আর্য্যভূমি ।

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

[বৈশাখ ১৩১৪ সাল]

প্রস্তাবনা ।

" যস্মাদ্বৈজায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্ম
প্রবর্ত্ততে ।
নমস্তুভ্যং পিতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ
নমোঽস্তুতে ॥"

যাঁহা হইতে এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি, যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, হে ব্রহ্মরূপ সাক্ষাৎ জগৎপিতঃ, তোমার শ্রীপাদ পদ্মে অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক আজ আমরা এই শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম ।

মানবগণের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি স্ব স্ব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ । ধীশক্তি সম্পন্ন মানব মাত্রেই স্বীয় দুঃখ ও অবনতির জন্য দৈবের উপর, অদৃষ্টের উপর কিম্বা রাজার উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না । কারণ তাঁহারা জানেন, নিজের সুখ, দুঃখ নিজের হস্তেই রহিয়াছে । তাঁহারা আত্ম শক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ও যত্ন নিয়োজিত করেন । সেই অমোঘ উদ্যম ও যত্নের নিকট সহস্র বাধা বিঘ্ন পরিপন্থীরূপে দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা উদ্যম হীন করিতে পারে না । ফলতঃ আত্মনির্ভর নীতিই, স্বাবলম্বনবৃত্তিই মানবগণকে উন্নতির সোপানে লইয়া যায়, উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত করে । ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনির্ভর নীতি যেরূপ সুফল প্রদান করে, জাতিগত জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না । ইতিহাস এবিষয়ের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমাদের আর্য্যভূমি ভারতভূমি আজ স্বাবলম্বন বৃত্তিহীনা তাই অবনতির পরাকাষ্ঠায় উপনীতা হইয়াছেন । উন্নতির পর অবনতি অবনতির পর উন্নতি জগৎ সংসারের নিয়ম । এমন কি কোন একটী জাতি অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে দেখা যায় । আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আর্য্যভূমি সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । উষার ক্ষীণালোক দেখা

দিয়াছে। এক দিন এই ক্ষীণরশ্মি দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া আর্য্যভূমির মুখোজ্জ্বল না করিবে কে বলিতে পারে।

"আর্য্যভূমিতে" বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিমাসে বাহির হইবে। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতমাতার প্রতি আমেরিকার পত্র।

——:O:——

প্রিয়তমা ভগিনি! বহুদিন পর্য্যন্ত তোমার আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায়, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার জন্য আশা করিয়া আছি, কিন্তু হায়! আমার সে আশা পূর্ণ করিবার কোন উপযুক্ত অবসর দেখিতে পাইতেছি না। পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ না ঘটিলে মনোগত অভিপ্রায় বলিবার ও শুনিবার সুযোগ ঘটে না। আমার যে সকল প্রিয় সন্তান কর্ম্মক্ষম, পণ্ডিত ও বহুদর্শী তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আমার মনোগত কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না, বিশেষতঃ মহাসমুদ্র পারে তোমার অবস্থিতি, সন্তানগণ সাহসী ও কুসংস্কার-বিহীন হইলেও তাহাদিগকে দূর-দেশে পাঠাইতে আমার ইচ্ছা করে না। কেন না পথে পদে পদে বিষম অনর্থ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, পাছে, তাহাদের কোন অমঙ্গল হয়, তাহাতে তুমিও বিরক্ত হইবে, আমিও মনে বড় বেদনা পাইব। এক্ষণে পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ সাহায্যে তোমার সংবাদ লইবার জন্য অধিক কষ্ট করিতে হইবে না জানি, কিন্তু তোমার যে সংবাদ পাইবার জন্য আমি আকাঙ্খা করি তাহা টেলিগ্রাফে হয় না বরং পোষ্ট আফিস দ্বারা কতক সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু পথে যেরূপ দৌত্যের দৌরাত্ম্য তাহাতে সে আশা সফল হইবার পক্ষে সম্ভাবনা অল্প। যাহাই হউক আইস এক্ষণে আমার শক্তিতে যতদূর পারা যায় নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরে বলাবলি করিতে আরম্ভ করি। তোমার যে ২১টী সন্তান এখানে আসিয়াছিল আমি তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি; কিন্তু সে সুখ হৃদিয়ে নিবার মাত্র। তাহারা অদ্যাপি মানুষ হইতে পারে নাই। তোমার পূর্ব্বকার সন্তানগণ যেরূপ উপযুক্ত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহাদিগের বিশেষ করিয়া পরিচয় লইতে হয়। কারণ ইহাদের যে বেশ নাই যে ভাষা নাই যে আকার নাই, যে স্বদেশানুরাগিতা শক্তি নাই। সুতরাং অনেক কষ্টে তোমার পর জানা যায় যে তাহারা তোমার সন্তান বটে। কিন্তু হায়! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমার পূর্ব্বগৌরব, স্মৃতি পথে উদিত হইয়া মনে যে বেদনা হয় তাহা আর কি বলিব।

বারম্বার পর-পীড়ন সহ্য করিয়া গৃহ বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকর ফল-লাভ করিয়া আত্ম-কলহ যে কি ভীষণ কুফল উৎপাদন করে, তাহা কি তোমার সন্তানগণ বুঝিতে পারিয়াছে? নিজের দেশ নিজের স্বাধীনতা অপরকে দিলে যে সকল আশায় বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা কি জানিতে পারিয়াছে? বিজেতৃগণ শিরারোহণ পূর্ব্বক যে নানাবিধ কষ্ট প্রদান করে সে পীড়নের কঠোরতা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে? বিদ্যার সুমধুর আস্বাদ-লাভে সমর্থ হইয়া এক্ষণে কি তোমাকে সুখী করিবার জন্য তাহাদের কোন চেষ্টা আছে না মুক্তকায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছে? তাহাদিগের অতি-

আর কি কিছু অনুভব করিতে পারিতেছ ? আমি মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে তাহারা একণে যে রাজার বশীভূত সেই রাজার ঔদার্য্য গুণে সন্তুষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্যতালাভ করিয়া তোমাকে কতক পরিমাণে সুখী করিতেছে। বিদ্যার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কি বীরত্বের গৌরব করিয়া থাকে ? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যেমন মনের বল বাড়িতেছে শারীরিক শক্তির উত্তেজনার পক্ষে তাহাদের সেইরূপ দৃষ্টি আছে কিনা ? তাহারা পুস্তকে যাহা অধ্যয়ন করে, শিক্ষকের নিকট যে বিষয়ের উপদেশ পায়, কার্য্যে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে অদ্যাপি সমর্থ হইয়াছে কি না ? অথবা শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাহাদের আন্তরিক অভিলাষ আছে কি না ? তাহাদের জাতীয় গৌরব রক্ষার বিষয়ে উদাসীনতা না আগ্রহতা পরিলক্ষিত হয় ? তাহারা যে শিক্ষা করে সে শিক্ষা আত্মোন্নতির না পরসেবার জন্য ? কি মানসে তাহাদের শিশুরা শিক্ষালয়ে প্রবেশ করে, কোন অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষাকাল অতিবাহিত করে ? কোন্ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে পাঠাগার হইতে [illegible] হইয়া বহির্গত হয় ? শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ কি তাহাদের মনোহরণ করে ? তাহারা কি তোমার নাম তোমার গৌরব, তোমার [illegible] করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর ? তাহাদিগের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তোমার মনে কি কোন আশার উদ্রেক হয় ? না নিরাশানীরে হৃদয় নিমজ্জিত হইয়া মৃয়মাণ হও ? এ সম্বন্ধে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কথা প্রসঙ্গে কখনও অবগত না হইলেও সংবাদ পত্রাদি পাঠে অনেক আভাস পাইয়াছি।

কিন্তু ভগিনী ! তোমার সন্তানগণের রাজভক্তি সন্দর্শন করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। এমন রাজভক্ত সন্তান আর কোন দেশ প্রসব করিতে পারেন নাই।

তোমার দেশের শাস্ত্রকারগণ রাজভক্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শুনিলে প্রকৃত পক্ষেই পুলকিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য্য, অগ্নি, এবং কুবের এই অষ্ট দেবতার অংশে রাজা নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। দেবতার অংশে নির্ম্মিত বলিয়াই অন্য লোক অপেক্ষা রাজাদিগের প্রভাব অধিক। রাজা বালক হইলেও মনুষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ভাবিতে হইবে"।

রাজার বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের এরূপ নির্দ্দেশ অযৌক্তিক নহে। দেখ ভগিনি ! দেশে রাজা না থাকিলে, প্রজাগণ কখনই নিরাপদে থাকিতে পারিত না। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর সর্ব্বদা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত, কুলবালিকার উন্নতির কথা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত না, লোকের ধন প্রাণ দস্যুদিগের ক্রীড়া সামগ্রী হইত। যে রাজার প্রভাবে দস্যুগণ পরস্বাপহরণে সঙ্কুচিত হয়, দুর্বৃত্তগণ হিংসা হইতে বিরত হয়, বলবান দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে ভীত হয়, সেই রাজাকে দেবতা বলা যুক্তিসঙ্গত। রাজা দুষ্টের দমন না করিলে পৃথিবী অশান্তির বাসভূমি হইত।

রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, অপক্ষপাতে বিচার দ্বারা ন্যায্য অধিকার হইতে প্রজাগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজাগণ লোকবিগর্হিত অহিতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া

শাস্ত্রানুশীলনে স্ব স্ব জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, বাণিজ্যাদির দ্বারা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইতেছে, বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা অভিনব তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করিয়া দেশের এবং জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছে, এই সকল দেখিলে রাজা অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। অন্য দিকে যে রাজার প্রজা কষ্টে আছে, দারিদ্র্য দুঃখে নিপীড়িত, সাহিত্য বিজ্ঞানুশীলন দ্বারা উন্নতি করা দূরে থাকুক, উদরান্ন সংস্থানের জন্যই ব্যাকুল, সেই রাজা কখনই সুখী নহেন। তাঁহার মন সর্ব্বদাই কিসে প্রজার মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া আকুল হয়। সদাশয় মহাত্মা নরপতিগণ স্ব স্ব সুখ দুঃখকে সুখ দুঃখ বলিয়া ভাবেন না, প্রজার সুখ দুঃখকেই প্রকৃত সুখ দুঃখ মনে করেন।

প্রিয় ভগিনি! ধ্যানাসক্ত শমীক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলে ঋষিকুমার শৃঙ্গী মহারাজকে যে অভিসম্পাত প্রদান করেন তদুপলক্ষে ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি প্রবর পুত্রকে রাজভক্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন বস্তুতঃ তাহা যে জগতের আদর্শ তৎপক্ষে অণুমাত্র সংশয় নাই। ঋষি বলিলেন "হে পুত্র! রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত, আমরা ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, আমরা যথা সুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না। হে বৎস! ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া থাকি, সুতরাং রাজা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ধর্ম্মের অংশ ভাগী। অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হয়। বৎস! দেশ অরাজক হইলে সর্ব্বদা দস্যু ভয় প্রভৃতি নানা দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজাই দণ্ডবিধান করিয়া শাসন করেন, যখন সকলেই রাজদণ্ডভয়ে সাতিশয় ভীত হয়, তখনই শান্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ বা যাগাদি ক্রিয়া করিতে পারে না, সুতরাং রাজা হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতেই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ভূপাল কর্ত্তৃক সমুদায় যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি হইতেই শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এবং শস্যাদি হইতে জনগণ জীবন ধারণ করে। রাজা রাজ্য রক্ষা করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের ধাতা, ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে রাজা দশ সংখ্যক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান মান্য। রাজাকে শাপ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

প্রজ্ঞাবতি ভগিনি! সত্য পথে থাকিয়া যাহাতে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারা যায় প্রকৃতি পুঞ্জের তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। সকলেরই এক প্রমাদ হইয়া থাকে, রাজারও হইতে পারে।

পিতার কার্য্যে ভ্রম হইলে পুত্রের তাহা যেরূপে দেখাইয়া দেওয়া উচিত রাজার ভ্রম ও প্রজার সেইরূপ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। রাজাকে লোকের নিকট নিন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে, বা তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি কমাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোন দোষের কথা বলা অতীব গর্হিত। রাজার ভ্রমের কথা বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার সত্যাসত্যতার বিষয় সম্যক অবগত হইয়া, ভক্তি সাবধানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

যদি রাজা প্রকৃতপক্ষেই অত্যাচারী হন, প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজে ভোগ বিলাসে ব্যাপৃত থাকেন, তথাপি হঠাৎ রাজার

নিন্দা না করিয়া বা প্রতিকূলাচরণে সক্ষম না করিয়া, বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে শত সহস্রবার তাঁহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। রাজদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা একই কথা ; কাহারও এ পাপে লিপ্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

জল।

করুণাময় পরমেশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ে কি অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই ক্রমশঃ তাঁহার অসীম দয়া ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিমোহিত হইয়া থাকিতে হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য যে দ্রব্যের যেরূপ প্রয়োজন তিনি সে দ্রব্যের সেরূপ যোজনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায় বায়ু জল ও খাদ্য। তন্মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, সে কারণ জগদীশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বায়ু সাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। জল আমাদের জীবন রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকা অসম্ভব বটে, কিন্তু জল ব্যতীত অধিক দিন জীবিত থাকাও সম্ভবপর নহে। জল জীব রক্ষার ঈদৃশ অন্যতম প্রধান সাধন বলিয়া পরম কারুণিক ভগবান এই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জলে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণী-জগতের পক্ষে জল যেরূপ প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদ জগতের পক্ষেও সেরূপ প্রয়োজনীয়। এই দুই জগতের অস্তিত্ব জলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। জল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে এরূপ একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুতরাং ইহার পরিমাণ যাহাতে একেবারে হ্রাস হইয়া না পড়ে তজ্জন্য যে সমস্ত নৈসর্গিক উপায়ের বিধান রহিয়াছে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে মহান্ মহেশ্বরের সৃষ্টি ও পালন বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় কৌশল অবগত হইয়া একেবারে আনন্দরসে পরিপ্লুত এবং ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইতে হয়। এই সকল বিষয় নিম্নে ক্রমশঃ সংক্ষেপ ও পরিস্ফুটভাবে বিবৃত করা যাইতেছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থল এবং দুই তৃতীয়াংশ জলে পরিপূর্ণ। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি একটি জীব দেহের ভার ১৫০ একশত পঞ্চাশ পাউণ্ড হয় তবে তাহার ১০০ একশত পাউণ্ড জল এবং পঞ্চাশ পাউণ্ড অপরাপর পদার্থ। উদ্ভিদের জলের পরিমাণও প্রায় এইরূপ আমরা বাজারে শাক সবজী বা অপরাপর তরকারী খরিদ করিয়া যে মূল্য দিয়া থাকি তাহার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জলের মূল্য।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রূঢ় ও যৌগিক। তাঁহারা বলেন এই পৃথিবীতে কতক গুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহারা সেই সকল পদার্থকে রূঢ় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পুনরায় তাঁহারা বলেন যে জগতে এমন অনেক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং রাসায়নিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাঁহারা এই সমুদায় পদার্থকে যৌগিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এবং এই সকল

যৌগিক পদার্থ কোন্ কোন্ বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন তৎসমুদায় পৃথক করিবারও নানাপ্রকার উপায় স্থির করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে জল রূঢ় পদার্থ নহে। একটী যৌগিক পদার্থ।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা কল্পনা শক্তির বলে জলকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া স্থির করেন নাই। নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এ বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা রেশম জড়িত দুইটী সরু তাম্রের তারের এক এক মুখ এক এক খণ্ড প্লাটিনম্ সংলগ্ন করিয়া সলফিউরিক্ এসিড্ মিশ্রিত বিস্তৃত মুখ বিশিষ্ট একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করতঃ অপর অপর মুখ বুন্সেন কিম্বা গ্রোভের তাড়িত ব্যাটারি সংলগ্ন করিয়া দুইটী জলপূর্ণ কাচের নলের খোলা মুখ প্লাটিনম্ খণ্ডদ্বয়ের উপর যথাক্রমে বিপর্য্যস্ত করতঃ ধরিয়া রাখিয়া দেখিয়াছেন অল্পক্ষণ পরে কাচের নল দুইটীর মধ্যে বুদ্ বুদ্ উঠিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটী কাচের নল জল শূন্য হয় এবং অপরটি অর্দ্ধেক জল পূর্ণ থাকে। ইহার কারণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে যেমন কাচের নল দুইটীতে গ্যাস সঞ্চিত হইতে থাকে অমনি নল দুইটী জল শূন্য হইতে আরম্ভ করে; তাঁহারা তৎপরে উক্ত কাচের নল দুইটীর খোলামুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অথবা ছোট ছোট দুই খানি কাচের প্লেটের দ্বারা আবদ্ধ করতঃ বিপর্য্যস্ত করিয়া দুইটী নলের মধ্যে যথাক্রমে দুইটি জলন্ত দেশলাই প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছেন একটীতে প্রবেশ করাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই নিবিয়া যায় এবং অপরটিতে আরও উজ্জলভাবে জলিতে থাকে এতদ্বারা তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, যে কাচের নলে দেশলাই প্রবেশ করাইয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে নিবিয়া যায়, সেই নলটিতে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং যে নলটিতে জলন্ত দেশলাই প্রবেশ করাইলে আরও উজ্জলভাবে জলিতে থাকে সেই নলটিতে অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। তাঁহারা ইহাও নির্ণয় করিয়াছেন যে এই দুই প্রকার গ্যাস যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত করিলে জল উৎপন্ন হয় না। তাঁহারা বলেন দুই তৃতীয়াংশ হাইড্রোজেন গ্যাস ও এক তৃতীয়াংশ অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে এক অংশ জল উৎপন্ন হয়। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুই স্বতন্ত্র গ্যাস ২ : ১ এই অনুপাতে সংমিশ্রিত করিয়া জল উৎপন্ন করা ব্যতীত আরও কয়েকটী উপায়ে জল উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন মূলে সকল গুলিই একরূপ। তাঁহারা হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়াইয়া জল উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে উত্তপ্ত কপার অক্সাইড্ উপরে হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দিলে জল উৎপন্ন হয়। এইরূপে দেখা যায় তাঁহারা নানা যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কোন না কোন উপায়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সংমিশ্রিত না করিলে জল উৎপন্ন হয় নাই।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা জলকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জল, দ্বিতীয়তঃ অবিশুদ্ধ জল তৃতীয়তঃ এফারভেসেণ্ট জল, চতুর্থতঃ ক্যালিবিয়েট জল, পঞ্চমতঃ গন্ধক জল। তাঁহারা বলেন কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টি হইলে পর বাতাসের সহিত যে সমুদায় অবিশুদ্ধ অপরিষ্কার পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহা ধৌত হইয়া যায়। তৎপরে যে বৃষ্টির জল পতিত হয় সেই জলই

বিশুদ্ধ জল এবং এই জলকে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন নদী প্রভৃতি অপরাপর জলাশয়ের জলে নানা প্রকার খনিজ ও অপরিষ্কার পদার্থ মিশ্রিত থাকে সুতরাং সেই সমুদায় জলাশয়ের জলকে বিশুদ্ধ জল বলা যাইতে পারে না। এই সমুদায় জলকে তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। যে সকল জলে কারবণিক্ এসিড্ গ্যাস মিশ্রিত থাকে সেই সমুদায় জলকে তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। যে সকল জলে লৌহ ঘটিত যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ রহিয়াছে সেই সকল জলকে তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। আর যে সকল জলে হাইড্রোজেন ও গন্ধক ঘটিত যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ রহিয়াছে সেই সমুদায় জলকে তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা জলের যে সমুদায় সাধারণ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয় নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা জলের চারিটী সাধারণ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ অসঙ্কোচশীলতা, দ্বিতীয়তঃ সান্তরতা, তৃতীয়তঃ স্থিতিস্থাপকতা, চতুর্থতঃ স্থান-বিরোধকতা। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওরষ্টেড্ নামক একজন পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত পিজোমিটার নামক একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তদ্দ্বারা তিনি নিরূপণ করেন যে এক বর্গইঞ্চি আয়তন জলের উপরে যে ১৫ পাউণ্ড বায়ুর চাপ পড়ে তাহাতে কেবলমাত্র উক্ত আয়তনের দুই সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র সঙ্কোচিত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে জলকে একরূপ অসঙ্কোচশীল বলা যাইতে পারে। জল যে সান্তরতা গুণবিশিষ্ট ইহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে জলের ভিতর রঙ্ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি। জল সান্তরতা গুণবিশিষ্ট না হইলে কখনই আমরা স্বেচ্ছাক্রমে জলের ভিতর রঙ্ কিম্বা অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করাইতে পারিতাম না। জল অল্প পরিমাণে সঙ্কোচশীল, এই গুণের উপর ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ নির্ভর করিতেছে। জলের চতুর্থ গুণ স্থান-বিরোধকতা। এই গুণটীর বিষয় আমরা সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারি, একটী জল পূর্ণ পাত্রে যদি কোন বস্তু নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে তাহার সম আয়তন জল উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। জলের স্থান বিরোধকতা গুণ বশতঃ এরূপ সংঘটিত হয়। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা জলের কয়েকটী সাধারণ গুণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বিশুদ্ধ জল স্বাদ বিহীন এবং গন্ধ বিহীন। অগভীর অবস্থায় বর্ণ বিহীন এবং সমধিক গভীর অবস্থায় নীলবর্ণ বিশিষ্ট। পার্ব্বতীয় অনেক হ্রদের পরিষ্কার জল সুন্দর নীলবর্ণ বিশিষ্ট দেখা যায়, এবং ঐ সকল জলের বর্ণ বিশুদ্ধ জলের স্বাভাবিক বর্ণের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

সান্ত্বনা।

(১)

বিমান রথেতে চড়ি সরগের মাঝে
গিয়েছ কুমার;
দুরাশার হায় সুখের স্বপন যত
ভেঙ্গেছে আমার;
জীবনের মরীচিকা, জীবনের প্রহেলিকা,

খেলেনা উঠেনা চিতে আর বার বার।
বাসন্তি হৃদয় মোর হ'ল ছারখার!

(২)

সরগের পারিজাত, আলোকর তুমি
নন্দন কানন,
সরগের ছবিখানি মরতে হাসিবে
হয় কি কখন।
জানিনা কি মনে করে, বিধি দুদিনের তরে,
খেলাইলা হাসিটুকু মরত ভবনে!
লুকাইলা দুই দিনে কেনবা গোপনে!

(৩)

রে অবোধ প্রাণ, ভাসিবিরে আঁখি জলে
আর কত দিন?
মিছে কেঁদে দেহ প্রাণ আর কত কাল
করিবিরে ক্ষীণ?
কেঁদে কেঁদে হলে সারা, জানিনা কেমন ধারা,
রে অবোধ, চিরদিন নয়ন আসারে,
ভাসাও উরস্ যদি পাবেনা তাহারে।

(৪)

এক দিন তুই এ দেহ পিঞ্জর হতে
করিবি প্রয়াণ,
তবে আর মিছে কেন কাঁদিস্‌রে মোর
অবোধ পরাণ?
মুছে ফেল্ আঁখি জল, হৃদয়ে জাগারে বল,
কেবা কার এসংসারে কেহ কারো নয়।
এসংসারে সব ফাঁকি, সব মায়াময়।

(৫)

এ অনন্ত রঙ্গভূমে আসে নাই কেহ
চিরদিন তরে,
খেলা সাঙ্গ হলে পরে কে কোথা পলায়
শূন্য মঞ্চ করে,
খেলিতে খেলিতে হায়, খেলিতে দিলেনা তায়,
রে পরাণ সমে হয় একপ আমার,
নির্দয় নির্ম্মম ওই যম দুরাচার।

(৬)

শিশুর সুন্দর খেলা লাগেনাকো ভালো
যাহার নয়নে;
পড়িল মানস তার কলুষেতে ভরা
হেন লয় মনে;
দেবজন মনোলোভা, শিশুর বদন শোভা,
দেখি প্রাণে দয়া যার না হয় সঞ্চার,
নিশ্চয় পাষাণে গড়া হৃদয় তাহার।

(৭)

বৃথা গঞ্জি আজ মোরা নিষ্ঠুর শমনে
নাহি দোষ তার;
বিধির বিধান যাহা অবহেলি চলে
সাধ্য আছে কার:
দুদিনের লাগি সবে, নাচিছ ভুলিছে ভবে,
হাসিরাশি মোরা তার ভুলিব কেমনে,
নাহতে সময় তেঁই হরিল সে ধনে।

(৮)

ফোটে ফুটে নাই সবে কুসুমের কলি
সৌরভে আকুল,
দুদিনের তরে গৃহ ছেল আলোময়
উপমা অতুল,
পেয়ে হায় নিরবধি, সেহেন নীহার যদি,
পেতরে ফুটিতে ওই কুসুমরতন,
পাসরিতে পারিতেকি জনমে কখন॥

(৯)

আধ ভাস ভাষা তার আধ আধ খেলা
কটি না খেলেছে,
ভোলাকো ভোলনা, আজ জীবনের সাধ
সে খালি হয়েছে।

যদিরে পরাণ খুলি, খেলিতাম খেলাগুলি,
সে গাথা গাহিতে কিরে ভুলা'ত জীবনে,
সে যে অনন্তের গাথা ফুরাবে কেমনে।

কর-বিজ্ঞান।

অবতরণিকা।

মনুষ্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে হইলে করতল পর্য্যবেক্ষণই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র মনুষ্যের দোষ ও গুণ দর্শনের ক্ষমতা জন্মে তাহা নহে দোষ ক্ষালনের উপায়ও জানিতে পারা যায়। গুপ্ত ও বাহ্য উভয়বিধ দোষ ও গুণের ক্রটি এবং প্রকাশ, সংশোধন এবং বিনাশ, এই সমুদয়ই করতল দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়।

কর-বিজ্ঞান বিবরণ জানিতে হইলে ঐতিহাসিক যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আদিম অবস্থার অনুসন্ধান লইতে হইবে। ইতিহাস দ্বারা আমরা ইহা অবগত হই যে আর্য্যঋষিগণের সময় হইতেই এই শাস্ত্র প্রচলিত আছে। উপস্থিত এতদ্বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ দৃষ্টে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অস্মদ্দেশে ইহা অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা এক্ষণে আমাদের পক্ষে নিবিড় ঘনাচ্ছন্ন অমারজনীর তুল্য। একটি নক্ষত্রও নাই, ধূসর চন্দ্রের একটি ক্ষীণ কিরণ-রেখাও নাই যাহা আমাদিগকে এই দারুণ অন্ধকারে কোন প্রকারে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। সুতরাং, জ্ঞাত বিষয়ের ক্ষুদ্র সীমার ধারে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞাত সাগর পানে চাহিয়া থাকি। সেই অনন্তসাগর তীরে দাঁড়াইয়া ভূগর্ভোত্থিত মনুষ্যখোদিত প্রস্তরখণ্ড কিম্বা কোন আশ্চর্য্যজনক পদার্থ বিশেষের ভগ্নাংশাদি কদাচ কুড়াইয়া পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। অবশ্য এ সমুদয় জ্ঞানমার্গে সহায়তা করে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা দুস্তর সমুদ্রের বালুকাময় তীরে তুচ্ছ আগাছা সমষ্টি মাত্র। এতদ্দ্বারা আমরা জ্ঞাত হই যে, আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে জ্ঞানালোক বিভাষিত যুগসময় ছিল, আমাদের বর্ত্তমান নরবংশের পূর্ব্বেও বহুতর বিচিত্র জ্ঞানমণ্ডিত মানবমণ্ডলী বিদ্যমান ছিলেন, বসুন্ধরা শস্যসম্ভার-শোভিতা ছিল; সভ্যতাও পূর্ণ বিকশিত ছিল; কিন্তু আজ সে সকলই অতীতের অন্ধকার ক্রোড়ে চিরদিনতরে লুক্কায়িত হইয়াছে।

যাঁহারা এই শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন আমরা তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের, অলৌকিক পাণ্ডিত্যের এবং সূক্ষ্মদর্শী গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হই। যখন রোম ও গ্রীস মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান করিতেছিল, যখন তাহাদের নামও শ্রুত হয় নাই তাহারও বহুযুগ পূর্ব্বে ভারত পাণ্ডিত্যের শুভ্র জ্যোতি অভ্রভেদী হিমাচল শিরে উদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যদিগের জ্যোতিষের অসীম জ্ঞান তাঁহাদের নির্ম্মিত বিচিত্র দেবমন্দির গাত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেব অয়নাংশে এক রাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করিতে অন্ততঃ দুইসহস্র বৎসর গ্রহণ করেন। অতএব কত শতসহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভাস্করের অয়নাংশ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি আমাদের ধারণার সীমা বহির্ভূত নহে?

এই ঘটনার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অসীম শক্তি সামর্থ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বর্ত্তমান অবতারিত প্রস্তাব এই সমুদয় মনস্বী জ্ঞানবৃদ্ধ পিতৃ-

পুরুষগণের অমিত জ্ঞানানুশীলনের একমাত্র ফল। ইহাদেরই শিক্ষা দেশ দেশান্তরে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের] প্রচার আরম্ভ হয়। অনেকের মতে আমাদিগের বেদচতুষ্টয় ঋষিদিগের শিক্ষার একমাত্রভিত্তি।

যে আর্য্যমহাপুরুষগণ জ্ঞানবলে ঈদৃশ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের পরিত্যক্ত জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র কণিকা পাইয়া জগতে আপনাদিগকে জ্ঞানাভিমানী বলিয়া পরিচয় দিতেছি, আধুনিক অতি সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক তত্ত্বগণনায় অকিঞ্চিৎকর, সামান্য লৌকিক প্রকৃতির রচনা বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ, সুতরাং সত্ত্বশূন্য ছিলেন, এই অশ্রদ্ধেয় কথা অসৎ সমীপে প্রচার করিয়া উপহাসাস্পদ হইতেছে, এমনও অনেক নির্ব্বোধ আছে।

এই কর-বিজ্ঞানও সেই মনস্বী মহোদয়গণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। যদি জগতের যাবতীয় শিক্ষার মূলে তাঁহারাই আমাদের একমাত্র গুরুস্থানীয়, তবে কোন সাহসে আজি আমরা ক্ষীণবুদ্ধি লইয়া এই কর-বিজ্ঞানকে হতাদরে অবজ্ঞা স্তূপের উপর নিক্ষেপ করিব?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকেই এরূপ ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছেন যে, তাঁহারা যে বিষয় স্বয়ং বিশ্বাস করেন না, তাহাই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইহা একবারে ভিত্তিশূন্য। যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন প্রকার মতামত প্রচারে যে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, একথা একেবারে বিস্মৃত হন। "আমি বিশ্বাস করি না" কেবলমাত্র এই কথা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে; সুতরাং, স্বতঃই মনোমধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, "পুরাকাল হইতে তাপসগণ এবং অনেকেই আপনার অন্তঃকরণে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে, তিনি তাহাদের সকলের অধ্যয়ন এবং অনুশীলনে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন কি না?" এবং যদিও সমালোচক প্রত্যুত্তর দেন, এবং যদিও যথাসাধ্য অনুসন্ধানও করিয়া থাকেন, তথাপি সেই গভীর তত্ত্বান্বেষীও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এখনও এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কথার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, সংসারের মধ্যে একজনও অবিশ্বাসী ব্যক্তি নাই। তাঁহারা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, কারণ তাঁহারা কখনও সে কথার অর্থ এবং প্রকৃত তত্ত্ব গভীর আলোচনা করিয়া দেখেন নাই।

প্রারম্ভে সমুদয় বিজ্ঞানই কেবল কতকগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনার সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে মনস্বী মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক তৎসমুদয় পরীক্ষিত, প্রমাণিত এবং পরিমিত হইয়াছে। সাধারণ লোকেরাই কেবল পার্থিব নীতির বলে জগৎ পরিচালিত হইতেছে ভাবিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন; সাধারণ ও নিত্য ঘটনার বাহিরে যাহা কিছু তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, তাহাকেই তাঁহারা অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিতেন; কিন্তু জ্ঞানালোক প্রাপ্তদিগের অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া কিছুই নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন, কি আধ্যাত্মিক জগতে (Moral World) কি আধিভৌতিক জগতে (Physical World) সর্ব্বত্র একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে। উপযুক্ত তত্ত্বান্বেষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে যাহা কিছু আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক বা সার্ব্বলৌকিকজ্ঞানকারী ঘটনা বা ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে তৎসমুদায়ই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তবে এমন হইতে পারে মধ্যে একটী শৃঙ্খল হারা-

হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সমুদয় অনুসন্ধানই নিষ্ফল হইয়াছে; যদিও আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সসীম পর্য্যবেক্ষণ সেই শৃঙ্খলের অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া পড়ে, তথাপি নিশ্চয়ই সেই শৃঙ্খলের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

যিনিই কালের ক্ষণসমূহ অস্তরের সহিত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তিনিই জানিতেছেন, যে শনৈঃ শনৈঃ ক্রমোবিধ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে; অতীতের অশ্রদ্ধেয় ধারণানিচয় ধীর প্রশান্তচিত্তের অনুধাবন ফলে ক্রমেই মীমাংসিত হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকেই অলীক গল্প বলিয়া বিশ্বাসমুক্ত, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের আত্মবোধোচিত নির্ম্মল সত্যকে এতদিনে যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপ সত্যের সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে একটি নিবিড় অন্ধকারময় পথ দিয়া চলিতে হইবে; ভ্রমসঙ্কুচিত পথেও পদার্পণ করা অসম্ভব নহে। তদ্ব্যতীত লোকের অজস্র বিদ্রূপবাণও সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ ঐকান্তিক উদ্যমশীলদের দ্বারাই বহুতর সত্যরত্ননিচয়ের প্রসূতি স্বরূপিণী ধীর

(ক্রমশঃ)

পি, দত্ত, F. C. S., Ph. B.

ত্যা রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হত্যা।

দয়ালচাঁদ একজন প্রসিদ্ধ ধনী। প্রায় ত্রিশ বৎসর নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থসংগ্রহ ক ; বৃদ্ধ বয়সে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাওড়ায় গঙ্গাতটে একখানি বাগানবাটি ক্রয় করিয়া নির্জ্জনবাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যাকালে দয়ালচাঁদ তাঁহার বৈঠকখানায় পায়চালি করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরের প্রতি বিরক্তি মিশ্রিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অমরও বিষণ্ণবদনে গবাক্ষ হইতে অদূরস্থিত কলকলনাদিনী ভাগীরথীর তীরে চাহিয়া রহিয়াছে।

অমর দেখিতে অতি সুপুরুষ। সংসারে তাহার একমাত্র পিতা ও অতি দূর সম্পর্কীয় একটি আত্মীয়ের কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। বাল্যকালেই অমর মাতৃহীন হয়। বৃদ্ধ দয়ালচাঁদও তাঁহার পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং পত্নীবিয়োগে অন্য দারপরিগ্রহ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন নাই। একমাত্র সন্তান বলিয়া অমর পিতার আদরে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, দয়ালচাঁদ ক্রোধবিমিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি আর তোমাকে সাহায্য করিব না; অনাহারে মর সেও ভাল।"

অমর উত্তর করিল, "তাহা হইলে অনাহারেই মরিতে হয়।"

দ। তোমার মাতামহ তোমাকে দশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি দিয়াছেন। তোমার বয়সে আমার পাঁচশত টাকারও সম্পত্তি ছিল না।

বিষাদের হাসি হাসিয়া অমর ধীরভাবে বলিল, "ও টাকাতে আমার কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।"

দ। তাত বটেই। ঐ টাকাতে অনেক বড় বড় পরিবার সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়, আর তোমার হাত খরচ হয় না। তা যাক্, তুমি আমার নিকটে থাকনা কেন।

"এ স্থানটা আমার আদৌ পছন্দ হয় না।"

"কেন, মন্দটা কি? আমার পক্ষে কিন্তু বেশ। তা যা হোক, তুমি বলছ,—দেনাটা তোমায় দিতেই হইবে?"

"নতুবা আমার একবারে মান যায়; ভদ্র সমাজে মুখ দেখান ভার।"

"যখন তোমার শোধ করিবার টাকা নাই, তখন ধার করা কি উচিত ছিল?"

"আমি আপনার কাছে পাবার আশা করি।"

"কত টাকা ধার?"

"২০,০০০ বিশ হাজার টাকা।"

"সেই জন্যইত আমার বেশী ভয়; সে টাকা না দিতে পারিলে একবারে ভদ্র সমাজে মুখ দেখান ভার হইবে। মানসম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইবে।"

"তাতে আমার কি?"

ক্রোধে ও অপমানে অমরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল "তা হলে কি আপনি ব'লতে চান যে, আমার মান সম্ভ্রম যাক্ বা আমি অপমানিত হইলে আপনার কোন ক্ষতি নাই?"

"নিশ্চয়ই।"

"দেখুন, লোকে আপনাকে নীচ ও স্বার্থপর বলে, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না।"

"কেমন, এখন ত হোল।"

"সে কথা আমি বল্‌তে চাই না। আমার প্রার্থনা যে আপনি এবারের মত টাকাগুলি দিন।"

বৃদ্ধ তাচ্ছল্যের সহিত বলিলেন, "তুমিত আমার প্রার্থনা খুব শুনিয়াছিলে কি না?"

"আপনি তারারই কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ, সেত আমার সুলক্ষণা ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

অমর অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "সেই ত আরও একটা কারণ যে তার সহিত আমার বিবাহ হতে পারে না। [illegible]শেষতঃ এ বিবাহ প্রস্তাব আমি আন্তরিক ঘৃ[illegible]রি।"

"কেন?"

"মাপ করুন; এ বি[illegible] অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল।"

"বিবাহ কর, আমি তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিব।"

"দেখুন, এ প্রলোভন কিছু বেশী নয়। আপনি এই বিবাহ ছাড়া যা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

"কেন? সে একজন ভদ্র ঘরের কন্যা।"

"তা হোক, আমার উপযুক্ত নয়।"

"বেশ, বেশ, এ বিষয়ে আর বেশী বলিতে চাহি না। এই ব্যবহারের জন্য তোমাকে এক দিন বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে।"

"আপনার ইচ্ছা আমি তাহাকে বিবাহ করি?"

"কেন, হ'তে পারে সে এক[illegible] নয়, কিন্তু তা ব'লে ত কুৎসিৎ নয়।"

"সে যা হোক আমি বিবাহ [illegible]িব না।"

"আঃ যাক্, তবে এ বিষয় [illegible] আর তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই; আমি [illegible]মাকে আর এ প্রস্তাব করিব না।"

"তাতে আমি অত্যন্ত সুখী [illegible]।"

"তোমার ও আর এখানে [illegible] কাজ নাই।"

অমর অত্যন্ত বিস্মিত হই[illegible] কহিল, "কেন? আমিত অনেক দিন পরে [illegible]এখানে এসেছি।"

"না, না, তোমাকে [illegible]নে আর আসতে হবে না।"

"তবে এখানে আমি ছুরি [illegible] সতে পার না ?"

"না যতদিন না তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন কর, ততদিন এখানে এস না।"

"লোকে আপনার এ কথা শুনিলে, আমাকে চোরেরও অধম বিবেচনা করিবে।"

"জুয়া খেলে দেনা করা বড় পৌরুষের কাজ ?"

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া অমর বলিল, "দেখুন আপনি আমায় অপমান করিবেন না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "কালে কালে কতই দেখি। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

"আমি আপনাকে ভয় দেখাই নাই।"

"তবে আমি কাণে কম শুনি। যাক্, এখন তুমি যাও।"

"তবে আপনি আমাকে তাড়ালেন ?"

"হাঁ তোমার সঙ্গে আর দেখা না হইলে কোন ক্ষতি নাই।"

"দেখুন, কোন লোক হয়ত আমার বিরুদ্ধে আপনাকে কোন কিছু বলে থাকবে তার জন্য কিন্তু আপনাকে পরে পরিতাপ করিতে হইবে।"

[illegible] র আমায় শাসাচ্ছ, আ্যা ?"

হইবে

"হুলস্ ক্রোধে অমর বলিল হাঁ। এই টাকা আমি আ [illegible] ার কাছ হইতে জোর ক'রে লব।"

"আর [illegible] আমি মরি, তবে।"

"মরির [illegible] র আর বেশী দেরি নাই।"

"কি তু [illegible] আমাকে মেরে ফেলবার ভয় দেখাও নাকি [illegible] যাও দূর হও।" যুবক তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ [illegible] রিয়া প্রস্থান করিল। একটি ভৃত্য সেই সময়ে [illegible] দ্ধকে তামাক দিতে আসিলে, বৃদ্ধ কহিলেন, [illegible] খ, যদি ও—আবার কখন এখানে আসে ও [illegible] এবাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ না; সে আমা [illegible] ক মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়াছে।"

সেই রাত্রে বৃদ্ধ সকাল সকাল শয়ন করিতে গেলেন। মনের অসুস্থতা নিবন্ধন আদৌ ঘুম হইল না। বহুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা আসিল, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি চমকিয়া শয্যার উপরে উপ-বেশন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহার শয়নের পাশের ঘরে চলিয়া বেড়াইতেছে। সেই ঘরে তাঁহার একটী লোহ নির্ম্মিত সিন্দুক ছিল এবং তাহাতে তাঁহার টাকাকড়ি ও প্রয়ো-জনীয় কাগজ পত্র থাকিত।

তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে, শয্যা ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বারে অতি সন্তর্পণে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে যেন দুইজনের মৃদু কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়াতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন দুইজন লোক তাঁহার লৌহসিন্দুক খুলিতেছে। তাহাদেরও একজনের আকৃতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চমকিত ও ভীত হইয়া যেমন চিৎকারে উদ্যত হইলেন, অমনি পশ্চাদ্দেশ হইতে একজন তাঁহার মস্তকে একটী ভীষণ লগুড়াঘাত করিল। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। চোরে-রাও তাহাদের কার্য্যসাধন করিয়া পলায়ন করিল।

আঘাত সাংঘাতিক হইলেও, দয়ালচাঁদের তৎ-ক্ষণাৎ মৃত্যু হইল না। প্রায় দুই সপ্তাহ তিনি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন।

ঘটনার পরদিনই পিতৃহত্যা অভিযোগে অমর ধৃত হইল। চাকরটাই বলিয়াছিল যে, অমর তাহার পিতাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কেবল তাহা নহে, দীনদয়ালের সরকার হামিদও অমরকে সেই রাত্রে বাটীর চারিধারে বেড়াইতে দেখিয়াছিল।

সংবাদপত্রে এই শোচনীয় ঘটনার বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। সকলেরই অমরের দোষ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

আঘাত লাগিবার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যমালচাঁদের একবারও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় নাই। সর্ব্বদাই কেবল প্রলাপ বকিতেছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে "অমর! তোর বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিলি!" বলিয়া চীৎকার করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

করোনারের তদন্তে 'তারা' বলিয়াছিল যে লৌহ সিন্দুকে প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা ছিল। মৃত হইবার সময় অমরের নিকট প্রায় অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা পাওয়া গেল।

কোথা হইতে সে এত টাকা পাইল, জিজ্ঞাসা করাতে অমর উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া কেবল বলিল "আমি নির্দ্দোষী।"

খুনের রাত্রিতে সে কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করাতেও উত্তর দিতে পুনরায় অস্বীকার করিল।

করোনারের বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে যমালচাঁদ তাঁহার পুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।

আমোদপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল অমর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে চলিল।

(ক্রমশঃ)

মহারাষ্ট্রীয় গল্প।

(সিংহদ দুর্গ)

বিজাপুর রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর, মহারাষ্ট্র সিংহ শিবজী আপনাকে কিয়ৎপরিমাণে সুরক্ষিত ও নিশ্চিন্ত মনে করিলেন। তখন দক্ষিণাবর্ত্তে মোগলদিগের সহ আত্মশক্তির পরীক্ষা লইবার জন্য তাঁহাদের অধীনস্থ স্থান সকল জয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দুর্গাদি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইলেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন শিবজী কোন রাজবংশ সম্ভূত নহেন। অলৌকিক সাহস ও আত্মশক্তির প্রভাবেই তিনি সেই সময়েই, আপনাকে সামরিক পরাক্রমশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং অসং সামান্য আত্মীয়বর্গের দল লইয়া একমাত্র সাহসবলের জন্যেই প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে মহারাষ্ট্রবাসীগণ পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। শিবজীর পূর্ব্বে কেহ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহসী হইয়া অসি ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই। মোগলের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শিবজীর কাহিনী অনল অক্ষরে লেখিত আছে। এখানে তাহার বিশেষ আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। সেই মহাপুরুষ মহারাষ্ট্র চূড়ামণি শিবজীর অলৌকিক কাহিনীর ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই আমাদের এই প্রবন্ধ।

শিবজী মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গের পর দুর্গ, গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তখন ভারতেশ্বর আলমগীর সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া রাজ্যসার নিষ্কণ্টক হইবার আশায় অম্বর রাজ জয়সিংহ ও দিলদার খাঁর অধীনে বিপুল সৈন্য শিবজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এই বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৬৬৫ সালে শিবজী মোগলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির সর্ত্ত অতি কঠিন ছিল, ও তাহা শিবজীকে পালন

মধ্যে অধিকাংশ দুর্গ তিনি মোগল সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, অবশিষ্টগুলি মোগল সম্রাটের জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিতে পারিবেন নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহা হউক শিবজী তখন এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিলনা। এই রূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর বিজাপুর অল্প দিনের মধ্যেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। এবং ইহাতে শিবজীর বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িল। এই সময়ে শিবজী সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীতে আমন্ত্রিত হন। বিশেষরূপ শিক্ষিত না হইলেও শিবজী রাজনৈতিক কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই আমন্ত্রণ বড় ভাল বিবেচনা করিলেন না। তজ্জন্য প্রথমে সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। শেষে রাজা জয়সিংহের কথায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়া দরবারে যোগদান করিবার জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কথাছিল দিল্লীতে উপস্থিত হইলেই শিবজী একজন প্রধান মোগল সেনাপতি বলিয়া গণ্য হইবেন। এই উচ্চ সম্মানলাভ হইবে বলিয়া শিবজীও যে মনে মনে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত না হইতেছিলেন তাহা নহে। এদিকে আরঙ্গজেবের মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল; শিবজীকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার ছলনা করিয়া তাঁহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাটের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামী যেরূপ প্রবল ছিল, রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতেন না। শিবজীর ন্যায় একজন উদারচেতা বীরপুরুষকে মিত্ররূপে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে পাইলে তিনি স্বল্পকালের মধ্যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সম্পূর্ণরূপ বশীভূত করিতে পারিতেন. কিন্তু আরঙ্গজেবের সেরূপ দূরদর্শীতার বড়ই অভাব ছিল। সাম্রাজ্যমদগর্ব্বে গর্ব্বিত, দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট কর্ত্তৃক শিবজী দিল্লীতে যেরূপ অনাদরে গৃহীত হইলেন, তাহাতে ঘৃণায় স্রিয়মান ও রোষে তাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মোগলের অধীনে কার্য্য করিবার ইচ্ছা অন্তর হইতে অপহৃত হইল। [illegible] পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে শিবজী [illegible] উপস্থিত হওয়ার পর রাজকীয় কোন [illegible] তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হন [illegible] কেবলমাত্র জয়সিংহের পুত্র তাঁহাকে [illegible] করাইয়া দরবারে লইয়া আসেন। [illegible] রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার আসন [illegible] নাই। সামান্য পাঁচ হাজারী মনসবদারগণের মধ্যে আসন গ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং রাজধানীতে নজরবন্দী অবস্থায় থাকিয়া অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধি প্রভাবে কৌশল পূর্ব্বক রাজপ্রহরী ও অন্যান্য সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আইলেন।

এই অলৌকিক পলায়ন কাহিনী জানিতে পারায় সম্রাট আপন নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এবং কোন প্রকারে পুনরায় শিবজীকে প্রলোভন বা বন্ধুতা দেখাইয়া স্ববশে আনিবার চেষ্টায় থাকিলেন কিন্তু সকলি বৃথা হইল। বেরার প্রদেশের অধিকাংশ জায়গীর স্বরূপ প্রদান ও রাজা উপাধীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াও আরঙ্গজেব তাঁহাকে আয়ত্ত্বে আনিতে পারিলেন না। শিবজী হিন্দুবংশে জন্মিয়াছিলেন, মন উচ্চ ছিল, সুতরাং প্রথমবার সরল বিশ্বাসে সম্রাটের প্রতারণায় ভুলিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন সম্রাট মিত্রভাবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন তখন তাঁহার হৃদয়ে

প্রজ্বালিত অমিত তেজ পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল। এবং মোগলের শত্রু হইয়া নিজে এক নূতন হিন্দু রাজ্য স্থাপনে যত্নবান হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহের নিকট হইতে শিবজী সংবাদ পাইলেন যে সম্রাট গোপনে তাঁহার জীবন বিনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবজী মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অমঙ্গল অনেক সময়ে মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে দেখা যায়। শিবজী সম্রাট কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত না হইলে আজ দাক্ষিণাত্যে যেরূপ হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে চলিল ইহা কখনই সম্ভবিত না। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা কি ছলে কি কি কার্য্য সাধন করে কে জানিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

ভাগবদ্গীতা পাঠ।

শ্রীযদুনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

১—৩। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! অর্জ্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেও আপনার পুত্রগণের নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভের কোন আশা নাই কারণ, সর্ব্বকৃত-বারিণী কৃপায় বশীভূত অর্জ্জুনকে বিগলিত হৃদয়, বিষাদ নিমগ্ন এবং বাষ্পাকুললোচন অবলোকন করিয়া শ্রীভগবান্ তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! এই বিষম রণসঙ্কটে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যদিগের নিতান্ত অযোগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক অসুখকর। হে পার্থ! ক্লীবত্ব ত্যাগ কর, ইহা তোমাতে শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূর কর, যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও।

৪—৫। তখন অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, মধুসূদন! আমি কিরূপে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমি কাতর হইয়া রণ পরাঙ্মুখ হইতেছি না। অন্যরূপ আমার নিবৃত্তির কারণ:— যাঁহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগকে বধ করিব কিরূপে? গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে যদি আমায় ভিক্ষা উপজীবিকাও করিতে হয় ইহাও আমার ভাল। যদি বল ভীষ্ম দ্রোণাদি পূর্ব্বে পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ইঁহারা অর্থদাস, কারণ পিতামহ নিজেই বলিতেছেন।—

"মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, আমি কৌরবের অর্থে বদ্ধই আছি। অতএব ইহাদিগকে বধ করিলে ইহাদের রুধির লিপ্ত ভোগ লাভ হইবে। ইহাতে ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হইব। গুরু বধ অপেক্ষা ভিক্ষাই শ্রেয়ঃ।'

ভগবান্! কিন্তু যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্য। ইহা তোমার পক্ষে পরধর্ম্ম এজন্য নিষিদ্ধ।

৬। অর্জ্জুন।— যুদ্ধেই বা শ্রেয়ঃ কি? জয়লাভ যে পক্ষেই হউক, ইষ্টনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইষ্টনাশ করিয়া জীবনে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? বিশেষ ইষ্টনাশ পরাজয় সদৃশই বটে, এ জন্য স্বজন বধ করিয়া জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না।

৭। হে কেশব! আমার চিত্তে দীনতা আসিয়াছে ধর্ম্মে সন্দেহ জন্মিয়াছে, কি করিব, নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার গুরু, নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও কি করিব?

৮—৯। যদি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পাই। এমন কি ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, তাহা হইলেও স্বজন বধ জনিত শোক কিরূপে নিবৃত্তি হইবে? গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না, অর্জ্জুন এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

১০। শ্রীভগবান অর্জ্জুনের বিষাদ দেখিয়া তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।

১১। অর্জ্জুন! তুমি শোক করিতেছ—, তাহাও যাহাদের জন্য শোক হইতে পারে না, তাহাদের জন্য; মুখে জ্ঞানের কথা কহিতেছ, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যিনি পণ্ডিত তিনি শোক করেন না—মৃতের জন্যই কি আর জীবিতের জন্যই কি।

অর্জ্জুন—অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছি কিরূপে?

ভগবান;—এই যে সমস্ত লোক দেখিতেছ, ইহাদের আত্মা হত হইবে, এই জন্য কি শোক না আত্মার দেহান্তর ঘটিবে তজ্জন্য শোক অথবা ইহাদের দেহ বিনষ্ট হইবে, তজ্জন্য তোমার শোক?

অর্জ্জুন,—যুদ্ধে কি ইহারা মরিবেন না?

ভগবান—তাহাইত জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি মরিবে? দেহ ত জড়। মাটি, জল, আগুন, বায়ু, ও আকাশ এই পঞ্চভূতে দেহ গঠিত। কতক মৃত্তিকা থাকিল বা গেল তাহাতে কাহার দুঃখ? যে কাপড়খানি পরিয়াছ, তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তবে কি মনে তার তুমিও মরিলে? তুমি আত্মা—আত্মা চৈতন্য স্বরূপ ইহার মৃত্যু নাই; ইনি অবিনাশী, তবে শোক করিবে কি জন্য? পণ্ডিত ব্যক্তি জানেন, চৈতন্য জড় হইতে পৃথক, তুমি পণ্ডিতের মত কথা গুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ। বলিতেছ দেহ নাশ হইলেও আত্মা থাকে। তোমার এই কথাতে তাহার পরিচয় পাইতেছি। মুখে পণ্ডিতের মত কথা না বলিয়া কার্য্যে তুমি যে পণ্ডিত তাহাই দেখাও। পণ্ডিতের মত চৈতন্যের স্বরূপ কি জান, তখন দেখিবে মৃত বা জীবিতের জন্য পণ্ডিতের শোক হয় না।

১২। আরও দেখ, আমি পূর্ব্বে যে ছিলাম না তাহা নহে। আর তুমিও যে ছিলে না, অথবা এই রাজাগণ ছিলেন না, কিম্বা আমরা যে থাকিব না তাহা নহে। তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাভরণ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইয়া যাই নাই।

(ক্রমশঃ)

হোমিওপ্যাথি কি?

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিকিৎসা জগতে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে হোমিওপ্যাথীর উৎপত্তি ও সৃষ্টি হয়। আজ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তাহার জন্মদাতা মহাত্মার নাম জানিতে কাহার না ঔৎসুক্য হইয়া থাকে? স্যামুয়েল হানিম্যান নামক একজন নগণ্য লোক কর্ত্তৃক একবড় একটি বিজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়াছে শুনিলে সকলেই বোধ হয় আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক কি উহা আশ্চর্য্যের বিষয়? জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে আমরা কি সততই দেখিতে পাই না যে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সমুদয়ই নগণ্য সাধারণ লোক হইতেই হইয়াছে। হানিম্যানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এলোপ্যাথিই—যাহাকে সাধারণ লোকে আজও চলিত কথায় "ডাক্তারী চিকিৎসা" বলিয়া থাকে—একমাত্র চিকিৎসা (বিজ্ঞান সম্মত) বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে হানিম্যানের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে "যাহা প্রয়োগে শরীরে যে সমুদয় রোগ বা লক্ষণের উৎপত্তি আবার তাহা প্রয়োগেই তৎ তৎ ব্যাধি বা লক্ষণের উপশম হইতে পারে।" কথাটি একটু

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ;—মনে কর কেহ একজন অজ্ঞাতসারে আর্সেনিক নামক বিষ পান করিয়াছে ; এখন তাহাতে আমরা মোটামুটি দেখিতে পাইতেছি যে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অস্থিরতায় অনবরত ছট্‌ফট্ করিতেছে ; ভয়ানক তৃষ্ণা ; গাত্রজ্বালা এবং ক্রমেই শরীরে নিস্তেজাবস্থা আসিয়া পড়িতেছে ; মহাত্মা হানিমানের মতে উক্ত লক্ষণাবলী যদি তুমি কোন রোগীতে দেখিতে পাও তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত আর্সেনিক নামক ঔষধ ব্যবহার করিলেই তোমার রোগী উপশম লাভ করিবে। হানিমানের এই theory বা অনুমিতির লাটিন নাম "Similia Similibus curantur" এবং ইংরাজীতে উহাকে "Likes cured by likes" বলে। আমাদের সংস্কৃতে উহাকে "বিষস্য বিষমৌষধম্" "সমঃ সমং শময়তি" বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে চলিত কথায় প্রবাদ আছে যে "কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করা" "জল দিয়া জল বাহির করা" ; ইহাই হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র বলিয়া জানিবে। সুস্থদেহে কোন একটি ঔষধ সেবনে শরীরে যে সমুদয় লক্ষণের উদ্ভব দেখা গিয়াছে অসুস্থ শরীরে সেই সমুদয় লক্ষণ-দৃষ্টে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগ শান্তি হইবে।

হানিমানের এই থিয়রী যে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছিল তাহা নহে। তিনি স্বয়ং সমুদয় ঔষধ সুস্থাবস্থায় প্রথমে নিজের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন পরে শিষ্যগণকে উহার ফল প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এত কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিয়া তিনি জগতে নিজ আবিষ্কৃত চিকিৎসার সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঔষধাবলীর এই সত্যতা নিরূপণ বৈজ্ঞানিক জগতে "প্রুভিং" নামে খ্যাত আছে। পুরাতন মতের চিকিৎসার সহিত হানিমানের নবাবিষ্কৃত চিকিৎসার আর একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে ইহাতে কেবলমাত্র একটী ঔষধ ক্রমোন্নীত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তাহাও অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইবে ঔষধের মাত্রা যত অল্প হইবে উহার শক্তিও তত অধিক হইবে এজন্য হানিমান নির্দেশ করেন যে, মূল ঔষধ কোনরূপ ব্যবহার না করিয়া তাহাকে স্পীরিট বা এল-কোহলের যোগে শক্তীকৃত করিয়া তবে ব্যবহার করিবে। হোমিওপ্যাথীর এই শক্তিতত্ত্ব বিষয় লইয়া অনেকে কতপ্রকার উপহাস করিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে "তারকেশ্বরে এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইয়া এক অঞ্জলি জল পান করিলেই রোগ সারিয়া যাইবে"। এই সমুদয় লোকে কি একবারও সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব কতদূর হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখেন না? এই যে ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রভৃতির দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা কয়জন চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সেইরূপ এই হোমিওপ্যাথীর সূক্ষ্মশক্তি একমাত্রায় কত কঠিন রোগ আরোগ্যলাভ করিতেছে তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না বা পারেন না।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে মূল ঔষধের মাত্রা অতি অল্প থাকায় সহজে কোন ক্ষতি করিয়া থাকে না। অবশ্য আমি এমন কথা বলি না (যেমন সাধারণ জন-মণ্ডলী বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ এক বাক্স সেবন করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না) যে এই ঔষধ একেবারে অনিষ্টকর নহে। ইহার অপব্যবহারেও শরীরের অনেক অনিষ্ট আসিয়া পড়ে, সহজে কোন ঔষধ ব্যবহার [illegible]

লাভ হয় না; তখন আবার ঐ ঔষধের প্রতিষেধক অথবা ব্যবহার করিয়া পরে পুনরায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তবে ফললাভ হইবে। ইহাও সামান্য ক্ষতিকারক নহে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে এই নির্দ্দোষক ঔষধ সেবনেও মুহূর্ত্ত-মধ্যে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে ইহা একেবারে ক্ষতিকারক নহে?

সাধারণে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকার জন্যই আজকাল সকলেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামে অনায়াসে পরিচিত করিতে সাহসী হয়েন। কিন্তু বাস্তবিকই কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এত সহজ? তাহা নহে। যিনি আমাদিগের ভৈষজ্য-তত্ত্বের কোন দুই একটি ঔষধ পাঠ করিয়াছেন তিনিই স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, প্রায় সমুদয় লক্ষণই একপ্রকার গুণবিশিষ্ট। আরও এক মহা বিপদ এই যে এলোপ্যাথিক যেমন প্রত্যেক লক্ষণের জন্য একটি করিয়া ঔষধ দিয়া ৪।৫।৬।৭টি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, ইহাতে কেবলমাত্র একটি ঔষধের মধ্যেই রোগীর সমুদয় লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকা চাই। রোগীর সমুদয় লক্ষণ অর্থাৎ Totality of symptoms যে ঔষধে পাইবে তাহাই হোমিওপ্যাথি মতে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ জানিবে। এলোপ্যাথি মতে কতকগুলি ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করা সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলিতে চাহি। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে কোন কথা এখানে না বলিয়া আমরা কেবলমাত্র উহার ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যে যে লক্ষণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটি ঔষধ মনোনয়ন করা হইল তাহাদের মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন নূতন ফলোদয় হয় কি না তাহা কে বলিতে পারে। যদি স্বীকার করা যায় যে নূতন ফলোদয় হয় তাহা হইলে আমাদের হোমিওপ্যাথি যে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এক্ষণে বলা যায় কারণ ৪।৭টি মিশ্রিত করিয়া যে ফললাভ হইবে তাহা হোমিওপ্যাথির একটী মাত্র ঔষধেই দর্শাইবে।

হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব আমরা আর একটি বিষয়ে দেখিতে পাই যথা, ইহা বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী গর্ভিণী প্রভৃতি সকলকেই নিঃসন্দেহে সেবন করাইতে পারা যায়। অবশ্য গর্ভাবস্থায় ইহা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন কারণ জরায়ুর সঙ্কোচনকারক ঔষধ ব্যবহৃত হইলে গর্ভস্রাব সম্বন্ধে আশঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে। কতকগুলি পীড়ায় যেমন, ওলাউঠা, স্ত্রীরোগনিচয়, শিশুরোগাবলী ইত্যাদি—ইহা একপ্রকার Specific system of medicine বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবশ্য এই বিশ্বাসের কারণও প্রচুর আছে। নূতন ও পুরাতন প্রকারের চিকিৎসার তুলনায় দেখা গিয়াছে যে উক্ত রোগাদিতে পুরাতন অপেক্ষা নূতন প্রকারে শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিতে জ্বরাদির চিকিৎসা ভাল হয় না। ইঁহাদের মনে করা উচিত যে চিকিৎসায় ওলাউঠা বসন্ত, প্লেগের মত রোগী আরোগ্য হইতেছে তাহাদের সামান্য জ্বর সন্নিপাত, অবিরাম বা ম্যালেরিয়া সংযুক্ত—আরোগ্য হয় না ইহা কি প্রকারের অসম্ভব কথা। ফল কথা এই যে এলোপ্যাথি মতে কুইনাইনাদি প্রয়োগে কত সময় জ্বর চাপা দেওয়া হইয়া থাকে ইহা দ্বারা তাহা হয় না। আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা হইতেছে এই যে, জ্বর

চাপা দেওয়া ভাল না তাহা একেবারে radically আরাম করা ভাল। নিউমোনিয়া টাইফয়েড, টাইফস্ প্রভৃতি প্রকারের কঠিন কঠিন জ্বর আমাদের এই সামান্য হোমিওপ্যাথি প্রয়োগে কেমন সুন্দর ও সহজে আরোগ্য হইয়াছে যিনি তাহা সচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস হওয়া কঠিন। রোগীর যেরূপ নিস্তেজাবস্থায় এলোপ্যাথিরা ঘণ্টার ঘণ্টায় ব্রাণ্ডি দিয়া ষ্টিমুলেণ্ট করাইয়া থাকেন সেই স্থলেই আমরা সামান্য ২।১ মাত্রা প্রয়োগে কত আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকি তাহা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যিনি দেখিয়াছেন তিনিই আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। সময়ে সময়ে আমরাও ইহার শক্তি পরিচয় পাইয়া মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি এবং ইহার আবিষ্কার কর্ত্তার নামে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকি।

গৃহস্থের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নানা কারণে অধিক প্রয়োজনীয় বটে (১) ইহা সেবনে কোন প্রকার গোলযোগ নাই, সকলেই চাহিয়া খাইয়া থাকে, (২) ঔষধ সেবনের জন্য নানাপ্রকার আনুসঙ্গীক দ্রব্যাদি যথা মসলা, ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না। (৩) অল্প খরচে চিকিৎসা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, (৪) গৃহে একটি হোমিওপ্যাথি বাক্স এবং নিজে প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ ও ২১খানি পুস্তক থাকিলেই সহজে নিজেই সামান্য রোগাদি চিকিৎসা করিতে পারেন। (৫) প্রতিবাসী দরিদ্রগণকেও বিনা খরচে ইচ্ছা করিলে চিকিৎসা করিয়া সুনাম অর্জ্জন ও পরকালের কার্য্য সাধন করিতে পারেন।

ডাক্তার মৈত্র
১৮।১ হরপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

(আমরা প্রতিমাসে সাধারণের সুবিধার জন্য সহজ সহজ রোগ ও তাহার চিকিৎসা ইহাতে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহার এসম্বন্ধে কিছু জানিবার প্রয়োজন হইবে তাহা পত্রদ্বারা আমাদিগকে জানাইলেই তাহার ব্যবস্থা যথাসম্ভব করিয়া দিব।—সম্পাদক)

:0:

লেখনী অবতার।

(১)

বেন্টিংক্ ষ্ট্রীটে নিবাসক্ত উকিলপাড়ায় "মধু মিশ্রচ, শঠশিরোমণি ও প্রবঞ্চনাবিশারদ কোম্পানি" নামক এটর্নী আফিসে শ্রীমান্ লেখনীঅবতার কালী একজন বিশ্বস্ত কেরাণী। পাঁচ বৎসর এটর্নী আফিসের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে একজন কেরাণী অনায়াসে উপযুক্ত এটর্নী হইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কত পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি অবতারবাবু এটর্নী হইতে পারেন নাই। বহু কষ্টে বি, এ, পাশ করিয়া এটর্নী হইবার আশায় কাজ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে তিনি যে কেরাণী সেই কেরাণীই রহিলেন।

অবতার বাবুর দেহায়তন খর্ব্ব। শরীরের গঠন প্রণালীতে বিলক্ষণ লালিত্যের অভাব দৃষ্ট হয়। তিনি স্বভাবতঃই নিরীহ এবং শান্ত প্রকৃতির লোক। তাঁহার শিক্ষানবিশ জীবনে কেবল মাত্র দুইটি ঘটনায় ব্যতীত আর কোন প্রকারে চাঞ্চল্য বা অসহিষ্ণুতার দৃষ্ট হয় নাই। আবশ্যক আর কিছুই না তিনি একখানি দশটাকার নোট অসময়ে উপকারে আসিবে বলিয়া কোটা জিন কোটের বুকপকেটে অতি সাবধানে রাখিতেন

করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুষ্ট রজক ইস্ত্রিকালে কোনরূপে টের পাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল। অবতার বাবু যখন জানিতে পারিলেন, রজকের নিকট গিয়া তাহাকে ব্যবস্থা ও ধর্ম্মের দিব্য দিয়া টাকাটী ফেরত দিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। দুষ্ট রজক ধর্ম্মের দোহাই না মানিয়া অম্লানবদনে অস্বীকার করিল। তদবধি তিনি রজককুলের উপর মহাকুপিত হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দিতেন না, স্বহস্তেই পরিষ্কার করিয়া লইতেন। আর একবার তিনি আফিসের আবশ্যক কয়েকখানি কাগজ পত্র অন্যমনস্কতা হেতু জল গরম করিবার সময় চুলীমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শেষে যার পর নাই বিরক্ত হইয়া জন্মের মত গরম জল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দুইটী ঘটনার পর অবতার মহাশয় যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে যথাক্রমে সুখের পর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন সে পক্ষে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

(২)

প্রকৃত পক্ষে অবতার বাবু সুখী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৪০।৫০ টাকা হইয়াছিল। একমাত্র প্রভুর অটল বিশ্বাসই তাঁহার প্রভুত্ব ও সুখের মূল। তদ্ব্যতীত তাঁহার সরল স্বভাব ও সদ্ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। যাহা হউক, এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের ভিতরেও সময়ে সময়ে তিনি কেমন একটা কি অসুখ বোধ করিতেন। যদি কেহ কখন অবতার বাবুকে কোন গানের মজলিসে দেখিয়া থাকেন এবং যখনই গায়ক কোন প্রেমসঙ্গীত গান করেন, সেই সময়ে একবার তাঁহার মুখের পানে বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন যেন তাঁহার নীরস চক্ষু সরস হইয়া ক্রমে অশ্রুপাত করিবার উপক্রম করিতেছে, আর তিনি যেন অতি কষ্টে সেই অশ্রুসংবরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই প্রচ্ছন্ন মনোভাবের ক্রমে এই ভাবে বিকাশ হইত,—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, তৎসহ দেহের ভঙ্গি অলস ও উদাস, ওষ্ঠাধরযুক্ত গুড়গুড়ী নলের অকালে অধঃপতন, শেষে "ন্যাবীকে" আনো, "শ্যাম প্রিয়া" বোলাও, গোলাপ লেয়াও ইত্যাদি শব্দে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতেন।

ফল কথা অবতার বাবু একটী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সঙ্গিনীর একান্ত অভাব বোধ করিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যের বশীভূত হইবার পূর্ব্বেই তিনি কেবল মাত্র বংশরক্ষার্থে বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দাম্পত্যজীবনের প্রণয়রসাস্বাদে একান্ত লোলুপ হইয়া অবিবাহিত জীবনের স্বাধীনতা রত্নটী বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

(৩)

পাত্রীও জুটিল। লেখনী অবতার মহাশয়ের ভাগ্য ক্রমেই কিঞ্চিৎ বয়স্কা পাত্রীর সহিতই শুভ বিবাহের পর, ফুলশয্যার রজনী অতীব কমনানন্দ কৌতুকিনী হইয়াছিল। আমরা জানি, উক্ত রজনী যোগে অত্যাধিক আনন্দবশতঃ তিনি একাদিক্রমে উপর্য্যুপরি ছয় বার তামাকুর অগ্নি সংস্কার করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে এরূপও ঘটিয়াছিল যে, তিনি আশে পাশে রহস্যের গন্ধ আঘ্রাণমাত্রে অতি উচ্চরবে হাস্য করিয়া নিদ্রাতুর বালকবালিকাগণের যথেষ্ট ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—জীবনে আজ কি সুখের দিন! কেমন চন্দ্রিকাময়ী রজনী! পার্শ্বদেশে কেমন লাবণ্যললিতাঙ্গী ললনা! মরি সুমুখীর সৌন্দর্য্য কি মনোহর! কি সুন্দর অলস আঁখিপাত! না, না, সুমুখী নহে, বুঝি কপট

মিত্রায় মিজিতা ;—এইটাই সম্ভব। কারণ নিশ্চয়ই প্রণয়িনী আমার কথোপকথন ও রসিকতা শ্রবণে মনে মনে কতই আনন্দ অনুভব করিতেছে।

বহু বিলম্বে ঘটিলেও সেই দিন যে তাঁহার সুখের দিন আসিয়া পঁহুছিল তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন। পাছে বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রীতিভোজ দিতে হয় এই ভয়ে বিবাহটা অতি গোপনেই সমাধা করিয়াছিলেন। এমন কি এই বিবাহ ব্যাপার তাঁহার অফিস মহাশয়দেরও অজ্ঞাত ছিল।

(৪)

ইহার পর কিছুকাল গত হইলে তিনি পত্নী সহ মাতৃ সন্দর্শনে যাইবার জন্য মনিবের নিকট তিন দিনের ছুটী লইলেন। এতদিন যে বিলাস লালসা ভয়ে ভয়ে তাঁহার ছায়া মাড়ায় নাই, আজ তিনি পত্নীর বিশেষ অনুরোধে সেই বিলাসের শিকারভূত হইলেন। আজ তাঁহার পায়ে ফুল-কাটা লাল রংয়ের মোজা, তদুপরি বার্ণীস করা পম্প জুতা, পরিধানে ফরাসডাঙ্গার মিহি চওড়া কালাপাড় ধুতি। গায় রামধনু রঙের রেশমী পাঞ্জাবী আছেন্। যজ্ঞোপবীত আকারে বাঁধা সুন্দর কুঞ্চিত চাদর। অঙ্গুলীতে হীরক অঙ্গুরীয়ক হস্তে পিচের ছড়ি মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম না পাইয়া অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে। পকেটে লতা পাতা পাখী আঁকা রুমালে এসেন্সের মিঠা গন্ধ মন্দ পবনে ভুর ভুর করিয়া উড়িয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। মুখে নানাপ্রকার সুগন্ধি মশলা মিশ্রিত মিঠা পান তোতার তীক্ষ্ণ দন্তে চর্ব্বিত হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াও রসদানে বিরত ছিল না এবং সুরার দুর্গন্ধনাশে বিশেষ চেষ্টিত ছিল। ওষ্ঠাধর সংলগ্ন গোলাপী বিড়ির কুণ্ডলী-কৃত ধূম যেন অবতার বাবুর সোনা ধূসর বর্ণের বিড়ালীর মত তাঁহারই মুখের কাছে আনন্দে লাঙ্গুল নাড়িয়া ঘুরিতেছিল। তাঁহার মাথার ঊর্দ্ধ-মুখ কণ্টকোপম কেশগুলি মনোহর ও সুগন্ধময় সুবাসিত তৈলের সহবাসে যেন কিছু নত ভাব ধারণ করিয়া মস্তকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তেড়ীরূপ রাজপথটী দেখাইয়া দিতেছিল।

লেখনী অবতার প্রণয়িনী ও তাঁহার অত্যাবশ্যক পেটিকা ও পোঁটলীগুলির সহিত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছকড়গাড়ী ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে চলিলেন। যাইতে যাইতে তিনি প্রিয়তমাকে কহিলেন, "প্রিয়ে, দেখ, আজ আমাদের কি সুখের দিন।" প্রিয়তমা স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া অধরকোণে একটু মৃদু হাসির রেখামাত্র ফুটাইলেন। তাহাতে এরূপ বোধ হইল যেন দিনহীন ভিখারীকে স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে অবতার মহাশয়ের কানে কানে কে যেন কহিল, "ভাই হে, আনন্দ চিরস্থায়ী নহে।" কি জানি ক্ষণেকের তরে তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িয়া তখনই আনন্দস্রোতে মিলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী ফকিরচন্দ্র দত্ত।

শোক-দুঃখে লোক কাঁদে কেন?

শোক দুঃখে লোক কাঁদে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে লোক সুখের জন্য কাঁদে। দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখ হউক এ চিন্তা কার না আছে?

এই মরণধর্ম্মশীল জগতে সকল জীবই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত। সুখের সুমধুর আস্বাদ অনুভব করিবার জন্য আপামর সাধারণ সমুদায় প্রাণী লালায়িত। সুখের ব্যাঘাত ঘটুক, দুঃখ আসুক, এ প্রার্থনা কেহই করে না, কেহই ভাল বাসে না। হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন—প্রাণাধিক সন্তান পিতা মাতার বর্ত্তমানে, অবনীর সমুদায় লীলা বিসর্জ্জন করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গেলে, তদীয় জনক জননী শোক-ভারাক্রান্ত হইয়া রোদন করেন। তাঁহারা শোক-তাপে তাপিত হইয়া রোদন করেন কেন? দুঃখের দারুণ নিষ্পেষণে পীড়িত হইতে তাঁহারা অভিলাষী নহেন। শোকে কাঁদিলে দুঃখের হ্রাস হয়, অর্থাৎ সুখের সঞ্চার হয়। জীবের চিত্তে সুখের অধিকার না হইলে, কখনই শোক লঘু হইতে পারে না। লঘু হইতে চায় না। বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন স্থান এক কালে শূন্য থাকিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের নিয়মও সেইরূপ, মন সর্ব্বদা চিন্তা-বিরহিত নহে। যখন মনে শোকের অধিকার, তখন সুখ থাকে না, আবার যে সময় সুখের অধিকার, তৎকালে শোক স্থান পায় না; কিন্তু কোনটির কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষিত হইলেই, অপরটী অমনি জীবের অজ্ঞাতসারে সেই স্থল অধিকার করিয়া বসে।

যে দম্পতি পরস্পরে পবিত্র প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতেছে, পৃথিবীর সমুদায় দ্রব্য, সকল কার্য্য, সমস্ত ব্যাপারি আনন্দদায়ক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, শোকের বা কষ্টের ছায়া মাত্রও যাহাদিগের হৃদয়-ফলকে পতিত হয় নাই। সমুদায় বাসনা, সমস্ত প্রবৃত্তি মনোমত চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে, পরমেশে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া জগতের সার সুখ ভোগ করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, দৈব দুর্ঘটনাক্রমে তাঁহাদের অন্যতরের বিচ্ছেদ হইলে বা কালের করাল কবলে আত্ম বিসর্জ্জন করিলে, যে বর্ত্তমান থাকে, তাহার পক্ষে এই ভবধাম অন্ধকারময়। কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। জগতের যে সমুদায় বস্তু পূর্ব্বে তাহাদের প্রীতি উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল, এক্ষণে সে সমুদায় অসুখের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বিমল পবিত্র বদনের সে স্নিগ্ধ হাসির ছটা লুকাইয়া যায়। হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া নিরন্তর ভীষণ আঘাতে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। সুরভি কুসুমের আঘ্রাণ মলয় মারুতের ব্যজন কিছুই তাহার নিকট প্রীতিদায়ক হয় না। তখন তাহার বিষণ্ণ হৃদয় আত্মীয় জনের—বন্ধু জনের রোদনের সহিত কাঁদিতে পাইলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে শোকাপনয়ন করিতে সমর্থ হয়—সুখের আভা দেখিতে পায়; শোকও ক্রমশঃ অন্তরিত হইতে থাকে। মর্ম্ম বেদনা ব্যথার ব্যথীকে বলিতে পারিলেই শোকের অনেক হ্রাস হয়, এবং তাহাতেই যন্ত্রণা ভার ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে। সুতরাং সুখ উপস্থিত হয়। লোক শোকে কাঁদে সুখের জন্য। যাতনা লাঘব করাই সুখের মোক্ষ কার্য্য।

লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত শোক-প্রভাবে চক্ষের জল না ফেলে, ততক্ষণ তাহার শোকের লাঘব হয় না। যেই নয়নাম্বু ধরাতল স্পর্শ করে, অমনি শোকের কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়। শোকের সেই হ্রাসের অবকাশ স্থানে সুখ স্বীয় অধিকার স্থাপন করে অর্থাৎ তখনই সুখের সঞ্চার হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন স্থান শূন্য থাকিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সেইরূপ কোন মানসিক ভাবের অভাবে, অন্য একটী ভাব সেই স্থান অধিকার করিবেই করিবে।

কোন বস্তু নষ্ট হইয়া গেলে, কোন প্রিয় বস্তুর

অভাব ঘটিলে কষ্ট হয়—মনোস্তাপ হয়, সেই কষ্ট ও মনোস্তাপ কিসে নষ্ট হয়? দুঃখের ভাবনা ভাবিলে, সুখের উদয় হয়; এই সুখের নামই প্রবোধ। প্রবোধই মনুষ্যজীবনকে সুখের অধিকার দানে সক্ষম শোক-যাতনার বা দারিদ্র্য কষ্টের শত অপনয়ন হইতে থাকে, মন ততই প্রবোধ মানে। মন প্রবোধ মানিলেই সুখের অধিকার উপস্থিত হয়। তাই বলি লোক সুখ লালসায় শোকাগমে রোদন করে।

শ্রী—

কদম্ব।

(১)

পবিত্র কদম্ব কিবা বিটপী সুন্দর।
শিরপরে পত্রগুচ্ছ শোভে থরেথর।
নবহরিতিমাময়, চন্দ্রাতপ মনে হয়,
তার মাঝে পুষ্পরাজি কিবা মনোহর।
বিশ্বশিল্পী এমনি বিচিত্র কারিকর।

(২)

ধন্যরে জনম তব ওহে তরুবর,
তোমার সৌভাগ্য হেরি প্রফুল্ল অন্তর।
এ বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার করুণাদৃষ্টি,
বড়ই দেখিরে তরু তোমার উপরে।
তুমিই সৌভাগ্যশালী অবনী ভিতরে।

(৩)

তরুরাজ, বল বল সুধাই তোমায়।
শ্যাম কি আসেন আর তোমার তলায়?
সঙ্গেলয়ে গাভীধন, রাখাল বালকগণ,
প্রমোদে মাতিয়ে সবে করেগো নর্ত্তন।
আর কি আসেন হেথা সেই শ্যামধন?

(৪)

বন ফুল মালা গলে করিয়া ধারণ।
আর কি আসেন তলে রাধিকারমণ?
পরিয়া সে পীতধড়া, বাঁধিয়া মোহনচূড়া,
রাখাল বালক সনে করেন নর্ত্তন?
কদম্বরে বল ধরি দুইটি চরণ।

(৫)

কদম্বরে বল ধরি দুইটী চরণ।
আর কি বাজান বাঁশী সে বংশীবদন?
শুনি যে বাঁশীর স্বর, গোপকুল নারী সব,
প্রেমস্রোতে ভাসমান হ'ত নিরন্তর।
আর কি শুনিতে পাও সে বাঁশীর স্বর।

(৬)

আর কি শুনিতে পাও সে বাঁশীর স্বর।
যে মধুর রবে হ'ত মোহিত অন্তর।
গোপকুল নারী যত, ভক্তি ভরে হয়ে নত,
পতিরূপে ভগবানে আরাধিত সবে।
প্রেমডোরে বাঁধিতরে সেই ভবধবে।

(৭)

ভক্তি নাই, প্রেম নাই, চিত্ত মরুভূমি।
সেখানে কি শ্যামধনে দেখাবে কি তুমি।
কলুষকালিমাময়, মম প্রাণ সমুদয়,
বিন্দুমাত্র আছে মোর চক্ষে অশ্রুজল।
পাব কিগো শ্যাম ধনে কদম্বরে বল।

(৮)

বিষয় বাসনা চিত্তে হয়েছে প্রবল।
ভক্তি, প্রেম ভালবাসা তক সে সকল।
হৃদির প্রধান জ্ঞান, পূর্ণদম্ভ অভিমান,
কিরূপে হইবে বল এ পাপীর গতি।
কদম্বরে বল মোরে করি এ মিনতি।

আর্য্যভূমির সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। /০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে, অথবা স্থগিত না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্র পাঠাইতে থাকিব।

৩। মূল্য পাঠাইবারকালে অথবা অপর কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নিজের নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এই কথাটী লিখিবেন। পত্র প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। হস্তাক্ষর অপরিষ্কার হইলে, ছাপার ভুল অপরিহার্য্য। প্রবন্ধ লেখক ও সংবাদদাতা মাত্রেই আর্য্যভূমি একখানি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রবন্ধ ও সংবাদগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। সংবাদদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকগণকেও বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইঁহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনা মত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।	শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
৮৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।

---

১৭ নং কেনাল ষ্ট্রীট "দিব্য প্রেস" হইতে শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।] [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

লেখকগণের নাম।

শ্রীরাধাকমল মজুমদার এম্, এ, শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্ এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী সহ সম্পাদক) শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, পি দত্ত F C. S, PH; B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র ও সম্পাদক।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১।৷৹ টাকা) (প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য ৶৹ আনা)

সার্সাপারিলা

আধুনিক সকলপ্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয় !

প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ।

জৈন বেনোভোলেণ্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক নিয়োজিত ভারতের স্বাধীন নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পৃষ্ঠপোষিত কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রীর আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় ।

নলিনী বিনোদ তৈল ।

এই তৈল কেশহীনতা (টাক) কেশের অকালপক্কতা, কেশদাদ, রুকি, খুস্কি প্রভৃতি কেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগের মহৌষধ ও অনিদ্রা নাশক ।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১।৵ ।

কামিনী বিনোদ ঘৃত ।

ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে অমৃতকল্প রসায়ন । জরায়ু সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ রোগনাশক, ও বন্ধ্যাত্বদোষ নিবারক ।

একমাত্র ব্যবহারোপযোগী ঘৃতের মূল্য ৪৲ টাকা । প্যাকিং ৵০ দুই আনা ; ডাকমাশুল ৬০ বার আনা ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ৫৲ টাকা লাগিবে । নং ১১।৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিঃ

কলিকাতা, আম্বালা, মালদহ প্রভৃতি ১৯০৮।৭ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে রৌপ্যপদক ও উচ্চ প্রশংসাপত্র ও সর্ব্বোত্তম প্রশংসিত—

দত্ত কোম্পানীর

দাঁত—(জাম ও মুখ সমেত) মূল্য ৵১৫

পকেট পেনহোল্ডার— ৵০

পারপেচুয়াল রিফ পেষ্ট (জাম ও মুখসমেত) ।১০

পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত । প্রত্যেক মৌসনরী দোকানে ও ৪৮ নং ক্যানিং লেন মিশন রো, কলিকাতা প্রাপ্তব্য । অর্ডার পাইলে সত্বরে ভিঃ পিতে পাঠাইয়া থাকি ।

সেটিন্ চিকেন, লোহচাদর প্রভৃতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে কিনিবার আবশ্যক হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার

জি, সি, নন্দী এণ্ড কোম্পানীর

হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট, চাউল সওদাগর এবং সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের অর্ডার সাপ্লায়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন ।

ঠিকানা,—১৩।৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

আর্য্যভূমি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

" অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥"

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল

আহ্বানবাণী।

এই বিশ্ববিধানে কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে। এবং চিরনিদ্রা ব্যতীত মানবের সকল নিদ্রারই এখানে একটা শেষ আছে। কোন একটী জাতি হয়তো বহুকাল পর্য্যন্ত অন্ধকারের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত মনে মগ্ন হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদ অঞ্চলে লইয়া তাহার গৃহ-দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিয়া ফিরিয়া গেল তাহার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিল না; বিধাতার অযা-চিত সেই আশীর্ব্বাদ জগতের কত জাতিকে, কত দেশকে নব জীবন দান করিয়া ধন্য করিল, কিন্তু অভাগা জাতি তাহার আলস্যে ও অবহেলায় উঠিল না, জাগিল না,—তাহার গৃহদ্বারে বিধাতার আহ্বান বাণী সে শুনিল না। কিন্তু কি জানি কি শুভক্ষণে কি শুভলগ্নে এই বিশ্বের মর্ম্ম মধ্যে বিধাতার যে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই প্রতিধ্বনি সহসা অন্তর মধ্যে উপলব্ধি করিল। এতকাল পরে আজ পুনরায় তাহার সর্ব্বশরীরে ও মনে জীবন ও জাগরণের একটা বহুমুখী চেষ্টা ও চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেখা গেল; সহস্র স্বর্ণ কিরণ আজ জাতীয় জীবনের নব প্রভাতকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে দেখিয়া সকলে সুখী হইল। এই জাতীয় জীবনের শুভ প্রভাতে দেখা গেল জাতিটী সংসারবিমুখ, নির্জ্জন-বাস ও শুষ্কতপস্যা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্য জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। মাতৃভূমির শিক্ষিত, ধীশক্তি সম্পন্ন, জন হিতোৎসাহী, স্বার্থত্যাগী সন্তানমণ্ডলী চতুর্দ্দিক হইতে সমবেত হইতেছেন। তাঁহারা সকলেই জীবনের উচ্চতম ও পবিত্রতম উদ্দেশ্যে

উত্তেজিত [illegible] প্রীতি কহিবা সাধনে বদ্ধপরিকর, এবং স্বদেশের দুর্দশা মোচনে দৃঢ়চিত্ত। জগতের [illegible] অলীক আনন্দ ও অহঙ্কার এবং সীমাবদ্ধ জীবনের সকল উদ্দেশ্যের অতীত এক উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের চির আকাঙ্ক্ষায় আকুল ও আবিষ্ট। তাঁহারা জানিলেন, যে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাঁহারা এক্ষণে এক নূতন জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং এক্ষণে সকলকে এই নূতন অবস্থার উপযোগী পথাবলম্বন করিতে হইবে। ইহাও তাঁহারা জানিলেন, যে তাঁহাদের সম্মুখে এক্ষণে যে সকল সমস্যা উপস্থিত কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও দর্শনের অনুশীলনে, তাহার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব এবং নিজ নূতন অবস্থার মধ্যে যদি তাহারা উন্নতি লাভে ইচ্ছুক হন তাঁহাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই নবজীবনের আভাস ভারতের সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে। জানি না ভগবানের "আহ্বান বাণী" মোহ নিদ্রায় অভিভূত আর্য্য সন্তানগণকে জাগরিত করিয়া জাতীয় নবজীবন প্রদান করিয়াছে কি না। এ সমস্যার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

বিজনে মল্লিকা।

(১)

কে তুমি রে সাদা ফুল বিজন গহনে,
আপনার মনে দোল প্রফুল্ল আননে,
মলহীন পরিমলে, বিতরি বনজ দলে,
কানন সৌরভ পূর্ণ কর সযতনে ;
কেবা করে সমাদর, গন্ধে কর ভর ভর,
বনে ফুটে বনফুল বনে [illegible]জন,
যতনের সনে কেহ না ক[illegible]ন।

(২)

মলয় মারুত কিবা সুগন্ধবাহে,
মাখিয়া পরাগ অঙ্গে মন্দ ধীর বহে,
স্মরণে না যদি কটে, জানাতে অকপটে,
তোমার মহিমা সত অশান্ত হৃদয়ে,
ভক্তিভরে সমাদরে, দোলাইতে চরাচরে,
আনন্দে হিল্লোল চিত্ত বকুল বসান,
গুণী বিনা কে জানিবে গুণীর সম্মান।

(৩)

গুঞ্জরি ভ্রমর গীতি মধুর নিক্বণে,
অপ্সরি অমিয়মাখা সঙ্গত শিঞ্জনে,
তব গুণ গান গত, করিতেছে অবিরত,
শ্রবণ বিবরে সদা সুধা বরিষণে ;
সদানন্দ সাঙ্কুচিত, হয়ে কিবা আনন্দিত,
গুণীগণ গুণগ্রাম করিতে কীর্ত্তন,
তাহাকি করিতে পারি সদা স্মরণ ?

(৪)

কুসুমে সুষমারাশি হেরিয়া নয়নে,
আপাত সৌরভে মাতি কেন আয় বনে,
কেমনে না এ সদন, নির্জ্জন গহন বন,
সফল হইত তব প্রীতি সম্ভাষণে ;
নির্জ্জন বিপিনবাসী, আমি এই তপস্বী,
কুসুমকাননে তুমি করহে গমন,
তুমি যে রতন তব সেই নিকেতন।

(৫)

কহিল সরল ফুল বিনয় বচনে,
বরষিল সুধা যেন শ্রবণে শ্রবণে,
বাসনা মনের সাধ, হিংসাপূর্ণ যে সমাজ,
সরলতা উদারতা শূন্য যায় মনে,
মহেশের কীর্ত্তিরাশি, সুধা মাখা প্রাতি হাসি,

এ বিজন বিপিনেতে করিব প্রচার,
যে শক্তি পেয়েছি তার এই সদাচার।

লেখনী অবতার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

যথা সময়ে রণবাদ্যের সহিত নাচিতে নাচিতে বাতব্যাধিদুষ্ট পক্ষিরাজধ্বয় কোনক্রমে আরোহী সমেত গাড়ীখানিকে হাওড়া ষ্টেসনে পহুঁছাইয়া দিল। ভাড়া চুকাইয়া তাঁহারা জিনিসপত্র সহ ষ্টেসনে নামিলেন।

ট্রেণও ছাড়িতে বড় বিলম্ব ছিল না। পাহাড়ী অজগর সর্পের মত ইঞ্জিনমুখ দিয়া অতি উচ্চ ফোঁস ফোঁস শব্দ বাহির হইতেছিল। অবতার বাবু মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া পত্নীকে অগ্রে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। অতি কষ্টে, অতি দ্রুততার সহিত জিনিসপত্রগুলি একে একে প্রায় সমস্তই গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে তাঁহার 'উত্তমঅঙ্গাঙ্গিনী' ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ঐ যা, কি ক'লে, টিনের ভাঙ্গা বাক্সটা কি হ'ল?"

স্বামী। তাতে আর এমন কি আছে?—যাক্‌গে।—না হ'লে দেরী হ'য়ে যাবে।

স্ত্রী। বল কি গো! তাতে আমার আর্সি চিরুণী, এ সব আছে। দেখ, দেখ, যদি পাওয়া যায়। সে ঐ গাড়ীতেই ফেলে এসেছি।

সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া অবতার বাবু ভাঙ্গা বাক্সের সন্ধানে চলিলেন। তিনি ভগ্ন বাক্সটি পাইলেন বটে, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইলেন। এইবার অবতার বাবুর ভাগ্যচক্র আবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে দুঃখের প্রান্ত দেখাইয়া দিল। গাড়ী ছাড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অবতার বাবুর প্রিয়তমাকে চুরি করিয়া দুষ্ট লৌহশকট ছুটিয়া পলাইল। তখন হতবুদ্ধি ও আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ও ব্যাকুল কণ্ঠে "বাঁধ, বাঁধ" শব্দে প্লাট্‌ফরমের উপর দিয়া অবতার বাবু ছুটিলেন। রেলের লোকেরা বহু কষ্টে তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?" অবতার বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ থাকিয়া কহিলেন, "সে একলা কোথায় চ'লে গেল!"

সকলে কহিল, "কে মহাশয়?"

অবতার। আর কে? আমার মাথা আর মুণ্ডু!

সকলে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া—কোন পরামর্শ না করিয়া—বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত প্লাট্‌ফরমের উপর পদচারণা করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী মেলগাড়ীতে পত্নীসন্ধানে যাইতে মনস্থ করিলেন।

ঘোর কুহকিনী আশা ব্যঙ্গচ্ছলে পত্নীহারা উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের চিত্তে একটী লাল রঙের আলো জ্বালিয়া বিষাদ কালিমা ঢাকিয়া দিল। গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে পহুঁছিল। অঞ্জনানন্দনের অনুকরণে তিনি এক লম্ফেই ট্রেণে আরোহণ করিলেন। গাড়ী ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল। মুহূর্ত্ত তাঁহার পক্ষে শতাব্দী বোধ হইতেছিল। শেষে গাড়ী ছাড়িল। এই শ্রীরামপুর, এই চন্দননগর, শেষে মেল মহাশয় হুগলীতে 'বাপ্ বাপ্' শব্দে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিল। অবতার বাবুও অবিলম্বে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্রামাগার কয়টীতে হারাণ সিকি বা দুয়ানির মত তন্ন তন্ন করিয়া পত্নীর অনুসন্ধান করিলেন। হায়, সকলই নিষ্ফল হইল!

এমন কি ষ্টেসনের প্রত্যেক কুলিকে পর্য্যন্ত কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া বিষন্ন বদনে এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে এই ভাব উদয় হইল, "তবে কি প্রিয়তমা আমার অদর্শনে আমারই অনুসন্ধানে পুনর্ব্বার কলিকাতা রওনা হইয়াছে? না জানি, এতক্ষণ আমাকে হাওড়ায় দেখিতে না পাইয়া হয়ত অজস্র অশ্রুপাত করিতেছে।"

(৬)

চিন্তা অচিরে তাঁহাকে কার্য্যে প্রণোদিত করিল। তিনি প্রত্যেক ষ্টেসনে সংবাদ লইবার জন্য একখানি যাত্রীট্রেণে কলিকাতাভিমুখে চলিলেন। গাড়ী যখন চন্দননগরে থামিল, সংবাদ লইবার জন্য তিনিও অবতীর্ণ হইলেন। সেখানে সংবাদ পাইলেন, অবিকল তাঁহার পত্নীর মত একটী কামিনী অসুস্থ হওয়াতে গাড়ী করিয়া তথা হইতে চুঁচুড়ায় গিয়াছে। লেখনী অবতার আর কাল বিলম্ব না করিয়া চুঁচুড়ার দিকে ছুটিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। আকাশে মেঘমালা দুলিয়া দুলিয়া কালরাত্রির সূচনা করিতেছিল। তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবলই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকালয় ছাড়িয়া যখন মাঠে উপস্থিত হইলেন, তখন দুর্দ্দৈব, যে দুর্দ্দৈবের সহযাত্রী, যেন এ কথারই সত্যতার প্রমাণের জন্য মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত রূপে দেখা দিল। কিন্তু প্রেমিক কি বজ্রপাতে ভয় পায়? তবে তাহাকে লোকে প্রেমিক বলিবে কেন? অন্ততঃ এই জন্যই বোধ হয় অবতার মহাশয় তাঁহার বড় সাধের বেশভূষা ভিজাইয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে কোথাও আশ্রয় না লইয়া চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে লোকের মুখে জ্ঞাত হইলেন, যে পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে যথার্থই একটী স্ত্রীলোক পীড়িত অবস্থায় আসিয়াছে। তাঁহার তখন বিশ্বাস গাঢ় হইল। নিশ্চয় উহাঁর এ রমণী আর কেহই নহে তাঁহারই হৃদয়ের হৃদয়-মণি। দ্বারে করাঘাত করিলে সমাগত দাসীর মুখেও ঐ কথা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পরে দাসী কহিল, 'আপনার কি আবশ্যক?"

তিনি কহিলেন, "'কি আবশ্যক'?—সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারই জন্য এই বড় জল মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিতেছি।"

দাসী কহিল "তবে আসুন, আমরা আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" দাসী তাঁহাকে রুগ্নার শয্যা গৃহ দেখাইয়া দিল।

গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া তিনি শয্যাবরণ বস্ত্র মধ্য হইতে স্তিমিত দীপালোকে রুগ্না রমণীর মুখমণ্ডল অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। দর্শন মাত্রে ঝটিকা-সন্তাড়িত প্রেমিক আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রুগ্নার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। রুগ্না এই আকস্মিক ব্যাপারে যার পর নাই ভীত ও চমকিত হইয়া "মাগো ম'লাম গো" শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া বাটীর ভৃত্য ও দাসী কার্য্যান্তর হইতে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য বলপূর্ব্বক অবতার বাবুকে টানিয়া লইয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?

অবতার মহাশয় ত অবাক!

রুগ্না অতি কষ্টে কহিল, "এই পাষণ্ড কোথা হইতে আসিয়া আমার উপর অত্যাচার করিতেছে।"

ভৃত্য তখন বজ্রাদপি গম্ভীরস্বরে কহিল, "হারামজাদ, পাজী, কে তুই?"

হতবুদ্ধি দাসী এতক্ষণে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ওমা, তবে কি তুমি ডাক্তার নও?"

ভৃত্য তখন স্বকীয় সুকোমল হস্ত ও পদের সাহায্যে অবতারকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিয়া উত্তম মধ্যম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

'অতি প্রেমিকতা' বলিয়া যে পেত্নীটা এতক্ষণ অবতারের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, প্রহারের চোটে পলাইতে পথ পাইল না। তখন প্রহারে অচৈতন্যপ্রায় অবতার বাবু আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আর আমাকে মারিও না, এবার মারিলে মরিয়া যাইব। আমি ভুল করিয়াছি,—আমার স্ত্রী হারাইয়াছে, খুঁজিতে আসিয়া এই বিপদে পড়িয়াছি।"

ক্রমে তাহারা আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রেমিককে ছাড়িয়া দিল।

(৭)

আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, সেই ভগ্ন টিনের বাক্সটী এতাবৎ অবতার বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। প্রহারে জর্জ্জরিত, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়, বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত, নিরাশ প্রেমিক ভগ্ন বাক্সটী হস্তে লইয়া বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, অবতার বাবুর বাটী হুগলী সহরে। নিশাকালে নিঃশব্দে একজনকে বাক্স হস্তে যাইতে দেখিয়া চোর অনুমানে একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। পদে পদে বিপদের পদদলিত হইয়া অবতারের হৃদয়টা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। অবতার ভাবিলেন, "ভগবান আজ আমাকে লইয়া বুঝি কোন রঙ্গ করিতেছেন।"

তাঁহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি?"

অবতার। শ্রীলেখনী অবতার কালী।

ইন্‌। তুই কি করিস্?

লেখনী অবতার মনে মনে ভাবিলেন, "ভাগ্যে যাহা আছে ঘটুক, যথার্থ কথাই বলি।" পরে বলিলেন, "আমি কলিকাতার সুবিখ্যাত 'শঠশিরোমণি, বঞ্চনাবিশারদ' কোম্পানীর এটর্নী আফিসের একজন বিশ্বস্ত কেরাণী।"

ইন্‌স্পেক্টার সহাস্যে কহিলেন, "তোর এরূপ স্পষ্ট কথায় আমার অনেক কষ্ট বাঁচিল। আচ্ছা, তুই চোর চূড়ামণিকে চিনিস্?"

অবতার। হাঁ, চিনি।

ইন্‌। তুই জানিস্ যে চূড়ামণি জাল করে টাকা নিয়েছে? তুই ত তার সহায়তা করেছিস্?

এই কথা শুনিবামাত্র অবতার বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, এবং ভয়ে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে অবতার মহাশয় নির্দ্দোষী ছিলেন। সাহস তাঁহাকে আশ্রয় করিল। গাম্ভীর্য্যের সহিত সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "অবতার বিশ্বাসঘাতক এমন কথা কে বলে? পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও অবিশ্বাসের কাজ আমার দ্বারা হইতে পারে না। এক বিশ্বাসের জোরেই আমি এটর্নী অফিসে চির সম্মানিত।"

তাঁহার এইরূপ সতেজ উত্তর শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টার একটু বিস্মিত হইলেন, পরে কহিলেন, "নে, নে, আর বাক্‌চাতুরী করিস্ না;—এই দেখ্ তোর মনিবগণ আমাদের কি লিখেছেন।"

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার তাঁহাকে একখানি পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

মহাশয়,—আমাদের অফিসের দুইজন কেরাণী জাল করিয়া কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে। শুনিলাম তাহারা দুই জনেই হুগলীর টিকিট কিনিয়াছে।...একজনের নাম, চোর চূড়ামণি; তাহার আকৃতি নিম্নলিখিত প্রকার, ... ইত্যাদি। এই ব্যক্তিই জাল করিয়া টাকা লয়।

আর এক জনের নাম লেখা অবতার বাবু। আকৃতি ..ইত্যাদি প্রকার। এই বার চূড়ামণির সহায়তায় ছিল আমাদের এরূপ বোধ হয়। অবতার গত কল্য বাটী যাবেন বলিয়া তিন দিবসের ছুটি লয়। অনুসন্ধানে জানা গেল সেও বাটী যায় নাই। . ইত্যাদি।"

পত্র শুনিয়া অবতার মহাশয় নির্দ্দোষী হইলেও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ইনস্পেক্টরের হুকুমে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাজতে লইয়া যাওয়া হইল।

(৮)

ঝড় বৃষ্টি ক্রমে থামিয়া আসিল। আকাশব্যাপী কাল কাল মেঘ সমূহ জল হইয়া ঝরিয়া গিয়াছিল। প্রভাতে মেঘমুক্ত নীলাকাশগাত্রে বালরবির রাঙা ছবিখানি আঁকিয়া স্বর্ণমণ্ডিতা প্রকৃতি দেবী মধুর হাসি হাসিতে ছিলেন। প্রকৃতির কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন। এই কান্না, এই হাসি। হাসি কান্না লইয়াই জগৎ।

সংবাদ পাইয়া এটর্ণী অফিসের শঠ-শিরোমণি মহাশয় ভবানীর থানায় প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনিবকে দেখিয়া পদপ্রান্তে পতিত হইয়া অবতার কহিলেন, "মহাশয়, কি অপরাধে অধীনকে এই দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে"?

মনিব কহিলেন, "শনিবার বৈকালে তোমায় যে চেক দেওয়া হয় তাহার টাকা আমাদের খাতে নাই কেন?

অবতার বাবু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "এইবার সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি। তাড়াতাড়িতে বোধ হয় দেরাজের চাবী বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তবে চূড়ামণি নিশ্চয়ই চেক চুরি করিয়াছে।" এই বলিয়া নিজের বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিলেন।

মনিব কহিলেন, "এখন আমরা বুঝিলাম চূড়ামণিই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। তুমি নির্দ্দোষী।"

এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে চূড়ামণি মুক্তাবস্থায় থানায় আনীত হইল। চূড়ামণিকে দেখিয়া অবতার মহাশয় সাহসী হইয়া রোষের সহিত কহিলেন, "ওরে চণ্ডাল, বিশ্বাসঘাতক, তোর অপরাধের সীমা নাই। কেন নিরপরাধীকে ক্লেশ দিতেছিস্?"

মনিব বলিলেন, "চূড়ামণি, আমরা সমস্তই জানিয়াছি; এইবার তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।"

চূড়ামণি মনিবের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কহিল, "এ দাসকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। অবতার নির্দ্দোষী, আমিই সমস্ত দোষী।"

শঠশিরোমণি মহাশয়ের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ হাতকড়ি লাগাইয়া চূড়ামণিকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইল। অবতারও মুক্তি পাইলেন। মনিব মহাশয় অবতারের নির্দ্দোষীতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার এক সপ্তাহ ছুটি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

(৯)

মুক্তি পাইয়া অবতারের আনন্দের সীমা রহিল না। সদ্য কারাবাস কথা একবারেই বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। অবিলম্বে বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সাত রাজার ধন একটী মাণিক, আঁধার ঘরের প্রদীপ, অবতারের নয়নানন্দের একমাত্র শান্তিস্বরূপ প্রিয়তমা প্রণয়িনীকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া যেন হাতে আকাশের

চাঁদ পাইলেন। অতঃপর প্রিয়ার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একটু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "হায় প্রিয়ে, তোমাকে হারাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি তাহা ভগবানই জানেন। আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি কেমন করিয়া জানাইব? যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত এখনই একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী আনিয়া চিরিয়া দেখাইতাম।"

পত্নী স্বামীর মুখে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "মেয়ে মানুষের মাথায় যে বুদ্ধিটুকু আছে ভগবান কি তোমার ঘটে তত-টুকুও দেন নাই! হুগলিতে গাড়ী আসিবা মাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। মুটে নিকটে আসিলে তাহাকে মোট দেখাইয়া দিলাম। তাহাকেই কিছু পুরস্কার দিব বলায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া দিল। আমি গাড়োয়ানকে আমাদের ঠিকানা বলিলে নির্ব্বিঘ্নে পহুঁছাইয়া দিল। তুমি না আসাতে আমরা বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। মা ও বাবার বিনোদ ঠাকুরপোকে তোমার অনুসন্ধানে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। যা' হোক্ তোমার বুদ্ধিকে ধন্য! যে জন্য এত বিপদ ঘটিল কই আমার সেই ভাঙা বাক্স?"

স্মিতমুখে লেখনী অবতার কহিলেন, "ভবী ভোলবার নয়। প্রিয়ে হে, তুমি আর ভাঙা বাক্সর কথা তুলিও না। উহাই সকল বিপদের মূল।"

স্ত্রী। সে কি! যার জন্য এত কাণ্ড তাহাই হারাইলে! তবে তোমারই হার।

তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া অবতার কহিলেন, "আনিয়াছি, বাহিরে আছে।"

স্ত্রী। না, না, কাঁকে রেখ'না, নিয়ে এস।

অবতার বাবু অচিরে আদেশ পালন করিলেন। তখন পরিহাসরসিকা অবতার হৃদয়-তোষিণী মৃদু হাস্যে কহিলেন, "যাও, এখন স্নান করে এস, মাথা ঠাণ্ডা হোক্। ছিঃ, ছিঃ, এমনও হয়; রাম! রাম!

সমাপ্ত।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

ভারতমাতার প্রতি আমেরিকার পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয়তমে ভগিনি! তোমার আর্য্যঋষিগণ যে কেবলমাত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় কালাতিপাত করিয়াছেন এরূপ মনে করি না। তাঁহাদের রাজনীতি সম্বন্ধীয় চর্চ্চাও বহুল পরিমাণে ছিল। আর্য্যঋষিগণ বহুপরিশ্রমসাধ্য বহুদিনব্যাপী প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে যে সমস্ত জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা ধীর ভাবে আলোচনা করিলে যে কত অত্যদ্ভুত বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু কালের এমনি কুটিল গতি যে মানবপ্রকৃতি সেই আবর্ত্তনে পড়িয়া কাণ্ড জ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে। এমন কি তোমার যে সকল সন্তান সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও অলৌকিক বিবেক শক্তির ভূয়সী প্রমাণ দিয়াছেন তাঁহাদেরও সেই অলোকসামান্যবিবেকিনী শক্তি স্থানে স্থানে প্রতিহত হইয়া ভ্রমসঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হয়। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংসর্গের অসদ্বিবেকবতী শক্তিতে তোমার সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই হিন্দু আচার, ব্যবহার, রাজনীতি,

ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রানুশীলন, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। জানিনা তাহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবিধ বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারাদির দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষের কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিনা। সুতরাং কাল স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া আজ আমি আর্য্য রাজনীতির সহিত পাশ্চাত্য রাজনীতির সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। এরূপ করিবার প্রয়োজন এই যে সহসা পলিত কেশ, বলিত কায়, গলিতবয়াঃ আর্য্যঋষিগণের মার্জ্জিত রুচি প্রসূত বিষয়গুলির অবতারণা করিলে বিংশ শতাব্দীর আত্মাভিমানী, অনুকরণপ্রিয়, শিক্ষিতম্মন্য তোমার সন্তানগণ বিশ্বাস করিতে কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। ভগবান্ কামন্দক বলিয়াছেন ;—

"নিষ্ফলং ক্লেশবহুলং সন্দিগ্ধ ফলমেব চ।
নকর্ম্ম কুর্য্যান্মতিমান্ সদা বৈরানুবন্ধি চ" ॥

অর্থাৎ যে কার্য্য ফলদায়ক নহে, অথবা যে কার্য্যে সর্ব্বদা শত্রুতা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, এমন সকল কার্য্যে বুদ্ধিমানগণ হস্তক্ষেপ করিবেন না। পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর বার্ক (Burke) মহোদয় আমেরিকানদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিলন (Conciliation with America) বিষয়ে বক্তৃতাকালীন যুদ্ধের অনিশ্চয়তা বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন : —"It may subdue for a moment, but it does not remove the necessity of subduing again ; and a nation is not governed, which is perpetually to be conquered." ইহার তাৎপর্য্য এই বল প্রয়োগ দ্বারা প্রথমতঃ কোন একটী জাতিকে জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু একবার জয় করা হইল বলিয়াই যে বিজিত জাতি চির অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? তাহারা পুনরায় বিদ্রোহী হইলে পুনরায় তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে। সুতরাং যে জাতিকে ক্রমাগতই জয় করিতে হইল, সে জাতি বিজিত কেমন করিয়া বলিব?"

প্রিয়তমে ভগিনি! পাশ্চাত্য প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ বার্ক (Burke) সাহেবের উক্তি যেন ঠিক কামন্দকীয় শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধ দ্বারা কোন দেশ জয় করা অপেক্ষা যদি সামাদি উপায় দ্বারা রাজ্য কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলোদায়ক হইতে পারে। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা জয় পরাজয় উভয়ই সংঘটিত হইতে পারে কিন্তু অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ফললাভের আশা অধিক। অন্য উপায়ে ব্যর্থ মনোরথ হইলেও অবশেষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার উপায় থাকে। কিন্তু প্রথমতঃ যুদ্ধে বিফল মনোরথ হইলে আর উপায়ান্তর থাকে না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ বার্ক মহোদয় লিখিয়াছেন—

"My next objection is its uncertainty. Terror is not always the effect of force ; and an armament is not a victory. If you do not succeed, you are not without resource; for conciliation failing, force remains, but force failing, no further hope of reconciliation is left. Power and authority are sometimes bought by kindness ; but they can never be begged as alms by an impoverished and defeated violence."

ইহার তাৎপর্য্য এই, আমার আর এক আপত্তি যুদ্ধের অনিশ্চয়তা। বল প্রয়োগে সতত লোকদিগকে ভীত করিয়া বশীভূত করা যাইতে পারে না। আর অধিক সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্রাদি

থাকিলেই যে নিশ্চিত জয়লাভ হইবে তাহারও কোন কারণ দেখিতেছি না। যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই। কারণ, সন্ধি করিতে গিয়া যদি সন্ধি স্থাপন না হয় তাহা হইলে অবশেষে বল প্রয়োগ করিবার অবকাশ থাকিবে। কিন্তু প্রথমেই যদি যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজয় হয় তাহা হইলে সন্ধি হইবার আর আশা থকিবে না। কখন কখন সদয় ব্যবহারে প্রতাপ ও আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরাজিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া কখনই প্রতাপ ও আধিপত্য লাভ করিতে পারে না।

আর্য্যরাজনীতিজ্ঞগণ চারিটি উপায় দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনের উপদেশ দিয়াছেন। সেই চতুর্ব্বিধ উপায় এই—সাম দান, ভেদ, ও দণ্ড। উপরোদ্ধৃত বার্ক মহোদয়ের মতের পরিপোষকতার জন্য, এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের লক্ষণাদি বলিবার পূর্ব্বে উহাদিগের উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে আর্য্য রাজনৈতিক মহোদয়েরা কি বলিয়াছেন তাহাই বলিব। নীতিশাস্ত্রোক্ত চতুর্থ উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন॥"

ইহার অর্থ প্রথমতঃ সাম প্রয়োগে অর্থাৎ প্রীতি, সমাদরদর্শন, হিতকথনাদিদ্বারা, অথবা দান দ্বারা অর্থাৎ হস্তি, অশ্ব, স্বর্ণাদি দিয়া কিম্বা ভেদ সংঘটনে অর্থাৎ বিপক্ষ রাজার অমাত্যাদি অথবা তাঁহার অনুজীবিবর্গের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিয়া উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে একটীর দ্বারাই হউক অথবা দুই তিনটীর দ্বারাই হউক শত্রু জয় করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু চতুর্থ উপায় যুদ্ধের দ্বারা নহে। রাজনীতিজ্ঞ আর্য্যঋষিগণের এই সকল উক্তি শ্রবণে তাঁহাদিগকে অনেকে কাপুরুষ মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কারণ বিবেকী ব্যক্তি মাত্রেই ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা অধিক এবং অনিষ্ট সম্ভাবনা আদৌ নাই অথবা যদিও অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহার পরিমাণ অতিশয় অল্প, এমন কার্য্যে বিবেকিগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ মনু যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ যুদ্ধকালে যখন জয় পরাজয়ের কোনরূপ নিত্যতা দৃষ্ট হয় না, তখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করাই উচিত। তবে কি ভগবান্ মনুর মত যে, কোন ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না? তাহা নহে। তাঁহার মতে যুদ্ধ রাজনীতি শাস্ত্রের শেষ উপায়। যখন আর কোনরূপ উপায়ের সুবিধা নাই, তখন সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এবিষয়ে ভগবান্ মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানাম সম্ভবে।
তথা যুদ্ধ্যেত সংযুক্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপায় যথা সাম, দান, ভেদ ইহাদিগের প্রয়োগে ও যেখানে যাহাতে জয়লাভ হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। জয়লাভ না ঘটিলে সম্মুখ সমরে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে কিন্তু কখনই যুদ্ধে ভঙ্গ দিবে না।

প্রিয়তমে ভগিনি! আর্য্যঋষিগণ তেজস্বীতার পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারা কখনই ভীরুতার প্রশ্রয় দেন নাই; তবে দুঃসাহসিকতার বিরোধী। সহসা কোন কর্ম্মই করিবে না, একথা তাঁহারা

পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই সূক্ষ্ম বিষয়ে সহসা প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দেন নাই। তাই বলিয়া তাঁহারা যে আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দাতা এরূপ মনে করা কোনমতে উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

কর-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

হস্ত-বিবরণ।

যে শাস্ত্র শরীরচিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহ জানাইয়া দেয় তাহাকে সামুদ্রিকশাস্ত্র কহে। করবিজ্ঞান সামুদ্রিক-শাস্ত্রের প্রধান অংশ। ইহাদ্বারা করতল, করপৃষ্ঠ, অঙ্গুলী, নখর ও অপরাপর হস্তস্থিত চিহ্ন হইতে মনুষ্যপ্রকৃতি ও বিকাশের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী সমস্তই স্পষ্ট বুঝা যায়।

এতাবৎ কালের মধ্যে পৃথিবীতে এরূপ কোন যন্ত্র, কল বা কৌশল সাধারণে আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা অশেষপ্রয়োজনসাধক মনুষ্যহস্তের ন্যায় কার্য্যোপযোগী। কিম্বা মনুষ্য নিজের মত সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষম এমন কোন সম্পূর্ণ যন্ত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। হস্তের বর্ণভেদ ও কোমলতা দৃষ্টে কর্কশ কিম্বা সুকুমার কার্য্যোপযোগী নিঃ-সন্দেহে বলা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য চিহ্নের দ্বারাও কোন প্রকার কার্য্যে উপযুক্ত স্পষ্ট জানা যায়। এবং হস্তরেখাদিও তাহাদের নিয়ন্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তির ভাণ্ডার মস্তিষ্কের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাপন করে। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই হস্তের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আরম্ভ হওয়া উচিত।

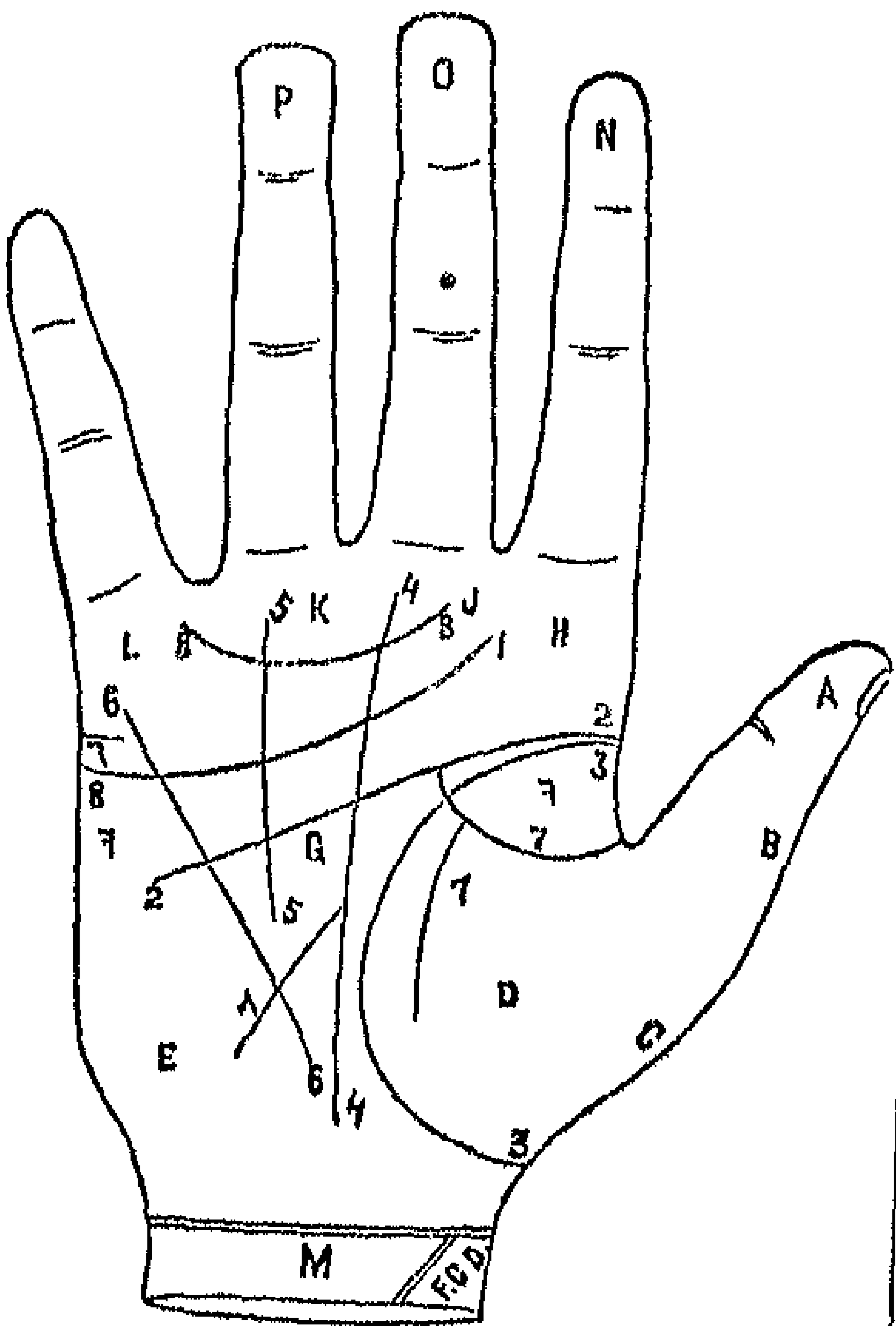
এই শাস্ত্র অনুসারে করস্থিত চিহ্নের ব্যাখ্যার দ্বারা মনুষ্যের বিকাশের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনা-বলী ও চরিত্রের দোষ এবং গুণ তন্ন তন্ন করিয়া জানা যায়। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসক রোগের পরিণাম কি হইবে যে ভাবে নির্ণয় করেন করবিজ্ঞানবিদ্ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ সেইরূপ, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাকে অন্ধ কুসংস্কারের অন্তর্গত করা উচিত নহে। কারণ, করস্থিত যে রেখা সমূহ ভবিষ্যৎ ঘটনা সমূহের নিয়ম প্রকাশ করে, সেই রেখাসমূহকে পরে পরিবর্ত্তিত, সংযুক্ত ও মিলাইয়া যাইতেও দেখা যায়। ইহা ভ্রান্ত অদৃষ্ট-গণনাও নহে; কিন্তু প্রমাণবর্জ্জিত মানব-চরিত্র-চিত্রাঙ্ক-দর্শন। যে শক্তি বাসনা বশীভূত করে, এবং মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, করাঙ্কদর্শনে নিদর্শনস্বরূপ তাহা অবগত হওয়া যায়। সাধারণ দর্শকগণ কেবলমাত্র ফলা-ফল দেখিতে পান, কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেন এবং অধিকতর সুস্পষ্টভাবে স্বরূপ-নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হন।

এই শাস্ত্রদ্বারা আশা, প্রবৃত্তি এবং শক্তি-সকল সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ও এই জ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। * * * বিজ্ঞানবিদের কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অতি সাবধানে এবং যত্নসহকারে চিত্তসমাধানে মনো-নিবেশ করা আবশ্যক।

কোন ব্যক্তির দোষসমূহের এবং অকৃতকার্য্য-তার বিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত সামান্য নহে। যদি আমরা এইরূপে সংসারের ভগ্নোৎ-সাহীকে সাহসপ্রদান করিতে পারি এবং অশান্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারি, তবে যে ইহা অতীব লোকহিতকর হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইবার

পূর্ব্বে আমাদের নিম্নলিখিত চিত্রটী স্মরণ রাখা আবশ্যক।



A. ইচ্ছাশক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্ব।

B. বিচারশক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয়পর্ব্ব।

C. প্রণয়শক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয় পর্ব্ব।

D. শুক্রের স্থান। E. চন্দ্রের স্থান।

F. মঙ্গলের স্থান। G. মঙ্গলের ক্ষেত্র।

H. বৃহস্পতির স্থান। J. শনির স্থান।

K. রবির স্থান। L. বুধের স্থান। M. মণিবন্ধের রেখা।

N. সুচ্যগ্র বা শুণ্ডাকার অঙ্গুলী। O. চতুষ্কোণ অঙ্গুলী।

P. স্থূলাগ্র অঙ্গুলী।

1-8 হৃদয়-রেখা।	3-3 আয়ু-রেখা।
2-2 শিরোরেখা।	4-4 ভাগ্যরেখা।
5-5 রবিরেখা	6-6 স্বাস্থ্যরেখা।
7 বিবাহ-রেখা	8-8 শুক্রবন্ধনী।

মনিবন্ধ অবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত করতলের বহির্ভাগের নাম "করভ"। অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় গ্রন্থির বহির্দ্দেশে ও মনিবন্ধের সহিত অঙ্গুষ্ঠের সংযোগস্থলকে "কোণ" কহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হস্তবিভাগ।

পশ্চাদ্ভাগ হইতে দেখিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকলের গঠন কতপ্রকার বিভিন্ন ভাবের তাহা করাঙ্কদর্শনপটু সকলেই অবগত আছেন।

এই পার্থক্য দর্শনেচ সামুদ্রিকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হস্তকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপ এক এক শ্রেণীর হস্ত এক একরূপ চরিত্রের নিদর্শন বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সপ্তগ্রহানুসারে হস্তের শ্রেণীবিভাগ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক মতে প্রধানতঃ হস্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,— শুণ্ডাকার, স্থূলাগ্র এবং চতুষ্কোণ। কিন্তু সূক্ষ্মাগ্র এবং মিশ্রলক্ষণ সমন্বিত এই দুই ভাবে হস্তের নিজস্ব লক্ষণও বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকন্তু, অবিমিশ্র লক্ষণান্বিত অর্থাৎ অঙ্গুলী সমূহ সম্পূর্ণভাবে শুণ্ডাকার, স্থূলাগ্র অথবা চতুষ্কোণাকৃতি কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়।

শুণ্ডাকার অঙ্গুলী, কল্পনা-শক্তি; স্থূলাগ্র, কার্য্যকারিতা-শক্তি; এবং চতুষ্কোণ, বিচার-শক্তি প্রকাশ করে।

শুণ্ডাগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তির কার্য্যকারিতা

শক্তি অপেক্ষা কল্পনা প্রবণতাই অধিক ; বিশেষতঃ যদি হস্ততালু কোমল হয়, তাহা হইলে ইহারই আধিক্য বুঝায়।

স্থূলাগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তি কার্য্যে তৎপর হন। বিশেষতঃ যদি হস্ততালু কোমলতাশূন্য হয় তবে তাঁহারা স্বহস্তে কার্য্য করিতে ভাল বাসেন। করতল কোমল হইলে তাঁহারা অন্যের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লয়েন। কোনপ্রকারে কার্য্য তাঁহাদের চাইই।

যাঁহাদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চতুষ্কোণ তাঁহারা কারণানুসন্ধায়ী হন; প্রমাণ ব্যতীত কোন কার্য্যেই তাঁহারা অগ্রসর হয়েন না।

গুণ্ডাকার অঙ্গুলী-বিশিষ্ট হস্ত যদ্যপি কঠিন ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া বোধ হয় তবে তাহারা স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করে।

মিশ্রাঙ্গুলীযুক্ত হস্তের বিষয় কেবল প্রবল লক্ষণগুলির দ্বারা বিচার্য্য। অর্থাৎ, যদি পাঁচটী অঙ্গুলীর মধ্যে তিনটী বা ততোধিক স্থূলাগ্রবিশিষ্ট বা সূচ্যগ্রবিশিষ্ট হয় তবে তাহা মিশ্রিত স্থূলাগ্র বা মিশ্রিত-সূচ্যগ্র-লক্ষণযুক্ত বলিতে হইবে।

প্রত্যেক অঙ্গুলীর লক্ষণও পৃথকভাবে পরীক্ষা করা উচিত, এবং তৎপরে ভাল মন্দ বিচার করা কর্ত্তব্য।

অঙ্গুলী সকলের লক্ষণ সমূহ।

তর্জ্জনী।

সূচ্যগ্র বা গুণ্ডাকার—অনুভূতি, পাঠানুরক্তি।
স্থূলাগ্র—কার্য্যবাহুল্য।
চতুষ্কোণ—সত্যপ্রিয়তা।

মধ্যমা।

সূচ্যগ্র—লঘুচিত্ততা।
স্থূলাগ্র—কার্য্যতৎপরতা।
চতুষ্কোণ—পরিণামদর্শিতা।

অনামিকা।

সূচ্যগ্র—কলাকৌশল-চিন্তা (*artistic thought*)
স্থূলাগ্র—সাহিত্য, চিত্র বা নাটকাভিনয়।
চতুষ্কোণ সামান্য শিল্প বা কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য সাহিত্যাদির আলোচনা।

কনিষ্ঠা।

সূচ্যগ্র—নিপুণতা (*tact*)
স্থূলাগ্র—কার্য্যদক্ষতা।
চতুষ্কোণ—শিক্ষাপটুতা।

অঙ্গুষ্ঠ।

সূচ্যগ্র—দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি।
স্থূলাগ্র—প্রবল ইচ্ছাশক্তি।
চতুষ্কোণ—স্বমতাভিমানিতা।

তর্জ্জনী গুণ্ডাগ্র বা সূচ্যগ্র হইলে অনুভূতি (*perception*) ও পাঠানুরক্তি বুঝায়, এবং অপরাপর অঙ্গুলীচয়ের দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে কিয়ৎপরিমাণে স্বভাবের কোমলতা উৎপাদন করে। সেইরূপ কনিষ্ঠাঙ্গুলী সূচ্যগ্র হইলে, অপরাপর চতুষ্কোণ অঙ্গুলীর কঠোর তার্কিকতা, নিপুণতার (অর্থাৎ, যেখানে যেরূপ ভাবে চলা উচিত ঠিক সেইরূপ ভাবে কর্ম্মকুশলতার) দ্বারা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাব আনিয়া দেয়; অথবা, যেমন কোন সূচ্যগ্র হস্তে মধ্যমাঙ্গুলী চতুষ্কোণ হইলে পরিণামদর্শিতার দ্বারা অবিমৃষ্যকারিতার সংশোধন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

হত্যা রহস্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুন্না।

জগন্নাথ ঘাটের অতি সন্নিকটে একখানি মুদিখানার দোকান। দোকানে জিনিসপত্র অতি অল্প; সামান্য সামান্য নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়াই দোকান।

দোকানখানি অধিকারিণীর নামেই খ্যাত ছিল। সকলেই তাহাকে "মুন্নার দোকান" কহিত মুন্না একজন আধাবয়সী স্থূলা স্ত্রীলোক; তাহাকে দেখিলে এক কালে সুন্দরী ছিল বলিয়াই বোধ হইত।

যদিও বহু দিবস হইল মুন্না এই দোকানের অধিকারিণী; কিন্তু দোকানে যে অধিক জিনিস-পত্র বিক্রয় হইত তাহার কোন লক্ষণ ছিল না। পরন্তু এই দোকান সম্বন্ধে প্রতিবাসীরা গোপনে নানাপ্রকার জল্পনা করিত। গভীর রাত্রে নানা-প্রকার নূতন লোক তাহার দোকানে গোপনে আসা যাওয়া করিত। কাজেই প্রতিবাসীরা মুন্নাকে কেবল মুদিখানা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় লিপ্ত থাকিতে সন্দেহ করিত। পুলিসের লোকেরাও তাহাকে চোরাইমালবিক্রেতা বলিয়া অনেকবার ধরিয়াছিল এবং এখনও তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিত। যাহা হউক এই প্রকার কোন গুপ্ত ব্যবসায়ে মুন্না কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর মুন্না আহারাদি সমাপন করিয়া দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একজন কদাকার, গুণ্ডাকৃতি লোক দোকান ঘরে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক কহিল, 'কিগো কি হচ্ছে? এবার বড় শীগ্‌গির এসেছি, না?"

মুন্না উত্তর করিল, "আমি মনে করেছিলাম তুমি কাশীতে গিয়েছ।"

"না কোন কাজ জুটলো না, কাযেই যাওয়া হ'ল না। সবই বরাতের দোষ।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মুন্না কহিল, "তাইত! তোমার আবার দোষ কিসের?"

"সে যা হোক, কিছু টাকা চাই।"

"এবার আমার কাছে তোমার কিছু হবে না।"

"সে আমি জানি - তুমি আগেই অমন 'দেব না' বল।" এই কথা বলিয়া আগন্তুক একটী ছোট মদের শিশি বাহির করিয়া তাহা হইতে খানিকটা পান করিল।

মুন্না দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি আগেও দেব না, পরেও দিচ্ছি না।"

আ। আমিও টাকা না নিয়ে যাচ্ছি না। টাকা না যদি নিতে পারি তবে আমার নাম রহমন নহে।

মু। দেখ্ মুখপোড়া এখনি তোকে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

"দেখ, সোয়ামীকে কি অমন ব্যাভার কর্‌তে আছে? সোয়ামীকে কোথায় মান্যি করে টাকা কড়ি দেবে, তা নয় পুলিসের ভয় দেখাচ্ছ!"

"আ মরে যাই, মিন্‌সের কথা দেখ, আমি মেয়ে মানুষ, আমি টাকা দেব?"

"কেন, তোমার যা আছে তা ঐ পেঁচামুখো ছোঁড়াটার জন্যে রাখবে নাকি?"

মুন্না বলিল, "খবরদার, তাকে গালাগালি দিও না তোমার ভাল হবে না, বলছি।"

"কেন, আমি কি বল্লুম?"

"না, কিছু বল নি!"

"তবে যে তুমি ব'কছ?"

"আমার যা কিছু, সব তার।"

"সেটা ধোকা।"

"কেন, তোমার মত চোর নয় বলে?"

"তোমার আগেকার সোয়ামীও আমার মত ছিল।"

"দূর্, তা কেন? সে আমায় খুব ভালবাসতো।"

"তা, আমিও তোমায় কোন কম ভালবাসি?"

"কেন, আমিই কি তোমায় যত্ন করি না?"

"থাক্, আর পীরিতে কাজ নেই! এখন কিছু টাকা দাও।"

"তুমি কি মনে কর, তুমি চুপ করে বসে থাকবে, আর আমি রোজকার ক'রে তোমায় খাওয়াব?"

"টাকা না দিস্ নেই নেই, অত কথায় কায কি? তোর দেরাজে ফিতে বাঁধা যে চিঠিগুলা আছে সেগুলোর কথা যাকে বল্লে টাকা পাব, তার কাছেই যাই।" কথা শুনিয়া মুন্নার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তবে রে মুখপোড়া, আমার কোথায় কি থাকে তুই যে বড় দেখিস্?"

"সোয়ামীর কাছে পরিবার কিছু লুকোয় রে মাগী?"

"কতদিন তুই কাগজগুলা দেখেছিস্?"

"হপ্তা খানেক হবে।"

"পড়েছিস্?"

"কি করি? না পড়ে থাকতে পাল্লেম না।"

"এখন বুঝি তাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্?"

"এইবার খাতে জমেছ!"

"কাজেই। যতদিন তোকে টাকা দিব ততদিন চুপ ক'রে থাক্‌বি ত?"

"নিশ্চয়ই; কে সাধ ক'রে আমবজের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা? যা হোক, কাগজ পড়ে জানলাম তুমিও কম নও, তুমি একখানি!"

কম্পিত স্বরে মুন্না কহিল, "চুপ!"

"আবার কি বল্‌বে বল, কিছু টাকা চাই?"

মুন্না কয়েকটী টাকা লইয়া তাহাকে দিয়া বলিল, "যাও, এই নাও, কাল আবার কিছু দেব। কিন্তু দেখ, এখন দাদাবাবুরও বড় দেনা হবে না।"

"কে তোমায় দান দিচ্ছে?"

"তোমাকে টাকা দেওয়া ত আমার দান করা।"

"তা যা বল, তাতে আমার বড় আসে যায় না, আমার টাকা পেলেই হ'ল।"

"তা ব'লে তুমি যে যখন তখন চাইতে পার্‌বে আর আমি দেব, তা হবে না; নইলে আমি আর এক পয়সাও দেব না, তবে তোমার যা হবার হবে।"

এমন সময় একজন ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক যুবক তথায় প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া হরমনও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এই তরুণ বয়স্ক যুবক, দয়ালচাঁদের সরকার পেঁটু।

মুন্না তাহাদিগকে দোকানে বসিতে বলিয়া একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক কোণে একটী দেরাজ ছিল। দেরাজ খুলিয়া মুন্না তাহার চিঠির তাড়া দেখিতে পাইল না; চক্ষে অন্ধকার দেখিল, চীৎকার করিয়া ভূতলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পেঁটু সরকার।

তিন দিবস হইল দয়ালচাঁদ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। সহরে এ বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সংবাদপত্রের বিশেষ

টাঁরেরা জীর্ণ, কীটদষ্ট, স্বেদগন্ধি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নোটবুকহস্তে সংবাদসংগ্রহের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান। বাজারে ক্রেতাবিক্রেতা দর দস্তুর ভুলিয়া গিয়া কেবল হত্যাসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একজন বলিতেছে, "বাপ্! কলি-কালের ছেলের কাণ্ড দেখ! জন্মদাতা পিতা—তাকে খুন!" অপরজন বলিল "যেমন দিনকাল পড়েছে তা এর আর আশ্চর্য্য কি?"

এইরূপ যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল সে তাহাই বলিতে লাগিল। কেহ বা এইকথা লইয়া অপরের সহিত তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল। মোট কথা হত্যাবিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হইতেছিল।

আজ এমন সময়ে হেমচন্দ্র তাঁহার অফিস-গৃহে একাকী উপবিষ্ট আছেন। হেমচন্দ্র পুলিস-বিভাগে প্রায় দশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া এক্ষণে স্বাধীনভাবে ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নামে বড় বড় বদমাইসও ভীত হইত। যদিও তিনি অত্যন্ত অধিক পারিশ্রমিক লইতেন বটে, তথাপি তাঁহাকে কার্য্যাভাবে একদিনও বসিয়া থাকিতে হইত না; বরং, তাঁহার হস্তে এত অধিক কার্য্য আসিত যে তজ্জন্য তাঁহাকে অন্যলোক নিযুক্ত করিতে হইত।

হেমচন্দ্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন লোক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে। লোকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ও হৃষ্টপুষ্ট। চুলগুলি কটা। পরিধানে কেবলমাত্র একখানি ছোট কাপড়।

হেমচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া আগন্তুক কহিল, "আমার নাম ঘেঁটু সরকার।"

"ঘেঁটু সরকার" বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে হেমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন।

ঘেঁটু কহিল, "কি করব ম'শাই, বাপ মা নাম রেখেছেন, তাতে আমার কি দোষ?"

"তাহলে তোমার নাম ঘেঁটু?"

"মা ঐ ব'লে ডাকৃত'।"

"ভাল; হেসেছি মনে কিছু ক'রনা"

"কি মনে ক'রব, ম'শাই?"

"থাক্; তোমার কি চাই বাপু?"

"কিছুই না।"

"তোমার কিছু আবশ্যক না থাকিলে আমার কাছে এসেছ কেন?"

"আর একজনের জন্যে।"

"ভাল, তার কি দরকার?"

"আপনাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে।"

"কি কাজ?"

"আজ্ঞে, ম'শাই, যাতে ধর্ম্মের জয় হয়।"

"এ বেশ কথা। যে লোকের হ'য়ে তুমি এসেছ সে কে?"

"একজন মেয়েমানুষ।"

"তাঁর নাম?"

"নাম বল্‌তে পার্‌বনা মশাই।"

"তা, আমাকে কি দরকার?"

"হাওড়ায় খুনের কথা আপনি শুনেছেন?"

"কোন খুন? দয়ালচাঁদ পুত্র কর্ত্তৃক হত হয়েছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, ঐ খুনের সম্বন্ধেই দরকার। কিন্তু দয়ালের ছেলে খুন করেনি—কারণ, তাহ'লে আপনি ও আমি খুন করেছি।"

"তবে তুমি অমরকে নির্দ্দোষী মনে কর?"

"তা না হ'লে আমি আপনার কাছে আস্‌ব' কেন?"

"কিসে তুমি তাকে নির্দ্দোষী মনে কর?"

"এই মেয়েমানুষটী আমাকে বলেছেন, অমর নির্দ্দোষী।"

"এই কথাতেই তোমার বিশ্বাস সে নির্দ্দোষী"

"হাঁ, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। আপনিও যদি অমরকে দেখে থাকেন, তাহ'লে আপনিও তাকে নির্দ্দোষী বলবেন।"

"আমি অমরকে খুব জানি।"

"আপ্‌নি কি তাকে খুনী মনে করেন?"

"যেরূপ ঘটনাচক্র দেখিতেছি তাহাতে তাহাকেই খুনী বলিয়া বোধ হয়।"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঘটনাচক্রের অনেক সময় ভুল হয়।"

"তা সত্য বটে।"

"তাহ'লে আপনি অমরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে পারেন।"

"আগে তুমি বল, কে আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে?"

"তা ব'ল্‌তে পারবনা।"

"তবে আমিও এ কাজ লইতে পারিব না।"

ঘেঁটু সরকার অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "কি জানেন, ম'শাই, নামটা পাছে পেরকাশ হয়, তাই ভয়।"

"আমি কাহার কাছে প্রকাশ করিব না।"

"তবে এতক্ষণ বলেন নি কেন?"

"এখনত বলিলাম।"

"তাঁর নাম অলকা,—বিনোদলাল ক্ষেত্রীর মেয়ে।"

"বিনোদলাল না জহরতির কার্য্য করেন?"

"হাঁ।"

"তুমি কি তাঁর বাটীতে কাজ কর?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"তোমাকে কি কাজ কর্ত্তে হয়?"

"প্রতিদিন অলকার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়, কিছু দরকার হ'লে এনে দিতে হয়, এই সব কাজ কর্ত্তে হয়। মোটকথা আমি তার সমস্ত তদারক করি"।

"তাহ'লে অলকার রক্ষক তুমি?"

"তা নিশ্চয়ই।"

কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র কিছুতেই হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। হাস্যের প্রবল বেগে চক্ষু হইতে জল নির্গত হইল। অতি কষ্টে হাস্যবেগ থামাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন, "ঘেঁটু, তুমিই আমার কাল হ'লে দেখ্‌ছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

রামধনু।

(১)

কে তুমি সুন্দর মরি ছড়ায়ে কিরণ ছটা,
ঝটিকার অবসানে আকাশে করেছ ঘটা,
জানিতে বাসনা তব চাহিনা বিজ্ঞান কাছে,
কে তুমি মেলেছ মরি উদাত্ত গগন মাঝে।

(২)

অনন্ত বিশাল বপু সপ্তবর্ণ সুরঞ্জিত,
অনন্ত বিমান পথে হয়ে সদা প্রকাশিত,
সৃষ্টির সুষমা রাশি করিছ প্রচার কিবা,
ছড়ায়ে গগনমাঝে অতুল উজ্জ্বল বিভা।

(৩)

দিগন্তপ্রদেশব্যাপী মহেশের কীর্ত্তিরাশি,
দিগন্তপ্রদেশব্যাপী সুধামাখা মধুহাসি,
যাঁহার শকতি বলে করিছ প্রচার তুমি,
সে মহান্ মহেশ্বরে চায় সদা চিত্তভূমি।

(৪)
জ্ঞানবান্ নর বলি, মিছা করি অহঙ্কার,
অজ্ঞানভাণ্ডার মম হয়ে যাক্ ছারখার,
মহেশের কীর্ত্তিরাশি প্রচারে কি আছে মন,
করেছি কি তার তরে কিছু আমি আয়োজন।

(৫)
প্রকৃতি-দেবীর প্রিয় নিসর্গের সুসন্তান,
অনন্ত বিমানব্যাপী বিশাল ধনুকখান,
নিরখি তোমার রূপ মনে হয় অবিরত,
তুচ্ছ তব কাছে হায় মানব ভূষণ যত।

(৬)
জলদ পটল হেরি সুনীল গগণ কায়,
করিছে নর্ত্তন শিখী হইয়া উন্মত্ত প্রায়,
বিস্তারি কলাপকুল, করি পুচ্ছ প্রসারণ ;
তোমার ও রূপরাশি করি তায় নিরীক্ষণ।

(৭)
মেঘসনে উভজনে, আবদ্ধ কি প্রেম জালে,
তাই কি উন্মত্ত হও হেরিলে গগণভালে ?
বিভাবসু অনুরাগ কর তুমি নিরীক্ষণ,
উপেক্ষিয়া দিবাকরে করে শিখী নরতন।

(৮)
নীরব বাসনা তব নীরব তোমার ধর্ম্ম
নীরবে সাধিছ তুমি বিশ্বনিয়ন্তার কর্ম্ম,
নিসর্গই শিক্ষাদাতা, নীরবে শিখায় সব,
কি সঙ্কেত কি ইঙ্গিত করিছেন ভবধব।

(৯)
শ্রেষ্ঠ জীব আমি নর, মিছা করি অহঙ্কার,
অহঙ্কার করিবার কিবা বল আছে আর,
নিত্য ত্যাজি অনিত্যেতে আমার মানস ধায়,
সংসারের সুখজালে মজিতে সতত চায়।

(১০)
যেই শিক্ষা শিখায়েছ নীরবে সুন্দর ধনু,
ভুলিবনা যতদিন রহিবে এ ক্ষীণ তনু,
নীরবে করিব কাজ নীরব বাসনা হবে,
প্রাণমন চিন্তাশক্তি বিভুকাজে সদা রবে।

৬

আর্য্যশক্তি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য। সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদিগের দেশে চিরকালই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত আছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিটী জাতি। চতুর্ এবং বর্ণ, এই দুইটী শব্দে সমাস করিয়া "চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিভ্যঃ স্বার্থে ষ্যঞ্" এই পাণিনীয় সূত্রে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা এই চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, চতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণ চতুষ্টয় শব্দের যে অর্থ, চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দেরও সেই অর্থ।

এই চারিটী বর্ণ ভিন্ন আমাদিগের দেশে পঞ্চম বর্ণ নাই। তবে এই চারিটী বর্ণের অসবর্ণ বিবাহ হইতে কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সমস্ত সঙ্কর জাতি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে আর অসবর্ণ বিবাহ নাই, সুতরাং আর নূতন বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি হইতেছে না। এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত ; এবং শূদ্র এক জাতি। কারণ, প্রথম তিন জাতির উপনয়নাদি সংস্কার আছে, এজন্য ইহাদিগকে দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাতি বলে। উপনয়ন সংস্কার দ্বিজদিগের দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ। দ্বে জাতি জন্মনী যস্য ইতি দ্বিজাতিঃ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি পদ বাচ্য ; আর শূদ্র দ্বিজাতি নহে,

একজাতি ; কারণ, ইহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই; আর বৈদ্য প্রভৃতি যে জাতি আছে, তাঁহারা যে বর্ণসঙ্করবাচ্য তাহারও যে সকল শাস্ত্রীয় বচন আছে উহা অনধিকার চর্চা দোষে এস্থানে আলোচনা করা হইল না। যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

এই চরাচর-বিশ্ব সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সমস্তের মধ্যেই ক্রমিকত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। একেবারে কোনও বস্তুই পরিপুষ্টি বা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহা হইতে ক্রমে শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি বহির্গত হয়, অনন্তর কাণ্ড প্রকাণ্ড সংযুক্ত হইয়া থাকে ; অবশেষে একটী বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। জীব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্ব্বাবয়বপূর্ণ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর দন্তোদ্গম, হস্তপদাদির পরিপুষ্টি ক্রমে হইতে দেখা যায়। বাহ্য অবয়বাদিতেও যেরূপ ক্রমিকত্ব দেখা যায়, অন্তরিন্দ্রিয়াদিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অবশ্য সকলেরই অন্তরে জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির বীজ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুযায়ি উপ্ত আছে। সেই বীজ কালসহকারে ক্রমেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমন কখনও দেখা যায় না যে, বালক পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই শাস্ত্রাদিতে প্রাবীণ্য লাভ করিয়াছে অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভে জীবন্মুক্ত হইয়াছে। অতএব আমাদিগের পূর্ব্ব মনীষিগণ এই সমস্ত বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে আমাদিগের ক্রমাধিকার নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
কর্ম্মণা যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥"

অর্থাৎ জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণের পুত্র "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য হইবে, উপনয়ন সংস্কার হইলে "দ্বিজ" পদবাচ্য হইবে ; আর যাগাদিক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা "বিপ্র" সংজ্ঞা লাভ করিবে এবং উপরোক্ত তিনটী নিমিত্ত থাকিলে "শ্রোত্রিয়" এই উপাধি লাভ করিবে। এই চারিবর্ণ ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"

(ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত।)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরুদেশ হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

এই চারিটী স্থানের প্রাধান্যাপ্রাধান্যানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রুতি যেরূপ বলিয়াছেন, বেদার্থোপদেষ্টা ভগবান্ মনুও সেইরূপ বলিয়াছেন, ·

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

প্রজাবৃদ্ধির জন্য ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় মুখ বাহু উরু এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রজাতিকে সৃষ্টি করিলেন।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন বলিয়া ইঁহাদিগের প্রাধান্য হইল ; তাহার পর ক্ষত্রিয়, তাহার পর বৈশ্য, এবং তাহার পর শূদ্র পরিগণিত হইলেন। ইহাতে যে সমাজে কেহ নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণিত হইবেন তাহা নহে। যাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষাপকর্ষ, তাঁহাকে সেইরূপ পদবী প্রদান করা হইয়াছে ; এবং তদনুসারে কার্য্যও দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের

আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে ইহাদিগের সত্ত্বগুণের সমধিক বিকাশ হইয়াছে, এজন্য ইহাদিগকে বিষয়কর্ম্ম অর্থোপার্জ্জনাদি হইতে একরূপ পৃথক রাখিবারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সতত ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া অপর সাধারণের কিরূপে মঙ্গল সাধিত হয়, তজ্জন্যই চেষ্টা করিবেন। কেবল যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, এরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিদ্বারা কালাতিপাত করিবেন। সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন ও সদুপদেশ প্রদানই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানাম কল্পয়ৎ॥

অর্থাৎ ছাত্রদিগকে শাস্ত্রপাঠনা, স্বয়ং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, দেবপূজা যজ্ঞাদি, অন্য লোককে দেবপূজা যজ্ঞাদি করান অথবা স্বয়ং তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া দেবপূজাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অন্যকে দান, এবং দান প্রতিগ্রহণ, এই ছয়টী ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের অর্থোপার্জ্জনের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। দান গ্রহণ অথবা যজ্ঞাদির দক্ষিণা হইতে যাহা কিছু অর্থাগম হইতে পারে, তাহাদ্বারাই ইহারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন অন্য কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য বা কৃষিশিল্পাদিরূপ অর্থাগমোপায় অবলম্বন করিতে ব্রাহ্মণগণের নিষেধ। এই কারণেই ব্রাহ্মণগণের মনীষা এত অধিক। সতত শাস্ত্রালোচনাদিতে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের আত্মা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে; আত্মার উৎকর্ষ যখন এত অধিক তখন তাঁহারা সমাজে সর্ব্বোচ্চস্থান পাইবেন না কেন? যাঁহারা বিষয়চিন্তা ভোগসুখাদি সমস্ত পরিত্যাগে সতত পরোপচিকীর্ষায় অরণ্যবাসী বল্কলধারী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিবেন না কেন? সমাজের নিয়মই এই, যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবেন, তিনি তদুপযুক্ত সম্মান ও প্রাধান্য লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য এবং পরার্থতৎপর বলিয়াই সমাজে তাঁহাদিগের শীর্ষস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
সোমপ্রকাশ-সম্পাদক।

টাইফয়েড্ জ্বর।

প্রায় ৭।৮ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় এই পীড়ার বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমি এমন বলিতেছিনা যে পূর্ব্বে এ পীড়া আদতেই দেখা যাইত না তবে এই, যে আজকালকার মত উহা এরূপ সাধারণ ছিল না। অনেকে বলিতে পারেন যে দিন দিন কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য নানা প্রকারে সহস্র সহস্র টাকা স্রোতের ন্যায় ব্যয় হইয়া যাইতেছে অথচ পীড়া সকল উপশমিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে কেন? একথার উত্তর বড় সহজে দেওয়া যাইতে পারে না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সহরে দিন দিন চারিদিকে উন্নতিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতি ঘন বসতি থাকায় এবং বস্তির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা ও রৌদ্র এবং আলোকের সমাগম না থাকায় ঐ সমুদয় বস্তিগুলিই সহরে পীড়ার আকর হইয়াছিল। অধুনা মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক সেইগুলি অপসারিত হইয়া এবং তৎস্থানে এক একটি পার্ক প্রস্তুত হইয়া সহরের শোভা

স্থিত এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অদ্ভুত স্বাস্থ্যোন্নতিও সাধিত হইয়াছে। এই জন্যই কয়েক বৎসর যাবৎ রোগের প্রকোপ এখানে আর তেমন লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু জগতে কখন কিসের মধ্য হইতে কি উৎপত্তি হয় তাহা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানযুগেও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। সু এবং কু দুইটি পৃথক জিনিস হইলেও সর্ব্বদাই পাশাপাশি চলিয়া থাকে এ কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, যেমন সু হইতে কু'র উৎপত্তি হইয়া থাকে তেমনি কু হইতেও সু'র উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরে সেই প্রকার নানাবিধ স্বাস্থ্যোন্নতি নিয়ামক সু উপায় হইতেই কু উৎপত্তি দেখিতে পাই। এই যে সহরের আবদ্ধ পয়ঃপ্রণালী হইতে সর্ব্বদা গ্যাস্ উত্থিত হইতে থাকে উহা নিতান্ত বিষজনক এবং উহা হইতেই নানা পীড়ারও উদ্ভব হইয়া থাকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সহরেই সমুদয়—"খোলা পায়খানা" ছিল, প্রতিদিন প্রাতে মেথরে উহা পরিষ্কার করতঃ ময়লাদি লইয়া দূরে মাঠে ফেলিয়া দিত। এখন উক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তে সমুদয় "ড্রেনের পায়খানা" করিবার অনুমতি হইয়াছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহরের বার আনা কি চৌদ্দ আনা অংশে উহা প্রচলিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও ভরসা করেন যে, ২।৪ বৎসরের মধ্যে সহরে আর একটিও "খোলা পায়খানা" থাকিবে না। এই পরিবর্ত্তনে কর্ত্তৃপক্ষের অনেক সুবিধা ও সাশ্রয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণের প্রকৃত সুবিধা কিছু হইয়াছে কি? প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত জলের কলে সকল সময়ে রীতিমত জল নিষ্কাশন হয় না, দ্বিতীয়তঃ জল ভালরূপে নিষ্কাশিত না হওয়ার জন্য ময়লাদি বিশেষরূপে ধৌত হইতে না পারায় ড্রেনের মধ্যেই জমাইয়া থাকে; সুতরাং রাত্রিতে উহা হইতে বহুই বিষময় গ্যাস্ উত্থিত হইতে থাকে। সম্প্রতি ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ চিকিৎসক-গণের মতে টাইফয়েড্ জ্বর হওয়ার কয়েকটী কারণ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গ্যাসই একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হয়। আমরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে বাড়ীতে এই পীড়া হইয়াছে সেই সমুদয় বাড়ীর সব প্রকার ড্রেনের পায়খানাতেই দোষাবহ এই আবদ্ধ মলমূত্রের পচন ও গলন (decomposition) হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহাকে সিউয়ার গ্যাস্ (Sewer Gas) কহে। ইহা এতই ভয়ানক যে উহার নিঃশ্বসনে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি কিছু দিন হইল ভবানীপুরে একজন কুলী পথের ম্যান্‌হোল (Manhole) উন্মুক্ত করিয়া পরিষ্কারার্থে উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া যায়, উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর একজন কুলীও তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হয়ত হতভাগ্যদের তখনও জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কিন্তু প্রাণের মমতায় আর কেহই তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে চাহিল না। ইহা দেখিয়া এক জন বাঙ্গালী যুবক নগেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, তাহাদের উদ্ধারার্থে সাহসপূর্ব্বক তথায় নামিবা মাত্র তাহাদের সহগামী হইলেন। পরে কৌশল পূর্ব্বক দড়ায় বাঁশ বাঁধিয়া একে একে তাহাদিগকে যখন উত্তোলিত করা হইল তখন দেখা গেল যে, সকলেই মারা গিয়াছে। যে গ্যাস এরূপ বিষাক্ত তাহা উত্থিত হইয়া বাটীতে বিপজ্জনক পীড়ার সূত্রপাত করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীহার সেন।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন। দুঃখ সহ্য করিলে কি হয় ?

ভগবান্। সুখে দুঃখে যে ধীর ব্যক্তি অবিচলিত থাকিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী। দুঃখ কিছুই নয় ইহা একেবারে অনুভব করা নিতান্ত কঠিন। দেহ মিথ্যা, দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্নে দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় ভ্রমকল্পনা মাত্র, চিত্তস্পন্দন মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, চিত্তকে ভ্রম দেহাদি হইতে ছাড়াইয়া লও। ইহা বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বিচার দ্বারা দেহ কিছুই নয় জগৎ কিছুই নয় বুঝিলেই বৈরাগ্য আসিল। সুরাপায়ী যদি ক্রমাগত অভ্যাস করে সুরাতে তৃপ্তি নাই তবে সে সুরা ছাড়িতে পারে। বৈরাগ্য আসিলে অভ্যাস দৃঢ় ভাবে হইতে থাকে। চিত্তকে সজাগভাবে ব্রহ্মে রাখাই অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস প্রত্যহ পালন করিতে করিতে ইহা দৃঢ় হয়। যাহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না, সর্ব্বদা অহঃরহঃ তাহাদের প্রণব জপ বা মন্ত্র জপ বা নিষ্কাম কর্ম্ম আবশ্যক। তথাপি পূর্ব্বসংস্কার বশে চিত্ত এক বিষয় ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ে গমন করে, এক বিষয়ের আকার ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্য বর্জ্জিতভাব তাহাকেই তুমি নির্ম্মল চৈতন্য বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। অহঃরহঃ ঈশ্বর প্রণিধানে তুমি সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে অভ্যাস কর। হুসিয়ারে থাক। অভ্যাস দৃঢ় হইলে দেখিবে জাগ্রত নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রিত নহে, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার যে সনাতনরূপ সর্ব্বদা তুমি তাহাই। চিত্তে কোন বিষয়ের উদয় বা প্রলয় অনুভব করিও না, ক্ষোভ ও বিক্ষোভ রহিত হইয়া যথা সুখে অবস্থান করিও দেখিবে জগৎ মিথ্যা, সুখ দুঃখ মিথ্যা, সমস্তই ভ্রম; সুখ ও দুঃখের অস্তিত্ব কোথায় থাকে ? এই রূপে চিত্ত ব্রহ্মে গমন করিলে চিত্তের স্পন্দন রহিত হইল। চিত্তের স্পন্দন রহিত হইলেই জগদাড়ম্বর ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ এই জগৎ চিত্তস্পন্দন কল্পনাজাত ইন্দ্রজাল মাত্র। যতদিন যাওয়া আসা বা যত দিন স্পন্দন যতদিন কোন প্রকার গতি থাকিবে ততদিনই জনম মরণরূপ ভ্রম থাকিবে। যাহার কোনপ্রকার গতি আছে তাহারই মৃত্যু আছে। চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন হইলে সর্ব্বপ্রকার গতি রহিত হইল। কাযেই সুখও নাই, দুঃখও নাই, সুখ দুঃখ সমান হইয়া গেল। সুখ দুঃখ সমান বোধ যাঁহার হইল তিনিই অমরত্ব লাভ করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, সুখ হউক দুঃখ হউক অগ্রাহ্য করিয়া সহ্য করিতে থাক তবেই চিত্ত ব্রহ্মে লাগিতে থাকিবে। অথবা চিত্ত ব্রহ্মে রাখিবার অভ্যাস যে করিবে প্রথম অবস্থায় তাহাকে সুখ ও দুঃখে অবিচলিত হইতে হইবে। সুখও অগ্রাহ্য দুঃখও অগ্রাহ্য। এইরূপে সুখ দুঃখে সমান বোধ করিতে করিতে অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলেই অমর হইয়া গেলে। ইহাই জীবন্মুক্তি; এখন বুঝিলে সুখ দুঃখ সহ্য করিলে কি হয় ?

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

সিংহদ দুর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দাক্ষিণাত্যে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত করিতে সমুৎসুক হইয়া মহারাষ্ট্ররাজ প্রথমেই কোন্দণা দুর্গ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই বিষয়ের সুপরামর্শ ও কোন পথে, কি উপায়ে কার্য্য করিলে সফলকাম হইতে পারিবেন উমারথের সুবাদার তানাজীমালশ্রীর সহিত সেবিষয়ে যুক্তি করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা এবং একপ্রাণতা বর্ত্তমান ছিল। একত্রে উভয়ে পাশাপাশি থাকিয়াই পুনার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তাখাঁর গৃহাধিকার করিয়াছিলেন; আফজুল খাঁর সহিত যুদ্ধে এই দুজনেই অতুল সাহসের পরিচয় দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তানাজী আনন্দ সহকারে শিবজীর মতে মত দিয়া আপনি কোন্দাণা দুর্গাধিকারের সম্যক্ ভার গ্রহণ করিলেন। এবং ঐ দিবস (৪ই মাঘ) হইতে ৪ দিবসের মধ্যেই দুর্গের শীর্ষ প্রদেশে শিবজীর হরিদ্রা বর্ণের পতাকা উড্ডীন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

তানাজী দুঃসাহসে ভর করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু দেখিলেন যে উহা নিতান্ত সহজে হইবার আশা নাই। কারণ দুর্গ একে স্বভাবতঃই সুদৃঢ় তাহার উপর পুনরায় বিগত কয়েক বর্ষের যুদ্ধকালে বিশেষ কৌশলে ও যত্নপূর্ব্বক অতিরিক্তরূপে সুরক্ষিত ও সুগঠিত করা হইয়াছে। ইহার পাদদেশে এবং পাহাড়ের মধ্যপথে মার্‌ল ও কোলিশ নামক দুই বলিষ্ঠ জাতি বসবাস করিত। ইহারা দুর্গাধিপতির নিমকের চাকর এবং বাহ্য শত্রুর আগমন সংবাদ দুর্গাভ্যন্তরে জ্ঞাপন করাই উহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। পর্ব্বতের সর্ব্বোপরি দুর্গমধ্যে একটি রাজপুত সেনাদল বসতি করিত; এই সেনাদলের অধিনায়ক উদয়ভানু একজন সুবিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্পদিন হইল সম্রাট তাঁহার যশোপ্রভাবে সুখী হইয়া নূতন প্রদেশ রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এতগুলি দুরূহ বাধা তানাজীর সম্মুখে থাকিলেও তাঁহার অনুকূল অবস্থারও অভাব ছিল না। পূর্ব্বে এই কোন্দণা দুর্গ শিবজীরই ছিল এবং তাঁহার সহানুভবতা ও প্রজাপালনে বহুশীলগণ আজও দুর্গবাসীরা ভুলিতে পারে নাই। তানাজী বেশ জানিতেন যে মার্‌ল এবং কোলিশ্‌ জাতিদিগকে সহজেই তিনি আপন পক্ষে আনিতে পারিবেন। ভগবান্ যখন যাহার সহায় থাকেন তাহার প্রাণে উদ্যম থাকিলে উপায়ের জন্য অধিক চিন্তা করিতে হয় না; উহা যেন আপনা হইতেই আসিয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এক্ষেত্রে তানাজীরও তাহাই হইল। কোলিশদিগের নায়ক সামজীর কন্যার সহিত পুনানিবাসী তানাজীর বন্ধু দৌলত রাওয়ের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে, ঐ দিবস বিবাহ। বিবাহের খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া আছে। এমন দিনে একজন চারণের গীত শুনিয়া সকলে হর্ষের পূর্ণমাত্রা লাভ করিবার আশা করায় বর পক্ষকে একজন চারণ সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তানাজী কি এই স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি বন্ধু দৌলতরাওয়ের সাহায্যে বিখ্যাত গান্ধালী টোটারাম গায়কের ছদ্মবেশে বিবাহ সভায় সকলের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গীত গাইয়া সমবেত সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের গীতালহরী শ্রবণে যখন

সকলেই মুগ্ধ চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন তখন তানাজী শিবজীর জন্ম ও বাল্যজীবন বিষয়ক একটি সুন্দর গাথা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গায়ক পর পর কেমন করিয়া অম্বাবাইএর প্রার্থনায় দেবাদিদেব কৈলাশেশ্বর শঙ্কর স্বয়ং অবতাররূপে জিজিবাইএর গর্ভে মোগলধ্বংশের জন্য শিবজীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, কেমন করিয়া শিবজী বাল্যকালে গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নাবালক হইয়া হেতকরী ও মাউলীগণকে যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কেমন করিয়া উনবিংশতি বর্ষকালে টোর্ণার পার্ব্বতীয় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন ইত্যাদী প্রকার শিবজী জীবনের ঘটনাবলী সুস্বরে গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষকালে গায়ক গীতস্বরেই কতকটা অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে আজও তোমরা হিন্দু হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছ। স্বাধীনতা হারাইয়া পরের পাদুকা স্পর্শে আপনাকে ধন্য করিতেছ, পরাধীন জীবন কি এতই সুখময়, হা ধিক্, শতধিক্ তোমাদের জীবনে"। গায়কের এই বাক্যগুলি এতই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে সমবেত সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তানাজী সকলের মুখভাব অবলোকন করিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পরিশ্রম বৃথায় ব্যয়িত হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী চলিয়া গেলে রায়জীর নিকট তানাজী আত্ম প্রকাশ করিয়া সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। রায়জীও সমুদয় শ্রবণ করিয়া মার্‌স ও কোলিশ জাতিদ্বয় দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য হইতে পারে তাহা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এখন কেবল রাজপুত সেনানিবেশটি কোন রূপে বশ করিতে পারিলেই দুর্গটি দখল করিতে পারা যায়। জগদীশ্বর সহায় হইলে কোন কার্য্যেরই বাধা থাকে না। এ বিষয়েও বেশ এক সুযোগ সত্বর উপস্থিত হইল। পরদিন সন্ধ্যার সময় রায়জীর সহ একত্রে ভ্রমণকালে তানাজী দুর্গের ঠিক তলদেশে একজন রাজপুত সৈনিককে আহত করিয়া বন্দী করেন। এই আহত সৈনিকের নাম জগৎসিংহ, ইহার নিকট দুর্গাধিপতি উদয় ভানুর পূর্ব্ব পরিচয়ও পাওয়া গেল। এই প্রবন্ধের সহ উহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় আমরা পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে তাহার বর্ণনা করিলাম।

উদয়ভানুর পিতা এক জন উদয়পুরের ওমরাহ ছিলেন; ইহারই ঔরসে এক দাসীকন্যার গর্ভে উদয়ভানুর জন্ম হয়। লোক সমাজে জারজ পুত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে উদয় দেখিলেন যে রাজস্থানের সমুদয় উচ্চ কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্য। ইহাতেও উদয়ের মন তেমন বিচলিত হয় নাই। কমলকুমারী নামে একটি সর্দ্দার কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। বংশমর্য্যাদাভিজ্ঞ কন্যার পিতা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া এই উত্তর করেন যে "রাজহংস কখনও পাতিহাঁসের সহ সংযুক্ত হয় না"! উদয় ইহাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া এই অপমানের বিশেষরূপে প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করেন। তথায় আপনাকে মেওয়ারের সর্দ্দার বলিয়া পরিচয় দিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া সম্রাটের সুনজর প্রাপ্ত হযেন। যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের উপর সন্দিগ্ধ হইয়া সন্দিগ্ধমনা সম্রাট এই উদয় ভানুকেই বহু সেনা সমভি-

ব্যাণ্ডের যশোবন্তের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। ইহার উপর সম্রাটের এমন আদেশও ছিল যে সম্ভব হইলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বকও শিবজীকে ধৃত করিয়া বন্দী করিবেন। এইরূপ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে গৌরবান্বিত হইয়া উদয় ভানু মনে করিলেন যে দাক্ষিণাত্যে যাইবার পূর্ব্বে একবার মেওয়ারে যাইয়া আপনার পদমর্য্যাদা দেখাইয়া আসিবেন। সেই জন্য একদা মেওয়ারের সীমান্তে আসিলে ঘটনাচক্রে তিনি এমন সময় এক দৃশ্য অবলোকন করিলেন যে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পাঠক এমন কোন ঘটনা আছে যাহাতে রাজপুতবীরের হৃদয় স্তম্ভিত হইতে পারে। নিশ্চয়ই কোন সম্মুখ শত্রুর প্রতিকৃতি দেখিয়া নহে। উদয়ভানু দেখিলেন যে সম্মুখে তাঁহার নয়নানন্দদায়িনী রূপলাবণ্যময়ী কমলকুমারী বিষাদিনী বেশে মৃত পতির সহ চিতানলে অনিত্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে পতিদেবের সহ চিরানন্দে বাস করিবার আশায় পতির চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য এবং পীড়ার কারণতত্ত্ব। ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা এই পুস্তকে নরনারীর সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকে পড়িয়া বুঝিতে পারে এরূপ সরল ভাষায় লিখিত। সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বঙ্গবাসী স্বাস্থ্যবিসর্জ্জন পূর্ব্বক দিন দিন অবনতির কিরূপ চরম সীমায় উপনীত হইতেছে তাহাও সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচারের আশা করি। পুস্তক প্রাপ্তির স্থান ১৮।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা।

জাতীয় মহাসমিতি। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড্ মাষ্টার, সিটি ইণ্ডিয়ান স্কুল, প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে জাতীয় মহাসমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গত অধিবেশনের সম্পূর্ণ বিবরণের বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। নানা অনিবার্য্য কারণে জাতীয় মহাসমিতির সকল কার্য্যই ইংরাজীতে হইয়া থাকে, সুতরাং দেশের জনসাধারণ সমিতির কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিবার সুবিধা পান না। নরেন্দ্র বাবু এ অভাব মোচন করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ নরেন্দ্র বাবু বর্ষে বর্ষে সমিতির কার্য্যপ্রণালীর বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া সমিতির জাতীয় কর্ম্মের সবিশেষ সাহায্য করেন। পুস্তক প্রাপ্তির স্থান ৬৬।২ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দৈবাশ্রয়। শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী কৃত। গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় "দেবগণ অমর নহেন।" পুস্তকখানি লেখকের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইহাতে নানা শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোরম এবং পুস্তকখানি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলপূর্ণ। প্রত্যেক সমাজ তত্ত্বজ্ঞেরই পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা সাতিশয় আনন্দ সহকারে "আশা" ও "সঙ্গতি" নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আর্য্যভূমি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র মাত্র দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ৴০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। বর্ষ শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে অথবা নিষেধ না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্র পাঠাইতে থাকি।

৩। মূল্য পাঠাইবার সময় অথবা অন্য কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নিজ নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এ কথাটী লিখিবেন। পত্র প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। হস্তাক্ষর অপরিষ্কার হইলে, ছাপায় ভুল অপরিহার্য্য। প্রত্যেক লেখক ও সংবাদদাতা মাত্রেই আর্য্যভূমি একখানি বিনা মূল্যে পাইবেন। প্রবন্ধ ও সংবাদগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। সংবাদদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপন আপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইঁহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনামত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা, মাসে প্রতি কলম ২ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৮৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
শক্তিনিবাসী, সম্পাদক ও প্রকাশক।
হাওড়া, সাহকোরা।

৫০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট "আর্য্যভূমি প্রেসে" শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কর হালদার দ্বারা মুদ্রিত

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [আষাঢ় ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

লেখকগণের নাম।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ, শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি; পি দত্ত F. C. S. PH. B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র ও সম্পাদক।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১।০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা।)



আধুনিক সকল প্রকার মালসার শীর্ষস্থানীয় !

প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ।

ইজন বেনোভোলেন্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক নিয়োজিত ভারতের স্বাধীন নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও পৃষ্ঠপোষিত কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় ।

নলিনী বিনোদ তৈল ।

এই তৈল কেশহীনতা (টাক) কেশের অকালপক্কতা, কেশদ্রুম, রুক্ষি, খুস্কি প্রভৃতি কেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগের মহৌষধ ও অনিদ্রা নাশক ।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১।৷০ ।

কামিনী বিনোদ ঘৃত ।

ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে অমৃতবৎ রসায়ন । জরায়ু সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ রোগনাশক, ও প্রদরদোষ নিবারক ।

একমাস ব্যবহারোপযোগী ঘৃতের মূল্য ৪ টাকা । প্যাকিং ৵০ দুই আনা ; ডাকমাশুল ৸০ বার আনা ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ৫৲ টাকা লাগিবে । নং ৩১৩ বাগবাজার স্ট্রীট, বড়বাজার কলিঃ

কলিকাতা, আগ্রা, মালদহ প্রভৃতি ১৯০৬ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত

আসলগোলাপ ও সরবৎ প্রস্তুতকারক—

দত্ত কোম্পানীর

গাঁদ— (রূপ ও মুখ সমেত) মূল্য ৴১২

পকেট লেমনেডজুরান— ৴০

গারদেগুয়াল ষ্টিক দেন্ট (রূপ ও মুখ সমেত) ।১০

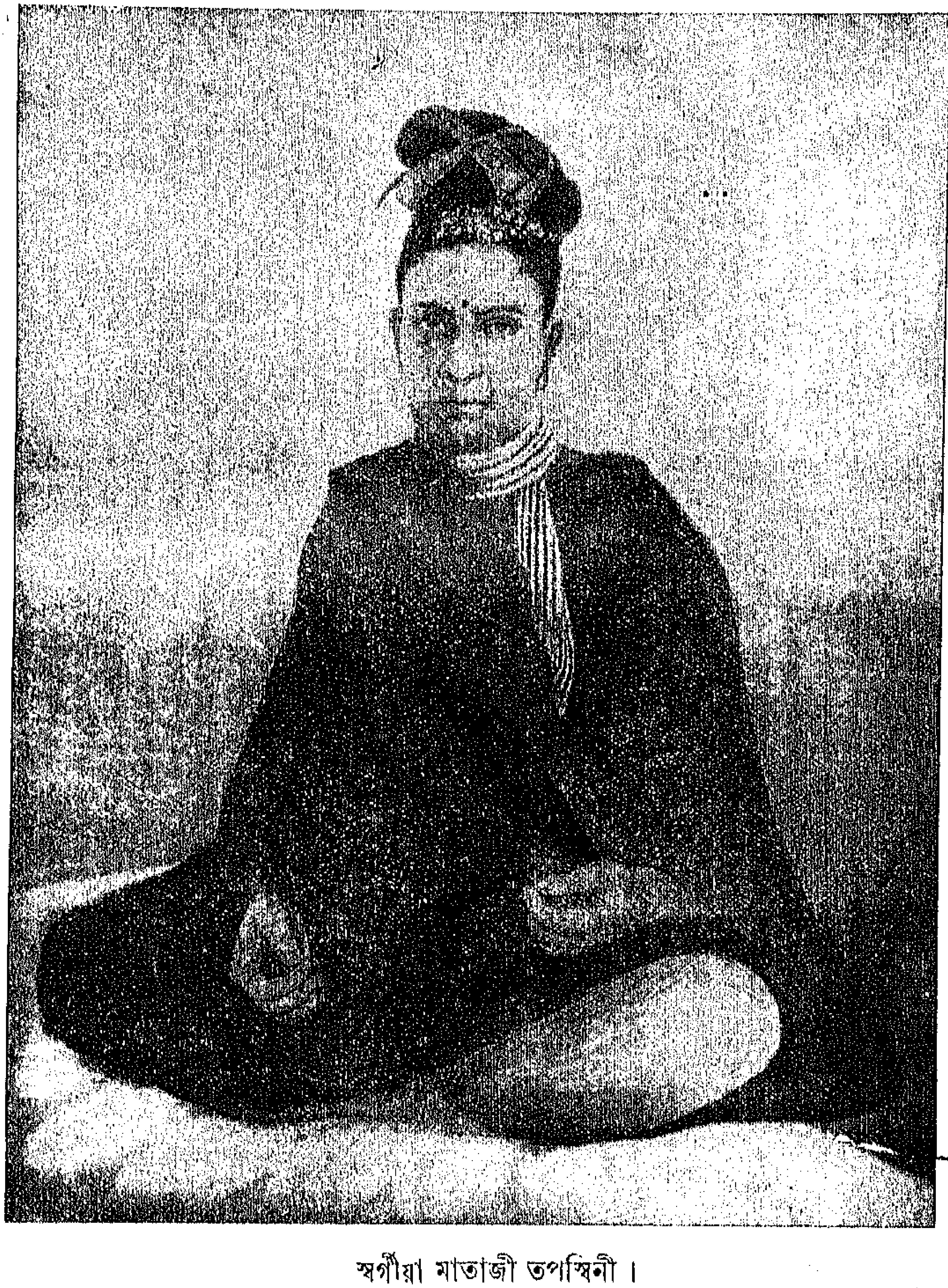
পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত । সিমলের ঠেপরারী দোকানে ও ৪৮ নং ক্যানিং স্ট্রীট লেন, কলিকাতা আসুন । অর্ডার পাইলে মফঃস্বলেও ভিঃ পিতে পাঠাইয়া থাকি ।

পেটেন্ট টিনের, লোহার প্রভৃতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে কিনিবার আবশ্যক হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার

জি, সি, নন্দী এণ্ড কোম্পানীর

হার্ডওয়ার মার্চেন্ট, চাইল মসলাপাতা এবং সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের অর্ডার সাপ্লায়ার নিকট অনুসন্ধান করিবেন ।

ঠিকানা—৩৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা ।



স্বর্গীয়া মাতাজী তপস্বিনী।

(ভারত মহিলা হইতে গৃহীত)

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [বৈশাখ ১৩১৪ সাল]

আর্য্যভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

কলিকাতা।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১।৷০ টাকা। (প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা)

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ। ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে এক দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাপানি কাস ক্ষয় কাস, রক্ত উঠা, গঙ্কাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ এক বটিকা সেবন করিবা মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সকলপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, মাঃ ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ পোঃ বিডন স্কোয়ার,

কলিকাতা।

দেলবাহার তৈল।

এই মনোহর সুগন্ধি স্নিগ্ধ তৈল ব্যবহারে মেচেতা ব্রণ প্রভৃতি বদন মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন সকল তিরোহিত হয়, মুখখানি শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঢল ঢল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতে চর্ম্ম সুকোমল, বর্ণ সুবর্ণাভ হয়। লাবণ্য কুসুম বিকসিত হইয়া উঠে। এই সুবাসিত তৈলে গাত্র ফাটা, ছুলি, ঘামাচি, শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়।

ডজন	৯৲	প্যাকিং ইত্যাদি	॥০
শিশি	৸০	ঐ	৵০

নেপালজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কস্তুরী (মৃগনাভী) এইখানে পাওয়া যায়।

আর, পি সাধুর উৎকৃষ্ট সুলভ

গোলাপজল।

পাইট্ বোতল ডজন	২।০
বড় বোতল ডজন	৫৲
পাইট বোতল	।০
বড় বোতল	॥০

এইচ্, পি, মুখার্জ্জি

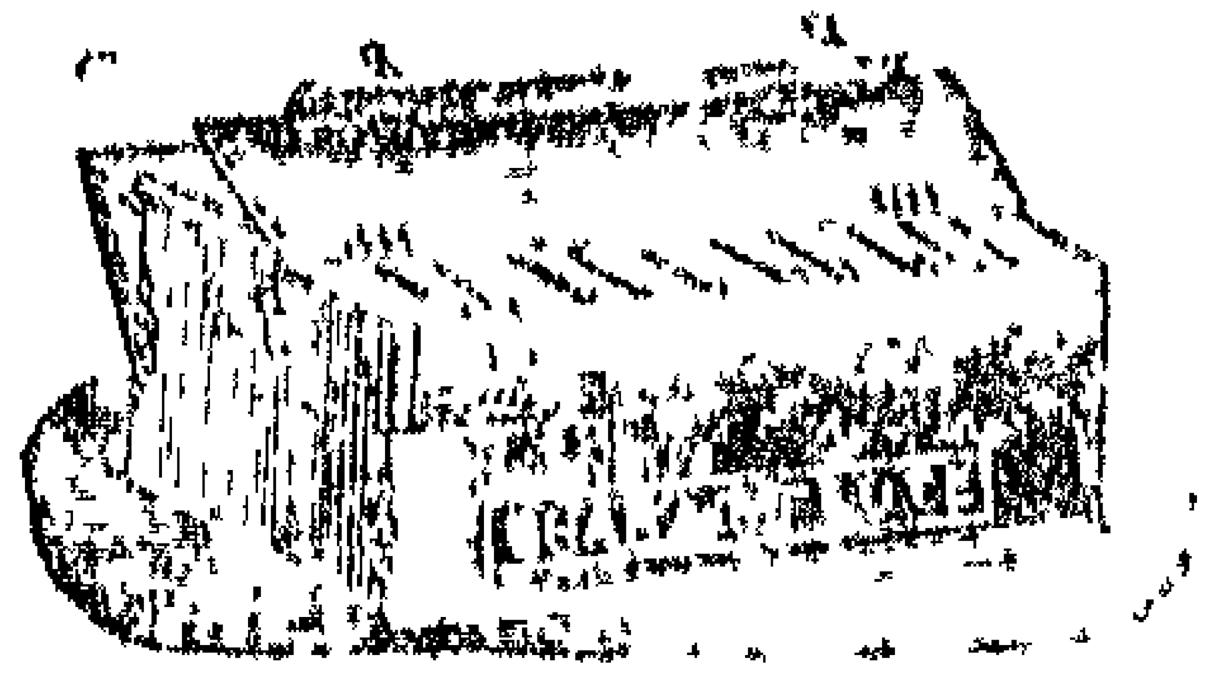
অথবা

আর, পি, সাধুর নিকট

১৬৩ নং আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বন্দে মাতরম্।

৪ বৎসর  গ্যারেন্টি

ভারত ফ্লুট হারমোনিয়ম।

(স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত)

ঈশ্বর অনুগ্রহে ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের কালে আমাদের "ভারত ফ্লুট" হারমোনিয়ম উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়াছে কারণ মনমুগ্ধকর স্বর, সুন্দর গঠনপ্রণালী ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব গুণে সকলেই ইহার সুখ্যাতি করেন। ইহা উৎকৃষ্ট উপাদানে ও সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত একারণ সহজে জল বায়ুর দোষে নষ্ট হয় না। আমাদের এই হারমোনিয়ম যিনি একবার ক্রয় করিয়াছেন তিনিই ইহার গুণে মোহিত হইয়াছেন ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে ইহা ক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের সানুনয় প্রার্থনা—সঙ্গীত অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অন্যত্র হারমোনিয়ম ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের সুবিখ্যাত "ভারত ফ্লুট" হারমোনিয়ম একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

মূল্যাদি।

১ সেট	৩৭ রিড	৩ অক্টেভ	২ ষ্টপ	মূল্য	২৫৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৩ ঐ	"	৩০৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৩ ঐ	"	৩৫৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	"	৪০৲
২ ঐ	৭৪ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	"	৪৫৲
২ ঐ	৭৪ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	"	৫৫৲
২ ঐ	৮৪ ঐ	৩॥ ঐ	৫ ঐ	"	৬০৲
৩ ঐ	১২৬ ঐ	৩॥ ঐ	৭ ঐ	"	১২০৲

দাস ব্রাদার্স।—১৭ নং রাজা রাজ মিত্রীর লেন, মধ্য

কলিকাতা।

ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

দাঁত থাকিতে দাঁতের যত্ন করুন।

বিলাতি মাজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী দন্তমঞ্জন থাকিতে আপনি কেন অপকৃষ্ট বিলাতি ব্যবহার করেন? ইহার গুণ যেমন অধিক, মূল্যও তেমন অল্প। একদিন ব্যবহারেই প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন আর কখনও প্রস্তুত হয় নাই। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দন্তমঞ্জনের গুণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশংসাপত্র।

মেদিনীপুর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ মহোদয় বলেন যে "আমি বি দাসের টুথ-পাউডার ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। ইহা দ্বারা মাড়ির ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়।"

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সেকসনের কিউরেটার শ্রীযুক্ত ডি, হুপার মহোদয় বলেন যে "আমি বাবু বি, দাস কর্তৃক প্রস্তুত টুথ পাউডার রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম যে ইহা দন্তরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নির্দ্দোষ উপাদান সমূহ দ্বারা প্রস্তুত এবং অত্যন্ত সুগন্ধ।"

মূল্য প্রতি কৌটা ৶০ আনা।

ঠিকানা—বি, দাস। ৫নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান টুথ প্রিজার্ভার।

যাবতীয় দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ॥০।

এজেণ্ট—এ, এম, জান।

বোম্বাইটার স্বদেশী সিগারেট কোম্পানি ১০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের ধাতু সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ ও নিত্য মেহ প্রমেহ স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং শক্তিবর্দ্ধক অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য ৩২ বটিকায় এক কৌটা এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা পুলিসকোর্টের মোকদ্দমা হইতে [illegible]

[illegible]

কামশাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনামূল্যে ডাকমাশুলে পাইবেন।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১৬৬ হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুর্ণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [আষাঢ় ১৩১৪ সাল

গৃহলক্ষ্মী।

পুরুষও রমণী লইয়াই সংসার। এই সংসার-রূপ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীগণ পুরুষের দক্ষিণ হস্ত। তাঁহারা মাতৃরূপে আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন, ভগিনীরূপে স্নেহ করিতেছেন, মমতা দেখাইতেছেন, পত্নীরূপে জীবনের সঙ্গিনী হইয়া আছেন। রমণীগণ অশেষ প্রকারে পুরুষের কল্যাণসাধন করিতেছেন। এই রমণী সমাজের প্রতি প্রত্যেক পুরুষেরই সবিশেষ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করা উচিত। আমার বিশ্বাস অন্যান্য সভ্য প্রদেশের ন্যায় আমাদের দেশও রমণীগণের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনে ন্যূন নহে। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমাদের দেশ রমণীগণকে 'গৃহলক্ষ্মী' এই যে বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন, ইহা হইতেই উপলব্ধি হয় কি উচ্চ ও পবিত্রভাবের সম্মান স্ত্রীসমাজকে প্রদান করা হইয়াছে। ফলতঃ রমণীগণ প্রকৃতই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী দেবী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমাদের ঈদৃশী হিতকারিণী রমণী-গণের সুশিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের উপর সন্তানগণের লালনপালনের ভার রহিয়াছে সংসার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। যে শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে শিক্ষা কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নহে। এই নিয়মের বৈপরিত্য বশতঃই বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এই শিক্ষা বিভ্রাটের দিনে, এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়, মহারাষ্ট্র দেশীয় এক বীর রমণী অধঃপতিত বঙ্গ-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুকুমারীগণের

শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই বীর রমণীর নাম মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী। কয়দিন হইল রমণীর কর্ম্মের অবসান হইয়াছে। আর এই প্রাতঃস্মরণীয়া তপস্বিনী ইহ সংসারে নাই। কিন্তু তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, তাঁহার পবিত্র নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী।

বঙ্গদেশে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি।

যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য যশঃ সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি লোকহিতার্থে আজীবন ব্রহ্মচারিণী সেই নিখিল জনগণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী অলৌকিক প্রতিভাশালিনী রমণীকুলভূষণা, পরদুঃখকাতরা যথার্থে ও পরহিতে উৎসর্গীকৃত জীবনা প্রাতঃস্মরণীয়া তপস্বিনী মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী সেই ভগবতী তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করাইয়া সুরধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ন্যায় শক্তিশালিনী নারীর বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যভূমিতে অতি বিরল। ইহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের অনেক স্থান বিশেষতঃ "মহাকালী পাঠশালা" অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়। স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই, আর যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে। অতএব উন্নতি যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা অতীত যুগের স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, জাতি ও দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ভারত অতীত গর্ব্বের স্থল। প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত দেশেরই অতীত ইতিহাস এখন গল্প বা স্বপ্নবৎ। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভারতীয় মহিলা জাতিও চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখনও তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদিগকে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আদেশ করিতেন, তাঁহারই কৃপায় এই বঙ্গদেশে ও অন্য বিভাগের উপরে আমাদের আবার আশা জাগিয়াছে।

কোন দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে সে দেশের রমণীকুল কতদূর উঠিয়াছে। যে দেশের নারীকুল উঠিতে পারে নাই, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয় নাই। কারণ নারীলোক সমাজের অর্দ্ধ শক্তি। সুতরাং রমণী দুর্ব্বল থাকিলে সে সমাজ কখন সবল হইতে পারে না। এখানে যে বলের উল্লেখ করা হইল, তাহা শুধু শারীরিক বল নহে, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বল। এই তিন প্রকার বল স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই পূর্ণ বিকাশের পরিণাম। স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই বিকাশপ্রবণ, সুতরাং তাহাকে বিকশিত হইতে দেওয়া উচিত। এই বিকাশের গতি রোধ করা জগৎ স্রষ্টার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। সুতরাং অধর্ম্ম। বিশেষতঃ একের বিকাশ অপরের বিকাশ সাপেক্ষ। বিধাতার এমনই সৃষ্টি কৌশল, যে পাছে প্রকৃতি পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাঘাত সম্পাদন করে, এইজন্য প্রকৃতি

পুরুষকে তিনি অনন্য সাপেক্ষ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং একের অধোগতি অপরের ঊর্দ্ধগতির বিঘ্নকারিণী। যেখানে পরস্পর—সংলগ্ন প্রকৃতি পুরুষের বল সমান, অথচ গতি ভিন্নমুখী সেখানে পরস্পরের বল পরস্পরকে ক্ষয় করিবে। কিন্তু যদি উভয়েরই গতি ঊর্দ্ধমুখিনী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে দ্বিগুণ বল পাইবে। সুতরাং উভয়ের ঊর্দ্ধগামিনী গতি ও দ্বিগুণিত হইবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশের স্ত্রী ও পুরুষের বলের গতি বিপরীত গামিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশিক্ষা-নিবন্ধন মহিলাগণ প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধিনী, সুতরাং পুরুষের ঊর্দ্ধমুখিনী গতি নারী জাতির অধো-মুখিনী গতি দ্বারা নিরন্তর প্রতিহত হইতেছে। এইজন্য এত চেষ্টা সত্বেও আমাদের দেশের অতি অল্পই উন্নতি হইতেছে। এই বিপরীত গতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

স্ত্রীজাতিকে ঊর্দ্ধগতি প্রবণ করিবার জন্য মাতাজী জগতের পুরাণাদি ইতিহাস হইতে অতীতের রমণী রত্নের চিত্র লইয়া মহাকালী পাঠশালার কুমারীদিগকে উপহার দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। এই রমণীগণের চরিত্র শ্রবণে ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী মাতৃ স্বরূপ সুকোমল মতি বালিকাবৃন্দ যে নিশ্চয়ই উন্নত হইবেন—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মাতাজী বঙ্গমহিলাগণের সম্মুখে যে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র যে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থল এরূপ নহে, অনেক বিষয়ে পুরুষগণেরও আদর্শস্থল। আত্মোৎসর্গে পুরুষ জাতিকে ইঁহাদের নিকট নিশ্চয় মস্তক অবনত করিতে হইবে।

পারিবারিক ধর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, বিনয়বিহীন ধার্ম্মিক, মীন-হীন সরোবর ও তরু-হীন জনপদ অনুশোচ্য; সতীত্ব-বিহীন রমণী ততোধিক অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত্য ব্রত অতি কঠোর। এই ব্রত আত্মোৎসর্গের পূর্ণ বিস্ফুরণ। প্রকৃত পাতিব্রত্য কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে; আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্ব ও সেই আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্বের বাহ্য-ক্রিয়া—এই দুইটী ইহার অঙ্গীভূত। যখন আর্য্য-ভূমিতে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল,—স্ত্রীজাতির আপন আপন আদর্শপতি নির্ব্বাচনে অধিকার ছিল,—সেই পবিত্র সরল ও সত্যনিষ্ঠ পুরাকালেই ভারতে সতীত্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই সতীত্বগুণে ভারতললনা—চিরদিন জগতের আদর্শ-রূপিনী আছেন।

সতীত্বগুণেই পতিকে দেবভাবে পূজা আর কোন দেশের মহিলা কখন করিয়াছিলেন কি না জানি না। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, গিরিসুতা—সতী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী—প্রভৃতি আর্য্য-ললনাগণ চরিত্রের আদর্শে ও সতীত্বের উজ্জ্বল মহিমায় জগৎ বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের আধুনিক ইতিহাসেও রাজপুত রমণীগণের সতীত্বের অমিত তেজ ও আত্মোৎসর্গের—বীরত্বের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পদ্মাবতী, দুর্গাবতী প্রমর রাজপত্নী, পৃথ্বিরাজমহিষী, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী, কর্ণাবতী এবং তারাবাই প্রভৃতি বীর রমণীগণ আত্মোৎসর্গে ও সতীত্বরূপ চরিত্র গৌরবে অদ্যাপি জগতের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। রমণীর সতীত্ব ও আত্মোৎসর্গ পারিবারিক ও জাতীয় সুখের নিদানীভূত বলিয়া তপস্বিনী মাতাজী আমাদের বাঙ্গলায় আসিয়া সেই সকল আদর্শ সতীর ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণা রমণীকুলের ছবি তুলিয়া বঙ্গকুল বালিকাগণকে উপহার

দিবার জন্য সক্ষম করিয়া স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয় মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য, সমনীতি ও কুশলতা প্রভৃতি গুণে এবং আধ্যাত্মিক উৎসর্গে — যাঁহারা ললনাকুলের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগেরও ছবি আঁকিয়া উপহার প্রদান করিয়া পবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।

প্রায় বিংশতি বৎসর গত হইল তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বঙ্গদেশে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিয়াছেন। পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্মে অবশ্যই তিনি গভীর নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁহার শ্রদ্ধা বড় ছিল না। এ দেশে ধর্মবন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মাতাজী মহারাণী অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্মাহত হইতেন। এ দেশের সাধু তপস্বীগণ সাধারণতঃ জনসংসর্গে বিমুখ, কিন্তু সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী নারী হইয়াও তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী পরম লোক হিতকর স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যে এত মনোযোগী হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় মহিলাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্যই তিনি প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইল মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। "মহাকালী পাঠশালা" তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের ফলে এখন এ দেশে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার প্রতি পল্লীতে, হাবড়া কাশুন্দিয়া, সাঁতরাগাছী, বরাহনগর, পানিহাটী, শান্তিপুর, নদীয়া, পাবনা, বহরমপুর, কাশী, রাওয়ালপিণ্ডী প্রভৃতি ২০।২৫টী স্থানে মহাকালী পাঠশালার শাখা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বালিকা এই সকল পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। একটী তেজস্বিনী নারীর কেবল একমাত্র বাঙ্গালা দেশের এইরূপ কার্য্যকারিণী শক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভারতের প্রায় সর্বস্থানেই তাঁহার একটী না একটী কীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কখন কখন সহস্রাধিক টাকা তপস্বিনী মাতাজী নিজ তহবিল হইতে সাহায্যদান করিতেন এবং তদ্দ্বারা কেবল মাত্র বঙ্গদেশের এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। জানি না—সন্ন্যাসিনী এই অর্থ কোথায় পাইতেন। তবে ইঁহার ন্যায় তপস্বিনীদের অর্থাভাব না হইবারই কথা। বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এই চেষ্টার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

যাঁহারা একদেশদর্শী ও সবিশেষ শাস্ত্রচর্চ্চাবিহীন তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহাদের হৃদয়কন্দর কুসংস্কারান্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানসূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ না হইলে সে অন্ধকারজাল ছিন্ন হইবে না। মাতাজী তপস্বিনী তাঁহাদিগকে দুই একটী কথায় এমন যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, বালিকা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রথমে যে অযথা মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর হইয়া গেল। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষের সনাতন বেদোক্ত ধর্ম্মের বিরোধী। তাঁহারা আর্য্যসন্তান বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্যদিগের কার্য্যকলাপের অনুসরণে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের বেদে কি লিখিত আছে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধিৎসা বর্জ্জিত। অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যমহিলাগণ কীদৃশী সুশিক্ষালাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

পুরাকালে আমাদের এই বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা

পুস্তক পড়িতেন না, অথবা অক্ষর আঁকিতে জানিতেন না ; কিন্তু তাঁহাদের গৃহস্থালি বা গার্হস্থ্য উপযোগী শিল্প অথবা সিবন, বিনয়, নম্রতা, সদাচার পূজা পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রমণীগণের প্রকৃত শিক্ষা হয় না; আর এরূপভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে প্রকৃত শিক্ষা হওয়ারও কখন সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতার তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞান নাই যে, কন্যাকে ধর্ম্মকথা শুনাইবেন। পূর্ব্বে কথকতা প্রণালী প্রচলিত থাকাতে রমণীগণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণিত সদুপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চভাব লাভ করিতেন, কিন্তু এখন সে পদ্ধতিও লুপ্ত প্রায়। প্রাচীনা রমণীগণ উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা জানিতেন ; কন্যা কি বধূর কোন ত্রুটি দেখিলে, তাহা আওড়াইয়া, তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন,—এই সকল ব্যাপার মাতাজী মহারাণী যখন কলিকাতা ও বঙ্গদেশে প্রথমবার আগমন করিয়াছিলেন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখনকার রমণীরা সে সকল উপদেশপূর্ণ বাক্য গ্রাহ্য করেন না তাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়াছেন, নানা রসের উপন্যাস ও নাটকাদি পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন; এখন কি আর সে সকল বাজে কথা ভাল লাগে ? প্রাচীনা রমণীগণ অনেক গুণে বিভূষিতা ছিলেন, গৃহকার্য্য তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য লোকে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। প্রাচীনা রমণীগণ পরদুঃখে কাতরা ও পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইংলণ্ড মার্কিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহারা বলেন, বালক এবং বালিকাদিগের শিক্ষাগত কোন পার্থক্য থাকা বিধেয় নহে। কিন্তু তপস্বিনী মাতাজী বলিতেন, বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই স্ত্রীশিক্ষা যে প্রাচীন আর্য্যেরা কিরূপভাবে প্রদান করিতেন, তাহা এখন আর কেহ দৃষ্টিগোচর করেন না। আর্য্যগণ যখন স্ত্রীশিক্ষা দিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সে স্থলে যে প্রকারে হউক বালিকাগণকে শিক্ষা দিলেই হইল ইহাই আমাদের দেশের অনেকের ধারণা। ফলতঃ কি প্রণালীতে, কি কি শিক্ষা দিলে, আর্য্যমহিলাগণের হৃদয় অধিকতর পবিত্র ও প্রশস্ত হইবে, সে সম্বন্ধে প্রায় কেহই চিন্তা করেন না। এখন কেবল বঙ্গদেশে নয় ভারতের অন্যান্য দেশের রমণীগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু নরনারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিলে পরিণামে তাহারাও বালকদিগের ন্যায় হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক। বর্ত্তমান শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। অধুনা ভারত গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বশ্রেণীর মহাত্মাগণই আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের চরিত্রে বিহিনতা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। যে শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালক এবং যুবকগণের চরিত্রে দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা হিন্দু মহিলার হৃদয় আরও পবিত্র ও উন্নত হইবে,—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের এক প্রকার পরম শত্রু। পুরুষের

শিক্ষালাভার্থ কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা অত্যন্ত মানসিক চিন্তা এ সমস্তই রমণীর পক্ষে বর্জনীয়। কারণ ঐ সকল কার্য্য দ্বারা নারী জীবনের সার প্রধান ও মহাপ্রধান উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও তাহাদের প্রতিপালন শক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, নারীদের মস্তিষ্কের আত্যন্তিক আলোচনায় তজ্জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পরিপূরণের জন্য স্ত্রীজাতির অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, সুতরাং রমণীগণের অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে তাহাদিগের মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় না। অতএব তাঁহাদের দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি সদ্গুণরাশি যাহাতে বৰ্দ্ধিত ও বিকসিত হয়, তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে হিন্দু মহিলাগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা না পাইয়া এবং বিজাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদিগের বালিকারা বিজাতীয় রীতিনীতির অনুকরণপ্রিয়া ও জাতীয় রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহারে আস্থাবিহীনা হইয়া উঠিতেছেন।

যাহারা নরনারীর প্রকৃতির বিভিন্নতা অস্বীকার করেন তাঁহাদিগকে একদিন আমাদের মাতাশ্রী মহারাণী কহিলেন, তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল এবং উল্লিখিত যুক্তিধারা তাঁহাদের উহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। মাতাশ্রী তপস্বিনী বলিলেন, নারীপ্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবণ হইলেও তাহে পুরুষের প্রাধান্য প্রত্যক্ষ, অতএব সমাজবিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান কেবল মাত্র পুরুষগণই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নারীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, চিন্তাশক্তি অল্প, কল্পনা প্রবণ। সত্য, তথাপি নারীর গভীর আত্মনিবেদনের শক্তি পুরুষদিগের তুলনায় ন্যূন। তবে তাঁহাদের গভীর আত্মনিবেদনের পথে একটা অন্তরায় আছে, এ কথা সত্য। যাহাদিগকে নিয়তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কর্ম্মে এবং শিশুপালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে আত্মনিবেদনের অভ্যাস হওয়া কঠিন ব্যাপার। পুরুষের সুযোগ সুবিধা অনেক এবং এই হেতু একের প্রাধান্য ও অপরের অক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়াছে। নারীপ্রকৃতির অন্য এক বিশেষত্ব বাৎসল্যভাব হইতে নারীর আত্মসম্প্রদান। দয়া, স্নেহ, নিঃস্বার্থ নিঃস্বার্থতা, পরহিতৈষিতা, আত্মত্যাগিতা এ সমুদায়ই নারীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। শিক্ষা ও সদনুষ্ঠানিক ভাব সকলের বিকাশের সহায়তা হইতে পারে, বিপরীত শিক্ষার দোষে তাহার বিকৃত হওয়া সম্ভব। নারীজাতির অনেক দুর্ব্বলতা ও দোষ যে কুশিক্ষার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভীরুতা, চিত্তের দুর্ব্বলতা, মনের ক্ষুদ্রতা, আত্মপরায়ণতা প্রভৃতি যে সকল দোষ বালিকাগণের কুশিক্ষার ফল। কিন্তু আমাদের আধুনিক বালিকা শিক্ষার যেরূপ প্রণালী তাহাতে আচরে আমাদিগের দেশে অনাচার, অনাচারিতা ও ব্যভিচার ঘটিবে; কারণ আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে সমুদায় বিদ্যালয় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার কোনটিতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয় না, অথবা বালিকাদিগকে রন্ধন সেবা, পতিভক্তি এবং হিন্দু শাস্ত্রীয় মোটামুটি পূজা পাঠাদি গার্হস্থ্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয় না। অঙ্গনাদিগের শিল্পশিক্ষা যত্ন। অভ্যাস ধর্ম্মশিক্ষা ততোধিক প্রয়োজন। বালিকাদিগের যেই বিদ্যা সহিত কিছু ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে তাহা কখনও বিষময় হইয়া উঠে। কিন্তু হিন্দু বালিকাগণ শৈশবকালে বিজাতীয় ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, গৃহস্থালী, পাকশিক্ষা প্রভৃতিতে বিশেষ দক্ষতালাভ করিতে পারেন না,

অথচ অনেকেরই মুখে শুনা যায় যে, বালিকাগণ লেখা পড়া শিখিয়া যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় সুচারুরূপে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বঙ্গের অধিকাংশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে, প্রায় অনেক স্থলেই উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণ সেই প্রাচীন আর্য্য মহিলাদের ন্যায় সুচারুরূপে অথচ অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু যে স্থলে ম্লেচ্ছ শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে কুশিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকেই আবার নানারূপ বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন।

নারীজাতির শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে নারী-প্রকৃতির আলোচনা প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু নরনারীর প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই কেন থাকুক না, যথার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষায় নরনারী ভেদ থাকে না। নারীর প্রকৃতির পার্থক্য উল্লেখ করিয়া যাঁহারা তাঁহাদের উন্নত শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, স্বর্গীয়া দেবী মাতাজী বলিতেন—যে, ঐ সকল ব্যক্তি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র বিষয়ে যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয় তাঁহাদিগের চিত্তকে উন্নত অবস্থায় রক্ষা করিতে হইলে, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। এই উচ্চ অঙ্গের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা কেবল মাত্র পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী মহাকালী পাঠশালায় দেখাইয়া গেলেন। কেহ কেহ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের এরূপ শিক্ষালাভ সমাধা হইতে পারে না বলিয়া মনে করিতেন। কারণ সাধারণের নিকট ইহা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন ঐ সকল ব্যক্তি মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া যাইলেন তখন মাতাজী মহারাণীকে মনুষ্যরূপধারিণী দেবী না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

গার্হস্থ্য জীবন এবং নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সকল দেশেরই সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক। জাতীয় উন্নতি বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শিশুগণ গৃহে জননীর নিকট যে শিক্ষালাভ করে তাহাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া গণনা করিতে হয়। নারীগণের চিন্তা এবং জীবন উন্নত না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত মহত্ত্বলাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। জননীই সন্তানগণের হৃদয়ে যথাসময়ে মহত্ত্বাবের বীজ রোপণ করিতে সক্ষম হন। মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানেরা সুশাসিত হয়, তাহারা শৈশবকালেই অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না। মাতা অশিক্ষিত হইলে সন্তানের সম্মুখে সকল প্রকার আলাপ করিতে থাকেন। এইরূপে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকগণ অনেক সময়ে তাঁহাদের অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা সন্তানের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, যে মাতা নিজেই শিক্ষা করেন নাই, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করিবেন? তিনি তাহার লালনপালনের ভার লইতে সক্ষম, কিন্তু তাহাকে শাসন করিতে একেবারে অক্ষম। এই জন্য আমাদের দেশে অনেক সন্তান আদরেই নষ্ট হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইলে এই ভয়াবহ দোষটী আমাদের দেশ হইতে নিশ্চয়ই দূর হইবে। ইহা সেই তপেশ্বরী আমাদিগকে ভূয়োঃভূয়ো বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা যে এক সময়ে বিশেষ উন্নত ছিল, প্রাচীন সাহিত্য পুরাণাদি তাহার সাক্ষী। বেদের ঋষিপত্নীগণ, গার্গী, অরুন্ধতী,

শাণ্ডিলী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি মনস্বিনী রমণীগণের নাম সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইঁহাদের কি জ্ঞান গরিমা, কি কঠোর বৈরাগ্য, কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, কি মধুর সহানুভূতি এই দেব প্রকৃতি নারী সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিয়া প্রাচীনকালে ভারতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্বে মাতাই নিজ বালিকাগণকে শিক্ষাদান করা স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে মনে করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে মাতার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সে প্রথা একেবারে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অধুনা দেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দেখিতেছি যাহা পুরুষের শিক্ষণীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা পাইতেছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের উভয় জাতীয় শিক্ষা না হইলে, সংসারের কখনই উন্নতি হইবার আশা নাই। গৃহস্থালি, গার্হস্থ্য শিল্পাদি পাকবিদ্যা ও পূজা পাঠাদি, এই সকল স্ত্রীলোকের প্রধান ও অবশ্য শিক্ষিতব্য। বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে এ সকলের অভাব-বশতঃ সমাজ নানা প্রকারে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পতিব্রতা ধর্ম্মই আর্য্যমহিলার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা ও ধর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমান রাজা আমাদের বিজাতীয়, তাঁহাদের ধর্ম্ম রীতি, নীতি ও সামাজিক অবস্থা হিন্দুদের হইতে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। বালক ও যুবকগণ বাধ্য হইয়া শৈশবকাল হইতে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু মহিলাদিগকেও কেন সেই বিজাতীয়ভাবে, বিজাতীয় শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্ত্রীপুরুষের উভয়েই যদি শৈশবকাল হইতে বিজাতীয় ভাষা ও বিজাতীয় রীতিনীতির অনুকরণ করেন, তবে এ দেশে জাতীয় উন্নতি যে কখনও হইবে না তাহা কোন্ সহৃদয় মহাত্মা অস্বীকার করিবেন?

মহারাণী মাতাজী তপস্বিনীর পরিচয় সকলেই জ্ঞাত আছেন সহযোগী "যুগান্তর" বলিয়াছেন তিনি আরকোট রাজবংশ সম্ভূত এবং দক্ষিণের বিন্ধ্যকুলচূড়ামণি যে মহাপুরুষের নামে ইংরাজ সরকার এখনও চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন ইনি সেই মহারাষ্ট্র বীরপুঙ্গব মহা তেজস্বী নানাজের কুমারী। মাতাজী অদ্বিতীয়া শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। অশ্বারোহণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন; নেপালের বীরগণ তাঁহার নিকট অশ্বচালনা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমরা মাতাজী মহারাণীর জীবনের অপরাপর অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। এই সংখ্যায় কেবল তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ মাত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

(সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

যামিনী।

হাসে নিশিথিনী, চম্পকমালিনী,
যেন দেববালা, রূপে উজলা,
কহিনূর মণি দিয়া মাথায়।
সহাস্য আননে, মৃদুল গমনে,
সুনীল অম্বরে, তারকা নিকরে,
কি সুন্দর সাজে ঢাকিল কায়।
দেখলো যামিনী, মুগ্ধকুমুদিনী
সলিল দর্পণে, হরষিত মনে,
সাধের সজনে কহি তোমায়।
কেবা হেন আছে, হারী তব কাছে,
শশী তারাগণি, অগণ্য যে আছে
সাজাইল কে দিয়ে এ সবায়।

মৃদুল সমীর, ব্যজনে সুধীর,
মৃদু মন্দ ভাবে, তান সেবা পাবে,
এমন আরাম আছে বা কার।
নিদাঘে তাপিলে, মলয় অনিলে,
সহসা আসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
করে ক্লেশ দূর সুখ অপার।
ফুল্ল ফুল দল, অতি নিরমল,
ভেটিয়া সৌরভ, তোমার গৌরব,
যতন করিয়া কত বাড়ায়।
খদ্যোত আসিয়া, সিথী বিরচিয়া,
তব শির পরি, অবস্থান করি,
অপূর্ব্বরূপে সাজায় তোমায়।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ রবে, ঝিল্লী যত সবে,
শুভ অবসরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
গাইছে ধরিছে আনন্দে তান।
নীরব নিশায়, ঝিল্লীগণ গায়,
বিহঙ্গম সবে, সুমধুর রবে,
যাবৎ প্রভাতে না ধরে গান।
নিদ্রার প্রসাদে, কোলাহল নাদে,
নাহি শুনা যায়, মোহন মায়ায়,
যেন অচেতন রয়েছে সবে।
ঘোর অবসাদ, নাই কলনাদ,
অথবা প্রমাদ, গভীর বিষাদ,
ঢালিয়া দিয়াছে নিখিল ভবে।
যেই জন স্থান, উন্মত্ত সমান,
এবে সে আরাম, লভে অবিরাম,
হয়ে জ্ঞান হীন আছে শয়নে।
নিশাচর প্রাণী, করি কানাকানি,
লভিতে আহার, করয়ে বিহার,
দিক দিগন্তরে অতি গোপনে।
শুভ অবসরে, প্রশান্ত অন্তরে,
যত যোগীদল, সুকবি সকল,
ভাবপূর্ণ মনে সুখে কাটায়।
গভীর নিশিথে, পাপী তাপী চিতে,
ঘোর অনুতাপে, হৃদয়ের তাপে,
নয়ন আসার বহিয়া যায়।
পায় সে রতন, যাঁহার কারণ,
উৎসৃষ্ট জীবন, মোহের কানন,
করি উৎপাটন জ্ঞানাস্ত্র ক্ষেপণে।
হে শুভে যামিনি, আরাম দায়িনি,
দুঃখ বিনাশিনি, শোক সংহারিণি,
নিদ্রায় কর সুখী দীন জনে।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরমা নদীর সঙ্কীর্ণ খাতের উভয় পার্শ্ব জলজঙ্গল সমাচ্ছন্ন, মধ্যে শীর্ণ জলধারা ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর উচ্চ পাহাড়ে অনেক গুলি ছোট বড় পল্লী অবস্থিত, তন্মধ্যে বিজয়পুর একখানি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম। বিজয়পুরের অব্যবহিত পশ্চিমে বেজপুর। বেজপুরও সুবিখ্যাত পল্লী। উভয় গ্রামই অধুনা সুরমার উত্তর তটে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে; পূর্ব্বে নদীর গতি এবং গ্রামদ্বয়ের সংস্থিতি অন্যরূপ ছিল। তখন বেজপুর সুরমার উত্তর তটেই অবস্থিত ছিল কিন্তু বিজয়পুরের দক্ষিণে নদী ছিল না। নদী পশ্চিম দিক্ হইতে সরল রেখায় চলিয়া আসিয়া বেজপুর গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া বিজয়পুরের পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বদিক বেষ্টন করত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত ছিল। সুরমা শাখা নদী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মাতৃ নদীর সহিত সুরমার সম্বন্ধ দূর হয় নাই। সুতরাং নদীর আয়তন খুব প্রবল

ছিল। ৯৯৯ বঙ্গাব্দের বন্যার জলে দেশ ভাসিয়া যায়। বন্যাবাহিত প্রভূত বালুকারাশি বেজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত নদীর বাঁকে জমিয়া বন্যার জলের গতিরোধ করে। জলরাশি বাধা পাইয়া বিজয়পুরের দক্ষিণ পার্শ্বে খাত কাটিয়া পুরোবর্ত্তিনী পূর্ব্বদিগ্‌ বাহিনী নদীতে পড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। তদবধি সুরমার জলস্রোতঃ বিজয়পুর ঘুরিয়া প্রবাহিত হইত না। কালক্রমে বিজয়পুরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের নদী মজিয়া পুরিয়া উঠিয়াছে; উত্তরদিকে স্থিত নদীর অংশ একটা বিস্তীর্ণ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। লোক সেই জলাশয়কে বিজয়পুরের বাঁওড় বলে।

বিজপুর আর বেজপুর বহু নরনারীর বাসক্ষেত্র। পূর্ব্বে গ্রাম দুখানি নদীর এপারে ওপারে অবস্থিত ছিল। ৯৯৯ সালের বন্যার পর, নদীর ব্যবধান দূর হইলে উভয় গ্রাম সম্মিলিত হইয়া এক বিপুল সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামদ্বয়ের অবস্থা ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। বিজয়পুর বেষ্টিত নদীর উভয়তীরে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, শাঁখারি, কাঁসারি প্রভৃতি শিল্পিগণ এবং নানা শ্রেণী ব্যবসায়িবর্গ পাড়া বাঁধিয়া বাস করিত। নদী মজিয়া গেলে তাহাদের কার্য্য সৌকর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিল এবং স্থানে স্থানে বিষম জলকষ্ট উপস্থিত হইল। বিজয়পুরের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তি জনগণের জলকষ্ট ছিল না, তাহারা বাঁওড়ের জল ব্যবহার করিত। কিন্তু বদ্ধজল ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। তজ্জন্য গ্রামের উত্তর পাড়ায় নানা রোগ সংক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১০১৬ বঙ্গাব্দে উক্ত উভয় গ্রামে মহামারি উপস্থিত হয় তাহাতে প্রায় দুই সহস্র নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জয়নারায়ণ রায় ভূষণপুর পরগণার ইজারাদার ছিলেন। তিনি বিজয়পুরের অধিবাসী। রায় মহাশয় খুব প্রতাপশালী এবং ধনী লোক ছিলেন। মহামারির সময়ে তিনি লোকের উপকারের জন্য চেষ্টা করিতে ক্রটী করেন নাই। বেজপুরে তখন অনেক বৈদ্যের বাস ছিল। কয়েকজন কৃতবিদ্য কার্য্য কুশল চিকিৎসকও সে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারও সেই দুঃসময়ে আর্ত্তের উপকারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ গ্রাস করিয়া মহামারি প্রশমিত হইয়াছিল।

মহামারি প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু একটা তমোময়ী বিষাদচ্ছায়া সমস্ত নরনারী মুখে অঙ্কিত রহিল। কেহ পুত্রহীন হইয়াছে, কাহারও মেয়ে মরিয়াছে, কেহ কেহ বা পুত্র কন্যা উভয়ই হারাইয়াছে। কেহ মাতৃহীন, কেহ পিতৃহীন, কাহার কাহার মাও গিয়াছে বাপও মরিয়াছে। অনেকেই ভ্রাতা ও ভগিনীর শোকে ম্রিয়মাণ। কেহ মনোবৃত্তানুসারিণী মনোরমা ভার্য্যার শোকে বিমর্ষ, কোন হতভাগিনী বিধবা হইয়াছে। সকলেরই মন বিষণ্ণ, শরীর অবসন্ন। যাহারা মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘকাল যাবৎ ফিরিয়া পায় নাই। অনেকের দেহে রোগের শেষ রহিল। কেহ প্লীহাগ্রস্ত, কাহারও শরীর যকৃদ্ দোষ দুষ্ট, খোস পাচড়া অনেকেরই অঙ্গ ভূষণ হইয়া রহিল। বেলা শেষে সকলেরই শরীর অবসন্ন হয়। জনসংঘ নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম এবং জড়প্রায় হইয়া রহিল। অধ্যাপকের টোলে ছাত্র আসে না, গ্রামের পাঠশালা গুলিও বন্ধ হইয়া গেল।

ইজারাদার জয়নারায়ণ রায় মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। সে বছরের পৌষ কিস্তির খাজনা নিজ তহবিল হইতে সারিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রজাবর্গের যেরূপ অবস্থা তাহাতে চৈত্র কিস্তির খাজনা আদায় হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি সুজাগঞ্জের তহশিল দারকে জানাইলেন যে, চৈত্র কিস্তির খাজনা আদায় হইবে না। প্রজা-বর্গের অবস্থা অতি মন্দ। কৃষকেরা চাষ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তাঁতিরা তাঁত বন্ধ করিয়াছে এবং অন্যান্য শিল্পজীবী ও ব্যবসায়িরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তারপর বর্ত্তমান বাঁওড়ের উত্তরে যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড রহিয়াছে, নদী মজিবার আগে তাহা আওয়ান শস্য ক্ষেত্র ছিল। এখন ফাল্গুণ চৈত্র পর্য্যন্ত সেই বিশাল ভূমিখণ্ড জলমগ্ন থাকে সুতরাং কোন ফসলই তাহাতে জন্মে না। এই সকল কারণে আদায় তহশিলের ব্যাঘাত ঘটি-তেছে। এ বিষয়ে হুজুরের কৃপা প্রার্থনীয় তহশিল দার উত্তরে জানাইলেন যে আমি দুনিয়ার মালিক নহি, কিস্তি কিস্তি আমাকে নবাব সরকারে খাজনা পাঠাইতে হয়। তুমি যেমন করিয়া পার চৈত্র কিস্তির খাজনা যথাসময়ে পাঠাইবে। কড়া তাগিদ আরম্ভ কর। সুতরাং গাঁয়ে তহশিল হইতে লাগিল। দেশে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল।

শ্রীশীতলচন্দ্র কবিরত্ন।

কর-বিজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়।

করতল এবং হস্তাঙ্গুলী।

——(*)——

অঙ্গুলীর তুলনায় করতলের আকৃতি বিচার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরি-মাণ দেওয়া যাইতে পারে না; কিছুকাল অভ্যাস-দ্বারা যথার্থ পরিমাণ সহজেই আয়ত্ত হইবে। খর্ব্ব অঙ্গুলী চিন্তা এবং কার্য্য বিষয়ে দ্রুততা ও হঠ-কারিতার পরিচয় দেয়। খর্ব্বাঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তি সমুদয় ঘটনা সমষ্টিকেই গ্রহণ করিয়া, ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করে।

দীর্ঘ অঙ্গুলীতে খুটীনাটী করিয়া দেখিবার শক্তি বুঝায়; সূক্ষ্ম বিষয় অনুশীলনে তৎপর; সহজেই বিরক্তি এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়। করতল ও অঙ্গুলী দীর্ঘে সমান হইলে স্বভাবও সমভাবাপন্ন হয়; সুতরাং, তাহারা অংশ ও সম্পূর্ণ উভয়ই নিখুঁতভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। করতলের সীমা মণিবন্ধের প্রথম রেখা হইতে মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত, এবং অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে হইলে মধ্যমার অগ্রভাগ হইতে করতলের পশ্চাদ্দিকস্থ শেষ গ্রন্থি পর্য্যন্ত লইতে হয়।

সরল, সুগঠিত এবং সমস্ত অঙ্গুলীর সহিত মনোজ্ঞভাবে সজ্জিত অঙ্গুলীকে "সুফলপ্রদায়ক" অঙ্গুলী কহে। অতি দীর্ঘ, অতি হ্রস্ব, অথবা বক্র-ভাবাপন্ন অঙ্গুলী "কুফলপ্রদায়ক" বলিয়া বুঝিতে হইবে।

করতল সম্মুখভাবে মুক্তাবস্থায় ধরিলে যে অঙ্গুলী অন্য সকল অঙ্গুলী অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকে তাহাকেই "বলবান" বলিয়া ধরিতে হইবে; এবং সেই অঙ্গুলীটী ও তন্নিম্ন "গ্রহ-স্থানকে" মানবচরিত্রের কুঞ্চিকা বলিয়া জানিবে।

বিভিন্ন অঙ্গুলী সমূহ যে যেরূপ গুণ প্রকাশ করে, তাহাদের ক্ষমতানুসারে গুণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করিতে হইবে।

তর্জ্জনী।

সুফলপ্রদায়ক—কর্ত্তৃত্ব।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্য)—অত্যাচার।

" " (খর্ব্ব)—দায়িত্বে অনিচ্ছা।

বক্র—আত্ম-সম্মান-বোধহীনতা।

মধ্যমা।

সুফলপ্রদায়ক—পরিণামদর্শিতা।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে)—বিষাদপ্রিয়তা।

" " (খর্ব্বে)—অব্যবস্থিতচিত্ততা।

বক্র—বায়ুগ্রস্ততা।

অনামিকা।

সুফলপ্রদায়ক—সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে)—দ্যূতপ্রিয়তা; আউতি খরিদ-বিক্রয়শক্তি।

" " (খর্ব্বে)—সৌন্দর্য্যবোধহীনতা।

খর্ব্বে—শিল্পসাহিত্যাদির নিষ্ফল আলোচনা।

কনিষ্ঠা।

সুফলপ্রদায়ক—বাণিজ্য সম্বন্ধীয় খরিদ-বিক্রয়ে বিশেষ পারদর্শিতা।

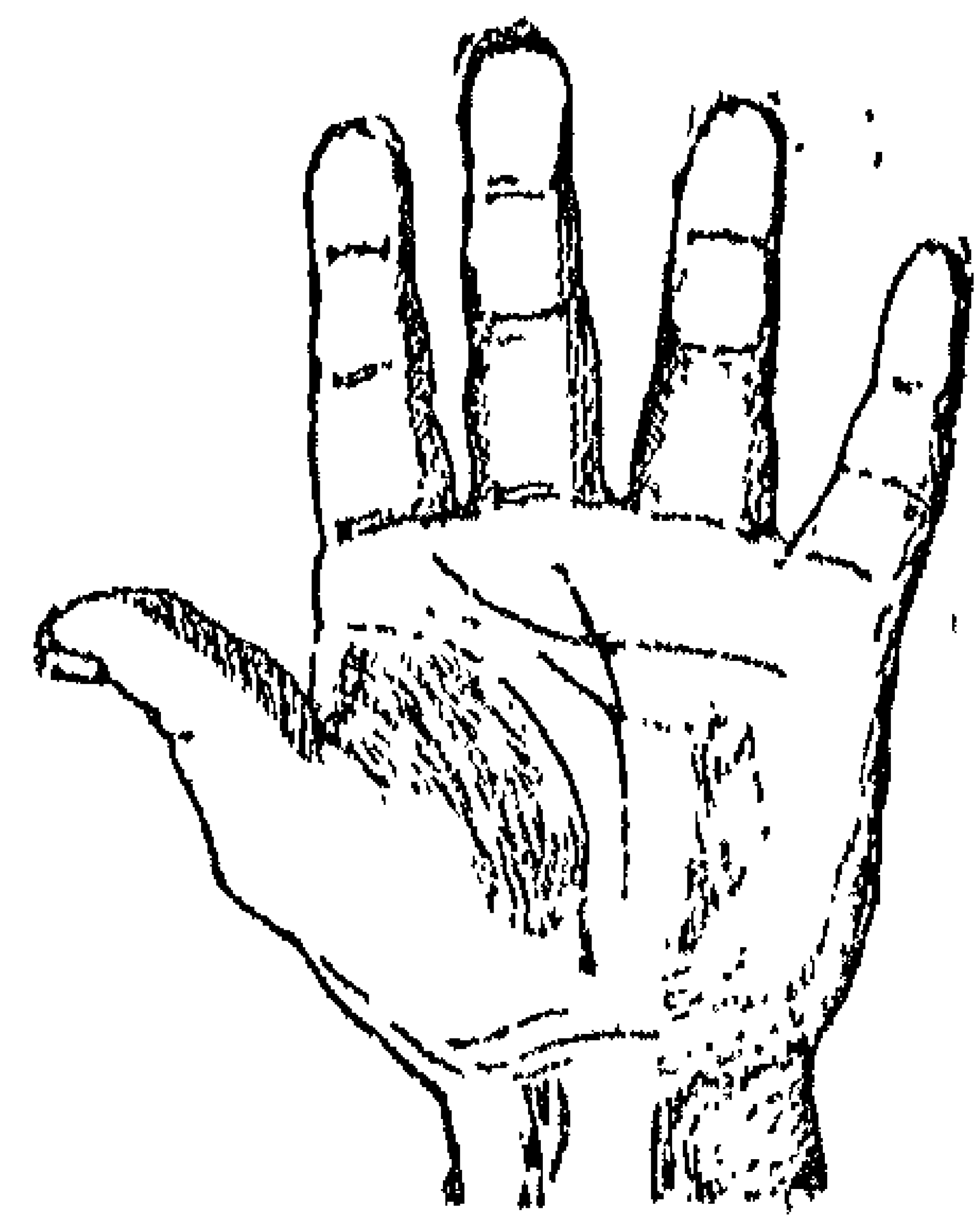
কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে—চাতুর্য্য।

" " (খর্ব্বে)—নির্ব্বুদ্ধিতা।

বক্র—কার্য্যতত্ত্বাবধারণে অক্ষমতা।

যদি অঙ্গুলী সকল সমরেখায় স্থাপিত হয় তবে জীবনের সফলতা জ্ঞাপন করে। যদি কোন অঙ্গুলী অপরগুলি অপেক্ষা কিছু নিম্নে স্থাপিত হয়, তবে তাহার কিছু গুণাবলীর হ্রাস বুঝায়। কনিষ্ঠাঙ্গুলী যদি নিম্নাবস্থিত হয় তবে অবস্থার প্রতিকূলতা জ্ঞাপন করে; সুতরাং তাহাকে জীবনসংগ্রামে রত থাকিতে হয়। তদ্রূপ তর্জ্জনী নিম্নাবস্থিত হইলে, অসামাজিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়। অনামিকা উক্তরূপ হইলে সাহিত্য শিল্পাদি শিক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। মধ্যমা কদাচ নিম্নাবস্থিত হয়।

ঘনসন্নিবিষ্ট অঙ্গুলী ও সংকীর্ণ করতল সামাজিক আচার ব্যবহার পালনেচ্ছা প্রকাশ করে। মঙ্গল, বুধ ও চন্দ্রস্থান (প্রথম অধ্যায়ের চিত্র দেখ) অপরিপুষ্টতার জন্য করতল সাধারণতঃ সংকীর্ণ হয়। সুতরাং সে সমস্ত লোকের সাহস, কল্পনাশক্তি ও প্রফুল্লতার অভাবদুষ্ট হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মঙ্গল, চন্দ্র ও বুধ যথাক্রমে সাহস, কল্পনাশক্তি ও প্রফুল্লতার পরিচায়ক; আবার, কখনও বা বৃদ্ধাঙ্গুলী করতলের অভিমুখে সংলিপ্ত থাকায় করতল সঙ্কীর্ণ দেখায়; কাজেই করতল হইতে অঙ্গুষ্ঠের দূরত্ব হ্রাস হওয়াতে অনপেক্ষী উদারতার বিঘ্ন প্রদান করে।



চতুষ্কোণ-করতল-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবনপ্রিয়; কিন্তু যদি ইহা কঠিন এবং সমতল হয়, তবে দৈহিক-ক্রীড়া-নিপুণতা ব্যক্ত করে।

রবি-চন্দ্রাদি গ্রহস্থানের পরিপুষ্টতাবশতঃ করতল প্রশস্ত হয়। করতলের মধ্যে যদি সমতল হয় এবং চতুর্দ্দিকস্থ রবিচন্দ্রাদি স্থানের সহিত সমকোণ হয়, তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিপুষ্ট বুঝিতে হইবে। এবং এইরূপ লক্ষণান্বিত ব্যক্তি সংসারে যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া

পরিণামে জয়ী হয়; এবং উক্ত ব্যক্তির বিবাদ ও কলহপ্রিয়তা বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে।

যাহার করমধ্যস্থল গভীর হয় সে ব্যক্তি ভীরু-স্বভাব, অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলে, এবং সহজেই ভগ্নোৎসাহ হয়। এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। যদি কোন বালকের হস্তে এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে তাহাকে কোন কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা পরিহাসাদি না করিয়া উৎসাহিত করিলে সুফল ফলে। এইরূপ লোক সামান্য পরিহাসেই মর্ম্মাহত হয় এবং তাহার প্রত্যেক উদ্যম-শীলতা শিথিল হইয়া পড়ে।

করতলের সর্ব্বত্র সুসঙ্গতি দেখা আবশ্যক। যদি কোন হস্ত চক্ষেও কোমল দেখায়, ফলতঃ দৃঢ় হয়, ইহা উদ্যমশীলতার পরিচায়ক। যাহার করতল কঠিন, সমতল এবং দৃঢ়, তিনি প্রায় কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হন না, এবং দুর্দ্দমনীয় উদ্যম-শীলতা ও চঞ্চলচিত্ততার দৃষ্টান্তস্থল হয়েন। আবার করতল অতিশয় কঠিন হইলে যদিও উদ্যমশীলতার ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচায়ক, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তির হীনতা বুঝায়।

করতলের স্থিতিস্থাপকতা বর্ত্তমান থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্যমশীলতা, এবং কঠিন হস্তের সমস্ত সদ্‌গুণের পরিচায়ক। এইরূপ ব্যক্তিরাই স্বনাম-ধন্য পুরুষ হয়েন।

যদি হস্ত কোমল ও স্ফীত বা শিথিল, তবে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত যদি অঙ্গুলী সকলের তৃতীয় পর্ব্বগুলি এবং করপৃষ্ঠ স্থূল হয়, তবে ভোগবিলাসপ্রিয়তা সূচিত করে; এই সকল ব্যক্তি স্বহস্তে স্বকর্ম্ম করিতে নিতান্তই অক্ষম, —এমন কি অপরে তাহাদের হইয়া চিন্তাও করিয়া দিলেই যেন তাহাদের পক্ষে ভাল হয়।

উক্ত শ্রেণীর করতল আবার যদি কোমল না হইয়া কঠিন হয় তবে তাহাদের সকল উদ্যম ভোজনব্যাপারেই পর্য্যবসিত হয়। কেবল আহারই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ক্ষীণ (পাতলা) এবং সমতল করতল দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য-লোকের লক্ষণ। উত্তম স্বাস্থ্যের লক্ষণ— দৃঢ় অনতিবৃহৎ, উষ্ণস্পর্শ ও অনতিকঠিন করতল।

স্থূল ও কদাকার করতল পাশবিকতার এবং আত্মগরীমার লীলাক্ষেত্র। স্থূলতাই আত্মগরীমার লক্ষণ।

নমনীয় করতল, সেই ব্যক্তির সর্ব্বাবস্থার উপ-যুক্ততা ও মানসিক নমনীয়তা, এবং বৈচিত্র ও পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বিকাশস্থল। এইরূপ করতল-বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য্যে উপযুক্ত, কোন বিষয় শীঘ্রই বুঝিতে পারে, উদার এবং প্রায়ই অপরিমিতব্যয়ী। তাহারা নীচকর্ম্মে বা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা করে। তাহারা সরল ও কৌতূহলপূর্ণ।

করতল পাটল-বর্ণ হইলে স্বাস্থ্য ও রক্তের পরিষ্কারতা বুঝায়। এই প্রকার করতলবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রফুল্লচিত্ত ও প্রীতিপূর্ণ হয়।

করতল শ্বেতবর্ণ হইলে রক্তহীনতা বুঝায়। এই প্রকার করতল স্বার্থপর, নীচ, ক্রূর ও সন্দিগ্ধ-চিত্তের পরিচায়ক।

রক্তাভ করতল শরীরে রক্তের আধিক্য বুঝায়। এই প্রকার করতলবিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অনুরাগী ঈর্ষাযুক্ত, উগ্রস্বভাব ও অতি শীঘ্রই ক্রোধযুক্ত হয়। অন্যান্য কুচিন্তা সংযোগে তাহারা অতিশয় কামুক হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

হত্যারহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘেঁটুবিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন ম'শাই কি করেছি!

হে। আর বাপু, তোমার নাম আর কাজ শুনেই বুঝি প্রাণটা যায়।

ঘেঁ। আজ্ঞে, বলেন কি? আপনার পরাণ যায়—সে কি কথা? ডাক্তার ডাক্‌ব' নাকি? কি বলেন?

হে। ডাক্তার ডাক্‌তে হয়, পরে ডাকা যাবে; এখন বল দেখি অলকার কেন অমরের জন্য এত কষ্ট?

ঘেঁ। আজ্ঞে, ওরা দুটীতে ছেলেবেলা থেকে যেন মানিকজোড়ের মত খেলাধুলা কর্‌ত্তো, তাই অত ভাব।

হে। কিন্তু একটা কারণে আমি একাজ হাতে নিতে সাহস করি না।

ঘেঁ। ভয় কি মশাই, অলকার নিজের ঢের টাকা আছে।

হে। টাকার জন্য নয় হে, টাকার জন্য নয়; আর একটা কারণ আছে।

ঘেঁ। কারণটা কি?

হে। যে রকম প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বড় সুবিধা বোধ হয় না।

ঘেঁ। তবু চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারেন তো?

হে। হাঁ, তা পারি। আচ্ছা, অমর ত বলেছে, খুনের সময় সে হাওড়ায় ছিল না, বাধা দিয়া ঘেঁটু কহিল, "নিশ্চয়ই তবে ছিল না।"

হে। তবে কোথায় ছিল তুমি জান?

ঘেঁ। আমি? বাপ্‌রে! কোথায় ছিল আমি কেমন করে জান্‌ব?

হে। তবে তুমি যে বল্লে, সে ছিল না।

গম্ভীরভাবে ঘেঁটু কহিল, "মহাশয়, ফাঁসির সময় লোকে কি কখন মিথ্যাকথা বল্‌তে পারে?"

একটু হাস্য করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "বেশ বুঝি বাপু তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি আবার কথা গুলিও মিষ্ট।"

ঘেঁটু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "কথাগুলিও মিষ্টি হবারই কথা।"

"কেন?'

"আমি বড় মিষ্টি খাই।"

"থাম বাপু, তুমি বেশ রগড়ের লোক। এখন অলকার সঙ্গে কিসে আমার দেখা হয় বল দেখি?

"আমি তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

"দেরি হবে যে।"

"এলুম বলে।"

"আরে বাপু, অলকাদের বাড়ী এখানথেকে অনেকদূর, এখনি আসবে কি ক'রে?"

"নীচে গাড়ীতে বসে আছে, ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

ঘেঁটু সরকার এই বলিয়া অলকাকে ডাকিয়া আনিতে গেল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চুরি।

পতনের শব্দ শুনিয়া হামিদ দ্রুতবেগে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, "কি হয়েছে, মা?"

কোন উত্তর পাইল না। মুন্না অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হামিদ খানিক জল লইয়া তাহার মুখে চোখে দিল; ক্রমে মুন্নার চৈতন্য হইল। অপ-

কাল পরে সে অস্ফুটস্বরে কহিল, "কাগজ---"

হামিদ কহিল, "কি কাগজ মা ?"

কোন উত্তর না দিয়া মুন্না পুনরায় উঠিয়া দেরাজ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিল, কোথাও কাগজের সন্ধান পাইল না। পরে নিতান্ত হতাশ হইয়া বিবর্ণমুখে ভূতলে বসিয়া পড়িল ও নিশব্দে অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। হামিদও ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অল্পকাল পরে মুন্না চুপ করিল। অতীব গম্ভীর-স্বরে কহিল, "হামিদ, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

হা। তোমার কি কিছু চুরি গেছে ?

মু। হাঁ, কতকগুলা দামী কাগজ গেছে।

হা। এ কি কোম্পানির কাগজ।

মু। না, এ বড় গোপনীয় কাগজ, এ গুলি গেলেই আমার মৃত্যু।

হা। কাকে চোর বলে তোমার সন্দেহ হয় ?

মু। আবার কে ? মিন্সে নিজেই নিয়েছে।

অশান্তির সহিত হামিদ কহিল, "ওঃ, বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই নিয়েছে।"

"তা হলেই বাঁচি।"

"কিছু টাকা দিয়ে কাগগুলা পাওয়া যায় না ?

"কেবল ঐ উপায়ই আছে। তুমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।"

"কোথায় তাহার দেখা পাইব ?"

"মোড়ের মাথায়, মদের দোকানে।"

হামিদ তখন রহমনের সন্ধানে মদের দোকানে চলিল। সেখানে তাহাকে একখানি বেঞ্চের উপরে বসিয়া মদ্য পান করিতে দেখিতে পাইল।

রহমন হামিদকে দেখিয়া কহিল, "কি গো, তুমি কি মনে করে ?"

হামিদ কহিল, "মা তোমার সহিত একবার দেখা করিতে চায়।

র। আহা, আমি বাহিরে থাকিলে বেচারীর বড় কষ্ট।

হা। বিশেষ আবশ্যক, এখনি যাইতে হইবে।

র। এখন যেতে পার্‌বো না, দেখ্‌ছ। নেশা কর্‌ছি।

হা। চল, চল, বড় দরকার—দেরী করো না।

র। কি দরকার ?

হা। মা কাগজগুলা চায়।

র। কি কাগজ ?

হা। কেন, মা তুমি দেরাজ থেকে নিয়েচ ?

র। আমি দেরাজ থেকে কিছু লই নাই। আর আমিই বা লব কেন, বাপু ?

হা। তুমিই কাগজগুলা নিয়েছ।

র। নিয়ে থাকি, মা পুলিস ডাক্‌তে বল্‌গে না।

হামিদ দৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিল, "তুমি বেশ যান সে তা পারে না।"

"তা হলে এইবার বুঝেছেন আমি তাঁর কে ?"

"তা হলে স্বীকার কর্‌ছ, তুমি কাগজগুলা নিয়েচ।"

"আমি কিছুই স্বীকার অস্বীকার করি নাই। যা, যা মিছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিসনে।"

"তুমিই তার সর্ব্বনাশ কর্ল্লে।"

"কে বল্লে, তার সর্ব্বনাশ কর্ল্লা ?"

"কাগজগুলা না পেলেই তার সর্ব্বনাশ হবে।"

"কিছু টাকা খরচ কর্ত্তে বল্‌গে না।"

"মা ১০০ টাকা দিতে চায়।"

"ও ত বড় কম টাকা।"

"তুমি কত চাও ?"

"আমি কিছুই চাই না।"

"তুমি তা হলে দেরাজ থেকে কাগজগুলা লও নাই ?"

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহমন কহিল, কতবার তোকে ঐ কথা বল্‌ব ? ফের যদি তুই ঐ কথা বলিস্, এই বোতলের বাড়ীতে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।” শ্রী— ক্রমশঃ।

বিশ্বে ভগবানের প্রকাশ।

১

নমি তোমা বিশ্বপতি,
তুমিই জগত গতি,
এ বিশ্ব আলেখ্যে সদা
আছ বিদ্যমান।
আছ বিদ্যমান,
করুণা নিদান,
নীল চন্দ্রাতপে
ঊর্দ্ধে শোভমান,

২

বিবিধ বরণ বিভা,
অসংখ্য মূরতি কিবা,
অনন্ত আকাশ পটে
শোভে থরে থর।
শোভে থরে থর,
মূর্ত্তি মনোহর,
অনন্ত অস্ফুট
অধিক সুন্দর।

৩

আরোহি বিমানরথে,
ভ্রমিলে অম্বরপথে,
কতই হে বিশেশ্বর,
দেখিতে যে পাই,
দেখিতে যে পাই,
যে দিকে তাকাই,
কোটী দীপরূপে
জ্বলিছ সদাই।

৪

গ্রহ উপগ্রহরূপ,
ধরি হে নিখিল ভূপ,
ভ্রমিতেছ মহাকক্ষে
অনন্ত রচনা।
অনন্ত রচনা,
পরাস্ত কল্পনা,
এ বিশ্বের সীমা,
শুধু বিড়ম্বনা।

৫

প্রভাতে অরুণবিভা,
সমুজ্জ্বল করে দিবা,
নিসর্গের শোভা যবি
কতই বাড়ায়।
কতই বাড়ায়,
কতই সাজায়,
প্রকৃতি সতীরে
মোহন ভূষায়।

৬

কৌমুদী ধবলবাসে,
সাজিয়া ধরণী হাসে,
সুনীল গগন তলে
কিবা মনোহর।
কিবা মনোহর,
সুনীল অম্বর,
বক্ষে তার শোভে
তারকা নিকর।

৭

এ হেন অসংখ্যরূপ,
ধরিয়া নিখিল ভূপ,
ভাতিছ এ বিশ্বপটে
অনন্ত শকতি।

অনন্ত শকতি,
ওহে বিশ্বপতি,
যে দিকে তাকাই,
জীবন্ত মূরতি।

৮

কে বলে অদৃশ্য তুমি,
বিশ্ব তব লীলাভূমি,
ফলিত তোমার মূর্ত্তি
এ বিশ্বদর্পণে।
এ বিশ্বদর্পণে,
ভূতলে গগনে,
তড়িতের সনে,
ভীম প্রভঞ্জনে।

৯

প্রীতি তব পুষ্পরাশি,
তুমিই উষার হাসি,
বিহঙ্গ কুলের ধ্বনি,
অশনির রব।
অশনির রব,
ওহে ভবধব,
তুমিই অনন্ত
নিখিলের সব।

১০

তুমি দীপ্ত হুতাশন,
তুমি স্নিগ্ধ সমীরণ,
তুমিই বিশ্বের তেজ,
বিশ্বের জীবন।
বিশ্বের জীবন,
অনাদি কারণ,
জগত পালক
অনাথ শরণ।
তুমিই নিদাঘ রবি,
তীক্ষ্ণ খরতর ছবি,
টানিয়া সাগর বারি
কর বরিষণ।
কর বরিষণ,
ভূতলে পতন,
ভূতলের জল
জগত জীবন।

১১

শরতে বিমলাকাশে,
পূর্ণচন্দ্র কিবা হাসে,
এ বিশ্ব আনন্দময়,
কিবা অপরূপ।
কিবা অপরূপ,
দেখাও স্বরূপ,
নেহারি উচ্ছলে,
ভাব প্রেমকূপ।

১২

নিশির শিশির ঝরে,
পত্রে, পত্রে, রবি করে,
কিবা অপরূপ রূপ
করি সন্দর্শন।
করি সন্দর্শন,
ভুবন মোহন,
নেহারি সেরূপ
মোহিত নয়ন।

১৩

সুনীল ভূধর গায়,
স্রোতস্বিনী বয়ে যায়,
তরুণ অরুণ বিভা
কিবা মনোহর।
কিবা মনোহর,
ওহে বিশ্বেশ্বর,

কি মোহন রূপ
নেত্র তৃপ্তি কর।

১৪

বিবিধ বরণ পাখী,
পুষ্পিত ফলিত শাখী,
লতাবধূ কুঞ্জবন
দেয় পরিচয়।
দেয় পরিচয়,
নব দূর্ব্বাচয়,
হরিত শাদ্বল
নব কিশলয়।

১৫

সুখময় মধুমাসে,
ধরা যেন প্রেমে ভাসে,
নব পরিচ্ছদ পরে
তরুলতা চয়।
তরুলতাচয়,
সব শোভাময়,
মলয় পবন
ধীরে ধীরে বয়।

১৬

কুঞ্জবনে রাত্র দিবা,
সঙ্গীত লহরী কিবা,
উঠিতেছে ধীরে ধীরে
শ্রবণ জুড়ায়।
শ্রবণ জুড়ায়,
পরাণ মাতায়,
প্রেম অশ্রুগণ্ডে
ধীরে বয়ে যায়।

১৭

নমি তোমা বিশ্বেশ্বর,
তুমি ব্যাপ্ত চরাচর,
কিবা তুমি নও দেখ
প্রেমিক নয়নে।
প্রেমিক নয়নে,
নেহারে গগনে,
ভূধরে সাগরে,
নির্ঝরে কাননে।

১৮

যে দিকে নয়ন ধায়,
প্রেমিক দেখিতে পায়,
তব অপরূপ রূপ
নিখিল ভুবনে।
নিখিল ভুবনে,
জীবনে মরণে,
আঁধারে আলোকে
তোমার আননে।

ভগবদ্গীতাপাঠ।

অর্জ্জুন। অস্ত্রাঘাত জনিত দুঃখও কি লাগিবে না?

ভগবান্। স্থূলভাবে দেখ লোকে যখন যুদ্ধে মাতিয়া যায় তখন কোন অঙ্গ কর্ত্তিত হইলেও মন যুদ্ধে তীব্র নিযুক্ত বলিয়া ঐ সময়ে কিছুই অনুভব হয় না। পরে যখন যুদ্ধাবসানে মন যুদ্ধ চিন্তায় আর মাতিয়া থাকে না, তখন এই দেহ আকারে আকারিত হইয়া দেহের যাতনা অনুভব করে। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। দৃশ্য জগৎটা জড় ও অসৎ। অসৎ ত্যাগ করিয়া সৎ বস্তুতে থাকিতে অভ্যাস কর অমর হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিও অসতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু সতের কোথাও কখন অভাব নাই। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব জানেন।

অর্জ্জুন। অসতের সত্তা বা অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই ইহা বুঝিলাম না।

ভগবান্। অসৎ কি আগে বুঝ।

অর্জ্জুন। বল।

ভগবান্। যাহা দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ।

অর্জ্জুন। দেশ পরিচ্ছিন্ন ইহার অর্থ কি?

ভগবান্। যাহা সর্ব্বদেশে সমভাবে থাকে না তাহাই দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এই সম্মুখবর্ত্তী তোমার দেহ এখন এখানে আছে কিন্তু এই সময়ে পুষ্করে নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বদেশে সমভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার দেশ পরিচ্ছেদ নাই।

অর্জ্জুন। কালপরিচ্ছেদ কি?

ভগবান্। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই অবিকৃত ভাবে থাকে না তাহাই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। 'অসৎ' তিন কালে সমান থাকে না বলিয়া পরিণামী। একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বকালে অবিকৃত।

অর্জ্জুন। বস্তু পরিচ্ছেদ কি?

ভগবান্। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ এই তিন প্রকার।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্প ফলাঙ্কুরঃ।

বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয় শিলাদিতঃ।

বৃক্ষের অন্তর্গত পুষ্প, পত্র, ফল, অঙ্কুরাদি যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ এবং বৃক্ষ হইতে শীলা মনুষ্যাদির অন্য বস্তুর যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ, কোন বস্তু এরূপ পাইবে না যাহার এই তিন ভেদ নাই। আকাশ, কাল, দিক অন্যত্র অনবচ্ছিন্ন হইলেও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কেবলমাত্র ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ ভেদ ভিন্ন।

অর্জ্জুন। অসতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই কিরূপে? অসতের ভাব নাই ইহার অর্থ কি? নামরূপ ত অসৎ। এই অশ্বথ বৃক্ষতলে তুমি আমার কথা শুনিতেছ, এই দেখিতেছি তোমার গলদেশে বনমালার পরিবর্ত্তে এই যুদ্ধক্ষেত্রে একছড়া পদ্মমালাকে আদর করিয়া পরাইয়া দিয়াছে। বৃক্ষাবরণ সরাইয়া তোমার অপরূপ রূপ দেখিবার নিমিত্ত সূর্য্যরশ্মিও নিরত হইতেছে। চক্ষের উপরে দৃশ্য প্রপঞ্চও দেখিতেছি অসৎ—কিন্তু অস্তিত্ব নাই কিরূপে? যতক্ষণ দেখিতেছি ততক্ষণ ত আছে বলিতে হইবে।

ভগবান্। এই দেহ ইহা সত্যই নাই। যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্ন দেখার মত। দেখ একটু অন্যমনস্ক হইলে এই দেহ থাকে না। স্বপ্নে থাকে না। জন্মের পূর্ব্বে ইহা ছিল না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না। উপস্থিত যাহা দেখিতেছ তাহার অস্তিত্ব থাকে ইহা কি প্রমাণ করিতে পার? নিদ্রাকালে যাহা দেখ তাহার মত ইহা বোধ হইতেছে। যাহা অসৎ যার —আগে—বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ তাহার অস্তিত্ব নাই, তবে যে দেখ তাহা ভ্রমমাত্র। স্বপ্নকালে যাহা দেখ, জাগিয়া তাহা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পার। রজ্জু দেখিয়া যে সর্প মনে কর, এ সর্প কি আছে বলিতে পার? বন্ধ্যাপুত্র শব্দ আছে বলিয়া কি বস্তুতঃ আছে? সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পূর্ণ পদার্থে —জগৎ ভ্রম হইয়াছে। অস্তি ভাতি প্রিয়ই আছে তাহার উপর নাম রূপ কল্পনা মাত্র, এজন্য নামও রূপ মিথ্যা। একমাত্র আদি মধ্য অন্তবর্জ্জিত সত্য ব্রহ্মই জগৎরূপে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ভাসিতেছেন। নামরূপ সম্বলিত জগৎ ভাব মিথ্যা; ব্রহ্মভাব সত্য। স্বর্ণবলয়ে স্বর্ণ ব্যতীত আর কি? স্বাশ্রিত অবিদ্যারূপ স্বপ্নে ব্রহ্মে জগৎ না থাকিলেও ইন্দ্রজাল মত জগৎ দেখাইতেছে। চিত্ত সর্ব্বদা বাসনাময় এজন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। দর্পণে সূর্য্যের তেজ পড়িলা। সূর্য্য

প্রতিবিম্ব দর্পণ হইতে দেয়ালে প্রতিবিম্বিত হইল। দর্পণকে চঞ্চল কর দেখিবে ছায়া কতই চঞ্চল। সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত দর্পণে চৈতন্য সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া শূন্যে তাহার প্রতিচ্ছায়া খেলা করিতেছে। ইহাই গমনশীল জগৎ। চিত্ত স্পন্দন রহিত কর জগৎ নাই দেখিবে। রাগ ও দ্বেষভাব চিত্তস্পন্দনের কারণ চিত্তকে অনুরক্তি বিরক্তি শূন্য কর দেখিবে ব্রহ্মই রহিয়াছে, জগৎ ভ্রম দূর হইয়াছে, যেমন স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর পৃথক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ চিত্ত স্পন্দন ব্যতীত জগৎ পরিণতির অন্য উপাদান নাই। বুঝিলে অসতের অস্তিত্ব নাই কিরূপে ?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম অসৎ ভ্রম কল্পনা মাত্র। কিন্তু এই ভ্রম কল্পনাও ত সেই সৎ হইতে জাত। সৎ কিরূপে অসতের কারণ ?

ভগবান্। অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরই বুদ্ধি মান্দ্য বশতঃ স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ বৃথা কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করিয়া থাকে।

দুর্ব্বুদ্ধিভিঃ কারণ কার্য্যভাবং সঙ্কল্পিতং দূরতরে বুধেষু।
তদেব তৎসত্য মনাদি মধ্যং জগত্তদেতৎ স্থিতমিত্যবেহি ॥
স্থিতি ১-৩৬। যোঃ বাঃ

একমাত্র আদি মধ্য ও অন্তবর্জ্জিত সত্য ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জগৎ ভাব নাম রূপ মাত্র। জগৎ ভাব মিথ্যা। ব্রহ্মভাব সত্য।

অর্জ্জুন—কার্য্য কারণ কি তবে মিথ্যা ?

ভগবান্—মিথ্যা বৈ আর কি ? ব্রহ্মকে যাহারা জগৎ কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাদের বোধ মোহ কলুষিত। শ্রুতি কার্য্য কারণের পৃথক সত্তা কল্পনা করেন না। একমেবা দ্বিতীয়ং ইহাতে একই আছে বলা হইয়াছে।

কার্য্যস্য তৎকারণতাং প্রযাতং সংজাতি সম্যক্ বিমূঢ় বোধঃ।
দৈর্ঘ্যাদি তৎকার্য্যমুদেতি তস্মাৎ দৈবঃ কারণাদ্যৈঃ সহকারীকৃতৈঃ ॥
স্থিঃ ১-৩৫ যোঃ বাঃ।

মায়া সম্বন্ধে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ প্রযুজ্য কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে ন্যায়ের আরম্ভবাদ এবং সাংখ্যের পরিণামবাদ ও উপাসকের পরিণামবাদ খাটিবে না। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদ মাত্রই গ্রহণীয়।

শ্রী রামদয়াল মজুমদার এম, এ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান।

টাইফয়েড্ জ্বর।

পল্লীগ্রামে এই টাইফয়েড্ জ্বর বড় অধিক দেখা যায় না। কারণ তথায় মল মূত্র প্রায়ই উন্মুক্ত মাঠে নিঃসৃত হওয়ায় অনন্ত আকাশ তদস্থিত অনন্ত বায়ুতে মিশিত হইয়া যাওয়ায়, এবং রৌদ্রের প্রখর কিরণে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় decomposed (গলিত পচিত) হইতে পায় না। এই হেতুই উহা হইতে তথায় গ্যাসও উত্থিত হইতে পায় না। এই স্থানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ মহর্ষিগণ নিঃসৃত মলমূত্র হইতেই নানা প্রকার পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে জানিতেন বলিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে বাটীর বিপরীত দিকে খোলা যায়গায় একটী বাণ নিক্ষেপ করিলে যেখানে উহা পতিত হইবে তথায় মল মূত্র ত্যাগ করিবে। কি না তাহা হইলে আর উহার বিষে বায়ু বিষময় হইয়া তোমার গৃহ বিষময় করিতে পারিবে না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে এখন আর সেরূপ করা সম্ভবমত নয়। বিশেষতঃ সহরে। তথাপি

আমাদিগের মতে, সমুদয় ড্রেণ উত্তমরূপে বিধৌত (flushed) হইবার উপায় নিরূপিত না হইলে ড্রেণের পায়খানা অপেক্ষা তোলা পায়খানা থাকাই ভাল, কিন্তু উহাও আবার নিয়মিতরূপে প্রত্যহ পরিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন; ড্রেণের পায়খানা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহরে অতি উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, যদি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইবার বন্দোবস্ত থাকিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল কার বর্ত্তমান ড্রেণের কার্য্য প্রণালী একেবারেই বৈপরীত্য সাধক এবং কর্তৃপক্ষও তৎ-সংশোধনে প্রায় নিশ্চেষ্টবান্। সুতরাং সহরে যে উত্তরোত্তর টাইফয়েড্ জ্বর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখানে সংক্ষেপে আমরা উক্ত জ্বরের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে ২।১টী উপদেশ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। বিশদভাবে চিকিৎসা ও রোগ বিবরণাদি চিকিৎসা গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্থান বাহুল্যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া গেল না।

এই জ্বর প্রথমে ৩।৪ দিন প্রত্যহ প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্ণে ২ ডিগ্রী করিয়া বর্দ্ধিত থাকে, যেমন ১ম দিন প্রাতে ৯৯ ডিগ্রী অপরাহ্ণে ১০১ ডিগ্রী এবং তৎপর দিন প্রাতে ১০০ এবং অপরাহ্ণে ১০২। এই ক্রমান্বয়গতিক তাপাম্বৃদ্ধি টাইফয়েড্ জ্বরের একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে। প্রায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস হইতেই জ্বরের উত্তাপ ১০৫।১০৬ ডিগ্রী বা ততোধিক হইয়া থাকে এবং এই তাপ বৃদ্ধিপ্রায় সমভাবেই দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এখন জ্বরের যদি কোন বিশেষ কঠিন উপসর্গ না থাকে তাহা হইলে আপনা হইতেই জ্বর কমিতে থাকে কিন্তু উপসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয় সপ্তাহেও এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এই পীড়ার আর একটি বিশেষত্ব এই যে রোগী সত্বর অতিশয় দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

এই জ্বর প্রায়ই ২৮ দিনের কমে সারিতে দেখা যায় না; কোন কোন স্থলে ৪২ দিন পর্য্যন্তও ইহা স্থায়ী হয় এবং কদাচিৎ ২।১ স্থলে—অতি কঠিনাবস্থায়—৬১।৬২ দিনও লাগিয়া থাকে। এই পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহটি বড়ই বিপদের সময়, অনেক স্থলেই রোগী ১৩ বা ১৪ দিনের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে এইজন্য এই সময়কে পীড়ার critical state অর্থাৎ সঙ্কট অবস্থা বলে। এই সময়টি উত্তীর্ণ হইলে পীড়া ক্রমশঃ অল্পে অল্পে কমিতে থাকে; পীড়া বর্দ্ধিত হইবার সময়—যেমন ক্রত-গতিতে বাড়িতে থাকে কমিবার সময় আবার তেমন অল্পাকারে কমিতে থাকে—জানিবে। তৃতীয় সপ্তাহে রোগ অল্পাকারে থাকিয়া চতুর্থ সপ্তাহে উহা একেবারে কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই চতুর্থ সপ্তাহটিও—কোন কোন স্থলে পীড়ার বৃদ্ধির সময় জানিবে।

রোগী এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রায়ই জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; ২।১ স্থলে রোগীর আন্তরিক জ্ঞানের বিলোপ না হইলেও বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত থাকায় নিজের উপর কোনই control রাখিতে সমর্থ হয় না। এই পীড়ার ডিলিরিয়ম বা প্রলাপ বকা একটি প্রধান উপসর্গ জানিবে। মস্তিষ্কে ঘোরতর রক্তাধিক্য হইয়া ডিলিরিয়ম উৎপত্তি হয়। রোগী তখন উঠিয়া বসিতে চাহে, জোর করিয়া পলাইতে চাহে, শুশ্রূষাকারীগণকে মারিতে থাকে, কামড়াইতে যায়, গায়ে বস্ত্রাদি রাখিতে চায় না। ইহার সময় বক্ষে শ্লেষ্মার আধিক্য হওয়ায়, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন বক্ষরোগ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বালক ও যুবকগণই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; স্ত্রীলোকগণের

এই পীড়া অতি অল্পই হইয়া থাকে; পীড়ার ৭।৮ দিবস পরে গাত্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল স্ফোট দেখা যায় উহাকে Typhoid rash কহে। কোন কোন স্থলে এই স্ফোট মোটেই উদ্ভূত হয় না। এই স্ফোট দেখিতে ঠিক মশার কামড়ের ন্যায় এবং পৃষ্ঠে বক্ষে উদরদেশে ও পদে দেখা যাইয়া থাকে। উহা কখনই অধিক মাত্রায় দেখা যায় না।

এখানে সামান্যরূপে যে নৈদানিক পরিবর্ত্তন টাইফয়েড জ্বরে হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিব। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে এই জ্বর বিশেষতঃ মল মূত্রের পচনাবস্থা হইতে উত্থিত গ্যাস হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ টাইফয়েড জ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদেও দেখা যায়। এই মৃতদেহ পরীক্ষায় আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে ক্ষত উদ্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা প্রায়ই পীড়ার সাংঘাতিকত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা একটি মন্দ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। প্রথম সপ্তাহে ইহাতে উদরাময় দেখা যাইবার সম্ভব কিন্তু পরে উহা কোষ্ঠবদ্ধে পরিণত হইয়া থাকে, এমন কি ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত মলবদ্ধ থাকিতে দেখা গিয়াছে।

রেমিটেণ্ট বা অবিরাম জ্বর হইতে সহজে বড় ইহার পার্থক্য অনুভব করা যায় না। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ চিকিৎসক নিম্ন বর্ণিত দুটি লক্ষণেই প্রায় স্থলে পীড়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। এই টাইফয়েড জ্বরে প্রথম সপ্তাহে ক্রমানুযায়িক তাপ বৃদ্ধির কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহা একটি জ্ঞাপক লক্ষণ এবং দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ কুক্ষি-ও কুঁচ্‌কি প্রদেশের মধ্যস্থলে হাত দিয়া টিপিলে গল্‌ গল্‌ শব্দ শ্রুত হইবে। অনেক সময়ে এই রোগের লক্ষণ মাত্র দৃষ্ট হয়। দৃষ্টে [illegible] নির্ণীত হইয়া থাকে। পীড়া [illegible] করিলে বিশিষ্ট টাইফয়েড দশা অর্থাৎ অবসন্নাবস্থা দৃষ্টেও রোগ জানিতে পারা যায়।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে এই পীড়ার ৮।১০ দিন পর হইতেই বাক্‌রোধ হইয়া যায় এবং আত্মীয় স্বজন কাহাকেও চিনিতে পারে না। পীড়ার সাংঘাতিক অবস্থায় রোগীর হাত, পা, ঠোঁট জিহ্বা, সমুদয় কালবর্ণ হইয়া যায় এবং দেখিলে মনে হয় যেন কেহ কালি মাখিয়া দিয়াছে। এই লক্ষণটি বড়ই সাংঘাতিক জানিবে।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এরূপ পীড়া আরোগ্য হওয়া সম্ভব কিনা? আর উগ্র অ্যালোপ্যাথী ঔষধ ব্যবহার না করিয়া সরল হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসকের রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে কিনা? যাঁহারা মনে করেন যে উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ (কার্য্যে না হউক ব্যবহারে উৎকট) প্রয়োগ না করিলে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে [illegible] (হাসপাতালে ও প্রাইভেট প্রাক্‌টিসে) দেখা গিয়াছে যে বহু স্থলে হোমিওপ্যাথী মতের চিকিৎসায় শতকরা ৮০।৮৫ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে। অ্যালোপ্যাথের ভক্তগণ যাহাই কেন বলুন না এরূপ সফলতা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে আজও লাভ ঘটে নাই।

চিকিৎসা দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা (১) প্রতিষেধক এবং (২) আরোগ্য। ইংলণ্ডে একটি প্রবাদ আছে যে Prevention is better than cure অর্থাৎ উৎপন্ন রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা উহা উৎপন্ন হইতে না দেওয়া [illegible] ব্যবস্থা। ইহা একটি অতি সংক্ষিপ্ত [illegible]

অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি প্রভৃতি সকল দিকেই নাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এ কারণ আমরা প্রথমে এই বিষম রোগ যাহাতে উদ্ভূত হইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

অনেকের মতে ইহা একটি সংক্রামক (Contagious) পীড়া বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আমরা যে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী তাহা নহে। তবে আমরা এমত বলি না যে উক্ত পীড়াগ্রস্ত রোগীকে সুস্থ করিলেই ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িবে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী প্রভৃতি কেহই বড় উহার কবল হইতে উদ্ধার পাইতেন না। যাহা হউক যথাসাধ্য প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই পীড়া যখন যেস্থানে আরম্ভ হয় তখনই প্রায় বহুব্যাপী (Epidemic) হইয়া পড়ে তাহার কারণ আর কিছুই নহে শুধুমাত্র অসাবধানতা নিবন্ধন অনেকেই আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমরা পুনঃপুন বলিয়া আসিতেছি যে টাইফয়েড্ পীড়ার মলমূত্রই দূষিত পদার্থ এবং উহা হইতেই গ্যাস উত্থিত হইয়া বায়ুকে সংস্পর্শ দোষাক্রান্ত করে এবং সেই বায়ু প্রশ্বাসিত হইয়া আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করতঃ ঐ রোগ আনিয়া ফেলে। অতএব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র সাবধানে দূরে নিক্ষেপ করিবে অথবা মাটির নিম্নে উহা প্রোথিত করিয়া ফেলিবে কিন্তু সাবধান (পল্লীগ্রামে হইলে) কদাচ যেন পাতকুয়ার ধারে উহা প্রোথিত না হয় কারণ তাহা হইলে, বৃষ্টির জলে উহা ধৌত হইয়া পাতকুপার জল দূষিত করিতে পারে। এই রোগীর নিশ্বাসও বড়ই দূষণীয় এজন্য চিকিৎসক, শুশ্রূষক প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। রোগীর শয্যা প্রায়ই বদলাইয়া রৌদ্রে দেওয়া প্রয়োজন নতুবা রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্মে তাহা দূষণীয় হইয়া উঠে। এক কথায় উক্ত রোগীর শরীর নিঃসৃত সমুদয় প্রকার পদার্থই দূষণীয় জানিয়া তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবে। (ক্রমশঃ)

ডাঃ মৈত্র।

স্বায়ত্ত-চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রণ—ব্রণশোথ।

আমরা যাহাকে ঘা বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ। ক্ষত ব্রণরোগের অপর একটি প্রসিদ্ধ নাম।

ব্রণ দুই প্রকার—এক প্রকারের নাম শারীর ব্রণ, অপর প্রকারকে সদ্যোব্রণ বলে।

শরীরের দোষে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপে শরীরে যে ব্রণরোগ জন্মে, তাহার নাম শারীর-ব্রণ। আর অস্ত্রে কাটিলে, শর বিঁধিলে, আগুনে পুড়িলে কিম্বা ঘর্ষণ ও আঘাত প্রভৃতি অন্যান্য কারণে শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির অপচয় ঘটিলে যে ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে।

শারীর-ব্রণ জন্মিবার পূর্ব্বে প্রায়ই বেদনাযুক্ত বিবর্ণ স্থানিক শোথ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে স্থানে ব্রণ জন্মিবে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে, টাটানি ও ছেঁচানি প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনাযুক্ত হয় এবং সেই স্থানের বর্ণ বিবর্ণ ঘটে। এই প্রকার শোথ বা ফুলাকে ব্রণশোথ বলে। লোকে সচরাচর ব্রণশোথকেই ব্রণ বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ব্রণ নহে, ব্রণরোগের পূর্ব্বরূপ। ছোট-বড় ভেদ, স্ফোটক, ফোড়া এবং চাম প্রভৃতি ব্রণশোথের চলিত নাম।

ব্রণশোথ আপনা আপনি বিদীর্ণ হইলে কি বিদারণ করিয়া দিলে শারীর-ব্রণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোথ ছয় প্রকার—বাতশোথ, পিত্তশোথ, কফশোথ, ত্রিদোষশোথ, রক্তশোথ এবং আগন্তু-শোথ।

যে শোথের বর্ণ খুব লাল বা কাল, শোথযুক্ত স্থানে হাত বুলাইলে খস্‌খসে বোধ হয় এবং শোথ টিপিলে বসিয়া যায় অর্থৎ ঠোল খায় তাহাকে বাত-শোথ বলে। বাতশোথে টাটানি, শূলানি এবং দপ্‌-দপানি প্রভৃতি যাতনা কখন বোধ হয় কখনও বা জানিতে পারা যায় না। বায়ু বিকৃত হইয়া ত্বক্‌ মাংস ও রক্তাদি আশ্রয় করিয়া বাতশোথ উৎপাদন করে।

যে শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, শোথের বর্ণ পীত বা লোহিত হয়, শোথের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে এবং শোথ টিপিলে ঠোল খায় না অথচ কোমল বোধ হয় তাহাকে পিত্তশোথ বলে। কুপিত পিত্ত রক্ত-মাংসাদি আশ্রয় করিয়া পিত্তশোথ উৎ-পাদন করে।

কুপিত কফ, স্থানসংশ্রয় করিয়া যে শোথ উৎপাদন করে তাহাকে কফজশোথ বলে। কফজ-শোথ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, শোথের রং পাণ্ডু বা শুক্ল এবং চাক্‌চিক্যযুক্ত। এই শোথ খুব কঠিন হয় এবং শোথে চুলকণা প্রভৃতি যাতনা থাকে।

যে শোথে উক্ত তিন প্রকার শোথের লক্ষণ দেখা যায় তাহার নাম ত্রিদোষ শোথ।

মাকড়শা, ভিমরুল ও বোলতা প্রভৃতি কীট পতঙ্গের দংশনে, সবিষ প্রাণীর মল-মূত্র সংযোগে এবং বিষাক্ত গাছের লতা, পাতা এবং আঠা প্রভৃতি লাগিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তুশোথ বলে। দুষ্ট বায়ু এবং দূষিত জলের সংস্পর্শেও আগন্তু শোথ জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রণশোথের চিকিৎসা।

ব্রণশোথ প্রকাশ পাইলেই তাহা বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা যাহাকে 'বসান দেওয়া' বলি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে বিম্লাপন বলে। ব্রণ-চিকিৎসার সাতটী ক্রমের মধ্যে বিম্লাপন আদ্যক্রম। প্রথমেই, বিম্লাপনের জন্য অর্থাৎ শোথ বসাইবার জন্য প্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয় এইজন্য ইহাকে আদ্যক্রম বলা যায়।

ব্রণশোথ বসাইয়া দিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে তন্মধ্যে প্রলেপ দেওয়া অনায়াস বা অল্পায়াস সাধ্য প্রক্রিয়া। একমাত্র প্রলেপ প্রয়োগেই অনেক স্থলে সুফল লাভ করা যায়।

একই প্রকার প্রকার প্রলেপ প্রয়োগে সকল প্রকার শোথ প্রশমিত হয় না, শোথ বিশেষে প্রলেপ বিশষের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তজ্জন্য বাতাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শোথের লক্ষণ দেখিয়া যে শোথে যে প্রকার প্রলেপ দিবার উপদেশ আছে সেই প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রলেপ প্রয়োগ করিবার কয়েকটী বিশেষ বিধি।

শোথ বসাইবার প্রলেপ দিনের বেলায় দিতে হয়, রাত্রিকালে দিতে নাই।

শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দিতে হয়। যদি ব্রণশোথের স্থান বিশেষ উচ্ছিত হয় অর্থাৎ উঁচু হইয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ উঁচু স্থান আদৌ বিদীর্ণ হইয়া পুঁজ রক্ত প্রভৃতি নির্গত হইবে। এরূপ উঁচু স্থানকে লোকে ফোড়ার মুখ বলে। ফোড়ার মুখ আলগা রাখিয়া শোথস্থান আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

যে দ্রব্যের যেরূপ স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ এবং আস্বাদ তাহা যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে সে দ্রব্য

ভাল আছে বুঝিতে হইবে। প্রলেপের জন্য ভাল দ্রব্য অবশ্যই গ্রহণ করিবে। টাট্‌কা গাছ গাছড়ার প্রয়োজন হইলে সতেজ গাছের ছাল, মূল, পাতা প্রভৃতি লইতে হইবে। প্রলেপের দ্রব্য বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। পোকায় ধরা লতা পাতা ফল মূল কদাচ গ্রহণ করিবে না। বেণে-মসলাও যাহা টাট্‌কা থাকে তাহাই লইবে।

যে খলে বা শিলায় প্রলেপ বাটিতে হইবে তাহা যেন খুব পরিষ্কার হয়। বাটিবার নোড়াও বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

প্রলেপের দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে বাটিয়া লইতে হইবে!

এক আঙ্গুল পুরু প্রলেপ দিলেই কার্য্যসিদ্ধ হয়। তার চেয়ে পুরু প্রলেপ দিলেও হানি নাই। ঘসা চন্দন প্রভৃতি এরূপ ঘন করিয়া লইবে যে প্রলেপ দিলে গড়াইয়া না পড়ে।

প্রলেপ শুকাইয়া আসিলেই তাহা উঠাইয়া নূতন প্রলেপ দিতে হয়। শোথের উপর প্রলেপ সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

একবার দেওয়া প্রলেপ কদাচ পুনর্ব্বার দিবে না। অনেকক্ষণ বাটিয়া রাখা প্রলেপ কি বাসি প্রলেপ দিতে নাই।

রোমাবলী উৎক্ষেপ করিয়া নীচের দিক্ দিয়া উপরের দিকে প্রলেপ যোজনা করিবে।

বাতজ ব্রণশোথের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদি বাতজ ব্রণশোথে টাটানি, শূলানি এবং দপ্‌-দপানি প্রভৃতি নানা প্রকার যাতনা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিয়া স্বেদ অর্থাৎ তাপ দিলে সত্বর যাতনার লাঘব হয় এবং ফুলা কমিয়া যায়।

১

কৃষ্ণতিলের অর্থাৎ কালতিলের শাঁস এরণ্ড বীজের অর্থাৎ ভেরেণ্ডার বীজের শাঁস এবং তিসি এই দ্রব্য তিনটির প্রত্যেক দ্রব্য তুল্য পরিমাণে ওজন করিয়া জল দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে।

ব্রণশোথের উপর সেই বাটনার পুরু প্রলেপ দিয়া, প্রলেপের উপর কলার কচি পাতা রাখিয়া তাহাতে তাপ দিবে। লোহার হাতা আগুণে গরম করিয়া কি কাপড়ের পোঁটলা গরম করিয়া মৃদু মৃদু তাপ দিতে হইবে।

২

গাওয়া ঘি গরম করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া শোথের উপর রাখিবে। তদুপরি অল্প অল্প গরম ঘি পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করিলে বাতজ শোথের যাতনা কমিয়া যায়। যেরূপ গরম লাগিলে রোগী সোয়াস্তি বোধ করে সেইরূপ গরম অবস্থায় ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩

যজ্ঞডুম্বুর গাছের টাট্‌কা নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা লইয়া সেই আঠার উপর প্রলেপ লাগাইলে শোথ বসিয়া যায়।

৪

যজ্ঞডুম্বুরের গাছের বা শিকড়ের ছাল শীতল জলের সহিত বেশ করিয়া বাটিয়া অল্প গরম করত পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলেও উপকার লাভ করা যায়।

৫

ডেউয়া বা ডহুয়া অথবা মাদার প্রভৃতি নামে পরিচিত গাছের আঠায় সৈন্ধব মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বাতজশোথ অচিরে বসিয়া যায়। বাঘী নামক অতি দুষ্ট শোথও এই প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

৬

বেগুণের ফুল এক ভাগ ও মরিচ সিকি ভাগ একত্র জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপ-

কার লাভ হয়। শোথের আয়তন বুঝিয়া বেগুণের ফুলের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণশোথ বসাইবার প্রক্রিয়া।

তুলাবাপ।

১

শীতল জলের সহিত রক্তচন্দন ঘসিয়া খুব ঘন করিয়া লইবে। সেই ঘসা চন্দন পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণশোথের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। যেমন একটী প্রলেপ শুকাইয়া আসিবে অমনি সেটী ধুইয়া অপর একটী প্রলেপ লাগাইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপে প্রলেপ লাগাইলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

২

দূর্ব্বার মাইজ শীতল জলের সহিত বাটিয়া তাহার সহিত ঘসা রক্ত চন্দন মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

৩

দূর্ব্বা, নলের মূল, যষ্টিমধু চূর্ণ এবং রক্ত চন্দনের গুঁড়া একত্র জল দিয়া বাটিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে উক্ত উভয় প্রকার শোথ বসিয়া যায়।

যদি ফোড়ায় খুব জ্বালা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

৪

কৃষ্ণতিল মেটে পাত্রে রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুনের তাপে অল্প ভাজিয়া কোন পাত্রস্থিত গরুর দুধে ফেলিবে। তারপর সেই দুধে ভিজা তিল বেশ করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথের জ্বালা জুড়াইয়া যায়।

ঘায়ে জ্বালা থাকিলেও উক্ত প্রলেপ ঘায়ের উপর লাগাইবে। ইহার ন্যায় ঘায়ের জ্বালা নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

Swadeshi Case স্বদেশী কেস প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। এ পুস্তকে স্বদেশী সম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি মোকদ্দমা হইয়াছে তৎসমুদায়ের ধারাবাহিক কাহিনী এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে। কি প্রকারে সামান্য "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে কর্তৃপক্ষের অন্তঃকরণে বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল তাহা পাঠ করিলে যথার্থই বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। পুস্তকখানি কলিকাতা সিটিবুক সোসাইটিতে প্রাপ্তব্য।

ভারতমহিলা—আষাঢ়। এই সংখ্যায় কয়েকটী সুন্দর চিত্র আছে তন্মধ্যে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর "মোদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে" নামক চিত্রটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলিও বঙ্গ সাহিত্যে খ্যাত প্রতিষ্ঠ লেখকগণ কর্তৃক লিখিত। 'ভারতমহিলা' মহিলাসমাজের গৌরবের জিনিষ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার সবিশেষ উন্নতি কামনা করি।

নতি নলিনী। শ্রীযামিনীনাথ সান্যাল প্রণীত। মূল্য দুই আনা। যামিনীনাথ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহার নতি নলিনী সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা ভক্তি, শিক্ষা ও নীতিপূর্ণ বাক্যগুলি এত সরল যে পাঠ করিলে "শান্তিশতক" পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

আশা—বৈশাখ। 'আশার' বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছি। অনেক প্রসিদ্ধ লেখক এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন। কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আশার লেখা সাহিত্য ক্ষেত্রে বেশ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

Rani Sri (৫) Dambar Kumari Devi আখ্যায়িকা; মূল্য ১৲ টাকা। মহাত্মা শ্রী

শ্রীমতী দক্ষর কুমারী দেবী নেপাল রাজ্যের প্রধান সচীব সুবিখ্যাত মহারাজ রাণা জঙ্গবাহাদুরের চতুর্থ কন্যা এবং মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ ধীর বিক্রমের পত্নী। দক্ষর কুমারী নিজে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতা এবং শিকারাদি কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার স্বলিখিত আত্মকাহিনী অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। কালের কুটিল গতি বশাৎ কি প্রকারে অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজরাজ্য হইতে আত্মীয় কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারই বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহার ধৈর্য্যের ও মহদন্তঃকরণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত রমণীর এইরূপ শৌর্য্য বীর্য্য কাহিনী প্রত্যেক ভারতবাসীরই পাঠ করা উচিত। এই দুঃখের সময়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তিনিই বলিতেছেন, "যদপি জন্ম বভূব পয়োনিধৌ নিবসনং শগতা পশুপতেঃ। তদপি নাম পুরাকৃত কর্ম্মণা পততি রাহু-মুখে খলু চন্দ্রমা॥" ভগবান তাঁহাকে শান্তি প্রদান করুন।

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ণ ।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তদুপসর্গ মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্‌টনানি, সপূঁয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলুদে বা সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হওয়া, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত সূতার ন্যায় পড়া, কিম্বা খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, বাহ্যে বসিয়া বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্রনির্গত হওয়া, স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্র শুক্র পতন বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে কুচিন্তা লাগিয়া থাকা, বদ হজম, ক্ষুধা বোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়া, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হইবে। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক মহৌএ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ। ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য নাহইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে ১ দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিযাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাঁপানী কাস, ক্ষয়কাস, রক্ত উঠা, যক্ষাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ ১ বটিকা সেবন করিবা মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন স্কোয়ার,

কলিকাতা।

বিশেষ পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ ঔষধ

১। ক্ষতকুলান্তক।

ইহা গরমি; বিকজ, কাউর, নালী, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পচা ও দূষিত ক্ষত, খোস পাঁচড়া, দাদ, ছুলি এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় শীঘ্র ও নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহাতে পারা নাই। মূল্য ।০ আনা প্যাকিং নাই, ৵০ আনা মাশুলে ৪ কৌটা যায়।

২। দদ্রুসংহার।

ইহা লেপনে সকলপ্রকার দাদ, ছুলি ও নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ ও ক্ষত রোগ বিনষ্ট হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, প্যাকিং নাই ৵০ আনা মাশুলে ৬ কৌটা যায়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—বি, এন্ মুখার্জ্জি—১৪ নম্বর হরলাল দাসের লেন, কলিকাতা ও শ্রীব্রজবিহারী মুখোপাধ্যায়—কপিব পোঃ আঃ, (খুলনা।

নিভৃত বিলাপকাব্য।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপান, বাঁধাই সুন্দর সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৯নং সুকিয়াস লেন, কলিকাতা।

মহাকালী এজেন্সি।

এখানে যাবতীয় পুস্তক, নানাবিধ স্বদেশী বস্ত্রাদি এবং যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ পাওয়া যায়। মফঃস্বলবাসীর সুবিধার্থে স্বদেশী অতি সামান্য দ্রব্য হইতে বহুমূল্য পর্য্যন্ত বাজারদরে সত্বর পাঠান হয়। বলা বাহুল্য ইহার উপস্বত্ব মহাকালী শিক্ষক সমিতির শিক্ষা বিভাগে উৎসর্গীত।

সোমপ্রকাশ ও বিশ্বজননীর সম্পাদক এবং মহাকালী পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ প্রণীত উক্ত পাঠশালার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

১৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, পোঃ শিমলা—কলিকাতা।

অপূর্ব্ব সুযোগ। অপূর্ব্ব সুযোগ!

ভাগ্য পরীক্ষা।

আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সাধারণের অনাস্থার কারণ এই যে তাঁহারা জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের নিকট অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ ফল মিলিতে দেখিতে পান না। এই জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য ফিরলজিকেল সোসাইটির স্থাপনা হয়। বহু পরীক্ষা ও আলোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের গণিত পদ্ধতি অশুদ্ধ সুতরাং ফলও তদ্রূপ হয়। যাহাতে এতদ্দেশে এই শাস্ত্রের পুনরায় প্রচার ও আদর হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ফিরলজিকেল সোসাইটীতে জন্ম সময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জ্ঞাত করাইলে বিনা পারিশ্রমিকে জাতকের জীবনের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের ফল সমূহ বলিয়া দিতেছেন। এই কার্য্য তাঁহাদিগের ব্যবসা নয়। কেবলমাত্র ডাকখরচের নিমিত্ত এক আনার টিকিটসহ পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ফিরলজিকেল সোসাইটী;

সম্পাদক;

২১।১।১, নবাবীওস্তাগরের লেন কলিকাতা।

ঘোষ প্রেস।

এই প্রেসে যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ঠিক সময়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীগণপতনাথ ঘোষ, ৩৮নং শিবনারায়ণদাসের লেন, কলিকাতা।

আর্য্যভূমি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

—(*)—

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ৶০ তিন আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে অথবা স্থগিত না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাঠাইতে থাকিব।

৩। মূল্য পাঠাইবারকালে অথবা অপর কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নিজের নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এই কথাটী লিখিবেন। পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকগণকেও বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইঁহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনা মত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।
খাদিয়া গাঙ্গীরা।

৩৮নং শিবনারায়ণদাসের লেন ঘোষ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও প্রিণ্টার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 431

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [শ্রাবণ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ,
শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু এম, এ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ,
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী,
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক)
শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি; পি দত্ত F. C.
S. PH, B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখো
পাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন, ডাক্তার বৈদ্য প্রভৃতি লব্ধপ্রতি-
ষ্ঠেন লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায়
লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা)
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা সোমপ্রকাশ প্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সার্শাপ্যারিলা

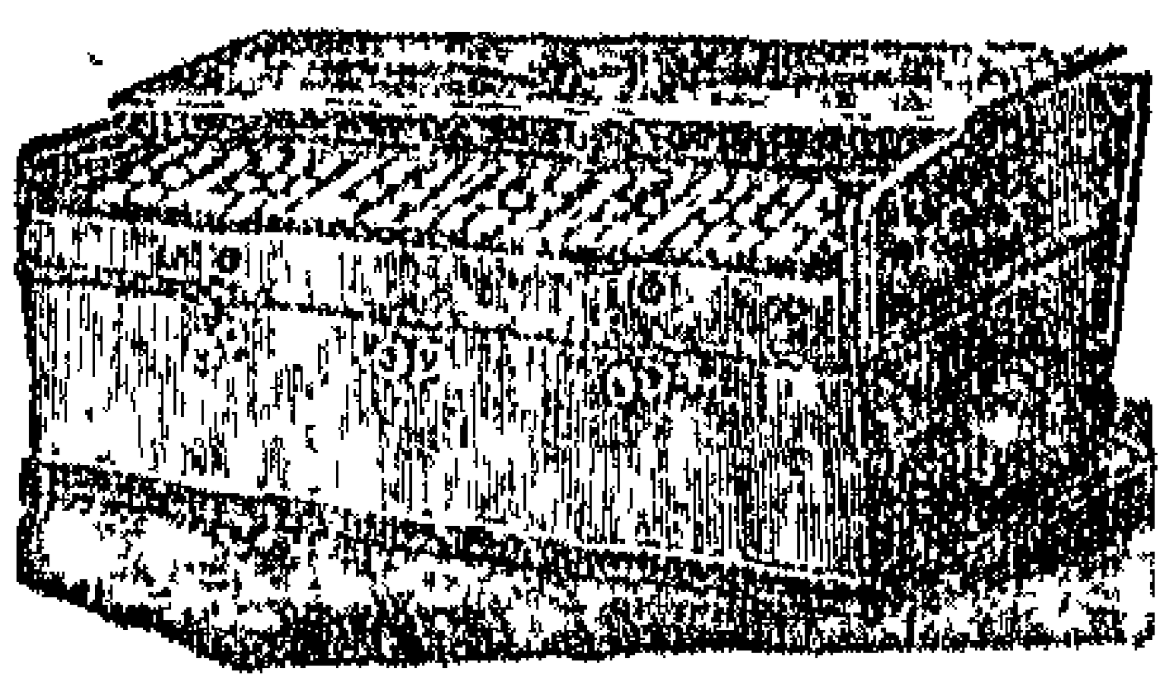
আধুনিক সকল প্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয়।
প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

THE

INDIAN HARMONINA Co.

MANUFACTURERS OF HARMONIUMS
FACTORY :—38, CREEK ROW, CALCUTTA.

TRADE **HARMONINA** MARK



The Harmonina, specially constructed for the Indian climate, sweet and powerful tone, in strong box.

3, Octaves, C to C, 3 stops, one set of reeds,			common	... Rs. 18 net.
Do.	do.	do.	ordinary	... ... 20 ,,
Do.	do.	do	best	... ... 22 ,,
Do.	do.	do	superior	... ... 24 ,,
Do.	do.	do.	extra superior	26 ,,
3 Octaves, C to C, 4 stops, 2 sets of reeds,			common	... ,, [illegible] ,,
Do.	do.	do.	ordinary	... ,, 30 ,,
Do.	do.	do.	best	... ,, 35 ,,
Do.	do.	do.	superior	40 to 45 ,,
Do.	do.	do	extra superior	50 to [illegible] ,,

HARMONIUM TUTOR with a master by U Roy, Re 1-4

Packing case, packing & forwarding Re. 1-4.

Terms cash in full with order.

Manager :—DWARKA NATH GHOSE,
The first Harmonium Manufacturer in India

SOLE AGENTS : Messrs. DWARKIN & SON
267, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA



মাতাজী মহারাণীর মৃত্যু সংবাদে মহাকালী পাঠশালার
ছাত্রীবৃন্দ শোক করিতেছে।

আর্য্যভূমি।

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [শ্রাবণ ১৩১৪ সাল।

স্পর্শমণি।

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ঈশ্বরপরায়ণ, সাধু মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের হৃদয়শায়ী ভুক্ত ভাবন ভগবান্ ভুক্ত কল্যাণের জন্য তাঁহাদের মুখ দিয়া যাহা বলান তাঁহারাও ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাহাই বলেন। এই সকল সারবান্ উক্তি মহাপুরুষের মহাবাক্য নামে খ্যাত; এবং ধর্ম্ম জগতের অমূল্য রত্ন। মানবগণ যখন সংসার মৃগতৃষ্ণিকায় আকুল হইয়া পড়ে, অজ্ঞানান্ধকারে পথভ্রান্ত হয়, গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না, তখন এই মহাপুরুষগণের উপদেশাবলীই তাহাদিগের পক্ষে সুশীতল বারির কার্য্য করে, এবং তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট সরণি দেখাইয়া দেয়। জানি না এই সকল উপদেশাবলী কি অমোঘ শক্তি সম্পন্ন, কি ঐশীবলে বলীয়ান্, যে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মানবের চিত্ত বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়, পাপজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, হৃদয়ের মালিন্য সংস্কৃত করে, কঠিন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

শুনিয়াছি স্পর্শমণি সংযোগে কঠিন লৌহও সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, লৌহের কৃষ্ণবর্ণ পীতবর্ণ ধারণ করে। স্পর্শমণি কেহ কখনও দৃষ্টিগোচর করে নাই, সুতরাং স্পর্শমণি অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু অবহিত চিত্তে প্রণিধান করিলে প্রতীতি হয় স্পর্শমণি অলীক স্বপ্ন নহে। এই সত্যসন্ধ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু মহাপুরুষগণই প্রকৃত স্পর্শমণি। ইঁহাদের চরণরেণু স্পর্শে, উপদেশাবলী কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিলে, প্রকৃতই লৌহবৎ মলিন কঠিন হৃদয়ও সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল ও নমনীয় আকার ধারণ করে।

এই সকল সাধু পুরুষেরাই ধন্য, ইঁহারাই মানব সমাজের অলঙ্কার, ইঁহারাই মানবমণ্ডলীর জীবনাদর্শ। নিম্নে এক মহাপুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল। অতঃপর ইঁহার শ্রীমুখে নিঃসৃত উপদেশাবলী 'সৎসঙ্গপ্রসঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়া প্রতিমাসে ধারাবাহিক রূপে আর্য্যভূমিতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর উক্ত দিবস ভারতবর্ষের হিন্দু প্রধান প্রদেশ মাত্রেই মহাসমারোহে এক উৎসব হইয়া থাকে, তাহার নাম গুরুপূজা মহোৎসব। আর্য্য-ভূমির সর্ব্ববিধ স্থানের মন্ত্রশিষ্য, শাস্ত্রশিষ্য প্রভৃতিগণ স্ব স্ব গুরুদেবকে যথাবিহিত পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল এই বাঙ্গালায় এই গুরুপূজা প্রথা দেখা যায় না। কলিকাতায় কেবলমাত্র পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর শুভাগমনের ফলে মহাকালী পাঠশালায় এই গুরুপূর্ণিমা উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমতী কুমারীবৃন্দ প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুরুপূজা উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্বর্গীয়া মহারাণী মাতাজী তপস্বিনীর কৃপায় বঙ্গদেশে এই গুরুপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা সাতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভায়ও আজ কয়েক বৎসরাবধি মহাসমারোহে গুরুপূজা মহোৎসব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসরও উক্ত সভায় গুরুপূজা উপলক্ষে বহুসংখ্যক দীন দুঃখী কাঙ্গাল এবং নানা স্থানের সাধু সন্ন্যাসীগণকে অন্নাদ্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এ সংবাদে সভার সৎকার্য্যের প্রশংসা আছে—যাঁহারা ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া কেবল পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পরহিতে ব্রতী হইয়া এরূপ সদনুষ্ঠানে জীবনোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগের আসন সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে। এই সভার পূজ্যপাদ আচার্য্য যিনি বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় নিজ সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের নরনারীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তাহাদিগের দুঃখের গভীরতা প্রত্যক্ষ করতঃ তন্নিবারণকল্পে মনোযোগী হইয়া ভগবৎ কৃপায় মহাপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজত্বের রাজধানী এই মহানগরী কলিকাতায় শুভাগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসীকে অপূর্ব্ব তেজোদৃপ্ত স্বধর্ম্মানুকূল বীরবাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছেন, সেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমাযুক্ত—সেই লোকহিতার্থে আবাল্য ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ স্বামী নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়ের অপার করুণায় ও ঐকান্তিক যত্নে আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

ইনি স্বদেশভক্ত স্বজাতিবৎসল, সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে দেশের গণ্যমান্য ও সুপণ্ডিত বরপুত্রের সংখ্যাই অধিক। ইনি একাহারী, নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন নিরীহ ব্যক্তি। এই জন্য, তাঁহার শরীরে প্রভূত বল না থাকিলেও তাঁহার মনের শক্তি ও সামর্থ্য অতিশয় প্রবল। সমাজের সাম্প্রদায়িক কলহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও অশান্তি নিবারণে এই মহাপুরুষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অজস্রবাণী—অমৃতোপম উপদেশাবলীর গুণে অনেকে এমন কি দস্যু ও

পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক সুনিয়মের অধীন হইয়াছে। যাহারা কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, ধর্ম্মের মধুর ভাব তাহাদের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিলে বড়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাহার আকর্ষণ বড়ই প্রবল হয়। তাই বলিতেছি, যে ব্যক্তি একবার এই মহাত্মার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যত বড় দুর্বৃত্ত হউক না কেন তাঁহার সামান্য কএকটী বাক্য সেই ব্যক্তির কর্ণ কুহরে অমৃত বর্ষণের ন্যায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতেই হইবে। এবম্বিধ সৎকার্য্যের নিমিত্ত স্বদেশবাসী তাঁহাকে রাজপূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই অলৌকিক প্রতিভাশালী সাধু পুরুষ এই খানেই স্বীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করেন নাই। স্বজাতির এবং ভক্তগণের উন্নতির অন্যবিধ পবিত্র পন্থাও অবলম্বন করিয়াছেন। যে বাঙ্গালী জাতি আত্ম-কলহে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিত ইনি তাহাদের মধ্যে একতা ও সহানুভূতির সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত করিতেছেন—এ মহান্ মহাপুরুষগণের হৃদয় দুর্গে রহিয়াছে। প্রতি রবিবারেই বাঙ্গালীর অবকাশ থাকে, সেই অবকাশে আর যাহাতে আমরা বৃথা অলীক আমোদে অথবা আত্ম-কলহে সময় ক্ষেপণ করিতে না পারি, তজ্জন্য ইনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং গীতোক্ত স্বধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আমাদিগকে স্বধর্ম্মাস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া প্রকৃষ্ট ধর্ম্মরূপ রণাঙ্গ বিদ্যায় শিক্ষিত করিতেছেন।

এই ভারত ভূমিতে কাল প্রভাবে নানাদেশীয় নৃপতি আসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু অধুনাতন ইংরাজ রাজত্বে বৃটিশ রাজ বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন বটে তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। অধুনা ভারত গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্ব শ্রেণীর মহাত্মাগণই আমাদের দেশের বালক এবং যুবকগণের চরিত্র বিহীনতা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। অনেকেই বলেন ইংরাজী শিক্ষাই এই সমূহ অনিষ্টের মূল; কারণ অধুনাতন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, রাজভক্তি এবং অপরাপর গুরুজন ভক্তি ও স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ইংরাজী বিদ্যা নানারূপে আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হইলেও শিক্ষা প্রণালীর দোষে এক প্রকার পরম শত্রু। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে এই ইংরাজী শিক্ষার সহিত বাল্যকাল হইতেই বালকদিগকে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা সম্বন্ধে উপদেশ না দেওয়াতেই অধুনা আমাদের দেশের শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে এতদূর ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" একমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রভূত কল্যাণের মূল স্বরূপ স্বকীয় ধর্ম্মেরই প্রতি যাহার আস্থা নাই তাঁহার মাতৃপিতৃ গুরুজন ভক্তি কিংবা রাজভক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বধর্ম্মে অনাস্থাশীল ব্যক্তি হিন্দুই হউন মুসলমানই হউন, অথবা খ্রীষ্টানই হউন, কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেন না।

এই স্বধর্ম্মানুকূল শিক্ষা দিবার উপযুক্ত সময়ই বাল্যকাল। কারণ সুকুমার মতি বালকদিগের কোমল হৃদয়ে যে উপদেশ একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আজীবনকাল থাকিয়া যায়। যে উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়ের বালকগণ ক্রমশ

কদাচার এবং অখাদ্য অব্যবহার্য্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া সুশিক্ষা লাভ করে তন্নিমিত্ত এই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন স্বদেশ প্রেমিক মহাতেজস্বী তপোধন "পেট্রিয়টিক ইনষ্টিটিউসন" নামক একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় সর্ব্ববিধ লোকের জ্ঞানের জন্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এখানে আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রভৃতি হিন্দু নরনারীর সকলেই ইঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন।

ইনি একাহারী, নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন নিরীহ ব্যক্তি। এইজন্য, তাঁহার শরীরে প্রভূত বল না থাকিলেও তাঁহার মনের শক্তি ও সামর্থ্য অতিশয় প্রবল।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বাল্য লীলার বিষয় আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকারীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রম পটুতা দর্শনে পাঠশালার গুরু অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন এই বালক যেরূপ মেধাবী ও ধর্ম্মপিপাসু এবং ইহার স্মৃতি শক্তি যেরূপ প্রবল তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখাইতে পারিবে এবং উত্তরকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবে। "ব্রাহ্মণ" বলিলে পূর্ব্বে বিস্তর কথা বুঝাইত বটে; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিলে আজকালকার দিনে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা প্রায় কিছুই নয়; কেবলমাত্র একটা অনেক দিনের পুরাতন আভিজাতিক উপাধি মাত্র। ইনি বাল্যকালে বাস্তবিক এ প্রকৃতির সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বাচ্য দ্বিজ ছিলেন না, তিনি অতি শৈশবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসী সন্ধ্যাহ্নিক পূজা এবং নিত্য নিয়মিত পূজা পাঠে নিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পাঠদশায় তাঁহার অসংখ্য কার্য্যের মধ্যে, ইংরাজীর অশেষ আলোড়নের মধ্যে প্রত্যহ প্রত্যুষ কাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টী পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। ইহা করিতে তাঁহার কোনও দিনই সময় ও অবকাশাভাব হইত না।

স্বামী নগেন্দ্রনাথ যেরূপ সাত্বিক প্রকৃতির লোক তাহাতে ইনি ধর্ম্ম জগতে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। অতি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন। পল্লীগ্রামস্থ একজন জমীদারের সন্তান হইয়াও বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ দেওয়া এবং সংসার সুখ সম্ভোগ করা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। বস্তুতঃ স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভ্যাস করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব হয়। যাঁহার সুতীব্র ধর্ম্মপূর্ণ, মর্ম্মস্পর্শী, সরল বক্তৃতায় লোকের শিক্ষা সাধিত ও সমাজের বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইয়া থাকে, স্বদেশের হিতকর ধর্ম্মের কার্য্যে যিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর, এই বঙ্গভূমিতে ধর্ম্ম আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্য যিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, দীন দরিদ্রের ক্লেশে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা বিগলিত, বিপন্ন ও শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ মোচনে যিনি আপনার শক্তির অতীত দান করিতেছেন, পাণ্ডিত্যাদিতায় যাঁহার সমকক্ষ এ দেশে খুব কম, যাঁহার অলোকসামান্য সদ্‌গুণরাজীর কথা সর্ব্ববিধ লোকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, তিনিই আমাদের গুরুদেব।

গুরু কে—এক অদ্বিতীয় ভগবান্। তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখা

যায়, তাহাই তাঁহার মূর্ত্তি।

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে শঙ্করি! শ্রবণ কর; যে মন্ত্র সেই গুরু, আবার যে গুরু সেই হরি, সেই ব্রহ্মা, সেই মহেশ্বর অর্থাৎ আমি, আর সেই তুমি। যথাঃ—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মা বাপি হরো বাপি ত্বংবাপি শৃণু শঙ্করি॥
ইতি তন্ত্রসারে।

আমরা বারাণসীধামে বহুকাল পূর্ব্বে একদিন মহাকালী পাঠশালা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই যখন পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীকে জিজ্ঞাসা করি,—"আমরা গুরুর মূর্ত্তির কিরূপে সেবা করিব, তাহা বলুন"।

মাতাজী বলিলেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে সাধুগণে ও ভক্তগণে ভগবানের প্রকাশ অধিকরূপে দেখা যায়। কারণ তাঁহাদের ভিতর ভগবান জ্ঞান, চৈতন্য ও আনন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগকে গুরুর মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিবে।

আমি বলিলাম। আমরা আজকাল সাধুদিগের মধ্যেও ছোট বড় বিচার করিয়া থাকি। সেইজন্য সকলকে সমভাবে ভক্তি করিতে পারি না এবং সকলের কথা সমভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এক্ষণে আমরা কিরূপে গুরু মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে পারি, তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

মাতাজী মহারাণী পুনরায় বলিলেন। সাধু ও ভক্তদিগের মধ্যে যাঁহাতে ভগবানের প্রকাশ অধিক দেখিবে তাঁহাকেই গুরুমূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিবে।

আমার অনেক সঙ্গী বলিলেন, "কাহার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অধিক আছে তাহা কিরূপে জানিব? তাহার লক্ষণ কি? অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আর মা! আজ কালকার দিনে এরূপ গুরু দেখিতে পাওয়া যায় না। শিষ্যের ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলেও এরূপ গুরু এখন আর নাই।" ইহাতে মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী একটু বিরক্ত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে বলিলেন "এই যে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে আমার নিকট আসিয়াছেন উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর উঁহাদের যিনি গুরুদেব তিনি একজন মহাপুরুষ, তিনি গোপনে অতি সাবধানে সাধন ভজন করিতেছেন।" এই বলিয়া আমাদের গুরুদেবের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন আমাদিগের অপর একজন বন্ধু যখন পুনরায় তাঁহার বিষয় সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন তিনি বলিলেন—"বৎস! তাঁহার দর্শন না পাইয়াও যখন তাঁহার জন্য তোমাদের চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে তখন এমন একদিন আসিবে যে তোমরাই তাঁহার শ্রীচরণে বিরাজ করিবে।" অতঃপর আমাকে আদেশ করিলেন—"বৎস! তোমার সঙ্গীগণ তোমার ন্যায় বড় ধর্ম্ম পিপাসু দেখিতেছি অতএব নগেন্দ্র বাবুর নিকট ইহাদিগকে লইয়া গিয়া প্রকৃত গুরু যে কি বস্তু তাহা দেখাইয়া দিয়া ইহাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবে। ভাদুড়ী মহাশয় সকলেরই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা জগতে অতুলনীয়; লোকাভিরাম নগেন্দ্র নাথ আপনার সুশীল ও শান্তস্বভাব এবং অনুপম সৌন্দর্য্য দ্বারা সর্ব্বসাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। অতএব এমন একজন মহাপুরুষের দর্শন লাভ বহুভাগ্যের কথা। তাঁহার কৃপা লাভ করিবার আশায়, তোমাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত অনেক যুবক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসা

উপদেশ গ্রহণে গমন করিয়া থাকে।

পরমারাধ্যা ভগবতী তপেশ্বরী মাতাজী মহারাণী যে মহাপুরুষের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—আজ আমরা তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে যথার্থই বিরাম করিতেছি। আজ এই আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমার দিবস তাঁহারই কৃপায় এই মহানগরী কলিকাতায় গুরুপূজা মহোৎসব হইতেছে। এই আশ্রমটীর নাম "সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী নিকেতন।" এখানে গুরু পূজার দিন বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সহরের যে সকল গণ্য মান্য ব্যক্তি ও ভদ্র-মহিলাগণ আমাদের পরম আরাধ্য দেবতা ঠাকুরকে গুরুতুল্য ভক্তি করেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় বিবিধোপচারে পূজনীয় গুরুদেবের পূজা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই আমরা এই আশ্রমের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই অপার আনন্দ লাভ করিলাম। দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালা, আম্রপল্লবশ্রেণী সুশোভিত এবং সশীস নারিকেল ও আম্রপল্লব সহ মনোহর মঙ্গল ঘট সকল বারি পরিপূর্ণ! কোন স্থানে যন্ত্র বাদ্যবাদকগণ আপন আপন যন্ত্র বিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছিলেন; অধিকন্তু গুরুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখানে বীণাযন্ত্রে ভজন করিতে করিতে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তৎপার্শ্বস্থ গৃহে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও আন্দুলনিবাসী জনৈক ভক্ত সুমধুর স্বরে হরি গুণ গান করিয়া শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন; এই পবিত্র আশ্রমে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত কুল-কামিনীগণ গুরুপূজা করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না; মহিলাগণের জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত এই বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমরা অন্য কোন স্থানে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

ক্রমে উপরে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ পার্শ্বের এক সুবিস্তৃত গৃহের মধ্যে সুচারুরূপে ভূষিত বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত অপূর্ব একখানি সিংহাসনে সেই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন ঋষিপ্রতিম পরমারাধ্য সাধু-পুরুষ সমাসীন। আকর্ণ বিস্তৃত অক্ষিযুগল স্থির-নিশ্চল-নিমীলিত, যেন অন্তরে কি এক অপূর্ব মোহন মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন! অধর ওষ্ঠ অতি মৃদুভাবে কম্পিত! ধীরে অতি ধীরে ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত! মহাপুরুষ যেন মহাধ্যানে মগ্ন।

এই ধূর্জ্জটিপ্রতিম তপোধন যেন নিমীলিত নেত্রে তপোনিরত রহিয়াছেন। ঠাকুরের পরিধানে বারানসী ধুতি অঙ্গে সেই উত্তরীয় শোভিত হইয়া বহু মূল্যবান অলঙ্কার সকলকে ব্যঙ্গ করিতেছে। পশ্চাদ্দেশে নাতি দীর্ঘ প্রবাল-নীবিড় জলদকান্তি কেশজাল বিলুণ্ঠিত, সম্মুখেও সুদীর্ঘ শ্মশ্রু মন্দ মারুত স্পর্শে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন সাক্ষাৎ ভূতভাবন পতিতপাবন কৈলাশ-বিহারী পরম পিতা মহেশ্বরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। গুরুদেবের এই স্বর্গীয়মূর্ত্তি দর্শনে কিরূপ ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কারণ সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বর্ণনাতীত!

এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন :—

মনুষ্য চর্ম্মণাবদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
সশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতিক্ষিতৌ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

বাস্তবিকই সাক্ষাৎ ভগবান পরম শিব মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুরুরূপে শিষ্যকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন।

মহা পুরুষের সম্মুখে কিছুদূরে শিষ্য সকল সসম্ভ্রমীকৃতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সকলের

আনন্দিত। সকলের মুখমণ্ডল পবিত্র আনন্দে উৎফুল্ল। শিষ্যগণ যখন গুরুপূজা আরম্ভ করেন তখন এক অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই আশ্রমটী প্রকৃত প্রস্তাবে একটী অতি পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে পরিণত। এই গুরুপূজা উৎসব, ভক্তিমান্ আস্থাবান্ হিন্দু মাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ করে। ঠাকুরের সে দিনের সেই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনেই সংসার দাব দগ্ধ দর্শকের তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ঢালিয়া দিয়াছিল।

পূজনীয় ঠাকুরের সম্মুখে অর্থাৎ শ্রীপাদ পদ্মের প্রান্তদেশে একখানি নয়নরঞ্জন মনোহর ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি তদীয় স্বর্ণ খচিত রজত নির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় বিরাজিত। এরূপ সুন্দর চিত্রিত পাদুকা বঙ্গবাসীগণ কেহ কখনও দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তদুপরি আবার নানাবিধ বনজ পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিরসের আবির্ভাব করিয়া দিতেছিল। ঠাকুরের পাদুকায় অঙ্কিত চিত্রের অতি গূঢ় মর্ম্ম আছে।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল যে পূজোপকরণ যাবতীয় পূজার সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপধারে ধূপ ধূনা অগ্নি সহযোগে মধুর গন্ধ বিস্তার করিয়া সেই পবিত্র গৃহটী আমোদিত করিতেছিল। নানাবিধ স্থলজ জলজ পুষ্পরাশি পুষ্পাধারে অবস্থান করিয়া এই মহাপুরুষের অভয় চরণে স্থান লাভ করিবার অপেক্ষা করিতেছিল। আর সম্মুখেই একখানি সুচারু আসন প্রসারিত ছিল। ভক্তবৃন্দ আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া গুরু পূজা করিবেন বলিয়া এরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল। শিষ্য মণ্ডলী শ্রেণী বদ্ধ হইয়া একে একে যখন গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ পুষ্পাদি দ্বারা গুরু চরণ পূজা করিতে লাগিলেন বেদমন্ত্র সমস্বরে শ্রীগুরু স্তোত্রপাঠ করিলেন তদ্ধ্বনে তখন প্রকাশ্যে স্বীকার না করুক ঘোর নাস্তিকের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইত। এই সময়ে ঠাকুরের নিকট কত লোকে মানসিক করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া যান। এরূপ অলৌকিক দৃশ্য বঙ্গদেশে অদ্যাপি কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় নাই। বস্তুতঃ পূজনীয় গুরুদেব বঙ্গে এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়া দিতেছেন। তিনি যে বীজ উপ্ত করিতেছেন তদুদ্ভূত বৃক্ষে অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রকেই নবজীবন প্রদান করিবে।

ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি এবং তদীয় অমৃতময়ী উপদেশাবলী পাঠকবর্গকে সময়ান্তরে উপহার প্রদান করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

আকাশ।

১

অনন্ত আকাশপট,
কে জানে কোথায় তট,
বিবিধ অসংখ্য ছবি
শোভে থরেথর।
শোভে থরেথর,
মূর্ত্তি মনোহর,
বিবিধ বরণে
রঞ্জিত সুন্দর।

২

জলধর শশধর,
গ্রহদল দিবাকর,
ধূমকেতু উল্কা কত
ররেছ উদরে।

ধরেছ উদরে,
তারকা নিকরে,
মহাকক্ষে তব
ভুবন বিচরে।

৩

বিমল প্রভাতে কিবা,
অরুণের চারুপ্রভা,
হে নভো অরুণোদয়ে
মনে মনে গণি।
মনে মনে গণি,
সুষমা এমনি,
নীলোৎপলে শোভে
পদ্মরাগমণি।

৪

মধ্যাহ্নেতে দিবাকর,
বরষিয়া তীক্ষ্ণকর,
উজ্জ্বল প্রভায় করে
প্রদীপ্ত সকল।
প্রদীপ্ত সকল,
তব মধ্যস্থল,
প্রকাণ্ড হীরকে
শোভে নীলাচল।

৫

দিনমণি অস্তে যায়,
শোভিছে তোমার কায়,
অস্তগামী রবি কর
লোহিত প্রভায়।
লোহিত প্রভায়,
রবি শোভা পায়,
হেম পিণ্ডরূপে
শোভে নীলকায়।

৬

প্রদোষ হইলে গত,
রূপের নানামত,
তোমার অগাধ দেহে
অনন্ত অম্বর।
অনন্ত অম্বর,
তারকা নিকর,
কুমুদেতে পূর্ণ
নীল সরোবর।

৭

পূর্ণিমা শুভ্র যামিনী,
কৃষ্ণা অমা মিলিথিনী,
ধবল অসিত বাসে
সাজায় তোমায়।
সাজায় তোমায়,
মোহন মায়ায়,
সুবর্ণ চুমুকী
কত শোভা পায়।

৮

হেমন্ত ও শীতকালে,
আচ্ছন্ন শিশির জালে,
মধুময় বসন্তেতে
সুরভি সমীরে।
সুরভি সমীরে,
ঢাকিয়া শরীরে
প্রমোদে মাতিয়ে
চল ধীরে ধীরে।

৯

নিদাঘে তাপিত হয়ে,
প্রাবৃটে জলদোদয়ে,
বিষম বিপদাপন্ন
হওহে কেবল।

ত ওহে কেবল,
গগনে নির্ম্মল,
দূরদেশে রাখি
জলদ পটল।

১০

মুক্ত পক্ষে উড়ে যায়,
সারি সারি বলাকায়,
স্থান দান কর সবে
ওহে মহাকায়।

ওহে মহাকায়,
যত বলাকায়,
সূত্রহীন মাল্যে
তোমারে সাজায়।

১১

সলিল শীকর-চয়,
রবির কিরণ-ময়,
প্রাবৃটে তোমার অঙ্গে
শোভে রামধনু।

শোভে রামধনু,
অপরূপ তনু,
ধরে নাম এক
আর ইন্দ্র-ধনু।

১২

সুদীর্ঘ তোরণ যেন,
শোভে মনে লয় হেন,
বিমোহিত হয় চিত
স্তম্ভ হীনতায়।

স্তম্ভ হীনতায়,
যেন শোভা পায়,
নিসর্গের শোভা
কতই বাড়ায়।

১৩

বিদ্যুৎ চমকে কত,
অপরূপ রূপ যত,
তোমার সুনীল কায়,
পুনঃ মিশে যায়।

পুনঃ মিশে যায়,
বজ্র ধ্বনি তায়,
ভৈরব রবেতে
সৃষ্টি নাশে ধায়।

১৪

প্রাবৃটে জলদ দলে,
মত্ত হয়ে কুতূহলে,
সাজায়ে আপন দেহ
ময়ূরে নাচাও।

ময়ূরে নাচাও,
চাতকে বাঁচাও,
নব নীর দানে,
চকোরে কাঁদাও।

১৫

তোমার বিহনে হায়,
রহিত শব্দ কোথায়,
জগত জীবন বায়ু
কিরূপে বহিত।

কিরূপে বহিত,
প্রকাশ পাইত,
অনলের শিখা
তিমির নাশিত।

১৬

তোমা বিনা বাষ্প রাশি,
কোথায় উঠিয়া আসি,
মেঘ দল সাজাইত
বরিষণ তরে।

বরিষণ করে,
সব চরাচরে,
রক্ষিবার তরে,
পৃথিবী উপরে ।

১৭

ভো মহো অনন্তকায়,
এ বিশ্ব বাড়িয়া যায়,
যতই কল্পনা করি
তব অপরূপ ।

তব অপরূপ
দেখায় স্বরূপ,
বিশ্ব বিধাতার
সে দেহ কিরূপ ।

১৮

ভক্তি পূর্ণ মনে আমি,
পূজি সে জগত স্বামী,
যে দেহ স্বরূপ ধরি
তোমাতে প্রকাশ ।

তোমাতে প্রকাশ,
দেখিতে আকাশ,
সেই নিত্যধনে
সদা অভিলাষ ।

স্বামী বিবেকানন্দ ।

অতীতের যবনিকা অন্তরালে যে এক নয়ন-মনোহর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি উহা কোন মহাপুরুষের ? কি নর-দুর্লভ গভীর ভাব-স্নেহ, প্রীতি ও করুণার সহিত মাখামাখি করিয়া মুখ-মণ্ডলে বিরাজমান রহিয়াছে ! কি বিস্ফারিত নেত্র-যুগলে বৈরাগ্যের ছটার সহিত মিশিয়া পূর্ণ সমাধিকত্ব পবিত্রচিন্তাশীল ঋষি সন্দেশ ? এ অরবিন্দসুন্দর নয়নদ্বয়ের জ্যোতিঃপ্রভা দেখিলে কাহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হয় ?

পাঠক শুনিবেন এ প্রতিমূর্ত্তি কাহার ? সমস্ত পৃথিবী অবাক হইয়া যে সন্ন্যাসী বাঙ্গালী যুবকের প্রতিভার আলোচনা করিয়াছিল জ্ঞান গরিষ্ঠ ইংলণ্ড ও আমেরিকা অবনত মস্তকে যে বাঙ্গালী সাধুর কথা শুনিয়াছিল—যাঁহার অপরিমেয় উদ্যমে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইয়াছিল, ইহা সেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্ত্তি ।

জীবনী-সমালোচনা লোক-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তির জীবনী-সমালোচনায় অনেক শিখিবার আছে। বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী-আলোচনায় পুণ্য আছে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে সন ১২৬৯ সালের ২৯ শে পৌষ সোমবার রাত্রি ১১।২৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শিমলায় বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতৃ-দত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রেরা তিন ভাই। নরেন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মহেন্দ্র মধ্যম ও ভূপেন্দ্র কনিষ্ঠ। কালের কুটিলগতিবশতঃ আজ ভূপেন্দ্র রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়া কারাবাসে।

নরেন্দ্র ছেলে বয়সে বড় আমোদে ছিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু বলেন যে "তাঁহার মত তাস-ক্রীড়ায় আমোদ প্রমোদে ধূমপানে ও গীতবাদ্যাদিতে এমন আর দুটী ছিল না। কিন্তু ঐ আমোদের মধ্যে কোন কদর্য্যতা দেখা যাইত না। প্রাণটা যেন খোলাগড়ের মাঠ—যত মাড়িয়ে যেতে পার মাড়িয়ে যাও।"

বাল্যকালে নরেন্দ্রের বড় ধর্ম্মের প্রতি টান ছিল না; বরং তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৯১ সালে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতেও তিনি সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সময়ে, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। দুঃখের কথা বলিতে হইবে, দেশের সৌভাগ্য বলিয়াই এখন মনে হয়, আইন পাঠ তাঁহার সমাপ্ত হইল না।

অদৃষ্টের অলক্ষ্য গতি তুমি আমি কি বুঝিব? আইন পাঠে নরেন্দ্রের পুরুষকারের পূর্ণ পরিচয় ত পাইলাম; কিন্তু অদৃষ্ট আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিল। অদৃষ্ট-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া বিবেকানন্দকে অন্যপথে চলিতে হইল। একে যৌবনকাল, তাহাতে আমোদ প্রিয়তা, এই আমোদ প্রমোদের সময়েই তাঁহার এক স্পর্শমণির সঙ্গলাভ হইল। পুরুষকার বিফল হইল বটে, কিন্তু প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় ছিল; ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজবপন হইল, বৃষ্টি হইল না; সুতরাং ফসলও ফলিল না; অদৃষ্টের দোষ; কিন্তু প্রতিভা যাইবে কোথায়? আইন শিক্ষায় ব্যাঘাত হইল সত্য, কিন্তু তাহা না হইলে কি আজ নরেন্দ্রকে কেহ চিনিত, না ভক্তি করিত? এই সময়ে যে স্পর্শমণির সঙ্গলাভ হইয়াছিল, মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই স্পর্শমণি। ভগবান্ রামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের পর নরেন্দ্র—বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন—দশ বৎসর ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া ভারত পর্য্যটন করিলেন—আমেরিকায় গিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। ভারতের গৌরব দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইল।

চিকাগোনগরের ধর্ম্ম মহাসমিতির কথা চির স্মরণীয়। এসম্বন্ধে বিবেকানন্দের জনৈক বিশেষ পরিচিত বন্ধু যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা বলিতেছি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে ধর্ম্মের মহাসমিতি আহূত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই মহাসমিতিতে উপস্থিত হন। অপরিচিত অজ্ঞাতনামা স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে সেই মহাসমিতিতে উপস্থিত হন। তখন পর্য্যন্তও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে কি এক মহাশক্তি, কি এক অপূর্ব্ব প্রতিভা ঐ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত আছে—কি অতুল বাগ্মীতা—কি অপরিমেয় শাস্ত্রজ্ঞান কি পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা ঐ গৈরিক বসনের নিম্নে লুকায়িত আছে।

মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের মত ও মহিমা ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক, সনামখ্যাত বাগ্মী স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই মহাসভায় বক্তৃতা করিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতের ব্যাখ্যা করিলেন।

তাহার পর গৈরিক বসন ধারী, গৈরিক উত্তরীয় ও গৈরিক শিরস্ত্রাণধারী অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক—বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে তখন যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—সেই পণ্ডিতগণের সভায় একজন অপরিচিত অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই যুবক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন—ক্রমে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার স্বর উঠিতে লাগিল—হিন্দুধর্ম্মের পাবন ব্যাখ্যা যুবকের মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। যুবকের বক্তৃতা শক্তি—যুবকের শাস্ত্রজ্ঞান—যুবকের অকাট্য যুক্তিতর্কের প্রণালী দেখিয়া বিদ্বজ্জনী, সাধুসমাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই বাঙ্গালী যুবকের কথা শুনিতে লাগিলেন,—সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল,—সে আন্দোলন, সে প্রশংসাধ্বনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে নূতন ও পুরাতন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ সত্য সত্যই প্রতিভাব অবতার স্বামী বিবেকানন্দ সত্যসত্যই মহাজ্ঞানী পুরুষ। তখন ভারতবর্ষ জানিতে পারিলেন—বঙ্গভূমি কি অমূল্য রত্নের প্রসবিনী।

এইবার আমরা বিবেকানন্দের জন্ম পত্রিকা ও তাহার বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আজকাল জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে জ্যোতিষীগণের গণনার ফল প্রায়ই মিথ্যা হইত না। এক্ষণে ফল না মিলিবার প্রধান কারণ এই যে আধুনিক জ্যোতিষীগণের গণনা পদ্ধতি অশুদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি মূলগ্রন্থ হইতে গণনাদি না করিয়া স্থূলমার্গে রচিত ভ্রমসঙ্কুল নিয়মে গ্রহগতি নিরূপণ প্রভৃতি যাবতীয় গণনা সম্পন্ন হয় বলিয়া নিয়তই ফলের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থাদি অনুমোদিত দৃক্-গণিতের সাহায্যে এই মহাপুরুষের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া তৎপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ প্রাতঃ ৬টা ৩৩ মিনিটের সময় সায়ন তুলা রাশির দ্বাদশ অংশ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল। এই সময়েই বিবেকানন্দের জন্ম হয়। নিম্নে সায়নগ্রহ সকল স্ফুট প্রদত্ত হইল।

রবি রাশ্যাদি ৯।২৯।৫৫
চন্দ্র রাশ্যাদি ৬।১৮।৪৮
বুধ রাশ্যাদি ১০।৪।৫৩
শুক্র রাশ্যাদি ৯।২৯।৫৬
মঙ্গল রাশ্যাদি ০।২৮।৩৬
বৃহস্পতি রাশ্যাদি ৬।২৬।১
শনি রাশ্যাদি ৬।৫।৩২
রাহু রাশ্যাদি ৮।১৯।৮
কেতু রাশ্যাদি ২।১৯।৮

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তুলালগ্নে শনি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, মঙ্গল কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হইয়া জন্মসময়ে উদিত হইতেছিল। চররাশি উদিত লগ্ন ও ছয়টী গ্রহ চরস্থ হওয়াতে তাঁহার লোক বিমোহিনী প্রতিভার সূচনা স্পষ্টরূপেই জানা যায়।

মনোবৃত্তির উচ্চাবস্থায় তিনি সমান সাহসের সহিত জনসাধারণের অবাধ্য প্রকৃতির সঙ্গে তর্ক ধারণা করিতে পারিতেন। তুলালগ্নের ফলে বিবেকানন্দ দেশান্তর ভ্রমণকারী, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মব্যবসায়ী; চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্রে উদিত হওয়ায় অলৌকিক জ্ঞানের অনুমিত হয়। বুধ এবং শনি তুঙ্গী থাকায় লোকের সৌভাগ্য ও সম্মান সূচিত করিতেছে। লগ্ন শনিযুক্ত ও মঙ্গল কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার অদ্ভুত পথাবলম্বন এস্থলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে দশমাধিপতি চারিটী গ্রহের সহিত কেন্দ্রে অবস্থান করিলে লোক মুক্তিলাভ করে অথবা চারিটী গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থান করিলে লোক

সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। লগ্ন হইতে গণনার প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। এস্থলে দশমাধিপতি চন্দ্রলগ্নে, বৃহস্পতি ও শনিযুক্ত, মঙ্গল, রবি, বুধ ও শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং কেন্দ্রে অবস্থিত, আরও কেন্দ্রে ছয়টী বলবান গ্রহ, সুতরাং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ খুব স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে।

লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান বৃশ্চিকরাশি, তাহার অধিপতি মঙ্গল স্বক্ষেত্রগত হইয়া সপ্তমস্থ, ইহাতে জাতকের অর্থসম্বন্ধে কখন অসচ্ছলতা সূচিত করে না, বরং বন্ধুবান্ধবাদি হইতে অর্থলাভ জ্ঞাপন করে।

চতুর্থভাবপতি শনি তুঙ্গী হওয়ায় জাতক যে দেশে গমন করুননা, সেখানে পূজিত হইতেন এবং সকলে আদরে তাঁহাকে স্থান দিত।

পঞ্চমস্থান বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানলাভ প্রভৃতিও অনুমিত হয়। পঞ্চমভাব কুম্ভরাশি, অধিপতি শনি তুঙ্গী, এস্থলে বুধ ও উচ্চস্থ হইয়া অবস্থিত, সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জ্ঞাপন করিতেছে। প্রথমতঃ কুম্ভরাশি ও শনি ধর্ম্মবিষয়ে, সন্ন্যাস বিষয়ে ঔৎসুক্য বুঝায়, তথায় বুধ উচ্চস্থ, সুতরাং তাঁহার অতুল বাগ্মীতা, অপরিমিত শাস্ত্রজ্ঞান, এবং পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

ষষ্ঠস্থান শত্রু ও পীড়াবোধক। ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নস্থ শনিযুক্ত এবং মঙ্গলকর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট; সুতরাং তুলারাশি অবস্থিতি হেতু উক্ত রাশিবোধক অঙ্গে পীড়া সূচিত করে। স্বামীজি বহুমূত্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সপ্তমস্থান বিবাহবোধক। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল শনি চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় এবং অংশরূপ উৎকট সন্ন্যাসযোগ থাকায় বিবেকানন্দের বিবাহই হয় নাই।

লগ্নপতি ও অষ্টপতি উভয়ই শুক্র। এই গ্রহ রবিযুক্ত কিন্তু কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না পাওয়াতে দীর্ঘায়ুযোগ ভঙ্গ হইয়াছে।

বঙ্গের দুর্ভাগ্যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মাসে রাত্রি ৯॥০ সময় পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে, বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের দেবাত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। আজ ঠিক পাঁচ বৎসর হইল দেখিতে দেখিতে বঙ্গের অতুল কীর্ত্তিমান্ বিবেকানন্দ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি সাধুপুরুষ, তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সান্ধ্যভ্রমণ করিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং প্রায় একঘণ্টা ভগবানের প্রার্থনা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। একঘণ্টা পরে নিদ্রিত অবস্থায় দুইটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমরবাঞ্ছিত দেবলোকে সহসা গমন করিলেন।

যে গুণে বিবেকানন্দের এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সে গুণ ইহ-সংসারে এখন সুদুর্ল্লভ। তাঁহার সে গুণের কথা স্মরণ করিয়া, আজ বহুসংখ্যক ভারতবাসী শোকাচ্ছন্ন, বিদেশী বিজাতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাঁহার সেই গুণে বিমুগ্ধ হইতেন। গুণসংখ্যাতে লোকের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন হয়, বিবেকানন্দের সেগুণ অনেক ছিল। যে গুণ থাকিলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চাহে, এবং যেগুণ থাকিলে মানুষ বাহ্যজগৎ ভুলিয়া সেই গুণবানেরই সম্পূর্ণ সত্তায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সেগুণও বিবেকানন্দের অনেক ছিল। স্থূল কথা, যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না। বিবেকানন্দ যে সিংহাসন শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে কি না, অন্তর্যামীই জানেন।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃ শাস্ত্রী।

হত্যারহস্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অলকা ও হেমচন্দ্র।

ক্ষণকাল পরে ঘেঁটুর সহিত অলকা হেমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। অলকা উপবিষ্ট হইলে ঘেঁটু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

অলকা সুন্দরী। তাহার নীলোৎপলসদৃশ শ্রুতিবিশ্রান্ত নেত্রদ্বয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তারকা দুটা যেন ঢল ঢল করিতেছে। মাথার কুঞ্চিত কাল কাল কেশগুলির মধ্যে অলকার মুখমণ্ডল যেন অম্বরে ক্ষণপ্রভাবৎ কমনীয় দেখাইতেছে।

অলকার গঠন মধ্যমাকৃতি বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর—সবেমাত্র চরণের চপলতা নয়নে আশ্রয় লইতেছে।

অলকা উপবেশন করিলে, হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার চাকর আমাকে অমরের বিষয় তদন্তের জন্য অনুরোধ করিতেছিল, আমি সে বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

বীণাবিনিন্দিত স্বরে সলজ্জভাবে অলকা বলিল, আমি তাহা হইলে আপনার নিকট বিশেষ বাধিত হইব এবং আপনার যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত আছি।"

"সেকথা পরে হইবে। তুমি কি ইতিমধ্যে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ ?'

"না মহাশয়, এখনও সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই।"

"তবে সাক্ষাৎ করিও না ; কারণ তাহা হইলে এবিষয় সাধারণে জানিতে পারিবে।"

"বেশ, তবে তাহাই করিব।"

"আচ্ছা, তোমার মতে অমর নির্দোষী ?"

"হাঁ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

"তবুও তাহার নির্দোষীতা প্রমাণের কিছু উপায় বল্‌তে পারছ্‌ না ?

"দেখুন, তিনি তাঁর পিতাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ত্তেন, কখন কোন প্রকার অসন্তোষের কথা তাহার মুখে শুনি নাই।"

"তবে পিতাপুত্রে একত্রে থাকিত না কেন ?"

"পিতাপুত্রের স্বভাব ভিন্ন প্রকারের ছিল। বিশেষতঃ তাহার মাতামহ দত্ত সম্পত্তির আয় যথেষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে টাকা লইতে হইত না।"

"তবে যে দয়াল চাঁদের একজন চাকর বলিতেছে যে, হত্যার দিবস টাকা লইয়াই পিতাপুত্রে বচসা হয়।"

"চাকরে মিথ্যা বলিতে পারে।"

"এ লোকটার কথা যেন বিশ্বাসযোগ্য বলেই বোধ হচ্চে।"

"কিন্তু এ লোকই বলেছে সে আড়াল থেকে শুনেছে।"

"তা হলে পিতাপুত্রের এই বিবাদের কথা তুমি বিশ্বাস কর না ?"

"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

"তবে বল, কি উপায়ে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি ?"

"সে উপায় আপনই দেখুন, আমি—" বাধা দিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "আমি ত তাহাকে জেল ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিতে পারি না।"

কুন্দদন্তে বিম্বাধর দংশন করিয়া ধীরে অলকা কহিল, "আমি তাহা বলিতেছি না ; যাহাতে যথার্থ বিচারে তিনি মুক্তি পান তাহার উপায় করুন।"

হে। হাঁ, তাহা আমি করিতে পারি।

অ। আপনি কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ?

হে। তুমি যদি বল, করিতে পারি।

অ। বোধ হয়, তাঁহারই নিকটে আপনি এ বিষয়ের কোন সন্ধান পাইতে পারেন।

হেমচন্দ্র সম্মুখস্থ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বেলা প্রায় এগারটা ; আমি এখনই অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার তাহাকে কিছু বলিবার আছে ?"

ম্লানমুখে অলকা কহিল, "বলিবেন, আমি তাঁহাকে এখনও নির্দ্দোষী বিবেচনা করি।"

হেমচন্দ্র "আচ্ছা" বলিয়া বহির্গত হইলেন, অলকাও ঘেঁটুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

শ্রীঃ—

[ক্রমশঃ]

ভগবদ্গীতাপাঠ।

অর্জ্জুন। কার্য্য কারণ সম্বন্ধে কিরূপ মতামত আছে ?

ভগবান্। সৃষ্টি কারণ মধ্যে তিনটি প্রধান মত।

(১) আরম্ভবাদ—পিতামহকৃত পুরাতন গৃহ ভগ্ন হইলে, তাহার ইট সুরকি দিয়া যেমন নূতন গৃহ হয়, সেইরূপ কার্য্যরূপ যে পৃথিবী তাহার নাশ হইলে যে পরমাণু থাকে তদ্দ্বারা অন্য পৃথিবী আদি আরম্ভ হয়। ইহাই ন্যায়ের আরম্ভবাদ। ইহাতে কার্য্য কারণ ভেদ আছে। মায়িক সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য।

(২) পরিণামবাদ—যেমন দুগ্ধের পরিণাম বা বিকার দধি সেইরূপ, সাংখ্যমতে প্রকৃতির এই জগৎ। প্রকৃতি ও মায়া একস্থ জগৎ। মায়িক ব্যাপারে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। উপাসক মতে ব্রহ্মের পরিণাম জীব এবং জগৎ। কিন্তু ব্রহ্ম পরিণামী নহেন। এই মতেও কার্য্য কারণ অভেদ।

(৩) বিবর্ত্তবাদ—যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, কার্য্য কল্পিত মাত্র। সেইরূপ নির্বিকার ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম মাত্র। এই কার্য্যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত (কল্পিত কার্য্য মাত্র) বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে কার্য্যকারণের বোধ কৃত অভেদ।

তবেই দেখ মায়া সম্বন্ধে কার্য্য কারণ প্রয়োগ করিতে পারিলেও মায়া যখন মিথ্যা তখন কার্য্য কারণ মিথ্যা ভিন্ন আর কি ? সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি এক অকারণ রূপে বিরাজিত ছিলেন, সৃষ্টি প্রারম্ভে মায়িক লীলাবশতঃ তিনিই আপনাতে কারণ ভাব উপস্থিত করার মত করিলেন। সেই কারণ ভাব অবিচার অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। ইহা মায়া প্রভাবে সমুদিত এবং পরম প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ। অজ্ঞানের নাম প্রকৃতি। জগৎ অজ্ঞানের শরীর।

অর্জ্জুন। পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি ; দেখ কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র রহিয়াছে, জানিতেছি ঘট হইবে। তুমি বলিতেছ ঘট অসৎ। তাহাই হউক কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণ রূপে এই ঘটের সত্তা ছিল। এই জন্য কেহ কেহ না বলিয়া থাকেন যে কল্পকালে এই জগৎ বীজ মধ্যে অঙ্কুর অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন। কল্পাবসানে পুনরায় বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়।

মহাকল্পবিষয়ে দৃশ্যমাত্রে বীজইবাঙ্কুরঃ।
পরেভূয় উদেত্যেতত্ত এবেতি কিংবদ॥

স্থিঃ ১-১৯ যোঃ বাঃ।

এবমেষোদ্ভাঃ কিমজ্ঞা স্বাবাক্তজ্ঞা ইতি চ শ্রুতিম্।
যথাব্যং ভগবান্ ব্রূহি সর্ব্বসংশয়শান্তয়ে॥

ঐ ২০।

ভগবান্। যাহারা বলেন ব্রহ্ম ছিল। ব্রহ্মটী আছে বলিয়া ইহার অস্তিত্ব নাই বলিতে পার না। বীজ মধ্যে অঙ্কুরের মত ইহা রহিল। এইরূপে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ এই বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে অবস্থান করে। তাঁহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ। এই বাক্য শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই মোহজনক। ইহা মূঢ়দিগের জল্পনা মাত্র। এবং ভ্রান্তির প্রকার ভেদ।

ইদং বীজেঽঙ্কুর ইবদৃশ্যমাস্তে মহাশয়ে।
ব্রূতে য এবমজ্ঞস্ব মেতত্তস্যাস্তি শৈশবম্।

স্থিঃ—১-২১ যোঃ বাঃ।

ব্রহ্ম বীজ স্থানীয় ও জগৎ অঙ্কুর স্থানীয়, এ দৃষ্টান্ত ভুল। বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এজন্য ধান্যাদি বীজ পত্রাঙ্কুরার্থ কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অতি সূক্ষ্ম, যাহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, যিনি অযোগী পুরুষের নিকট অসৎ বলিয়া পরিচিত হয়েন, সাধারণ লোকে যাঁহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, সেই সূক্ষ্ম পুরুষকে কিরূপে বীজ বলা যায় কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহাকে বুঝান যায় না, তিনি নিজ বোধ রূপ। তবে যে রজ্জুতে সর্প ভ্রম ইত্যাদি বলা ইহাও ঠিক নহে। কতকটা অভ্যাস দেওয়া যায় মাত্র। "গগণং গগণাকারংসাগরং সাগরোপমঃ।"

আর একটা ব্রহ্ম নাই যে তাহার সহিত ইহার তুলনা হইবে। একটা আকাশ তাই বলিতে হয় আকাশ আকাশের মত। তাহাকে কোন বস্তুর কোন পদার্থ বলা যায় না। তবে যে ব্রহ্ম-পদার্থ বলা হয় বাক্যে তাহাকে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া পদার্থ বলা হয়। শব্দও নয়, কারণ বাক্যে প্রকাশ হয় না। সামান্য আভাস দেওয়া যায় মাত্র। যাহা কোন বস্তু নহে তাহাতে জগৎ থাকবে কিরূপে? সূর্য্য কিরণে কি অন্ধকার থাকিতে পারে? না জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে? সাকার বটে বীজাদিতে অঙ্কুরের স্থিতি যুক্তিযুক্ত কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে মহাকার জগৎ স্থিতিযুক্তি বিরুদ্ধ। এজন্য বলিতেছি কার্য্যাবস্থানের কথা যাহারা বলেন তাহাদের বাক্যের যৌক্তিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। প্রলয়ে জগদবস্থিতি কল্পনা, অনুভব বিরুদ্ধ।

আরও স্থূলভাবে তোমায় বুঝাই শুন। লোকে বলে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। মৃত্তিকা দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি—কারণ হইতে ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিলাম। কিন্তু কার্য্যটী যদি অসৎ হয় তবে কারণটিও অসৎ হইবে ইহা কে বলিল? কার্য্যরূপ ঘট যদি না থাকে তবে কারণরূপ মৃত্তিকা কি থাকিবে না? দুইটী অসৎ বস্তুরই এর কারণ সৎ বস্তু এক। বুঝাইবার জন্য বলিতেছি এর ঘট অসৎ তাই বলিয়া মৃত্তিকাও কি অসৎ? তবে কিরূপে বলা যায় কারণে অসৎরূপ জগৎ সদা রহিয়াছে।

আর একটু উপরে উঠ। ঘট মৃত্তিকার বিকার, বিকারের উৎপত্তি আছে, নাশও আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও নাশের পরে বিকারী বস্তুর অস্তিত্ব থাকা কি সম্ভব আর উপস্থিতে যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রম মাত্র। আকাশে নীলিমার মত, নিদ্রার স্বপ্নের মত।

ঘট ও মৃত্তিকা সম্বন্ধে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল মৃত্তিকা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ কর। কারণ ব্যতিরেকে কখন মৃত্তিকারূপ কার্য্যের উপলব্ধি সম্ভব নহে। এজন্য

কার্য্যের উপলব্ধি কারণ উপলব্ধির অধীন। কিন্তু কার্য্যে উপলব্ধি না হইলে যে কারণ উপলব্ধি হইবে না তাহা বলা যায় না। যাহা সৎ তাহা কোন কিছু থাক্ বা না থাক্ সত্তাবস্থায় থাকিবে। যাহা সত্তাবস্থায় থাকে না তাহাই অসৎ। যাহারা সত্ত অন্যের উপর নির্ভর করে তাহাই অসৎ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

মেঘ।

১

জলদ পটল হেরি
সুনীল গগণ কায়,
চঞ্চলা চপলা বালা
হেসে কোথা ছুটে যায়।

২

গরজিছে ঘন ঘন,
নাশিতে উদ্ধত ভবে,
চমকিয়া উঠে প্রাণ
শুনি সে ভীষণ রবে।

৩

বিস্তারি ময়ূখমালা
প্রসারিয়া পুচ্ছকর,
নাচিছে কলাপীকুল
শুনিয়া মেঘের স্বর।

৪

তিমির ভুবন মগ্ন,
চপলা দেখায় পথ,
জীবকুল ছুটে যায়,
গণিয়া মনে বিপদ।

৫

ছেয়েছে জলদ দল
সুনীল গগণ গায়,
অতল জলধি দেখি
হয়েছে উন্মত্ত প্রায়।

৬

উত্তাল তরঙ্গ তুলি
আনন্দ উচ্ছ্বাস সবে,
ভেটিতে জলদকুলে
চলেছে ভীষণ রবে।

৭

জলরূপে পরিণতি,
জন্মেতে জনম যার,
যাঁহার নিয়মে বদ্ধ,
তাঁর পদে নমস্কার।

৮

হে নাথ জগতপতি,
অজ্ঞান জলদচয়,
ছেয়েছে মানসাকাশ,
অন্ধ যে নয়নদ্বয়।

৯

কিরূপে দেখিব পথ
কিরূপে চলিব আমি,
বিদ্যুৎ ছটায় পথ
দেখাও জগত স্বামী।

১০

ক্ষণে তমঃ, ক্ষণে আলো,
পড়িলে বিপদে ঘোরে,
যদি পথে পড়ে যাই,
হাত ধরে তুলো মোরে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান।

টাইফয়েড্ জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই পীড়ার চিকিৎসায় অত্যন্ত ধৈর্য্যের প্রয়োজন কারণ এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে "রোগ আমাদিগের বশে যাইবে না কিন্তু আমাদিগকে রোগের বশে যাইতে হইবে"। রোগের গতিরোধ করা যাইতে পারে না এবং তাহা করা উচিতও নহে। এখানে এক কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তবে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? তিনি যদি পীড়ার গতিরোধই করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন কি? আমরা ইহার উত্তর এই দিয়া থাকি যে, চিকিৎসক ধৈর্য্য সহকারে পীড়ার সহ যাইতে যাইতে কেবল এইমাত্র দেখিবেন, যেন উহা বিপথে গমন না করিয়া সুপথে চলিতে থাকে এবং যখনই দেখিবেন যে সামান্য বিপদে পড়িতেছে তখনই উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার দ্বারা বিপদ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করেন। এই রোগের চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ও সাবধানতার বিষয় পরে বলা যাইবে। আমাদিগের বিশ্বাস যে উপযুক্ত সময়ে যদি রোগীর পীড়া ভাল লক্ষিত হইয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তবে অধিকাংশ স্থলেই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন তবে রোগী মারা যায় কেন? আমরা বলি যে উহা ঈশ্বরের হাত। মানুষের সাধ্যাতীত। তবে আমরা ইহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে, নিতান্ত খারাপ রোগীদের ও ঔষধ প্রযুক্ত হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বেই আমরা একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, হোমিওপ্যাথী মতে এই পীড়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। এখানে আমরা কেবলমাত্র পীড়ার বিকাশ অনুযায়ীক চিকিৎসায়, কোন্ কোন্ ঔষধ কি কি লক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইয়া আসি। বিস্তৃত ভাবে যাঁহারা ইহার আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কোন চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় রোগীর সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে, ব্যাপ্টিসিয়া এবং ব্রায়োনিয়া সাধারণতঃ অধিক ব্যবহারে আসিয়া থাকে; তাহার মধ্যে কোন কোন বিশেষ লক্ষণের জন্য যেমন শিরঃপীড়া ইত্যাদি সময়ে সময়ে বেলাডনা, জেল্সিমিনম, আর্সেনিক অথবা শরীরে সাধারণ বেদনার জন্য—রস টক্স ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে টাইফয়েড অবস্থার বিকাশ হেতু, সাধারণতঃ রস টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে [illegible]

বিকারাবস্থা জন্য ব্যাপ্টিসিয়া বা মার্কিউরিয়স প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং যদি উহাতে উপকার না পাওয়া যায় এবং লাল, শুষ্ক জিহ্বা, অজীর্ণতা, অতীব তৃষ্ণা, ও দুর্গন্ধী—জলবৎ মলত্যাগ হইতে থাকে, তাহা হইলে ফস্ফরস্ (বিশেষতঃ মোহাবস্থা comatose বর্ত্তমান থাকিলে) কিংবা টেরিবেন্থিনা (উদরের ফাঁপ ও অন্যান্য উদরিক লক্ষণ বর্ত্তমানে) ব্যবহারে আসিয়া থাকে। মানসিক নিশ্চেষ্টতা সহ প্রাতি-শ্যায়িক আন্ত্রিক পাকাশয়িক অবস্থা বর্ত্তমানে ফস্ফরিক অ্যাসিডের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোষ্ঠ-বদ্ধতা সহ পাকাশয়িক প্রতিশ্যায়ে—হাইড্রাষ্টিস নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। স্নায়বীয় উত্তেজনা অধিক দৃষ্ট হইলে হায়সায়ামস্ (অতিশয় প্রলাপ বকা), ষ্ট্র্যামোনিয়ম্ (ডিলিরিয়মে হাসিতে থাকে, কামড়াইতে যায়) এবং অ্যাগারিকস্ (অঙ্গ-কম্পন ও কাঠিন্যতা সহ প্রলাপ) ব্যবহৃত হয়। নিম্নশ্রেণীর (low) ডিলিরিয়ম সহ মাংস পেশীর অবসাদতা লক্ষিত হইলে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ এবং অতিশয় টাইফয়েড অবস্থা সহ সাধারণ হিমাঙ্গ অবস্থা ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্যাক্ষমতার লক্ষণ দেখিতে পাইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে হ্যামামেলিস্ (উদর মধ্য দিয়া শোণিতস্রাব) টেরে-বিন্থিন (উদরে বায়ুপূর্ণতা, দুর্গন্ধী মল এবং সঙ্গে সঙ্গে এল্বুমিনুরিয়া) হাইড্রাষ্টিস (অতিশয় ক্লেদা-বৃত জিহ্বা ইত্যাদি) এবং ইপিকাকুয়ানা (নাভির নিম্নে খামচানিকর শূল-বেদনা) ব্যবহৃত হয়।

উপরে আমরা যে প্রকার ঔষধ ব্যবহারের কথা বলিয়া আসিলাম তাহা সাধারণতঃ উপসর্গ বিহীন পীড়ায় প্রযুজ্য মাত্র। কোন প্রকার উপসর্গ দেখা যাইলে অন্য প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পীড়ায় বক্ষ আক্রান্তি (chest complaints) একটি বিশেষ লক্ষণ এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া আব-শ্যক। সামান্য প্রকার বক্ষ আক্রান্তি (যেমন ব্রঙ্কাইটিস্) দৃষ্ট হইলেই উহা বেশ করিয়া তুলা ও ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে—যেন কোন প্রকারে বাহিরের exposure না লাগে। সামান্য ব্রঙ্কাইটিস হইতে নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত ইহাতে হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় অ্যালোপ্যাথ মহাশয়েরা যে পোল্টিস্ ব্যবহার, প্লাষ্টার প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের মতে নিরর্থক ত বটেই, উপরন্তু ঐ গুলিকে আমরা অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকি। উহা দ্বারা রোগের উপশম হউক বা না হউক, রোগীকে বিরক্ত করা এবং কষ্ট দেওয়া হয় বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। যে উদ্দেশ্যে অ্যালোপ্যাথেরা এ সমুদয় ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা শুধুমাত্র তুলা ও ফ্লানেল্ ব্যাণ্ডেজ দ্বারাই—সাধিত হইতে দেখিয়াছি। এই তুলার প্যাড ও ফ্লানেলের ব্যাণ্ডেজ দুই প্রস্থ রাখা উচিত, কারণ ঘামে ভিজে হইলে একপ্রস্থ খুলিয়া রৌদ্রে দিতে হইবে এবং সেই সময় অন্য প্রস্থ দ্বারা শরীর—আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রধা-নতঃ চেলিডোনিয়ম, লাইকোপোডিয়ম, ব্রায়োনিয়া, ফস্ফরস, সাঙ্গুইনেরিয়া প্রভৃতি প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি ঔষধ দক্ষিণ ফুস্ফুস্ আক্রান্ত স্থলে ও শেষোক্ত ৩টি বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হইলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সহ যকৃতের আক্রান্ত থাকিলে এবং ফুস্ফুস্ হইতে রসস্রাব (exudation) না হইতে থাকিলে এবং উহা অতি-শয় রক্তাধিক্যযুক্ত বোধ হইলে, হিপার সল্ফার প্রযুক্ত হয়। রোগী সুস্থকায় ধাতু প্রকৃতির হইলে এবং বক্ষে ও শরীরের অন্যাংশে অধিক ঘর্ম দৃষ্ট

হইতে থাকিলে, এ অবস্থায় ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় আর একটি বিশিষ্ট এবং ভয়াবহ লক্ষণ, এজন্য ইহার চিকিৎসাও যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ অবস্থায় হেলিবোরস্; মিউরিয়াটিক আসিড্, জিঙ্কম্ ও এপিসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হেলিবোরসে মোহাচ্ছন্নভাব অধিক লক্ষিত এবং সদা বালিসে মস্তক চালনা করিতে থাকে; মিউরিয়াটিক আসিডে রোগী ক্রমাগত শয্যায় পাদদেশাভিমুখে নামিয়া আসিতে থাকে এবং জিঙ্কমে সদা একখানি পদ বা হস্ত চালনা করিতে থাকে, ঠিক যেন অটোমেটিকভাবে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এপিসে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় খুব জোরে চীৎকার করিতে থাকে এবং প্রস্রাব স্বল্প পরিমাণে হয় ও তৃষ্ণা থাকে না। কন্‌ভল্‌শন লক্ষণ দেখা যাইলে এবং তাহার সহ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য লক্ষণ থাকিলে, প্রথমে বেলাডনা দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে উক্ত কন্‌ভল্‌শন অধিক দৃষ্ট হইতে থাকিলে কুপ্রম, সিকুটা বা জিঙ্কমের ব্যবহার প্রয়োজন। সিকুটায় রোগী বাঁকিয়া ঊর্দ্ধদিকে সোজা হইয়া উঠে, জিঙ্কমে মস্তক একপার্শ্বে বাঁকাইতে থাকে।

অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব দেখিতে পাইলে ওপিয়ম, নক্স-মস্চাটা ও কেলি ব্রোমেটম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; উদর অতিশয় ফাঁপিতে থাকিলে নক্স-মস্চাটা, কার্ব্ব-ভেজি; কৃমি লক্ষণে সিনা এবং অতিশয় নাক খোঁটা, এমন যে খুঁটিয়া রক্ত বাহির করা, লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এর মট্রিফাইলম প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

উদরের ফাঁপ, অল্প জরাবস্থায় ঘোর ডিলিরিয়ম, উদরাময়, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি এই পীড়ায় বড়ই মন্দ লক্ষণ, এ কারণ যত সত্বর সম্ভব ইহা বিদূরীত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি সুনির্ব্বাচিত ঔষধে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হয়, তাহা হইলে একমাত্রা সল্ফর প্রয়োগ করিয়া পরে পুনরায় সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এইমাত্র আমরা এই পীড়ায় প্রচলিত সমুদায় প্রকার ঔষধের বর্ণনা করিয়া আসিলাম এবং এখন কতকগুলি আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের এখানে অবতারণা করিতেছি। ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক যে, শুদ্ধমাত্র ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না, রোগের শুশ্রূষা ও তাহার পথ্যাপথ্যই অধিক মাত্রায় রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। বক্ষের কোন প্রকার আক্রান্তি স্থলে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূত্রপাতাবস্থাতেই—তুলা ও ফ্লানেলের ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা আবশ্যক তাহা, পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। আর আর যাহা করা আবশ্যক হইয়া থাকে এখানে তাহাই বলিব। মস্তিষ্কের গোলযোগে মাথায় জলসিঞ্চন ও বাতাস দেওয়া প্রয়োজন। মাথায় জলপটি দেওয়া অপেক্ষা নাক, মুখ, চোখ, ও কপাল বেশ করিয়া ভিজা বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছাইয়া লইয়া, ধীরে ধীরে বাতাস করিতে থাকিলে, রোগী বেশী আরাম পাইয়া থাকে আমরা দেখিয়াছি। মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তাধিক্য এবং তাহার সহ ঘোর ডিলিরিয়ম থাকিলে, মস্তকে আইস্ ব্যাগ্ (ice-bag) দেওয়া প্রয়োজন। উদরের ফাঁপ অতিশয় থাকিলে এবং তাহার সহ মলমূত্র রুদ্ধ থাকিলে, গরম জলের ফোমেণ্ট করা অথবা hot-water-bag প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে, কোষ্ঠ বাহ্য পরিষ্কারের জন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না—ক্যাষ্টর অইল বা পিচকারী করা ত দূরের কথা। উদরে

পর্য্যায়ক্রমে গরম ও শীতলতা প্রয়োগ করিলেও, অনেক সময়ে মলমূত্র ত্যজিত হইয়া উদরের ফাঁপ ও বায়ু পূর্ণতা কমিয়া থাকে।

অতিশয় নিস্তেজাবস্থা উপস্থিত হইলেও, কদাচ ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে ক্ষণিক একটু জীবনী শক্তির উত্তেজনা দেখা যায় বটে কিন্তু তৎপরেই এমন অবসাদতা আনয়ন করিয়া থাকে যে, তাহা হইতেই অনেকস্থলে রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে আমাদের মতে ২।১ মাত্রা আর্সেনিক বা কার্ব্ব-ভেজি প্রয়োগ করিলেই, অনেক সময়ে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে দেখিয়াছি। গাত্রতাপ কমাইবার জন্য কাহারও কাহারওও মতে গরম জলে গা ধোয়াইয়া দিয়া, পরে শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া মুছাইয়া একখানি গরম কাপড়ে বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক-স্থলে এই উপায়ে অরের বেগ কমিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পীড়ায় উহাতে তেমন কোন স্থায়ী ফললাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কেহ কেহ আবার ঠাণ্ডা জলেই গাত্র ধোয়াইয়া থাকেন ইহা আরও বিপদজনক।

ক্রমশঃ।

ডাক্তার মৈত্রে।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

রামজয় আগম বাগীশ একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তন্ত্র শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে তিনি বিলক্ষণ সুকুশল ছিলেন। কৃষ্ণগঞ্জে তিনি বাস করিতেন। সুজাগঞ্জের ব্রজমোহন রায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রায় মহাশয় হলদি-বেড়ে পরগণার তহশিলদার। কৃষ্ণগঞ্জ অন্য পরগণার অন্তর্গত। তখন অত্যাচার অবিচারের দিন, বিশেষতঃ নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর স্থানে স্থানে বিশেষ অত্যাচার হইত। একজন মুসলমান কৃষ্ণগঞ্জের তহশিলদার ছিলেন। ব্রজমোহন রায় তাঁহার গুরুদেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সপরিবারে সুজাগঞ্জে আনয়ন করেন। বহুলোকের আগ্রহে বিজয়পুরে সুরমাতীরে তাঁহার বাস ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আগমবাগীশ মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের নাম রাম-কমল। যে সময়ে তিনি পিতার সহিত বিজয় পুরের নূতন বাটীতে আইসেন, তখন তিনি ষোড়শ বৎসর বয়স্ক যুবক। সেই তরুণ বয়সে তিনি শব্দ ও দর্শন শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আগমবাগীশ মহাশয় বিজয়পুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্বীয়পুত্রকে, শিক্ষার্থ বিদেশ গমনে আদেশ করেন। পিতার আদেশক্রমে রামকমল নবদ্বীপ এবং মিথিলা প্রভৃতি স্থানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করত বিজয়পুরে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্পদিনেই নানা দেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি-ষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অনেকগুলি ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত; কুড়ি পঁচিশটী ছাত্রের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর তখনও তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দেবার্চ্চনা এবং সংযম নিয়মে নিয়মিত ছিলেন, বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার খেয়াল তাঁহার ছিল না। পিতা আগমবাগীশও তদ্বিষয়ে

উদাসীন ছিলেন। অকৃতদার সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কোন সাংসারিক কষ্ট ছিল না। তাঁহার পিতা প্রাচীন, মাতাও প্রাচীনা। কিন্তু সে প্রাচীন প্রাচীনার কার্য্য সামর্থ্য নিতান্ত হীন ছিল না। সংসারে তাঁহার দুই পিসি ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাল বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণী ও ব্রতচারিণী। তাঁহাদের শারীরিক শক্তি অসাধারণ ছিল, মানসিক বলেরও ইয়ত্তা ছিল না। ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রতাচরণে হিন্দু বিধবারা যে পরমাত্মা উপভোগ করেন, লালসা বহ্নিতে পুনঃ পুনঃ আহুতি দিয়া সকামা রমণীগণ এ সুখ অনুভব করিতে পারেন না। একথা যাঁহারা বুঝেন না তাঁহারা হিন্দুঘরের দেবীদিগকে ভোগসুখে আসক্ত করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত। তাঁহাদের অনুভূতি অতি ঘৃণ্য তজ্জন্য সেই সকল মহাত্মার সহানুভূতি প্রশংসার যোগ্য নহে।

সে যাহা হউক সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক সংসার সুখেই চলিতেছিল। কিন্তু ১০১৬ সালের মহামারীতে তাঁহাকে বড়ই ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রতিবেশীগণের হাহাকারে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, টোল বন্ধ হওয়াতে তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। মারীভয়ে বিদেশীয় ছাত্রেরা স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে, প্রত্যাগমন করে নাই, গ্রামস্থ ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়া গিয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও জীর্ণ, শীর্ণ, শোকগ্রস্ত, সুতরাং পড়িতে আসে না। ইহাতে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মাতা ও পিসিমাতাদিগের সাংসারিক কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছিল; ফুলতোলা গৃহস্থিত দেববিগ্রহ পূজা করা এবং সন্ধ্যোপাসনা ভিন্ন তাঁহারও কাজ খুব অল্প ছিল। এই কর্ম্মহীনতা তাঁহাদের সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন সময়ে [illegible] সার্ব্বভৌম তাঁহার গৃহে প্রবেশ করেন; তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি অতিথির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া, আতিথ্যের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন।

একদিন পিতা পুত্রে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। দেশের কথা, দশের কথা, বাজারের কথা, শাস্ত্রের কথা ইত্যাদি নানাবিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। আগম বাগীশ মহাশয় পুত্রকে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমরা যেমন শালগ্রাম শিলায় সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পরমপুরুষ নারায়ণের আবাহন অর্চ্চনা করি, সেইরূপ ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে তেত্রিশকোটি দেবদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করিলে পরম পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে। লোকহিত ব্রতের ন্যায় মহাব্রত ইহলোকে আর নাই। তুমি সেই ব্রত গ্রহণ করিয়া লোকহিতে রত হইলে আমার কুল উজ্জ্বল হইবে। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুত্ররত্ন মহাশয় সার্ব্বভৌম সার্ব্বভৌম ব্রত গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রী[illegible]।

স্বায়ত্ত চিকিৎসা।

কফজ ব্রণশোথ।

১

ধুতুরার মূল শীতল জলে দিয়া বাটিয়া তাহার সহিত গৈরিক চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ বসিয়া যায়।

শজিনার মূলের ছাল, দেবদারু কাষ্ঠ চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ শ্বেত সর্ষপ, এবং শাদা পুনর্নবা শাক সমভাবে লইয়া কাঁজি অর্থাৎ পুরাতন আমানি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ বসিয়া যায়।

যে দেবদারু কাষ্ঠ মসলার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এ দেশীয় দেবদারুর কাষ্ঠ গ্রহণ করিবে না। শ্বেত পুনর্নবা শাককে কোন স্থানে শাদা গাদো শাক কোন স্থানে শেপুণ্যা শাক বলে। শ্বেত সর্ষপ সিতি সরিষা নামে বিখ্যাত। কাঁজি না পাইলে অগত্যা জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

উক্ত প্রলেপটীর প্রতি সকলেই লক্ষ্য রাখিবেন। প্রলেপটী যেমন কফজ শোথ বসাইবার ভাল ঔষধ সেইরূপ সন্ধিগত বাত বেদনার মহৌষধ। সন্ধি অর্থাৎ অস্থি-সন্ধিস্থল বা গাঁইট সকল ফোলা বেদনাযুক্ত হইলে উক্ত প্রলেপে বিশেষ উপকার করে। নিয়মিত প্রলেপ দিলে, সন্নিপাতশোথ, বাতশোথ, কফশোথ এবং আর সকল রকম শোথ অচিরে আরোগ্য লাভ হয়। এই প্রলেপটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ সকল প্রকার শোথ বসাইবার জন্য যত প্রকার প্রলেপ চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে কোনটাই ইহার ন্যায় ফলপ্রদ নহে। এই প্রলেপের সাহায্যে অনেক স্থলে অনেক লোক ভীষণ ব্রণশোথ ও বিদ্রধি প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—অন্য চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয় নাই।

যে যে গাছের ছাল লইয়া সেই মহান উপকারী প্রলেপ তৈয়ার করিতে হয় তাহা বলিতেছি।

৩

বট, অশথ বা অশ্বত্থ, প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড়, যজ্ঞডুমুর এবং অম্ল বেতস অর্থাৎ বৈকল এই পাঁচ প্রকার গাছের ছাল তুল্য পরিমাণে লইয়া শীতল জল দিয়া পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া বেশ করিয়া বাটিয়া লইবে। সেই বাটনার সঙ্গে, প্রত্যেক ছাল যে পরিমাণে লওয়া হইয়া থাকে তৎতুল্য পুরাতন ঘি মিশাইয়া শোথের উপর পুরু করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

বট, অশথ এবং যজ্ঞডুমুর সম্ভবতঃ সকলেরই চেনা গাছ। প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড় গাছও অজ্ঞাত নহে। অশথের পাতা ও পাকুড়ের পাতা প্রায় একই রকম। একটু বিশেষ আছে—অশথের পাতার অগ্রভাগে একটা লম্বা শীষ থাকে, কিন্তু পাকুড়ের পাতার আগায় তার চেয়ে ছোট শীষ থাকে। আর পাকুড়ের পাতার রং গাঢ় সবুজ, অশথের পাতার বর্ণ ফিকে সবুজ। পাকুড়ের গাছকে কোন কোন স্থানে পাকড়ও বলে।

অম্লবেতস বা বৈকলের গাছ সকল স্থানে পাওয়া যায় না, রংপুর প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায় না, সেখানে সেই ছালের পরিবর্তে বেতসের মূল দিলেও কাজ চলিবে।

ঠুনকো নামক স্তনশোথের ঔষধ।

প্রসবান্তে সাধারণতঃ দোষযুক্ত সংক্রম হইলে প্রসূতির এবং স্তন্য দায়িনী মাতার একটী বা উভয় স্তনে বেদনাযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং কঠিন শোথ জন্মে এই শোথের নাম স্তন-বিদ্রধি। বাঙ্গালার অনেক স্থলে ইহাকে ঠুনকো বলে। ইংরাজী নাম ম্যামারি এবসেস্।

এই শোথ উপেক্ষা করিলে শোথ পাকিয়া উঠে। বিদার হইলে মহান অনর্থকর নালী রোগে পরিণত হয়। শোথের সঞ্চার জানিবামাত্রেই বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। কদাচ উপেক্ষা করিবে

না। নিম্নলিখিত প্রলেপ দিবসে পাঁচ সাত বার লাগাইলে ৩৪ দিনেই স্তনশোথ বসিয়া যায়।

খোসা ছাড়ান যবের গুঁড়া এক ভাগ, কাঁচা সোনামুগ কলাইয়ের গুঁড়া এক ভাগ এবং ময়দা এক ভাগ লইয়া শীতল জলে গুলিবে। তাহার পর একখানি মেটে পাত্রে রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুনের জ্বালে পাক করিবে। প্রলেপ দেওয়ার মত ঘন হইলে নামাইয়া রাখিবে। অল্প অল্প গরম থাকিতে স্তনের শোথস্থানে পুরু প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে উঠাইয়া পুনর্ব্বার প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত প্রলেপে অন্যান্য প্রকার ব্রণশোথ ও বিদ্রধি অর্থাৎ ছার নামে প্রসিদ্ধ শোথও বসিয়া যায়।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

স্তব-পঞ্চক। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত। মূল্য ।০ আনা। মহাস্তোত্র, মহিম্ন স্তোত্র, বগলা স্তোত্র, তারা স্তোত্র নব গ্রহ স্তোত্রের অবিকল অনুবাদ। শশিভূষণ বাবু রঙ্গপুরের একজন সদাশয় জমিদার। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সাহিত্যানুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। তাঁহার এই "স্তব পঞ্চক" তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও ঈশ্বরভক্তির উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। অনুবাদে তাঁহার বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। মূল সংস্কৃতের সৌন্দর্য্য এই অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কি পদলালিত্যে, কি ভাব বিকাশে শশীবাবু বাস্তবিকই গ্রন্থখানিকে বিশেষ মনোজ্ঞ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চিন্তা। নূতন মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। দুঃখের বিষয় কার্য্যাধ্যক্ষ বা সম্পাদক কাহারও নাম দেওয়া নাই। সাময়িক প্রবন্ধের আলোচনা ও চিন্তাই 'চিন্তার' প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও ক্ষুদ্র আকারের তথাপি ইহাতে অনেক গম্ভীর বিষয়ের চিন্তা আছে। 'চিন্তা' সাময়িকী সাধারণের চিন্তার উপযুক্ত বটে।

আর্য্যভূমি পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র। ।৴০ আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৩। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৫। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়। ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	শ্রীপ্রিয়মোহন হালদার। সত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক। [illegible]

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল বৈদ্যরত্নের আবিষ্কৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

বাতবিজয় তৈল।

"আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

আমাদের এই "বাতবিজয় তৈল" মালিশে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অর্থাৎ প্রমেহ ও উপদংশজনিত বাত, কোমরের, কনুয়ের, হাতের কব্জির, পায়ের গাঁঠের বাত, ঝিঝিবাত, আমবাত, পক্ষাঘাত, খঞ্জ, পঙ্গু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনা, ফুলা, কন্‌কনানি এবং আঘাতপ্রাপ্তি জন্য বেদনা, এত সত্বর আরোগ্য হয় যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত মহামাষ তৈলাদি দ্বারাও সুদীর্ঘকালে, সেইরূপ ফল পাওয়া যায় না। অথচ শাস্ত্রোক্ত তৈলাপেক্ষা, কম ব্যয়ে কম সময়ে এই তৈল মালিশে বাতব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন কারণে বেদনা হইলে, এই তৈল একটু হাতে লইয়া ৫।৭ মিনিটকাল সেই স্থানে মালিশ করিলে, মন্ত্রশক্তির ন্যায় তৎক্ষণাতই ব্যাধি-যন্ত্রণার উপশম হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ।০।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রভৃতি রোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ

অম্লশূলান্তক চূর্ণ।

আমাদের অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে, অম্লজনিত বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার, আহারান্তে বমন বা দমকা ভেদ, উদর ভার বোধ, মাথা জ্বালা, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ, বদ্ধতা, পেটে বায়ু জমা, মুখ দিয়া জল উঠা, বমি বমি বোধ, পেটের ভিতর চাকা মত হওয়া, এবং কোঁ, কোঁ ভুটভাট ও কলকল শব্দ হওয়া খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অম্লপিত্তের উপসর্গ হউক না কেন, অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে নির্দোষরূপে আরোগ্য হয়। যে রোগী অম্লশূল বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, দেখিবেন আগুনে জলে পড়ার ন্যায়, তখনই ব্যাধিযন্ত্রণার উপশম বোধ হইবে। মূল্য ছোট শিশি ৷৹ আনা, বড় শিশি ১৲ মাঃ ।০ আনা।

প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ ধ্বজভঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর প্রভৃতি রোগের মহৌষধ

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ণ।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তদুপসর্গ মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্‌-টনানি, সপুঁয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলদে না সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হওয়া স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত সূতার ন্যায় পড়া, কিম্বা খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, বাহ্যে বসিয়া বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্রনির্গত হওয়া স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্র শুক্র পতন বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে কুচিন্তা জাগিয়া থাকা, বদ হজম, ক্ষুধা বোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়া, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হইবে আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক মহৌ-

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ। ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে এক দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাঁপানী কাস-ক্ষয় কাস, রক্ত উঠা, যক্ষাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ এক বটিকা সেবন করিবা মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, মাঃ ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার।
নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ পোঃ বিডন স্কোয়ার,
কলিকাতা।

দেলবাহার তৈল।

এই মনোহর সুগন্ধি স্নিগ্ধ তৈল ব্যবহারে মেচেতা ব্রণ প্রভৃতি বদন মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন সকল তিরোহিত হয়, মুখখানি শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চল চল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতে চর্ম সুকোমল, বর্ণ সুবর্ণাভ হয়। লাবণ্য কুসুম বিকসিত হইয়া উঠে। এই সুবাসিত তৈলে গাত্রে ফাটা, ছুলি, ঘামাচি, শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়।

ডজন	৯৲	প্যাকিং ইত্যাদি	॥০
শিশি	৸০	ঐ	৵০

নেপালজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কস্তুরী (মৃগনাভী) এইখানে পাওয়া যায়।

আর, পি সাধুর উৎকৃষ্ট সুলভ

গোলাপজল।

পাইট্ বোতল ডজন	২।০
বড় বোতল ডজন	৫৲
পাইট বোতল	।০
বড় বোতল	॥০

এইচ্, পি, মুখার্জ্জি
অথবা
আর, পি, সাধুর নিকট
১৬৩ নং আমড়াতলাগলি কলিকাতা
ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বিশেষ পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ ঔষধ

১। ক্ষতকুলান্তক।

ইহা গরমি, বিক্ষত, কাউর নালী, প্রভৃতি সমপ্রকার পচা ও দূষিত ক্ষত, খোস পাঁচড়া, দাদ-চুলি এবং অন্যান্য চর্ম্মরোগ বিনা জালা যন্ত্রণায় শীঘ্র ও নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহাতে পারা নাই। মূল্য ।০ আনা প্যাকিং নাই, ৵০ আনা মাশুলে ৪ কৌটা যায়।

২। দদ্রুসংহার।

ইহা লেপনে সকলপ্রকার দাদ, ছুলি ও নানা-প্রকার চর্ম্মরোগ ও ক্ষত রোগ বিনষ্ট হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ৶০ আনা, প্যাকিং নাই ৵০ আনা মাশুলে ৬ কৌটা যায়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা—বি, এন্ মুখার্জ্জি—১৪ নম্বর হরলাল দাসের লেন, কলিকাতা ও শ্রী কুঞ্জ-বিহারী মুখোপাধ্যায়—কুমির পোঃ আঃ, (খুলনা।

নিভৃত বিলাপবাক্য।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপান, বাঁধাই সুন্দর সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৪নং সুকিয়াস লেন, কলিকাতা।

মহাকালী এজেন্সী।

এখানে যাবতীয় পুস্তক, নানাবিধ স্বদেশী বস্ত্রাদি এবং যাবতীয় রোগের অমোঘ মহৌষধ পাওয়া যায়। মফঃস্বলবাসীর সুবিধার্থে স্বদেশী অতি সামান্য দ্রব্য হইতে বহুমূল্য পর্য্যন্ত বাজার-দরে সত্বর পাঠান হয়। বলা বাহুল্য ইহার উপস্বত্ব মহাকালী শিক্ষক সমিতির শিক্ষা বিভাগে উৎসর্গীত।

সোমপ্রকাশ ও বিশ্বজননীর সম্পাদক এবং মহাকালী পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কাব্যভূষণ প্রণীত উক্ত পাঠশালার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

১৮নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, পোঃ সিমলা—কলিকাতা।

অপূর্ব্ব সুযোগ। অপূর্ব্ব সুযোগ!

ভাগ্য পরীক্ষা।

আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সাধারণের অনাস্থার কারণ এই যে তাঁহারা জ্যোতিঃ ব্যবসায়ীগণের নিকট অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ ফল মিলিতে দেখিতে পান না। এই জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কিরলজিকেল সোসাইটির স্থাপনা হয়। বহু পরীক্ষা ও আলোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের গণিত পদ্ধতি অশুদ্ধ সুতরাং ফলও তদ্রূপ হয়। যাহাতে এতদ্দেশে এই শাস্ত্রের পুনরায় প্রচার ও আদর হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিরলজিকেল সোসাইটীতে জন্ম সময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জ্ঞাত করাইলে বিনা পরিশ্রমিকে জাতকের জীবনের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের ফল সমূহ বলিয়া দিতেছেন। এই কার্য্য তাঁহাদিগের ব্যবসা নয়। কেবলমাত্র ডাকখরচের নিমিত্ত এক আনার টিকিটসহ পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কিরলজিকেল সোসাইটী;

সম্পাদক,

২১ ১৩, নবাবী ওস্তাগরের লেন কলিকাতা।

ঘোষ প্রেস।

এই প্রেসে যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ঠিক সময়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] [ভাদ্র ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীনাগদয়াল মজুমদার এম, এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম,এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি; পি দত্ত F. C. S. PH. B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



"গোলাপ-গন্ধ" সুবাসিনী তৈল।

ইহার মনোহর মিষ্টগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক ; ইহা তিন তৈলে প্রস্তুত নহে॥ মাস্তক শীতলকারী।

মূল্য ৩ আউন্স শিশি ৷৷৵০ — প্যাকিং ৵০ ডাঃ মাঃ ৷৷৵ ০
৮ „ „ ১৷৵০ — „ ৵০ „ ৷৵০
২৪ „ „ ৩৲ — „ ৷০ „ ৷৷০

স্বদেশী এসেন্স ও পারফিউমারি।

এসেন্স বোকে—বিলাতী এসেন্স [illegible] বোকে হইতেও [illegible] ১৷০

ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১৲

কেশ সুন্দরী—নানা জাতীয় ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১৷০

কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের মনোহর গন্ধ ৷৷০

হোয়াইটরোজ—সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ ৸০

ডামাস্করোজ—আসল দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸০

এসেন্স রজনীগন্ধা—সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸০

বকুল—স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ বড় শিশি ৷৷৵০ ছোট শিশি ৸৵০।

খস্—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুদিন স্থায়ী ৸০

কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলের গন্ধ ৷৷০

গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৷৷০

চেরি—চোরকমলের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ ৸০

জেস্মিন—প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৷৷০

কুন্দিনী—সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৷৷০

টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ৷৷০

মোহিনিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ৷৷৵০

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ ৷৷০

চম্পক—প্রস্ফুটিত চম্পক ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৸০

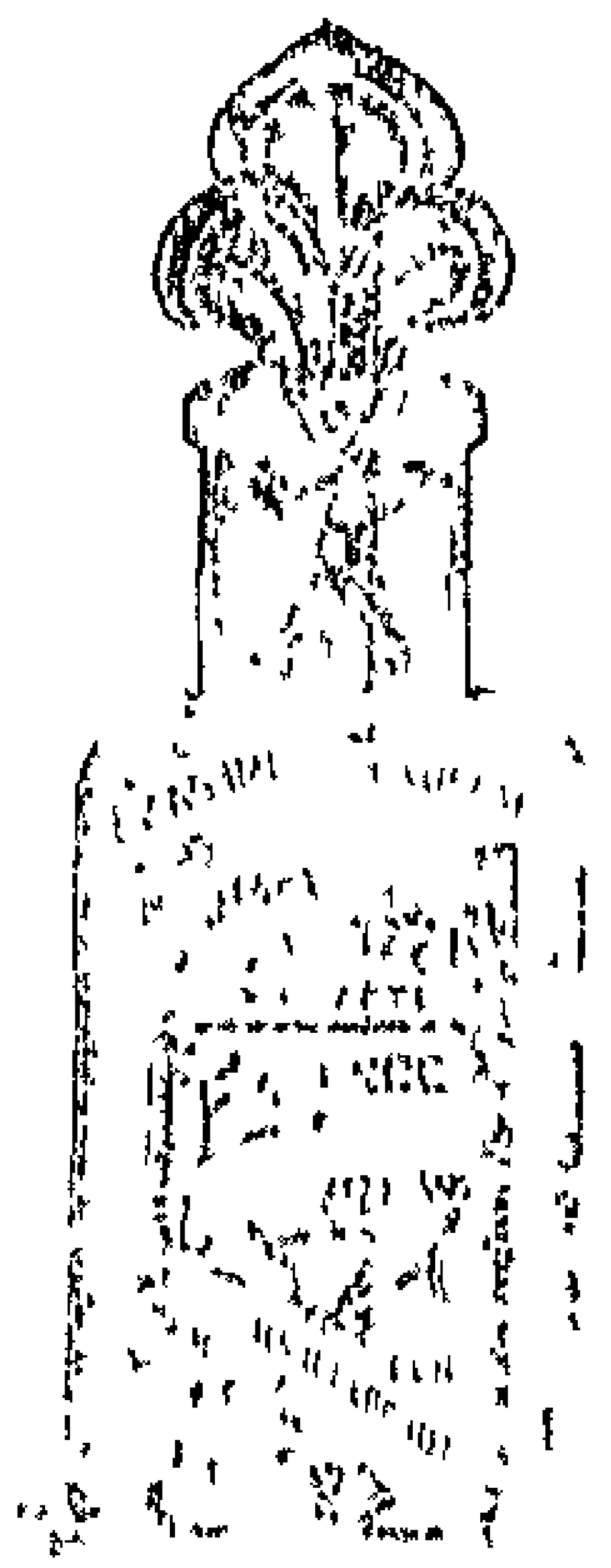
চামেলী—সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা স্থায়ী গন্ধ ৸০

ভুল না আমায়— ২৲

বেলা—বেলফুলের গন্ধ ৸০

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—মনোহর গন্ধ ও স্থায়ী ৷৷৵০

অডিকলোন— ৷৷০



কারখানা—৩৮, ৩৮।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল ৩রা পৌষ বুধবার কৃষ্ণা নবমী রাত্রি ৮ দণ্ড।

স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল ৪ঠা আষাঢ় বুধবার শুক্লা নবমী রাত্রি ১০টা ৭০ মিনিট।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [ভাদ্র ১৩১৪ সাল।

ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে ১২৪৭ সালের ৩রা পৌষ কৃষ্ণানবমী তিথিতে উমেশচন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরমোহন দত্ত; মাতার নাম সর্ব্বমঙ্গলা দাসী।

গ্রাম্য পাঠশালায়—উমেশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ। পাঠশালার পাঠসমাপন করিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উমেশ-চন্দ্রের অধিকদিন বিলম্ব হইল না। দশম বর্ষবয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাল্য জীবনেই সংসারের ঘাত প্রতিঘাত আসিয়া পড়িল; সংসারের ঝঞ্ঝাবায়ু জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। যে বীণাপাণির আরাধনা জীবনের নিত্যব্রত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন সেই ব্রত উদযাপনের জন্য শ্রমশীলতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অবশেষে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর উচ্চশিক্ষালাভার্থ তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহাকে স্বহস্তে প্রাতে ও সায়াহ্নে পাককার্য্য, সম্পাদন করিতে হইত; এবং সংসারের ব্যয়ভার আনুকুল্যার্থে অর্থাগমের উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

যে সকল মহাপুরুষ ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যশঃপ্রভায় পৌর্ণমাসী রজনীর সুধা-করের কিরণজালের ন্যায় দিক দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন, যে সকল কর্ম্মবীর স্বয় কার্য্যপাদপের সুধাময় ফলধারা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া-

গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে বাল্যজীবনের প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। ইহাই ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রের উন্নততা-শক্তি এবং বিবিধ বিপদসঙ্কুল অবস্থার শিক্ষাই ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের বীজ। জ্ঞান শক্তির উন্মেষ দ্বারা এই বীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পরিশেষে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ রূপে পরিণত হয়। জানিনা এই সকল প্রতিকূল অবস্থার শিক্ষার কি মহীয়সী শক্তি!—ইহা যেমন একদিকে মানবকে উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পক্ষে সহায়তা করে তেমনি, অন্যদিকে দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য, সভ্যতা প্রভৃতি বিবিধসদ্গুণে মানবের চিত্তক্ষেত্রকে বিভূষিত করে। এই পরীক্ষা এবং শিক্ষার মধ্যদিয়া যে মহাপুরুষের জীবন গঠিত হয় তাহা জগতের আদর্শ। কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্রের জীবনেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। তিনি বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় অবলম্বিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বাবিংশ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বাল্যসাধনার সিদ্ধি হইল; তিনি বাল্যজীবনে যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উদযাপন হইল।

তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই খানে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষ। সম্মুখে বিশালকর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত। কর্ম্মবীর কর্ম্মকরিবার, অবসর প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর উমেশচন্দ্র যথাক্রমে নিবিধু, হরিনাভী কোন্নগর প্রভৃতি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। পরিশেষে সিটিকলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। জীবনের কয়েক বৎসর [illegible] তিনি এই কলেজে ছিলেন। যেখানে সৎসাহস, সদনুষ্ঠান, [illegible] সেখানে তিনি বিদ্যমান থাকিতেন। [illegible] পরপীড়া বর্জ্জন, সকলের প্রতি আদর প্রীতি ও প্রিয়াচরণ, যথাসাধ্য [illegible] উমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা। তিনি কর্ত্তব্য পালন মহাব্রত যাবজ্জীবন প্রতিজ্ঞা ভাবে পালন করিয়াছেন। কার কোন্ খানে [illegible] তাহার নিকট অপরিচিত ছিল। তাঁহার ধর্ম্মভাব বড়ই উদার ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সাধক হইয়াও তিনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও কখন [illegible] পরামর্শদেন নাই। শোক মানবের ধৈর্য্য [illegible] জ্ঞানকে নষ্ট করে, শোকের সমান শত্রু আর নাই। এমন কি দেব চরিত্রেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না; কিন্তু যে দিন পতিপ্রাণা সাবিত্রী সতীলক্ষ্মী প্রিয়তমা পত্নী ইহ সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন; প্রাণাধিকা দুহিতা বিন্দুবালা, এই সংসার পরিত্যাগ করেন সেইদিন সেই সময় যাহারা তাঁহার সেবা এবং তাৎকালিক কর্ত্তব্য পালনে ঐকান্তিকতা দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই সানন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি অতি শৈশব কাল হইতেই কঠোরতায় ও সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি নিত্য প্রকৃতি লোকদিগকে লইয়া একজন লোক [illegible] কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে এতদূর প্রবল ছিল, যে তিনি সত্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন [illegible] এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিতেন। জানিনা এই নৈতিক সাধুতা না করিয়া পারেন কি

মহীয়সী শক্তি। যে কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রণোদিত হইয়া মহাজ্ঞানী সক্রেটিস্ তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"ক্রিটো! আমি সর্ব্বজনাদিগত অপার বর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থ কোথায় গমন করিব?" যে নৈতিক বাধ্যতা প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মবীর ঈশা অসহ্য ক্রুশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; মহাত্মা সেণ্টপল রোমনগরস্থ কারাগৃহে সিংহমুখে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন; বীর হৃদয় মার্টিন লুথার "মহান্ত পোপের" বিরুদ্ধে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, স্বদেশ প্রেমী ম্যাটসিনি মাতৃভূমি ইটালিকে অষ্ট্রীয়ান দিগের দাসত্ব নিগড় হইতে নিমুক্ত করিবার জন্য অম্লান বদনে নির্ব্বাসন যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; ধর্ম্মবীর পার্কার মার্কিন দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে এবং কাফ্রিদাস দিগকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে দৃঢ় ব্রত হইয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, চিরস্মরণীয় গ্যালিলিও আপনার বিচারকদিগের সম্মুখে নতজানু হইয়া ক্ষমতাবলে ঈশ্বর জানিয়া সত্যকে অস্বীকার করিয়া আবার পরক্ষণেই পৃথিবীতলে পদাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন "ইহা এখনও চলিতেছে"; কেবল বিদেশীয় মহাপুরুষদিগের কথা কেন বলিতেছি, যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত নানক দ্বারে দ্বারে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতে গিয়া কোন প্রকার বাধা বিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, শ্রীচৈতন্য পাষণ্ডগণের ইষ্টক বৃষ্টির মধ্য দিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন; রামমোহন রায় স্বজাতির গঞ্জনা সত্ত্বেও অকুণ্ঠিত চিত্তে উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রণোদিত কর্ম্মবীর উমেশচন্দ্র কর্ত্তব্য সম্পাদনে তদীয় জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্রের বিশ্বজনীন প্রেমের বিষয় ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যথার্থ মহাপুরুষগণ আপনাকে তৃণ হইতেও লঘু মনে করেন, আত্মাভিমান তাঁহাদের কিছুই নাই। তাঁহারা মনে করেন এবিশ্ব তাঁহাদের এবং তাঁহারা এবিশ্বের সুতরাং সমস্ত প্রাণী জগৎ তাঁহাদের প্রেমের বিষয়ীভূত। ইহ সংসারে তাঁহাদের দ্বেষ্য কেহ নাই সকলই প্রিয়। ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন দেশের লোকে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। অত্যাচারে শরীর জর্জরিত হয়, হিংসায় ও আক্রমণ হয়, তিনি সে সব। অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন এবং অত্যাচারীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট বা অবতার বলিয়া জ্ঞান হয়।

বঙ্গভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাহাদের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মধুর এবং প্রায় সকলগুলিই ভক্তি রসাত্মক। স্ত্রীলোকদিগের সুখপাঠ্য পত্রিকা বামাবোধিনীর সম্পাদক তিনিই। তাঁহার পরিচালিত বামাবোধিনীর প্রভাবে অনেক স্ত্রীলোক মহোপকার লাভ করিয়াছেন। বামাগণের রচনা গদ্য প্রবন্ধ ও পদ্য রচনায় তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। কোন বামার সুশিক্ষার পরিচয় পাইলে বা বামা রচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাইলে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন, তাঁহার বামাবোধিনী হিন্দু, ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের জন্য উন্মুক্ত।

সিটিকলেজ ও মূকবধির বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইতে বর্ত্তমান সমুন্নতি প্রধানতঃ উমেশচন্দ্রেরই চেষ্টার ফল। হরিনাভী প্রভৃতি স্থানের স্কুল, নানা স্থানের ব্রাহ্ম মন্দির, স্বর্গীয় মহাত্মাদের স্মৃতি সভা, পাঠাগার, পুস্তকালয়, দাতব্য ভাণ্ডার, দাতব্য চিকিৎসালয়, দুর্ভিক্ষ প্রতিষ্ঠান, সোমবারী [illegible]

উমেশচন্দ্রের ভূয়িষ্ঠ সংযোগ ও সহানুভূতি ছিল। রাত্রিকালে কয়েকঘণ্টা মাত্র তিনি নিদ্রা যাইতেন। কর্ম্মেই তাঁহার স্বচ্ছন্দ ছিল এবং কর্ম্মেই তিনি বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেন। উমেশচন্দ্র প্রকৃত পক্ষে একজন পরম ঈশ্বর পরায়ণ সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ভগবদ্‌ প্রেম ও ভগবদ্‌ প্রীতির বিষয় ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। মুমূর্ষু সময়ে যখন এককালে সংজ্ঞালোপ, পুত্র কন্যা দত্ত জলবিন্দু ওষ্ঠপ্রান্তে গড়াইতেছে, নাভিদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত, তখন তাঁহার বদনে 'মা' 'মা' 'মা' এই অমৃতাক্ষর নিঃস্বনিত হইতেছে। মহাযোগী যোগ নিদ্রায় অভিভূত, মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি! অপূর্ব্ব মাধুরী! জীবাত্মা দেহ পিঞ্জর হইতে ধীরে ধীরে পরমাত্মায়বিলীন হইতেছে, এ মহাসঙ্গম! এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতে হয়। যেন স্বতঃই মনে হয় মা আনন্দময়ি! একি তোমার বিচিত্র লীলা,—শুনিয়াছি সাধুদিগের জীবনে তুমি আনন্দময়ীরূপে সপ্রকাশ থাকো, মরণেও আনন্দময়ীরূপে সপ্রকাশ। একি তোমার আনন্দের লীলা খেলা! মা! তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১০॥ টার সময় মহাযোগীর মহাসমাধি হইল। কর্ম্মবীরের কর্ম্মের অবসান হইল, ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদযাপন হইল, কিন্তু যতদিন সিটিকলেজ বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন অনাথাশ্রম, মূকবধির বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত মহাশয়তার ও পরোপকারিতার মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সত্যের মহিমা জগতে বিঘোষিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের প্রতি সম্মান জগতে সংরক্ষিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে সতত বিরাজিত থাকিবেন। তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়, তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন মগধ রাজ্যের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহের আধুনিক নাম রাজগির। এই নগর রাজা জরাসন্ধের পুরাতন রাজধানী ছিল; এবং বসু বংশ হইতে বিম্বিসার নরপতি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ভূপালগণ এই নগর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। কুশাগ্র বসু এই রাজগৃহ নগরকে গঙ্গা ও শোণ সঙ্গম স্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। যে শিল্পজ্ঞ এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মহাগোবিন্দ। এই পুরাতন মগধের রাজধানীর অন্য নাম গিরিব্রজ এবং কুশাগ্রপুর। সুগন্ধি কুশ তৃণ প্রাচীনকালে ঐ স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং এক্ষণও জন্মে, সেইজন্য ঐ তৃণের নামানুসারে ঐ নগরের নাম কুশাগ্রপুর করা হইয়াছিল। রাজগৃহ নগর পাঁচটী পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত সেইজন্য জরাসন্ধের রাজধানীর পুরাতন নাম গিরিব্রজ রাখা হইয়াছিল। যখন বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজা হন, তখন তিনি গিরিব্রজ নগরে আর রাজধানী রাখিলেন না, বিপুল পর্ব্বতমালার উত্তরে সরস্বতী নদীর পূর্ব্বে রাজগৃহ নামে এক নূতন নগর স্থাপন করিয়া রাজধানী করিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬০ অব্দে বিম্বিসার কর্ত্তৃক এই নগর প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নূতন রাজগৃহ একটী অসমান পঞ্চভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার এক সীমা অতি দীর্ঘ; অন্য চতুঃসীমা দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান, সর্ব্বসমেত প্রায় ৫ ক্রোশ স্থান পরিবেষ্টন করিয়া এই নগর অবস্থিত।

বুদ্ধের জন্মের অব্যবহিত পরে এই নূতন রাজধানী অত্যন্ত ধন সম্পত্তি শালী হইয়াছিল। যখন অশোক রাজা হন তিনি এই নগর ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া পাটলি পুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন

খৃষ্টপর ৬৩৭ অব্দে ব্রাহ্মণেরা সেখানকার একমাত্র অধিবাসী ছিলেন এমন কি এক্ষণ পর্য্যন্তও সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। কথিত আছে পুরাতন রাজগৃহ নগরে মহারাজা অশোক একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি দক্ষিণা দিবার জন্য ১৫০০ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি রাজগৃহ নগরের শাসনভার কয়েকজন প্রধান ব্রাহ্মণগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত ও সেখানে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতা প্রায় পূর্ব্ববৎই পরিলক্ষিত হয়। জরাসন্ধের রাজত্ব সময়ে গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা অতি মনোরম ছিল এবং দুরাক্রম্য দুর্গসমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত পরিলক্ষিত হইত।

মহাভারতে উল্লেখ আছে অর্জ্জুনের সহিত জরাসন্ধবধার্থে অভিযানকালে বসুদেব এই নগরের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ দেখ পার্থ! বিবিধ পশুসমাকীর্ণ, সুগভীর জলাশয় সংযুক্ত, সুরম্য হর্ম্ম্যে অলঙ্কৃত, উপদ্রবশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈভারা, বরাহ, বৃষভ, ঋষি গিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্ব্বত রহিয়াছে। এই সুশীতল দ্রুমসমূহশোভিত, উন্নত শিখর পর্ব্বত সকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। পুষ্পিত শাখা বিশিষ্ট সুগন্ধযুক্ত, কামীজনপ্রিয়, মনোহর লোধ্রবনরাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে।"

পরে বসুদেব অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ শ্রেণী ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে গিরিব্রজ নগর অট্টালিকা ও ধনসমৃদ্ধিশালী লোকে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থানে কীর্ত্তিকলাপ পূর্ণ বহুবিধ কার্য্য মহোৎসবে সম্পন্ন-টিত হইয়াছে, অদ্য সেই স্থান জনহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কোনও ব্যক্তি এক্ষণে সেই স্থান পরিদর্শন করিলে তাহার অন্তঃকরণ দুঃখে দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে না।

খৃষ্ট পর ৪০০ অব্দে যখন চীনপর্য্যটক্ ফাহিয়ান্ এই স্থান পরিদর্শন করেন তখন সমস্ত অট্টালিকা ও দুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তিনি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন," ৫টী পর্ব্বতে ৫টী প্রাচীরের ন্যায় নগর পরিবেষ্টিত করিয়া আছে, এই নগর রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজধানী। পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে এই নগর দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে দেড় ও দুই। ক্রোশ এখানে অশ্বজিতের সহিত শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। এখানে নির্গ্রন্থ বুদ্ধের প্রাণসংহার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইখানেই অজাতশত্রু একটী কাল হস্তীকে মদ্যপান করাইয়া বুদ্ধকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই নগরের উত্তরদিকে একটী অপ্রশস্ত উপত্যকায় অম্বপালি নামক উদ্যানে চিকিৎসক জীবক একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধকে তাঁহার ১২৫০ জন শিষ্য সমেত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নগর মধ্যে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। এই স্থান এখন মানবহীন মরুভূমিবৎ রহিয়াছে এই স্থান কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই তীর্থস্থান এই পুরাতন রাজগৃহে ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লেখকদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমরা অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী-গণের উৎপত্তির সময় নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ]

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

শিশু।

আনন কমল ফুল বিমল বরান,
কোমল ললিত কায় সুধার সমান।
নিয়ত হাসির কাছে না ধরে অধরে,
দামিনী ঝলকে যথা শারদ জলধরে।
পীযূষ পূরিত চারু বচন নিচয়,
শুনিতে কামনা করে লোক সমুদয়।
চঞ্চল লোচনযুগ ঢল ঢল করে,
অবিরত হাসি কান্না বিরাজে অধরে।
সুচারু চরণযুগ, চপল চপল,
খেলিতে নিয়ত রত করে কোলাহল।
ভাবনা বিহীন মন, কামনা সাধে,
আনিতে জিনিস শুধু করে কল কল,
ভোজনের তরে করে নিয়ত রোদন,
পুলকিত পরিতোষে পাইলে ভোজন।
ঘোর ফের কিছু নাহি নিবসে অন্তরে,
সতত মানসে শুভ বিচরণ করে।
নকল করিতে পটু চপল হৃদয়,
যা দেখে বা শুনে তাহা শিখে সমুদয়।
লেখা পড়া শিখ শিশো এইতো সময়,
হেলায় হারালে কাল সমুচিত নয়।
সযতনে বিদ্যাধনে পূর হৃদাগারে,
তমস আবৃত চিত্ত দীপ্ত করিবারে।
সুকোমল কায় মন, এমন সময়,
নীতি কথে দাও কর নবীন হৃদয়।
নীতি পরায়ণ হও নয়ন থাকিতে,
সংসারে সম্মান সুখে জীবন যাপিবে।
কাঁচা কাঁচা ডাল বাঁকা নোয়াইতে যত
উচ্চ শির কভু নহে সদা অবনত।
তাই বলি বলা যায় করি শিশুগণে,
যতনে রাখিবে সদা সন্তান কাননে
লোহার এ কাঁচা ডাল করিয়া যতন,
মিলাবে সদা ফলে ফল গাছেতে রতন।

প্রাচীন।

বলীতে লোলিত কায় বিকল শরীর,
চলিতে চরণযুগ নিয়ত অস্থির।
বাঁকাইত চিবুক নাহি দাঁত নাহি পাত,
লোচন বিকল দেখে শুভ্র আলুলিত মাথ।
শ্রবণে শুনিতে নারি কিছু কথা কথা,
নাসা আণ নাহি করে গোলাপ সৌরভ।
চিবাতে অশনচর্ম্ম দশন বিকল,
কাঁপে বা কঠিনতাপে করে থর থর।
সবলে বাঁধিতে সদা সতত রসনা,
বালকের মত করে বিনয় বাসনা।
কোথা চিকণ চারু চিকুর নিচয়,
ধবল বরণে তার শোভে অতিশয়।
বিচলিত চিত্ত সদা ভাবিয়া আকুল,
থেকে থেকে কত কাঁদে কত মনে ভুল।
বিগত যৌবন সুখ মানসে ভাবনা,
বাড়ায় যাতনা যত ভাবনা আপনা।
হাহাকার শান্ত নাহি সদাই মানসে,
পাপভার পরিত্রাণ নহেনাকো বশে।
আহা বীর যুবাগণ! ভাবি দেখ পথ,
আশা দিয়া কোন দিনে পূর্ণ মনোরথ।
যদি নেহাত হায় নীতি পালনে,

আমাদেরো রত মন রূপ যতনে।
বিগত যৌবন যবে হবে শেষ কাল,
তখন বিশাল মন হবে না ভগানে।

কর-বিজ্ঞান।

চতুর্থ অধ্যায়।

অঙ্গুলী "পর্ব্ব।"

অঙ্গুলীর উভয় গ্রন্থির ব্যবধানকে "পর্ব্ব" কহে। নখর যুক্ত পর্ব্ব হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব গণনা করা হয়। এই পর্ব্বত্রয় তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্বসমূহ, কল্পনা রাজ্য, দ্বিতীয় পর্ব্ব সমূহ মানসিক-রাজ্য, এবং তৃতীয় পর্ব্ব সকল, বাস্তব-রাজ্য সূচিত করে। সুতরাং, হস্তের মধ্যে অঙ্গুলী সকলের যে পর্ব্ব সমূহ দীর্ঘ হয়, মনও সেই পর্ব্বসূচক রাজ্যে বিচরণ করে।

প্রথম পর্ব্ব হস্তের লক্ষণ প্রকাশ করে, সুতরাং অঙ্গুলী হস্ত যে শ্রেণীভুক্ত তাহা জানা যায়।

অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা প্রথম পর্ব্ব সকলের দীর্ঘতা, রমণী বাক্যের পরিচায়ক। সেইরূপ দ্বিতীয় পর্ব্ব-সমূহ দীর্ঘ হইলে বুদ্ধিজীবি লোকের স্বভাব জ্ঞাপন করে; এবং তৃতীয় পর্ব্বগুলির সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতা ও স্থূলতা পার্থিব বিলাস-বাসনা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ। যদি তৃতীয় পর্ব্বগুলি করতলের ঠিক উপরিভাগেই পরিপুষ্ট হয়, আরামসুখ, পানভোজনে স্পৃহা জানা যায়। কিন্তু এইরূপ তৃতীয় পর্ব্ব কোমল হইলে অতিরিক্ত সুখ পানেচ্ছাও সূচিত করে।

যাহাদের তৃতীয় পর্ব্ব ক্ষীণমধ্য, তাহারা ঔদরিক নহে, কিন্তু তাহাদিগকে সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না। যাহাদের তৃতীয় পর্ব্ব সমূহ 'চ্যাপটা' ও সাধারণ ভাবের, তাহাদের ভোজনেচ্ছা প্রবল নহে।

পর্ব্ব সমূহের দীর্ঘতা।

তর্জ্জনী।

প্রথম পর্ব্ব—কুসংস্কার।
দ্বিতীয় পর্ব্ব—উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা গৌরব লালসা।
তৃতীয় পর্ব্ব—শাসন কর্ত্তৃত্ব।

মধ্যমা।

প্রথম,,— অবসাদ বা বিষণ্ণতা।
দ্বিতীয় ,,—কৃষিকার্য্য প্রিয়তা।
তৃতীয় ,,—মিতব্যয়িতা।

অনামিকা।

প্রথম ,,—সুকুমার বিদ্যাপ্রিয়তা।
দ্বিতীয় ,,—সাহিত্য-দর্শন প্রিয়তা।
তৃতীয় ,,—(তৎসহ শিরো রেখা দীর্ঘ ও সবল হইলে) অর্থপ্রিয়তা।

কনিষ্ঠা।

প্রথম ,,—শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য।
(অতি দীর্ঘ—মিথ্যাবাদিতা)
দ্বিতীয় পর্ব্ব— কার্য্যপটুতা।
তৃতীয় ,,—ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপ্রিয়তা (ঝোঁকো)।

অপর অঙ্গুলীর দিকে নত ভাবযুক্ত অঙ্গুলী বিচার করা আবশ্যক। যদি সমস্ত অঙ্গুলী মধ্যমা-স্থলীর দিকে নত হয় তবে সমস্ত জীবন বিষাদময় জানিবে।

তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠের দিকে নত—সাতন্ত্র্যে স্বাধীনতা প্রিয়তা। তর্জ্জনী মধ্যমার দিকে নত—নানা কারণে স্বীয় জীবনের নিষ্ফলতার জন্য বিষাদপূর্ণ আত্মাভিমানিতা।

মধ্যমা তর্জ্জনীর দিকে নত—কুসংস্কার জন্য বিষণ্ণতা।
মধ্যমা অনামিকার দিকে নত—সামান্য বিষণ্ণতা।
অনামিকা মধ্যমার দিকে নত বিষাদময় বৃথা গর্ব্ব।
অনামিকা কনিষ্ঠার দিকে নত—কোনরূপ উপজীবিকার্থ

সামান্য বা নগণ্য শিল্প বা সাহিত্য আলোচনা।

কনিষ্ঠা অনামিকার দিকে নত—বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রিয়তা।

অঙ্গুলী সকলের প্রসারতা;

এক অঙ্গুলী হইতে অন্য অঙ্গুলীর ব্যবধানই সেই অঙ্গুলীটির প্রসারতা অধিক তাহারই প্রাবল্য স্বীকার করিতে হইবে।

বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর মধ্যে বদান্যতা।

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে—স্বাধীন চিন্তা।

মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে সদানন্দচিত্ত।

অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যে—স্বেচ্ছানুষ্ঠান-কারিতা বা স্বাধীন কার্য্যকারি ।।

সহজেই অঙ্গুলী সকল প্রসারিত হইলে সমাজ বন্ধনে থাকিতে অনিচ্ছা, এবং সমস্ত অঙ্গুলী অনমনীয় ও অনসন্নিবিষ্ট হইলে, সমাজ বন্ধনে থাকিবার অভিলাষ বুঝা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

অঙ্গুষ্ঠ।

কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাই মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ বুঝা যায়। ইহাই মানব-চরিত্র-চিত্রণের সর্ব্ব প্রধান তুলিকা।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর তিনটী পর্ব্ব নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ করে।

প্রথম পর্ব্ব—ইচ্ছাশক্তি।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—ন্যায় বিচার শক্তি।

তৃতীয় পর্ব্ব—প্রণয়।

প্রথম পর্ব্ব।

যদি দীর্ঘ, দৃঢ়বদ্ধ ও স্থূলাগ্র হয় তবে স্থির হয় এবং অন্যের মতাপেক্ষী হয় না। ক্ষীণ মধ্য, তোষামোদ প্রিয়তার লক্ষণ। যদি সূক্ষ্মাগ্র ও কোমল হয়, তবে যতই দাম্ভিক হউক না কেন, ইচ্ছাশক্তির অক্ষমতা এবং এরূপ ব্যক্তি পরের দ্বারা চালিত হয়। পুরো স্থূলতা অবিবেচক ঐকান্তিকতার (অর্থাৎ একগুঁয়েমির) লক্ষণ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

দীর্ঘ, দৃঢ় ও সমভাবে পুষ্ট হইলে যৌক্তিক বিচার চিন্তাশীলতা ও প্রত্যেক বিষয়ের উভয়পক্ষ দর্শন করিবার বিচার শক্তি প্রদান করে, এবং আবেগ বা উগ্রতা দমন করে। আবার ইহার সহিত প্রথম পর্ব্বের দৃঢ়তা সহিষ্ণুতার বা ধৈর্য্যভাবের লক্ষণ। ক্ষীণ মধ্য দ্বিতীয় পর্ব্ব নিপুণতা ও একদেশদর্শীতা ব্যঞ্জক।

তৃতীয় পর্ব্ব।

শুক্র স্থানের নিম্নভাগে অবস্থিত। উক্ত পর্ব্বের দৈর্ঘ্যানুসারে বিশ্বস্ততার ক্রমবৃদ্ধি সূচিত হয়। ইহার সহিত শুক্রস্থান পরিপুষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা সূচিত করে। এই পর্ব্ব সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে, প্রবৃত্তি সকল কল্পনাপূর্ণ হয়। হ্রস্ব এবং স্থূল হইলে, প্রবৃত্তি সকল পাশবিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

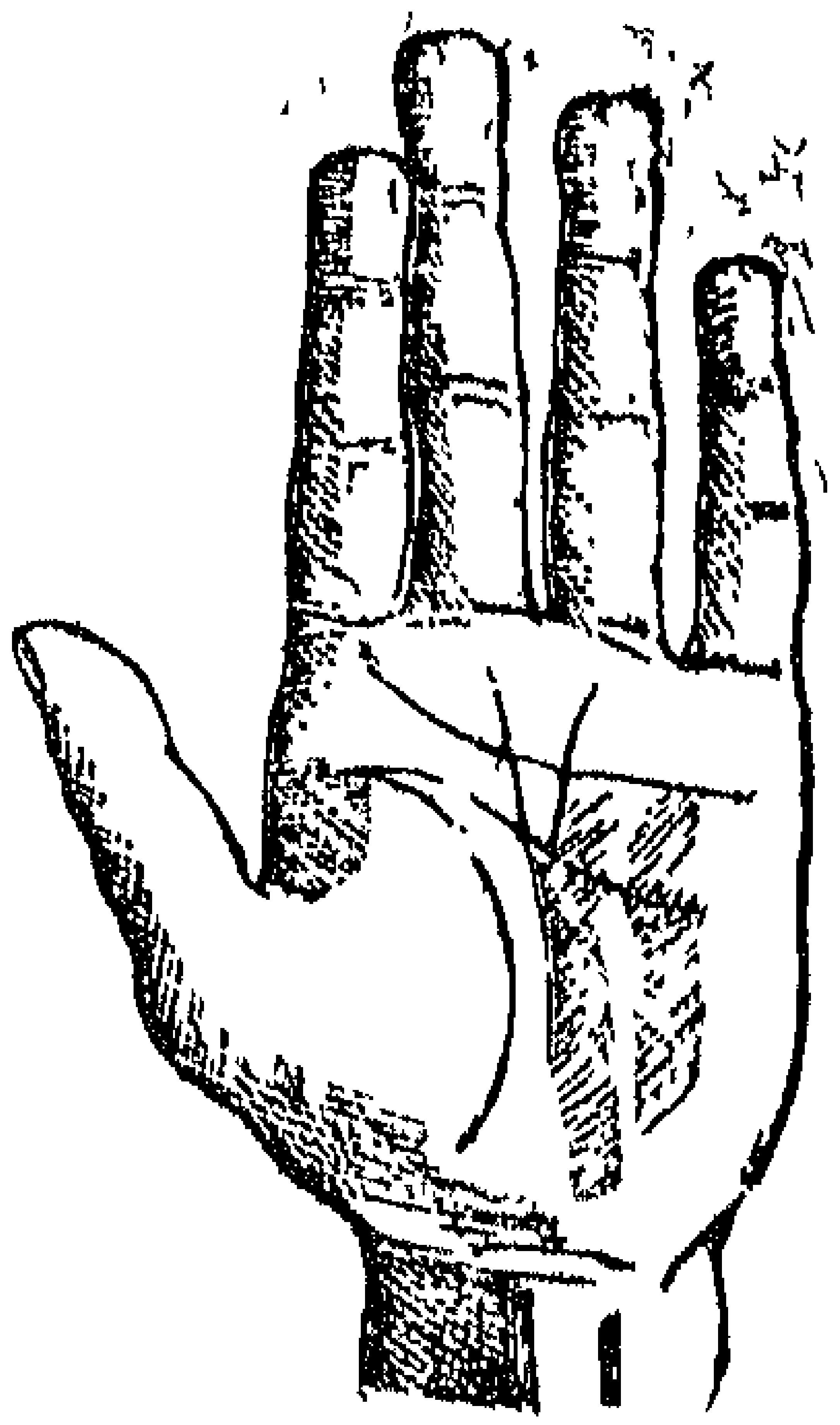
যদি অঙ্গুষ্ঠের পশ্চাদ্দিকস্থ কোণ সকল স্পষ্ট হয়, তবে সঙ্গীতশাস্ত্রে তালমান বোধ বুঝায়। উপরিস্থিত কোণ তালবোধক, নিম্নস্থ কোণ স্বরবোধক।

অঙ্গুষ্ঠের অবস্থিতি।

যদি অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ এবং সমকোণভাবে অবস্থিত থাকে কার্পণ্যদোষ এবং যোগ্যতাহীনতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু যদি উচ্চাবস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ প্রথম পর্ব্ব পশ্চাদ্ভাগে বক্র হয়, কেবল স্বাধীন ভাব সূচিত করে।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ব্যবধান অধিক হইলে উদারতা জ্ঞাপন করে। উক্তরূপ দূরব্যবধান সহিত প্রথমপর্ব্বের পশ্চাদ্ভাগে বক্রতা, অপরিমিত

ব্যয়িতার লক্ষণ। যদি এইরূপ ভাব প্রথম দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হয়, অর্থ ব্যয় বিষয়ে সদসৎ বিচার থাকে না। সমস্ত অঙ্গুষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগে নত, অভিনয় শক্তির অন্যতম পরিচায়ক। অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব সকল সুগঠিত, দৃঢ় এবং দীর্ঘ হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে অটল থাকে।



সুগঠিত অঙ্গুষ্ঠ বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিকে নিজ ইচ্ছা শক্তিবলে দমন করিয়া বহুল পরিমাণে করতল নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের অন্যান্য সমস্ত দোষ ক্ষালন করে। এইরূপ ব্যক্তি পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য বোধে আলস্য ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীলতা অবলম্বন করে। ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা স্বাস্থ্যনাশক বিবেচনায় ইন্দ্রিয়দমনে অনেকাংশে সমর্থ হয়।

আবার বিচারশক্তিহীন দুর্ব্বল অঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য গুণাবলীকেও নষ্ট করে। ক্ষুদ্র সূচাগ্র প্রথম পর্ব্ব, ক্ষীণ মধ্য দ্বিতীয় পর্ব্ব এবং সমস্ত অঙ্গুষ্ঠের ক্ষুদ্রতা, অব্যবস্থিত চিত্ততা, দুর্ব্বল চিত্তে ঐকান্তিকতাযুক্ত অর্থাৎ দুর্ব্বল-চিত্ত অথচ একগুঁয়ে মনুষ্যের লক্ষণ। এরূপ ব্যক্তি অধ্যবসায়শূন্য ও সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য। তাহারা কিছুই সুসম্পূর্ণ করিতে পারে না, সহজেই লোকের কথায় বিচলিত হয়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃ শাস্ত্রী।

হত্যা-রহস্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলহ।

রহমানের কথা শুনিয়া হামিদ একটু উদ্ধতস্বরে কহিল, "তুমি কি মনে কর, তোমার গায়ে জোর আছে ব'লে তোমাকে ভয় কর্ত্তে হবে?"

অর্দ্ধোত্থিত হইয়া রহমন কহিল, "কি তুই আমাকে তাচ্ছিল্য কর্‌ছিস্?"

"না, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে চাই না।"

"হাঁ, তাই বল্। যদিও এখন বয়স হয়েছে তবু এখনও তোর মত দশটাকে নিকেশ কর্ত্তে একটুও মেহন্নত হয় না।"

"আচ্ছা, তুমি কি হিতকথা শুন্‌বে না?"

"কেন শুন্‌ব' না?"

"দেখ, মা তোমার বিশেষ উপকার করে থাকে।"

"কে আমার উপকার করে সে আমিই বেশ বুঝি; তোকে বল্‌তে হবে না, তুই থাম্।"

"তাকে কি এখানে নিয়ে আস্‌ব'?"

"কেন রে?—মদ খাবে নাকি?"

"ঐ ত তোর দোষ,—মদে কত মজা বুঝতে পাল্লে না।"

"মা এসে তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌তো।"

"কি বুঝাবে?—কোন মদে কত মজা হয়?

কি বুঝাবে তাত তুমি জান।"

"আমি জানি?—বলিস কি রে?"

"তার দেরাজ থেকে তামাসা করে যে কাগজগুলা নিয়েছ সেই জন্য।"

রহমন উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "তা হ'লে, তামাসা ক'রে কাগজগুলা নিয়েছি?—হাঃ, হাঃ, কথা শুনে ভারি হাসি পাচ্চে।"

"সে যাহোক, কাগজগুলা ফিরে দিলে পাঁচশত টাকা পাবে।"

"সত্যি, তোর কথাশুনে বড় লোভ হচ্চে যে।"

হামিদ মৃদুস্বরে কহিল, "মা কখন তোমাকে কোন জিনিস দিতে অস্বীকার করে নাই, করেও না।"

"আহা, তা হ'লে বেচারী কিছুতেই আমাকে ছাড়্‌চে না।"

"তুমি কি তার অনিষ্ট ক'র্‌বে?"

"আমি কি তার কিছু অনিষ্ট ক'রেছি?

"হাঁ।"

"কি বলত বাবা—কি করেছি?

"তোমারই এই কামের জন্য তার সর্ব্বনাশ হবে।

"সর্ব্বনাশ হবে—এখনও হয়নিত? যদি এটা আমার তামাসাই হয় তবে এত ভয় কেন?"

"কাগজগুলা ফিরে দিবে?"

"আমিত লই নাই বাপ।"

"কে নিয়েছে জান?"

"কেমন ক'রে জান্‌বো?"

"আচ্ছা, কালতুমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌বে?"

রামদীন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "দেখাযাবে, যদি হাতে কাজ না থাকে তবে দেখা কর্‌ব।"

বিমর্ষ বদনে হামিদ ভাঁড়ওয়ালা গলি পার হইয়া সুরার দোকানাভিমুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কারাগৃহ।

পিতৃহত্যা অভিযোগে অমরের বিচার শেষ হয় নাই। অমর হাজতে। হাজতের একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া অমর আজ বিষন্নবদনে নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন।

প্রহরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র অল্পক্ষণ মধ্যেই হাজতগৃহে অমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অমর কহিল, "মহাশয়, আপনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছেন। আমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব।"

হেমচন্দ্র বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "তবে কি দোষী?" অ। না, মহাশয়, আমি দোষী নহি। ভগবানই জানেন, আমি দোষী কি না।"

হে। কে এ কার্য্য করিয়াছে জান?"

অ। কেমন করিয়া বলিব বলুন?

হে। যদি তুমি নির্দ্দোষী, তবে একথা বলিলে কেন?

অ। কি করিয়া বলিব? সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

হে। তোমার পিতার মৃত্যুতে তোমারই সুবিধা; বাধা দিয়া একটু বিরক্তির হাসি হাসিয়া অমর কহিল, "মহাশয়, যদি কোন পক্ষপাতের বিষয় থাকে তাহা এই;—পিতার মৃত্যুতে আমার কিছুই নাই; তাঁহার উইল যখন পড়া হবে, দেখিবেন তিনি আমাকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

অমর কহিল, "আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই নহে ;— তিনি আমার জন্য একটী পাত্রী স্থির করিয়াছেন, যাহাকে বিবাহ না করিলে আমি এক কপর্দ্দকও পাইব না।"

হে। বিবাহ না করিলে সম্পত্তি কাহার হইবে?

অ। তাহা ঠিক বলিতে পারি না ; বোধ হয়, সেই পাত্রীটীই পাইবে।

হে। এই পাত্রীটী কে?

আমাদের কোন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয় কন্যা, নাম তারা।

হে। বিবাহ বিষয়ে তাহার মত লওয়া হইয়াছিল।

অ। অবশ্যই। অর্থ থাকিলে তারা বিজাতীয়কও বিবাহ করিতে নারাজ নয়।

হে। তুমি পিতার সহিত যে দিবস রাত্রে বিবাদ করিয়াছিলে?

অ। হাঁ, কিছু টাকা চাওয়াতে তিনি দিতে অস্বীকার করেন, তাহাতেই রাগের মাথায় কোন অনুচিত কথা বলে থাকিব।

আচ্ছা তারার সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে?'

"কিছুমাত্র না।"

"সে কি তোমার পিতার উইলের বিষয় জানে?"

"সম্ভবতঃ জান্‌তে পারে।"

"তবে সে নিজের সুবিধার জন্য খুন করিতে পারে?"

"না, তাহা হতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে অনেক আগে অন্য প্রকারে তাঁহাকে মারিতে পারিত। আরও এরূপে খুন, সে করিতে পারে না।"

"খুনের সময় তুমি কি নিকটেই ছিলে?

"আজ্ঞে না।"

"তবে কোথায় ছিলে তুমি?

অমরের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ হইয়া গেল; কাঁপিতে কাঁপিতে অমর কহিল, "ক্ষমা করুন, সে কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না।

হেমচন্দ্র অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অমর হত্যা সময়ে কোথায় ছিল বলিল না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে সেই দিবস অমর অপরাহ্ন ভ্রাতা মোহনলালের সঙ্গে ছিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হেমচন্দ্র মোহনলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়বাজারে অমরদের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিবস তাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

হেমচন্দ্রের মনে ধারণা হইল যে হত্যাকান্ডে অমর ও মোহন লাল উভয়েই কোন প্রকার বিশেষ গুপ্তকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, নতুবা অমর তাহা সহজেই প্রকাশ করিত।

পর দিবস প্রভাতে স্বীয় অফিস-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হেমচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, বেচুসরকার একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া একখানি বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, অমরও আসিবে।"

বেচু একটু বিমর্ষ ভাবে কহিল, "আর মশাই, আমাদের কি কবে? কাল সেই আপনি কি সুযোগ করে বল্লেন, সেই থেকে বাছা একবারে শুকিয়ে গেছে।"

"তাইত, বড় দুঃখের বিষয়।"

"আপনি দুঃখিত হ'লেন বলে তার কিছু উপকার হবে না।"

"সে কথা ঠিক, তুমি বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলেছ।"

"আজ্ঞে, আমার বাপ পিতামহ আমাদের গাঁয়ের মধ্যে বড় পাণ্ডিত্য লোক ছিলেন, সকলে তাদের পরামর্শ নিয়ে কাম কর্ত্ত।"

"বটে! পণ্ডিতের বংশ তোমাদের!

ঘেঁটুর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল, কহিল সাবধান হয়ে কথা বল্‌বেন, নয়ত দাঙ্গা হাঙ্গাম হয়ে যাবে। আমার পিতেমা পণ্ডিত ছিলেন আপনি তাঁদের ঠাট্টা কর্ত্তে পারেন না। ভগবান তাঁদের পণ্ডিত করেছিলেন—সেটা কি তাঁদের দোষ?"

আমি ত বাপু তোমার পিতা, পিতামহকে উপহাস করি নাই।"

"হতে পারে; কিন্তু যদি আমি সাবধান না করে দিতুম তাইলে পরে হয়ত অপমান করে ফেল্‌তেন।"

"বেশ বাপু, তুমি খুব সাবধানী। যা হোক, তুমি অলকাকে বলিও অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।"

"আজ্ঞে সে তা জানে। কারণ, কালত খাবার সময় আপনি দেখা করবেন বলে গেলেন।"

"হাঁ, অলকাকে বলিও যে এখন অনেক আশা আছে, বোধ হয় কৃতকার্য্য হইব। আর যদি পারে তবে যেন আমার সহিত শীঘ্র একবার দেখা করে।"

"যে আজ্ঞা ম'শাই" বলিয়া ঘেঁটু সরকার গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারদেশে মোহন লালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া প্রস্থান করিল।

ঘেঁটু চলিয়া গেলে মোহন লাল হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। পরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি কাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন শুনিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

মোহন লাল গৌরবর্ণ। শরীর নাতিদীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব পরন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে কোঠরস্থ চক্ষু ও শুষ্ক মুখ রাত্রিজাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

অলকা ও মোহন লালের পিতা বিখ্যাত নামজাদা লোক। প্রায় ৫।৭ লক্ষ টাকার কারবার। কিন্তু লোকটী পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। পুত্র মোহন লাল একটু উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের এবং তাহারই সঙ্গদোষে অমরের অধঃপতন হইয়াছিল। মোহনলাল পিতার নিকট সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইত, তথাপি তাহার চরিত্র সংশোধনে কিছুমাত্র চেষ্টা করিত না। ভগ্নী অলকা তাহাকে অত্যধিক স্নেহ করিত এবং সেই সুযোগে মোহনও তাহার আবশ্যক অর্থাদি ভগ্নীর নিকট হইতে মিথ্যা কারণ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইত এবং তদ্বারা নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিত।

[ক্রমশঃ]

টাইফয়েড্ জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ইহার চিকিৎসায় যেমন ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সুবিবেচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থার প্রয়োজন, তদ্রূপ পথ্যের সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পীড়ার প্রথম হইতেই কোন প্রকার অতরল (Solid.) পদার্থ আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ যদিই উহা সম্যক পরিপাচিত না হয় তাহা হইলে উদরাময় আনয়ন করিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি, যে, উদরাময় অথবা তাহার প্রবণতা এই পীড়ায় বড়ই মন্দ লক্ষণ; এইকারণ যথাসাধ্য উহা যাহাতে না হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অতরল পদার্থ উদর মধ্যে যাইয়া অন্ত্র মধ্যে উপদাহ (irritation) উৎপাদন করিয়া রক্তস্রাব আনয়নও করিতে পারে। ইহা আরও মন্দ লক্ষণ। এই সকল উপসর্গের হাত হইতে

রোগীকে রক্ষা করিবার জন্য সাগু, বার্লী বা অ্যারো-রুট ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদরাময় প্রবণতা লক্ষিত হইলে উহা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে জলের সহ প্রস্তুত করিতে হইবে নতুবা জল মিশান দুগ্ধের দ্বারা (ঘন দুগ্ধে উদরাময় আসিতে পারে) প্রস্তুত করিয়া দিতে পারা যায়। মেলিন্স্ ফুড্ বা হর্লিক্স্ মল্টেড মিল্ক কি বেঞ্জারস্ ফুড (উদরাময় স্থলে বিশেষতঃ) প্রভৃতি বিলাতী পথ্য ও জল বা দুগ্ধের সহ সেবন করিতে দিতে পারা যায়। এখানে আমরা স্বদেশী না হইয়া বিদেশীর আশ্রয় লইতেছি বলিয়া হয়ত অনেকে রাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে বিলাতী ঔষধ যখন ব্যবহার করিতে দোষ নাই, সেইরূপ রোগীর পথ্যস্থলে (উহাও ঔষধ বলিয়া ধরিয়া) বিলাতী ফুড ব্যবহার করা দোষ হইতে পারে না। আজকাল কতকগুলি স্বদেশী ফুড্ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা এখনও সম্যকরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। বহু পরীক্ষিত দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া জীবন মরণের সংগ্রাম স্থলে আমরা কোন মতেই অপরীক্ষিত স্বদেশী ফুডের প্রচলন করিতে ব্যবস্থা দিতে পারি না। ইহাতে যদি আমাদের কোন স্বদেশী দাতা রাগ করেন বা বিরক্ত হন তাহা হইলে আমরা নাচার।

যাহা হউক আমরা যাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাই আরম্ভ করা যাউক—স্বদেশী বিদেশীর তর্ক এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। যবের মণ্ড, খই-এর মণ্ড, মুসুরির যূষ প্রভৃতিও আমরা অনেকস্থলে ব্যবস্থা করিয়া সুফল পাইয়াছি। অধিক অব-সাদাদি ও দৌর্ব্বল্য স্থলে মাংসের যুস্ (কচি পাঁটা কিম্বা ছানা মুরগী হইলেই ভাল হয়) অথবা উহার জল্ সুপ (Tug-soup) করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কবুতরের মাংসও অনেকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন দেখিয়াছি। এইত গেল জ্বর থাকা কালে, এখন জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইলেও সত্বর অন্ন পথ্য করান কর্ত্তব্য নহে; অন্ততঃ ১০।১২ দিন যাবৎ নিতান্ত লঘু পথ্য দিতে হইবে—আমরা এমতস্থলে সুজি সিদ্ধ, খই বা মণ্ডের অথবা সিঙ্গী-কি মৌরলা মৎস্যের ঝোলসহ সেবন করাইয়া থাকি। ইহাতে রোগীও বেশ আনন্দ বোধ করে দেখিয়াছি।

এখানে আমাদের আবিষ্কৃত (ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী দ্বারা আবিষ্কৃত) এসেন্স অব্ মস্থরীর সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিতে ইচ্ছা করে। নিতান্ত নিস্তেজাবস্থায় আমরা অনেকস্থলে ইহা ব্যবহারে মাংসের যূস্ অপেক্ষাও অধিক ফললাভ হইতে দেখিয়াছি জ্বরাবস্থায় অথবা আরোগ্যাভিমুখীন (convalescence) অবস্থায় প্রতিবার পথ্যের পর ১০ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত বয়সানুসারে) ব্যব-হারে সহজে পরিপাক হইয়া শরীরে বলাধান হইতে দেখা গিয়াছে।

আমাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত দুইটি অতিশয় কঠিন রোগীর বিবরণ দিয়া এই খানে প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। বিবরণ পাঠেই জানিতে পারিবে যে কেমন মুমূর্ষু রোগীও মহাত্মা হানিমানের পুণ্য কীর্ত্তি ফলে আরোগ্য লাভ করিয়া হোমিওপ্যাথীর—সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখি-য়াছে।

দিনাজপুরের মহারাজার—ভূতপূর্ব্ব নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু পেয়ারী মোহন বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের এই পীড়ার সপ্তম দিবসে আমি আহূত হইয়া চিকিৎসার ভার লইয়াছিলাম। এ দিবস অপরাহ্নে যাকে আমি দেখিলাম যে বালকটি (৬ বৎসরের বালক) প্রায় অজ্ঞানা-বস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে,—উদর স্ফীত, দাস্ত বা প্রস্রাব হয় নাই, জ্বর প্রায় ১০৫ অথচ গাত্রতাপ

অধিক নহে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মও হইতেছিল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে। বাড়ীতে সকলেই এই অবস্থা দৃষ্টে মৃত্যু নিকট ভাবিয়া কান্নাকাটি করিতেই প্রবৃত্ত। অবস্থা দৃষ্টে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত প্রথমে হইয়াছিলাম। তাহার পর সকলকে আশ্বাস দিয়া ওপিয়ম (৩০) একমাত্র বালককে সেবন করাইলাম এবং উদরে গরম জলের ফোমেণ্ট করাইতে লাগিলাম। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই একবার বেশ প্রস্রাব হইয়া গেল এবং সামান্য দাস্তও হইল। তাহাতে বালক সুস্থবোধ করিল পরদিন হইতে বালকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। জ্বর ১০৪ এর নীচে নামে না, ক্রমে ঘোর ডিলিরিয়ম, প্রায় অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জন্য সর্ব্বদা চীৎকার করা, শূন্যে হাত নাড়া, হস্ত ও জিহ্বা কামড়ান, শয্যার বস্ত্র টানিতে থাকা প্রভৃতি সমুদয় মন্দ লক্ষণই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩ দিনের দিন হইতে ১৫ দশ দিন পর্য্যন্ত অতিশয় বৃদ্ধি অবস্থা ছিল। ১৫।১৬ দিনের পর হইতে জ্বর বসিয়া ১০১ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তখনও ডিলিরিয়মের অতিশয় বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইয়াছিল বলা বাহুল্য যে ইহা অতিশয় মন্দ লক্ষণ। বালকের আকৃতি এমন কালি মাখা হইয়াছিল যে তাহাকে চিনিতেই পারা যাইত না। বিশেষ হাতের অঙ্গুলিদ্বয় ও পায়ের পাতা, জিহ্বা এত অধিক কাল হইয়া গিয়াছিল যে তাহার জ্যেষ্ঠ" (১৯ বৎসরের বালক) হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল যে (ঐ বালক) হনুমান হইয়া গিয়াছে বক্ষে উভয় ফুসফুসেই—ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, কাশি শুষ্ক এবং উৎক্ষেপ বিহীন ছিল। নাসিকা খুঁটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিত। উদরের ফাঁপ প্রায়ই থাকিত—দাস্ত হওয়া সত্ত্বেও—প্রস্রাব পরিমাণে স্বল্প হইত।

যাঁহারা এই রোগী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমরা অতি কষ্টে পূর্ব্বোক্তরূপ ভয়াবহ অবস্থা হইতেও ঐ বালকের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া হোমিওপ্যাথীর জয় জগতে ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই রোগীর চিকিৎসা ধারাবাহিক রূপে কি কি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বর্ণনায় এখানে স্থান নাই সেজন্য অগ্রে সে গুলির নাম বলিয়া যাইব। এই পীড়ার জন্য আমি হায়সায়ামস্ ষ্ট্রামোনিয়ম্, কেলি-ব্রোমেটস্ ডিলিরিয়ম জন্য, সিনা, এরম্ ট্রিফাইলম্ ক্রিমি ও অতিরিক্ত নাসিকা খোঁটার জন্য, ওপিয়ম ও নক্স মস্চাটা উদরের ফাঁপ জন্য এবং বক্ষাক্রান্তি জন্য ফস্ফরস্ ও কেলিব্রোমেটস সময়মত লক্ষণ-দৃষ্টে ব্যবহার করিয়াছিলাম। ২৩।২৪ দিনের পর হইতে সমুদয় লক্ষণের বেশ উপশম লক্ষিত হইয়াছিল এবং ২৯ কি ৩০ দিনে জ্বর একেবারে বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৫।৩৬ দিনের দিন পুনরায় রাত্রিতে হঠাৎ জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইজ্বর বৃদ্ধি ও সামান্য একবারে পুনঃপুনঃ জ্বর ক্যাল্কে-কা, ক্যাল্কে আস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

এইজ্বরে প্রবল বক্ষাক্রান্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা ব্লিষ্টার না দিয়া কেবলমাত্র তুলা ও ফ্লানেল ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম এবং মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তের আধিক্য জন্য মাথায় আইস ব্যাগ দেওয়া হইত।

পরিশেষে গৃহস্থের ধৈর্য্য সম্বন্ধে ২।১টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদের হোমিওপ্যাথীর উপর অটল বিশ্বাস ও ঔষধের সফলতা দর্শন জনিত ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হওয়ার জন্যই যে আমরা ধৈর্য্য সহকারে ঐ বালকের

চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এবং অনেক বন্ধুবান্ধব চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু গৃহস্থের মন থামাইতে পারেন নাই। রোগী যেরূপ দুর্ব্বল ও জীবনী শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছিল এই অবস্থায় তাহাকে উগ্র আলোপ্যাথী নানারূপ তীব্র ঔষধ সেবন করাইলে ফল কি হইত বলিতে পারি না। এই রোগীকে হোমিওপ্যাথির সফলতা দৃষ্টে অনেকের এই চিকিৎসার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাইয়া গিয়াছে।

আর একটি রোগীর বিবরণ এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত মল্লিক বংশের নন্দ মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কঠিন পীড়ায় গত বৎসর আক্রান্ত হইয়া আলোপ্যাথী দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছিল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য সাহেব ও বাঙ্গালী ডাক্তার প্লেগ বলিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন এবং ১৩ দিনের দিন একরূপ জবাব দিয়াই দিয়াছিলেন যে মারা যাইবে। যাহা হউক পরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয় আহুত হইয়া উহা টাইফয়েড ফিবার বলিয়া স্থির করেন। ঐ বালক তখন ঘোর অজ্ঞানাবস্থায় ছিল অথচ ঘোর ডিলিরিয়মযুক্ত; কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সদা চীৎকার ও অস্থির হইয়া শয্যায় এপাশ ওপাশ করিত। পেটে ফাঁপ, চক্ষে ক্ষত, কাণের পাশে রক্তার্ব্বুদ গাত্রে অজ তজ রক্তস্ফোট বাহ্যে প্রস্রাব এক প্রকার বন্ধ বলিলে চলে। সকলেই এই বালকের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিল। যাহা হউক ফলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং হোমিওপ্যাথীর অমোঘকতায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

এই রোগীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঔষধাদি ও পথ্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ডাক্তার—মৈত্র।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জনপ্রণালী।

স্বদেশী ও স্বজাতি আন্দোলনে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছে। অনেকেরই অন্তঃকরণে আত্মসম্মান স্বাবলম্বন নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চার হইয়াছে। দাসত্বকে হেয় জ্ঞান করিতে অনেকেই শিক্ষা করিয়াছে। শিক্ষারও দিকপরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এখন অনেকের নিকটেই আর যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিল্প বাণিজ্যের প্রতি সকলেরই এখন অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কলেজের পাঠসমাপনান্তে চাকুরী ও ওকালতি ব্যতীত অপর কোন উপায় আছে কিনা তদ্বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে ছাত্র সম্প্রদায়ের অনেককেই এখন দেখা যায়। সাময়িক পত্রাদিতেও শিল্প বিজ্ঞান কৃষি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদিরও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধের পাঠক শ্রেণীর সংখ্যাও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে আমরা অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছি যে দাসত্ব ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের আরও অনেক পথ খোলা রহিয়াছে। কেবল মাত্র উপযুক্ত চেষ্টার অভাব। কিন্তু সময়ের অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। গত তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে তাঁতের সংখ্যা যেরূপ সহসা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার। গত দুই বৎসরের মধ্যে কেবল মোজার কলই বঙ্গদেশে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বিক্রীত হইয়াছে কলিকাতার প্রায় ঘরে ঘরে ঐ কল

চালিত হইতেছে; দেখিতে দেখিতে আমাদের দেশে কতগুলি কাপড়ের ও সূতার, কল ষ্টিমার কোম্পানী, বীমা কোম্পানি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া গেল। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ও যদি কেহ আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে সন্দিহান হন তবে তাঁহার বুদ্ধি বলিতে হইবে।

চারিদিকে উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু তাহাই যথেষ্ট বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোন কারণ নাই। জাতীয় উন্নতি সাধনের আবেগের সঙ্গে কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল কিন্তু কার্য্য সাধনের জন্য কেবল আবেগই যথেষ্ট নয়।

কার্য্য উদ্ধারের জন্য ব্যবসায় পরিচালনোপযোগী বিশেষ বুদ্ধি থাকা অথবা তাহার বিকাশের বিশেষ আবশ্যক। ব্যবসায় বুদ্ধি একটি ভিন্ন জিনিস; তাহা সকলের থাকে না ইহাও একটী শিক্ষার বিষয়; আয়াস করিয়া ইহা লাভ করিতে হয়।

বর্ত্তমান উত্তেজনার ফলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে সত্য কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক ও ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। আমরা আপাততঃ সূত্র ও বস্ত্রাদি রংকরণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়াদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই।

শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ৪০০,০০০ মন রঙ্গিন সূতা ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য প্রায় ২ কোটী টাকা। এই সূতার প্রায় ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার সূতা বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এবং অবশিষ্ট বোম্বাই আমেদনগর পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয় অতি সামান্য ভাগ বঙ্গদেশের শিল্পিদিগের শ্রমজাত।

টাকা নানাদিক দিয়া আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে আমরা অন্ধ; আমরা তাহার কোনটীরই কোন সন্ধান রাখি না আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই সমস্ত দিক লক্ষ্য করা এবং তাহার যদি কোন প্রতিকারের উপায় থাকে তাহার বিধান করা।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমরা স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারে উদ্যোগী হইয়াছি কিন্তু যদিও দেখে আমরা স্বদেশী বলিয়া যাহা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই বিলাতি বা বিদেশ জাত।

আমরা দেশী তাঁতের কাপড় ব্যবহার করি তাহার সূতা বিলাতি দেশী গেঞ্জি ও মোজা ব্যবহার করি—তাহারও প্রায় সমস্তই বিদেশী। সময় বুঝিয়া বিদেশী বণিকেরা ঐ সমস্ত সূতার দর চড়াইয়া দিয়াছে এবং সেই জন্যই আমাদের দেশের প্রস্তুত গেঞ্জি মোজা প্রভৃতি বিদেশীয় সহিত প্রতি যোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। রেঙ্গুন বাতি আমরা দেশী বলিয়া জানি, কিন্তু উহার মূলধন সমস্তই সাহেব কোম্পানির। প্যারাফিন মোম দ্বারা ঐ বাতি প্রস্তুত। সাহেব কোম্পানী ঐ বাতি ৵১০ ও ৵০ মূল্যে প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু ঐ প্যারাফিন যাহা রেঙ্গুণ বাতির একমাত্র উপাদান তাহা উহারা।০ ।৫ মূল্যে প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় করিতেছে পাছে ভারতবাসীরা ঐ মোম খরিদ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া উহাদের সহিত প্রতি যোগিতা করে। এইরূপ পদে পদে তাহাদের শত্রুতায় আমরা—প্রতারিত প্রতিহত হইতেছি। ইহার উপায় আমাদেরই করিতে হইবে। আমরা একটী একটী করিয়া পর পর প্রধান প্রধান বিষয় গুলির আলোচনা করিব। আপাততঃ রং করা সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলা যাক।

বিলাতি ১৬নং রঙ্গিন সূতার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৲

টাকা। ঐ স্থলে বিলাতি ১৬নং সাদা সুতা ৷৶০ আনায় বিক্রীত হয় সুতরাং আমরা প্রতি পাউণ্ডে রং করার জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত দণ্ড দিয়া থাকি।

৪ লক্ষ মণ সুতা ৩ কোটি পাউণ্ডের উপর সুতরাং আমরা প্রতি বৎসর বিলাতকে কেবল রং-করিবার খরচা স্বরূপ ৭৫ লক্ষ টাকা অযথা দিয়া থাকি। ইহা কেবল বাঙ্গলা সম্বন্ধে। বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গলা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রঙ্গিন কাপড় ব্যবহৃত হয় সুতরাং সেই সমস্ত প্রদেশ হইতে আরও অধিক টাকা বিলাতের চরণে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। আমরা জাতীয় উন্নতির উপায় কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই খুঁজিয়া থাকি। অবশ্য সেদিক ও দেখিতে হইবে কিন্তু অপর দিক সম্বন্ধে একবারে উদাসীন থাকিলেও চলিবে না; সে দিকটাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

অনেক পত্রিকার সম্পাদক লেখকগণ কে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সহ শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারি না প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নূতন কোন শিল্প সম্বন্ধে পাঠক গণের কি করিয়া কার্যোপযোগী জ্ঞান জন্মিতে পারে। শিল্প প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শিখিবার পদার্থ নয়। "হাতে হাতিয়ারে" কাজ করিলে তবে কোন শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার জন্মিতে পারে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শিল্প শিক্ষার আশা বিড়ম্বনা মাত্র; তবে, ইহাতে উপায় মাত্র নির্দ্দেশিত হইতে পারে। ধরুন আমরা রং করিবার কতকগুলি উপাদানের নাম ধাম সহ কতকগুলি প্রক্রিয়া পরিষ্কার লিপিবদ্ধ করিলাম; তাহা পাঠ করিলেই একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সুতা উপযুক্ত মত রং করিতে পারিবে? রং করিতে গেলে হয়ত সুতার এক অংশে গাঢ় ও অপর অংশে ফিকে হইল; এ জিনিস বাজারের কাটিবে না; আবার রং করিবার পূর্ব্বে যে সুতা নরম ও উজ্জ্বল ছিল রং করিবার পরে হয়ত তাহা শক্ত, মলিন ও কর্কশ হইয়া পড়িল। ইহা স্বাভাবিক, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রত্যেক শিল্প সম্বন্ধেই এইরূপ। শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ শিল্পের উপর পাঠক গণের আগ্রহ আকর্ষণ করা ও আগ্রহ শীল পাঠককে পথ প্রদর্শন করা। যাহা হউক অনুরোধ মত শেষে দুই একটী আবশ্যকীয় ও অতি পরীক্ষিত রং করণ প্রক্রিয়া বিবৃত করিব। ইহার পূর্ব্বে আমার উহার কল সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ,

অদ্ভুত পরীক্ষা।

—(*)—

পুরাকালে জনশ্রুতি নামে এক নরপতি প্রাচীন ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। এই মহীপাল সাতিশয় সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে রাজ্যের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপিত ছিল। তিনি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য ধর্ম্মরাজ্যে আবার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং ভয় ও উৎপীড়ন দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মান-লাভ ও প্রীতি আকর্ষণ তাঁহার নিকট নিন্দনীয় ছিল। প্রজার সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি, দুঃখ নিরাকণের উপায় বিধান, ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বসাধারণের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও

একদিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য পরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এই জন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়া নানাদিগ্দেশ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ও সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদা তদীয় রাজসভায় সমাগত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি স্থানে স্থানে কূপ খনন, পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর পথিকবৃন্দের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থগণ ঐ সকল পান্থশালায় অযাচিতভাবে সুখসেব্য ভোজ্য পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার যশগান করিতে করিতে ভগবান সমীপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিত। ফলতঃ তাঁহার শাসনগুণে ও ধর্ম্মপ্রভাবে মর্ত্ত্যরাজ্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট' এই প্রচলিত বাক্য তাঁহার শাসনকালে জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। রাজা জনশ্রুতিও তাঁহার সুশাসন এবং বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসাবাদ শ্রবণে আত্মপ্রসাদরূপ বিমল ও পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিবস রজনীযোগে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নবশে দেখিতে পাইলেন সম্মুখে ফুল্ল কুমুদদাম সুশোভিতবাপী বিরাজমান; রাজহংসগণ সলিল বক্ষে কেলি করিতে করিতে বিবিধ বিষয়ক প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। প্রায় সকলেই একবাক্যে রাজা জনশ্রুতির বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া স্তুতিবাদ করিতেছে। অতঃপর এক বৃদ্ধ রাজহংস সলিল বক্ষে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বন্ধুগণ! এই রাজ্যে রৈক্য নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ বাস করেন। তিনি জনশ্রুতি নরপতি অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসাভাজন। এই বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজা এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে রৈক্যের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর একদা একজন দূত প্রত্যাগত হইয়া বলিল—মহারাজ! রৈক্যের অনুসন্ধান পাইয়াছি। এই বাক্য শ্রবণে রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বিবিধ ধনরত্নাদি লইয়া দূত সমভিব্যাহারে রৈক্যের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পর্ণশালার অভ্যন্তরে এক কদাকার দেহ ব্যক্তি সূত্রধরের কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। দূত বলিল মহারাজ! ইঁহারই নাম রৈক্য। রৈক্য সহসা রাজসমাগমে বিস্মিত হইয়া শশব্যস্তে রাজাকে যথাবিহিত সম্মানে অভিবাদন করিলেন।

রাজা সেই ধর্ম্মাত্মা দেহ শ্রমনিরত সূত্রধরের সদানন্দ চিত্ত ও অপূর্ব্ব তেজ দৃষ্টে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন প্রভু! আমি আপনার জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। রৈক্য বিনয়পূর্ণ বচনে উত্তর করিলেন মহারাজ! আপনার রাজভোগ ও আপনার বিবিধ ধনরত্নাদির প্রয়োজন কিন্তু আমি যে অমূল্য রত্নের প্রত্যাশী তাঁহার নিকট এ সমুদয় অতীব অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। আমার ইহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। বস্তুতঃ তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। সংসার সুখসম্ভোগ অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। জনশ্রুতি নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিফল মনোরথ হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরিশেষে রৈক্যকে একজন পরম তত্ত্বজ্ঞানী বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপলাবণ্যবতী একমাত্র কন্যা-রত্ন সুকন্যাকে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন, এবং অবিলম্বে রাজা পুনরায় বিপুল ধনরত্নাদি ও স্বীয় দুহিতা সমভিব্যাহারে রৈক্যের নিকট গমন করিলেন এবং রাজকন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এ প্রস্তাব রৈক্য প্রত্যাখ্যান করিলেন না। শুভ বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই মহাত্মা ধর্ম্ম ও পুণ্যের বলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কৃপায় দিব্যকান্তি রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইলেন; ইনিই মহর্ষি চ্যবন নামে খ্যাত রহিয়াছেন।

আমরা এইখানেই উপাখ্যানটীর শেষ করিলাম, এই উপাখ্যান হইতে কি শিক্ষালাভ করিলাম? শিখিলাম—শক্তি থাকিতে ক্ষমা, সত্যের পুরস্কার ধর্ম্মের প্রতি সম্মান, যোগ্যপাত্রে দান; জনশ্রুতি সসাগরা ধরার অধিপতি; রৈক্য রাজ্যের একজন দীনহীন অধিবাসী। রাজার দানে বিপুল রত্নাদি, রৈক্যের নিকট সেদান তুচ্ছ, সুতরাং হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অপ্রিয় ব্যবহারে জনশ্রুতির অবমাননা বোধ নাই, দ্বেষ নাই, প্রতিহিংসাও নাই। শক্তি থাকিতে ক্ষমা কি অদ্ভুত পরীক্ষা। পরীক্ষার পরিণাম সত্যের পুরস্কার। ধন্য পুণ্যভূমি আর্য্যভূমি! এরূপ নরপতি তোমাতেই শোভা পায়। ধর্ম্মেই তোমার উন্নতি। ধর্ম্মহীনতায় তোমার অবনতি। আর কতদিন ধর্ম্মহীন ভাব ভারতে থাকিবে? আর কতদিন পরে পুনরায় ধর্ম্মভাব পূর্ব্ববৎ প্রবুদ্ধ হইবে? যে তোমার দীন হীন সন্তানগণ আত্মস্বার্থপর স্বার্থে বলি দিতে শিখিবে, সত্যকে সত্য বলিয়া চিনিবে; সত্য রক্ষার জন্য, কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। পুণ্যভূমি আর্য্যভূমি, পুণ্যভূমি এসিয়া খণ্ড! তোমরা জগতের গুরু; সমস্ত জগৎ আজ তোমাদিগের নিকট অবনত মস্তকে ধর্ম্মজ্ঞানলাভ করিতেছে। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আজ ধর্ম্মহীন, একবার পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মে অনুপ্রাণিতকর; পুনরায় সত্য যুগের আবির্ভাব হউক।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

পাটোয়ারি বুদ্ধি।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস, রাজসেবা কত অচমচ, গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এইমত, ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ।" একথা কে না জানে? তথাপি চাকুরীর কি যে মোহিনী শক্তি, কেহই ছাড়িতে পারে না। বিষ্ণুপুরের মদন ঘোষ ও ইহার একজন। কিন্তু তাঁহার কয়েক ঘর জ্ঞাতি বাণিজ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মদন-ঘোষের পৈতৃক ভিটার চতুর্দ্দিকে তাহাদের সকলের দোতলা তেতলা অট্টালিকাগুলি যেন কলিকাতার অপরিষ্কৃত পথ পার্শ্বস্থ বিপুল সৌধমালার ন্যায় শোভা পাইত।

তাঁহার জ্ঞাতিদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের ধুমে রাত্রে ঘুম হইত না। তাহার উপর আবার গৃহিণীর তাড়না, মধ্যে মধ্যে শুকনা ঝগড়া। মদন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

মদনঘোষ একটী সামান্য চাকুরী করিতেন। আয় অতি যৎসামান্য এবং তদ্দ্বারা অতিকষ্টে কোনরূপে তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন হইত। তজ্জন্য মদনঘোষের বদনে কেহ কখন হাসির রেখাও দেখিতে পাইত না। মদন চিরদিন বিষণ্ণ বদনে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন

ও মনে মনে জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলের জন্য তাহাদের ভবযন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্য ধর্ম্মরাজের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কলিতে অধর্ম্মের জয় বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়াছিল।

যখন সকল প্রার্থনা নিষ্ফল হইল, তখন মদন ভাবিলেন দৈববল ভিন্ন উপায় নাই। দেবতারাই মানুষকে রাতারাতি বড়মানুষ করিতে পারেন। নিজে তিনি বেশ চালাক‍্‍ চতুর, ব্যবসা করিলে একজন বড়মানুষ হইতে পারেন, কিন্তু পুঁজি নাই। সুতরাং, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে দৈববল উপার্জ্জন করাই স্থির করিলেন।

একদিন দিনমণি তাঁহার দিনের কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করে বাটীযাবার যোগাড় কচ্চেন, এমন, সময়ে আকাশ থেকে সন্ধ্যাদেবী এসে পড়লেন। সন্ধ্যার এক কাল মেয়ে সঙ্গে, মেয়েটীরনাম নিশি, মিস্‌মিসে কালো, বিষণ্ণ বদন নিশি বাপের আদরের মেয়ে। পিতা দিনমণি তাঁহার আদুরে মেয়ের বিষণ্ণ বদন আড়ালথেকে দেখে মস্ত বড় সুতায় বড় বড় হীরের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলেন। নিশিঠাকুরাণী সাজসজ্জায় বিভূষিত হয়ে সবেমাত্র দাড়িয়েছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাস আসিয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা, আসন বাঘছাল পরিধান বাঘছাল, মস্তকেজটাভার। দাড়ী বিলম্বিত, নেত্র ঢুলু ঢুলু। হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘাকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—যেন নিশিঠাকুরাণীর সদ্যজাত সন্তান।

গ্রামে অমনি রাষ্ট হইল একজন মহাকায় সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। দলে দলে লোক আসিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ নিজের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ঔষধাদি দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও যথাসাধ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা মদন অবশ্যই শুনিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই দৈব উপায়ে স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে এই সুযোগ বুঝিয়া বিরলে সন্ন্যাসী দর্শনে অভিলাষ করিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, লোকের ভিড় কমিলে, ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, নতুবা আজ আপনার পদপ্রান্তে এ ছার তনু বিসর্জ্জন করিব।"

সন্ন্যাসীর বোধ হয় কিছু ক্ষমতা ছিল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া মদনকে কহিলেন, "বেটা তোর ভাল হবে, তুই যা রোজ সাঁজ সময়ে শিবমন্দিরে যাস্, আর সেখানে গিয়ে ভক্তি করে প্রার্থনা করিস্।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মদন আপন কার্য্য করেন এবং অবকাশে একান্ত মনে আশুতোষের আরাধনা করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গ্রামের প্রান্তস্থিত শিবালয়ে গিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শিবের আরাধনা করেন।

কিসে কি হয়, তাহা ভাল বুঝা যায় না। কেন হয়, কেমন করিয়া হয়—তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঐ পূর্ণিমার চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ,—কিন্তু প্রতিপদ হইতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়। অন্তিমে অমাবস্যায় কিছুই নাই, কেবল ঘোর অন্ধকার। আবার শুক্লপক্ষারম্ভে সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অন্ধকারের ক্ষয়। শেষে পূর্ণিমায় কিছুই,নাই—কেবল আলোক! কিন্তু কেন যে চিরকাল এইরূপ হইবে, কেন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না—কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

আবার বুঝি আলোকের পর অন্ধকার ও অন্ধকারের পর আলোক প্রকৃতির একটী নিয়ম।

যাহা হউক, শিবের আরাধনা বা মদনের ভাগ্যবলে তাঁহার শুভদিন উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে দয়া অধিক, সহজেই লোকের প্রতি দয়া হয়, সহজেই লোককে ভালবাসে। মদনের একান্ত ভক্তি দেখিয়া পার্ব্বতীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল; তিনি মহাদেবকে কহিলেন, "ঠাকুর, মদনের প্রতি কৃপা কর, এ বড় দুঃখী ইহার দুঃখ দূর করিতে হইবে, মদন বড় ভক্ত।"

মহাদেব কহিলেন, "দেখ, পার্ব্বতি, মদনের ভাল করব কি, ভাল করতে গেলে, উহার জ্ঞাতিদের দ্বিগুণ ভাল হইবে। "পার্ব্বতী বলিলেন, "তা হউক, সে লোয়ামা, সে তা বেশ বুঝিবে, সহ্যও করবে।"

এ দিকে মদন আপন কার্য্য সমাধা করিয়া শিবালয়ে গিয়া আরাধনায় বসিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল "মদন, তুমি বর প্রার্থনা কর; কিন্তু একটী কথা আছে, তুমি যাহা পাইবে, তোমার জ্ঞাতিদের তাহা দ্বিগুণ হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া বর গ্রহণ কর। চারিটী বর তুমি প্রার্থনা "কর।"

ইহা শুনিয়া মদন ঘোষের বদনে এই প্রথম হাসির বিকাশ হইল। তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। মদন বড় চতুর, বুদ্ধিমান। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার লক্ষ টাকার বিষয় হউক, দ্বিতীয় আমার একটী চক্ষু কাণা হউক, তৃতীয় আমার একটী সন্তান মরুক চতুর্থ আমার সমস্ত দ্বারের সম্মুখে একটী করিয়া বৃহৎ গর্ত্ত হউক।" মহাদেবের বরে মদনের তাহাই হইল; কিন্তু জ্ঞাতিদিগের দুই লক্ষ টাকার বিষয়, দুইটী চক্ষু অন্ধ দুইটী সন্তান মৃত ও সমস্ত দ্বারের সম্মুখে দুইটী করিয়া বৃহৎ গর্ত্ত হইল। জ্ঞাতিরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সমস্ত বিষয় লইয়া মদন ঘোষ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাটোয়ারি বুদ্ধির কাছে দেবতারও হার হইল।

শ্রীসত্যচরণ দত্ত বি, এ।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন। তবে কি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের একটা সৎরূপ কারণ থাকা চাই? নতুবা কার্য্যও উপলব্ধি হয় না?

ভগবান। নিশ্চয়ই।—কোনপ্রকার চলন যেখানে আছে অন্তরালে একটা স্থির কিছু আছেই। যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই কার্য্য। কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কি? নাম ও রূপ অস্তি ভাতি প্রিয় না থাকিলে নাম দিবে কাহার?

অর্জ্জুন—আর একবার বল। সাক্ষাতে তোমার এই সুন্দর রূপ দেখিতেছি, এই সুন্দর হাসি দেখিতেছি এই দৃশ্য প্রপঞ্চ দেখিতেছি কিরূপে বলি এইত দৃশ্য প্রপঞ্চের সত্তা নাই। ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বপ্নকালে তুমি কত বস্তু দেখ কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে উহার অসত্ত বুঝিতে পার। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে তুমি জাগ্রত হইলে দেখিবে আত্মার দীর্ঘ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নে যে অসৎ জগৎ ভাসিয়াছিল স্বপ্ন ভঙ্গে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ স্থিতিতে এই স্বপ্নরূপ জগৎ প্রপঞ্চ কিছুই রহিল না। অজ্ঞান তাঁহারই কল্পনা। তিনিই ইচ্ছা করিয়া বহু হইব কল্পনা করেন। কল্পনা সত্য নহে। আকাশ নীল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিচার করিয়া দেখ ইহা কে বলিল? জগৎ দেখিতেছে লোকে কিন্তু বাস্তবিক ইহা নাই একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগৎ রূপ ইন্দ্রজাল তাহাতেই ভাসিতেছে। জ্ঞানদৃষ্টিতে মায়িক জগৎ তুচ্ছ। যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয়

এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক।

অর্জ্জুন—"ন সতো বিদ্যতে ভাব" বুঝিলাম। "না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" একরূপ বুঝিয়াছি আরও ভাল করিয়া বল।

ভগবান—সৎবস্তু পরিপূর্ণ চৈতন্যের অভাব কোন কালে কোন দেশে হইতে পারে না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র "আছে" ইহা বস্তু বা অবস্তু সকলেরই উপাদান। ইন্দ্রজালও আছে। আছে বা বিদ্যমানতা সকলেরই অন্তরালে রহিয়াছে তরঙ্গের ভিত্তি যেমন সমুদ্র সেই রূপ বিদ্যা মমতা সকলেরই ভিত্তি। বৃক্ষ আছে, ঘট আছে, বায়ু আছে, সকলেই বলিয়া থাকে, এই বিদ্যমানতা বাদ দিলে কি হয় কেহ কি বলিতে পারে? এজন্য সৎ বা বিদ্যমানতা রূপ সাধারণ ভিত্তির কোথাও অভাব হয় না, যাহা সৎ তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম ইহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কাল ত্রয়ে আদিঅন্ত মধ্য স্থানত্রয়ে বিদ্যমান। ইহা অবিকারী। আরও যে সৎ পদার্থ দ্বারা সমস্ত দৃশ্য জগৎ পরিব্যাপ্ত তাহা অবিনাশী। এই অব্যয় সত্য বস্তুর বিনাশ কে করিবে?

অর্জ্জুন—বিনাশ কাহাকে বলে?

ভগবান্। সাধারণতঃ নাশ অর্থে (১) অদর্শন, (২) পরিবর্ত্তন। দেহ অগ্নি যোগে ভস্ম হইল, লোকে বলিল দেহ নষ্ট হইল। আবার রোগাদি দ্বারা কৃশ হইল লোকে বলিল দেহটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আত্মার অদর্শন বা পরিবর্ত্তন নাই। প্রকৃত পক্ষে দেশকাল বা বস্তু দ্বারা যে পরিচ্ছেদ তাহারই নাম নাশ। সৎ স্বরূপ ব্রহ্মে কোন পরিচ্ছেদ নাই এজন্য নাশও নাই।

অর্জ্জুন—সর্ব্বব্যাপী কিরূপ? ভগবান্—ব্রহ্মই আছেন। তিনি পরিপূর্ণ, অন্য দৃশ্য জগৎ যাহা দেখিতেছি তাহা রজ্জুতে সর্প জ্ঞান মাত্র। এই মায়ার কার্য্য। মায়াই চৈতন্যের সহিত জড়িত হইয়া মিথ্যা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি রূপ পরিবর্ত্তন দেখাইতেছে। যেখানেই পরিবর্ত্তন সেই স্থানে মূলে একটা অপরিবর্ত্তনীয় কিছু থাকে। জাগ্রত কালে চৈতন্য থাকিতে মায়া দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় স্বপ্নকালে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে সঙ্কুচিত হইয়া মনের সংস্কার মাত্র প্রকাশ করে। সুষুপ্তিতে বাসনা সমস্ত সুপ্ত হওয়ায় তিনি আপন স্বরূপে যাইতে থাকেন। তৃতীয় অবস্থায় শুদ্ধ সৎ চিৎ আনন্দে ভাসিতে থাকে। তখন সং নাই। কাজেই অজ্ঞান নাশ অবস্থা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। যাহারা তৃতীয় অবস্থা অনুভব করেন তাঁহারা জানেন আত্মা সর্ব্বব্যাপী।

অর্জ্জুন—ব্রহ্মকে চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ ও ত বলিতেছ। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হয় নষ্ট ও হয়? তবে জ্ঞান নিত্য কিরূপে? ভগবান্—একটা দৃষ্টান্ত লও। আমি ঘট জানিতেছি। এখানে 'আমি' কোন্ বস্তু বিচার কর। দেখিবে পরিপূর্ণ কিছু থাকিলে আমি। অনুভব থাকে না। দ্বিতীয় কিছু থাকিলে তবে আমি অনুভব সীমায় আসিবে, আমি অনুভব সীমায় আসিলেই জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি ভাসিয়া উঠে।

এই ত্রিপুটীর কোনটির অভাবে আমি অনুভব হয় না। সেইজন্য বলা হয় যেমন গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি ভঙ্গে একেবারে দৃশ্য প্রপঞ্চ স্মরণ হয় সেইরূপ ব্রহ্ম অহং ভাব আসিলেই জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী ভাসিয়া উঠে। একটু অনুভব করিতে চেষ্টা কর দেখিবে মায়া রচনা কি অদ্ভুত। তাই বলিতে ছিলাম যখন অন্য কিছু থাকে এবং তাহা হইতে পৃথক আমি এই কথা ব্যবহৃত হয় তখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সৎবস্তুকে অহং বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করে। অহং ভাসিলেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার পরিচ্ছেদ ঘটে। এই অহং বৃত্তির সহিত জড়িত

যে চৈতন্য তাহাই অহং,বৃত্তির পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও নাশ হওয়াতে উৎপন্ন হইতেছে ও নাশ হইতেছে বলিয়া বোধ হয় সেই কারণে বলা হয় জ্ঞান জন্মিতেছে ও নষ্ট হইতেছে। ফলে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি ও নাই নাশও নাই। অহং বৃত্তিরই উৎপত্তি ও নাশও ঘটে। যেমন ঘট পটাদি উপাধি নাশে তদুপস্থিত আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ অহং উপাধি নাশে তদুপস্থিত চৈতন্যের বা জ্ঞানের নাশ হয় না। যেমন মুখের উপাধি দর্পণ আকাশের উপাধি ঘট। সেইরূপ চৈতন্যের উপাধি অহং। আকাশ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ থাকিলেও ঘটের মধ্যে পড়িয়া পরিচ্ছিন্ন হয় বোধ হয় সেইরূপ চৈতন্য অহং বৃত্তি জড়িত হইয়া পরিচ্ছিন্নবলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান,বা চৈতন্যের পরিচ্ছেদ নাই। এজন্য উৎপত্তি নাশও নাই।

আবার দেখ ঘটাদি মৃণ্ময় বস্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং মৃত্তিকাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য ঘট মৃত্তিকা রূপেই প্রস্তুত হয়। কেবল মৃত্তিকা পিণ্ডাকার ত্যাগ করিয়া ঘটাকার ধারণ করে বলিয়া উহা বিনাশ শীল। পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্তই বিনাশ। 'সৎ' বস্তুর এরূপ অবস্থান্তর হয় না। অথচ সৎ স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দৃশ্য জাত সমস্তেরই উপাদান। সৎ বস্তু বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎ রূপে পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বেও বলিয়াছি মায়া সম্বন্ধে পরিণাম বাদ প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে নহে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ঘটে সেইরূপ 'সৎ' বস্তু অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইলে অসৎ জগৎ রূপে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি। ভ্রম মায়ার কার্য্য। মায়া বা ভ্রম নাশে যে সৎ সেই সৎই থাকে। এখন বুঝিয়াছ সৎ। অবিনাশী ও অব্যয় কিরূপে অর্জ্জুন আত্মাজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী কিরূপে? আশ্রয় একটী মাধবীলতা সহকারে জড়িত হইয়াছে কখন ইহাকে কেহ দেখিতেছে না তখনও ইহাকে কেহ জানে কিরূপে?

ভগবান্—স্থূল দৃষ্টিতে বলা যায় আকাশ সর্ব্বব্যাপী। যেখানে কোন লোক নাই সেখানেও আকাশ আছে। যেখানে বলা যায় শক্তি দ্বারা সর্ব্ব বস্তু গঠিত সেই শক্তির পশ্চাতে শক্তিমান্ আছেন যাহার শক্তি তিনি সর্ব্বদা আপন শক্তি জানিতেছেন, তখন আত্মা সর্ব্বব্যাপী ইহা বলিতেই হইবে, শক্তির কার্য্য না হইলে শক্তি শক্তিমানে লীন থাকে। যেখানে শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়া থাকেন তখনই ব্রহ্মভাব। আর যেখানে শক্তির কার্য্য হইতেছে বা হইয়াছে তাহাই শক্তিমান দেখিতেছেন। এজন্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অর্জ্জুন। বুঝিতেছি পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সত্ত্বের উৎপত্তি নাশ উপচয়, অপচয়, হ্রাস, বৃদ্ধি এই ছয় বিকার নাই। ব্যয় নাই বলিয়া অব্যয়। অব্যয় বলিয়া পরিপূর্ণ—পরিপূর্ণের নাশ হইবার স্থান নাই।

ভগবান্—তবেই দেখ ভীষ্মাদির নাশ হইবে বলিয়া যে শোক করিয়াছিলে তাহা উচিত নহে। ১১ শ্লোকে তোমার শোকের বিষয় তিনটী দেখাইয়াছিলাম, দেখাইলাম আত্মার জন্য শোক হইতে পারে না। আত্মার দেহান্তরের জন্যও শোক হইতে পারে না এমন কি দেহে যে দুঃখ অনুভূত হয় তাহাও মিথ্যা, বাকি রহিল দেহ। দেহ নাশে যে শোক হইলে পারে না ইহা তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ, তবু বলি শোন।

অন্তবন্ত ইমে দেহা—আত্মার এই সমস্ত দেহ বিনাশশীল। তবে বৃথা, শোকে অন্ধ হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না, কেন? শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা।

টাঙ্গাইল সন্তোষ প্রমথ ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল ও বারাণসী ধামের বিখ্যাত "উৎসব" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত 'সাবিত্রী পুস্তকখানি আমরা অদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। মহাভারতের চিরনূতন সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যানটী প্রাঞ্জল ও সুকোমল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট। হিন্দুর কাছে সাবিত্রীর কথার মত অল্পই আছে। মহাভারত অনুসরণ পূর্ব্বক নীতি ও সদুপদেশ পূর্ণ সেই কথা লিখিয়া গ্রন্থকার বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। যদিও আজকাল এরূপ ভাবের গ্রন্থের অভাব নাই তথাপি এ দুর্গতির দিনে রমণী চরিত্র গঠনের জন্য যিনি এরূপ সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষেই ধন্যবাদের পাত্র। ইহার সাংসারিক, বৈষয়িক, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতএব আজকালকার নানারূপ গ্রন্থ না পড়াইয়া আমাদের দেশের বালিকাগণকে এরূপ পুস্তক যতই পড়ান যায় ততই ভাল। রচয়িতা যে অভিপ্রায়ে সাবিত্রী রচনা করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সে অভিপ্রায় সফল হইয়াছে। কারণ বালিকাবস্থায় ও বিবাহান্তর হিন্দু রমণীগণ কিরূপ আচরণ করিলে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সহজ কথায় পুস্তকে যে সকল কথা লেখা আছে, মেয়েদিগকে সেই সকল কার্য্য নিত্য করাইতে পারিলে সৎপথে তাহাদের মতি হইতে পারে। রামদয়াল বাবুর সাবিত্রী পড়িলে হিন্দু নরনারী উভয়েই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে সাবিত্রী কথার অধ্যয়নে ও অনুশীলনে কত পুণ্য আছে।

আর্য্যভূমি পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র। ১/০ আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার একমাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৩। ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশ হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৪। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৫। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
সত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।
মাঘিয়া, সাতক্ষীরা।

Registered No C. 439

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [আশ্বিন ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা)

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজ ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কেশরঞ্জন তৈল

এই যে শরৎ সমাগমে মেঘমুক্ত নির্ম্মল গগনে, কোটি কোটি তারকারাজি আবার হাসিয়া উঠিল। এই যে, শরতের সুবর্ণ-চন্দ্রমা, সুধা-বর্ষিত কিরণে, দিক্ প্লাবিত করিয়া জগৎ মাতাইলো তুলিল। জলে ফুল, আকাশে ফুল, প্রকৃতির গায়ে ফুল,—প্রফুল্ল কমল মাথায় ধরণী সুশোভিতা। এ প্রফুল্ল শরতের শুভাগমে ফুল্ল ফুলহারে, প্রকৃতি-সুন্দরী আজ বিমোহন বেশে সাজিয়াছেন। এ আনন্দের দিনে কমনীয় কেশরঞ্জনে আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীর ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাজি সিক্ত করিয়া দিন, "কেশরঞ্জনের" স্নিগ্ধ সুবাস দশ দিক আমোদিত করিয়া আপনাকে আরও উৎফুল্ল করিবে। "কেশরঞ্জন" মহাপূজার প্রিয় উপহার। "কেশরঞ্জন" দেবভোগ্য বিলাস দ্রব্য। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, মাঃ ।৵০ পাঁচ আনা। ৩ শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ॥৵০ নয় আনা।

সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা। (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)।

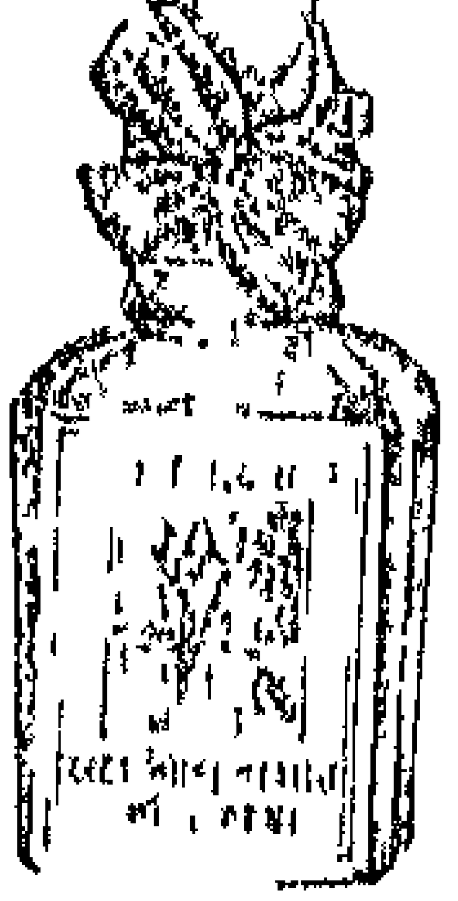
আয়ুর্ব্বেদের সমুদায় চিকিৎসা গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজী-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পুস্তক ৮ খণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেও এই পুস্তক অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন স্থলে অতি সুন্দর চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আটাট হাজার পৃষ্ঠারও অধিক।

ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয় ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। মূল্য ২॥০ টাকা, ডাক মাশুলাদি ৸০ আনা।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ। ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

একাধারে তৈল ও এসেন্স সুরমা।

সুরমা মহাসুগন্ধি— অতি কমনীয় কেশরাগ। "সুরমার" সুগন্ধ দুইপ্রকার, একটীতে টাটকা বকুল ফুলের গন্ধ, অপরটীতে কতকগুলি সুমিষ্ট মিশ্রগন্ধ। "সুরমায়" চুল কাল হয়, মাথা ঠাণ্ডা থাকে, কমনীয় রমণীয় বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে—আর বালক-বালিকার মুখ প্রফুল্লতামণ্ডিত হয়। বড় শিশি ৸০ বার আনা। মাশুলাদি ।৵০ আনা, সাত তিন শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা।



আমাদের স্বদেশী সুগন্ধ (এসেন্স)।

বিলাতী এসেন্স অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট কিনা, সকলে একবার পরীক্ষা করুন। আমাদের "সোহাগ" "মিলন" "গোলাপসার" "বসন্তমালতী" দিল্ বাহার, রোজ", "মতিয়া", "সাবিত্রী", "রেণুকা" "চামেলী", "বকুল", প্রভৃতি এসেন্স গুলি, বাজারের সমস্ত এসেন্সকে পরাজিত করিয়াছে। প্রত্যেক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। নাম ঠিকানা এস, পি, সেন ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



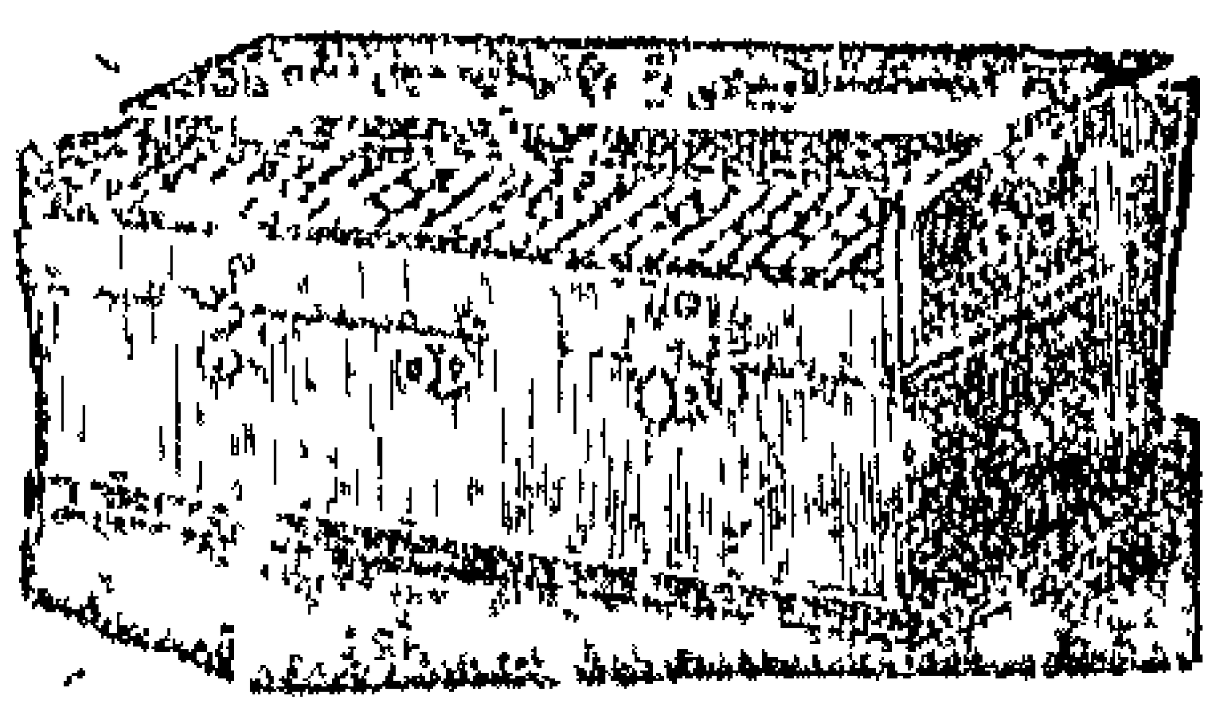
আধুনিক সকল প্রকার সালসার শীর্ষস্থানীয়।
প্রত্যেক শিশি ২৲ টাকা মূল্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

THE

INDIAN HARMONINA Co.

MANUFACTURER OF HARMONIUM
FACTORY —38, CREEK ROW, CALCUTTA.

TRADE **HHRMONINA** MARK



The Harmonina, specially constructed for the Indian climate, sweet and powerful tone, in strong box.

3, Octaves, C to c, 3 stops, one set of reeds,			common ...	Rs. 18 net,
Do.	do	do.	ordinary	20 „
Do.	do	do	best	22 „
Do	do.	do	superior	24 „
Do.	do.	do.	extra superior	26 „
3 Octaves, C to c, 4 stops, 2 sets of reeds,			common ...	„ 28 „
Do.	do.	do.	ordinary ...	„ 30 „
Do.	do.	do.	best ...	„ 35 „
Do	do	do.	superior	40 to 45 „
Do.	do.	do	extra superior	50 to 55 „

HARMONIUM TUTOR with a master by U. Roy, Re. 1-4.
Packing case, packing & forwarding Re. 1-12.
Terms—cash in full with order.
Manager :—DWARKA NATH GHOSE,
The first Harmonium Manufacturer in India.
SOLE AGENTS :—Messrs. DWARKIN & SON.
267, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল বৈষ্ণবের আবিষ্কৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

বাতবিজয় তৈল।

"আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

আমাদের এই "বাতবিজয় তৈল" মালিসে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অর্থাৎ প্রমেহ ও উপদংশজনিত বাত, কোমরের, কনুয়ের, হাতের কব্জির, পায়ের গাঁঠের বাত, ঝিঝিবাত, আমবাত, পক্ষাঘাত, খঞ্জ, পঙ্গু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনা, ফুলা, কনকনানি এবং আঘাতপ্রাপ্তি জন্য বেদনা, এত সত্বর আরোগ্য হয় যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত মহামাষ তৈলাদি দ্বারাও সুদীর্ঘকালে, সেইরূপ ফল পাওয়া যায় না। অথচ শাস্ত্রোক্ত তৈলাপেক্ষা, কম ব্যয়ে কম সময়ে এই তৈল মালিসে বাতব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন কারণে বেদনা হইলে, এই তৈল একটু হাতে লইয়া ৫।৭ মিনিটকাল সেই স্থানে মালিষ করিলে, মন্ত্রশক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎই ব্যাধি-যন্ত্রণার উপশম হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ।০।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রভৃতি রোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ

অম্লশূলান্তক চূর্ণ।

আমাদের অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে, অম্লজনিত বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার, আহারান্তে বমন বা দমকা ভেদ, উদর ভার বোধ, মাথা ঘোরা, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ, বদ্ধতা, পেটে বায়ু জমা, মুখ দিয়া জল উঠা, বমি বমি বোধ, পেটের ভিতর চাকা মত হওয়া, এবং কোঁ, কোঁ ভুটভাট ও কলকল শব্দ হওয়া, গা গোলান প্রভৃতি অম্লপিত্ত রোগের লক্ষণ এবং শূল বেদনার সহিত আহারের পর বেদনা বৃদ্ধি, গলা জ্বালা করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অম্লপিত্তের উপসর্গ হউক না কেন, অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হয়। যে রোগী অসহ্য বেদনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, দেখিবেন দশ মিনিটের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখনই, ব্যাধিযন্ত্রণার উপশম বোধ হইবে। মূল্য ছোট শিশি ॥০ আনা, বড় শিশি ১৲ মাঃ।০ আনা।

প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ ধ্বজভঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর প্রভৃতি রোগের মহৌষধ

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ণ।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তজ্জন্য মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্‌টনানি, সপূঁয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলদে বা সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগে চেষ্টা হওয়া স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতু নির্গত হওয়া, কিম্বা খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, বাহ্যে যাইবার বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্র নির্গত হওয়া স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্র শুক্র স্খলন বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে দুশ্চিন্তা লাগিয়া থাকা, বদহজম, ক্ষুধা বোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইবে, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইবে। ইহা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও বলবীর্য্যবর্দ্ধক মহৌ-

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে এক দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাঁপানী কাস-ক্ষয় কাস, রক্ত উঠা, যক্ষাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ এক বটিকা সেবন করি। মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, মাঃ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ পোঃ বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

দেলবাহার তৈল।

এই মনোহর সুগন্ধি স্নিগ্ধ তৈল ব্যবহারে মেচেতা ব্রণ প্রভৃতি বদন মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন সকল তিরোহিত হয়, মুখখানি শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঢল ঢল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতে চর্ম্ম সুকোমল, বর্ণ সুবর্ণাভ হয়। লাবণ্য কুসুম বিকসিত হইয়া উঠে। এই সুবাসিত তৈলে গাত্র ফাটা, ছুলি, ঘামাচি, শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়।

ডজন	৯৲	প্যাকিং ইত্যাদি	॥০
শিশি	৸০	ঐ	৵০

নেপালজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কস্তুরী (মৃগনাভি) এইখানে পাওয়া যায়।

আর, পি সাধুর উৎকৃষ্ট সুলভ

গোলাপজল।

পাইট্ বোতল ডজন	২।০
বড় বোতল ডজন	৫৲
পাইট বোতল	।০
বড় বোতল	॥০

এইচ্, পি, মুখার্জ্জি

অথবা

আর, পি, সাধুর নিকট

১৬৩ নং আমড়াতলাগলি কলিকাতা।

ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

নিভৃত বিলাপকাব্য।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপান, বাঁধাই সুন্দর সোমপ্রকাশ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৪নং মুক্তিরাম লেন, কলিকাতা

অপূর্ব্ব সুযোগ ! অপূর্ব্ব সুযোগ।

কলিকাতা, আম্বালা, মালদহ প্রভৃতি ১৯০৬।৭ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে স্বৌপ্যপদক ও উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত ও সর্ব্বজন প্রশংসিত •

দত্ত কোম্পানীর

দাঁদ—(ব্রূস ও মুখ সমেত) মূল্য	৵১৫
পকেট পেনহোল্ডার—	৴৹
পারপেচুয়াল ষ্টিক পেষ্ট (ব্রূস ও মুখ সমেত)	।৴৹

পাইকারদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রত্যেক ষ্টেসনারী দোকানে ও ৪৮ নং ক্যানিংষ্ট্রীট মিশন লেন, কলিকাতা প্রাপ্তব্য। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলেও ভিঃ পিতে পাঠাইয়া থাকি।

বেট্‌স্ টীসেড, লৌহচাদর প্রভৃতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে কিনিবার আবশ্যক হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার

জি, সি, নন্দী এণ্ড কোম্পানীর

হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট, চাউল সওদাগর এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের অর্ডার সাপ্লায়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

ঠিকানা—৯৩৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগ্য পরীক্ষা।

আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সাধারণের অবস্থার কারণ এই যে তাঁহারা জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের নিকট অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ ফল মিলিতে দেখিতে পান না। এইজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কিরলজিকেল সোসাইটির স্থাপনা হয়। বহু পরীক্ষা ও আলোচনায় দেখা যায় যে, আধুনিক জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণের গণিত পদ্ধতি অশুদ্ধ সুতরাং ফলও তদ্রূপ হয়। যাহাতে এতদ্দেশে এই শাস্ত্রের পুনরায় প্রচার ও আদর হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কিরলজিকেল সোসাইটিতে জন্ম সময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জ্ঞাত করাইলে বিনা পারিশ্রমিকে জাতকের জীবনের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের ফল সমূহ বলিয়া দিতেছেন। এই কার্য্য তাঁহাদিগের ব্যবসা নয়। কেবলমাত্র ডাকখরচের নিমিত্ত এক আনার টিকিটসহ পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কিরলজিকেল সোসাইটি।

২১১।১, নবাবী ওস্তাগরের লেন কলিকাতা।

ঘোষ প্রেস।

এই প্রেসে যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ঠিক সময়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৪ সাল [৬ষ্ঠসংখ্যা।

মহামায়ার আগমন।

আবার প্রাবৃটের ঘনধারা অপসৃত হইল। ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন বিদ্যুৎচকিত সন্ত্রাসিত ধরণীর বিষাদ-মলিনবদনে আবার হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসিত হইল। শারদ-চন্দ্রিকা-বিধৌত প্রকৃতির প্রফুল্লমূর্ত্তি আবার ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইল।

মায়ের শুভাগমনের দিন সমাগত প্রায়। কোটী কোটী নরনারী প্রীতি-বিস্ফারিত লোচনে জননীর আগমন-পথ প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতেছেন। দিবাভাগের ধূলিখেলা সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে শিশু যেমন ব্যাকুল প্রাণে মায়ের সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহার সুখ দুঃখের কথা জননীকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়, বঙ্গের নরনারী সংবৎসর পরে সুদীর্ঘ বৎসরের জয় পরাজয়ের আনন্দ নিরানন্দের কাহিনী জগজ্জননীর শ্রীপদে নিবেদন করিবার জন্য তেমনই ব্যাকুল হইয়াছেন।

মা দুর্গা আসিয়াছেন। প্রতি পত্র মর্ম্মরে, প্রতি বাত হিল্লোলে, প্রতি পতত্রীর স্বরে—সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে,—মা আসিয়াছেন। ধরাতলে, নভঃস্থলে, অনিলে, সলিলে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখ—মা আসিয়াছেন।

অয়ি রিপুদলবারিণি, শক্তিময়ি জননি, ঐ দেখ ভগ্নমন্দিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তোমার লাঞ্ছিত পুত্রগণ "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এস মা শিব-সীমন্তিনি, সিদ্ধিদাত্রি জননি, তুমি তাহাদের প্রাণে অযুত মত্তমাতঙ্গের বল প্রদান কর, তাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া প্রসন্নবদনে সমস্ত সহ্য করুক। মা অন্নদে, ঐ দেখ অন্নাভাবে শীর্ণ সন্তানগণ "অন্ন দে" "অন্ন দে" বলিয়া কাঁদি-

তেছে। মা তোমার কর্ণে কি ঐ ক্রন্দনের গগন-বিদারী রোল প্রবেশ করে না? অন্নপূর্ণার পুত্র-কন্যাগণ কি "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে? মা, তোমার ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়া সন্তান প্রতিপালন কর। মা, বাঙ্গালী কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতেছে, কত দিনে এই পতিত জাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে? কবে তুমি এই পরাধীন জাতির ভালে বিজয়তিলক পরাইয়া দিবে? মা, বাঙ্গালী তোমার নাম করিতে করিতে এবার যেন কি এক নূতন আশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মা, তুমি কি বাঙ্গালীর হৃদয়ে এই নূতন আশা জাগাইয়া তোল নাই? বাঙ্গালী হৃত-সর্ব্বস্ব দীন ভিখারী হইয়াও এবার আশায় বুক বাঁধিয়া পৃথিবীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাই বলিতেছি—এবার আট কোটী কণ্ঠের কাতর চীৎকার তোমাকে অধীর করিয়া তুলিবে।

মা!—কি মধুর নাম। যাহার মা নাই, জগতে তাহার কেহ নাই,—সেই মা—স্নেহময়ী করুণাময়ী মা—সেই অমৃতময়ী মাধুরীময়ী মা—আমার একার নহে,—কোটী কোটী সন্তানের মা—আনন্দময়ী, মা, ত্রাহি ত্রাহি।

মায়ের করুণাশ্রুপ্লাবিত স্নেহময় উৎসঙ্গে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া শান্তিলাভে অভিলাষী—পীড়িত সন্তান মুমূর্ষু শয্যায় মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যগ্র। এস মা বিজয়ে সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শীতাতপ-বর্ষা-বিক্ষোভিত দৈত্য দানবের চরণ তাড়নায় সমস্ত বঙ্গের বক্ষে তোমার চরণারুণের শুভ চিহ্ন অঙ্কিত কর। সম্বৎসর ধরিয়া, মা আমরা সাশ্রুনয়নে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া আছি। এস মা, আজ তোমার আট কোটী সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ কর।

মা মধুকৈটভনাশিনি, মহিষাসুর-মর্দ্দিনি, শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিসূদনি মা। যে রূপে তুমি অসুর প্রপীড়িত দেবগণকে অভয় দান করিয়াছিলে, আজ তোমার এই অকৃতি অধম সন্তানগণকে একবার সেই রূপে দেখা দাও। সর্ব্ব বিপদবিনাশন মাতৃপদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইতে ইচ্ছুক; এ সময়ে মা তুমি না আসিলে মা নামে যে কলঙ্ক হইবে! এ দুর্দ্দিনে, এ সঙ্কটে, এ বিপদে আমাদিগকে তোমার অভয় কোলে স্থান দাও। অভয়া! যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দুর্গমনামা মহাসুরকে বধ করিয়া দুর্গা নামে প্রখ্যাতা হইয়াছ, সেই শতাক্ষী শাকম্ভরী মূর্ত্তি আর একবার ধারণ কর মা। যে রূপে তুমি রাজ্যচ্যুত শত্রুপ্রপীড়িত দুঃখক্লিষ্ট সুরথ রাজাকে অভয় দিয়াছিলে, যে রূপে রাজ্যভ্রষ্ট অবতার রামচন্দ্রকে অভীষ্ট বরদানে চরিতার্থ করিয়াছিলে, যে রূপে দাক্ষিণাত্যে এক সামান্য জমিদার-তনয়কে ছত্রপতি রূপে পরিচিত করিয়াছিলে, আর একবার সেই রূপে আমাদের দেখা দাও মা!

তাই বঙ্গবাসি! ভক্তের প্রাণ ফাটিয়া যে অমিয়-মাখা "মা" নাম নিঃসৃত হয়, তাহা সপ্তলোক ভেদ করিয়া অনন্ত লোকে অনন্তকাল গভীর নাদে নিনাদিত হইতে থাকে। প্রাণের কর্ণে যে তাহা একবার শুনিয়াছে—সেই পাগল হইয়াছে। তাই বলি ভাই! সকল ছাড়িয়া, সকল ভুলিয়া "মা মা" করিয়া কেবল জগৎকে মাতাইয়া তোল। এস, এস ভাই! সুখী দুঃখী, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, এস ভাই! ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, দেব দানব, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, ভূত প্রেত, এস, এস! সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, নদ নদী, পর্ব্বত অরণ্য, সমুদ্র ভূমি, পুষ্প ফল, তৃণ পত্র, এস ভাই! শৈব শাক্ত, দণ্ডী বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য, এস ভাই! গৃহী, সন্ন্যাসী,

সাধু দস্যু, ভক্ত ভণ্ড, পিশাচ পাষণ্ড, আমার মায়ের ছেলে যে যেখানে আছে এই মহাশক্তির মানসী পূজা বা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ধন্য হও। স্বদেশপ্রাণ ও স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃবৃন্দ! বিশ্বজননীর কৃপালাভ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য ধন প্রাণ দেহ সম্পত্তি সমস্তই নিয়োজিত কর। মা বিশ্বেশ্বরী আমাদের ও স্বদেশের হিতসাধন করুন। আর একবার সকলে মিলিয়া সমপ্রাণে সমস্বরে হৃদয় ভরিয়া প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে একবার মনের সাধ মিটাইয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকি, এস ভাই! মান অভিমান, বিবাদ বৈষম্য, জাতি বর্ণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শ্রেণী সম্প্রদায় ক্ষণেকের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়া পরস্পরে প্রাণের সম্বন্ধে মিলিত হইয়া আজ বৎসরকার দিন একবার সকলের একমাত্র জননী মা ব্রহ্মময়ীর পূজা করিয়া পবিত্র প্রেমালিঙ্গনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি করি, এস ভাই! অতীতের শোক সন্তাপ সমস্ত বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া মা নাম-সুধাসমুদ্রে ঝাঁপ দিই।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

—*—

"দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কে'রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর দ্বারে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদি'পরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

১৭৫৪ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার সমস্ত জগতবাসীর পক্ষে একটী মহা-শুভদিন হইয়াছিল। এই দিনে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরে জগতের মঙ্গলের জন্য পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষের বঙ্গদেশে হুগলীজেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুর গ্রামে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে—'দুখিনী ব্রাহ্মণীর' কোলে—এক মহাপুরুষের উদয় হইয়াছিল।

যে মুহূর্ত্তে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তখন পূর্ব্বাকাশে প্রধান পাঁচটী গ্রহের সহিত সায়ন মীনরাশির ২০ অংশ উদিত হইতেছিল। এইরূপ লক্ষণ যে মহাপুরুষের আবির্ভাবসূচক তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। উক্ত সময়ের সায়ন গ্রহস্ফুট নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রবিস্ফুট রাশ্যাদি ১১।১।১৪
চন্দ্রস্ফুট রাশ্যাদি ১১।৫।০
মঙ্গলস্ফুট রাশ্যাদি ২।৬।২০
বুধস্ফুট রাশ্যাদি ১০।২২।১০
বৃহস্পতিস্ফুট রাশ্যাদি ০।২।৬
শুক্রস্ফুট রাশ্যাদি ০।১৬.৫৪
শনিস্ফুট রাশ্যাদি ৫।২৬।২৯ বক্রী
রাহুস্ফুট রাশ্যাদি ৩।২২।২১
কেতুস্ফুট রাশ্যাদি ৯.২২।২১

উক্ত গ্রহসন্নিবেশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জন্মসময়ে রবি, চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতির বিশেষ প্রাবল্য আছে এবং রবি ও চন্দ্র মীন রাশিতে অবস্থানহেতু এবং উক্ত রাশিই লগ্ন হওয়ায় জাতকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। রবি ও চন্দ্রসহ মীন রাশির উদয় ধর্ম্মপ্রাণতা বোধক। এই জাতকের হৃদয় নবনীত ন্যায় কোমল, সদা ভাবরাজ্যে বাসপ্রিয়, এবং ইচ্ছাশক্তি অপরিমিত অতুল বলশালী। বাস্তব-জগতের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধর্ম্মানুচরণে—ঈশ্বরের মহিমানুসরণে উৎসর্গীকৃত। বুধ দ্বাদশস্থ হইয়া উচ্চরাশিস্থ—

গভীর বিষয়, গুপ্ত বিষয় যাহা সাধারণ লোকের বিচারেই বোধগম্য হইবার নহে, সে সমস্ত বিষয় সহজে সরলভাবে অন্যকে বুঝাইবার শক্তিজ্ঞাপক। পূর্ব্বে বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনায় আর্য্যঋষি নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাস-যোগের লক্ষণ বলিয়াছি *। সেই লক্ষণ এস্থলেও বিদ্যমান আছে। কেন্দ্রে চারিটী বলবান গ্রহ এবং দশমাধিপতি নবমাধিপতির ক্ষেত্রে ও নবমাধিপতি কেন্দ্রে, এই সমস্ত লক্ষণ সন্ন্যাস-যোগ সূচক।

এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই তাঁহার জন্মশকাব্দার ভ্রম দৃষ্ট হয়। উক্ত জীবনী লেখকেরা ১৭৫৬ শকাব্দা নিরূপিত করেন। কিন্তু ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন বুধবার হয় না এবং শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিও হয় না। আমাদের নিরূপিত ১৭৫৪ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুনই বুধবার শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি হয়। ইংরাজী তারিখ ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুর গ্রামে একজন অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও তপঃ প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীও অতিশয় দয়ার্দ্রহৃদয়া ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। একদা গয়াধামে ক্ষুদিরাম স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে স্বীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিতে শুনিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ক্ষুদিরামের তিনটী পুত্রসন্তান তন্মধ্যে, সর্ব্বকনিষ্ঠই এই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ। ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস জন্মগ্রহণেই। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহার যে শক্তির জন্য প্রতিপত্তি বাল্য-জীবনে তাঁহার সেই শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি। ক্ষণজন্মা রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন; দিন দিন শশি কলাসম বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে পিতা ক্ষুদিরামেরও ভাগ্য-শ্রী সম্বর্দ্ধিত হইল। ক্ষুদিরামের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ করিল; সুতরাং ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে একটু লক্ষ্মীশ্রীও দেখা দিল। পাড়ায় রব উঠিল,—"চাটুয্যেদের বাড়ীতে পয়মন্ত ছেলে জন্মিয়াছে।" "পয়মন্তের" প্রতিপত্তি রামকৃষ্ণের বাল্যকাল হইতে। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিবাসীর প্রীতিপাত্র।

রামকৃষ্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঠাকুর দেবতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকায় ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের গ্রামের লাহাবাবুদের একটী অতিথিশালা ছিল। সেখানে নানাবিধ অতিথি আসিত। বালক রামকৃষ্ণ, তাহাদিগের নিকট গিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধে, কথোপকথন শুনিতেন। তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রবলা ছিল যে তিনি যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর কখনও বিস্মৃত হইতেন না। সে সময় গ্রামে, গ্রামে ভারতাদি পুরাণ পাঠ, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কথকতা যাত্রা প্রভৃতি হইত, বালক রামকৃষ্ণের এ সকল, শুনিয়া শুনিয়া এত কণ্ঠস্থ হইয়াছিল যে তিনি, কথকের ন্যায় নিজেই অনর্গল বলিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এত মধুর গান করিবার ক্ষমতা ছিল যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সংগীত শ্রবণ, করিত সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সংসারের সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্কন্ধে পড়িল। তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালে প্রেরণ, করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিয়া কি করিব? তাহার ফল ত কেবল চাল কলা; এমন বিদ্যা আমি শিখিব, না।" ভ্রাতার বিদ্যাশিক্ষায় এরূপ অনাসক্তি দেখিয়া

* আ। ভূমি ৮৮ পৃঃ।

নিজে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় নিজের চতুষ্পাঠীতে লইয়া আসিলেন।

রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলেন, তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহার বিবাহের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদের গ্রামের নিকটস্থ জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা সারদামণি দেবীর সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহ হইল বটে, কিন্তু স্ত্রী যে কি বস্তু, বিবাহ কি, ইহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। আজীবন তিনি কখনও স্ত্রী স্পর্শ করেন নাই। ইহাও তাঁহার কোষ্ঠীতে গ্রহসন্নিবেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সপ্তমস্থান পত্নীবোধক। এই স্থানে কুগ্রহ শনি বক্রী হইয়া অবস্থিত। সপ্তমাধিপতি বুধ দ্বাদশস্থ, সুতরাং জীবনে কখনও দাম্পত্যভাব বা স্ত্রীসহবাস সূচিত হয় না—সংসার হইতে নির্লিপ্ত বুঝায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উত্তরভাগে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে জানবাজার নিবাসিনী বিখ্যাতনামা মাড়-কুল-গৌরবা রাণী রাসমণি একটী কালীমন্দির স্থাপনা করেন। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই দেবালয়ের সেবকরূপে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণও এই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁহাকেই তাঁহার ভ্রাতার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।

কালীপূজায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের উদয় হইল। তিনি সর্ব্বদাই কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সরোদনে বলিতেন, "মা তুই ত জগতের মা, আমি শাস্ত্র জানি না, পণ্ডিত নহি, অবোধ সন্তান, আমাকে দেখা দে।" ক্রমে তাঁহার মুখে "মা, দেখা দে" ব্যতীত আর কোন কথা কেহ শুনিতে পাইত না। পাগলের মত, সমস্ত দিবারাত্রি "মা দেখা দে" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যখন নদীতে বান আসে, নদীহৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি যখন নদীর দুইটী পার্শ্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন অগাধ জলরাশি উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না, অপ্রতিহত-প্রভাবে আপনার বলে আপনি চলিয়া যায়। ভক্তিপ্রবণ হৃদয়েরও এই অবস্থা। হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, ভক্তি চারিদিকের বাধা বিঘ্ন, পাপ প্রলোভন না মানিয়া, আপনার মহালক্ষ্য পথে চলিয়া যায়। ভক্তিবলে রামকৃষ্ণ জগদম্বার অনুগৃহীত হইলেন। প্রায় ছয় মাস পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মবীর রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, পরে সাধন-কার্য্য আরম্ভ হয়।

এইবার তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করিবার জন্য সাধনা করিলেন। ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু যে ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া জগতের সুখ দুঃখ, জীবনের নানাসংগ্রাম সকলই উপেক্ষিত হয়, কেবল অন্তরে ভক্তের আরাধ্য দেবতা অন্তর আলোকিত করিয়া শুভ্রজ্যোতিতে সদা প্রকাশিত থাকেন, যে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভক্ত আত্মহারা,—সে ভক্তি চির অপরাজিতা, নিত্য মহাবলশালিনী, সুতরাং তাহার বলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ সাধক রামকৃষ্ণের সুখসাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একটী যোগিনী ও একজন সন্ন্যাসীর আগমন হয়, তাঁহাদের নিকট হইতে রামকৃষ্ণ যোগাভ্যাস শিক্ষা করেন, এবং মনের একাগ্রতা বশতঃ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে অতি অল্প দিনে যোগের চরমা-

বস্থা নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার শরীর একটু হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল ও রূপ লাবণ্যে দিক্ আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য একখানি-মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিতেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এইবার পরমহংসদেব সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি ভগবানের আরাধনার জন্য কখনও রাধিকা ভাবে, কখনও শ্রীদাম সুবলাদির সখ্যভাবে কৃষ্ণের উপাসনা, মহম্মদীয় ভাবে উপাসনা, খ্রীষ্টিয়ভাবে উপাসনা, এমন কি ভারতবর্ষের প্রচলিত অনেক প্রকার সম্প্রদায়-দিগের মতে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক উপাসনার ফল একই হইল। প্রত্যেক ভাবের উপাসনাতেই তাঁহার নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ হইত। প্রত্যেক বিভিন্ন ভাবের উপাসনায় যে ভগবানকে পাওয়া যায় তাহা তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখন বিনা পরীক্ষায় কোন মত প্রকাশ করিতেন না। তিনি সমুদয় ধর্ম্মপ্রণালী সাধন দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব ও ভক্তি বা লীলাতত্ত্ব এই দুইভাগে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, "এক ঈশ্বর তাঁহার অনন্তশক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্রভাব এবং স্বতন্ত্ররূপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমান নহে। কিম্বা যেমন কোন পুষ্করিণীর চারিটী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জলপান করিতেছে। এক জলাশয়ের চারিটী ঘাট, এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জলপান করিলেও কাহারও দোষ হইতেছে না। কিম্বা কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অথবা গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জলপান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছামত ঘাটও নির্ম্মাণ করিতেছে। হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরিবর্ত্তন হয়? সেই প্রকার, এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না।"

রাসমণির জামাতা মথুরনাথ বিশ্বাস কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে রামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে রামকৃষ্ণের অসাধারণ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিতেন ও দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। এই সময়ে তিনি মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইবার তাঁহার প্রধান কার্য্য আরম্ভ হইল। ভগবান রামকৃষ্ণ বোধ হয় জগতে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ লাগিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে লোকে আপনাকে শিক্ষিতম্মন্য ভাবিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে লোকে জড়বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির কেবল স্থূল-কার্য্য-কলাপ অবলোকনে

চমৎকৃত ও অন্তর্দৃষ্টিশূন্য হইয়া এক ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা আনিয়াছিল। বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশে ঘোরতর সমাজবিপ্লব ও শিক্ষাসংস্কার চলিতেছিল। ইংরাজী শিক্ষার আলোচনায় লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। বঙ্গমাতা তখন কয়েকটী দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন রত্ন লইয়া ক্রোড় উজ্জ্বল করিতেছিলেন। সে সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে "মেঘনাদ" রচনা করিয়া মধুসূদন লোকের নিকট উপহাসাস্পদ। কবিবর হেমচন্দ্র অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দান ও সাধারণের নিকট মাইকেলের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন। পরিহাসরসিক দীনবন্ধুর অমর নাটক "নীলদর্পণ" নীলকরদিগের দর্পনাশ করিতে উদ্যত। রাজ-অন্নে প্রতিপালিত পাদরী মহাশয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যীশুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, নিরক্ষর হিন্দুদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। তন্নিবারণে দয়ানন্দের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা ও আর্য্যসমাজ স্থাপন। আবার, রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার কল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রের ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। সে সময় ইংরাজি শিক্ষিত অনেক সভ্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন। অন্য দিকে, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর হিন্দুবালবিধবার বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনে প্রবৃত্ত। দেশের এইরূপ অবস্থার সময় ভগবান রামকৃষ্ণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। আজ সেই আলোকের জ্যোতিতে সুদূর মার্কিন রাজ্যও উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর উপদেশ শ্রবণ, এবং ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞাত হইতে নিত্য শতসহস্র লোক দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইত। অনেক শিক্ষিত সংশয়বাদী লোক তাঁহাকে বহুপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া শেষে তাঁহার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া শান্তিলাভ করিত। বহু দিবসের অন্ধকার গৃহে যেমন একবার আলো জ্বালিলেই তাহার চিরসঞ্চিত অন্ধকার দূরীভূত হয় তদ্রূপ তাঁহার সংস্পর্শে কত অজ্ঞানান্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয় এক দিনেই জ্ঞানালোকে বিভাসিত হইয়াছিল। দয়ার অবতার পরমহংসদেব যে কত নরপিশাচকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মার মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও অনেক শিক্ষিত ও বিখ্যাতলোক পরমহংসদেবের উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। পরমহংস হইতে কেশবচন্দ্র সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা, এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হন। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। এই কণ্ঠরোগই তাঁহার লীলা সম্বরণের কারণ হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার উপদেশের বিরাম ছিল না। এ উপদেশ কেবলমাত্র শব্দযোজনা নহে, প্রাণের কথা। যে একবার শুনিত সে আর ভুলিতে পারিত না, তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে চিত্ত সমুদ্ভাসিত হইত।

সন ১২৯৩ সাল ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ১ ঘণ্টা ৬

মিনিটের মধ্যে পরমহংসদেব সহসা সমাধিস্থ হইলেন। সেই সমাধিই তাঁহার মহাসমাধি হইল। ধীরে, ধীরে, নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে, কুসুমবাস বাসিত সুগন্ধি পবনে মহাপুরুষের আত্মা চিদ্ঘন সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে লীন হইল।

আজ ভারতে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য সকলে ব্যস্ত। এই মহাপুরুষের উপদেশ যে, জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের উৎকর্ষ করিতে হইবে, ধর্ম্মবল না থাকিলে উন্নতি হইতে পারে না। মনুষ্যশক্তি সীমাবদ্ধ, এই ক্ষুদ্র শক্তিতে কতদূর উন্নতি হইতে পারে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, ভক্তের ভগবান, তিনিই ভক্তের রক্ষা করিবেন।

আমরা আশা করি মহাপুরুষের বাক্য অন্যথা হইবে না। এমন সময় আসিতেছে যে দিন তাঁহার প্রজ্বলিত ক্ষীণ আলোকরশ্মিরেখা সমস্ত দিক্দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী, F. C. S.

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিম্বিসার নরপতির রাজত্বকালে রাজগৃহে জৈনদিগের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। এইখানেই জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর প্রাদুর্ভূত হন এবং অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রতের অনুষ্ঠানই মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, বৌদ্ধধর্ম্মের এই সার মত প্রচার করেন। রাজগৃহ তীর্থঙ্কর মহাবীরের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই জৈনগণ পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বিপুল নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে জৈনদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব ও মুসলমানদিগের উৎপীড়ন বশতঃ এই স্থান হইতে জৈনগণ তিরোহিত হন এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন আধিপত্যের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় নাই। মুসলমানগণ হীনবীর্য্য হইলে পর জৈনগণ পুনরায় রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বৈভার, বরাহ, বৃষভ, ঋষি ও চৈত্যক নামক পঞ্চ পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বহুল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জৈনদিগের এই সকল মন্দির কাননাবৃত গিরিপৃষ্ঠে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত; মন্দিরগুলি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত। জৈনগণ প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষগুলি সবিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্মের আধিপত্য ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বিম্বিসার নরপতি এবং বৈভার পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী জনসাধারণ বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উক্ত পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গমন করিতেন। নূতন রাজগৃহে সহরের দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুইটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশোক পুরাতন রাজগৃহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। এবং সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু যখন অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তখন হইতে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের হ্রাস হইতে লাগিল। কয়েক শতাব্দীপর শুঙ্গ ও মিত্র বংশীয় নরপতিগণের উত্থানের সহিত পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে পর, রাজগৃহের ব্রাহ্মণগণ তথায় পৌরাণিকধর্ম্ম প্রচারের জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে

বৌদ্ধদিগের মন্দিরাদি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মগধের গুপ্ত নরপতিগণের সহায়তায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরায় এইরূপ যুগ স্তর উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণদিগের একটী দেবালয় পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত না। খৃষ্ট পর ৬০০ অব্দে কণৌজে যশোবর্ম্ম নরপতির উত্থানে এবং গৌড়ে আদিশূরের পরাক্রমে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করেন। মগধের বৌদ্ধ পালবংশীয় নরপতিগণের তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণদিগের উপর সহানুভূতি ছিল তৎকারণ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা বহুল পরিমাণে হইয়াছিল। এবং কালক্রমে জৈন ও বুদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল।

বখতিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বেহার বিজয়ের পর মুসলমান ফকীরগণ রাজগৃহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পীর মুকুন্দ সাহ বেহারে সুপ্রসিদ্ধ আছেন। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ডে বাস করিতেন এবং বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জনসাধারণের চিত্ত ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড বিপুল পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত এবং পীর মুকুন্দ সাহের নামানুসারে পরিশেষে মুকদাম কুণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছিল। মুকদাম কুণ্ড এক্ষণে মুসলমানগণের বিশেষতঃ মুসলমান ফকীরগণের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিসমূহের অনেক ধ্বংশাবশেষ এক্ষণে মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন সহরের উত্তরাংশে প্রায় ৩০০ হস্ত দূরে কালন্দাবিহার। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে এবং শ্রমণগণ এই স্থান পরিস্কার রাখেন এবং জল সিঞ্চন করেন। সহরের উত্তর তোরণের বহির্ভাগে একটী স্তূপ আছে এইখানে দেবদত্ত ও অজাতশত্রু উভয়ে মিলিত হইয়া একটী মদমত্ত হস্তীকে বুদ্ধের বধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তেজ প্রভাবে মত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এই স্থানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্তূপ আছে এইখানে শ্রীপুত্র অশ্বজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে উত্তর দিকে একটী গভীর খাত আছে। ইহার পার্শ্বে একটী স্তূপ আছে এখানে শ্রীগুপ্ত বুদ্ধের বিনাশসাধনার্থ একটী গর্ত্তের অভ্যন্তরে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অগ্নিময় গর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্তূপ আছে এখানে চিকিৎসক জীবক একটী সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উত্তর তোরণ হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে করন্দবিহারের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। করন্দবিহারের পূর্ব্বদিকে একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপ বৌদ্ধের সম্মানার্থে অজাতশত্রু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুইটি ক্ষুদ্র সন্তবরণ আছে। রাজগৃহের দক্ষিণে এবং উদয়গিরির পার্শ্বে জরাসন্ধের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

উষা।

—(*)—

শ্যামল শাদ্বল পূর্ণ প্রশান্ত প্রান্তর,
নিহার নিচয় শোভে মুকুতা নিকর।
পুষ্পের সৌরভ ভার করিয়া হরণ
শান্তভাবে বহিতেছে স্নিগ্ধ সমীরণ।

শুদ্ধ মন্দ ছুটে কিবা মৃদুল পবনে,
তরুলতা নমিতেছে ঈশ্বর চরণে।
বালরবি ছবি কিবা শোভিল গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করি রক্তিম বরণে।
আঁধার নাশিয়া দিছে এসেছে আলোক,
তাই কলনাদে রত যত জীব লোক।
নিরখি মোহিনী মূর্ত্তি প্রশান্ত ঊষার,
কার না উপজে সুখ অন্তরে অপার?
কেগো এই মনোরম প্রত্যুষ সময়,
মোহময় মানসেতে জ্ঞান বিতরয়।
বিমল বিজ্ঞান ভাতি দীপ্ত করে মন,
অজ্ঞান আঁধার যাহে করে পলায়ন।
ভক্তি ভরে প্রেমানন্দে পবিত্র ঊষার,
চরাচর সনে সেবি নম তাঁর পায়।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী।

—*—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করিয়া সংক্ষেপে উহার প্রত্যেক অংশের বিষয় আলোচনা করা যাইবে:—(১) বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী (২) ঐ কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং (৩) ঐ কার্য্যের উপযোগী কল প্রভৃতি।

দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি বিধান করিতে হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষ হইতে হইবে; নতুবা পতন অনিবার্য্য। কেবল হাতে কাজ করিয়া তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য কল কারখানা আবশ্যক। ১৮৭১ সালের বিলাতের ফ্যাক্টরি রিটার্ণে প্রকাশ, তখন তথায়—১৭৩৮টী বস্ত্রাদি রঞ্জনের কারখানা ছিল এবং তাহাদের কর্ম্মী ও শিল্পীদের সংখ্যা প্রায় ৬৭০০০ ছিল। বর্ত্তমানে তথায় অন্যূন ২০০০ কারখানা চলিতেছে এবং তাহাদের শিল্পী সংখ্যাও ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য একটিও ঐরূপ কারখানা নাই। অন্যান্য প্রদেশেও কাপড়ের কলের সঙ্গে দুই একটি সামান্য বস্ত্র ও সূত্ররঞ্জনের কারখানা ব্যতীত একটীও বড় রকমের কারখানা নাই। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত এ দেশে কেহ এই অভাবটির গুরুত্ব অনুভব করেন নাই।

আমরা কার্পাস, পশম, রেশম ও অন্যান্য নানাবিধ সূত্র * ও তজ্জাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। এ সকলের প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জনপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বিভিন্নপ্রকার সূত্রের ও তজ্জাত বস্ত্রাদির রং করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কল আবশ্যক। যে কলে কার্পাসের রং করা যাইতে পারে—ঠিক ঐ কলে পাটের সূতা রং করা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। সুতরাং রং করিবার কল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কলের আলোচনা ও শিক্ষা আবশ্যক। আমাদের স্থান অতি অল্প; সুতরাং সংক্ষিপ্তসারেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

রং অতি সুন্দর ও স্থায়ী করিতে হইলে বস্ত্রাদি রং করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে ধুইয়া লইতে হয়। এজন্য পাশ্চাত্য দেশে রং করিবার কারখানার সঙ্গে সূত্র ও বস্ত্রাদি ধৌত করিবারও কারখানা থাকে। সূত্রাদি ধৌত করিবার কল রং করিবার কলের একরূপ অংশ বলিলেও হয়; এই রং করিবার কলের সঙ্গে ধৌত করিবার কলও স্থাপন আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার সূত্রের জন্য যেরূপ বিভিন্ন প্রকার রঞ্জনপ্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার কলের আবশ্যক হয় ধৌত প্রণালী ও তদুপযোগী কল সম্বন্ধে সেইরূপ।

---

* এখানে সূত্র শব্দকে আমরা Yarn শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ ধরিয়াছি।

কার্পাস সূত্রকে যে প্রণালীতে ধৌত করিতে হয় রেশম সূত্রকে সেই প্রণালীতে ধৌত করিতে গেলে রেশম নষ্ট হইয়া যাইবে এবং হয় ত ধোয়াও হইবে না। আবার যে কল কার্পাস বস্ত্রাদি ধৌত পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা রেশম বা অন্য সূত্র ধৌত-করণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

রঞ্জন প্রণালীকে সাধারণতঃ দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে:—(১) কষে * ছোপান বা mordanting ও (২) রং করণ বা dyeing। রং সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, রং করিবার পূর্ব্বে সূতা বা কাপড়কে একবার একটি কষে ছোপাইয়া লইতে হয়। তাহার পরে উহাকে রংএর পাত্রে ছোপাইয়া রং করিতে হয়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির জন্য নানারূপ কল প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কলে সূতার ফেটি, কাহাতেও বা কাপড় কাহাতেও বা মূল্যবান পরিচ্ছদাদি ধৌত ও রঞ্জিত হইয়া থাকে। রং করিবার পরে আবার সূতা ও কাপড় কাচিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য ভিন্ন কলের বন্দোবস্ত আছে। কাপড়ের মধ্য হইতে জল পিষিয়া বাহির করিবার জন্যও ভিন্ন কলের আবশ্যক হয়। হাতে নিংড়াইতে গেলে কাপড় ও সূতা নষ্ট হওয়ায় সম্ভব এই জন্য উহাও কলে হইয়া থাকে। ইহার পরে বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। রৌদ্রে দিলে অনেক রং নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য আর্দ্র বস্ত্রগুলিকে একটি ভয়ানক উত্তপ্ত ঘরের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা শুকাইয়া যায়। একখানি ১০ গজ ভিজা কাপড় শুষ্ক করিতে ৫ সেকেণ্ড সময়ও লাগে না। এক সঙ্গে পাশাপাশি করিয়া এইরূপ অনেকগুলি কাপড় উক্ত তপ্ত গৃহের মধ্য দিয়া পার করান হয়। এই জন্য কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি শুষ্ক হইলে উহাদের আরও কতকগুলি কাজ বাকি থাকে; যেমন, ইস্ত্রি করা, উজ্জ্বল করা, ভাঁজ করা, ইত্যাদি, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

* মাজুফল, হরিতকী, বাবলার ছাল, তেতুল ছাল প্রভৃতি জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উহাদের দ্রবণীয় অংশ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ মিশ্রিত জলকে সাধারণ ভাষায় ঐ ঐ দ্রব্যের কষ বলিয়া থাকে।

সিংহদ দুর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উদয়ভানুকে প্রত্যাখ্যানের পর কমলকুমারীর পিতা উদয়েরই কোন আত্মীয়ের সহিত কমলের বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন সীমান্ত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কমল পতিসহ এক চিতায় নশ্বর দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মূর্ত্তিমতি জলামভূতা সাবিত্রীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিয়া উদয়ভানুর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার সমাবেশ হইল। এ চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে তিলমাত্র বিলম্ব করা যুক্তি সঙ্গত নহে স্থির করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে বিদ্যুৎগতিতে কমলের পার্শ্বচরগণের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিহত করতঃ কমলকুমারী ও তাঁহার সহচরী দেবল দেবীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে সম্রাট আরঙ্গজীব এই সমুদয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া উদয়কে তিরস্কার মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলেন এবং তিন মাসের মধ্যে রাজকুমারী কমলকুমারীকে যেন বিবাহ না করেন তাহাও আদেশ করিয়া দিলেন। উদয় বিজয়মদে ঐ দুই

রমণী রত্নকে লইয়া কোন্দানা দুর্গে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিয়োজিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরবর্ত্তী ৯ই মাঘ সেই তিন মাস অতীত হইবে এবং সেই দিনই কমলকুমারীর সহ উদয়ের বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে। রাজপুতজাতী চির-কালই অতিশয় প্রতিহিংসা পরায়ণ বলিয়া জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। বিশেষ যদি মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে রাজপুত যেরূপেই হউক আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। দেবলের স্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি উদয়ভানুর ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উদয়ভানু মোগলের সেনা-নায়ক হইয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি হইয়া আছেন এমতাবস্থায় তাঁহার উপর প্রতিহিংসা সাধন করা দেবলদেবীর স্বামীর পক্ষে একরূপ দুরূহ বলিয়াই প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজ-পুত তাহাতে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি সামান্য সৈনিকের কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উদয়ের নিকট ছদ্মবেশে যাইয়া চাকুরীর প্রার্থী হইলেন। উদয়ও কোন প্রকার সন্দেহযুক্ত না হইয়া তাঁহার সে আশা পূরণ করিলেন। যে রাজপুত সৈন্য আহত হইয়া তনাজী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই সেঠ জগতসিংহই দেবল দেবীর স্বামী। জগৎ সিংহ আনন্দ সহকারে তানাজীর সহ যোগদান করিলেন এবং তাঁহাকে এমন আশ্বাসও দিলেন যে দুর্গের রাজপুত সৈন্যগণ উদয়ের উপর সতীর অবমাননা জন্য বিষম উত্তেজিত হইয়া আছে এবং প্রাণের সহিত তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা সুযোগ অভাবে এতদিন উদয়ের কোনই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তানাজী দুর্গে আগমন করিলে তাহারা কেহই অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিবে না সুতরাং সহজেই মহারাষ্ট্রীয়দের বিজয় পতাকা কোন্দানা দুর্গের উপরেই উড্ডীন হইবে।

এই সমুদয় শ্রবণমাত্র তানাজী দুর্গ আক্রমণের কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া একদল সেনানী আনিবার জন্য গুপ্তচর পাঠাইয়া দিলেন। এই সেনানী দলের মধ্য হইতে বাছা বাছা কয়টী যোদ্ধা লইয়া তিনি দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির সংকল্প করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল নিকটে কোথাও না থাকায় অনেক দূরদেশ হইতে তাহা-দের এখানে আনিতে হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব। এদিকে ৯ই মাঘ আসিয়া পড়িল। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে তানাজী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম গগণে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্তমিত হইলেন—বোধ হইল যেন উদয়ের কার্য্যে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাগ করিয়া নিজ দেহ লুক্কায়িত করিলেন। সন্ধ্যাও আগত প্রায়; এখনও তানাজীর সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। রজনী দ্বিপ্রহরের পরই উদয়ভানু সতী কমলকুমারীকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে এবং তানাজীও তাহা কখনই ঘটিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আদবেই উপস্থিত দেখিতে পাইতেছেন না। সমুদায় প্রতিকূল দেখিয়া তানাজী বড়ই বিপদ গণিলেন। এদিকে একজন কাজী আসিয়া কমলকুমারীকে বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু রমণীর পত্যন্তরগ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাতে আবার রাজপুত

রমণী মরণের ভয় না করিয়া হাসিতে হাসিতে পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িতে প্রস্তুত থাকে। উদয় ভাবিয়াছিল যে সময়ে কমলের শোক অপনোদন হইয়া যাইবে তখন তাহাকে বশীভূত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মমতে তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন।

কমলকুমারী এই তিন মাস যাবৎ দিবা রাত্রি আদ্যাশক্তি মহা সতীর নিকট কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছে সে কেমন করিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া সংসারে দ্বিচারিণী বলিয়া অভিহিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। সতীর নিকট ক্রন্দন বৃথা হয় নাই। দৈবী মায়া এবং দেবলীলা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায় —ঘোর অন্ধকার রজনী। সতীর অবমাননা পাছে দেখিতে হয় বলিয়াই যেন রজনী দেবী মসীময়ী মূর্ত্তী ধারণ করিয়াছেন—দ্বিপ্রহর রজনীর আর মাত্র ২॥০ দণ্ড অবশিষ্ট আছে—এই সময় পরেই সতী কমলকুমারী মুসলমানের সহ উদ্বাহবন্ধনে অনিচ্ছায় আবদ্ধ হইবেন। জগতে সতীমাহাত্ম্য লোপের আর বিলম্ব নাই, এমন সময় কোথা হইতে ৫০ জন সাহসী মহারাষ্ট্র সেনা—"হর হর মহাদেও" বলিতে বলিতে তানাজীর পার্শ্বে আসিয়া যোগদান করিল। তানাজী আশার ক্ষীণালোকে সমুদয় ভবিষ্যৎ নয়নের সমক্ষে উদ্ভাসিত দেখিলেন। তিনি সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই মোগল দুর্গ আক্রমণে কৃত সংকল্প হইলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালুদেশে উঠিয়া তানাজী সদলে দুর্গ প্রাচীরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে প্রাচীর লঙ্ঘনের প্রথম উদ্যমে তানাজী অকৃতকার্য্য হওয়ায় বিমর্ষ ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই প্রকার হতাশ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কারণ প্রথমেই ব্যর্থ মনোরথ হইলে অনেক সময়ে কার্য্যে আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না। কিন্তু যাহাই হউক তানাজী তাহাতে কিছুমাত্র উদ্যমহীন না হইয়া পুনরায় অকুতোভয়ে প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। পুরুষের সাহসই বল ভরসা এবং অনেক সময়ে কেবলমাত্র উদ্যমশীলতা ও সাহসের জন্যই পৃথিবীতে অনেকে মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন—দেহ সম্বন্ধে একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি এই দুরূহ বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে বোধ হয় তুমি বিরক্ত হইবে না?

ভগবান্—কি বলিবে বল?

অর্জ্জুন—সৎ এর উপাধি এই দেহ। কিন্তু দেহের স্বরূপ কি?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি দেহ 'অসৎ'। দেহের উৎপত্তি নাশ আছে।

অর্জ্জুন—দেহ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র।

ভগবান্—না, দেহের অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর। যেমন মরীচিকায় জলভ্রম কেবল ভ্রমমাত্র, সেইরূপ অসৎ দেহাদি সৎ আত্মার কল্পিত মাত্র। যেমন জল হইতে পানা জন্মিয়া জলই আবরণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া মায়াই ব্রহ্মের উপর এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে। মরীচিকা ও জলভ্রম পৃথক এইটি অনুভূত হইলে যেমন জল ভ্রমের অন্ত হয় সেইরূপ আত্মা হইতে দেহ পৃথক ইহা অনুভূত হইলে দেহাদি ভ্রমের অন্ত হয়।

অর্জ্জুন—সর্ব্বদা সৎ বস্তু লক্ষ্য থাকিলেই ত দেহাদি ভুল হইল, কিন্তু সর্ব্বদা কিরূপে 'সৎ' লইয়া ভাবা যায়?

ভগবান্—'সতের' স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা উপলব্ধি হয়। যখন অনুভূত হইতে থাকে যে আত্মা নিজে অবিনাশী অপ্রমেয়, তখনই তুমি জীবন্মুক্ত "অবিনাশিনোঽপ্রমেয়স্য নিত্যস্য"।

অর্জ্জুন—নিত্য ও অবিনাশী এক কথা, পুনরুক্তি কেন?

ভগবান্—অর্থগত পার্থক্য নাই। তথাপি অদর্শন ও পরিবর্ত্তন ভেদে নাশ দুই প্রকার। দ্বিবিধ নাশ রহিত এজন্য অবিনাশী। সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য।

অর্জ্জুন—আত্মা 'অপ্রমেয়' কিরূপে?

ভগবান্—'এই বস্তু এইরূপ' প্রকৃষ্টরূপে বস্তুর স্বরূপ পরিমাণকে প্রমা জ্ঞান বলে। যাহাদ্বারা প্রমা জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। পূর্ব্বে আত্মা তাহাকে যাহা কিছু জানাইয়া দেয় তাহাইত প্রমাণ হইবে। কিন্তু আত্মাকে জানাইয়া দিবে কে? জ্ঞান আছে তাই জানা। জ্ঞানকে জানাইবে কে? আত্মাই আত্মার জ্ঞাতা; কারণ আর কোন বস্তুই জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হয় না। এজন্য আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বা অপ্রমেয়, এইরূপ আত্মাকে যে হন্তা মনে করে বা যে হত মনে করে তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না কারণ ইনি হননও করেন না হতও হন না।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম, বিনাশও করেন না বিনষ্টও হন না, এজন্য শোক করিলাম না। কিন্তু তাঁহাদির জন্য ত শোক না করিলে পাপ হইতে পারে, শুধু আমার পাপ নহে তোমারও। যেহেতু তুমি এই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছ?

ভগবান্—আমি প্রবৃত্ত করিতেছি না, কাহাকেও তাহা করি না। আমি তোমার অজ্ঞান বিনাশ করিয়া দিতেছি মাত্র। আর আত্মার সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিলাম তাহা শুধু আমার মনে করিও না। কঠোপনিষদে ইহাই আছে, অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন,

হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি
ন হন্যতে॥ কঠ ১।২।১৯

যখন বেদ এই উপদেশ দিতেছেন তখন সকল শঙ্কা দূর কর। কারণ এ কার্য্যে পাপ থাকিলে বেদ কখন পাপকার্য্যে লওয়াইতে পারেন না।

এ কার্য্যে তোমার কি আমার কাহারও পাপ নাই। আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতির আর একটী মাত্র বলি শুন। আত্মা ষড়বিধ বিকার শূন্য।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্, এ।

ভারতে জাতীয় জীবনের উন্মেষ।

হৃদয়ের উদারতাই মানবের সভ্যতার প্রধান পরিচায়ক; বসন ভূষণ বা অস্ত্রশস্ত্রই আমাদের সভ্যতার যথার্থ পরিচায়ক নহে। সেইরূপ, যেখানে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা, সেইখানেই অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার আধিপত্য। মানুষ যতদিন এই অজ্ঞানে অন্ধ থাকে, অসভ্য থাকে, ততদিন তাহার চারিধারের এই বহুর মধ্যে সে সেই একককে দেখিতে পায় না; মানবসমাজের এই অসংখ্য খণ্ডতার মধ্যে চিরদিন যে এক মহতী একতা বিরাজ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি ও অনুভব করিতে সে অক্ষম হয়। তাই আপনার মোহবশে সে তাহার চারিধারের এই বৃহৎ জগৎকে, এই বিপুল মানব সমাজকে সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র

করিয়া তাহাকে তাহার আপন ধারণার ও হৃদয়ের উপযুক্ত করিয়া লয়। কিন্তু, ক্রমে তাহার জ্ঞান যত পরিস্ফুট হইয়া উঠে, প্রাণ যত প্রসারিত হইতে থাকে, তত সে তাহার সেই ক্ষুদ্র জগতের সীমার গণ্ডীকে বিস্তৃত ও বৃহৎ করিয়া তুলে। এই ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশই সংসারের নিয়ম। এই নিয়মের বশে, মনুষ্যহৃদয় তাহার আপন ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে তাহার পরিবারের, তাহার গ্রামের, তাহার প্রদেশের, তাহার দেশের ও অবশেষে তাহার জগতের সকলেরই মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চতুর্দ্দিকের এই অসংখ্য দেশকে সে একই পৃথিবী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং বহুবর্ণে, ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে ভিন্ন এই অগণ্য মানবসমাজকে তাহার আপন সমাজ বলিয়া সে স্বীকার করে। তখন এই পৃথিবীর সকল দেশই তাহার স্বদেশ, সকল জাতিই তাহার স্বজাতি। এই উদারতা, এই সভ্যতাই উন্নতির চরম আদর্শ। কিন্তু আজিও এ পৃথিবীর মানবসমাজ সে উদারতা, সে সভ্যতা লাভ করে নাই;—কোন্ ভবিষ্যতে সে এই উদার উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়া ধন্য হইবে, তাহা আমাদিগের ধারণার অতীত। কিন্তু, কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে মানবসমাজ যে প্রতিদিনই তাহার সেই চরম আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে পৃথিবীর অনেক স্থলে দেখিতে পাই, মানুষ তাহার পূর্ব্ব সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার দেশবাসী সকলকেই তাহার হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে,—এবং এই ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে এক একটি মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাষার, ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের সহস্র পার্থক্যসত্ত্বেও তাহারা সকলেই এক মহা জাতীয় ভাবে সম্মিলিত ও একপ্রাণ। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা মনান্তর, মতান্তর ও সহস্র স্বার্থসংঘর্ষ সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মাতৃভূমির সেবায় ও কল্যাণসাধনে একাগ্রচিত্ত। স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেকের কর্ম্মের সফলতায় গৌরব ও আনন্দবোধ করে,—বিফলতায়, অপমান ও শোক অনুভব করে। ইহাই যথার্থ জাতীয়তার লক্ষণ।

ভারতবর্ষ এত বৃহৎ ও বিস্তৃত দেশ যে, ইহার নানাপ্রদেশে নানাভাষায়, রীতির ও নীতির অর্থাৎ নানা ক্ষুদ্র জাতীর উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এবং প্রাচীন ভারতে ক্ষুদ্র জাতিকে একত্র মিলিত করিয়া একটা মহা জাতিতে পরিণত করিবার বহুল অন্তরায় ছিল।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে জাতীয় জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে যখন ভারতে সহস্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, শ্মশানের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায়, পরস্পর সংগ্রামে ও সংহারে মত্ত, সর্ব্বব্যাপী হিংসা ও বিদ্বেষের বিষে দেশের সর্ব্ব দেহ জর্জ্জরিত এবং দেশবাসীর প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত, হিমালয়ের পাদমূল হইতে সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত এ মহাভারত অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় মগ্ন;—আমাদের জাতীয় অধঃপতনের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, ইংরাজের বাণিজ্যতরী ভারতের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রমে ছলে, বলে ও কৌশলে ইংরাজ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। ইংরাজ ভারতে আসিয়া সর্ব্বদেশব্যাপী সকলের প্রতি সমদর্শী এক সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিল। জনসাধারণের সম্মুখে জগতের শত শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ও ইতিহাসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিল এবং আপামর সাধারণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিল; হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের ও জাতি বিচারের সঙ্কীর্ণ দৃঢ় বন্ধনকে অপেক্ষাকৃত শিথিল করিয়া তুলিল,

রেল, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাতায়াতের ও ও আলাপ পরিচয়ের সুবিধা করিল; এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সকল প্রদেশের শিক্ষিত অধিবাসী-গণের মধ্যে পরস্পর ভাব প্রকাশের উপায় প্রতিষ্ঠা করিল।

ইংরাজের এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে, আমরা জগতের ইতিহাস ও সাহিত্য অনুশীলন করিয়া ক্রমে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলাম। এক অপক্ষপাত রাজশক্তির অধীন হইয়া আমরা সকলেই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিলাম যে, আমরা সকল প্রদেশের সকল ভারতবাসীই একই নিয়মে ও স্বার্থে বদ্ধ; এবং রেল, টেলিগ্রাফ্, ডাক ও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমরা সর্ব্ব প্রথম সকল প্রদেশের অধি-বাসীগণের সহিত পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও ভাব বিনিময় করিতে সমর্থ হইলাম। এই উপায়ে আমাদিগের মধ্যে প্রথম জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হইল। ক্রমে বিধাতার ইচ্ছায় তাহা নানা বাধাবিঘ্ন ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া অঙ্কুরে পরিণত হইল। বহু শতাব্দীর অন্ধকারের পর আমা-দের মধ্যে এক নব জীবনের মঙ্গলালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু দিনের নির্জ্জীবতার পর আবার চতুর্দ্দিকে একটা চেষ্টা ও চাঞ্চল্যের সজীবতা আসিয়া দেখা দিল। বহুকাল পরে আমরা আত্মপরীক্ষায় ও আত্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে আমাদের রীতি-নীতি, ভাষা-ভাব, সকলই উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শের অনুকরণে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাই জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি।

ইংলণ্ডের সৌভাগ্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপর তাহার দায়িত্বও অল্প নহে। কারণ ইংরাজ জানে, যে ভারতবর্ষ তাহাদের বিজিত দেশ নহে,—যাঁহারা বলেন যে, ইংরাজ কতিপয় মাত্র সৈনিকের সাহায্যে ভারত জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ সন্দেহ নাই;—তাই বলিতেছি যে, ইংরাজ জানে যে সে ভারতে জয়ীরূপে প্রবেশ করে নাই, ভারতবাসী তাহাকে তৎকালীন সেই বিশৃ-ঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতার মধ্যে, শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের জন্য, তাহাদিগকে একমাত্র সহায় ও মুক্তি-দাতা জ্ঞানে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দানে সম্মত হইয়া-ছিল। এক্ষণে ইংরাজ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি সন্দেহ চক্ষে দর্শন না করিয়া যদি তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভারতবাসীকে উপনিবেশ সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের উপ-যুক্ত ক্ষমতা দান করেন তাহাতেই ইংরাজের মহত্ব, তাহাতেই ইংরাজের কৃতিত্ব।

পৌত্তলিক রোম্ তাহার সমৃদ্ধির দিনে, সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে তুল্য অধিকার দান করিতেন। ইংরাজ যীশু খৃষ্টের শিষ্য হইয়াও কি পৌত্তলিক রোমের অপেক্ষা হীন আচরণে কুণ্ঠিত হইবেন না? রোমীয়গণ, কেবল অর্থ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া, সাম্রাজ্য বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা মহত্তর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া সন্তোষতৃপ্ত প্রজাবৃন্দের কৃতজ্ঞতা লাভে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ড অতীত রোম অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আজ ইংলণ্ডবাসীর রোমবাসীর অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তরভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক। আমা-দিগের বিশ্বাস ইংলণ্ড আমাদিগকে এ আশায় হতাশ করিবেন না; কারণ, এখানে আমরা যেরূপ ক্ষুদ্রমনা ইংরাজকে দেখিয়া থাকি, ইংরাজ জাতি বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখানকার ইংরাজগণ তাঁহাদিগের রাজা ও স্বদেশের

নিকট বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু ইংরাজজাতি কখনই চিরদিন ইহাদের কথায় ভুলিয়া থাকিবে না। তবে এ বিষয়ে আমাদিগের ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। সময়ে আমরা সকল অধিকারই লাভ করিতে সক্ষম হইব সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলের সবলের নিকট হইতে অধিকার লাভ করিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত বহু দিনের চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। অধিকন্তু, ভারতে রাজা ও প্রজার মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত বা বর্ণগত কোন সম্বন্ধ ও সহানুভূতিই নাই; কিন্তু সেজন্য আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে যেরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে তাহাতে আমাদের দুর্দ্দশা দূর হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

রাম শর্ম্মার দুর্গাপূজা।

——(*)——

এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে রাম শর্ম্মা নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংসারে পত্নী ও এক বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম সরলা। ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ছায়া স্বরূপিনী। ধর্ম্মশীলতায় সদাচরণে ব্রাহ্মণী সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের অনুগামিনী। সামান্য ব্রহ্মোত্তর জমির উপস্বত্বে ব্রাহ্মণ আপনার ও ক্ষুদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের সেই দারিদ্র্যপূর্ণ কুটিরে কিন্তু চির শান্তি বিরাজিত ছিল।

রাম শর্ম্মা প্রতি বৎসর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দুর্গাপূজা করিতেন। তাঁহার আয় তেমন ছিল না। সুতরাং ভিক্ষা দ্বারা তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বলহীন সহায়হীন সম্পদহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র ভক্তির বলেই প্রতি বৎসর এই মহা পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিতেন। পূজার সময় প্রতি বৎসর দলে দলে লোক সকল তাঁহার কুটিরে সমুপস্থিত হইত। তখন অসংখ্য লোকের কোলাহলে, ভিক্ষুকের আনন্দ-ধ্বনীতে ও অতিথি-অভ্যাগতগণের কলনাদে সেই ক্ষুদ্র পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রতি বৎসর তিন দিন সেই ক্ষুদ্র পল্লী যেন অমরগণের লীলাভূমিতে পরিণত হইত। তারপর মহাদেবীর বিসর্জ্জন হইলে সেই নীরব পল্লী আবার নীরব-সাগরে ডুবিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ দম্পতি আবার অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপেই দিন যায়। একবার রাম শর্ম্মা মহাপূজার জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইলে কয়েকজন দস্যু পরামর্শ করিল, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ পথ হইতে লুণ্ঠন করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় রহিল। এদিকে ব্রাহ্মণ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া বাটি প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশাধিক পথ দূরে আসিলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ এক দীর্ঘকায় বটবৃক্ষতলে অর্থ ও বস্ত্রাদির মোট রাখিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া সেই দীর্ঘিকার ঘাটে বসিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিতে লাগিলেন।

সেই দীর্ঘিকার জল অতি মনোহর। ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্রী মধ্যে মধ্যে এই দীঘি হইতে নির্ম্মল জল পানার্থ বাটী লইয়া যাইতেন। রাম শর্ম্মা যখন সেই দীঘির কূলে বসিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সুনীল শরতাকাশে তারার মেলা বসিয়াছে; মাঝে মাঝে শুভ্র মেঘখণ্ড গগন মণ্ডলে বিরাজ করিতেছিল। সে নির্ম্মল দীঘির জলে চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়া

চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এমন সময়ে কলসীকক্ষে রাম শর্ম্মার ভ্রাতষ্পুত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে সেই দীঘিকূলে উপবিষ্ট দেখিয়া ভ্রাতষ্পুত্রী বলিলেন,—

দেখ দেখি, যা ভাবিয়াছি, তাই। তুমি যে আজ বাটী আগমন করিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। তাই তোমার জন্য খাবার জল লইতে আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। এত রাত্রে তোর একলা আসিবার দরকার কি ছিল?

ভ্রাতষ্পুত্রী। না আসিলে কি চলে? তুমি যখন শ্রান্ত হইয়া বাড়ি আসিয়া ভৃঙ্গার জল চাহিবে তখন কি দিব? চল, বাড়ী চল।

এই কথার পর উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বস্ত্রাদির মোটটি ভারি দেখিয়া ভ্রাতষ্পুত্রী উহা লইলেন ও ব্রাহ্মণকে কলসীটি লইতে বলিলেন। পথশ্রমে শ্রান্ত ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন বন পথ দিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহপানে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইলে সেই দস্যুদল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। সেই মহা কোলাহলে ভ্রাতষ্পুত্রী মোট লইয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না। দস্যুদল ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলাকীর্ণ আম বাগান; তাহার মধ্যে এক জীর্ণ কুটীর; সেই কুটীরের ভিতর ভয়ঙ্করী এক কালী মূর্ত্তি। একটি প্রদীপ একটি ভাঁড়ের ভিতর মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল; আর সেই কুটিরের বহির্ভাগে ১৫।১৬ জন ডাকাত রাম শর্ম্মাকে ঘিরিয়া অবিরত নির্য্যাতন করিতেছিল। রাম শর্ম্মা অটল। কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার বলিল:—

মেধো মাল দেখাৎ। বিটলেকে মায়ের কাছেই লাগা।

মেধো মহা আহ্লাদে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া হাড় কাঠ পুঁতিল ও ব্রাহ্মণকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আর একজনকে বলিল, 'খুড়ো ঠাকুর, লেগে যাও।' খুড়ো ঠাকুর পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। রাম শর্ম্মা বুঝিলেন, তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবার আর বিলম্ব নাই। তখন ব্রাহ্মণ ডাকাইতগণকে বলিলেন,—

টাকাগুলি পাইলে কি তোমরা আমায় ছাড়িয়া দাও?

সর্দ্দার। এখনি।

ব্রাহ্মণ। তবে আমার সঙ্গে চল। সমস্ত টাকা এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছিয়াছে।

মেধো। কি রকম?

ব্রাহ্মণ। আমার ভ্রাতষ্পুত্রী সঙ্গে ছিল, সে লইয়া গিয়াছে।

তখন সর্দ্দার উরু চাপড়াইয়া বলিল,—ঠিক রে ঠিক! ঠিক বটে।

ব্রাহ্মণ। তবে আমার সঙ্গে চল; যাইলেই পাইবে।

মেধো। ওরে বেটা বিট্‌লে! গেপ্তারের মতলব আঁটছিস্!

এই বলিয়া মেধো রাম শর্ম্মার গালে সজোরে এক চড় মারিল। সর্দ্দার বলিল, 'নারে বামুনটা মিছে বলে না। মেধো তুই যা।'

মেধো। একলা? বল, মালের বখরা নেই।

সর্দ্দার। বেশ।

মেধো আনন্দে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। রাম শর্ম্মার বন্ধন মোচন করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে অন্যান্য ডাকাইতগণ ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকেই রাম শর্ম্মার সহিত

যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন সর্দ্দার বলিল,—

বটে! তবে লাগাও তাল; তালে যাল ক'র্‌লেই মাল।

এই বলিয়া প্রত্যেককে তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মল্ল যুদ্ধের যে রীতি আছে, এই সময়ে একজন ডাকাইত তাহা ভঙ্গ করে, সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ তাহাকে তরবারির এক আঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এই ঘটনায় দস্যুগণ মহা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইল ও ভয়ঙ্কর দাঙ্গা করিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রদেব অস্ত যাইলে ঘোর অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া রাম শর্ম্মা পলায়ন করিলেন।

অতি ঘোর অন্ধকার। শ্রবণবিদারক ভয়ঙ্কর ঝিল্লিরবে প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি আরও বিভীষণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পেচক চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল। রাম শর্ম্মার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই; নির্ভয়ে সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রাহ্মণ বাটি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন যখন বাটি পৌঁছিলেন ব্রাহ্মণী। অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

কি আশ্চর্য্য! তুমি ঘুমুচ্ছ!

ব্রাহ্মণী। কি করিব। আজ তোমার পত্র পাইয়া পড়াইয়া বুঝিলাম, তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি আসিবে। তোমার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলাম; তুমি আসিলে না দেখিয়া ভাবিলাম কাল সকালে আসিবে। তারপর শুইলাম। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?

রাম শর্ম্মা। কেন কিছু জান না কি? বুড়ো বয়সে আবার রসিকতা! যাক্; মোটটি আন্‌তে পেরেছে ত?

ব্রাহ্মণী। ওমা! এ সব কি কথা গো!

রাম শর্ম্মা। কেন, সরলা আজ সন্ধ্যার পর দীঘিতে জল আনিতে যায় নাই?

ব্রাহ্মণী। ওমা! সে কি গো!

রাম শর্ম্মা। মিথ্যা বলিও না।

ব্রাহ্মণী। আমি কখনও মিথ্যা বলিয়াছি? সরলা আজ আবার কখন দীঘিতে যাইল?

রাম শর্ম্মা। এঁ্যা, সে যায় নাই! সে সরলা নয়?

তখন ব্রাহ্মণ অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া মস্তকে করাঘাত করিয়া হায় কি হইল বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শোকে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অবিরত 'হায় মা! কি করিলে' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীও স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ 'মা! মা!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন বিবেচনায় ব্রাহ্মণীও রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই দীঘির নাম কৃষ্ণ দীঘি। নির্ম্মল সলিলে সেই রমনীয় দীর্ঘিকা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত বলিয়া লোকে তাহার এইরূপ নামকরণ দিয়াছিল। কৃষ্ণ দীঘির নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক ইতর জাতীয় লোক বাস করিত। কৃষিই তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন। উক্ত ঘটনার পর দিবস এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া মাঠে যাইবার সময় সেই দীর্ঘিকার নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে একটি বৃহৎ মোট দেখিয়া কৌতূহলচিত্তে তথায় গমন করিল। পরে উহা-

দিগের মধ্যে একজন যেমন সেই ঘোটটি লইতে যাইবে অমনি এক প্রকাণ্ড কালসর্প বৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া মুহুর্মুহুঃ ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তখন সেই কৃষকগণ চীৎকার করিতে থাকলে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে বিস্তর লোক তথায় সমবেত হইল। কিন্তু কেহই বৃক্ষতলে গমন করিতে সাহসী হইল না। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'মা! মা!' রবে কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই বৃক্ষতলে সেই ঘোটটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র সেই অজগর বিষধর ফণা সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই ঘোট মাথায় করিয়া মা! মা! রবে আনন্দে নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমবেত লোক সকল অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে পৌঁছিলে অনতিকাল মধ্যেই এই বৃত্তান্ত চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন দলে দলে গ্রামের লোক ব্রাহ্মণের বাটিতে আসিতে লাগিল। অনন্তর মহা সমারোহে ব্রাহ্মণের বাটিতে মহাপূজার অনুষ্ঠান হইল। এই বৎসর জগজ্জননীর এমন বিশ্ববিমোহন রূপ হইয়াছিল, যে, এরূপ অপরূপ মূর্ত্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই। আন্তরিক ভক্তির আকর্ষণে মহাদেবী স্বয়ং ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া তাঁহার কুটিরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পর বৎসর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বহু অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণের কুটির সুন্দর অট্টালিকায় পরিণত করিয়া দিলেন। পূজার পরে বহু লোক সেই ডাকাইতগণকে ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহাদিগের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

শ্রীতারকচন্দ্র নাগ।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

কৃষি বা চাষ বলিলে সাধারণতঃ আমাদের দেশে একমাত্র ভূমিকর্ষণই বুঝায়, কিন্তু চাষ সকল প্রকারই সম্ভব। স্থলের চাষের ন্যায় জলের চাষ অর্থাৎ মৎস্যের চাষও অসম্ভব নহে। কিন্তু সম্ভব হইলেও কেহ কেহ হয়ত 'ইহা জেলেদের কার্য্য' এই কথা বলিয়া উপেক্ষিত করিবেন। আমরা স্বীকার করি মৎস্যের উন্নতি করা, মৎস্য ধরা জেলেদিগেরই কার্য্য বটে, কিন্তু দিন দিন যেরূপ মৎস্যের অভাব হইতেছে, তাহাতে জেলেদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলিবে না। দেশের যে দিন দিন কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা ভাবিলে সত্যই শরীর অবসন্ন হয়। এতদ্দেশীয় কৃষক শ্রেণী, মৎস্য ব্যবসায়ী জেলে, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ যাহারা সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ তাহাদিগের উন্নতির জন্য যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন সেরূপ হইতেছে না। আজকাল স্বদেশী আন্দোলনে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, অনেক দিকে পড়িয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। ফলতঃ স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় না থাকিলে দেশের উন্নতি কিরূপে হইবে। মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসা ধনাগমের একটী সহজ উপায়। এবং অল্প মূলধন লইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ বিষয় সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

দুগ্ধ ও ব্যঞ্জনের বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্য।

উচ্চবংশীয়া হিন্দু বিধবাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, মাছ খান না এমন লোক বাঙ্গালা দেশে কমই দেখা যায়। বাস্তবিক মৎস্য বাঙ্গালীর বড়ই আদরের জিনিস, একটি প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়, মৎস্যে সাধারণতঃ শতকরা ১৪ ভাগ যবক্ষারজান, ৭ ভাগ অঙ্গার, একভাগ ধাতব দ্রব্য ও ৭৮ ভাগ জল ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ আছে। এই জন্যই অনেক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক মৎস্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন মৎস্য দ্বারা মস্তিষ্ক পুষ্ট ও মানসিক বৃত্তি সকল তীক্ষ্ণ হয়। নানা কারণ বশতঃ দিন দিন বাঙ্গালায় এই পুষ্টিকর খাদ্য মৎস্যের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে। এই অভাবেরও কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) আমাদের দেশে দিন দিনই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত আহার্য্য বস্তুরও যে অভাব হয় তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। (২) পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ জল ছিল এখনও সেই পরিমাণ জল আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুকুর, খাল, বিল এমন কি বড় বড় নদী পর্য্যন্ত প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। জলের পরিমাণের ন্যূনতার সঙ্গে মৎস্যেরও যে ন্যূনতা হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। (৩) আহারাভাবে মনুষ্যদিগের যেরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে, নিরীহ মৎস্যজাতিরও ঐরূপ ক্লেশ হয়। এতদ্দেশের জঙ্গল আবাদ হওয়াতে মৎস্যকুলের খাদ্যের পক্ষে অনেকটা ব্যাঘাত পড়িয়াছে, সুতরাং নদী, খাল, বিলে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তত মৎস্য দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষাদির পত্র, ফুল ও ফল মৎস্যের শরীরের পুষ্টিসাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পত্র, ফুল ও ফল নদীগর্ভে পতিত হইয়া পচিলে মৎস্যকুল ঐ সকল গলিত পত্র, ফুল ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। পত্র, ফুল, ফলাদিতে যে রস থাকে তাহা জলে মিশ্রিত হওয়াতে সেই জল মৎস্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়। (৪) এতদ্দেশে রেলের গাড়ী ও জাহাজের প্রচলন মৎস্য অভাবের আর একটী প্রধান কারণ। রেলের রাস্তা নির্ম্মাণের দরুণ অনেক খাল, নালা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদিও মাঝে মাঝে দুই একটী খাল দৃষ্ট হয়, তদুপরি পুল হওয়াতে খাল কিম্বা নদীর স্রোত এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে মৎস্যকুল আর স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারে না। জাহাজের বংশীধ্বনি ও ঝপাঝপ শব্দে মৎস্যকুল যে কোথায় পলাইয়াছে তাহা তাহারাই জানে। (৫) মাছের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া জেলেরা ছোট ছোট মৎস্য বা সবে মাত্র ডিম্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এমন ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিতেও ত্রুটি করে না। বিস্তর পরিমাণে ডিমওয়ালা মাছ ও মৎস্যের পোনা ধ্বংশ হইতেছে বলিয়াই এতদ্দেশে দিন দিন মৎস্যের এত অভাব হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।

বঙ্গভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের পরিভাষা।

ভাষার না উন্নতি হইলে জাতীয় উন্নতি হয় না, জাতীয় উন্নতি না হইলে ভাষার উন্নতি হয় না, উভয়টীই পরস্পর একই পাশে আবদ্ধ। ভাষার তেজেই মনের তেজ এবং মনের তেজেই শরীরের তেজ জন্মে, মন ও শরীরের তেজযুক্ত জাতিই প্রকৃতজাতির মধ্যে গণ্য। পার্সি এবং হিন্দি উভয়ই জোরের ভাষা। এতাদৃশ্য ভাষাচয় যাহারা

ব্যবহার করে; একবার তাহাদের গানে চাহিয়া দেখিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হয়। ইংরাজিও বিশেষ জোরের ভাষা।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়, কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদির গঠনভুক্ত অনেক যন্ত্র। (wheel বা চাকা), ফিমেল স্ক্রু (female screw), মেইল স্ক্রু (male screw) ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের অনেক ব্যবহারিক যন্ত্রাদির জন্য কতকগুলি স্ত্রীবাচক এবং কতকগুলি পুংবাচক শব্দ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বিষয়ের অনুবাদে স্ত্রী-পুংবাচকযুক্ত সর্ব্বনাম দ্বারা উপকার হইবে আশা করি।

ইংরাজীতে, হিন্দিতে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতে আবশ্যক গুটিকতক স্ত্রী এবং পুংবাচক সর্ব্বনামের বিভিন্নতা রহিয়াছে, তবে আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন?

অগ্য আমরা অভাব ও অসুবিধা বোধ করিয়া "she" জন্য "সা", "her" জন্য "তস্যা" শব্দ মূল বা basis করিয়া অভাবাদি পূরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

এতাদৃশ কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে কয়েকটী উচ্চ বঙ্গসাহিত্যসেবক ও সংস্কৃত ও ইংরাজীতে দক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক মনে হওয়াতে যত্নতঃ তাহাও করিয়াছি। তাঁহারা সানন্দে এতাদৃশ সর্ব্বনামের বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা একটি আবশ্যক অভাব পূর্ণ হইবে বলিয়া এতাদৃশ ব্যবহারের বিশেষ অনুমোদন করিয়াছেন।

যে কাল আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাতে বঙ্গবাসীকে অন্নাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন ব্যবসা শিক্ষা, কলকারখানা শিক্ষা, নানা শিল্প শিক্ষা হেতু লালায়িত হইতে হইবে। সেইজন্য, এখন হইতেই আমাদের যৎকিঞ্চিৎ যে বিষয়ে যাহা সে বিষয়ের technical terms (যান্ত্রিক শব্দচয়) ঠিক বজায় রাখিয়া হউক বা অনুবাদ করিয়া হউক, বা পারিভাষিক কথা কিংবা ব্যাখ্যা দ্বারা হউক বা শব্দগঠন (coining) করিয়া হউক, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় প্রচুর গ্রন্থচয় রচিত এবং মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মাতৃভূমির সন্তানগণ এইরূপে জগতের সর্ব্বজাতির সহিত কোন না কোন প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সমস্ত জাতির উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক গ্রন্থনিচয় আমাদের মাতৃভাষায় প্রস্ফুটিত হউক, এই প্রাণের ইচ্ছা; তাহাতে মাতৃভূমির সন্তানগণ জগতের যাবতীয় জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করুন, এই হৃদয়ের বাসনা।

সংস্কৃতভাষা জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা। "সা" যখন বঙ্গভাষার মাতৃস্থানীয়া তখন "তস্যাঃ" সম্বন্ধকার অভাব কালে পূর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, L. M. S.

সমালোচনা।

মন্দার—শ্রীমতী পুষ্পময়ী দেবী প্রণীত।

মন্দার সুরতরু তাই প্রত্যেক পুষ্প স্বর্গীয় পরিমলে পরিপূর্ণ। মন্দারে দেখিলাম কি?—দেখিলাম, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সমস্ত স্বর্গীয় ভাবগুলিই কবিতায় প্রস্ফুট রহিয়াছে;

আর দেখিলাম, প্রেমের ক্রম বিকাশ, প্রেম স্বপরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে বিশ্বসংসারে, পরিশেষে বিশ্বসংসারের অধিপতি সেই ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছে। "বিমল", "অমিয় কুমার" প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় কবির প্রেমের জন্ম, "কাঙ্গালিনী মা" প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় সেই প্রেমের ক্রমবিকাশ, "তুমিই আমার" শীর্ষক কবিতায় সেই প্রেমের পূর্ণতা। কবি লিখিয়াছেন,

"যতদিন দেহে প্রাণ
থাকে মোর এই ভবে,
ততদিন তুমি, নাথ,
একাই আমার রবে।
তারপরে শেষ দিনে
তোমারে লইয়া বুকে,
মরহ্রদে অমরাত্মা
লভিব পরম সুখে।"

প্রেমের কি সুন্দর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

মন্দারে সুন্দর ঈশ্বর নির্ভরের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।—কবি লিখিয়াছেন,—

'তব পানে চেয়ে চেয়ে
মাথা পেতে নিরন্তর,
সতত সহিতে পারি
সংসারের শত ঝড়।'

"বিভো!
কি ভেবে হয়েছি আমি এতই আকুল?
যে ভাবে রাখিবে তুমি,
সেই ভাবে রব আমি,
অমিত একটী তব খেলার পুতুল!"

আপনার উপর কবি কিছুমাত্র দায়িত্ব রাখেন নাই। ভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কি মধুর ভাব!

ভগবানের নিকট কবির সুন্দর তিনটী প্রার্থনা আছে। এরূপ প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধক কবির লেখনী ব্যতীত নিঃসৃত হয় না। সাধক কবি পুষ্পময়ী প্রার্থনা করিতেছেন,

(১) বিভো!
যে ক'দিন থাকি ভবে
তোমার করুণা বলে,
তোমারি আদেশে যেন
খাটি এই ধরাতলে।

(২) চাহিনা তোমার কাছে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
এ শকতি দিও যেন
মনে রাখি তব নাম।

(৩) জগদীশ!
এ দাসের আর প্রভো কিছুই দিও না,
'যা' দেছ ফিরিয়া লও,
এই শুধু ভিক্ষা দাও,
আঁখি জল টুকু মোর
কাড়িয়া নিও না।

যতদিন বাঁচি তোমার প্রিয় কার্য্য যেন সাধন করি; কিন্তু তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবারই বা শক্তি কোথায়? তুমিই সেই প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার শক্তি দাও। আমি অতি দীন হীন, তোমার প্রকৃত সাধন ভজন জানি না কিন্তু তোমার সুধাময় নাম যেন সতত উচ্চারণ করিতে পারি এ শক্তি দাও। আর তোমার জন্য যেন সতত প্রাণ কাঁদে, তোমার জন্য যেন প্রাণে এক নিত্য আকাঙ্ক্ষা থাকে। দেব! সতত দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ জীবনে আনিয়া দিও। সুখে সম্পদে তো তোমার নাম মনে পড়িবে না যদি দুঃখে, শোকে তোমার জন্য প্রাণে এক নিত্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। দুঃখ যে বিরেচক ঔষধ; যেমন বিরেচক ঔষধ শরীরের

মল নির্গত করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে সেইরূপ দুঃখ মনের মলিনতা দূর করিয়া ভগবদ্ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাই প্রার্থনা দেব! চক্ষের জলটি যেন কাড়িয়া নিও না। মরি, কি দীন হীন ভক্ত সাধকের উক্তি! ভক্ত মনে করেন ভক্তির দর বাড়ায় কে? ভগবানের দয়া—তাই ভক্ত সকল কাজে ভগবানের দয়ার ভিখারী। আর যে সকল জিনিষ সেই দয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগায় তাহাই ভক্তের প্রার্থনীয়।

ভাষার অন্ত আছে কিন্তু আশার অন্ত নাই। আশার অন্ত এক ভগবানে, তাই কবি লিখিয়াছেন,

"তুমিই আমার এক
জীবনের সাধ আশা,
বেশী কি বলিব প্রভো,
আর তো জানে না ভাষা।"

বুদ্ধির উপর প্রকৃতি, প্রকৃতির উপরে পরমাত্মা। সাধকের সমাধিকালে বুদ্ধিতে পরমাত্মার ছায়া পড়ে তাই সমাধির পর সাধকের ভক্তিপ্লাবন হৃদয় হইতে ব্রহ্মানন্দের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। একজন সাধক বলিয়াছিলেন;—'মরে গেলে ফিরে আমি যদি মনে রয়, তবে তো বলিতে পারি মরিলে কি হয়।' তাই মনে হয় সাধক কবি পুষ্পময়ী দেবী ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া লিখিয়াছেন,—

"তবে এক আশা সদা বুকে পুরে রাখি,
তাই পূর্ণ কর মম,
এ আকাঙ্ক্ষা প্রিয়তম,
তুমি আমি ঘুচে দুই
এক হয়ে থাকি।"
"তোমাতেই মিশে যা'ক আমিত্ব আমার,
একটী বাসনা এই,
আর কোন সাধ নেই,
বারে বারে জন্ম মৃত্যু ঘুচুক এবার
তুমি আমি মিলে মিশে হই একাকার।"

প্রকৃত বৈরাগ্য কি?—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা, তাহার প্রতি বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য। দেবী পুষ্পময়ী 'কতদিনে ত্যজিব', 'কেন এত ভাবি' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃত বৈরাগ্যের ছবি আঁকিয়াছেন।

কবি কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"নরদেহ ধরিয়া ধরায়,
বৃথা ত হেথায় আমি নাই,
যা' হয় এ ক্ষুদ্র ক্ষমতায়,
তব কাজ কিছু করে যাই।"

কর্ম্মের ফলটী ভগবানে অর্পণ করিয়া কবিতার শেষে কবি যদি আর চারিটী চরণ রচনা করিতেন, কর্ম্মযোগ সুসঙ্গত হইত বলিয়া মনে করি।

দেবী পুষ্পময়ীর কবিতা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক কবি। তাঁহার 'মন্দার' প্রকৃত পক্ষেই স্বর্গীয় সুষমায় ও পরিমলে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

গোলাপসার। শ্রীযুক্ত এস, পি সেন কৃত এক শিশি গোলাপসার আমরা সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি। প্রথমে শিশি খুলিতেই কি এক অপূর্ব্ব সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি গোলাপের গন্ধে ঘর আমোদিত হইল। বোধ হইল, যেন মহাশয় নন্দন-কানন হইতে কয়েকটি ফুল সংগ্রহ করিয়া এই এসেন্সটী প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী এসেন্স অপেক্ষা ইহার সুগন্ধের কোমলতার মধ্যে যেন কি এক মধুর মোহিনী শক্তি পরিলক্ষিত হইল। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য পরের জিনিস অপেক্ষা এই ঘরের জিনিস অধিকতর প্রীতিপ্রদ, উৎকৃষ্ট ও সুলভ বলিয়া বোধ হইবে।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা,] [কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৷০) প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা।)

কলিকাতা, ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট্ আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কেশরঞ্জন তৈল

কেশের জন্য

কেশরঞ্জন।

কেন না—কেশরঞ্জন কেশকে যেরূপ মসৃণ কোমল কুঞ্চিত, ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিতে পারে—এমন আর কিছুই নাই। কেশরঞ্জন নিত্য মাখিলে চুল উঠা বন্ধ হয়, টাক দূরে যায়, কেশমূল দৃঢ় হয় আর বার্দ্ধক্যে নবীন যৌবন সঞ্চার হয়।

বিলাস ভোগে

কেশরঞ্জন

যাঁহারা একবার কেশরঞ্জন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার গুণে স্পিরিটভরা গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা—ইহাতে শত সহস্র সুগন্ধি মিশ্র-কুসুমের সুরভি সম্ভার সমাহিত। পূজার তত্ত্বে, বিবাহ-ক্ষেত্রে ইহা উপাদেয় উপহার।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	৶০ তিন আনা।

অর্শোহর বটিকা।

আমাদের 'অর্শোহরবটিকা' সেবন করিলে—বহির্বলি ও অন্তর্বলিজাত সর্ব্ববিধ কষ্টকর অর্শ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে ভাবেন, অর্শ-রোগ একবার হইলে আর আরাম হয় না। ইহা তাঁহাদের মহাভ্রম। প্রথম হইতে সাবধান হইয়া আমাদের 'অর্শোহর বটিকা' ব্যবহার করিলে রোগের উপশম ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে রোগ একেবারে নিরাময় হইতে পারে। আমরা দর্প করিয়া বলিতে পারি, যদি অর্শরোগের প্রকৃত ঔষধ কোথাও থাকে, ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। প্রত্যেক রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি কৌটার মূল্য	...	১।০ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	৶০ তিন আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

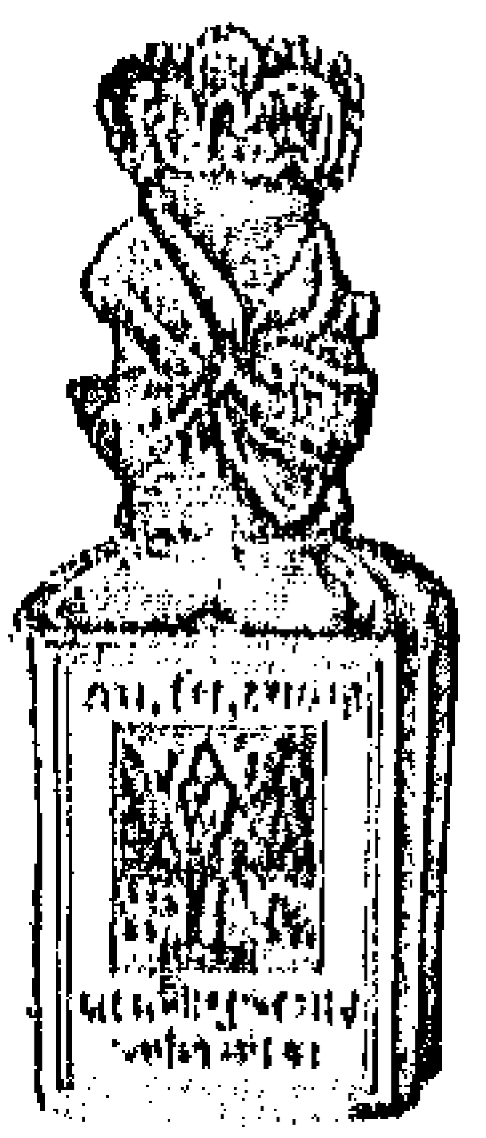
১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"সুরমা" শ্রেষ্ঠ কেশতৈল কেন? সুরমার সুগন্ধ দিবারাত্র চিত্তের প্রফুল্লতাসাধন করিয়া থাকে। সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা জন্মে। সুরমার ন্যায় সহজপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ কেশরাগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। চুল কাল কোমল ও কুঞ্চিত করে।

সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে মাথায় আটা হয় না। চুল বেশ নরম থাকে, কালো চুল আরও কালো হয়। বেণীরচনার সময় চারিদিকে "সুরমার" সুগন্ধ বহিতে থাকে। আর গৃহমন্দিরে শত শত প্রস্ফুটিত বেলা মল্লিকা-চামেলির সুবাস ফুটিয়া উঠে।

মূল্যাদি।—বড় একশিশির মূল্য ৸০ মাশুলাদি।৶০ তিন শিশি ২৲ মাশুলাদি ৸৶০।

স্বদেশী এসেন্স্!



বকুল। আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর। এই বকুলে সিক্ত রুমালখানি বুকে থাকিলে মনে হয়—বুক জুড়িয়া বুঝি বকুলফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দিল্ অব্ রোজ্। একটী ফুলের ফুলসার নহে, কতকগুলি কুসুমের সুমিষ্ট পুষ্পসার একত্র মিলিত। ইহার সৌরভ বলিয়া বুঝাইবার নহে। সকলকে একবার আমাদের 'দিল্ অব্ রোজ' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। প্রতি শিশি ৸০ মাঃ।/০



विरहिणी —दैनिक पत्र।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল [৭ম সংখ্যা।

বিজয়ার সম্ভাষণ।

—()—

শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজার বিজয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকারে আমরা আমাদের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সহযোগিগণকে যথোচিত অভিবাদন করিতেছি। মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা যেন প্রতি বর্ষেই এইরূপ হাস্যমুখে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণপূর্ব্বক ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া স্বদেশের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

আঁধার বঙ্গভূমি—তিন চারি দিনের জন্য দিব্য-প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল। মা আনন্দময়ী আসিয়াছিলেন; দিগ্মণ্ডল আনন্দে পরিময় ছিল; সলিলে, অনিলে, আকাশে, ভূতলে—সর্ব্বত্রই আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল।

এখন আবার—আবার সেই গাঢ় অন্ধকার; বিজয়া-দশমীর বাদ্যোদ্যমের সহিত যখন আদ্যা-শক্তির স্বর্ণপ্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি; রজনীর প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের মর্ম্ম দৃশ্য যখন পাষাণ প্রাণে অশ্রু-নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছে; তখনই বুঝিয়াছি মা চলিয়া গিয়াছেন—যে শ্মশান সেই শ্মশানেই আমরা পড়িয়া আছি। প্রকৃতি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কমল-নয়ন, হেমন্তের নৈশ-শিশির সম্পাতে, পুনরায় অশ্রুধারাভিষিক্ত হইতেছে।

কিন্তু আজ বিজয়োৎসব বলিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে আনন্দসাগরে মগ্ন হইবেন। সম্বৎসরের শত্রুতা ভুলিয়া বিদ্বেষভাব মনোমালিন্য ভুলিয়া, অবমানিত আক্রোশ ভুলিয়া মানব যে বাহুদ্বয়ে শত্রুর প্রাণ সংহার মানসে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল সেই বাহুদ্বয় প্রেমভরে প্রসারণপূর্ব্বক শত্রুকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিবে। আজ আনন্দের সীমা নাই, বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এ আনন্দের দিনে পতিহীনা অনাথিনী বিধবার নীরব রোদন মৃত পুত্র রত্নের জন্য মাতার আর্ত্তনাদ, দরিদ্রের অন্তস্তল সমুত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রবাহ যে বহিতেছে না তাহা নহে। তবে আনন্দ কোলাহলে তাহা ডুবিয়া যাইতেছে। এই মহৎ দিনে সসৈন্য মহিষাসুরের নিধন সাধন হইলে দেবগণ আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দজ্ঞাপক অসুর নারীগণের হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণগোচর হইতে দেয় নাই। এই বিজয়ার দিনে রাবণ বধ হইলে শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যগণ পরিবৃত হইয়া আনন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন। আনন্দরোলে রাক্ষসরমণীগণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি মহোৎসবে মত্ত বানরসৈন্যের কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিয়াছিল? আজ ভারতে সেই বিজয়ার সাম্বৎসরিক মহোৎসব। এই বিজয়া-উৎসব দিবসে পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিতেন। ভারতের রাজপুত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পুরাতন বীরজাতিরা মহাসমারোহে অস্ত্রপূজার উৎসব করিয়া থাকেন। যে খড়্গ, শর, গদা প্রভৃতির সাহায্যে বীর রণে বিজয়ী হয়েন তিনি আজ মহাসমারোহে সেই অস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন। তবে কালের কুটিল গতিতে সেই সকল এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আর বীর অশ্বারোহণ, দান ধ্যান, অতি কষ্টে প্রাণপণ শস্ত্র সমূহ রাখিয়া তাহার পূজা করেন, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের কথা স্মরণ হয় যে বীরগণের নবযৌবনে ভারত পরিপূর্ণ ছিল, যাঁহাদের বাহুবলে ধরা কম্পিত হইত; তাঁহাদের কথা আজ মনে হয় এবং প্রাণের মধ্যে মিলিত হয় না, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসে, আর সেই আশা নবনবভাবে বর্দ্ধিত হইয়া স্থান পাইয়া বেগে ধাবিত হয়। কিন্তু অতি কষ্টে সে আশা সম্বরণ করিয়া সকলের সেই প্রাণ মতে চাপিয়া দশজনের সঙ্গে মিলিয়া আজ বিজয়ার আনন্দে আনন্দোৎসব করিব।

জননীর প্রতি আমাদের মাতৃভক্তি বা দেশভক্তি বিদ্যমান আছে কিনা কে ঠিক বলে তাহা না। একান্তিক আত্মনির্ভর একান্তিক ভক্তিপ্রীত হইয়াও জননীর করুণা আমরা কখন বঞ্চিত নহি। মা যাইবার সময়েও আমাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কি হতভাগ্য আমরা যে, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। শত্রু মিত্রে আত্মজ্ঞানে আলিঙ্গন অভিবাদন বিজয়ার এই সুমধুর পবিত্র উপদেশ মা যে কর্ণে কর্ণে প্রদান করিয়া গিয়াছেন! সে কথা মনে! দিনান্তেই আমরা তাহা বিস্মৃত হইলাম! জগতে আত্মপর ভেদ জ্ঞান একান্তিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর অধিক কি থাকিতে পারে? হিন্দুর "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই ধর্ম্মের কথা। এই ধর্ম্ম যদি সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতে পারি, তবে আর আমাদের অভাব কি — ভাবনা কিসের? তাই বলিতেছিলাম ভাই! মার শেষ উপদেশ যেন বিস্মৃত হইও না। এস

ভাই—শত্রু মিত্র, যে যেখানে আছ, সকলেই আমরা বিজয়ার পর হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন—অভিবাদন করি। জননীর শেষ আদেশ—শত্রু-মিত্রে আত্মজ্ঞান; ভাই এ উপদেশ, যেন জীবনে মরণে কখন বিস্মৃত না হই।

ঁউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

- ৪০৪

এক্ষণে আমরা রাজগৃহের সুপ্রসিদ্ধ গিরিগুহা সমূহের প্রাচীন প্রাচীর মালার, পবিত্র হিন্দু তীর্থ-স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিব্রজ, বৈভার, বিপুল গিরি রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোণাগিরি এই পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপাণি গিরি-গহ্বর বৈভার পর্ব্বতে অবস্থিত। এই খানেই খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে প্রথম বৌদ্ধদিগের সভা আহূত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন বর্ত্তমান শোন-ভদ্র গিরিগহ্বর সপ্তপাণিগুহার নামান্তর মাত্র, এবং এই খানেই বুদ্ধদেব মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গভীর ধ্যানমগ্ন হইতেন। বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে ৩০০ হস্ত দূরে পিপোলো নামক আর একটা গিরি-গুহা আছে। এস্থানটিও বুদ্ধদেবের অতি প্রিয়স্থান ছিল; এবং এই স্থানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর ৫০০ আর্হৎ সমবেত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ ও মীমাংসা করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে বনভূমির মধ্যে, এক সুদীর্ঘ ভগ্ন প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন অজাতশত্রু এই সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৈভার গিরিমালায় আর একটি দুর্গম গিরিগহ্বর আছে। বিপুলপর্ব্বতে সুপ্রসিদ্ধ দেবদত্তগিরিগহ্বর বিদ্যমান আছে। কথিত আছে এখানে একজন ভিক্ষু ত্রিতাপ জ্বালায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। প্রাচীন রাজ-গৃহের বহির্ভাগ প্রকৃতি দেবী পর্ব্বত মালায় সুশো-ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু মধ্যভাগও রাজ-গৃহের সমৃদ্ধির দিনে কৃত্রিম প্রাচীর মালায় পরি-বেষ্টিত ছিল। যদিও সে সমুদয় স্থান এক্ষণে দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় স্থানে পরিণত হইয়াছে তথাপি ইহার ভগ্নাবশেষ আজও পর্য্যন্ত এই জঙ্গলময় প্রদেশে দৃষ্টি গোচর হয়। এবং এই প্রাচীরের পরিধি-পাঁচ মাইলের ন্যূন হইবেনা।

বৈভার এবং বিপুল পর্ব্বতের মধ্য দিয়া স্বরস্বতী নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। এই নদীর জল হিন্দুরা অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই স্বরস্বতী নদীর পশ্চিমে বৈভার পর্ব্বতের পাদদেশে মার্কণ্ডেয় ক্ষেত্র নামে পরম পবিত্র তীর্থস্থান আছে। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নামে দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। স্বরস্বতীর উত্তরে মাধবালয় তীর্থ। মাধব-আলয় তীর্থের কিয়দংশ উত্তরে একটি তীর্থস্থান আছে, এখানে বিভন্দক, গিরিমর্দ্দন, কপর্দ্দক, ব্রত-মোক্ষম এবং ধনেশ্বর নামক পঞ্চ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার দক্ষিণাংশে বনারিতারণ তীর্থ। বৈভার পর্ব্বতের পাদমূলেই ব্রহ্মকুণ্ড, ইহার কিয়দ্দূরে সপ্তর্ষি কুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমাংশে পঞ্চনদ তীর্থ। ইহা একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত এবং ইহার জল পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিপুল পর্ব্বতে সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড, রামকুণ্ড ও শৃঙ্গী কুণ্ড নামে উষ্ণ প্রস্রবণ সমূহ বিদ্যমান আছে। এসমুদয় হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। শেষোক্ত শৃঙ্গী কুণ্ড মুসলমান ফকীরগণ মকদাম কুণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

বৃষ্টি-তত্ত্ব।

—:০:—

"কুজেন সহিতোভানুঃ সমুদ্রমপি শোষয়েৎ।"

"পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ"।

মেঘ হইতেই অন্নের সম্ভব। শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত পৃথিবীর কৃষককুল বৃষ্টিপাতের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জল না হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এবং জলই প্রাণীসমূহের জীবনধারণের প্রধান বস্তু বলিয়াই ইহার অন্যতম নাম জীবন। সাধারণলোকের বিশেষতঃ কৃষি-উপজীবী ব্যক্তিগণের কোন সময়ে কিরূপ পরিমাণে বৃষ্টি ও কোন সময়ে অনাবৃষ্টি হইবে তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। এবং পূর্ব্বে জানিতে পারিলে দৈব-প্রতিকূলতার কথঞ্চিৎ প্রতিকারও করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই বৃষ্টিপাতের উপর শস্যের উৎপত্তি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বৃষ্টিপাতের কারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্নভাবের মত প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন মতের মূল ও উপাদান একটী সামান্য ও সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত। অন্তরীক্ষে অনিল সমূহের (gases) মধ্যে উষ্ণতার হ্রাসই বৃষ্টিপাতের মূল কারণ। যখনই পৃথিবীর কোন স্থানে শুষ্ক বায়ু বর্ত্তমান থাকে, তখনই তদ্দ্বারা বাষ্পীভবন (evaporation) আরম্ভ হয় এবং সেই স্থানের আদ্রতা-অনুযায়ী বাষ্পীভবন সম্পূর্ণ হইতে অধিক বা অল্প সময় লাগে। কিন্তু যে স্থানে বাষ্পীভবন হইতে থাকে সেই স্থানেই যে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কারণ, এমত হইতে পারে যে, বায়ুতে ভাসমান বাষ্পসমূহ মেঘাকারে ঘনীভূত হইয়া দৃশ্যভাবে অথবা অদৃশ্যভাবেই বাতাস কর্ত্তৃক বাষ্পীভবন স্থান হইতে বহুদূরে নীত হয় এবং উক্ত রূপে নীত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের বৃষ্টিরূপে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বাতাস শুষ্ক ও শীতল থাকিলেই বাষ্পীভবন আরম্ভ হয়, কিন্তু সে সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অতি অল্প। ক্রমে উত্তাপের বৃদ্ধি এবং অকস্মাৎ বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তন ও আর্দ্রবাতাসের আবির্ভাবের সহিত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রায়ই দেখা যায়, উত্তাপের আধিক্য বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে কি কারণে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তনঘটে? কেন উত্তাপ বৃদ্ধির পর অকস্মাৎ বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস হয়? আমরা জানি শুষ্ক বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু অপেক্ষা অধিকতর ভারী, সুতরাং শুষ্কবায়ু অন্তরীক্ষের নিম্নভাগে থাকে এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণবায়ু উপরে উত্থিত হয়, ক্রমে বাষ্পীভবনদ্বারা শুষ্কবায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হয় এবং পরে সেই বাষ্প ঘনীভবন (condensation) দ্বারা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। এই ঘনীভবন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বায়ুর যে উষ্ণতার

পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেবল রবির সাময়িক গতি দ্বারাই সাধিত হয় না, কারণ, রবি প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্টদিনে একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, সুতরাং যদি কেবল তাহারই সাময়িক গতিদ্বারা উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে, আমরা প্রতি বৎসরেই এক এক নির্দ্দিষ্ট দিনে এক-স্থানে একপ্রকারই উষ্ণতার পরিচয় পাইতাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না, কোন বৎসর হয়ত গ্রীষ্ম অধিক হয় কোন বৎসর বা শীত অধিক হইয়া থাকে; এবং প্রতি বৎসরেই যে প্রতি ঋতু এক ভাবের হয়, তাহাও নহে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে উষ্ণতার এইরূপ পরিবর্ত্তন রবিরগতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংঘটিত হয়। অবশ্য, রবির সাময়িক গতিই সরিৎসাগরমণ্ডলা শস্যশ্যামলা ধরণীর ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ, কিন্তু তাহা সাধারণ ভাবের। বায়ুর উষ্ণতার দৈনন্দিন, তারতম্য গ্রহসকলের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান ভেদে সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, যখন রাশিচক্রে রবি এবং মঙ্গল অথবা বৃহস্পতি, কিম্বা মঙ্গল ও বৃহস্পতি পৃথিবীর সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করে, অর্থাৎ উক্তগ্রহদ্বয় রাশি চক্রে একত্রে বা ১৮০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত থাকে তখনই উষ্ণতারবৃদ্ধি এবং উক্তভাবে শনি বিদ্যমান থাকিলে উষ্ণতার হ্রাস হইয়া থাকে।

বৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার স্থান আমাদিগের নাই। আমরা সংক্ষেপে ও যাহাতে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে এরূপভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে রাশিচক্রে গ্রহদিগের যেরূপ ব্যবধানে অবস্থিতির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবধানেও উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি সমাহিত হইয়া থাকে। গ্রহদিগের পরস্পরের ব্যবধান জানিতে হইলে তাৎকালিক গ্রহস্ফুট স্থির করিতে হইবে। আজকাল বঙ্গদেশের প্রচলিত পঞ্জিকার মধ্যে অনেকগুলিতেই গ্রহস্ফুট প্রদত্ত থাকে। প্রতি দিনের পঞ্জিকার বাম পার্শ্বে গ্রহসমূহ সেই দিবস কোন রাশির কত অংশে অবস্থিত তাহা উল্লিখিত থাকে। গ্রহস্ফুটগুলিতে প্রথমস্থিত অঙ্কে মেষাদি হইতে ০, ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা রাশি নির্দ্দিষ্ট থাকে, পরবর্ত্তী অঙ্কে অংশ কলাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে। এক এক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, সুতরাং দ্বাদশ-রাশি সম্বলিত রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। এই রাশিচক্রে গ্রহগণের কয়েকটি বিশেষভাবের অবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইবে। যখন একটী গ্রহ অন্য গ্রহের সহিত এক অংশে অবস্থান করে অথবা অন্য গ্রহ হইতে ৬০, ৯০, ১২০ বা ১৮০ অংশ দূরব্যবধানে থাকে তখন তাহাদিগের শক্তির বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়।

মনে কর, ১৫ই বৈশাখের দিন পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল যে উক্তদিবস রবি মেষ রাশির ১৫ অংশে অবস্থিত উক্তদিবস শনি কর্কট রাশির ১৫ অংশে, মঙ্গল কুম্ভরাশির ১৫ অংশে, বৃহস্পতি মেষ রাশির ১৫ অংশে, শুক্র ধনুরাশির ১৫ অংশে এবং বুধ তুলারাশির ১৫ অংশে অবস্থিত। এস্থলে দেখা যাইতেছে রবি বৃহস্পতির সহিত একত্রে অবস্থিত এবং রবি ও বৃহস্পতি হইতে শনি ৯০ অংশ, বুধ ১৮০ অংশ মঙ্গল ৬০ অংশ এবং শুক্র ১২০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত; শনি হইতে বুধ ৯০ অংশ ব্যবধানে, বুধ হইতে শুক্র ৬০ অংশ ও মঙ্গল ১২০ অংশ ব্যবধানে, এবং শুক্র হইতে মঙ্গল ৬০

অংশ ব্যবধানে অবস্থিত। এইরূপে প্রথমে গ্রহদিগের মধ্যে পরস্পরের পূর্ব্বোক্ত ব্যবধান নিরূপণ করিতে হইবে।

গ্রহদিগের মধ্যে রবিকে গ্রহরাজ কহে ; কারণ, রবিই সৌরজগতের কেন্দ্র ও আদি ; মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল গ্রহই তৎসম্ভূত। একমাত্র রবি হইতে সমস্ত জগত আলোকিত ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা, নানাবিধ তরুলতা, নানাবর্ণ ফুল-ফল, পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি জীবপ্রবাহ, নদী, হ্রদ, সাগর ও বিষয়সমৃদ্ধি সকলের মধ্যেই সূর্য্যরশ্মি অন্তর্লিপ্ত। সুতরাং অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা রবির সহিত অপর গ্রহসকলের পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধান বিশেষ ফলপ্রদায়ক। কিন্তু অনেকস্থলে অন্যান্য গ্রহদিগের মধ্যেও উক্তরূপ ব্যবধান ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

আবার, সকলগ্রহের সমান গতি নহে ; কোন গ্রহের গতি শিঘ্র এবং কোন গ্রহের গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু। সুতরাং, গ্রহগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যবধানই একদিনে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় না। উক্ত ব্যবধান যত সম্পূর্ণ হইতে থাকে গ্রহদিগের ফলপ্রদায়িনী শক্তি ততই বৃদ্ধি পায় এবং আবার যতক্ষণ না উক্ত ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের শক্তি কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, গ্রহদিগের মধ্যে উক্তরূপ কোন ব্যবধান সম্পূর্ণ হইবার দুই তিন দিবস পূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে।

বহুবার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে দিবস শনি, শুক্র এবং বুধ, রবি এবং কখন কখন চন্দ্র * হইতে অথবা আপনাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৬০, ৯০, ১২০, ১৮০ অংশ ব্যবধানে বা একত্রে অবস্থিত থাকে সেই দিবস বা তাহার পূর্ব্ব-পর দুই দিবসের মধ্যে বৃষ্টিপাত হয় অথবা বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস হয়। বুধগ্রহে বৃষ্টি অপেক্ষা ঝটিকারই প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, যে দিবস মঙ্গল বা বৃহস্পতি, রবির সহিত একত্রে অথবা পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধানে থাকে, সেই দিবস বা তাহার পূর্ব্ব-পর দিবসদ্বয়ের মধ্যে সাধারণতঃ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ত্তমান ১৯০৭ সালের বিগত জুলাই মাসের ৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত চারি দিবসের কলিকাতা আলিপুরের মানমন্দিরে পরিলক্ষিত বৃষ্টিপাতের তালিকা ও উক্ত দিবসচতুষ্টয়ে গ্রহদিগের ব্যবধান উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রবি
(
৭ই
হই
সা
উপ
হও
অং
মঙ্গ
অংশে

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

* চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়া, অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সমান ফলপ্রদ হয় না। তথাপি সময়ে সময়ে ইহার বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

প্রার্থনা।

—;*:—

দাও, দেখিতে দাওহে, ভুবন মোহন!
তোমারে পরাণ ভরিয়া।
লও, রূপা করি লও হে, মনো হরণ!
আমার মানস হরিয়া॥
প্রভু, তোমার মোহন বাঁশরী শ্রবণে
শ্রুতিযুগ যাক্ গলিয়া।
যাক্ অহরহ যাক্, তব গুণগানে,
রসনা অবশ হইয়া॥
দাও, পরশমাণিক, চরণ পরশে,
মমতা বাঁধন খুলিয়া।
তব, স্বরূপ-মাধুরী দেখিহে হরষে
বিষয়-বাসনা ভুলিয়া॥

বিনীত—
শ্রীগৌর গোপাল সেন।
মালদহ।

বঙ্গভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের পরিভাষা।

—:•:—

যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজি হইতে অনুবাদাদি করিব সে পর্য্যন্ত একমাত্র তদ্ শব্দের রূপ আমাদের জানা থাকিলেই যথেষ্ট। ব্যবহারতঃ সুবিধার জন্য সম্প্রতি আমরা নিতান্ত কার্য্যানুরোধে নিম্নলিখিত ভাবে কেবল তদ্ শব্দেরই রূপচয় ব্যবহার করিয়াছি।

তদ্ স্ত্রীলিঙ্গে একবচনে।

কর্ত্তা	সা	She
কর্ম	তস্যাকে	her
করণ	তস্যাকর্ত্তৃক, দ্বারা	by-her
সম্প্রদান	তস্যাকে	to her
অপাদান	তস্যা্ হইতে	from her
সম্বন্ধ	তস্যার	her or hers
অধিকরণ	তস্যাতে	in her

তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে যেমন "তাহা শব্দ মূল; এথায় অতি প্রাচীন ব্যবহৃত "তস্যা" শব্দকে মূল ধরিয়া তাহাতে চলিত বিভক্তিচয় যোগ করিয়া তাহাদের রূপচয় প্রদত্ত হইল।

"তস্যার" এই ষষ্ঠ্যন্ত স্ত্রী-সর্ব্বনামের ব্যবহার আমাদের নূতন নহে; অনেক প্রাচীন দলিলপত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। "ভবদাসীর স্বামীবিয়োগের দুই মাস পরে "তস্যার" তৃতীয় পুত্রের জন্ম। * * " প্রকাশ থাকে যে "তস্যার" গর্ভলাভের পূর্ব্বেই "তস্যার" পুত্রেরা মাতার জীবনে এই সম্পত্তি খরিদ করেন।" এতাদৃশ "তস্যার" ব্যবহার বাঙ্গালায় অনেক পূর্ব্বকাল হইতে আছে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। কোন কোন প্রাচীন দলিল পত্রাদিতে "তস্যাকে' শব্দের ও ব্যবহার দেখা যায়. "যদিচ রূপলতার পিতা "তস্যাকে' ভালবাসিত" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই কাল হইতে বোধ হয় "বিলাসমণি দাস্যার' সম্পত্তি; "কৃপাময়ী দাস্যাকে" তাহার মাতুল এই সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন; এইরূপ লেখা হইতেছে। উক্ত কাল হইতেই পুং আদি "তাহার" স্থানে "তস্

শব্দের অসংখ্য ব্যবহার দেখা যায়। ঘটকদিগের কুরসি নামাতে দেখিবে "তস্যা পুত্র অমুক, তস্যা পুত্র অমুক ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং স্ত্রী সর্ব্বনাম জন্য "তস্যা" শব্দকে মূল শব্দ ধরা বোধ হয় আমাদের নিতান্ত অন্যায় হয় নাই। এই সমস্ত ব্যবহার ঠিক সংস্কৃতের সূত্রানুযায়ী শুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারে চলিত, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্যসাধক। এবং স্ত্রী-সর্ব্বনাম যে, বঙ্গভাষার জন্য প্রয়োজন তাহাতেই প্রমাণ সন্দেহ নাই।

ইহাদের দ্বিবচন "দ্বয়" যোগে হইবে। যথা ঃ সাদ্বয়, তস্যাদ্বয়কে, তস্যাদ্বয় দ্বারা বা কর্ত্তৃক, তস্যাদ্বয়কে, তস্যাদ্বয় হইতে, তস্যাদ্বয়ের, তস্যাদ্বয়েতে।

ইহাদের বহুবচন "গণ" এবং "দিগ" যোগে হইবে। যথা ঃ—তস্যাদিগকে, তস্যাদিগের কিংবা তস্যাদিগ-কর্ত্তৃক, তস্যাদিগকে, তস্যাদিগের হইতে কিংবা তস্যাদিগ হইতে, তস্যাদিগের কিম্বা তস্যাদের, তস্যাদিগেতে।
সম্মানার্থ প্রয়োগ প্রচলিতমত চন্দ্রবিন্দু দ্বারা হইবে। যথা ঃ—সাঁ, তাঁস্যাকে তাঁস্যার ইত্যাদি।

যখন বঙ্গভাষার সৌভাগ্য সময় আসিবে এবং জাপান, চিন, জর্ম্মন, ফেঞ্চ ইত্যাদি নানা ভাষা হইতে "নানাবিধ আবশ্যকীয় বিষয় অনুবাদ করিতে হইবে তখন স্ত্রী সর্ব্বনামের সাধারণ পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন হইবে তাহা যেন প্রাণের ভিতরে কেহ বলিয়া দিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, এল্, এম্, এস্।

সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয়।

—:০:—

গাঁয়ের একপাশে আমাদের কুঁড়ে ঘর। বাবা বিদেশে চাকুরী করেন। কাকা আমাদের ঘর সংসার দেখ্তেন। কাকা লোকটী খুব সাদাসিদা রকমের, প্রাণটা বড়ই খোলা। তিনি নামেই সংসার দেখ্তেন; বস্তুতঃ ঠাকুর মা যা কর্তেন তাই হোতো, তবে ফাইটা ফরমাসটা মাঝে মাঝে কাকা শুন্তেন এই যা তাঁর সংসার দেখা। নতুবা সারাদিন কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন আর পরের ব্যাগার দিতেন। ঘরের ছাড়া অপর যাহারই কোন কাজ হোক্ না সব যেন তাঁর নিজের কাজ, কাঠ কাটিতে হইবে লোকে কাকাকে ডাকে; ঘর ছাইতে হবে কাকাকে ডাকে; কাহারও বাটী বিবাহে পরিবেশন করিতে হবে—কাকাকে ডাকে। অমুক লোককে অমুক জায়গায় রেখে আস্তে হবে—কাকা বলেন "চল যাচ্ছি।" কেহ বলে "ওহে আমার এই কাজটা করে দাওনা ভাই।" কাকা অমনি প্রস্তুত। সন্ধ্যার সময় কেহ যদি বলে, "ওহে, আমাদের পাতকুয়ায় ঘড়াটা পড়ে গেছে, তুলে দেবে?" অমনি কাকা এক থাব্‌লা তেল মাথায় দিয়া পাতকুয়ার ভিতরে নামিল। বিয়ের কি বারয়ারীতলার আসর তৈয়ার করিতে হইবে কাকার ডাক পড়িল—বাঁশের উপর কাকার কাটারি ঘন ঘন চলিতে লাগিল। গাঁয়ের লোকের যখন যা দরকার হয়—কাকাকেই ডাকে। কাকাও কোন কাজে "না" বলেন না। ঠাকুর মা এইজন্য কাকাকে তিরস্কার করিলে, কাকা বড় রাগ করিতেন ও সে

দিনস গাঁয়ের মুদীর যে বেশ দুপয়সা লাভ হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাকার শরীর খানি বেশ কালো কালো হৃষ্ট পুষ্ট; মুখখানিতে সরলতা মাখান। সবাই তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর কাজ পছন্দ করে। তবে কাকার মেজাজ্‌টা গাঁ করিয়া চটিয়া যায়, এইটুকু তাঁর দোষ।

আমাদের গাঁয়ে এক চোর ছিল। ছেলেবেলা থেকে চুরি করিতে করিতে তাহার বহুদর্শিতা জন্মিয়া গিয়াছিল। এখন বুড়ো হয়েছে ব'লে সব কাজ আর একলা পারিয়া উঠিত না। সুতরাং, রোজগারটা কম হওয়ায় ও একলা আর না পারায় একটা জোগাড় ধরিবার উদ্দেশে একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাটী আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর মা তখন ভাত চড়াইয়া উনানে ধীরে ধীরে জাল দিতেছিল এবং মাঝে মাঝে উনান নিবিয়া ধোঁয়া হইতেছিল বলিয়া, ফুঁ পাড়িয়া, ধোঁয়া লাগা চোখ বুজিয়া, দাঁত মুখ সিটকাইয়া উনানের পিতৃপুরুষের উপর গালি বর্ষণ করিতেছিল।

এমনসময় চোর আসিয়া ধীরে ধীরে কাকার নাম ধরিয়া ডাকিল। ঠাকুরমা চোরকে চিনিতেন এবং এই সময় তাঁহার মেজাজ গরম ছিল, সুতরাং তাহাকে গালি দিয়া বাটী হইতে দূর করিলেন।

কাকা প্রায়ই ঝোঁকে থাকিতেন, এবং প্রায়ই যে কাজ করিতে বারণ করা হইত আগে তাহাই করিতেন পরে অনুতাপ ইত্যাদির কথা ভাবিতেন।

ঠাকুরমাকে চোরকে বকিতে দেখিয়া কাকার রাগ হইল। কাকা তাহাকে আস্তে আস্তে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হে, কি চাও?—মায়ের কথা শুন না, তোমার কি দরকার বল দেখি?' তখন চোর তাহার কাছে গিয়া বলিল, "ওহে, একটা কাজ কত্তে পার?"

কাকা। কি কাজ?

চোর। দেখ, আমি চুরি চামারী করি, তা'ত তুমি জানই। তা' আমি একা ত আর আজকাল পেরে উঠ্‌ছিনা। তুমি আমার সঙ্গে যোগাড় দিতে পার? আমি তোমাকে কিছু বকরা দিব।"

কাকা নেহাৎ সরল লোক, ভাল মন্দ বিশেষ একটা কিছু বুঝেন না। বিশেষ, তাঁর কখনও কোন কাজে "না" বলা অভ্যাস নাই। 'যোগাড় দিবার' কথা শুনিয়া তিনি অম্লান বদনে কহিলেন, "তা পারবোনা কেন? কি ক'ত্তে হবে?"

চোর কহিল, "বেশী কিছু না। সে সব পরে টের পাবে। মোট কথা এই, যে আমি যেমন যেমন বল্‌ব', তোমায় তেমনি তেমনি কত্তে হবে। বুঝেছ ত?"

কাকা কহিলেন, "তা পারবো।"

চোর। আজ রাত্রেই এক জায়গায় যেতে হবে। তবে, তুমি এখন খাওয়া দাওয়া কর। রাতে আমি এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। তুমি জেগে থেক'। আমি এখন যাই।

এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। ঠাকুরমা কাকাকে যারপর নাই বকিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। কাকা যখন একটা গোঁ ধরিয়াছেন তখন কিছুতেই ছাড়িবেন না। তিনি বলিলেন, "একবার সঙ্গে যাব, তাতে আর হয়েছে কি?"

ঠাকুরমা। যদি পুলিসে ধরে?

কাকা। দৌড়ে পালিয়ে আস্‌বো।

ঠাকুরমা বেগতিক দেখিয়া চুপ করিলেন। পরে আমরা সকলে খাওয়ার পর ঘুমুতে গেলাম।

রাত্রি দশটা হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে এখন ত গভীর রাত্রি। কোথায়ও সাড়া শব্দটী নাই, মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের চীৎকার আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। এমন সময়ে চোর আসিয়া আস্তে আস্তে কাকাকে ডাকিল। কাকা উঠিয়া চোরকে দরজা খুলিয়া দিলেন।

চোর কহিল, "চল, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। দেখ, তোমাকে আমি যেমন যেমন ক'ত্তে বল্‌বো ঠিক সেই রকম ক'র্‌বে। বুঝেছ'ত ?"

কাকা, "আচ্ছা" বলিয়া একখানি গামছা কাঁধে লইলেন, এবং ঘর বন্ধ করিয়া চোরের সঙ্গে চলিলেন। পথে কি হইয়াছিল তাহা আমি নিজে দেখি নাই, পরে কাকার মুখে যাহা শুনেছিলাম তাহা বলিতেছি।

চোর ও কাকা দুজনে পথে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া, শেষে এক গৃহস্থের বাড়ী পঁহুছিলেন। চোর সেই বাড়ীর পিছনে পাঁদাড়ে কাকাকে বসাইয়া চুপি চুপি কহিল, "দেখ, তুমি এইখানে চুপ ক'রে বসে থাক। আমি আসছি।" কাকা বলিলেন "আচ্ছা!" কাকা পাঁদাড়ে লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। চোর দেওয়ালে সিঁদ কাটীয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কাকা পাঁদাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এ কি তাঁর পোষায় ? অনেক দেরী হইল, চোর আর ফিরিয়া আসে না। সেখানে মশা বোঁ বোঁ করিতেছে ও কাকার সর্ব্বাঙ্গে কামড়াইতেছে। বেচারা অনেকক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। "ভাল বিপদ! আরে দূর!" এই কথা বলেন আর চটাস্‌ পটাস্‌ চড় মারিয়া গায়ের মশা মারেন। তারপর যখন দেখিলেন, চোর তখনও ফিরিতেছে না, তখন চটিয়া গিয়া, পাঁদাড় হইতে বাহির হইয়া, সিঁদের ভিতর দিয়া একবারে বাটীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। ছুটা চারিটা মশা বোঁ বোঁ করিতে করিতে সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তাহাতে তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আরে গেলো যা! আবার এখানেও ?" এই বলিয়া মশা মারিবার জন্য নিজের পিঠে মাথায়, গালে, চটাপট্‌ চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে গৃহস্থেরা জাগিয়া উঠিল এবং "কেরে ? কেরে ?" করিতে করিতে বাহিরে আসিল। চোর বেগতিক দেখিয়া, আগেই চম্পট দিল। কাকাকে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তুই এখানে কেন ?"

কাকা মহা চটিয়া, অথচ সম্মানের সহিত উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, মশাইয়ের বাড়ীতে সিঁদ হয়েছে!

তখন তাহারা আলো জ্বালিয়া সিঁদ দেখিতে পাইল। ভাবিল, কাকা বুঝি চোর ধরিতে আসিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া পরদিবসের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিল।

পথে আসিয়া চোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চোর কহিল, "তুমি কি কল্লে বল দেখি ? সব মাটী কল্লে ?"

কাকা। তা ভাই, আমি কি কর্‌বো বল ? যে মশা কামড়াতে লাগলো ? আর তুমিও অত দেরী কত্তে লাগ্‌লে। আমার রাগ হয়ে গেল।"

চোর। আচ্ছা, তবে চল, আর একজায়গায় যাই।

এই বলিয়া তাহারা অন্য এক বাটীতে উপস্থিত হইল। চোর সিঁদ কাটিয়া কাকাকে বলিল "এবার তুমি যাও। গিয়ে, জিনিষ পত্র নিয়ে এসে

আমাকে দাও। খুব চুপি চুপি যাও। দেখ যেন দোর খুলতে শব্দ না হয়।"

কাকা ঘাড় নাড়িয়া বাটীর ভিতর ঢুকিলেন। একটী দরজায় গিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিলেন। তাহাতে কোঁ করিয়া একটু শব্দ হইল। কাকা চমকিয়া, হাত গুটাইয়া চুপিচুপি কহিলেন, "এই যা বারণ করেছে তাই!" একটু থামিয়া আবার দরজাটা আর একটু ঠেলিলেন। পুনরায় শব্দ হইল। কাকা এইবার চটিলেন। মুখ ভ্যাং চাইয়া একটুচেঁচাইয়া কহিলেন, "আবার"? একটু পরে আবার আর একটু বেশী করিয়া দরজাটা ঠেলিলেন। এবার খুবজোরে শব্দ হইল "কোঁ—ওঁ ওঁ।" কাকার আর সহ্য হইল না। একেবারে রাগিয়া কহিলেন, "কেবলকোঁ—! আচ্ছা, কত কোঁ করবি কর্‌!" এই বলিয়া দরজার কপাট ধরিয়া একবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিলেন। দরজা কাতর হইয়া "কোঁ-কোঁ" শব্দ করিতে লাগিল।

এদিকে চোর দেখিল, মহা বিপদ! এখনই হয়ত গৃহস্থ জাগিয়া উঠিবে। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া অন্যধারে লইয়া গিয়া কহিল, এ ঘর নহে, ঐ ঘরের জিনিস পত্তর সরিয়ে এই খানে নিয়ে এস। আমি এই খানে দাঁড়িয়ে রহিলাম।"

কাকা ঘাড় নাড়িয়া অন্য ঘরে ঢুকিলেন অনেকক্ষণ পরে চোরের নিকট আসিয়া কহিলেন, "ও ভাই, কি আনবো"?

চোর কহিল, "দূর বোকা; এতক্ষণ পরে শুধুহাতে এসে বলেঁ কিনা কি আনবো? যাও বেশ একটু ভারি জিনিস, যা বাজে এমন ধারা দেখে নিয়ে এস। বাজিয়ে নিয়ে আসবে বুঝেছ"?

কাকা আবার গেলেন। গিয়া দেখিলেন একখানা খোল দেয়ালে ঝোলান আছে। ভাবিলেন "এইত বাজে!" আর ইতস্ততঃ না করিয়া, খোলটাকে গলায় দিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন। বাজনার শব্দে গৃহস্থ জাগিয়া উঠিল। বলিল "কেরে? কেরে? খোলবাজায় কে?" কাকা দৌড়িয়া তখন সিঁদের কাছে আসিয়াছেন। গৃহস্থ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ওদিকে চোর তাহাকে বাহির করিবার জন্য সিঁদের ভিতর দিয়া টানিতে লাগিল। খোল গলায় থাকায় কাকা সিঁদে আটকাইয়া গেলেন। চোরও বেগতিক দেখিয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। গৃহস্থ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই খোল নিয়ে যাচ্ছিস কেন?"

কাকা। আমাকে বাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে যে।

গৃহস্থ। কে বাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে?

কাকা তখন আগাগোড়া সব কথা বলিলেন। গৃহস্থেরাও হাসিয়া খুন। তাহারা কাকার সাহয্যে চোরকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহার কয়েদ হইল। কাকাও আর কখনও ঠাকুরমার অবাধ্য হইতেন না।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দাসী।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

—— :0: ——

জলের মধ্যে যত প্রকার রূঢ় বা যৌগিক পদার্থ আছে তদ্ব্যতীত খোল, পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র, তাহাদের শরীরের ও বৃক্ষলতা পাতার পচানী, মনুষ্যের খাদ্য ভাত, ডাল প্রভৃতি এই সকলই মৎস্যের খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ও খোলে নাইট্রোজান ও প্রাফ্‌রস্ মিশ্রিত অম্লের ভাগ অত্যন্ত বেশী। কার্পাস বীজের খোল অত্যুৎকৃষ্ট ইহাতে হাজার করা নাইটারজান্‌, ৬৬০ ভাগ প্রাফ্‌রস মিশ্রিত অম্ল ৩১২ ভাগ থাকে। খোল মৃত্তিকা কি অন্য কোন মৎস্য খাদ্যোপযোগী দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পচাইয়া জলে ফেলা উচিত। (২) গোময় মৎস্যের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য; ইহা ভিন্ন অশ্ব, ছাগোল, শূকর, মেষ কুকুর প্রভৃতি পশু সকলের বিষ্ঠাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। (৩) জন্তুর চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি পচা কিম্বা পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইলে মৎস্যের উত্তম খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কেঁচো ছোট ছোট অব্যবহার্য্য মৎস্য পচাইয়া সময়ে সময়ে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের অব্যবহার্য্য এমন অনেক ছোট ছোট মৎস্য আছে যাহা পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের খাদ্য হইতে পারে। (৪) শম্বুক সচরাচর জলে থাকে, এবং মৎস্যের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। মৎস্যের পোনার পক্ষে শম্বুক ও গেঁড়ি ভাঙ্গা বিশেষ উপযোগী। (৫) যে পুকুরে মৎস্যের চাস করা যাইবে তাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগের আহারীয় পদার্থ অর্থাৎ পর্য্যুষিত ডাল, ভাত ইত্যাদিও ফেলা উচিত এবং খাবার নাগাদ পুকুরে নিষেধ করা উচিত নয়। (৬) সমস্ত পুকুর ব্যাপিয়া দাম থাকিলে মাছের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না কিন্তু পুকুরে খানিকটা দাম রাখা উচিত এতদ্ভিন্ন পুকুরে পানিফলের চাস করিতে দেওয়া মন্দ নয়। পুকুরে পানিফলের চাস করিতে দিলে চারিপার্শ্বে যেন চাস করা না হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব খোলা রাখা নিতান্ত উচিত, কারণ কতক গুলি পুষ্পের ন্যায় মৎস্যেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে ইহারা সূর্য্যোদয় হইলে জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তে এবং অস্ত যাইবার সময় পূর্ব্বপ্রান্তে যাইয়া ক্রীড়া বা বিচরণ করিতে থাকে।

আলো হইতে বঞ্চিত থাকা কোন জীবেরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে। (৭) মৃত্তিকায় যবক্ষার জান্‌, পটাস্‌, ফসফরিক অম্ল প্রভৃতি যৌগিক ও রূঢ় পদার্থ আছে, সময়ে সময়ে গোময় ও মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া পুকুরে ফেলা যাইতে পারে। উপরে যতগুলি খাদ্য লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন কুঁড়ো মদের গেঁয়া, পনির, পাউরুটি, মুড়ি, আলু, পচা, গলিতপত্র, পাঁক, গেঁড়ী, প্রভৃতি অনেক রকম পদার্থ আছে, যাহা মৎস্যের খাদ্যের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে। জলাশয়ের নিকটে গোশালা সংস্থাপিত হওয়া মন্দ নয় এবং গোশালা হইতে দুই একটী প্রণালী জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। নিকটে রজকের বাসস্থান থাকিলে ভাল হয়। রজকগণ যে সকল মলিন বস্ত্র পুকুরে ধৌত করিবে তাহাতে মৎস্যের উপকার ভিন্ন অপকারের আশঙ্কা নাই।

এক্ষণে কি উপায়ে মৎস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার উপায় সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এতদ্দেশে অনেককাল হইতেই

মৎস্যের পোনা পুকুরে ছাড়িয়া মৎস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার একটী উপায় চলিয়া আসিতেছে। মৎস্য ব্যবসায়ী জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে মৎস্যের পোনা ধরিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আজকাল অনেক জেলে নদী হইতে মৎস্যের ডিম্ব ধরিয়া মৎস্য জন্মাইতেছে। এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে অল্প ব্যয়ে যে অনেক মৎস্য জন্মান যাইতে পারে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের বড় বড় নদী, খাল, বিল, পুকুরে মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী যত জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যে সকল মৎস্য সমুদ্র কিম্বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, কেবল বর্ষা ঋতুতে ডিম্ব প্রসব করিবার সময়ে অথবা আহারীয় দ্রব্যের জন্য সময়ে সময়ে অপ্রশস্ত নদী ও খালে যাতায়াত করে ঐ সকল মৎস্যকে স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং যে সমুদয় মৎস্য নদী, খাল, বিল ও পুষ্করিণীতে সদা সর্ব্বদা বাসকরে, ডিম্ব প্রসব বা আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিবার জন্য কখন স্থানান্তরে যায় না তাহাদিগকে স্থান অপরিবর্ত্তন-শীল মৎস্য কহে। ইলিস, ভোলা, খরশুন জাতীয় মৎস্য প্রথম শ্রেণী এবং রোহিত, মিরগাল কাতলা, কৈ, মাগুর, প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। রোহিত মিরগাল কাতলা জাতীয় মৎস্যগুলিকে আপাততঃ স্থানপরিবর্ত্তনশীল মৎস্য বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ইহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। উপরি উক্ত মৎস্য সমূহের ডিম্বাদি কি পোনা সাধারণতঃ আমরা নদী খাল ইত্যাদি স্রোত জল হইতে প্রাপ্ত হই।

ক্রমশঃ

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

হোমিওপ্যাথি ও অস্ত্রচিকিৎসা।

—(১)—

সাধারণের মধ্যে একটি বড়ই ভুল বিশ্বাস আছে যে হোমিওপ্যাথি মতে অস্ত্র চিকিৎসা নাই। এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস যে কতই ভ্রমসঙ্কুল তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অস্ত্রোপচার একটি চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ এবং উহার সহিত আলোপ্যাথদিগের ও যেমন সম্বন্ধ হোমিওপ্যাথগণের সহ ও তেমনি সম্বন্ধ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আজিও স্থানে স্থানে নূতন মতের চিকিৎসা বলিয়া বিদিত রহিয়াছে। এখানে উহা এখনও উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে অস্ত্রোপচার প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ের সমুদয় উচ্চাঙ্গলাভ করিয়া perfect বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই। আমেরিকা ও ইয়ুরোপের নানা স্থানে এই মতের চিকিৎসা পুরাতন মতাপেক্ষা কোন অংশেই কোন বিষয়ে ন্যূন নহে। আলোপ্যাথ হাঁসপাতালেও যেমন প্রভূত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেইরূপ হোমিওপ্যাথি হাঁসপাতালেতে সুন্দর অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবেআলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথদিগের মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসার বিশেষ মতদ্বৈধতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্তগণের মতে অস্ত্র-চিকিৎসার সুবিধা ও উপায় থাকিলেই উহা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে কিন্তু শেষোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন যে যাহা ঔষধেই সুসাধ্য হইবে তাহার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিয়া রোগীকে কষ্ট দেওয়া যায়

কেন? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ফলে উক্ত মতাবলম্বীগণেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ রোগীর যন্ত্রণা উপশম করিয়া ব্যাধিমুক্ত করা।

আমরা অস্ত্র-চিকিৎসার বিরোধী নহি তবে যথা-সাধ্য চেষ্টাদ্বারা ঔষধ প্রয়োগেই ব্যাধিনির্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। যেখানে অস্ত্র প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া থাকি তথায় বাধ্য হইয়া তাহার সাহায্য লইতে হয়। অস্ত্র প্রয়োগের যেমন সুফল দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ অনেক স্থলে কেবল মাত্র যে উহারই জন্য বিষময় ফল ফলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে কিন্তু হোমিও-প্যাথি মতের চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগ জনিত কোন প্রকার মন্দফল ফলিয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। পীড়াবিশেষে ইহাতে দেখা গিয়াছে যে অস্ত্রপ্রয়োগে পীড়া এককালীন আরোগ্য না হইয়া উপশম হইয়াছে মাত্র কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে যাহা উপশম হইবে তাহা একেবারে radically আরোগ্য হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে অস্ত্র প্রয়োগ অপেক্ষা হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় আমরা দুইটি a vantage লইতেছি যথা, (১) পীড়ার মূল উৎপাটিত হইয়া এককালীন আরোগ্য হওয়া; (২) ঔষধ প্রয়োগ জনিত আশু মৃত্যুভয় সম্ভাবনা না থাকা। ভাবিয়া দেখিলে ইহা সামান্য সুবিধার কথা নহে। আমরা বহুসংখ্যক রোগীতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতে পারি কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্থানাভাব। সদ্য অস্ত্রোপচার না করিলে যে রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন এমত রোগীও আমাদিগের হস্তে আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। হোমিও-প্যাথির পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের পরিচয় নহে! নিম্নে একটি রোগীর বিবরণ দিয়া পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমান্ গণেশচন্দ্র দে হিন্দুবালক, বয়স ১০।১২ বৎসর পিতার নাম শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে নিবাস কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সিমলা পোঃ অঃ।

৩ মাস পূর্ব্বে একদিন প্রাতে আমার ডাক্তার খানায় আসিয়া উপস্থিত। পরীক্ষায় দেখিলাম তাহার গলদেশের উত্তর পার্শ্বে দুইটি কমলা লেবুর ন্যায় গণ্ড উত্থিত হইয়াছে, উহা অতিশয় নরম তুল্ তুল্ করিতেছে—দেখিলেই পুঁয সংযুক্ত হইয়া থাকিয়াছে বলিয়া বোধ হয় কিন্তু কোন প্রকার লাল হয় নাই বা তাহাতে কোন বেদনা নাই। গলদেশে ইতঃস্ততঃ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই চারিটি কাটালের বিচির মত গণ্ড রহিয়াছে দেখা গেল। বালকটির আকৃতি গৌরবর্ণ স্ক্রফুলা ধাতুর constitution কিন্তু স্থূলকায় নহে। শুনিলাম যে প্রায় ৪ মাস হইবে পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে এবং ঐ গণ্ডদ্বয় ক্ষুদ্রাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ একজন কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষো-ত্তীর্ণ কৃতবিদ্য বিচক্ষণ আলোপ্যাথ চিকিৎসক দেখিতেছিলেন। এ যাবৎ তাঁহাদের বিদিত সমুদয় প্রকার ঔষধ প্রয়োগে উহা বসাইতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বা ফাটাইতে পারেননাই। আজ কয়েকদিন হইতে বলিতেছেন যে অস্ত্র ব্যবহার ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। বালকের পিতা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে হোমি-

ওপ্যাথি দেখাইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রথমে এক জন সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথের দ্বারা ৮।১০ দিবস চিকিৎসান্তে আমার নিকট লইয়া আসেন। সমুদয় অবস্থা দৃষ্টে রোগমুক্ত হইতে বিলম্ব হইবে আমি বলিয়া দিলাম এবং ইহাও সাহস করিয়া বলিলাম যে বিনা অস্ত্র ব্যবহারে শুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগেই উহা আরোগ্য করিব। মহাত্মা হানিমানের আবিষ্কৃত ঔষধই যে আমাদের উক্ত সাহসের মূল তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শশী বাবুর একটি জামাতা লিভারের ফোটকে অস্ত্র-ব্যবহারে মারা গিয়াছিল সুতরাং তিনি যে আমার আশ্বাসবাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে অস্ত্র প্রয়োগের লোভ সম্বরণ দুষ্কর। বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে অস্ত্র প্রয়োগ করি কিন্তু বালকের পিতার কথা শুনিয়া তাহাতে বিরত হইলাম অন্য অবস্থায় হইলে হয়ত আমিও প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগে উহা কর্ত্তন করিতাম।

যাহা হউক উভয় গণ্ডদ্বয়ের উপর গরম পোল্‌টিস্ মসিনার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে মার্কুর্ আইড ব্যবস্থা করিলাম। ৩ দিবস পরেই দেখিলাম একটি গণ্ড আপনা হইতে ফাটিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে কোন প্রকার পূঁয বা রক্ত নির্গত না হইয়া কেবলমাত্র জল এবং সাদা লিম্ফ (lymph) বহির্গত হইতেছে। আমি টিপিয়া আরও বাহির করিয়া দিলাম। ক্যালেণ্ডুলায় ক্ষত আরোগ্য হইতে অধিক বিলম্ব হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। অন্য গণ্ডটি দেখিলাম যে আরক্ত হইয়াছে এবং সামান্য বেদনা তাহাতে আছে। পুনরায় গরম মসিনার পোল্‌টিস্ ব্যবস্থা করিয়া হিপার (৬) ব্যবস্থা করিলাম। পুনরায় ৩দিন পরে দেখিলাম যে সেটিও ফাটিয়া গিয়াছে। এটি হইতে কেবল জল ও lymph বহির্গত হইল। এখন দুটির আকার অনেক গলিয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে ক্যালকে আইয়ড কয়েক দিবস দিয়া সমুদয় ঔষধ বন্ধ রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা করিয়া ক্যাল্‌কে ব্রা (৩০) দিতে লাগিলাম। উক্ত গণ্ডদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড ছিল তাহাও ক্রমে উহা ব্যবহারে মিলাইয়া আসিল। মধ্যে দুটি ক্ষুদ্র গণ্ড একটু আকারে বড় হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহাও মিলাইয়া গেল। ক্ষত সারিবার জন্য এখন কেবল সাইলিসিয়া (২০) ৪ দিবস অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। ফাটিয়া যাইবার পর হইতেই ক্যালেণ্ডুলা অইল-বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দিয়াছিলাম।

এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং হোমিওপ্যাথির অমোঘতায় বালকটিকে দেখিলে একবার মনেও ধারণা হয় না যে উহার গলদেশে সেইরূপ গণ্ড ছিল। কোন ফোড়া ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগে কাটিলে যেমন ক্ষত মিলাইয়া একটি চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ তাহার গলদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বন্ধুবর্গের অনেকেই উহা শ্রবণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বালকটিকে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হোমিওপ্যাথি বিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে উহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "জল ঔষধ" সেবনে কেমন করিয়া এত বড় কার্য্য সাধিত হইল।

এইরূপ নানা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন টিউমার বিনা অস্ত্র সাহায্যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে আমরা দেখাইতে পারি। বিশেষতঃ রমণীগণের ডিম্বা-

শরিক অথবা আরায়বিক নানা প্রকার পীড়িত, টিউমার অথবা কাঠিন্য, যাহা আলোপ্যাথ মতে অস্ত্র সাহায্য ব্যতীত আরোগ্য হইতে পারে না বলিয়া স্বীকৃত তাহা আমাদের ঔষধ ব্যবহারে একেবারে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

এক্ষণে আর একটি রোগীর কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাম কর্ণের ম্যাষ্টয়েড্ উচ্চতার (mastoid process) একটি ক্ষুদ্র আঁচিলের ন্যায় একটু দেখা দেয়। তিনি প্রথমে উহা আঁচিল বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে উহা হইতে সামান্য স্পর্শ মাত্রই প্রভূত রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইল। আমার নিকট আসিয়া বলাতে আমিও প্রথমে আঁচিল ভাবিয়া একমাত্রা থুজা ৩০ প্রয়োগ করিয়া ঐ অর্ব্বুদটি ঘোড়ার বালামচি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলিলাম। ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল এবং রক্ত পড়া থামে না দেখিয়া অর্ব্বুদটি পাকাইয়া দিবার জন্য হিপারসল্ফর (৬) ব্যবস্থা করিলাম এবং পুনরায় উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া রাখিতে বলিলাম। এবার রক্ত পড়া কমিয়া ক্রমে উহা শুকাইয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে পুনরায় সেই স্থানেই আবার সেই অর্ব্বুদ দেখা দিল এবং সামান্য হাত লাগা অথবা কোন প্রকার স্পর্শ মাত্রেই প্রভূত লাল রক্তের স্রাব হইতে থাকিল। প্রত্যহ ঐ প্রকার রক্তপাত দেখিয়া তিনি একটু ভীত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হোমিওপ্যাথ মতে ইহার কোন ঔষধ আছে কিনা?

তাঁহার একজন বন্ধু ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জ্জন পরামর্শ দেন যে উহা বিনা অস্ত্র প্রয়োগে আরোগ্য হইবে না। এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইতেছে বলিয়া কতক উপহাস করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন যে বাস্তবিক আমি আরোগ্য করিতে পারিব এই বিশ্বাস চিকিৎসা করিতেছি কিনা? বলা বাহুল্য যে প্রফুল্ল বাবু আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু সুতরাং শুদ্ধ মাত্র পসারের জন্য আমি তাঁহাকে বৃথা আশ্বাস দিতে ছিলাম না। যাহা হউক ক্রমশঃ উপকার না দেখিয়া তিনি এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আলোপ্যাথ বন্ধু বলিতেন যে "যদি মেডিকেল কলেজে অস্ত্র প্রয়োগ জন্য আইস তবে তোমার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিব নতুবা নহে"।

আমিও দেখিলাম যে অর্ব্বুদটি সহজে যাইতেছে না এবং প্রত্যহই তাহা লাল right red রক্ত স্রাবিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া হামামেলিশ মাদার টিঞ্চার বাহ্য প্রয়োগ করিতে দিলাম এবং মধ্যে মধ্যে থুজা (৩০) সেবন করিতে দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হামামেলিশ বাহ্য প্রয়োগের পর হইতেই রক্ত পড়া কমিতে থাকে এবং ১০।১২ দিনের মধ্যেই অর্ব্বুদটিও ক্রমে স্বল্পাকার হইয়া আসিতে থাকে। আরও ৭।৮ দিনে উহা একেবারে মিলাইয়া গেল এবং আজও সেইস্থানে আর অর্ব্বুদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রফুল্ল বাবুর অন্যান্য বন্ধুগণও অস্ত্র প্রয়োগেই মত দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হোমিওপ্যাথিতে থাকায় কেহ তাহাকে এই চিকিৎসা ত্যাগে সম্মত করিতে পারে নাই। তাহার বন্ধুগণও আলোপ্যাথ ডাক্তারটি যে এই বিষয়ে হোমিওপ্যাথির অমোঘতা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় লেখা নিষ্প্রয়োজন।

পেরিটি ফ্লাউটিস্, ইলিয়াক অ্যাবসেস্, ওভার-ইটস্, হিপ্ জয়েণ্ট ডিজিজ প্রভৃতি গুরুতর পীড়াও এই হোমিওপ্যাথির "ফোঁটা ঢালা" ঔষধেই আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে উপযুক্ত ভাবে সুনির্ব্বাচিত হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধে বস্তুতঃই বিস্ময়কর ফললাভ হইতে পারে। এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্য আমরা কেবলমাত্র যুক্তির দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি না। হাতে কলমে practi cally দেখাইতে প্রস্তুত আছি এবং statistics অনুসন্ধান করিলে দৃষ্টান্তের অপ্রতুল হইবে না।

ডাক্তার জে, কে, মৈত্র।
সিমলা পোঃ অঃ কলিকাতা

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী

—:০:—

কাপড়ের উপর বিভিন্ন বর্ণের চিত্রাদি অঙ্কিত করণ ও রঞ্জন প্রণালীর একাংশ। বিলাতে ইহাকে calico printing বলে। ইহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতেই বিদেশীয়গণ ইহা শিক্ষা করে। দুঃখের বিষয় আজ এ শিল্প এদেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং বলিতে লজ্জা হয় আমরাই আজ ইংরেজ জার্ম্মান প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিগণের নিকট তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহা পুনঃশিক্ষা করিবার জন্য বিনীত ভাবে তাহাদের দ্বারে উপস্থিত।

calico printing এর জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাবিধ কল আবিষ্কৃত হইয়া চালিত হইতেছে। বিবিধ জটিল বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে বর্ত্তমান সময়ে এবিষয়ের যতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। স্থানাভাব জন্য তাহার আলোচনা এখানে অসম্ভব।

বস্ত্রাদি রঞ্জন ও ধৌতীকরণ সম্বন্ধে নিত্য নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের কার্য্য প্রণালী বিশেষ কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারাও অনায়াসে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক ও বালকের দ্বারাই ইহার অর্দ্ধেক কার্য্য চালিত হইয়া থাকে। এই উক্তি সমর্থন জন্য তথাকার কোন সালের ফ্যাক্টরী রিটার্ণ হইতে মজুর বা শিল্পগণের একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উক্ত সালে ইংলণ্ডের বস্ত্র রঞ্জন ও ধৌতকরণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত মোট কর্ম্মী সংখ্যা—৬৭৮০১।

তন্মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা ১৩শ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা—৩৯২১।

তন্মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা ১৮শ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা—৯০৫৫।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা—১৪১৭৬।

অষ্টাদশ হইতে অধিক বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা—৩৯৯১১।

ধৌত ও রঞ্জন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এক পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত কল কারখানার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, অপর দিকে সেইরূপ নানাবিধ রং ও জলের বিশুদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক

জল অপরিষ্কার থাকিলে তদ্দ্বারা ধৌতাদি ব্যাপার চলিতে পারে না। কর্দ্দমময় হইলেই যে কেবল জল অবিশুদ্ধ হয়, তাহা নহে। একেবারে কর্দ্দমশূন্য এবং দেখিতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলেও জল অবিশুদ্ধ হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা কোন কার্য্য অসম্ভব। এক গ্লাস ফিল্‌টার করা জলে কিয়ৎপরিমাণে দোবারা চিনি অথবা পরিষ্কার লবণ দিয়া নাড়িয়া দিলে উহা জলে একেবারে মিশিয়া যাইবে কিন্তু জল পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও পরিষ্কার দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ অবস্থায় জল পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ নয়; কারণ চক্ষুর অগোচর হইয়া থাকিলেও চিনি বা লবণ তন্মধ্যে রহিয়াছে; এই জন্য ঐ জলের স্বাদ মিষ্ট অথবা লবণাক্ত। জল উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া ফেলিলে পুনরায় ঐ চিনি বা লবণ বাহির হইয়া পড়ে। চিনি ও লবণের ন্যায় অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে। রঞ্জনাদি কার্য্যে জলের অপর পদার্থের অস্তিত্ব সাধারণতঃ—অনিষ্টজনক। উহাদিগকে দূরীভূত না করিয়া জল ব্যবহার করিলে, হয়, রঞ্জনাদি একেবারেই হইবে না অথবা আশানুরূপ ভাবে বস্ত্রাদি রঞ্জিত বা ধৌত হইবে না। অনেকেই দেখিয়াছেন কূপের জল জাল দিলে পাত্রের গায়ে শ্বেতবর্ণের কোন পদার্থ সঞ্চিত হয়। উহা প্রথমে জলের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল; গরম করায় উহা জলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পাত্রের গায়ে গিয়া জমিয়াছে। উহা ধৌতাদি কার্য্যে বিশেষ অপকারী। এই জন্যই জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা একবার পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং পরীক্ষার পরে ঐ জল অবিশুদ্ধ স্থির হইলে উহা পরিত্যাগ করিবে এবং যদি উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তি সুকঠিন বিবেচনা হয় তবে উহাকেই বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। জল পরীক্ষা ও তাহা বিশুদ্ধ করণ সম্বন্ধে নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয় বলিয়া উহা আর এখানে আলোচিত হইল না।

ক্রমশঃ।

শ্রী তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

সিংহদ দুর্গ।

—:০:—

তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যজীর নেতৃত্বাধীনে চালিত হইয়া মহারাষ্ট্র সেনা সমুদয় জয়োল্লাসে দুর্গে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে দুর্গমধ্যে শত্রুর প্রবেশ কথা সকলেই জানিতে পারিল। সকলেই ভয় ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

এদিকে একজন ভয়বিহ্বল অনুচর যাইয়া বিবাহ স্থানে উদয়ভানুকে এই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা বিদিত করিল। উদয়ও তৎক্ষণাৎ ঢাল ও তরবারীর সাহায্য লইয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন। জারজ এবং দেশত্যাগী ও দেশবৈরী হইলেও উদয় একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি অকুতোভয়ে এবং অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয় পক্ষীয় সৈন্যের গগনভেদী চীৎকার, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। প্রজ্বলিত মশালাদির অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা, মাভলী সৈন্যগণের বিকট চীৎকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া তথায় নৈশ অন্ধকারের মধ্যে কেমন এক ভয়াবহ দৃশ্যের যে অবতারণা করিয়াছিল তাহা সামান্য

লেখনীতে বর্ণনা করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। উদয় কিছুমাত্র বিমূঢ়চিত্ত না হইয়া সত্বর সেনা সংযোজিত করিয়া দক্ষিণ দিকের কূপ—যাহা হইতে সমুদয় দুর্গে জল সরবরাহ হইয়া থাকে—রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইলেন। তানাজী উহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সতেজে অগ্রসর হইলেন, উভয়ের তরবারী উভয়কে সানন্দে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু এখানে মহারাষ্ট্র বীর রাজপুতের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না—উদয়ের ভীম অসির এক আঘাতেই তানাজীর ঢাল দুইখণ্ড হইয়া গেল, দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ কনুই ছিন্ন এবং তৃতীয় বা শেষ আঘাতে তানাজী হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। অক্ষির পলক পড়িতে না পড়িতে বীরবর তানাজী রণস্থলে প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু ইহাতেই কি মহারাষ্ট্রগণ আত্মহারা হইয়া পশ্চাৎপদ হইল? না কখনই নহে। যে জাতী স্বজাতীয়ের মধ্যে জগতে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করিবে তাহার—গঠনকারকেরা সেরূপ দুর্বলচিত্ত হইতেই পারে না। যেমন তানাজী পতিত হইলেন অমনি জগৎসিংহ তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তানাজীর খুল্লতাত সালের মামা তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে উদয়ের সম্মুখীন হইলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও সালের মামার শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিল—কথিত আছে বয়সকালে ইঁহার ন্যায় কৌশলী অসিজীবী—তদানীন্তন দক্ষিনাবর্ত্তে আর কেহ ছিলনা। সম্মুখে পুনরায় একজন নূতন ব্যক্তির উপস্থিতি উদয়ের অনুভিতি হইবার বহু-পূর্ব্বেই সালের মামা, বিদ্যুৎগতিতে উদয়ের উপর লাফাইয়া পতিত হইয়া মস্তকে এক আঘাতেই দুর্গকে অধীস্বামী হারা করিয়া দিলেন। দুর্গস্বামীর পতনে বিজয়লক্ষী মহারাষ্ট্রদিগকে আলিঙ্গন করিল এখন মহারাষ্ট্রীয়গণ অমিততেজে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মোগলগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল; নেতৃবিহীন দুর্গস্থ সেনাগণ উপায়ন্তর না দেখিয়া বিজিতগণের নিকট অধীনতা স্বীকার করিল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিচালির গাদায় অগ্নি সমর্পণ করিয়া রায়গড় দুর্গে অবস্থিত শিবাজীকে জানাইয়া দিল যে কোন্দানা দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। এই সংবাদে মহারাজ শিবাজীর আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল. তিনি বলিলেন "এখন হইতে ঐ দুর্গের নাম কোন্দানা না হইয়া সিংহনাদ (সিংহের দুর্গ) কারণ কেবলমাত্র সিংহতুল্য অসমসাহসী তানাজীই উহা দখল করিয়াছেন নতুবা আর কেহ পারিত না।" এই কথা বলিয়াই যতসত্বর সম্ভব, তিনি নূতন অধিকৃত স্থান দেখিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যখন তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সালের মামার নিকট সমুদয় যুদ্ধের ঘটনা শ্রবণান্তে শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও জীবনের সহচর তানাজী আত্মবলী দিয়া দুর্গজয় করিয়াছেন তখন তাঁহার মনে যে কি প্রকার শোকের উদয় হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে-ছিল। শিবজী কিয়ৎকাল আত্মবিমূঢ় হইয়া থাকিয়াই অশ্রুজল মোচন করিয়া পুনঃ উক্তি স্মরণ করতঃ বলিলেন "সিংহের দুর্গ অবশ্য, আমরা দুর্গ-জয়ে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু সিংহটিকে হারাইতে হইয়াছে।"

আমাদিগের গল্পের মূল আখ্যায়িকা এক্ষণে শেষ হইল বটে কিন্তু জগৎসিংহ দেবল দেবী ও সর্ব্বো-পরি সতী কমলকুমারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্ততঃ সংক্ষেপে না বলিয়া যাইলে পাঠকগণ আমায় ক্ষমা

করিবেন না নিশ্চয়ই—এবং আমার ও আত্ম তৃপ্তি হইবে না এ কারণ পরিশিষ্ট ঘটনাবলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। দুর্গ জয়ের পরই জগৎসিংহ উন্মাদ গতিতে ইতস্ততঃ দেবল-দেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য কমলকুমারী যে স্থানে আবদ্ধা ছিলেন সেই দিকে দ্রুত গমন করিলেন। কিন্তু হায় উদয়-ভানুর আদেশে অথবা অন্য যে যে কোন কারণেই হউক দেবল-দেবীর জন্য নিযুক্ত কাফ্রী চাকরানীরা দেবলদেবীর লাবণ্যময়ী প্রতিমাটি ফাঁসীতে ঝুলাইয়া রখিয়াছে দেখিয়া জগৎসিংহ ক্ষোভে রোষে জ্ঞান হারা হইয়া গেলেন। হায় তাঁহার এতদিনের পরিশ্রম অন্ত সফল হইয়া কোথায় তাঁহার প্রাণারাম হৃদয় নলিনীকে বক্ষে ধারণ করিবেন না অসহায় অব-স্থায় দুষ্টা চেড়ীর হস্তে মৃতা সতীর মৃতদেহ দেখিতে হইল। জগৎসিংহ ক্ষণকাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পত্নীর প্রতি শেষদেখা দেখিয়া লইলেন তাহার পরে উন্মাদের ন্যায় বেগে কোথায় যে চলিয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিলনা। জগতের কেহ তাঁহাকে সংসারে দেখিতে পায় নাই।

যাহা হউক কমলকুমারী অক্ষতা অবস্থায় ছিলেন, ভগবান তাঁহার পবিত্র সতীধর্ম্মে আঘাত লাগিতে দেন নাই। কমল এখন সকলের অনুমতি লইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহন করত সতীমহীমা প্রচার করিয়া মৃত স্বামীর সহ মিলন আশায় আত্মত্যাগ করিলেন। ধন্য সতী মহিমা। স্বয়ং আদ্যাশক্তি অন্তরীক্ষে থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন।

কমলকুমারী জলন্তচিতায় আরোহন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু আজও ঐ দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোনে একখানি প্রস্তর খণ্ড উত্থিত থাকিয়া জগতে প্রচার করিতেছে যে "এইপুণ্য স্থানে একজন রাজপুত রমণী স্বামীর সহ পরলোক মিলিত হইবার আশায় জলন্ত চিতায় আরোহন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আত্ম ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন সন্দেহ নাই।

যে স্থানে তানাজী রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেখানেও আজও একখানি প্রস্তর খণ্ডউত্তোলিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে তাহাতে তদানীং কালের যোদ্ধবেশী একজন মহারাষ্ট্রের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

সমালোচনা।

—:*:—

অমলেশ্বর গন্ধকের গ্লাস। জি, সরকার কোম্পানীর প্রস্তুত "অমলেশ্বর গন্ধকের গ্লাস সমালোচনার্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। চিকিৎসক মাত্রেই অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, মেহ, প্রভৃতি হইতে সামান্য খোস পাঁচড়া সমস্ত রোগেই গন্ধকের উপকারিতা অবগত আছেন। হোমিও-প্যাথিকদিগের গন্ধকই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। যে কোন প্রকারে গন্ধকের ব্যবহার যে রোগ নাশক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ গন্ধক হইতে পানপাত্রের আকারে গ্লাস প্রস্তুত সরকার কোম্পানীর কলা-বিদ্যার অভিনব পরিচায়ক অথচ নিয়মিতরূপে

ব্যবহার করিলে সর্ব্ব রোগের বিনাশ। মূল্য অধিক নহে, দুইটী টাকা। সরকার কোম্পানী এজন্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

ভাগবদ্গীতা পাঠ।

—(৩)—

অর্জ্জুন। আত্মা দেহের ন্যায় নিত্যজাত বা নিত্যমৃত এ কাহাদের মত?

ভগবান। দেহের জন্মের সহিত আত্মার জন্ম হয় দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় এজন্য ইহা দেহের ন্যায় নিত্যজাত ও নিত্যমৃত ইহা চার্ব্বাকাদি এবং অজ্ঞানী সাধারণ লোকও বলিয়া থাকে।

অর্জ্জুন। চার্ব্বকাদি "নিত্যজাত" অর্থে কি প্রতিপন্ন করে?

ভগবান। নিত্যং নিয়মেন জাতং নিত্যজাতং ইতি চার্ব্বাক পক্ষঃ।

নিত্য সর্ব্বদা জাতং ইতি ক্ষণিক বিজ্ঞান পক্ষঃ নিতশ্চসৌ অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ জাতশ্চেতি তর্কাদি পক্ষাঃ।

অর্জ্জুনঃ। ইহাদের মতের অর্থ কি?

ভগবানঃ। দেহাত্মবাদীগণ বলেন—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ একত্র মিলিয়া চৈতন্যময় দেহ সংঘটিত করে সেই দেহই আত্মা। আর ঐ চারি ভূতের মিলন বশতঃ চৈতন্য জন্মে। যেমন পান চুণ খয়ের একত্র করিলে সুন্দর লাল হয় সেইরূপ।

ক্ষণিকবাদীগণ বলেন;—আত্মা জ্ঞান স্বরূপ কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই ক্ষণিক। এইমাত্র জ্ঞান জন্মিল তৎক্ষণাৎ লয় হইল। একটী লয় হইতেই আর একটী জন্মিতেছে আবার লয় হইতেছে আবার জন্মিতেছে। এজন্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে নিত্যজাত বা সর্ব্বদা জাত ও সর্ব্বদা মৃত বলে। যদি এই রূপেও বল তথাপি ইহার জন্য শোক হইতে পারে না।

অর্জ্জুন। মৃত্যু কি? জন্ম কি? জন্মের পর মৃত্যু. মৃত্যুর পর জন্ম কেন হয়?

ভগবান। আত্মা নিত্য। আত্মাতে অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয় যোগের নাম জন্ম। আত্মা হইতে পূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়ের নাম মৃত্যু।

স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু হয়। আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় নিমিত্ত মৃত্যুর অবসানে জন্ম হয়। কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে প্রাণিনা ধ্রুবঃ। ভাঃ ১০।১।২৬।

অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ।

অর্জ্জুন। কিরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

ভগবান। তুমি মৃত্যুর কথা ভুলিয়া নিরন্তর ভোগ বিলাসে উন্মত্ত থাক তথাপি তোমাকে মরিতে হইবে। অথবা সংসার জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে নিরন্তর মৃত্যু কামনা কর তথাপি তোমাকে মরিতেই হইবে। দেহ জন্মিয়াছে মরিবেই ইহা নিশ্চিৎ। বস্ত্রখানি জোর করিয়া কেহ কাড়িয়া লইলেই দুঃখ কিন্তু ছিঁড়িয়া গেলে অথবা মলিন বোধ করিলে যখন তুমি আপন ইচ্ছায় ত্যাগ কর এবং নূতন বস্ত্র পরিধান কর তখন দুঃখ নাই। আপনি এই দেহ-

রূপ স্বপ্ন যাহাতে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতে পার তজ্জন্য তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষয় কর। উপাসনা দ্বারা আপন স্বরূপে চিত্ত একাগ্র কর এবং "তত্ত্বমস্যাদি" বিচার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব নিশ্চয় করিয়া সদানন্দাকারে আকারিত হইয়া যাও; এবং নিত্য আত্মাকে লইয়া থাক তবেই তোমার পরিবোধ তবেই তোমার মুক্তি। আরও দেখ এই দেহ যাহা আদিতে ছিল না অন্তেও থাকে না তাহা মধ্যেও নাই জানিও।

অর্জ্জুন। দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করুন।

ভগবান। রজ্জু অজ্ঞানবশতঃ সর্পিত বোধ হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখ সর্প নাই। অজ্ঞান হইতে জাত সর্প অজ্ঞানেই লয় হইতেছে। রজ্জুতে নহে, অজ্ঞানেই সর্প দেখা যাইতেছিল। অজ্ঞানের পূর্ব্বে সর্প ছিল না, অজ্ঞানের নাশেও সর্প নাই। সেইরূপ আত্মাতে অজ্ঞান কল্পিত জগত শুদ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় দৃশ্য হয়। পূর্ব্বেও নাই পরেও নাই অজ্ঞানে যাহা দেখ তাহাও নাই। এরূপ দেহটী অজ্ঞানে দেখিতেছ। বাস্তবিক ইহার অস্তিত্ব নাই।

অর্জ্জুন। রজ্জুতে যে সর্প দেখি পূর্ব্বে সর্প দেখিয়াছি বলিয়াত? একমাত্র আমিই ছিলাম দেহত ছিলনা তবে এ ভ্রম আসিল কোথা হইতে?

ভগবান। যাহা নাই তাহাই আছে দেখানই মায়া। "মা" নিষেধ বাচক "আ" অস্তি বাচক। এজন্যই মায়াকে "অঘটনঘটন পটীয়সী বলে। পুরাণ বলেন—

"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা।"

অদর্শন হইতে আসিয়াছে আবার অদর্শন হইয়াছে। সে তোমার নয় তুমিও তার নয় বৃথা কেন ভাবনা?

অর্জ্জুন। এ সমস্ত কি এক অদ্ভুত রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আচ্ছা সুষুপ্তিতে আত্মা স্বরূপে থাকেন তখন অজ্ঞান নাই বলিলা কিছুই নাই। আবার সুষুপ্তি যখন স্বপ্নরূপে পরিণত হয় এবং জাগ্রত হয় তখন কিরূপ ব্যাপার ঘটে? আত্মাই লয় স্থান কিরূপ?

ভগবান। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে স্বপ্ন ও প্রবোধ কালে জগতের লয় ও উদয় সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্ট হয়।

"স যদা স্বপিতি তদিদং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রবুধ্যতে তদি তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

সম্পাদক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। গ্রাহকগণের বিরক্তি নিবারণার্থে এখন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে দুই খণ্ড আর্য্যভূমি প্রকাশিত হইবে। আঃ ভূঃ সঃ।

বন্দে মাতরং।

হিন্দু-শক্তি।

(বহু সংখ্যক এলোপ্যাথিক্ ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রসংশা পত্র আছে।)

স্বদেশী আন্দোলনের কি ফল? এইরূপ প্রশ্ন অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার উত্তরে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কার্য্যে দেখাইতে বাসনা করি। আজি স্বদেশী আন্দোলনের ফল স্বরূপ সাধারণের নিকট 'হিন্দু-শক্তি' লইয়া উপস্থিত। ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশী। ইহার মাল মসলা উপকরণাদি সমস্ত স্বদেশজাত দ্রব্য। ইহা বিলাতী বলকারক ও অম্লনাশক ঔষধ সকলের সমকক্ষ। এমন কি কোন কোন কারণে অধিক উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিলাতী ঔষধ সমুহ বিদেশীয় দ্রব্যে প্রস্তুত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় ভেষজ যেরূপ উপযোগী বিলাতী দ্রব্য ও তজ্জাত ভেষজ সেরূপ উপযোগী কোন প্রকারে হইতে পারে না। বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য অনেক দ্রব্য বিদেশীয় ভেষজে থাকে এবং সাধারণতঃ সর্ব্বস্থানে সকল দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'হিন্দু-শক্তি' আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে বিনাপত্যে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে অম্ল সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, বুকজ্বালা, দমকাবাহে, অজীর্ণতা, উদরাময়, অগ্নিমন্দ প্রভৃতি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। শ্লেষ্মা প্রাবল্যে 'হিন্দু-শক্তি' অমৃত তুল্য। এক কথায় ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ নাশক। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ইহা ব্যবহার করিয়া সালসার ন্যায় উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহা সেবনে বল, ক্ষুধা ও শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীরে কোন অসুখ নাই অথচ শরীর দুর্ব্বল হইতে, মেজাজ খিট্‌খিটে হইতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, জীবন বিড়ম্বনাময় বোধ হইতেছে তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করুন। আশ্চর্য্য ফললাভ করিবেন।

অনেকে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন। 'হিন্দু-শক্তি' মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী; কারণ কলিকাতা সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামে ''র-মিটযুশ'', জাক-শুপ প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। 'হিন্দু-শক্তি' ব্যবহারে উপরোক্ত বলকারক দ্রব্য সকলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ দুর্ব্বল শরীরে মাংস ব্যবহার জনিত পেট গরম ও যকৃতের ক্রিয়া হানি প্রভৃতি যে সকল অপকার হওয়া সম্ভব 'হিন্দু-শক্তি' ব্যবহারে তাহা হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

দুই আউন্স শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

ডাক মাশুলাদি ব্যয় ।০ আনা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

১ নং রাম মোহন সাহার লেন,

সিমলা পোষ্ট, (হেদুয়ার পূর্ব্ব,) কলিকাতা।

প্রমেহ, ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, পারা বা উপদংশজনিত দূষিত রক্ত, স্ত্রীলোকের প্রদর, ঋতুবন্ধ বা অধিক রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগের এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কৃশতার একমাত্র মহৌষধ।

নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন।

এই মহৌষধ সেবনে আজ ভারতবাসী অনেকেই বলিতেছেন যে, সালসা কড্‌লিভার অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন। কেবল তাহা নহে, শাস্ত্রীয় মকরধ্বজ, বৃহৎমকরধ্বজ, সোমনাথ রস বসন্তকুসুমাকর ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি বহুমূল্যবান ঔষধ সেবনে কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত রোগী এই ভারত বিখ্যাত নবাঙ্গ রসায়ন সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম সকলে মতে একমাত্র লৌহই সমস্ত রোগের মহৌষধ এবং সমস্ত ঔষধের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। বহু পুটের উৎকৃষ্ট লৌহ প্রায়ই পাওয়া যায় না, আমরা বহু চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ সংগ্রহ করিয়া এই নবাঙ্গ রসায়ন নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি, এই ঔষধে চারিটী মাত্র ধাতু দ্রব্য আছে; যথা লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ; তন্মধ্যে লৌহের ভাগ অধিক হওয়ায় নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন নাম হইয়াছে, এই ঔষধ বার্দ্ধক্যজাতরূপ ব্যাধি নষ্ট করে; এজন্য রসায়ন শব্দবাচ্য হইয়াছে।

এই ঔষধ সেবন করিলে শিথিল অঙ্গ দৃঢ় করে অর্থাৎ অঙ্গ সকল হাড়ে মাংসে জড়িত হয়। সালসার ক্রিয়া ক্ষণিক, লৌহের ক্রিয়া চিরস্থায়ী; সালসা যখন সেবন করা হয়, তখনই শরীর একটু ঠুসাঠুসা ও চাকচিক্য দেখা যায়, বন্ধ দিলে তাহা আর থাকে না আসল হইতেও একটু কমে। এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ভাল হইয়া অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু পূর্ণ ও পরিষ্কার হইয়া শরীরের লাবণ্য ও পুষ্টি হইয়া থাকে। টৈতল, ঘৃত অরিষ্ট, আসব এ সমস্ত অপেক্ষা লৌহের গুণ অধিক ও চিরস্থায়ী একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ১৫ দিবস সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহাশ্রিত জ্বর, হস্ত পদাদির জ্বালা ও উত্তাপ স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদর, ঋতুবন্ধ ও অধিক রক্তস্রাব, পুরাতন জ্বর, পেটগরম, মাথাঘোরা, মাথাগরম, শরীরের দুর্ব্বলতা, শুক্রের শিথিলতা ও তরলতা, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, অধিক প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ এই সমস্ত রোগ হইতে ১৫ দিবস সেবনে একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়। বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি সুতরাং এই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষ অবগত আছি। যদি শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সাম্যতা চাও, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্তধাতু সমান পূর্ণাবস্থা রাখিতে চাও, অল্প বয়সে অকাল বৃদ্ধ না হইতে চাও, তবে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন কর। শরীরের ধাত্বাদি ভাল করিতে লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ এই চারিটী ধাতুই উৎকৃষ্ট। এই ঔষধও এই চারিটি ধাতুদ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারা সপ্তাহকাল সেবন করিয়া দেখুন উক্ত ব্যাধি সমূহ হইতে অবশ্য আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা যৌবনের পূর্ব্বে বা যৌবনাবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা বারাঙ্গনা জনিত অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হেতু অকাল বার্দ্ধক্যত শরীরে অনুভব করিতেছেন অর্থাৎ অল্প উত্তেজনায় শুক্রপতন বা স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়, মাথাঘোরা, অন্ধকার দর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা জোনাকি পোকার ন্যায় দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ হইলে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধ বলিতে হইবে। এই রকম বিস্তর রোগীতে প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি, আপনারা একবার সেবন করিয়া দেখুন পুনর্ব্বার যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ লইলে ১৲ টাকা। একেবারে ১৫ দিবসের ঔষধ লইলে ১৸৹ এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ডাক মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা।



বঙ্গে আবার ভীষণ ম্যালেরিয়ার

প্রকোপ আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর কত হতভাগ্য যে এই বঙ্গে জাতশত্রু ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইয়া যে শ্মশান তুল্য হইয়াছে, একথা কে না জানেন? আপনাদের দেশজাত সামান্য একটী উদ্ভিদ, কতকগুলি লতা গুল্ম যে বিলাতী কুইনাইন অপেক্ষা কত উপকারী, কত জীবনীশক্তি-সংরক্ষিণী তাহা জানেন কি? তাই বলি যদি ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে, ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, জীর্ণজ্বর, ধাতুস্থ জ্বর, মেহসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বর হইতে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। নিম্বাদি কষায় জ্বরনাশক ও জ্বর নিবারক ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের সময় নিম্বাদি কষায় এক বোতল সেবন করিলে জ্বরে আর আক্রান্ত হইতে হয় না। মূল্য প্রতি বোতল বা শিশি ॥৴০ আনা। ডাক মাশুলাদি ।৴০ আনা মোট অঃ ভিঃ পিঃ ১।৴০ এক টাকা এক আনা।

প্রশংসাপত্র। আলিপুর জেল হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন ঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক। পরম কল্যাণবরেষু—

আপনার নিম্বাদি কষায় ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ম্যালেরিয়া জ্বরে এরূপ আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ ঔষধ আমি পূর্ব্বে কখন ব্যবহার করি নাই। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে এ ঔষধ দরিদ্রের পরম বান্ধব রূপে পরিণত হইবে ইহার মূল্য অতি সুলভ গুণ অমোঘ ও অব্যর্থ।

শুভাকাঙ্ক্ষীন ঃ—Sd শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণঃ (চট্টোপাধ্যায়)

অম্লপিত্তে শূলান্তক চূর্ণ অব্যর্থ।

(অম্লপিত্ত ও পরিণাম শূল অজীর্ণ প্রভৃতির মহৌষধ)

দুই তিন মাত্রা সেবনেই ইহার অমোঘ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ক্ষুধা ও আহারে রুচি বৃদ্ধি করিয়া শরীরে বলাধান করে।

এক শিশির মূল্য ॥০ আনা। ডাকমাশুল সমেত ভিঃ পিঃতে ৸৴০ তের আনা।

শূলান্তক চূর্ণের প্রশংসাপত্র।

হুগলি হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত তরুণীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন ঃ—

আপনার অম্লপিত্ত ব্যায়ামের জন্য ফলপ্রদ শূলান্তক চূর্ণ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে আর দুই শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ইতি।

কবিরাজ শ্রীচারুচন্দ্র মল্লিক।

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়। লালা বাবুর বাজার জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

কেশ শোভন তৈল।

চুল কাল হইবে, বকুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হইবে, রমণীর রমণীয় বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়িবে। এক শিশির মূল্য ॥০ আট আনা ডাক মাশুল ।৴০

শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ।

৩৭২ নং লালা বাবুর বাজার জোড়াসাঁকো কলিঃ।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ৮ম, ৯ম সংখ্যা] [অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্,এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী; পি দত্ত L.C.S.P.H.B., শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতা, ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেসে" শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।
১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১।০) প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)



আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৪ সাল। {৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

জাতীয় মহাসমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যে অধম বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইত, তাহারাই আজ ভারতে ধর্ম্মের, সমাজের, শিক্ষার ও অন্যান্য যাবতীয় বিভাগের সংস্কার সাধনে ও স্বদেশের কল্যাণ কার্য্যে সকলেরই অগ্রণী ও আদর্শ। সুতরাং, ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের সম্মিলিত জাতীয় চেষ্টার সর্ব্বাগ্রে আমরা এই বাঙ্গালীকেই দেখিতে পাই। যে সকল মহাপুরুষ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা সম্মিলিত জাতীয় ভাব পুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ও আমাদের বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধনের সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ সেবা ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য এবং তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু, এই মহাব্রত-সাধক মহাপুরুষগণের মধ্যে অচল অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম ও অক্লান্ত চেষ্টায় সকলের অগ্রে আমরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখিতে পাই।

শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আমরা রাজা ও প্রজার মধ্যে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত সম্বন্ধের বিষয় ক্রমে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলে পর, বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত নেতৃগণ দেখিলেন যে, যে সকল উচ্চ ও পবিত্র নীতি অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে বলিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই স্পষ্টাক্ষরে

ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ ভারতে সে নীতির প্রবর্তন হইল না,— সুতরাং, রাজার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র হইলেও, প্রজার নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে হইতেছে। রাজার সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র নীতির প্রবর্ত্তনের জন্য ও প্রজার স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতা লাভের জন্য, ভারতের সকল প্রজার সমবেত ইচ্ছা ও সংকল্প প্রকাশের সুবিধার জন্য, তাঁহারা একটা ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য নেতৃগণের যত্নে ও চেষ্টায় কলিকাতায় "ভারত সমিতি" স্থাপিত হইল। নানা কারণে, তাহা দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইল না বটে, কিন্তু দেশে একটা জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা যে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৮২ সালের ২৭এ মে তারিখের বেঙ্গলী সংবাদপত্রে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন— "ভারতে একটা জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সময় এক্ষণে যথার্থই উপস্থিত হইয়াছে। ইহার বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতার বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে, এবং ইহা বিভিন্ন প্রদেশের নানা বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সমিতির সম্মিলিত কার্য্যের সহায়তা করিবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে "ভারত সমিতি" আগামী বৎসর এই রূপ একটা জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন।" ১৮৮৩ সালে উক্ত সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের প্রকৃত জনক মিঃ য়্যালান্ হিউম। ইঁহারই পরামর্শে, নিঃস্বার্থ যত্নে ও চেষ্টায় এই সমিতি জন্মলাভ করে। এই মহাপুরুষের নাম আমাদের সকলেরই পূজ্য ও প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু ভারতের রাজপুরুষের সহানুভূতি ও পরামর্শ যে এই জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। প্রাতঃস্মরণীয় হিউম সাহেবই এই অভিনব কল্পনার জন্মদাতা বটে এবং তিনিই সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, যে আকারে জাতীয় মহাসমিতি জন্মলাভ করে, তাহার প্রকৃত পরামর্শদাতা স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফ্‌রিন্‌। হিউম সাহেব ও ভারতের নেতৃবৃন্দ কল্পনা করেন যে, শাসনবিভাগের নানা কার্য্যে ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের সুবিধার জন্য এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য, বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণকে লইয়া বৎসরে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমস্ত ভারতবাসীর এক জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন আবশ্যক। সে সমিতিতে স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার সম্মুখে দেশের নেতৃগণ ও শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। ১৮৮৪ সালে হিউম সাহেব বড়লাট ডাফ্‌রিণের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য সিমলা শৈলে গমন করেন। লর্ড ডাফ্‌রিণ্‌ তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বলেন যে, এরূপ সমিতি দ্বারা রাজার ও প্রজার উভয়েরই কোন উপকার সাধিত হইবে না। এরূপ সমিতিতে কেহই নির্ভীকচিত্তে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে সাহস করিবেন না, অধিকাংশই কেবল রাজকর্ম্মচারীর প্রতিধ্বনি করিবেন মাত্র। এরূপ সমিতির অপেক্ষা, যদি সম্পূর্ণরূপে প্রজাগণের দ্বারা

চালিত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত নেতৃগণকে ও প্রতিনিধিগণকে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি স্থাপিত হয়, তাহা দ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে। রাজার সকল কার্য্যের একটা প্রবল সমালোচক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলে, রাজপক্ষের যথেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা এবং শাসনবিধির ভ্রম ও ত্রুটি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এবং ক্রমে, এরূপ সমালোচক দলের মধ্যেও দায়িত্ববোধ, একতা ও রাজনৈতিক শিক্ষা পুষ্টিলাভ করে। লর্ড ডাফ্‌রিণের এই উদারতা, বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার জন্য, তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার এই পরামর্শ অনুসারে হিউম সাহেব ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে পুনা নগরে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রচার করেন—"এই সমিতিতে বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইবেন। সময়ে ইহা জাতীয় পার্লামেন্টের ন্যায় প্রবল সমিতিতে পরিণত হইবে এবং ন্যায্যরূপে চালিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে যে ভারতবাসী সম্মিলিতভাবে কার্য্যসাধনে অনুপযুক্ত নহে।"

বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ২০ জন এবং উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাব হইতে ১০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করা স্থির হয়। কিন্তু, সেই সময়ে পুনা নগরে বিসূচিকার প্রকোপ হওয়াতে বোম্বাই নগরেই সমিতির প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির প্রথম অধিবেশনে বোম্বাইর রাজ কর্ম্মচারীগণ প্রতিনিধিগণকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং সমিতির কার্য্যে তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে ১০০ জন প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। সমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল, হিউম সাহেব, মিঃ দাদাভাই নাওরোজী, মিঃ আনন্দ চার্লু ও অন্যান্য নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৫ সালের ২৮এ ডিসেম্বর সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের ভবিষ্যত ইতিহাসে এই দিন স্বর্ণাক্ষরে-লিখিত থাকিবে পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির পদে বৃত হয়েন। প্রথম সমিতি শাসন বিধি সংস্কারের জন্য সাতটি প্রস্তাব করেন ও সেগুলি কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় সমিতির অধিবেশন ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় হয়। এবারে ভারতের চতুর্দ্দিক হইতেই প্রতিনিধিগণ আসিয়া উপস্থিত হন, এবং জন সাধারণে তাঁহাদিগকে যে আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণাতীত। প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩১ জন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ১৩০ জন জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি। মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। এবার অধিবেশনে দাদাভাই নাওরোজী সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। বঙ্গের সুসন্তান মতিলাল ঘোষ, মনমোহন ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোধ্যায় ও অম্বিকাচরণ মজুমদার সমিতির কার্য্যে যোগদান করেন।

সমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ স্থির করেন যে, জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একটা জাতীয় শিল্পের প্রদর্শনী করিলে

দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ১৯০১ সালে কলিকাতায় প্রথম জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ১৯০৫ সাল হইতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর একটা জাতীয় শিল্পসমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই সমিতিতে এক একটী শিল্পের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভারতের সমগ্রপ্রকার শিল্প সকলের উন্নতি-সাধনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। গত কয় বৎসর গবর্ণমেণ্ট এই শিল্প-প্রদর্শনী ও শিল্পসমিতির কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক যে গত বাইশ বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে আমরা কতটুকু উপকৃত হইয়াছি? ইহার কার্য্যের ও উপকারের হিসাব লইবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, সমিতির এই জাতীয় কার্য্যে আমরা সকলে কতটুকু সাহায্য ও যোগদান করিয়াছি? যদি তাহা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় কর্ম্ম ও কল্যাণের হিসাব দেখা বৃথা,—কারণ, সমগ্র জাতির আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন জাতীয় কর্ম্ম বা কল্যাণই সাধিত হয় নাই। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র হইলেও আন্তরিক চেষ্টা মাত্রেরই একটা সফলতা আছে, এবং যাহার জন্য জগতে একজনও জীবন দান করে, এ বিশ্ববিধানে তাহার একটা প্রতিদান আছেই! সুতরাং, জাতীয় মহাসমিতির এতদিনের চেষ্টা ও উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা নিশ্চয়। কিন্তু, মানুষ যাহা চায় বা পাইবার আশা করে, তাহা সে কতদূর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই দিক দিয়া যদি সকল বস্তুর ও কার্য্যের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ জগতের সকল কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সমাজ ও জীবনই ব্যর্থ; —কারণ, যাহা চাহিয়াছে,—যাহা পাইবার আশা করিয়াছে, তাহা এখানে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে কে?

জাতীয় মহাসমিতির এই ক্ষুদ্র জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম যে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীকে অধিকতর সম্মিলিত জাতীয়ভাবের পুষ্টির পথে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ক্ষুদ্র জীবনে ইহা আমা-দিগকে রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধের শিক্ষাদান করিয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম ও চেষ্টাকে সম্মিলিত করিয়া এক প্রবল শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। ইহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে, আজ ভারতের শত জাতি ও শত সম্প্রদায়ের সহস্র বিভাগের ব্যক্তিগণের মধ্যে সহোদরের ন্যায় এক স্নেহ ও সহানুভূতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে, আজ ইংলণ্ডের উদার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভারতের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগের বিষয়ে সহানুভূতির সহিত কর্ণপাত করিতেছেন এবং আমাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচনের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতিই আজ জগতের নিকট ভারতবাসীকে একটা শিক্ষিত ও সম্মিলিত জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছে এবং ভারতের শাসন-বিধির অব্যবস্থা ও অবিচারের বিষয় প্রচার করিয়াছে। ইহারই যত্নে ও চেষ্টায় আজ ভারতে সামরিক ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়াছে, প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসী সভ্যের সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য সাধন প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহারই নিঃস্বার্থ চেষ্টা যত্নের ফলে আজ ভারতের শিল্প জগতে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভারতবাসীর শুষ্ক শীর্ণ অস্থিকঙ্কালের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রভাত।

১

পোহাইল বিভাবরী, নীলনভোস্থলে
বিলীন নিশারকান্তি নক্ষত্র নিকর,
অস্তগত শশধর পশ্চিম অচলে,
পরিল ধরণীলোকে বসন ধূসর।

২

মুদিল কুমুদকুল সরসীর নীরে,
সরোজিনী উন্মাদিনী পতি দরশনে,
লজ্জাবগুণ্ঠন খুলি চাহে ধীরে ধীরে,
বিষাদ প্রমোদ কিবা শোভে একমনে।

৩

গাহিল প্রভাত গাথা সুমধুর স্বরে,
মঞ্জুল নিকুঞ্জচর বিহঙ্গম গণ,
ঢালিল অমিয়ধারা শ্রবণ বিবরে,
ভক্তিরসে পরিপ্লুত মানবের মন।

৪

প্রস্ফুটিত পুষ্পবাস করিয়া হরণ,
মৃদুমন্দ ভাবে বহে শান্ত সমীরণ,
ভূজনে লুণ্ঠিত ধন কবি বিতরণ,
কথঞ্চিৎ করে তার পাপ বিমোচন।

৫

সপ্ত হয় সংযোজিত বিমান স্যন্দনে,
অরুণের দিব্যমূর্ত্তি হইল প্রকাশ,
রঞ্জিয়া রক্তিম রাগে উদীচ্য গগনে,
পড়িল সবারমাঝে রূপের বিভাস।

৬

ঝিল্লীগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে রবে না এখন,
ডাকেনা পেচক আর সকরুণ স্বরে,
হেরিয়া ভাস্করে যত নিশাচরগণ,
লুকায় কন্দরে কিম্বা তরুর কোটরে।

৭

শ্রেণীবদ্ধ সারি সারি তটিনীর নীরে,
যতেক তরণী ছিল করিয়া নঙ্গর,
শয্যাত্যাজি মাল্লাগণ উঠি ধীরে ধীরে,
ভাসায় তরণী মুখে বদর বদর।

৮

বাষ্পযান ভয়ঙ্কর গম্ভীর হুঙ্কারে,
উন্মত্ত হইয়া করে ধূম উদ্গীরণ,
বাড়বা অনল ক্রীড়া তটিনীর নীরে,
অথবা আগ্নেয়োদগম হেন লয় মনে।

৯

মৃদুল পবনে কিবা মৃদুমন্দ দুলে,
নবলতাবলী আর মহীরুহ গণ,
ভক্তিভরে নত শিরে মন প্রাণ খুলে,
নমিছে তাঁহায় যিনি অনাদি কারণ।

১০

সত্যব্রত ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু দ্বিজগণ,
পূর্ব্বাকাশে ঊষা আসি দিলে দরশন,
অবগাহনের তরে করেন গমন,
স্নানান্তরে স্তবপাঠে রত মনমন।

১১

অধ্যয়নে যত্নশীল বালক সকল,
শয্যাত্যাজি প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন,
পরিধান করিবাস শুভ্র নির্ম্মল,
অধ্যয়ন তরে সবে নিবেশিছে মন।

১২

গোপাল গোপাল লয়ে হরষিত মনে,
নবদূর্ব্বাদল ক্ষেত্রে করিছে গমন,
সেখানে চরায় সবে অতি সযতনে,
কিবা সতর্কিত ভাবে যতেক গোধন।

১৩

শয্যাত্যাজি প্রভাতেতে কৃষীবল গণ,
হল কর্ষণের তরে বলিবর্দ্দসহ,
ধাইছে প্রান্তর পানে অতি হৃষ্টমন,
প্রস্তুত সহিতে সবে ক্লেশ দুর্ব্বিসহ।

১৪

প্রভাতে নিদ্রার ভঙ্গে যত শিশুগণ,
মাতৃঅঙ্ক আরোহিয়া করিছে রোদন,
থামে না রোদন রোল সবে যতক্ষণ,
নাশিতে ক্ষুধার জ্বালা না পায় ওদন।

১৫

জননী করিয়া শান্ত সন্তান নিচয়ে,
সোহাগেতে তুষ্ট করি তাহাদের মন,
ক্ষিপ্রপদে হৃষ্টচিত্তে শশব্যস্ত হয়ে,
গৃহকর্ম্মে সবে কিবা নিবেশিছেমন।

১৬

নেহারি গগন ভালে অরুণ উদয়,
কোলাহল পরিপূর্ণ হল বিশ্বময়,
অগণন জন স্রোত প্রফুল্ল হৃদয়,
স্ব স্ব কর্ম্মে শান্ত ভাবে সবে রত হয়।

১৭

হে নাথ জগপতি, অজ্ঞান হৃদয়,
তর্কশাস্ত্র প্রসাদেতে স্বরূপ তোমার,
সমর্থ কিরূপে হবে করিতে নির্ণয়,
জগৎ আধার তুমি, বিশ্বমূলাধর।

১৮

এবিশ্ব আলেখ্যে যবে সুদীন নয়ন,
অন্বেষণ করে বিভো স্বরূপ, তোমার
তব অপরূপ রূপ, করি সন্দর্শন
বিমোহিত হয় নাথ হৃদয় আমার।

১৯

মধুর প্রভাতকালে নমি ভক্তি ভরে,
বার বার অনিবার হেনাথ তোমায়,
তোমার কৃপায় সুখী দেখি চরাচরে,
কৃপানাথ কৃপাকরি রেখতব পায়।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

—:০:—

পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য স্থান অপরিবর্ত্তনশীল শ্রেণীর অন্তর্গত। জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে উল্লিখিত মৎস্য সমূহের ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে। বর্ষা ঋতুতে যখন নূতন জলে নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায় সেই সময়ে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। আষাঢ় মাসের প্রথমে কিম্বা অম্বুবাচীর সময়ে যে সকল ডিম্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা

উৎকৃষ্ট দেখা গিয়াছে; জেলেগণ এই সময়ে কয়েকদিন যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান্য সময়ের ডিম্বাণু হইতে এই সময়ের ডিম্বাণু ইহারা অত্যন্ত বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই সময়ের সংগৃহীত ডিম্ব বেশ সতেজ ও সজীব জলাশয়ে ছাড়িলে ইহার প্রায় একটিও নষ্ট হয় না, সমস্তই ফুটিয়া থাকে এবং পোনাসমূহ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব সেই সময়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা উচিত। ডিম্বাণু সকল জলের ফেণার সহিত মিশ্রিত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে, কাপড় কিম্বা এই উদ্দেশ্যে যে এক রকম জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দ্বারা ধরিতে হয়। নূতন জল প্রাপ্ত হইয়া নানাজাতীয় মৎস্য এই সময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, অতএব মৎস্যবিশেষের ডিম্ব বাছিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নহে, সকলেই একত্রিত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে। আমাদিগের বহু দর্শনের দ্বারা এবং এতদ্দেশীয় জেলেদিগের নিকট হইতে ডিম পরীক্ষা সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

যত জাতীয় ডিম্ব হউক না সমস্তই সংগ্রহ করিয়া একটি জলপাত্রে রাখিয়া দিতে হয়, তৎপর জলপাত্রের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া যদি ক্ষণকাল বদ্ধ করিয়া রাখা যায় তবে দেখা যায়, রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু হইলে ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই একস্থানে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিবে, যদি কোন প্রকার পোকা কি অন্যান্য মৎস্যের ডিম্ব হয়, তাহা হইলে তাহারা একত্রে কখনই জমাট বাঁধে না। এতদ্ভিন্ন রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা, প্রভৃতি মৎস্যের ডিম্বাণুর বর্ণ বিশুদ্ধ তাম্রের ন্যায়। আমাদিগের পরিচিত কোন ব্যক্তি জেলেদিগের নিকট হইতে একভার ডিম্ব ক্রয় করিয়া স্বীয় পুকুরে ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ১৫ দিবস পরে দেখা গেল, ঘুসোচিংড়িতে পুকুরটী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক উল্লিখিত উপায়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করতঃ পরীক্ষা করিয়া ভাল ভাল সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

প্রায় সকল পুকুরেই ডিম্ব ফুটিয়া থাকে, তবে যে সকল পুকুরের জল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং মৎস্যের খাদ্যোপযোগী কোন পদার্থই থাকে না বিশেষতঃ শোল, শাল, বোল, চিতল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয় মৎস্য থাকে, তাহাতে ডিম্ব ফুটনের আশা করা যাইতে পারে না। নূতন পুকুরে ডিম্ব সহজে ফুটে কারণ পুকুর কাটিলে কিম্বা পঙ্কোদ্ধার করিলে মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারাম্ল, প্রস্ফুরম্ মিলিতাম্ল ইত্যাদি পার্থিব পদার্থ অনায়াসে চুয়াইয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে এবং হিংস্রক মৎস্যাদি একেবারেই থাকে না। মৎস্যের চাস করিতে হইলে জলাশয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। জলাশয়ের জল বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে খুব ভাল হয়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা কর্ত্তব্য। এবং যাহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জলে না থাকে কিম্বা কোন রকম বিষাক্ত গাছ গাছড়া পুকুরের তটে না থাকিতে বা জন্মাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। শাল, শোল, বোল প্রভৃতি কতকগুলি হিংস্র জাতীয় মৎস্য আছে, ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও মৎস্যের পোনার প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া থাকে, অতএব যে পুকুরে মৎস্যের চাস করিতে হইবে, তাহাতে উল্লিখিত

হিংস্র জাতীয় মৎস্য যাহাতে বাস না করিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, হিংস্রজাতীয় মৎস্য চাসের পুকুরে থাকা, আর মেষেরপালে ব্যাঘ্র থাকা একই কথা।

ডিম্ব ফুটাইয়া মৎস্যের পোনা জন্মাইবার আর একটি সহজ উপায় আছে। একটু বড় রকমের একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহার তলা এবং চতুর্দ্দিক ইষ্টকের দ্বারা বান্ধাইয়া, তৎপর এক ভাগ বিলাতী মৃত্তিকা ও নয় ভাগ বালু মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা পলাস্তার্ করিতে হইবে। চৌবাচ্চাটির তলাতে কি অন্য কোন দিকে কৌশল করিয়া এমন ভাবে দুটি ছিদ্র রাখা উচিত যে তাহা দ্বারা অনায়াসে চৌবাচ্চায় জল আনয়ন ও পুরাতন জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং এই জল পরিবর্ত্তন করিবার সময়ে মৎস্যেরপোনার উপর যেন কোন রকম অত্যাচার না হয়; এই জন্য চৌবাচ্চার এক পার্শ্বে একটি দরজা (Penstock) রাখা আবশ্যক, উক্ত দরজা উত্তোলন করিলে জলের সঙ্গে পোনা সমূহ অনায়াসে সন্নিকটস্থ অন্য আর একটি জলপাত্রে যাইতে পারে। উল্লিখিত উপায় অবম্বন করিলে ডিম্বাণু নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুব কম। চৌবাচ্চাতে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে, ডিম্বাণু সকল ফুটিলেও, পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কয়েক দিন চৌবাচ্চাতে রাখা আবশ্যক। এবং এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা চাউলের গুড়া কি নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা উচিত। ইহার পর অনায়াসে অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া সকলেই যে ডিম ফুটাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, অতএব অন্য আর একটি উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমতঃ, ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে, পুকুরে পাঁক থাকিলে তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল হয়। যদি একান্তই পঙ্কোদ্ধার করিতে পারা না যায়, তবে সেই সময়ে পুকুরে যে কোন জাতীয় মৎস্য থাকুক না, তাহা ধরা উচিত। ইহার পর সুবিধা ও সময়ানুসারে নানা জাতীয় সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু, কিংবা পোনা সংগ্রহ করিয়া পুকুরেছাড়িতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে ডিম্বাণু সমূহ একেবারে শুষ্ক হইয়া কি পুড়িয়া যায়, এবং কখন কখন অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে ডিম্বাণু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কিম্বা শীতে প্রস্ফুটিত হইবার অনেক ব্যাঘাত জন্মায়, অতএব পুকুরে মৎস্যের ডিম্ব ছাড়িয়া ইহাদিগকে শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুকুরের মধ্যপ্রদেশেই হউক, কি অন্যকোন প্রান্তে হউক চারিটি খুঁটি পুতিয়া একটি "মাচা" প্রস্তুত করিয়া দিলেই হইতে পারে। যাহা হউক, পুকুরে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে ডিম্বাণু সকল ফুটিলে পর, মৎস্যের পোনা একটু বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পুকুরে রাখিলেই ভাল হয় এবং এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য, ময়দা, চালের গুড়া ও নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা আবশ্যক। তৎপর অন্য কোন পুকুরে স্থানান্তরিত করা উচিত, এইরূপ স্থানান্তরিত করাকে এতদ্দেশে "মাছ চালা" বলে। মৎস্য চালিয়া অন্য পুকুরে ফেলিবার পূর্ব্বে, পুকুর পূর্ব্ব লিখিত অনুসারে সংস্কার করিয়া নানা জাতীয় হিংস্র মৎস্য দূর করিতে যেন ভুল না হয়। জলাশয়ের জলকর অনুসারে মৎস্যের পোনা ছাড়া এবং মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। খাদ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আহারের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন বা ব্যায়াম

শরীর বৃদ্ধির আর একটি প্রধান উপায়। শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণী কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া থাকে। করুণাময় পরমেশ্বর নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে, কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন, ইহারা তদনুসারে স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় ও সুস্থ থাকে। ইহাদিগকে আহার অন্বেষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যতটুকু পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই এক রকম ব্যায়ামের কার্য্য সাধিত হয়। যাহা হউক পুকুরে মৎস্য জন্মাইয়া শুধু আহার দিলে চলিবে না, মধ্যে মধ্যে পুকুরে জাল ফেলিয়া কি অন্য কোন প্রকারে ইহাদিগকে তাড়া দেওয়া উচিত। কারণ, ইহারা অনায়াসে আহার প্রাপ্ত হয় বলিয়া বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে না, কাজেই নিতান্ত অলস হয়, এবং তজ্জন্য ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় না। সময়ে সময়ে তাড়া দিলে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, রেলওয়ের নিকটস্থ পুকুরগুলির কিম্বা তালপুকুরের মৎস্য অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, রেলগাড়ীর যাতায়াতের ভয়ানক শব্দ শুনিয়া বা দিবানিশি তালবৃন্তের "খড়খড়" শব্দে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে, এই ধাবন বা অঙ্গ সঞ্চালনই ইহাদিগের শরীর বৃদ্ধি হইবার প্রকৃত কারণ। মৎস্য সমূহ জলচর জীব বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাদিগকে শীতে ক্লেশ পাইতে হয় না, স্থলচর কিম্বা জলচর যে জাতীয় জন্তুই বল না কেন, শীতের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না এবং শীতকালে সাধারণতঃ সকল জন্তুই একটু বেশী নিস্তেজ হয়, অতএব শীত ঋতুতে মৎস্যদিগকে বেশী তাড়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পুকুরের নিকট রজকের বাসস্থান থাকা ভাল, রজকের দ্বারা দুইটী কার্য্যই সাধিত হইতে পারে, রজকগণের কাপড় "কাচার" শব্দে মৎস্যকুল ভীত হইয়া সাধারণতই দৌড়াইয়া থাকে, এবং এই অঙ্গচালনায় ইহারা বেশ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মলিন বস্ত্রের ময়লা ক্ষার প্রভৃতি খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বড় বড় দির্ঘীকায় একখানি ছোট রকমের নৌকা রাখিয়া সময়ে সময়ে বেড়াইলে, জলক্রীড়া ও মৎস্যকে তাড়া দেওয়া উভয় কার্য্যই অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, এ,

মৃত্যুর পর।

জগৎ—অর্থাৎ যাহা যায়। মানুষ জন্মে, আবার মরে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই জন্মে, আবার দুইদিন পরে, মরে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা সকলেই জন্মে; ও মরে। নির্ম্মল সলিলা প্রাণস্বরূপা স্রোতস্বিনী, নয়নানন্দকর গাম্ভীর্য্যময় সুনীল পর্ব্বতরাজি, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রী, সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত, উদ্ভিজ্জ ও জীব জগতের প্রসবিতা সবিতৃদেব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সুবিচিত্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সকলেরই আদি ও পরিণাম ঐ, জন্ম ও মৃত্যু, প্রকাশ ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়। সকলেই আসে ও কিছুদিনের জন্য বিশ্বে নিজ নিজ লীলা প্রদর্শন করিয়া আবার বিলীন হয়।

সমস্তই যায়! তবে কি কিছুই থাকে না? কবি-হৃদয় স্মৃতির অতীত কাল হইতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। তাহার ব্যাকুল হৃদয় কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না, যে, তাহার এত প্রেম, এত ব্যাকুলতা, এত আশা, এত পিপাসা সমস্তই মিথ্যা—সমস্তই চিত্তের ভ্রম মাত্র। সে যেন বিশ্বজোড়া বিরাট শূন্যতার অন্ধকারের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আলো রেখার আভাস দেখিতে পায়, যেন অনুভব করে,—বিশ্ব নিধ্বংসী কালের করাল কবলও ঐ আলোকণার নিকট উপেক্ষিত, তাহার ধ্বংশ নাই,—উহা ধ্বংশের পর পারে অবস্থিত। কবির প্রেমিক প্রাণ সর্ব্বদাই জানিবার জন্য ব্যাগ্র—যে, ঐ আলোটুকু কি প্রকৃতই সত্য; না উহা তাহার দৃষ্টিভ্রম?

ব্রহ্মাণ্ডে নশ্বর জগৎ ব্যতীত আরও কি কিছু আছে, যাহা নিত্য ও অবিনশ্বর? মানুষ মরে, কিন্তু মৃত্যুকেও উপহাস করে এমন কিছু কি তাহার মধ্যে আছে? কবির সরল প্রাণের এই গূঢ় ব্যাকুলতা টুকু লইয়া সংসারে বিশাল বাগ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; সাধুভাষায় ইহারই নাম দর্শন। পাগলের প্রলাপ বলিয়া কেহ কেহ উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে; কেহবা উহার ভিতর অনন্ত দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছে, নানা জনে ইহার নানা উত্তর দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মীমাংসা আজিও হইল না।

সেই প্রাচীন যুগের কবিতাময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে;—

"যেয়ম প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নাস্তীতি চান্যে"—মানুষ মরিয়া গেলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন, না, তখনও তাহার অস্তিত্ব থাকে, ইহার মধ্যে কোনটি সত্য? এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন ঘোর সন্দেহের অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় কি?

বিজ্ঞান কঠোর সত্যবাদী। বিজ্ঞানের সমর্থন ব্যতীত এখন কোন সত্যই সমাদৃত হয় না। সুতরাং আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব, বিজ্ঞান উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

বিজ্ঞান স্বীকার করে, শক্তি অনশ্বর ও নিত্য (Conservation of energy)। জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। কেহ তাহার উৎপাদন বা ধ্বংশ সাধন করিতে পারে না। জগতের বৈচিত্রময়ী ঘটনাবলী ইহারই বিভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্তি (transformation of energy) বশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ঐ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আকারে সমাহিত থাকে এবং পদার্থের বা এক আকারের শক্তি কিছু মাত্র ব্যয়িত হইবা মাত্র অন্য পদার্থে বা অন্য আকারে তাহা ঠিক সেই পরিমাণে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পরিমাপক নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থে কি পরিমাণ শক্তি বর্ত্তমান আছে তাহা আমরা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারি এবং এক পদার্থ হইতে শক্তি অপর পদার্থে চালিত হইলে ঐ চালিত শক্তিরই বা পরিমাণ কত, তাহাও আমরা স্থির করিতে পারি। এই যন্ত্র গুলির সাহায্যেই শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ স্থাপিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।

সংসারের যাবতীয় বিচিত্র ঘটনাবলী ঐ এক শক্তির এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গমনের ফল মাত্র। বিজ্ঞান বলে, বিশাল শক্তির আধার ভূত সূর্য্য হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত তাপ ও

আলোরূপে শক্তি বিকীরিত হইতেছে। তাহার কিয়দংশ আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিতে ঐ আলো ও তাপ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাহার ফলেই পৃথিবীতে বায়ুর সঞ্চালন, স্রোতস্বিনীর প্রবাহ, তুষার ধবল হিমগিরির ও সুনীল সমুদ্র বক্ষের প্রাণোন্মাদক অসীম গম্ভীর সৌন্দর্য্য; উহারই ফলে ধরিত্রী বক্ষের শষ্যশ্যামল পরম রমণীয়ত্ব, নর নারীর —মাধুর্য্যময় প্রেমের অনন্ত উচ্ছাস এবং জীবকুলের নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা ব্যপদেশে কঠোর জীবন সংগ্রাম, ঐ শক্তি, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিজ্জাদির সংগঠন সাধন করে এবং নবোদ্ভূত বৃক্ষ লতাদির অভ্যন্তরে তাহাদের জীবন স্বরূপ হইয়া তথায় নানাবিধ আকারে অবস্থান করে। উদ্ভিজ্জ সমূহ জীবকুলের খাদ্য বলিয়া, তন্নিহিত শক্তি আহার কালে আবার জীব শরীরে প্রবেশ লাভ করে ও তথায় নানারূপ জটিল রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তির উন্মেষ ঘটাইয়া শরীরীকে সঞ্জীবিত ও রক্ষা করিতে থাকে।

যে কোন ঘটনা হউক না কেন বৈজ্ঞানিক বলেন, তাহা ঐ একই শক্তির, অবস্থান্তর প্রাপ্তি জনিত, নানাবিধ লীলা; জড় জগতের এমন কোনও ঘটনা নাই যাহা উহার আয়ত্তের বহির্ভূত।

জড় বিজ্ঞান আরও বলে, যে (১) সূর্য্য নিঃসৃত শক্তির, বা যে শক্তির বলে পৃথিবী পূর্ণ সঞ্জীবিত, তাহার কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নাই; উহা অন্ধ এবং অন্ধ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য চালাইতেছে; (২) আর ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কোন শক্তির ও অস্তিত্ব জগতে নাই। মানসিক শক্তিগুলিও ঐ শক্তির কোন বিশেষ অবস্থা মাত্র।

পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনার ন্যায় মৃত্যুও একটী ঘটনা। যখন "ঘটনা" তখন বিজ্ঞানের মতে উহা অবশ্য ঐ অনশ্বর শক্তির অবস্থান্তর প্রাপ্তির একটা ফল মাত্র। বিজ্ঞান বলে,—শক্তি যে অবস্থায় থাকিলে প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে, মৃত্যুতে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; মৃত্যুর সময় দেহ মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণাদি নানাবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই শরীরের পতন বা মৃত্যু হয়। অম্লজান যবক্ষারজান জলজান প্রভৃতি মূল পদার্থ গুলি মৃত্যুর পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীব শরীরে অবস্থিত ছিল এবং সমষ্টি ভাবে উহারাই শরীর রূপী হইয়া ছিল। মৃত্যুর সময় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়; তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া পুরাতন শরীরের পতন সাধন করে এবং অন্যত্র নূতন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া নূতন শরীর গঠন করে।

এখন শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ সত্য বলিতে হইলে, বলিতে হইবে মৃত্যুর পূর্ব্বে জীব শরীরে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত ছিল মৃত্যুর পরেও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি তথায় বা অন্যত্র পরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে; তাহার বিনাশ সাধন হয় না।

শক্তি এক হইলে ও অবস্থাভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ হইয়াছে। সেগুলি আমরা সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছি:—(১) জড়শক্তি:—যথা আলো, তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি (২) অজড় বা মানসিক শক্তি, যথা—বুদ্ধি ইচ্ছা ইত্যাদি।

শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ অনুসারে, মৃত্যুর পূর্ব্বের জড় ও অজড় শক্তি সমষ্টি, মৃত্যুর পরে জড় ও

অজড় শক্তি সমষ্টির সমান হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে জড় শক্তির সমত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে পরিমাণ জড় শক্তি শরীরে অবস্থিত ছিল মৃত্যুর পরে ও তাহাই থাকে অবশ্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায়। কিন্তু মৃত্যুর পরে সমপরিমাণ অজড় শক্তির অস্তিত্ব কোন যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করা যায় না কিম্বা উহার কিছু মাত্রেরও যে অস্তিত্ব থাকে তাহা ধরিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু উহার অস্তিত্ব না থাকিলে শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ বিজ্ঞানের একটী কঠোর সত্য সুতরাং বিজ্ঞানকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে,—মৃত্যুর পর পারেও মানসিক শক্তি গুলির অস্তিত্ব লোপ পায় না।

অতএব বিজ্ঞানের সাহায্যেই সিদ্ধ হইল চিন্তা প্রেম, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির উপর মৃত্যুর কোন হাত নাই, উহারা মৃত্যুর অতীত। ইহাদের ধ্বংশ নাই; কোন জড় শক্তির ন্যায় উহারা অবস্থান্তরে যাইতে পারে মাত্র।

মন, বুদ্ধি, চিন্তা, শক্তি অহংজ্ঞান, প্রেম, দয়া ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির মৃত্যুর পর পারে অস্তিত্ব থাকিলেও তাহারা কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে তাহা এখনও আমাদের বোধগম্য হইল না। তবে কি ভাবে ইহারা শূন্যে শূন্যে অনাধার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়? না, তাহা নয়। যখন আধার রহিত অবস্থায় কোন শক্তিরই অস্তিত্ব দেখা যায় না, তখন মানসিক শক্তিগুলিই বা কেন ঐ অবস্থায় থাকিবে? এই জন্য স্বীকার করিতে হয় মৃত্যুর পরেও উহাদের কোন আধার থাকে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহারা অবস্থান করিতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে ঐ আধারের নাম লিঙ্গশরীর।

আরও একটী কথা, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির স্বাধীন ক্ষমতা নাই। রেলওয়ে এঞ্জিন ভীষণ শক্তির আধার তথাপি উহা পরাধীন; ড্রাইভারের পরিচালনা ব্যতীত উহা গম্য স্থানে গমন করিতে পারে না এবং তদ্ব্যতীত কোনও কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। সেইরূপ, চিন্তা প্রীতি ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতির কোনই কার্য্য কারিতা থাকে না, যদি তৎপশ্চাতে কোন একটি পরিচালক না থাকে।

আমরা জানি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক শক্তি গুলি হইতে কার্য্য প্রসূত হয়; তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উহারা কাহারও কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রণোদিত হইতেছে। সেই পরিচালকের নামই আত্মা। মৃত্যুর পরে যদি ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে আত্মার ও অস্তিত্ব সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারেই সিদ্ধ হইল, মৃত্যুর পরেও মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সহ আত্মা বর্ত্তমান থাকে; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার ধ্বংশ সাধন হয় না; উহা নিত্য। অতএব আমরাও এখন নিঃসংশয়ে ভগবদ্বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া গাহিতে পারি—

"বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতিনরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্ব গতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥

শ্রী ঃ—

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী।

শুভ্রীকরণ (Bleaching)*

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রঞ্জন কর্য্যের পূর্ব্বে সূত্র বা বস্ত্রকে শুভ্র করিয়া লইতে হয়। কার্পাস পশম ও রেশমের শুভ্রীকরণ প্রণালী ক্রমান্বয়ে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণীত হইল।

কার্পাস সূত্র বা বস্ত্র ঃ—তূলার মধ্যে স্বভাবতঃই কিয়ৎপরিমাণে ময়লা থাকে। এইজন্য তদ্দ্বারা সুতা প্রস্তুত করিলে উহা দেখিতে ধূসরবর্ণ হয়। আবার টানা (১) করিবার সময় উহাতে আবও মলা (২) সঞ্চিত হয়; সময়ে সময়ে ঐ মলার পরিমাণ সুতার মোট ওজনের প্রায় তৃতীয়াংশের এক অংশ পর্য্যন্ত দাড়ায়। কাল অথবা অন্য কোন ঘন রং করিতে হইলে সুতাকে শুভ্র না করিলেও চলিতে পারে; কেবল গরম জলে ফুটাইয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। ফিকে রং করিতে হইলেও সুতাকে একেবারে সাদা ধপ্‌ধপে না করিলেও চলে; রঞ্জকগণ এক্ষেত্রে সাধারণতঃ সুতাকে গরম সোডা বা কোন ক্ষারের (ছাই) জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া লইয়া পরে ক্লোরাইড অব লাইম বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড এর জলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া কাচিয়া লয়; তৎপরে ইচ্ছামত রং করে। সুতাকে একেবারে সাদা করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় (৩) অবলম্বন করা আবশ্যক ঃ—

(ক) ধরা হউক, আমাদিগকে প্রায় ৪০ মণ সুতা শুভ্র করিতে হইবে। ৪৪০ গ্যালন জলের মধ্যে ১°১৬ আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ৩২° টৌয়াডেল* ঘনত্ব বিশিষ্ট ৬৬ গ্যালন কষ্টিক সোডার জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত পরিমাণ সুতা ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাও; তৎপরে পরিস্কার জলে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল ধরিয়া সুতা কাচিয়া নিংড়াইয়া লও।

(খ) পরে ঐ সুতাকে ১০ টৌয়াডেল ঘনত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) এর মধ্যে ছোপাও; পরে পুনরায় উহাকে কাচ।

যদি সুতাকে রং না করিয়া কেবল শুভ্র করিয়া রাখাই উদ্দেশ্য থাকে তবে উহাকে সামান্য নীল ও সাবান (Ultra marine blue &c and soap) এর জলে পুনরায় ছোপাইয়া, নিংড়াইয়া শুকাইয়া লও।

এই উপায় অবলম্বন করিলে সুতা ঠিক বরফের মত সাদা হইবে। নিম্নে অপর দুইটী

---

* শুভ্রীকরণ শব্দকে আমার এখন হইতে bleaching শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিব।

(১) Warp,

(২) মাটি, তেল চর্ব্বি প্রভৃতি।

(৩) Textile fabrics by Hummel ১২-১৩ পৃঃ।

* তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাণ যন্ত্র বিশেষ।

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারের দোকানে ইহা বিক্রয় হয়; মূল্য আনুমানিক ৬৲ টাকা। তরল পদার্থের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ইহা ভাসিতে থাকে ইহার গায়ে কতকগুলি দাগ কাটা আছে; ইহার যে দাগ ঠিক তরল পদার্থটির মাথা (Surface) স্পর্শ করিয়া থাকে, ঐ দাগ বা সংখ্যাই ঐ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব জ্ঞাপক।

(১) ইহাও ডাক্তারের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়; প্রতি পাউণ্ডের মূল্য আনুমানিক ।৶০ আনা মাত্র।

উপায় সংক্ষেপে বর্ণীত হইতেছে। অল্প পরিমাণ জিনিসের পক্ষে উহাদের বিশেষ উপ-যোগিতা দৃষ্ট হয়।

(১) ২ পাউণ্ড কষ্টিক সোডা ও ৩ পাউণ্ড সাবান ১৪০ পাউণ্ড জলের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে ১০০ পাউণ্ড সুতা বা কাপড় ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইয়া লও তাহার পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া শুকাও।

(২) দেড় ডিগ্রী-টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট ব্লিচিং পাউডারের শীতল জলের মধ্যে সুতা বা কাপড় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখ; তৎপরে তাহাকে উঠাইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত টেবিলের উপর রাখিয়া দাও। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন ব্লিচিং পাউডারের গুড়া সুতার গায়ে লাগিয়া না থাকে; যে স্থানে ঐ গুড়া লাগিয়া থাকিবে তথায় ছিদ্র হইয়া যাইবে। তৎপরে ১ ডিগ্রী টোয়াডেল ঘনত্ব বিশিষ্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলে ঐ সুতা ১০ মিনিটকাল রাখিয়া পরিষ্কার জলে উহাকে ভাল করিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লও।

পশমঃ—স্বাভাবিক অবস্থায় পশমের উপর কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থের আবরণ থাকে। উহার পরিমাণও নিতান্ত কমনয়; একসের পশমে ঐ মলার পরিমাণ প্রায় ১।৷৹ ছটাক। প্রথমে এগুলিকে না উঠাইয়া ফেলিলে পশমে রং ধরান যায় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশে জান্তব মূত্রের সাহায্যে ঐ কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে। ৫ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ জান্তব মূত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে পশম বেশকরিয়া কাচিয়া লইলে পশমের তৈলাক্ত অংশ প্রায় সমস্তই উঠিয়া যায়। দুর্গন্ধ ব্যতীত এপ্রণালীর আর অন্য কোন দোষ নাই। পাশ্চাত্য দেশে ইহার পরিবর্তে, পেট্রোলিয়ম, ইথর, কার্ব্বনবাইসালফাইড, বেনজিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ঐ জন্য সাবানের জলের সহিত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। ময়লা উঠিয়াগেলে পরিষ্কার জলে পশম বেশ করিয়া কাচিয়া লইয়া তৎপরে উহাকে শুভ্র করিতে হয়। শুভ্রকরিবার অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে আমরা নিম্নে দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিলামঃ—

(১) ৩২° টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট সোডা সালফাইটের জলে পশমকে ১৪।১৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, তৎপরে উহা নিংড়াইয়া পুনরায় উহাকে ৬° টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে কিছুক্ষণ ছোপাইয়া পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লও।

(২) ৪৬ গ্যালন জলের মধ্যে দুই গ্যালন হাই-ড্রজেনপারঅকসাইড, ও কিছু লাইকার অ্যামো-নিয়া মিশ্রিত করিয়া ঐজলের মধ্যে ১০ পাউণ্ড পশম প্রায় ১০।১২ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখ ও মধ্যে মধ্যে নাড়িতে থাক; তাহার পরে ঐ জল ১২০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহাতে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া পশমকে গরম কর; পরে পরিষ্কার জলে পশম কাচিয়া লও।

(৩) বার্মিংহামের নিকটস্থ ওল্ড্‌বারি নামক নগরের আলুমিনিয়ম মেটাল কোং কর্ত্তৃক প্রস্তুত সোডিয়ম পার অকসাইড দ্বারাও পশম অতি সুন্দর রূপে শুভ্রকরা যাইতে পারে। সোডিয়ম পার অকসাইড দেখিতে ধূসর বর্ণ; জলে দিলে সোঁ। সোঁ। শব্দ করিতে করিতে উহা গলিয়া যায় এবং ঐজল ক্ষার গুণ যুক্ত হয়। ২০ গ্যালন জলের সহিত ৩ পাউণ্ড দানাযুক্ত ম্যাগ্নেসিয়ম সালফেট ও ১ পাউণ্ড সোডিয়ম পার অকসাইড ক্রমশঃ মিশাও পরে ঐ জলকে ১৮০° ফা ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত

করিয়া এবং তন্মধ্যে পশম ডুবাইয়া, প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাড়িতে থাক; পরে জলের তাপ বৃদ্ধি করিয়া ১ঘণ্টা কি ১।।০ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ফুটাইতে থাক, অবশেষে উহাকে নিংড়াইয়া অল্প ঘনত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবকের জলে কিছুক্ষণ ছোপাইয়া পরিষ্কার জলে কাচিয়া লও। ১ পাউণ্ড সোডিয়ম পার অকসাইডের সাহায্যে প্রায় ১২ পাউণ্ড পশম শুভ্র করা যায়।

রেশম:—পশমের ন্যায় রেশমের উপরেও একরূপ তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। উহাকে উঠাইবার উপায় ঠিক পশমের অনুরূপ। পশম শুভ্র করিবার যে যে প্রণালী উপরে বর্ণীত হইল ঐ প্রণালী অবলম্বনে রেশমকেও শুভ্র করা যাইতে পারে। শুভ্রীকরণ প্রণালী যতই উন্নত হউক না কেন তথাপি সুত্রাদি শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ ধূসর বর্ণ থাকিয়া যায়; এইজন্য শুভ্রীক্রিয়ার অন্যান্য সমস্ত প্রণালী অনুষ্ঠিত হইবার পরেও রেশমকেও কিছুক্ষণ অল্পপরিমাণ নীল মিথিল ভায়লেট বা মিথিলিন ব্লু মিশ্রিত জলের মধ্যে ছোপাইয়া লওয়া আবশ্যক। এতদ্দ্বারা ধূসর ভাবটুকুও দূরীভূত হয়।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ।

রূপমতী।

ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে মালবপ্রদেশ কিছুকালের জন্য রাজবাহাদুর নামক একজন অফ্‌গান সর্দ্দারের অধীন হয়। রাজদীল্লীশ্বরের বেতন ভোগী প্রতিনিধি ছিলেন না সুতরাং মালব তখন এক প্রকার স্বাধীন রাজ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রূপমতী ইহারই প্রধান মহিষী ছিলেন।

এই স্বনাম প্রসিদ্ধা অসামান্যা গুণবতী ও সৌন্দর্য্যশালিনী ললনার নাম হিন্দুস্থানের গৌরবময়ী ও চিরপূজ্য রমণীবৃন্দের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইলেও আধুনিক ইতিহাসে ইহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না ইহা আমাদের ইতিহাস পাঠের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তাহা বলিতে পারি না। রূপমতী যে কেবল মাত্র গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন, তাহাই নহে,—তিনি রমণীর সারধনে ধনবতী—সতীত্বের আদর্শরূপিনী ছিলেন। যাহার জন্য কুৎসিতা হইলেও অরূপ রূপলাবণ্যবতী এবং যাহার অভাবে রমণী সুরূপা হইলেও কুৎসিতা, যাহার জন্য রমণীর রমণীয় নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকে, যাহার জন্য অলোক সামান্যা রূপবতী পদ্মিনীর নাম অদ্যাপি স্মৃতি মন্দির পবিত্র করিতেছে তাহার জন্য রূপমতীর নাম এত প্রসিদ্ধ।

তাঁহার জীবনী কাব্যের মত সুকোমল ভাবাপন্ন নহে; তাঁহার সমগ্র জীবন কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং সেগুলি সুরতান লয়ে গান করিতেন। নৃত্য গীতবিদ্যায় তিনি সম্যক পারদর্শিনী ছিলেন।

উজ্জয়িনী হইতে চতুর্ব্বিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, কালিসিন্ধুনদীর পূর্ব্বতীরস্থিত সারংপুর নামক একটী প্রাচীন নগরে রূপমতী জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা মাতা ও শৈশব ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই অবগত নহি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালকম সাহেবেরমতে রূপমতী সারঙ্গপুরের নৃত্যব্যব-

সায়িনী বালিকা ছিলেন। নর্ত্তকী হইলে কি হয়, তাঁহার গুণগ্রামে ও অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে তাঁহার নাম ও খ্যাতি বহুদূরে বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে সে সংবাদ মালবাধিপতি রাজবাহাদুরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

এই আফগান সর্দ্দার তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন সৌন্দর্য্য লিপ্সা তাঁহার প্রাণে অহরহঃ বিদ্যমান ছিল। তিনি সঙ্গীত ও কবিত্বের অসাধারণ পক্ষপাতী ছিলেন। রূপমতীর গুণাবলী ও সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল সে, তিনি অবিলম্বে রূপমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাজ বাহাদুর রূপমতীর গুণগ্রামে যেমন আত্মহারা, রূপমতীও রাজা বাহাদুরের গুণগ্রামে তেমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন। প্রগাঢ় প্রণয়, অকপট অনুরাগ ও নির্ম্মল প্রেম প্রণয়ী যুগলের সরল প্রাণে অপরূপ ভাবের স্বজন করিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, মানব সুখের এই বুঝি চরমোৎকর্ষ, পবিত্র প্রণয়লীলার এই বুঝি পরিণতি! সপ্তবর্ষ ব্যাপিয়া রাজ বাহাদুরের সুখের জীবন এমনই ভাবে অতিবাহিত হইতেছিল।

আকবরের দুর্দ্দমনিয় রাজ্যলিপ্সা লোলিহান রসনা মালবের শান্তিময় প্রদেশের উপর পতিত হইল। তাহার ফল স্বরূপ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আদম খাঁর নেতৃত্বে একদল সেনা মালবাধিকারে প্রেরিত হইল। একরূপ বিনাযুদ্ধেই রাজবাহাদুর পরাভূত ও বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার অপরিমিত ধনরাশি অগণিত হয়, হস্তি, সুবিখ্যাত "বেগম মহাল" আদম খাঁর হস্তে পতিত হইল।

রূপমতীর জীবনের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত বিদ্যমান থাকিলেও তিনি আদম খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আত্মঘাতিনী হয়েন, এই বিষয়ে সকল গুলিরই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

একটী মত এই। আদম খাঁর সহিত যুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজবাহাদুর তাঁহার "বেগম মহাল" সারঙ্গপুরে স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে আদেশ দেন "আমার পরাজয় দেখিলে তোমরা "মহলে" প্রবেশ করিয়া বেগমগণকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিবে যুদ্ধের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা রাজবাহাদুরের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। এই সংবাদ আদম খাঁর নিকট পৌছিল, তিনি ইতিপূর্ব্বেই রূপমতীকে যেরূপেই হউক, হস্তগত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে যখন তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিয়া সংবাদের যথার্থতা প্রমাণ করিল, তখন তিনি স্বয়ং রূপমতীর আহত দেহ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, রূপমতী তখনও জীবিতাবস্থায় চাহিয়াছেন। আদম খাঁ তাহার ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন ও বন্ধন (Bandage) করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপমতী কিছুতেই বাঁধিতে দিলেন না। যখন তিনি শুনিলেন, রাজবাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবেন, তখন তিনি বাঁধিতে আদেশ দিলেন। রূপমতী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে আদম খাঁর কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে বিষপানে আত্মঘাতিনী হয়েন।

অপর একটী মত এই। তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েন। বিষপান করেন নাই।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী আমরা

মুসলমান ঐতিহাসিক দফি খাঁর ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হই। তিনি বলেন, রাজবাহাদুর পরাজিত ও নিরুদ্দেশ হইলে রূপমতী আদম খাঁর হস্তগত হয়েন। খাঁ সাহেব বারবার তাঁহাকে প্রণয়িনী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সতী রমণী বরাবরই তাহার প্রত্যাখান করেন।

ইহাতে আদমখাঁ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নাশ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন।

যখন অনুনয় বিনয়ে ও কিছুই হইলনা, তখন সতীসাধ্বী রূপমতী সেই মহা সঙ্কটময় অবস্থার উপযোগী—সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য শেষেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি আদম খাঁর, অভ্যর্থনার জন্যে একটী দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। সেদিন রূপমতী বহুমূল্য রত্নরচিত পরিচ্ছদ ভূষিতা হইয়া ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। এমন সময়ে আদমখাঁ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া সহচরী বৃন্দ অনতি বিলম্বে রূপমতীকে জাগরিত করিতে গেলেন, কিন্তু হায়! তিনি আর জাগিলেন না, সে আকর্ণ বিস্তৃত সুন্দর নয়ন আর উন্মীলিত হইল না।

তখন বুঝাগেল বিষপানে রূপমতী চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কোন স্বর্গীয় পদার্থের পবিত্রতা রক্ষণে তুচ্ছপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন! ধন্য রূপমতী! ইহার জন্যেই তোমার নাম মানবের আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে অদ্যাবধি উচ্চারিত হইতেছে।

রূপমতী অসাধারণ সতিত্বগুণে গুণবতী। তাঁহার রচিত গাথা গুলি "রাজভূপ কল্যাণ" নামে আখ্যাত। সেগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নাইবটে, কিন্তু ভারতবাসী মাত্রেই সগৌরবে সেগুলি গান করিয়া থাকে। আজপর্য্যন্ত মালবের সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণ "রাজভূপ কল্যাণ" গীতগানে জীবিকার্জ্জন করে।

পতি প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ রূপমতী রচিত দুইটী কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পাপি প্রাণ রহত ঘট
ভিতর কিয়ো চাহত সুখরাজ।
রূপমতী পিয়ে হামুসি দুঃখিয়া॥
কাঁকগয়া পিয়া বাহাদুর রাজ!

ইহা বিরহ সঙ্গীত। রাজ বাহাদুরের অনুপস্থিত জনিত বিরহে রচিত।

তনুবিনুজিত্ত বারহত হট,
মাঁগত হাই সুখরাজ,
রূপমতী দুখিয়া তেই
বিনে বাহাদুর রাজ!

প্রবাদ এই রূপ, আদম খাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া যখন রূপমতী ছুরিকা ঘাতে আত্ম-ঘাতিনী হয়েন, উক্তগীত সেসময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিসৃত হইয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে সকল গুলি দিতে পারিলাম না।

এই দুইটী কবিতাই রূপমতীর অসামান্য পতি প্রেম ও সতীত্বের পরিচায়ক নহে কি?

শ্রী—

—০:*:০—

আর্য্য শক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্য রথীগণের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসা জাতীয় জীবনের উন্নতি স্রোতে ভাষা ও ভাবের, বক্তব্য ও কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ও সমাহারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্ত

দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্য আয়াসসাধ্য হইলেও স্বকীয় কার্য্য কারিতা দ্বারা সমাধান প্রয়াস, শিক্ষা বৈষম্যে বঙ্গীয় মস্তিষ্কে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, ইহাই দুঃখ; তবে লাভ এই,—এখন এ বিংশ শতাব্দীর, অস্তিত্ব সংরক্ষণের পারস্য গোষিত নির্ম্মলযুগে, স্বার্থসংঘর্ষের ঘোর দুর্দ্দিনে এ দুঃখের প্রতিকারকল্পে সামর্থহীনতা সত্বেও আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে পানীয় অভাব কিন্তু পিপাসার উত্ত-রোত্তর বর্দ্ধন শীলতা এক দিন না এক দিন পূর্ব্ববৎ আত্মনির্ভরতা আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই।

আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়। মনুষ্যের আদর্শ কাল্পনিক দেবতা না হইয়া মনুষ্য হওয়াই উচিত। স্বদেশীয় মহাপুরুষ অর্থাৎ আর্য্য ঋষিগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতি হাসের উপর নির্ভর করে। অতীত ইতিহাস প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দিগের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যাতীত কিছুই নহে। যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই সুতরাং উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য, অতীত যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্তের আলোচনা করা তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা অতীত যুগের স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অতীতই ভারতবর্ষের সম্বল। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক দেশেরই অতীত ইতিহাস এরূপ সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। বহুবিপ্লব, ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারত সন্তানগণ অনেক পরিমাণে সে সকল অতীত কাহিনী বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু আবার বিধির কৃপায় সুদিন উপস্থিত হইয়াছে; আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রাচীন আর্য্য পণ্ডিতদিগের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অল্প, সেই জন্যই আমরা তাঁহা-দিগকে বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহারা যাহা উপদেশ দিতেন তাহা কর্ণপাতও করিতাম না। আমাদিগের অধঃ পতনের ইহাই মূলকারণ। তাঁহারা বলিতেন,—সত্য কথা কহিও, পরস্ত্রী গমন করিও না নিষ্ঠুরতার সহিত কাহাকেও ব্যবহার করিও না, তাহা হইলেই তুমি রোগ শোক পাপমতি হইতে দূরে থাকিয়া পরমাসত্তারে আপনাপনি জ্যোতিষ্মান্ হইতে থাকিবেক ও দীর্ঘায়ুলাভে সদানন্দে কালযাপন করিতে পারিবেক। শিক্ষাগুণে প্রাচীন আর্য্য সমাজ যেরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়শীল, জগতে অধ্যবসায়ের এরূপ নিদর্শন কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরাণোক্ত ঋষিগণের দিব্য জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টি দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জগতের সর্ব্বস্থানের বিষয় অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অলীক বলিয়া জানিতাম; কিন্তু যখন জানিলাম যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের একত্র সাহায্যে দ্রব্যের অস্তিত্ব ও মানবাত্মার অবিনশ্বরত্ব, ইউক্লিডের (জ্যামিতি) প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিতে পারা যায়। অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, এমন কি

সেই মহাত্মা ঋষিগণের সহিত অনেক দিন একত্র বাস করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ছেন। তখন তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছি যে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আদৌ স্পর্শ করিতে সক্ষম না হইয়া প্রায় একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন ও যে বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কারণ ও পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও অবস্থিতি বিষয়ক কারণের জ্ঞান জন্মে, তাহা কেবল তাঁহারাই বিদিত আছেন। তাঁহাদের যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সাধারণের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা বলেন যে, উহা কেবল সেই বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভাবে হইয়া থাকে,। সকল বিষয় সকল বস্তু ও সকল কার্য্যই স্বাভাবিক নিয়মান্তর্গত। স্বভাবের নিয়মের বহির্ভূত কোন কর্ম্মই কখন সম্পাদিত হইতে পারে না।

মানব বুদ্ধির যে কত শক্তি তাহা মানুষ নিজেই অবগত নহে। কিন্তু আর্য্য মনীষীগণ জ্ঞাত আছেন। কাষ্ঠে অগ্নি আছে বলিয়াই দুইখণ্ড একত্র ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষে অনেক শক্তি অব্যক্তভাবে আছে বলিয়াই ক্রমে অনেক অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের এত উন্নতি হইতেছে। বৃক্ষ উৎপাদন করা ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুফল ফলার শক্তি বীজেই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। ক্ষেত্রগুণে ও বাহ্যিক চেষ্টাতেই যেমন বীজ নিজশক্তি প্রভাবে একটী সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ কাল ও স্থান বিশেষ ও নিজ যত্ন ও চেষ্টায় মনুষ্য আপনার সেই অব্যক্ত শক্তি প্রভাবে সমস্ত জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই আর্য্য ঋষিগণ ঐ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও সেই মহাপুরুষের সন্তান ব্রাহ্মণ, আবার উদ্যোগ করিলে আমরাও কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই।

কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে যে কতদূর কঠোরতা পালন করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রকারগণ পুনঃপুনঃ বলিয়াগিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যে অর্থাদি বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, তাহা আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিয়া গিয়াছেন।

"ন ধর্ম্মবর্জ্জিতং কামমর্থং বা মনসা স্মরেৎ।
সীদন্নপি স্বধর্ম্মেণ নত্ব ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
ভূতানাং প্রিয়কারী স্যান্ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ॥"

কূর্ম্ম পুরাণে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবিহীন কোন কামনা অথবা অর্থের বিষয় স্মরণও করিবেন না; আপনার ধর্ম্মে থাকিয়া যদি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হন, তথাপি বৈশ্যাদির ধর্ম্ম অথবা যাহা ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধক হইবেন, কখনই পরের অনিষ্টসাধন বিষয়ে বুদ্ধি নিবেশ করিবেন না। ইহা অপেক্ষা আর কি স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে পারে! ধর্ম্ম রহিত অর্থ অথবা কামনার প্রাপ্তি ত দূরের কথা; সে বিষয় চিন্তা করিতেও ব্রাহ্মণের নিষেধ। ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যদি ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহও না হয়, তথাপি কৃষিশিল্পাদি বৈশ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ কেবল পরের মঙ্গল সাধনেই রত থাকিবেন। এইরূপ ভাবে যাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে কি আর কাহাকেও উপদেশ দিতে হয়, ভক্তি শ্রদ্ধা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ ঋষিগণ যে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া পূর্ব্বকালে তাহাদিগকেই প্রথমে সত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রদান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি, কারণ যাহা ন্যায় তাহাই সত্য, যাহা পুণ্য তাহাই সত্য আর যাহা অন্যায় যাহা পাপ তাহাই মিথ্যা। শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন ঃ—

নাস্তি সত্য সমো ধর্ম্ম ন সত্যাং বিদ্যতে পরম।
নহি তীব্র তরং কিঞ্চিদনতাদিহ বিদ্যতে॥

অর্থাৎ "সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর পদার্থ জগতে লক্ষিত হয় না।" এই জন্য ব্রাহ্মণকে প্রথমে সত্য পরায়ণ হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের সুবুদ্ধি ছিল; মনুষ্যের দুই প্রকার বুদ্ধি সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। যে বুদ্ধি আমাদিগকে শুভকার্য্যে উত্তেজিত ও অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে তাহাই সুবুদ্ধি, আর যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা অন্যায় কার্য্য করি তাহাই কুবুদ্ধি। সুবুদ্ধির পরামর্শে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ কুবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধির অনুসরণ করিতেন। শাস্ত্রেও কথিত আছে ঃ—

"যস্ত নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥"

অর্থাৎ "যিনি মোহবশতঃ হিতবাক্য গ্রহণ না করেন তিনি দীর্ঘ সূত্রী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হন।" ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ করিবেন এই কথা ঋষিগণ পুনঃপুনঃ আদেশ করিয়াছেন, কারণ সাধু সঙ্গে আমাদের সাধুতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য সাধু সঙ্গ যেমন প্রার্থনীয় মন্দ সঙ্গও তেমনি পরিত্যাজ্য। যথা ঃ—

"মোহজালস্য কেনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধু সমাগমঃ॥"

অর্থাৎ "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধুসংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।" শাস্ত্রকারগণ আরও উপদেশ দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের "কৃতজ্ঞতা" রূপ মহারত্ন হৃদয়ে সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া রাখিতে হয়।

কেহ উপকার করিলে সেই উপকার অনুভব করিয়া উপকারক ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের যে সদ্ভাব ও অনুরাগের উদ্রেক হয় তাহাই কৃতজ্ঞতা। উপকার পাইয়া যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ না হয় সে নিতান্ত নীচ প্রকৃতির লোক। আর্য্য শাস্ত্রে কৃতঘ্নতা সকল পাপের অপেক্ষা মহত্তর পাপ বলিয়া গণিত। এইজন্য আর্য্য ঋষিগণ বলেন ঃ—

ধন্যস্ত কশ্চিল্লোকে হৃদয়ং তদলঙ্কৃতম্।
বিরাজতে সদা যত্র মহারত্নং কৃতজ্ঞতা॥

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তিনিই ধন্য, তাঁহার হৃদয়ই অলঙ্কৃত যাঁহার হৃদয়ে মহারত্ন কৃতজ্ঞতা সতত বিরাজিত।

ব্রাহ্মণের আর একটী গুণ থাকা বিশেষ প্রয়োজন, উহা ক্ষমা। সংসারের সকলেই ক্ষমার প্রত্যাশী। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক পরস্পর সকলেই সকলের নিকট কোন না কোন সময়ে অপরাধী হইয়াই থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তাহা হইলে সংসার কি অশান্তির আলয় হইয়া উঠে! বস্তুতঃ সংসারে ক্ষমা পাওয়া যায় বলিয়াই সংসারে শান্তি আছে।

অন্যকে ভাল বাসিতে পারিলে ক্ষমা করা

অতি সহজ। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ লোকদিগকে ভাল বাসিতেন। যাঁহারা মহৎ লোক তাঁহারা পরকেও আপনার মত ভাল বাসেন, সুতরাং শত্রুকেও ক্ষমা করেন—অপকারীর উপকার করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহাই যথার্থ প্রতিশোধ, কেন না এইরূপ প্রতিশোধে শত্রুও মিত্র হয়। শাস্ত্রেও বলে—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানে জয়েৎ সত্যেন চানৃতং॥

অর্থাৎ "ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপরাধীকে জয় করিবেক এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

পুরাকালে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধনের দিকে এখনকার মত লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র ধর্ম্মের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। এই স্বধর্ম্মের বলেই তাঁহারা মহাসুখে কাল যাপন করিতেন। সংসারে ধন একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা ধনে আমাদের অনেক অভাব মোচন হয়, ধন ব্যবহার করিতে জানিলে ইহা দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়, সুতরাং সকলেরই ন্যায় পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া উচিত। তৎকালে ব্রাহ্মণ ধনবান হইলে সেই ধনের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন এবং তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দেশের কার্য্য সাধিত হইত।

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়াদীনেষু সর্ব্বদা
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া, কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত লোক ত্রয় জয় করিতে তিনিই সমর্থ।

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ অন্যের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিয়া নিঃস্বার্থতার কাছে স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেন, পরোপকারে রত হইতেন, জ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, ক্ষমা করুণা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি মনুষ্যের অন্তর নিহিত সদ্‌গুণ সকলের বিনাশ দ্বারা ও ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তি সকলের ন্যায় দমন করিতেন। এই সকল গুণের জন্যই ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ।

আর্য্য ঋষিগণ বলেন ;—

"যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি ত্বয়া। নো ইতরাণি নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি।"

"কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, আর অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।" এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ তৎকালে ঈশ্বরানুরাগী হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা অর্থাৎ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতেন। ইহাতেই তাঁহারা যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করিতে পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

ওলাউঠায়—স্কোটিমের গ্যাংগ্রিন।

—:০:—

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সাল, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর; হিরালাল মৈত্র নিবাস কুমারখালী বর্ত্তমানে কুমারটুলি গলিতে বাস; আজ ৩

দিবসাবধি ওলাউঠায় আক্রান্ত। ভেদ কয়েকবার করিয়া শুষ্ক ও হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত। প্রাতঃকাল হইতে অণ্ডকোষদ্বয় কাল হইয়াগিয়াছে, গ্যাংগ্রিন হেতু যে উহা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়; আরও দেখা যায় যে অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত ও কঠিণাকার ধারণ করিয়াছে; প্রস্রাব বন্ধ; উদর ফাঁপা রহিয়াছে। নাসাগ্রে ও হস্তপদ শীতল নাড়ী ইনটারমিটেণ্ট ল্যাকেসিস্ ৩০শ শক্তি একমাত্রা দেওয়া গেল।

রাত্রি ১টা। আর ও দুইবার ভেদ হইয়াছে; মল সেই একই প্রকার আছে। প্রস্রাব হয় নাই কিন্তু উহার বেগ আছে এবং রোগী বলিতেছে যে প্রস্রাব হইলে সুস্থ বোধ করিতে পারি; মলত্যাগেরসহ কোঁতপাড়াও বর্ত্তমান আছে; তৃষ্ণা কমে নাই। মার্ক্কর ৩০শ শক্তি। একমাত্রা দিয়া আসিলাম।

২—২—০৭। ভেদ কমিয়াছে প্রস্রাব হয় নাই, তৃষ্ণা একই প্রকারের; অণ্ডকোষের কাল রং একটু ফেকাশে হইয়াছে কিন্তু বাম কোষটি উপরে পিউবিকের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে, অন্য কোষটি ফুলিয়া শক্ত হইয়া একটি বড় ডিমের মত হইয়াছে। এই জন্যই রোগী অতিশয় যাতনাবোধ করিতেছে; ঐ স্থানে হাত দিয়া টিপিলে বেদনা অধিক বোধ হয় সর্ব্বদা টনটন করিতেছে।
রডোডেণ্ড্রন ৩০শ শক্তি দিয়া আসিলাম।

বেলা ৬টা। ভেদ ২ বার হইয়াছে মাত্র; ২।৪ ফোঁটা প্রস্রাব ও হইয়াছে; সকল শরীরে বেদনা ও সন্ধিস্থান এবং মাংসপেশী সমুদয় কামড়াইতেছে; অণ্ডকোষের বেদনা একটু কম পড়িয়াছে কিন্তু তথাকার দপদপানি যায় নাই; বস্টক্স ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়া গেল।

৩রা ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে প্রস্রাব হইয়াছে তৃষ্ণা সামান্য কমিয়াছে; শরীর বড়ই দুর্ব্বল গত কল্য হইতেই নাড়ীতে আর ইণ্টারমিটেণ্ট ভাব দেখা যায় নাই; মল সামান্য পরিমাণে একবার মাত্র হইয়াছে। অণ্ডকোষের কালবর্ণ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে; শরীরের কামড়ানি আর নাই। (ঔষধ ঐ)

বেলা ৬টা। শরীরের অন্যান্য লক্ষণ সমুদয় বেশ ভাল; প্রস্রাব বেশ হইতেছে কিন্তু বাম কোষটি এখনও উর্দ্ধে উত্থিত রহিয়াছে এবং সেজন্য তীব্র যাতনা অনুভব করিতেছে। শরীরে কিজন্য অধিক যন্ত্রণা তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলে যে বোধ হয় কোষটি নামিয়া যাইলে শরীর সুস্থ হইতে পারে; অণ্ডকোষ এখনও স্ফীত ও কঠিন রহিয়াছে তবে আকারে একটু কমিয়াছে মাত্র। ক্লিমেটিস্ ৩০শ শক্তি। একমাত্রা দিয়া আসিলাম।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি। অণ্ডকোষের ফুলা কম পড়িয়াছে লক্ষিত হইতেছে এবং নিম্নাংশ হইতে চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছে; বাম কোষটি এখনও নামে নাই; আজ পুরুষাঙ্গের উপরেও লালভাব দেখা যায়; এই যাতনা ব্যতীত সাধারণতঃ রোগী অনেক ভাল; পূর্ব্বে নিদ্রা হইত না আজকাল ঠিক নিদ্রা যাইয়া থাকে; লড়াচড়া করিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করে; জিহ্বার ক্লেদ কম পড়িয়াছে। ক্লিমিটিস্ ৩৯ শক্তি।

বেলা ৬॥টা। একই প্রকার আছে—; বেশী কথা কহিতে চাহেনা; পূর্ব্বে গাত্রে কাপড়াদি

মোটেই রাখিত না। এখন তাহা রাখে এবং তাহাতে কষ্টবোধ করে না।

(ঔষধ ঐ)

৫ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকাল নিশ্বাস সজোরে পড়িতেছে, অণ্ডকোষের কালরং একটুবৃদ্ধি বোধ হইল, যাতনাও অধিকার দাস্ত ২৪ ঘণ্টার ও উপর বন্ধ আছে; রাত্রি হইতে আর প্রস্রাব হয় নাই; উদর স্ফীত; কথা জড়তাপূর্ণ, সামান্য ভুলবকাও আছে তৃষ্ণা অতিশয়। ল্যাকেসিস্ ৩০শ শক্তি।

পুনরায় একমাত্রা দেওয়া গেল।

বেলা ৫টা এই সময় ডাক্তার কালী যাইয়া দেখেন ডিলিরিয়ম্ মৃদু প্রকারে চলিতেছে। প্রশ্বাস ঘন ঘন নড়িতেছে, তৃষ্ণা অতিশয় জিহ্বার মধ্যস্থল অতিশয় লাল ও শুষ্ক; অস্থিরতা প্রস্রাব একবার হইয়াছে। গাত্রাবরণ ফেলিতে চাহেনা। আর্সেনিক ২০০ শত শক্তি

রাত্রি ১০টা ডিলিরিয়ম অনেকটা কম, অস্থিরতা কম পড়িয়াছে; রোগীর এখন কতক সুস্থ হইয়াছে।

(ঔষধ বন্ধ।)

৬ই ফেব্রুরারী প্রাতঃকাল অবস্থা অনেক ভাল; বাম অণ্ডকোষটী একটু তাপ দেওয়াতে পিউবিকের নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। এই জন্য ও রোগী অনেক সুস্থতা বোধ করিতেছে; পিপাসা কম, প্রস্রাব রীতিমত হইতেছে; অণ্ডকোষের চর্ম্ম ক্রমশ কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। কথার জড়তা এখনও আছে। ভুলবকা প্রায় গিয়াছে।

(ঔষধ বন্ধ।)

সন্ধ্যা ৬৷৷০টা সকল অংশই রোগী সুস্থ; দুর্ব্বলতা অতিশয় রহিয়াছে; অলসভাব ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতেছে। ভুলবকা আর নাই বলিলেই চলে। এখন কয়েকমাত্রা দেওয়া গেল।

(চায়না ৩ শক্তি।)

৭ই ফেব্রুয়ারি। বিশেষ কোন যাতনা নাই; দক্ষিণ চক্ষু লাল হইয়াছে। উহা হইতে জল ও পিচুটি পড়িতেছে—চক্ষুতে কর কবানিও সামান্যও আছে এখন মার্ক—সল ৩০শ শক্তির এক মাত্রা দিয়া চায়না ৩য় শক্তির কয়েক মাত্রা সেবন করাইতে বলিয়াই আসিলাম।

রাত্রি ৮টা। চক্ষের লাল কমিয়াছে। কথার জড়তা আর নাই। ক্রমেই দুর্ব্বলতা কমিয়া আসিতেছে। আজ তিন দিবস হইতে দুগ্ধ পথ্যচলিতেছে; আজ প্রাতে মাগুর মৎস্যের ঝোল দেওয়া গিয়াছিল। ক্ষুধা বেশ বোধ করিতেছে। গত পরশ্ব হইতে এসেন্স অব মসুরী পথ্যের পর এক ড্রাম করিয়া দেওয়া হইতেছে।

চায়না ৩য় শক্তি

৮ই ফেব্রুয়ারী। অণ্ডকোষ কুঞ্চিত হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতেছে। উহার গাত্র হইতে কাল বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্ম সকল শুকাইয়া ছাল উঠিয়া যাওয়ার মত হইয়াছে। উঠিয়া যাইতেছে। এখনও চায়না ৩য় শক্তি চলিতে লাগিল আজ পথ্য দুধ সুজি দেওয়া গেল।

৯ই ফেব্রুয়ারী। ক্ষুধা অতিশয় বোধ করাতে; সুজির রুটি ব্যবস্থা থাকিল। জিবের ক্লেদ প্রায় কমিয়াছে। রোগী ক্রমেই সবলতা বোধ করিতেছে। (ঔষধ ঐ)

মন্তব্য।

৯ই সহরের দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য আলোপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর উক্ত অবস্থা দেখিয়া অতিশয় শঙ্কান্বিত হইয়া একজন বলিয়াছিলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা না করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মরে যাইবে এবং অন্য একজন বলিয়া ছিলেন যে জোলাপ দিয়া দাস্ত না করাইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী আশ্চর্য্যের বিষয় এখন উভয়ের কেহ লক্ষ্য করিলেন না। যে কথিত রোগীটা সদ্য ওলাউঠার কবল হইতে উঠীয়াছে, এবং তাহার উপর ঐ সব ব্যবস্থা করা। যুক্তি সঙ্গত কিনা।

যাহা হউক হানিমানের কৃপায় রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। পরে শুনা গিয়াছে যে উক্ত আলোপাথ ডাক্তারদ্বয় ও রোগীর আরোগ্য সংবাদ শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন ও মহাত্মা হানিমানের জয়গান করেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে কোন চিকিৎসকই এরূপ রোগী দেখেন নাই। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে প্রথমে আমরাই এরোগী পাইয়াছিলাম হানিমাণের কৃপায় আমাদের হস্তেই উহা সম্পুর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার মৈত্রে।
১৮।১ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন।

বৃষ্টিতত্ত্ব।

(উপসংহার)

বিগত জুলাই মাসের প্রারম্ভ হইতে অল্প-বিস্তর বৃষ্টি হইতেছিল। ৬ই তারিখের বৃষ্টি, বৃষ্টিমান যন্ত্রে (rain-gange) আদৌ পরিমাণ যোগ্য হয় নাই। ৭ই তারিখে বৃষ্টিমান যন্ত্রে ১,৭০ইঞ্চি বৃষ্টি পরিমিত হইয়াছিল, এবং ৯ই ও ১০ই তারিখেও সামান্য সামান্য (০·১৬ ও ০·১১ইঞ্চি) বৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত দিবস চতুষ্টয়ের গ্রহস্ফুট পঞ্জিকাদৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, যে, ৬ই তারিখে রবিস্ফুট ২।২০।৪৬ অর্থাৎ রবি মিথুন রাশির ২০ অংশে অবস্থিত এবং মঙ্গলস্ফুট ৮।১৮।৩৩ অর্থাৎ মঙ্গল ধনুরাশির ১৮ অংশে অবস্থিত; ইহার দুইদিবস পুর্ব্বে রবি ১৮ অংশে ছিল; সুতরাং সেই দিবস রবি মঙ্গল হইতে ১৮০ অংশে ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্যই পুর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে ৬ই তারিখে বৃষ্টিপাত আদৌ পরিমাণ যোগ্য হয় নাই। ৭ই তারিখে শুক্রস্ফুট ২।৪।২৮ অর্থাৎ শুক্র মিথুনরাশির ৪ অংশে ছিল এবং শনিস্ফুট ১১।৩।৫৭ অর্থাৎ শনি মীনরাশির ৪ অংশে যাইতেছিল; সুতরাং শনি হইতে শুক্রের৯০ অংশ ব্যবধান সম্পুর্ণ হইতেছিল। শুক্র ও শনি উভয়েই বৃষ্টিকারক গ্রহ, তজ্জন্য ৭ই তারিখ হইতে ১০ই পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কেন গ্রহসমূহের উক্তরূপ ব্যবধান বৃষ্টিপাতের হ্রাস ও বৃদ্ধিসূচিত করে, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ গ্রহদিগের মধ্যে তাড়িতাকর্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্তরীক্ষে উষ্ণতার এইরূপ আকস্মিক হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

—:০:—

ভগবান্—স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত নামাদি তাহাতেই লয় হয়। চক্ষু সমস্ত রূপ লইয়া তাহাতেই প্রবেশ করে শ্রোত্র সমস্ত শব্দ সহ, মন সমস্ত ধ্যান সহ তাহা-

তেই লয় হয়। আবার যখন জাগ্রত হন তখন সেই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয় দেহে ছড়াইয়া পড়ে প্রাণ হইতে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জাগিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে জগৎ জাগিয়া উঠিল। আত্মাই সর্বভূতের নাশোদয় স্থান। অর্জ্জুন—আত্মা হইতে উদয় এবং আত্মাতেই যদি সমস্ত লয় হয় তবে সমস্ত ভূতাদি আদি অন্তে অব্যক্ত কিরূপ?

ভগবান—বাস্তবিক আত্মা পরিপূর্ণ। অন্য বস্তু কিছুই নাই। কেবল অজ্ঞান আশ্রয়ে ব্রহ্ম জগত ভান হয় মাত্র। বস্তুতঃ জগত নাই।

অর্জ্জুন—এই জটিল আত্মতত্ত্ব আমি কিছুতেই ধারণ করিতে পারিতেছি না। সম্মুখে জগৎ দেখিতেছি সম্মুখে ভীষ্ম দ্রোণাদি দেখিতেছি আপনি বুঝাইয়া দিতেছেন যাহা আদিতে নাই অন্তে থাকিবে না মধ্যে যাহা আছে বলিয়া বোধ করিতেছ তাহা নাই। বুঝিতেছি কিন্তু দৃশ্য ভ্রম যাইতেছে না। মনে মনে জানিতে পারিতেছি, ধারণাতে পারিতেছি না—কি অদ্ভুত প্রহেলিকা।

ভগবান—আত্মা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। আত্মতত্ত্ব অতি অদ্ভুত। জ্ঞানী ব্যক্তি ও বহুজন্মান্তে আত্মতত্ত্ব ধারণা করিতে সক্ষম হয়েন না। তোমার শোক না যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি শুকদেব ব্যাসদেবকে মোহ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কেন বলিয়াছিলেন—

"বিষ্ণুবংশ সম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ
সোহপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্ন পোতো বণিক যথা
অহো মায়াবলঞ্চোগ্রং যথোহয়তি পণ্ডিতং
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদ সম্মিতং
পুরাণাঞ্চ বক্তাচ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ।
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাহতীত দুঃখকর
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতী সুতং॥
দেবীভাঃ ১।১৫।২৪-২৭

কেন বলিয়াছিলেন তাং যামি যাবণং দেবীং যান জগৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হরাদিশ্চ কথাহয়েযাহশ্চ কাদৃশ"। আপনি সর্ব্বজ্ঞ আমি অল্পজ্ঞ। যাহাতে আত্মতত্ত্বের সর্ব্বময়ত্ব ধারণা করিতে পারি তাহাই করুণ।

ভগবান—আত্মদর্শনের অধিকারী দুর্লভ। কিন্তু আত্মদর্শন নিতান্ত বিস্ময়কর।

অর্জ্জুন—দর্শন অধিকারী দুর্লভ কিরূপ?

ভগবান—নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার যাহার নাই তাহার জ্ঞানে অধিকার নাই। গুরু মুখে প্রথমে বেদাদি শাস্ত্রের স্থূল ২ বিষয় অবগত হওয়া চাহি। পরে নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিত্য গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রকাশিত ধ্যেয় বিষয়ের উপাসনা চাই। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া ঈশ্বরের চিত্তের অনুরাগ জন্মিবে। তখন বৈরাগ্য আরম্ভ হইল। ক্রমে মন ও বাহেন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহ জন্য সমদমাদি অভ্যাস চাই। এইরূপে যোগাবস্থা জন্মিবে। তখন গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন পরিপক্ক হইলে গুরু মুখে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শুনিয়া অভ্যাস করিতে করিতে আত্মদর্শন লাভ হয়।

অর্জ্জুন—কিন্তু আত্মদর্শন বিস্ময়জনক কিরূপে? ভগবানঃ—আত্মাকে দেখিতে দেয়না অবিদ্যা। যেমন অজ্ঞান রজ্জুকে প্রথমে আবরণ করে, আবরণ করিলে অন্যরূপ দেখায় সেইরূপ অবিদ্যা আত্মাকে আবরণ করে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আত্মাতে জগতরূপ সর্পদেখায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখ অবিদ্যা নাশনা হইলে আত্মদর্শন হয় না। আবার অবিদ্যা নাশেও আত্মদর্শন হয় না।

কারণ অবিদ্যা নাশে দ্বৈতভাব থাকে না। সে কাহাকে দেখিবে? অদ্বৈত ভাবে দর্শন কোথায়? আত্মামাত্র দ্রষ্টাদৃশ্য সমস্তই জড়। আত্মা আপনাকে দেখিতেছেন ইহাও আত্মদর্শন নহে। ইহার অর্থই জড়ের সৃষ্টি। আপনার যে অংশ দেখিতেছেন তাহাই আত্মার স্বরূপ না থাকিয়া জড় হইয়া প্রকৃতিরূপে জগৎ সাজিতেছে। এমন কি "অহংভাব" জাগ্রত হইলেই দ্বিতীয় কিছু অনুভব হইয়াছে জানিতে হইবে। আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই। দ্বিতীয় যাহা ভাণ তাহাই মায়া। যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া দর্শন। দেখিতেছ দেহ আছে কিন্তু বাস্তবিক নাই। ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল কি আছে?

অর্জ্জুন—কি আশ্চর্য্যজনক এই আত্মা!

ভগবান—আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলা যায় বা শোনা যায় তাহাও বিস্ময় জনক।

অর্জ্জুন:—নিশ্চয়ই। আত্মা আছে বলিলেও দোষ কেননা কে বলে! যিনি আত্মজ্ঞ তিনি বলিতে পারেন না। যিনি আত্মজ্ঞ নহেন তিনি অজ্ঞান তিনি ও বলিতে পারেন না। আবার না বলিলেও দোষ আছেই।

ভগবান—যাহা দেখিতেছ (জগৎ) তাহা নাই যাহা দেখ নাই (আত্মা) তাহাই আছে। যখন বাহ্য দেখিতেছ তখন অন্ধকারে যখন দেখিতেছ না তখন আলোকে। যখন জাগিয়া থাক (বিষয়ে) তখন রাত্রি আবার যখন নিদ্রা যাও (বিষয়ে) তখন দিন। কতদিন কত রাত চেষ্টা করিয়া যাহা পাইলে তাহা পাইয়া কিছুই পাওয়া হইল না অজ্ঞানই দূর হইল কি? সূচি ছিদ্রে হস্তিপ্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে (অতিসূক্ষ্ম আত্মায় জগৎ সৃষ্ট হইতেছে ও লয় হইতেছে) শ্রুতি বলেন "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"—কঠউঃ ১২ সূঃ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নার্ণ্যে দেবৈস্তপস্য কর্ম্মণা বা।" মণ্ডুক উঃ। আত্মা সম্বন্ধে শত শত বিরুদ্ধ বাক্য কথিত হয়। তিনি সৎ হইয়াও অসৎ জগতে অবস্থিত, দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিত, অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চ রূপে নশ্বর তিনি নিজে অচল অথচ জগৎ চালাইতে ছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছু করেন নাই। ইত্যাবধি যাহাই আত্মা সম্বন্ধে বলা যায় তাহাই বিস্ময় জনক।

অর্জ্জুন—আত্মা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিরুদ্ধ বাক্য হয় কেন!

ভগবান—শ্রুতি বলেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আত্মতত্ত্ব বাক্যে বলা যায় না তাহার ভাষা নাই মনে ও ধারণা করা যায় না অতএব সর্ব্ব শব্দের অবনচ্য আত্মার সম্বন্ধে যে বচন তাহাও আশ্চর্য্য হইবে।

অর্জ্জুন—আত্মা সম্বন্ধে শুনিয়াও আত্মা হইতে পারে না কেন?

ভগবান—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য বিচার জনিত জ্ঞান দ্বারাই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। ইহাই শাস্ত্র বাক্য। কিন্তু না জানিলে জানা যায় না। গাঢ়নিদ্রা কালে কোন কথার অর্থবোধ হয় না। তথাপি ডাকা ডাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। জাগিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারে কিন্তু অজ্ঞান নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যের অর্থ বোধ করিবে কিরূপে! অর্থ বোধ না হইলে জাগিবে না। আবার না জাগিলেও অর্থবোধ হইবে না। তবেই দেখ শুনিয়াও জাগে না কেন। শ্রুতি এইজন্য বলেনঃ—'শ্রবণয়াপি বহুভি যৌন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ আশ্চর্য্যোহস্য বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলাহ-

শিষ্টঃ। যাহার শ্রোতা অল্প, শুনিয়াও অধিকাংশ লোক জানিতে পারে না যাহার বক্তা আশ্চর্য্য অনেক শ্রোতার মধ্যে নিপুণব্যক্তিই নিপুণ আচার্য্যের নিকট জানিয়া ইহা জ্ঞাত হন।

অর্জ্জুন—আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি নাই, অথচ আত্মজ্ঞান এরূপ দুর্লভ। তবে গতি কি?

ভগবান—বিশ্বাসই গতি। বিশ্বাস রাখিয়া যাহা করিতেছ তাহাই আমার পূজা করিতে ২ এই বোধে কর্ম্ম করিয়া চল আমি তোমাকে এই মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। আমি তোমার সহায় এই বোধ রাখিয়া সকল প্রকার ভয়কে মন হইতে উৎপাটন কর। 'তুমি আমার' তোমর ভয় কি? তুমি সর্ব্বদা বলিও 'আমি তোমার' আর যাহা কিছু সমস্তই আমি করিয়া দিব। ভয়দূর কর, আশা রাখ, বিশ্বাস কর তুমি যাহা চাও পাইবে।

অর্জ্জুন—কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য করাইতে হইলে এই প্রকৃষ্ট উপায় বটে।

ভগবান—দেখ না কর্ত্তব্য করিতে গেলেই তোমার মত সকলে অনিচ্ছা আলস্য প্রকাশ করে। ইহার মূল ভয় ও শোক। তুমি যেমন মনে করিতেছ ইহারা সব মরিয়া যাইবে। এই ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইতেছ। সাধারণ লোকেও বলে এ অবস্থায় কার্য্য করিতে গেলে শরীর খারাপ হইবে মরিয়া যাইব এই ভয়ে কর্ত্তব্য অবহেলা করে। কিন্তু যাহারা সদাসর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে দেহ বিনাশশীল—দেহ থাকিবেই না বিশেষ দেহই আমি নই দেহ গেলেও আমার কোন অনিষ্ট হয় না। আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র তবে দেহের ভৃত্য হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া কেন আলস্যে চুপ করিয়া থাকি? দেহ যায় যাক্ আপন করিয়া যাই মঙ্গল হইবে। প্রকৃত কথা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি মানুষ মরে। দেহ অগ্রাহ্য করিয়া আপন কর্ম্ম করিলে দেহাত্ম ভাবনা বা বাসনা মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। তুমি সর্ব্বপ্রকার অনার্য্যের মত ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর। আরও দেখ 'দেহই আত্মা' এই ভ্রমেই লোকের সকল প্রকার ভয় হয়। দেহ অসুস্থ হইয়া যাইবে, মরিয়া যাইব, মরিয়া যাইবে লোকের ইহাই ভয়। কিন্তু যিনি জানেন দেহ আত্মা নহে, দেহ জড়, দেহ যাক আর থাক্ উঁহার কোন ভয় নাই তোমার এই মোহ নিবারণ করিলাম। এখন তোমার স্বধর্ম্ম কি আলোচনা কর দেখিবে যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম কি?

ভগবান—শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপল্যায়নম্। দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অর্জ্জুন—যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ নাই উহা কি নিষ্ঠুর বিধি নয়?

ভগবান - অজ্ঞানীর পক্ষে জীবিত থাকাও নিষ্ঠুরতা জলের সহিত কত প্রাণী সংহার হয়, গমনে কত জীব বিনাশ হয়, একবিন্দু জলে অনন্ত কোটী জীব রহিয়াছে একটী বৃক্ষপত্রে কত প্রাণী রহিয়াছে তোমার দেহও কত জীবের আশ্রয় তাহা তুমি ধারণা করিতে পার না। কিন্তু জীবের দেহগুলি জীব নহে এ ধারণা হইলে কে কাহাকে বধ করিবে?

যজ্ঞের জন্যই ছাগাদি পশু সৃষ্টি হইয়াছে। "যজ্ঞেষু পশবো ব্রাহ্মণ হন্যন্ত সততং দ্বিজৈঃ সংস্কৃতা কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গ মবাপ্নুবন" মন্ত্রপূত পশু

যজ্ঞে বিনষ্ট হইলে কল্যাণ দেহ লাভ করে এবং যুদ্ধে হত বীরগণ কল্যাণতর দেহ প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটিলে ভাগ্যবান বলা যায় কেন?

ভগবান—দেখ জয় পরাজয় উভয়েই লাভ। জয় লাভে বিপুল যশ ও রাজ্য প্রাপ্তি এবং পরাজয়ে ও অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপানুষ্ঠান, ও যুদ্ধে স্পৃহা এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতুবটে কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে উহাতে কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম নাই।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় কি?

ভগবান :—

ন কুটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে নিপুন্
ন কর্ণিভির্ণাপি দিগ্ধৈর্ণাগ্নিজ্বলিত তেজনৈঃ
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্
ন মুক্তকেশং না সীনং ন তবাস্মীতি বাদিনাম্
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ধম্
না যুদ্ধমানং পশ্যন্তং ন পবেণ সমাগতম্
না যুধ ব্যসন প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরিক্ষতম্
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন॥ মনু

শুধু যে তোমার কীর্ত্তিনষ্ট এবং স্বধর্ম্মত্যাগ জনিত পাপ হইবে তাহা নহে কিন্তু তুমি যুদ্ধারম্ভে পলায়ণ করিয়াছিলে বলিয়া চিরদিন লোকে অপযশ করিবে।

অর্জ্জুন—করুণাহেতু আমি যুদ্ধত্যাগ করিতেছি।

ভগবান—ইহা কেহই মনে করিবেন না। বলিবে কাপুরুষ ভয়ে পলায়ণ করিয়াছে। আর পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলে "ন চৈতদ্বিদ্ম" (২।৬) তাহার উত্তর এই যে উভয় পক্ষেই তোমার লাভ। যুদ্ধই তোমার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মই জীবের কর্ত্তব্য। সমস্ত ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি মর না অন্যেই মরুক, তোমার লাভ হউক বা অলাভ হউক, সুখ দুঃখ জয় পরাজয় কিছুই গন্য না করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও পাপ হইবে না।

অর্জ্জুন—কিরূপে? বুঝিতে পারিলাম না।

ভগবান—প্রভু ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভৃত্য স্বচ্ছন্দে খুন পর্য্যন্ত করিল। ভৃত্য জানে ইহাতে আমার কোন অন্যায় হইল না। যদি এস্থানে প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করিয়া নিজের ইচ্ছায় মত কার্য্য করে তবে সে ভৃত্য নহে। যিনি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তিনিই প্রভু। যিনি চালাইতেছেন, তুমি চলিতেছ, তিনি যন্ত্রী তুমি যন্ত্র। এখানে তোমার স্বাধীনতা নাই। এজন্য পাপ পুণ্যও নাই। তুমি আমার উপদেশ মত সমস্ত কুরুকুল ধ্বংশ কর তথাপি তোমার পাপ নাই কারণ তোমার কোন কামনা নাই। তুমি মাত্র আমাকেই চাও। আমি নিজে সমস্ত করিতে পারি নিজে না করিয়া তোমাকে সম্মানিত করিব বলিয়া তোমার দেহ দিয়া আমিই সমস্ত লাভ করিলাম। তুমি জড় মাত্র আমি তোমার দেহে চৈতন্য, আমি তোমায় চালাইতেছি, ঘুরাইতেছি, যুদ্ধ করাইতেছি ইহাতে জড়স্বরূপ তোমার পাপ কি? হাত দিয়া পাপ করিলাম ইহাতে কি হাতের পাপ হয়? যে ভক্ত সে প্রিয় বস্তুর নিকট জড়। তুমি আমার ভক্ত হও। সর্ব্বস্ব আমাতে অর্পণ কর। আমি যাহা বলি তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। এখানেভাল মন্দ লাভালাভ কিছুই বিচার নাই। স্বধর্ম্ম মত ধর্ম্মই তাঁহার আদেশ মত কার্য্য। কোন, দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম করিয়া যাও নিষ্কাম হইল। নিষ্কাম কর্ম্মে পাপ নাই, কারণ কোন কামনা নহে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

কর-বিজ্ঞান।

—০:*:০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থি সমূহ।

গ্রন্থি অর্থাৎ আঙ্গুলীর গাঁইট উপরদিক হইতে এক দুই, তিন এইরূপ নাম করণ হইয়া থাকে। প্রথম গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে প্রত্যেক বিষয়ের আদ্যোপান্ত দর্শনেচ্ছা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিল্লাদি বিষয় অনুশীলন আনুরক্তির প্রকাশক। যাহার অঙ্গুলীতে এরূপ পরিপুষ্ট প্রথম গ্রন্থি দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির প্রমাণ ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস হয় না এমন কি প্রমাণ পাইলেও অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে চায় না। তাহারা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট সন্দিগ্ধ, কিছুই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; কেবল তাহাদের অভীপ্সিত আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায় কিন্তু সর্ব্বদাই প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থি ভাবরাজ্যের শৃঙ্খলা বিধায়ক। ইহা পরিপুষ্ট হওয়া শুভকর। হস্ততালু কোমলতার সহিত ইহা পুষ্ট হইলে, অপরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুনিয়মিত দেখিতে ইচ্ছা করে। কঠিন করতলের সহিত গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, স্বয়ং সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী থাকে।

উভয়গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, তর্ক বিষয়ে নিয়মের বাধ্যতা, প্রত্যেক বিষয়ই যতদূর সম্ভব নিয়মিত অনুষ্ঠান করা, অনুসন্ধানপর ও বিশ্লেষক।

তৃতীয় গ্রন্থি গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা বিধায়ক। যাহাদের ইহা পুষ্ট, তাহারা ও চিরায়গ্রস্ত এবং কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, গৃহস্থালির কোন না কোন কার্য্য তাহাদের করা চাই।

সাধারণতঃ গ্রন্থি সকলের পুষ্টতা আগ্রহ না উদ্দিগ্নতার হ্রাস করে। যাহাদের তর্জ্জনীর গ্রন্থি পুষ্ট, তাহারা কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয়বাদী। সব অঙ্গুলীতেই যদি কেবল প্রথম গ্রন্থিই পুষ্ট হয়, তবে সমালোচনা তৎপর হইলেও দোষ সংশোধনে অমনোযোগী। কেবল দ্বিতীয় গ্রন্থি সমূহ যদি পুষ্ট হয়, তাহারা শৃঙ্খলা সম্পন্ন দেখিতে ভালবাসে, পরন্তু সমালোচনা তৎপর হয় না।

সপ্তম অধ্যায়।

নখর।

নখর সকলের দ্বারা প্রকৃতি এবং ক্রোধবিপ্লব পরিমাণ ও ভাব অবগত হওয়া যায়। ক্রোধের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইতে হইলে "মঙ্গলস্থানের" স্বসঙ্গতি (যদ্দারা দমন শক্তি ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়) শিরোরেখার গভীরতা (বুদ্ধি শক্তির তীক্ষ্ণতা) এবং অঙ্গুষ্ঠের ক্ষমতা (বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তির তেজস্বীতা) হইতে অবগত হওয়া যায়; কারণ, ইহাদের উপর ক্রোধের দমন নির্ভর করে।

মানবের প্রকৃতি নখরের বর্ণদ্বারা জানা যায়—

নখর। রক্তবর্ণ—কোপন স্বভাব; গোলাপী ক্ষিপ্রক্রোধী; শ্বেতবর্ণ—শান্ত প্রকৃতি;

বহুবর্ণবিশিষ্ট (যেমন কতকটা লাল, কতকটা সাদা, ইত্যাদি) নখর, ক্রোধের অন্তঃ সলিল প্রবাহ বুঝায়; এবং উহার প্রকাশ স্বাস্থ্যহীনতা এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের উপর নির্ভর করে।

ক্ষুদ্র অপেক্ষা বড় নখরযুক্ত ব্যক্তির ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী। ক্ষুদ্র নখর পরিহাস ও সমালোচনা প্রিয়। ডিম্বাকৃতি নখর ঈষৎ রক্তাভ হইলে উদাসীন।

নখরের গঠন চ্যাপ্টা হইলে, পক্ষাঘাত ব্যাধির সূচনা করে। উচ্চভাবে গোলাকার হইলে,

স্নায়বোগ, এবং আকুঞ্চিত অর্থাৎ এড়োভাবে বেখা থাকিলে, পীড়াব লক্ষণ। নখবেব উপব শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, অজীর্ণতা জ্ঞাপন কবে।

নখবেব মূলদেশ চতুষ্কোণ হইলে, প্রতিহিংসা পবায়ণ; ঈষৎ গোলাকাব হইলে, সুন্দব স্বভাব, অল্পপবিসব—সোঁজাকৃতি—হইলে, সহজেই দোষগ্রহণ এবং অসন্তোষ প্রকাশ কবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গ্রহস্থান।

কবতলেব চতুর্দ্দিকস্থ উন্নত মাংসপেশীসমূহকে গ্রহস্থান কহে। বব্যাদি সপ্তগ্রহের নামানুসাবে কবতলে সাতটী গ্রহস্থান আছে। প্রথম চাবিটী অঙ্গুলীমূলস্থ করতলেব উপবিভাগে অবস্থিত তাহাদেব নাম যথাক্রমে তর্জ্জনীব মূল হইতে, বৃহস্পতি, শনি, ববি ও বুধ। অপব তিনটীব মধ্যে মঙ্গল দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগ কবতে শিবোবেখা ও হৃদয় বেখাব মধ্যস্থ; অপবভাগ বৃহস্পতিস্থান ও অঙ্গুষ্ঠমূলে মধ্যস্থিত মঙ্গলেব এই দুই ভাগের মধ্যস্থিত স্থানকে মঙ্গলেব ক্ষেত্র কহে। শুক্রস্থান অঙ্গুষ্ঠেব নিম্নস্থ আয়ুবেখা বেষ্টিত অংশ; এবং চন্দ্রস্থান কবভস্থ মঙ্গলেব নিম্নে অবস্থিত।

সুগঠিত, সুসংস্থিত, দৃঢস্পর্শ হইলে 'গ্রহস্থান' শুভফল প্রদায়ক বুঝিতে হইবে। তাহাতে ঐ সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট গুণাবলীব উৎকৃষ্ট সাধিত হইয়াছে বুঝায়। অতিপুষ্ট, অন্যগ্রহস্থানে প্রবিষ্ট, কোমল অথবা একবাবে অস্তিত্বভাব অর্থাৎ উক্ত স্থান নিম্ন হইলে, কুফল প্রদায়ক। তদ্বাবা উক্ত স্থানেব সূচিত গুণ, হয় অতিবিক্ত, অব্যবহৃত নতুবা তাবৎগুণের একবাবেই অসদ্ভাব বুঝিতে হইবে।

যদি কবতলেব নিম্নস্থ গ্রহস্থান সকল হইতে উপবস্থ গ্রহস্থান সকল উন্নত হয়, তবে পাশবিক প্রকৃতিব পবিবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। তদ্বিপবীত হইলে ইন্দ্রিয়েব দাসত্ব অর্থাৎ পাশবিক প্রবৃত্তিব প্রাধান্য বুঝায়।

সমূহ গ্রহস্থান সমতল হইলে কার্য্যে আগ্রহ-পূর্ণতাব পবিচয় দেয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচাব কবিতে হইলে হস্ত পার্শ্ব ধীবভাবে টিপিয়া দেখা আবশ্যক।

নিম্নে গ্রহস্থান সমূহেব ভালমন্দ অনুসাবে গুণাবলীব বিবরণ দেওয়া যাইতেছে:—

সুফল প্রদায়ক।

(সুসংস্থিত)

বৃহস্পতি—অহঙ্কাব।
শনি—নির্জ্জন প্রিয়তা।
ববি—করুণা।
বুধ—প্রফুল্লতা।
বুধনিম্নস্থ মঙ্গল—সহিষ্ণুতা।
চন্দ্র—কল্পনাপ্রিয়তা (মৌলিকতা)
শুক্র—প্রীতি।

কুফল প্রদায়ক।

(অতিবিক্তে)

বৃহঃ—আত্মশ্লাঘা।
শনি—বিষাদখিন্নতা।
ববি—বিচাবশূন্য করুণা।
বুধ—অপবেব মর্ম্মবেদনাব উদাসীন।
বুধ নিম্নস্থ মঙ্গল—বিবাদ প্রিয়তা।
বৃহঃ নিম্নস্থ মঙ্গল—নির্ব্বুদ্ধিতা।
চন্দ্র—চঞ্চল মতিত্ব (খামখেয়ালি)।
শুক্র—কামুকতা।

(অভাবে)

বৃহঃ—আত্মমর্য্যাদাহীনতা।
শনি—অব্যবস্থিত চিত্ততা।
রবি—নিষ্ঠুরতা।
বুধ—অরসিকতা।
বুধ নিম্নস্থ মঙ্গল—ভীরুতা।
বৃহঃ নিম্নস্থ মঙ্গল—ধৈর্য্যহীনতা।
চন্দ্র—কল্পনাবিরতি।
শুক্র—ঔদাসিন্য।

বৃহস্পতি স্থানের পরিপুষ্টি অনুসারে সমাজ-প্রীতি নির্ভর করে। রবিস্থানের প্রধান বিশেষত্ব, পশুপ্রীতি। বৃহস্পতি নিম্নস্থ মঙ্গলস্থান গাম্ভীর্য্যের ও প্রকাশক।

গ্রহস্থানের উচ্চতা স্বস্থানে থাকিয়া অন্য কোন স্থানের অভিমুখী হইলে, তদ্দারা নানা প্রকার লক্ষণ বুঝায়;

বৃহস্পতি

তর্জ্জনীর মূলাভিমুখী হইলে বৃথা গর্ব্ব, আত্ম-শ্লাঘা; শনির স্থানাভিমুখী—আত্মশক্তি জ্ঞান; হৃদয় রেখার অভিমুখী—স্নেহগর্ব্ব; শিরোরেখার অভিমুখী—আসবৃদ্ধি অহঙ্কারিতা; আয়ুরেখার অভিমুখী—কুলাভিমানিতা।

শনি

মধ্যমার মূলাভিমুখী—অতিশয় নির্জ্জন প্রিয়তা বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী—বিষাদপূর্ণ আত্মাভিমানিতা; রবির স্থানাভিমুখী—সামান্য বিষণ্ণতা; হৃদয় রেখার অভিমুখী প্রণয়ে সংশয়।

রবি

অনামিকার মূলাভিমুখী—ছলপূর্ব্বক কৃত্রিম-ভাব, শনির স্থানাভিমুখী—সহানুভূতি প্রণোদিত পশুপ্রীতি; ধ্রুবের স্থানাভিমুখী—শিল্প-বিজ্ঞান বেত্তৃত্ব, অক্ষুণ্ণ করুণা।

বুধ

কনিষ্ঠার মূলাভিমুখী হইলে—রসিকতা; রবির স্থানাভিমুখী ধীর ঔদাসীন, করভাভিমুখী—রূঢ় রসিকতা।

বুধনিম্নস্থ মঙ্গল

করভাভিমুখী—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; মঙ্গলের ক্ষেত্রাভিমুখী—সর্ব্বত্র প্রথম উদ্যোগ; চন্দ্রের স্থানাভিমুখী—সম্মোহিনী শক্তি।

বৃহস্পতিনিম্নস্থ মঙ্গল

বৃহস্পতি স্থানাভিমুখী—গৌরবরক্ষার্থ সহিষ্ণুতা; অঙ্গুষ্ঠাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা শাসিত সহিষ্ণুতা।

চন্দ্র

মঙ্গলস্থানাভিমুখী—কার্য্যকরী কল্পনা; মণি-বন্ধাভিমুখী আকাশকুসুম রচনা; শুক্রস্থানাভি-মুখী—উদ্বেগাধিক্য; মঙ্গলের ক্ষেত্রাভিমুখী—উদ্যমাধিক্য।

শুক্র

অঙ্গুষ্ঠের অভিমুখী—উদ্বেগরহিত বাসনা; মণিবন্ধ বা অঙ্গুষ্ঠ কোণাভিমুখী—ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা; চন্দ্রস্থানাভিমুখী কামুকতা।

মঙ্গলের ক্ষেত্র।

শুক্রস্থানের সহিত অঙ্গুষ্ঠের 'কোণ সকল পুষ্ট হইলে, স্বর মাধুর্য্য প্রীতি বুঝায়।

ইহা করতলের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং উদ্যোগীতার পরিচায়ক। যদ্যপি অত্যন্ত উচ্চ ও

কঠিন হয়; তবে বিবাদ প্রিয়তা বুঝায়। যদি গভীর হয়, তবে অবস্থা বা স্বাস্থ্যহেতু অধীনতা জ্ঞাপন করে। এই গভীরতা যদি আয়ুরেখার অভিমুখে হেলিয়া থাকে তবে পারিবারিক ক্লেশ বুঝায়; ভাগ্যরেখার নিকটে হেলিয়া থাকিলে, কার্য্যে নৈরাশ্য; রবিরেখার নিম্নে, শিল্পাদি আলোচনায় ও অর্থলাভে বিফল মনোরথ হয়। হৃদয়-রেখার নিম্নে হেলিয়া থাকিলে, পারিবারিক স্নেহে নৈরাশ্য বুঝায়।

উচ্চতা বিচার করিতে হইলে সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। করতলে গ্রহদিগের স্থান।

মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে সামান্য উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ; অপেক্ষাকৃত ও অধিক পরিমাণে উচ্চ হইলে, তাহা অত্যুচ্চ; এবং খাদবৎ (গর্ত্তের মত) প্রতীয়মান হইলে তাহা অনুচ্চ বা নিম্ন বলিয়া অভিহিত হয়। করতলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহস্থান গুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, বা একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান হয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী, F. C. S.

রণচণ্ডী।

কেউটে সাপের মুখে হাত দিতে সাহস হয়—জলে কুমীরের সঙ্গে বাস করতে ভরসা হয়—সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের মুখে যাইতে পারা যায়—তিনদিন অনাহার থাকাও যায়—কিন্তু যে পাড়ায় "পাড়াকুন্দুলী" আছে সে পড়ায় থাকিতে সাহস হয় না—তাকে দেখ্‌লে ভয় করে, তার নাম শুন্‌লে গা সিউরে উঠে গায়ে কাটা দেয়।

যে ছোট ছোট ছেলের পক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয়, স্কুলের ও কলেজের ছেলেদের পক্ষে সংস্কৃত জিউমেট্রী, পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে ইউনিভারসিটি; যুবকদিগের পক্ষে শিক্ষিতাপত্নী, বৃদ্ধদিগের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী, গুলি-খোরের পক্ষে শীতল বারি মক্কেলের পক্ষে উকীল।

আমরা এক পাড়াকুন্দুলীকে জানি, তার ভয়ে পাড়ার অনেক মাতাল, তামাকখোর, গাঁজাখোর গুলিখোর, আফিঙখোর অর্থাৎ আবগারী মহলে যতরকম খোর থাকা সম্ভব তারাও সায়েস্তা হয়ে গেছেন। কাহাকে কাহাকেও সুধা নেশা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই; এ ভবসংসার পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

আমরা আরও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সে পাড়ায় একটী ছেলে তিনবার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হয়, কিন্তু এই পাড়াকুন্দুলীর কুন্দুলের চোটে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ হয়ে গেল। পাড়ার দুজন আদবুড়ী বাজা মাগী ছিল তারাও ভয়ে সন্তান প্রসব করে ফেল্লে। একজন মহা-মহোপাধ্যায় পেটুক বলেন—যদি বাগবাজারের রসগোল্লা বহুবাজারের ভীমনাগের সন্দেশ, বড়-তলার পানতোয়া, জনায়ের মনোহরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, ধনেখালীর খইচুর, কৃষ্ণনগরের সর-ভাজা ইত্যাদি নানা স্থানের নানা খাদ্য পেট ভরিয়া খাইতে দেয়, তাহা হইলেও তার বাড়ী যাইয়া খাইতে সাহস হয় না।

এই পাড়াকুন্দুলী ঠাকুরাণী প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া ছুতায়নতায় কলে কৌশলে ঝগড়া বাঁধাই-বার চেষ্টা করেন ও কার্য্য সফল করিয়া একটা হুলস্থূল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। বাড়ী এলেও ঝগড়ার জন্য মন ফস্‌ ফস্‌ করে শেষে

হাঁড়ীর সঙ্গে, উনুনের সঙ্গে,—এমন কি পেটের সঙ্গে পর্য্যন্তও ঝগড়া করিয়া উপবাসী থাকেন। আবার বৈকালে বাহির হন ও স্বকার্য্য সাধন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং বাড়ীতে আসিয়া পাড়ার লোকের নাম করিয়া ঘরের দেয়ালে শতাধিক সম্মার্জ্জনী সজোরে সপাসপ্ প্রহার করেন; তাতেও যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ রাগের শান্তি হয় তা এমন বোধ হয় না।

সেই গ্রামে দুই ভাই থাকৃত। তার মধ্যে বড় ভাই খুব বড় মানুষ; তাঁর বড় বাগান, বড় তিনতালা বাড়ী, বড় বড় গাড়ী ঘোড়া; আর চাকর নফরের ত শেষ নাই। আর ছোট ভাই সাত গরিবের এক গরিব; সে গাঁয়ের এক পাশে একটু চালা বেঁধে, সেই খানে তার স্ত্রী, ছেলে-পিলে নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের অবস্থা ভাল হলে হবে কি, সে তার গরিব ছোট ভাইএর হিংসায় জলে পুড়ে মরত; এমন কি ছোট ভাই যদি কোন ভয়ানক বিপদে পড়ত, ত বড় ভাই কখন ভুলে এক গাছা খড় দিয়েও তার সাহায্য করত না। বরং ছোট ভাই কষ্ট পাচ্চে শুনলে তার আনন্দের আর শেষ থাকৃত না।

ছোটভাই একে গরীব, তার উপর এরূপ দুর্ভিক্ষ ও কাচ্ছা বাচ্ছা অনেকগুলি বলিয়া মাঝে মাঝে বড় ভাইএর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর্‌তে হ'ত। বড়ভাই উত্তর করিতেন "কোথা পাব।" পূজার সময় যদি কেহ বড় ভাইকে বলিত এ ছোট ভাইকে ও ভাদ্রবধূকে একখানা কাপড় দাও না।" তিনি উত্তর দিতেন, "এত খরচ, আব তাতে এত দুর্ব্বৎসর, দেই কি প্রকারে?" যদি তাহার উত্তর বলা যাইত "কেন, কি খরচ তোমার ছেলে পুলে নাই যখন তখন ওদের করাই উচিত।" তিনি উত্তর দিতেন, "দেখুন, কুটুম্ব দিগকে প্রায় ৫০।৬০ জোড়া কাপড় দিতে হয়, ভাইকে সুতরাং দিতে অসমর্থ।" অবশ্য ইহার উপর আর কথা চলে না।"

যাহা হউক, একদিন এই ছোট ভাই, মনের দুঃখে একটা বড় গাছের তলায় বসিয়া গালে হাত দিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতে-ছিল, কিকারণে তাহার অদৃষ্টে বিধাতা এইরূপ কষ্ট লিখিয়াছিল, কেনই বা সে জন্মগ্রহণ করিল, আর যদিই জন্মিল তবে শীঘ্র অবসান করিবার উপায় কি? এবং বার বার হাত জোড় করিয়া ইষ্টদেব স্মরণ করিতে লাগিল।

ছোট ভাই যখন বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ সেই পথে পাড়া কুন্দুলীর আগমন হইল। তাহাকে দেখিয়া কোন্দল করিবার জন্য পাড়াকুন্দুলীর একটু আহ্লাদ হইল —বোধ হয় মুখে একটু হাসির রেখাও দেখা দিল —পাড়াকুন্দুলীর মুখে হাসির রেখা যে মন্দ লক্ষণ তাহা সেখানকার সকলেই জানিত, সুতরাং ছোট ভাই তাহাকে দেখিয়া একটু জড়সড় হইল।

পাড়াকুন্দুলী একটু ধীরে কহিল, "কেরে ওখানে বসে?" কোন উত্তর পাইল না। ক্রমে স্বর বাড়াইয়া বলিল, আঃ মোলো যা কেরে তুই?" তবুও উত্তর নাই। তখন পাড়াকুন্দুলী আরম্ভ করিল, "আরে এ'ত আহাম্মুখ; বলি, ওরে হত-ভাগা, একি তোর বাবার জায়গা যে এখানে হাঁ করে বসে আছিস? এযে সরকারী রাস্তা খালি চল্‌বার জন্যে, বস্‌বার জন্যে নয়—এ তোর জায়গা নয়, ওঠ বলছি নইলে, ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেব। আমি মেয়ে মানুষ এখান দিয়ে যাচ্চি, তোর সরম হোলো না, তুই গালে হাত দিয়ে দেখছিস্; তোর চোখ খসে যাবে; ওঠ বলছি ভাল হবে না।"

ছোট ভাইএর তখন প্রায় ভয়ে নাভিশ্বাস উপস্থিত; সে বলিবে কি? তাহার নিশ্বাস বহিতেছিল কি না সন্দেহ!

পাড়াকুন্দুলীর আর সহ্য হইল না নিকট হইতে একটু ইট কুড়াইয়া তাহার দিকে ছুড়িল। এমন সময়ে সেই বৃক্ষের ডালে একটী চিল কি একজিনিস মুখে করিয়া লইয়া আসিল এবং গাছে বসিতে না বসিতে পাড়াকুন্দুলীর ইট তাহার গায়ে লাগিল। চিল তখন বিকট চিৎকার করিয়া মুখের জিনিস ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল। তাহার মুখের জিনিস ছোট ভাইএব গলায় পড়িল; সেও বুড়ীর ভয়ে ছুটীয়া পলাইল। বাটী গিয়া দেখে যে তাহার গলায় এক গাছা সোণার হার। আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই হার বিক্রয় করিয়া যাহা মূলধন হইল তাহাতে ব্যবসা আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট হইল পাড়াকুন্দুলী তাহাকে টাকা দিয়া এরূপ বড় মানুষ করিয়াছে। এসংবাদে পাড়াকুন্দুলীর একটু আনন্দ হইল, সে তখন বলিত, "আমি ওকে টাকা দিয়ে থাকি, দিয়েছি; তোদের কি? ফের যদি ওকথা বলিস্ তবে খেংরেবিষ ঝেড়ে দিব।" এইরূপে তাহার আরও কোন্দলের ভাগ বেশী হইল, পূর্ব্বে এক আধটুকু সময় যদিও স্থিরভাব থাকিত, কি ঘুমাইত, তাহা বন্ধ হ'ল এবং ঝগড়ার পথ আরও সুপ্রসস্ত হইল।

ছোট ভাইএর সমৃদ্ধি দেখিয়া বড়ভাই হিংসায় ফাটিতে লাগিল। শেষে ছোট ভাইএর তোষামোদে প্রবৃত্ত হইল। অর্থই ইহ জগতের সার বস্তু।

লোকের ব্যারামে, কি বজ্রাঘাতে, কি সর্পাঘাতে, কি আত্মহত্যায় এবম্বিধ ব্যাপারে মৃত্যু হয়, কিন্তু পাড়াকুন্দলী ঠাকুরাণীর মৃত্যু অন্য রকমে হইল। একদিন প্রাতে আপনা আপনি কোন্দল করিতে করিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়িল, অমনি মৃত্যুও হ'ল। কেহ পোড়াইতে যায় না, প্রায়শ্চিত্ত না হইলে পোড়াইব না, টোলে বিধান আনিতে গেল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদেশ করিল কোন সুবৈদ্যের নিকট থেকে কি ব্যারাম লিখিয়া আন। পাড়ার এক সোণারবেণে ভৈষজ্যালয় খুলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট যাইল। তিনি বৈদ্যশাস্ত্রের যত গ্রন্থ আছে তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন্দল রোগ পাইলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন্দল রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছু ব্যবস্থাও করিতে পারিল না। পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত। পাড়া সরগরমা মাগী মরিয়াও ছাড়ে না। পুলিশ বলিল মৃত্যু সন্দেহ জনক। মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে হইবে। সকলে মিনতি করে বলে একটু দেরি করে, কিন্তু পুলিশ দেরি করিল না, লাস্ গাড়িতে তুলিয়া হাঁসপাতালে আনা হইল। মৃতদেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল—সন্দেহ জনক মৃত্যু নহে—পেটের ভিতর ঝগড়ার একটা থলী ছিল তাহা শূন্য হইয়াছে, তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছে।

মৃতদেহ দাহ করা হইল; পাড়ার লোকও বাঁচিল।

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা দাসী।

সাকার উপাসনার উপকারিতা ও সার্থকতা।

সাকার উপাসনা বা ব্রহ্মের রূপ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা অর্চ্চনাদি হিন্দু ধর্ম্মের আর একটী বিশেষত্ব; সাকার উপাসনার নামেই জ্ঞানী ও যোগীপুরুষের হৃদয়ে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয় যে যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহার আবার রূপ কিসের, তিনি ত রূপবিহীন এবং নির্গুণ তবে সেই পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মকে কি রূপ দিয়া বা কি গুণ অর্পণ করিয়া উপাসনা করিব কেননা তিনি তো অব্যয় অজন্মা ও সর্ব্বেশ্বর। ইহার উত্তরে একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে এই 'সাকার উপাসনা' প্রণালী, সাধকের সাধনার সাহায্যার্থে ও অল্পমেধাবীগণের হৃদয়ে ঐশ্বরিকভাবের উদয়ার্থে শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মানব, যাহার জ্ঞানশক্তি ও ধারণাশক্তি তাদৃশ প্রবল নহে যে, সে অনায়াসে সেই নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা করিতে সমর্থ হয়, তিনি এই সাকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা পথের পথিক হইবেন।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোঽরূপ কল্পনা॥"

ব্রহ্মের রূপ ও গুণ না থাকিলেও তাঁহাকে সরূপ ও সগুণভাবে হৃদয়ে কল্পনা করিলে সাধারণ মানবের পক্ষে পরমাত্মার নৈকট্য সম্বন্ধ বড়ই সহজ ও বোধগম্য হইয়া আসে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই; মানসপটে যদি সেই ভগবানের একটী নির্দ্দিষ্টরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারি তবে তাঁহার গুণবর্ণনাদি দ্বারা আমরা অনায়াসেই সেই পরম পুরুষের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু নিরাকার ও নির্গুণ পরমাত্মার উপলব্ধি জনসাধারণের পক্ষে বড়ই কঠিন ও অবোধ্য। তবে জ্ঞানী ও যোগীর পক্ষে এই নিরাকার নির্গুণ পরমাত্মার ধারণা বিশেষ কঠিন নহে।

সাকার উপাসনা নিরাকার নির্গুণ বা পরম ব্রহ্ম জ্ঞান উপলব্ধি একটী সোপান মাত্র; ইহার প্রচলন কালভেদে বা মানবের অভিব্যক্তির ক্রমিক বিকাশ ভেদে শাস্ত্রকারেরা, নানাপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা অল্পমেধাবী মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাপ্তির একটী সহজ উপায় মাত্র। উপাসনা বা দেবদেবী অর্চ্চনা সেই পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের সহিত একটী ঘনিষ্টতা সম্বন্ধ রক্ষার একটী সহজ পন্থা। এই ঘনিষ্টতা যতই দৃঢ় হয় মানবের ব্রহ্ম উপলব্ধির ইচ্ছাও সেই প্রকারে বলবতী হয়। দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা রাম বুদ্ধ আমরা যাহাকেই উপাসনা করিনা কেন, প্রকারান্তরে সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিতেছি কেননা এই দেব দেবী বা অবতার তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(গীতা ৪ অঃ)

"যদি ও অজন্মা আমি, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বেশ্বর;
আপন মায়ায় জন্মি আপন প্রকৃতি পর।
যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।

সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
কবিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।"

"Creation is the act by which god passes through the primordial causes or universal ideas, into the region of particular things (processio) inorder finally to return to himself (reversio)."

(John, Scotus Eriqena.)

আর যখন সেই পরমাত্মার অংশ সকল জীবে জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান ও সকল পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তাঁহার অংশানুভূতি হৃদয়াঙ্গম হয় তখন তাঁহাকে যে অবস্থায় বা যে ভাবে উপাসনা করি না কেন প্রকারান্তরে সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান বা যোগ করিতেছি। তাঁহার জ্ঞান বা বর্ত্তমানতার উপলব্ধি যদি একমাত্র মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে পন্থাভেদে সে উদ্দেশ্য লাভের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটেনা। তবে পথ ঋজু বা বক্র হইতে পারে তজ্জন্য সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না; আমি জ্ঞানী, যোগী হইতে পারি আমার উদ্দেশ্য জ্ঞান বা যোগের দ্বারা লাভ হইবে, আমি যখন ভগবানকে প্রেমময় প্রীতিদাতারূপে কল্পনা করিব আমার মুক্তি এই ভক্তিমার্গে হইবে। আমি যখন তাঁহাকে ঘোর কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিব আমার মুক্তি সেই ভগবান নিহিত কর্ম্মযোগেই হইবে।

"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি

(গীতা)

অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি; তবু আমি কর্ম্মন্বিত।"

যদি রূপ ভেদে বা গুণভেদে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট দেব দেবীরূপ উপাসনায় সেই অন্তর্নিহিত পরম পুরুষ পরমাত্মার জ্ঞান বা তৎপ্রতি প্রেমের তারতম্য ঘটে তবে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী ও ভিন্ন ভিন্ন রূপধারীর জ্ঞানে আমাদের সেই এক অন্তস্থিত মানুষকে বর্ত্তমানতার উপলব্ধির ভ্রম হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না রঙ্গমঞ্চে একটী মানব কখনও নৃপতি আবার কখনও ভৃত্য, কেবল পরিচ্ছদের ও ভাব ভঙ্গিমার প্রভেদ মাত্র; যিনি এই প্রভেদ দেখাইতেছেন তাঁহার নিজের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, পরিবর্ত্তন কেবল পরিচ্ছদের ও ভাবের; সেইরূপ এই দেব দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ একভাবে ও অপরিবর্জ্জনীয়ভাবে স্থিত কেবল পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ও ভাবের পরিবর্ত্তন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী-গণ সেই পরিচ্ছদের পূজা করে না কিন্তু তাঁহারা সেই বহির্দৃষ্ট পরিচ্ছদ মধ্যস্থিত পরমাত্মার আবির্ভাব অনুভব করেন এবং তাঁহারই ধ্যানে বা যোগে মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন।

তবে সাকার উপাসনার নিস্ফলতা কোথায়? বরং উপকারিতা পদে পদে; কেননা, সাকার উপাসক, বৃক্ষে, মৃত্তিকা পুষ্পে, পত্রে জলে সর্ব্বস্থানেই, সেই পরমাত্মার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করেন; তিনি বৃক্ষকে উপাসনা করেন কারণ তিনি বুঝিয়াছেন এই বৃক্ষ পরমাত্মার রূপান্তর মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহংন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতিস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

(গীতা ৬ অঃ ৩০।৩১)

"যে আমাকে দেখে সর্ব্বে, সর্ব্বত্র আমাতে আর,
হয়না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার।
সর্ব্বময় জানিয়া যে অভিন্ন ভজে আমায়,
সর্ব্বদা থাকিয়াও সে আমাতেই স্থিত পায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মের যোগ বা জ্ঞান, জ্ঞানী ও যোগী-গণের সাধ্যায়ত্ত। ইহার ধারণা জনসাধারণ পক্ষে সহজ ও সরল নহে। সেই ধারণাশক্তিকে প্রবল ও পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই সাকার উপাসনা বা অর্চ্চনা প্রণালীর সৃষ্টি। ইহা মানবকে পরমাত্মাতত্ত্বে অধিকতর তত্ত্ববান ও জ্ঞানবান করিবার পথ প্রদর্শন করে। ইহার উপকারিতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে যখন মানব এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ভূতে সেই পরমাত্মার স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। যখন মানুষ বুঝিবে।

"Brahma is conceived as the eternal self-existent being, which on its material side unfolds itself to the world by gradually condening itself to matetial objects throug the gradation of ether fine water earth and the elements."

যখন অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন সাকার সগুণ উপাসনা ও নিরাকার নির্গুণ উপা- এই উভয় পথের মধ্যে প্রধান প্রশস্ত পথ কোন্‌টী? ভগবান উত্তর করিলেন।

"ময্যা বেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

"আমাতে নিবেশিমন, যারা নিত্যযুক্ত করে উপাসনামম,
পরম শ্রদ্ধার সহ, ধনঞ্জয়! মম মতে তারা যুক্ততম্‌।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ বি, এ, বি, এল।

বায়ু।

১

নিখিল পৃথিবীব্যাপী
সর্ব্বত্র সঞ্চর মান্‌,
হে অনিল বহ্নিসখে
তুমিতো জগত প্রাণ

২

কিরূপে বাঁচিত জীব,
বাচিতে গো তরুলতা,
যদিনা বহিতে তুমি
শান্ত ভাবে যথা তথা।

৩

নিদাঘে তাপিত তনু
প্রচণ্ড রবির করে,
জীবকুল অঙ্গে যেন
বহ্নি সমস্পর্শ করে।

৪

প্রাবৃটের অধিকার
যখন ভুবন ময়,
তখন তোমার মূর্ত্তি
অতীব ভীষণ হয়।

৫

দিবারাত্র ঝঞ্চাঘাত,
প্রকাশ বিক্রম কত,
তব কদাচারে ভুঞ্জে
নানা ক্লেশ জীব যত।

৬

শরতে মূরতি তব
মরিকি আনন্দ ময়,
হেরি জীব যত তব
কদাচার ভুলে যায়।

৭

নাতিশীত উষ্ণ ভাব
তুমিতো হেমন্তেশ্বর,
শান্তভাবে সদাচারে
চরাচরে সুখী কর।

৮
শীতে শৈত্য বৃদ্ধিকর
জীবকুল ভয়পায়,
কৃশানু ভানুর তাপে
সুখে কাল কেটে যায়।

৯
বসন্তেতে স্নিগ্ধভাবে
মনে তুমি তৃপ্তি কর,
পরশি জীবের অঙ্গ
সর্ব্বশ্রান্তি ক্লান্তি হর।

১০
মরুভূমে বালুময়ে
ক্রীড়ামত্ত হলে তুমি,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে
প্রাণীহীন মরুভূমি।

১১
অতীব প্রমত্ত দেখি
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মেঘসনে,
নাশিতে প্রতাপতার
যুঝ তুমি প্রাণপণে।

১২
মলয় অচল আর
বিকশিত পুষ্প যত,
সৌরভ পূরিত করে,
নানামতে অবিরত।

১৩
রজনী হইলে গত
উষা দেখাদিলে পরে,
বিশ্রাম দেখি না তব
নিমেষ কালের তরে।

১৪
কখন বা পদ্মগণে
কভুলয়ে লতাচয়,
কখন উঠিয়া উর্দ্ধে
ধরি নব কিশলয়;

১৫
শিখাও কিরূপে তারা
হইয়া বিশুদ্ধ মতি,
নমিবে তাঁহার পদে
যিনি এ বিশ্বের পতি।

১৬
হে অনিল বিরাজিত
আছ যাঁর প্রাণরূপে
বার বার শতবার
নমিসে নিখিল ভূপে।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

পোষ্টকার্ডের উপর ফটো :—ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পোষ্টকার্ডের উপর নিজ নিজ ফটো ছাপাইয়া প্রেরণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এজন্য তথায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ৫ আউন্স গরম জলের সহিত ৫ গ্রেণ জিলেটিন বা শিরীস গলাইয়া উহার মধ্যে ৫০ গ্রেণ পরিষ্কার নিশাদল মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থ সাদা ব্লটিং কাগজের মধ্য দিয়া ছাকিয়া লওয়া হয়। পোষ্টকার্ডের যে পৃষ্ঠায় ফটো তুলিতে হইবে ঐ নীচের পৃষ্ঠা উক্ত জলের উপর ৪।৫ মিনিট কাল ধরিয়া ভিজাইয়া, উহাকে উঠাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন উপরের পৃষ্ঠায় জল না লাগে। পরে ১ আউন্স বিশুদ্ধ জলের (distiled water) সহিত ৫০ গ্রেণ সিলভার নাইটেট মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে পুনরায় পূর্ব্বের মত পোষ্টকার্ডের নীচের পৃষ্ঠা ভিজাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। তাহার পরে যেমন সাধারণ ফটোকে প্রিণ্ট এবং টোন (tone) করিয়া ফিক্স (fix)

করা হয় উক্ত পোষ্টকার্ডকেও ঐরূপে প্রিণ্ট করিয়া নিম্নলিখিত সলিউসন বা মিশ্রণ দুইটির সাহায্যে যথাক্রমে টোন ও ফিক্স করিতে হয়ঃ—টোনিং সলিউশন (toning solution) জল ৩ আউন্স, গোল্ড্ ক্লোরাইড ২ গ্রেণ ও সোডিয়ম অ্যাসিটেট ১০০ গ্রেণ। টোন করিয়া পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া কার্ড ধুইয়া ফেলিতে হয়।

ফিক্সিং সলিউশন (fixing solution) জল ৮ ভাগ সোডিয়াম হাইপো সালফাইট ১ ভাগ। ফিক্স্ করিয়া পুনরায় কার্ড পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়।

দুগ্ধ দ্বারা কেরোসিনের অগ্নি নির্ব্বাণ ঃ—দেখা গিয়াছে জলদ্বারা কেরোসিনের আগুন নির্ব্বাসিত করিতে গেলে উহা অধিকতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ঐ সময়ে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ঐ অগ্নি অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

কোন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ধনেশ্বর তর্ক চূড়ামণির বাস। পল্লীটির নাম না বলিবার কারণ—এই যে, আসে পাশের লোকেরা বলে, নাম করিলে আর সেদিন অন্ন জোটে না।

চূড়ামণি মহাশয়ের চূড়ামণি খেতাবটি, টোলের অধ্যাপক দেন নাই কিম্বা কোন সংস্কৃত পরীক্ষায় পাশ হইয়া পান নাই। এটী তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি। কারণ তাঁহার পিতার নাম ছিল ৮ সিদ্ধেশ্বর তর্কচূড়ামণি। সিদ্ধেশ্বর তর্ক চূড়ামণি আর এ সংসারে নাই। কাল তাঁহাকে অনেক দিন হইল গ্রাস করিয়াছে। যদিও তাঁহার বুদ্ধি খুব বড় ছিল না কিম্বা বিদ্যায় তিনি খুব দড় ছিলেন না—কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রিয়া কাণ্ড গুলি তিনি খুব সড়গড় করিয়াছিলেন। সরস্বতীর সহিত যে তাঁহার আদৌ সম্পর্ক ছিল না একথা বলিতে পরি না। যাহা হউক অল্পস্বল্প সংশ্রব থাকাতে তিনি সংস্কৃত দুই একটী শ্লোক আওড়াইতে পারিতেন আর তাঁহার একটী প্রধান গুণ এই ছিল, যাহা একবার শুনিতেন তাহা তখনই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন।

তর্ক চূড়ামণির বাসগ্রামে ভদ্রলোকের বসবাস বড়ই কম ছিল। পোনর আনা তিন পাই চাসা লোক। কিন্তু চাসা হইলেও নেহাৎ চাসা নহে। আর তাহাদের মধ্যে অনেকই যোত্রশালী। তাহারা সকলে দেখিল গাঁয়ের মধ্যে যদি কোন বিধান লওয়ার দরকার হয়; পূজা পার্ব্বণ—সারিবার দরকার হয়, দায় ভাগের মতে সম্পত্তি বাঁটওয়ারার দরকার হয়, কিম্বা কোন বিষয়ের ছলা পরামর্শ লইতে হয় এক সিদ্ধেশ্বর বামুনছাড়া আর গতি নাই, এই সব কারণে সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিত। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার বাড়ীতে একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত কথায় বার্ত্তায় একতর্ক উপস্থিত হয়, চূড়ামণি মহাশয় বেগতিক দেখিয়া পেটে যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক ছিল পর পর উচ্চৈস্বরে আওড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে উচ্চ হাস্য করিয়া করতালি দিতে আরম্ভ করিলেন। আগত পণ্ডিতটী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বাপুহে ক্ষান্ত হও। আমারই হার হইয়াছে। আমাকে যখন হারাইয়াছ তখন আর তোমায় কি উপাধি দিব তর্ক চূড়ামণি উপাধি দিলাম। এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। গাঁয়ে রাষ্ট্র হইল সিদ্ধেশ্বর বামুন এক প্রকাণ্ড পণ্ডিতকে হারাইয়া দিয়াছে, পণ্ডিত হারিয়া বামুনকে তর্ক চূড়ামণি

খেতাব দিয়াছিলেন, সেই হইতেই সিদ্ধেশ্বর তর্ক চূড়ামণি হইলেন।

সিদ্ধেশ্বরের একমাত্র পুত্র ধনেশ্বর। একমাত্র পুত্র বলিয়া ধনেশ্বরের আর আদরের সীমা পরিসীমা ছিল না। সিদ্ধেশ্বরের গৃহিণী পুত্রকে কেহ কিছু বলিলে চটিয়া একেবারে আগুন হইতেন। পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বিবাহ দিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের সমান বয়সের এক পাত্রীর সহিত বিবাহ দিলেন। সংসারে যেদিন যায় সেই দিনই সুখের। পরিণাম ভাবিয়া কয়জন এ সংসারে কাজ করে? কয়জন পরিণামে সুখের ভাবনা ভাবে? যাহা হউক বধূমাতা যথাসময় হইতে পর্য্যায়ক্রমে সন্তানাদি প্রসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সংসার ভারী হইয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর ভার বহনে অসমর্থ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সংসার হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইলেন। ধনেশ্বরের ঘাড়ে সংসারের সমস্ত ভার পড়িল, ধনেশ্বরের চমক ভাঙ্গিল। যেদিকে চান দেখেন সেই দিকেই আঁধার।

পিতামাতার একমাত্র পুত্র হইলেও এবং শৈশব হইতে আদরে প্রতিপালিত হইলেও ধনেশ্বর পরিশ্রমী ছিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, মা জগদম্বার উপর তাঁহার অটলা অচলা ভক্তিও নির্ভর ছিল। তিনি মনে ভাবিলেন মা জগদম্বা যখন সংসারের ভার ঘাড়ে ফেলিয়াছেন, তখন সংসার চালাইবার পথও তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া করিব কি?

পিতৃ বিয়োগের পর দুঃখ কষ্টে ছয়মাস কাটিয়া গেল; কিন্তু ক্রমেই সংসার অচল হইয়া উঠিল। একদিবস রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া নানা প্রকার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ঘুমের ঘোরে দেখিলেন, তিনি এক দিনাসরোবরের তীরে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক বৃদ্ধা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধনেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপু হে! দেখিতে পাইতেছি তুমি সংসারের জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছ; যাও, অনতিদূরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক ভগ্ন কালীমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের বাহিরে দক্ষিণ কোণে খনন কর, সেই খানে অনেক ধন পোতা রহিয়াছে, তুমি তাহা হইতে অভিলাষ মত গ্রহণ কর।" বৃদ্ধার এই কথা শেষ হইলে পর ধনেশ্বরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, স্বপ্নের বিষয় মনে মনে অনেক আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাতে বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট দেবীমন্দিরের নিকট একাকী উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দক্ষিণ কোণ বহির্ভাগে খনন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠক্ করিয়া শব্দ হইল মনে আশার সঞ্চার হইল। উৎসাহের সহিত খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে একটি পিত্তলের কলসী বাহির হইয়া পড়িল। ধনেশ্বর দেখিলেন কলসীটি টাকায় পরিপূর্ণ। তিনি অতি সাবধানে কলসীটি তুলিলেন, এবং জঙ্গলের মধ্যে লুককাইয়া রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, রজনীর অন্ধকারে তিনি সেই কলসী ঘাড়ে করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ধনেশ্বরের মাতা ও পত্নী প্রাতে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন দেখিয়া সমস্ত দিন অনাহারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এক্ষণে ধনেশ্বরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও অর্থপূর্ণ কলসী দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদস্বরে মা জগদম্বাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। এই অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা ধনেশ্বর সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

প্রমেহ, ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, পারা বা উপদংশজনিত দূষিত রক্ত, স্ত্রীলোকের প্রদর, ঋতুবন্ধ বা অধিক রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগের এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কৃশতার একমাত্র মহৌষধ।

নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন।

এই মহৌষধ সেবনে আজ ভারতবাসী অনেকেই বলিতেছেন যে, সালসা কড্‌লিভার অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন। কেবল তাহা নহে, শাস্ত্রীয় বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি বহুমূল্যবান ঔষধ সেবনে কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত রোগী এই ভারত বিখ্যাত নবাঙ্গ রসায়ন সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম সকলে মতে একমাত্র লৌহই সমস্ত রোগের মহৌষধ এবং সমস্ত ঔষধের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। বহু পুটের উৎকৃষ্ট লৌহ প্রায়ই পাওয়া যায় না, আমরা বহু চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ সংগ্রহ করিয়া এই নবাঙ্গ রসায়ন নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি, এই ঔষধে চারিটী মাত্র ধাতু দ্রব্য আছে; যথা লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ; তন্মধ্যে লৌহের ভাগ অধিক হওয়ায় নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন নাম হইয়াছে, এই ঔষধ বার্দ্ধক্যতারূপ ব্যাধি নষ্ট করে; এজন্য রসায়ন শব্দবাচ্য হইয়াছে।

এই ঔষধ সেবন করিলে শিথিল অঙ্গ দৃঢ় করে অর্থাৎ অঙ্গ সকল হাড়ে, মাংসে জড়িত হয়। সালসার ক্রিয়া ক্ষণিক, লৌহের ক্রিয়া চিরস্থায়ী; সালসা যখন সেবন করা হয়, তখনই শরীর একটু ঠুসাঠুসা ও চাকচিক্য দেখা যায়, বন্ধ দিলে তাহা আর থাকে না আসল হইতেও একটু কমে। এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন করিলে বনিয়াদ ভাল হইয়া অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু পূর্ণ ও পরিষ্কার হইয়া শরীরের লাবণ্য ও পুষ্টি হইয়া থাকে। তৈল ঘৃত অরিষ্ট, আসব এ সমস্ত অপেক্ষা লৌহের গুণ অধিক ও চিরস্থায়ী একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ১৫ দিবস সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহাশ্রিত জ্বর, হস্ত পদাদির জ্বালা ও উত্তাপ স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদর, ঋতুবন্ধ ও অধিক রক্তস্রাব, পুরাতন জ্বর, পেটগরম, মাথাঘোরা, মাথাগরম, শরীরের দুর্ব্বলতা, শুক্রের শিথিলতা ও তরলতা, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, অধিক প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ এই সমস্ত রোগ হইতে ১৫ দিবস সেবনে একেবারে আরোগ্য হওয়া যায়। বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি সুতরাং এই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষ অবগত আছি। যদি শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সামঞ্জস্য চাও, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্তধাতু সমান পূর্ণাবস্থা রাখিতে চাও, অল্প বয়সে অকাল বৃদ্ধ না হইতে চাও, তবে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন কর। শরীরের ধাত্বাদি ভাল করিতে লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ এই চারিটী ধাতুই উৎকৃষ্ট। এই ঔষধও এই চারিটি ধাতুদ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারা সপ্তাহকাল সেবন করিয়া দেখুন উক্ত ব্যাধি সমূহ হইতে অবশ্য আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা যৌবনের পূর্ব্বে বা যৌবনাবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা বারাঙ্গনা জনিত অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হেতু অকাল বার্দ্ধক্যত শরীরে অনুভব করিতেছেন অর্থাৎ অল্প উত্তেজনায় শুক্রপতন বা স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়, মাথাঘোরা, অন্ধকার দর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা জোনাকি পোকার ন্যায় দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ হইলে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধ বলিতে হইবে। এই রকম বিস্তর রোগীতে প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি, আপনারা একবার সেবন করিয়া দেখুন পুনর্ব্বার যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ লইলে ১৲ টাকা। একেবারে ১৫ দিবসের ঔষধ লইলে ১৸৹ এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিতে লইলে ডাক মাশুলাদি ।৵৹ ছয় আনা।

সমস্ত রকম বাত রোগের একমাত্র সুদক্ষ ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব
কবিচিন্তামণির ভারত বিখ্যাত বাতরোগের মহৌষধ

মূল্য বড় শিশি ১৸০ মাশুলাদি ।৵০ **বাতের তৈল** । ছোট শিশি ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা

এই বাতের তৈল মালিষ করিয়া ভারতের নানা দেশস্থ বাত রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমাদিগকে সানন্দ পত্র প্রদান করিতেছেন, ভগবানের কৃপায় এই বাতের তৈল আজ নিজগুণে দিন দিন এত বিখ্যাত হইতেছে, যে এই তৈল সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক পরিচয় দিতে আবশ্যক করে না। কুব্জপ্রসার সৈন্ধবাদি তৈল প্রভৃতি মালিষ করিয়া কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত বাত রোগী শেষ এই তৈলে অল্প সময়ে ও অল্প অর্থব্যয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন. গেঁটে বাত, সন্ধিগত বাত, কোমরের বাত, জানু ও জঙ্ঘাগত বাত, পারা বা উপদংশ জনিত বাত, কোন অঙ্গ চিবান বা খাল ধরা, ঝিঁ ঝিঁ বাত, অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা, আমবাত, শিরামুণ্ড, খঞ্জ, পঙ্গু, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত প্রভৃতি সমস্ত রকম বাতরোগের একরূপ মহৌষধ আর নাই। এই কলিকাতাবাসী যাঁহারা এই তৈল মালিষ করিয়া বাতরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বাতরোগীর নাম ও ঠিকানা দিয়া আরোগ্য সংবাদ প্রকাশ করা হইল যথা—পাথুরিয়াঘাটাস্থ মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের ম্যানেজার বাবু মধুসূদন বর্দ্ধন মহাশয় কোমরে বেদনায় অতীব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, কোন চিকিৎসায় কোন কিছু ফল না পাইয়া শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। উক্ত মহারাজার খাতাঞ্জি বাবু দয়াময় মিত্র মহাশয় হাঁটু ফুলিয়া গুরুতর বেদনা ভোগ করিতেছিলেন, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মুন্সেফ বর্ত্তমান সবজজ বাবু মতিলাল হালদার মহাশয় দক্ষিণপদ ফুলা ও বেদনায় চলিতে অক্ষম হইয়া তিনমাস ভুগিয়াছিলেন, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। শোভাবাজারস্থ মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরায় জ্বর ভোগ করিতেছিলেন; প্রসারণ করিতে অক্ষম হইয়া দুই পদ শুষ্ক হইতেছিল, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক পক্ষাঘাত রোগে ৬ মাস শয্যাগত থাকিয়া নানাপ্রকার চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। বড়বাজারস্থ বাবু বীরেশ্বর দত্ত গাড়ির চাকার আঘাতে বামপদ মচকাইয়া ৬ মাস শয্যাগত ছিলেন শেষে এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন বর্ত্তমান পেন্‌সন ভোগী ডাক্তার বাবু রতিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের স্কন্ধে ফুলার সহিত অতি গুরুতর বেদনা হইয়াছিল, ডাক্তারিমতে যত কিছু প্রক্রিয়া প্রায় সমস্তই করিয়া কিছুমাত্র উপশম না পাইয়া, পরে এই তৈল মালিষে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন॥ তাহির পুরের রাজা শশীশেখর রায় বাহাদুর বলেন, আমার বিশ্বাস কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব কবিচিন্তামণির বাতের তৈলের ন্যায় উপকারী ঔষধ বাতরোগে আর নাই। এই বাতের তৈল ব্যবহার করিয়া বহুবিস্তর বাতরোগী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞাপনে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কিছুই নাই, আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

সাবধান। আমাদের এই বাতের তৈলের নবাঙ্গ লৌহ রসায়নের উপকার বশতঃ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া লুব্ধ লোকেরা আমাদের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে আমাদের বিজ্ঞাপনের কথাগুলি অনুকরণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছে, অতএব আপনারা একটু সতর্কতার সহিত আমাদের নিজ ঠিকানায় স্বয়ং বা লোক দ্বারা অথবা পত্রদ্বারা এই তৈল গ্রহণ করিবেন।

কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব কবিচিন্তামণির আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।
রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের মেষ পূর্ব্ব সীমায় ১৪ নং বাটী. প্রবেশের সদর দরজা, গেষ্ট্রীট, ট্রামরাস্তার উপর।



বঙ্গে আবার ভীষণ ম্যালেরিয়ার

প্রকোপ আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর কত হতভাগ্য যে এই বঙ্গে জাতশত্রু ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইয়া যে শ্মশান তুল্য হইয়াছে, একথা কে না জানেন? আপনাদের দেশজাত সামান্য একটী উদ্ভিদ, কতকগুলি লতা গুল্ম যে বিলাতী কুইনাইন অপেক্ষা কত উপকারী, কত জীবনীশক্তি-সংরক্ষিণী তাহা জানেন কি? তাই বলি যদি ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া, জীর্ণজ্বর, ধাতুস্থ জ্বর, মেহসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বর হইতে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। নিম্বাদি কষায় জ্বরনাশক ও জ্বর নিবারক ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের সময় নিম্বাদি কষায় এক বোতল সেবন করিলে জ্বরে আর আক্রান্ত হইতে হয় না।

মূল্য প্রতি বোতল বা শিশি ৷৶০ আনা। ডাক মাশুলাদি ।৵০ আনা মোট অঃ ভিঃ পিঃ ১৵০ এক টাকা এক আনা।

প্রশংসাপত্র। আলিপুর জেল হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন:—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক। পরম কল্যাণবরেষু—

আপনার নিম্বাদি কষায় ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ম্যালেরিয়া জ্বরে এরূপ আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ ঔষধ আমি পূর্ব্বে কখন ব্যবহার করি নাই। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে এ ঔষধ দরিদ্রের পরম বান্ধব রূপে পরিণত হইবে ইহার মূল্য অতি সুলভ গুণ অমোঘ ও অব্যর্থ।

শুভাকাঙ্ক্ষীন:—Sd. শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণঃ (চট্টোপাধ্যায়)

অম্লপিত্তে শূলান্তক চূর্ণ অব্যর্থ।

(অম্লপিত্ত ও পরিণাম শূল অজীর্ণ প্রভৃতির মহৌষধ)

দুই তিন মাত্রা সেবনেই ইহার অমোঘ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ক্ষুধা ও আহারে রুচি বৃদ্ধি করিয়া শরীরে বলাধান করে।

এক শিশির মূল্য ৷০ আনা। ডাকমাশুল সমেত ভিঃ পিঃতে ৸৵০ তের আনা।

শূলান্তক চূর্ণের প্রশংসাপত্র।

হুগলি হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত তরুণীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন:—

আপনার অম্লপিত্ত ব্যারামের অশু ফলপ্রদ শূলান্তক চূর্ণ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে আর দুই শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ইতি।

কবিরাজ শ্রীচারুচন্দ্র মল্লিক।

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়। লালা বাবুর বাজার জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

কেশ শোভন তৈল।

চুল কাল হইবে, বকুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হইবে, রমণীর রমনীয় বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়িবে। এক শিশির মূল্য ৷০ আট আনা ডাক মাশুল ।৵০

শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ।

৩৭২ নং লালা বাবুর বাজার জোড়াসাঁকো কলিঃ।

জগতে অতুলনীয়—ভারতবিখ্যাত, সর্ব্বজন প্রশংসিত সর্ব্ববিধ

জ্বরের মহৌষধ—

জ্বর-কালান্তক রস।

"জ্বর-কালান্তক রসের" অদ্ভুত উপকারিতা দর্শনে সকলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ "জ্বর-কালান্তক রসের" প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। যাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাই শত শত ধন্যবাদ দিয়া অযাচিত ভাবে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র দিতেছেন "একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

"জ্বর-কালান্তক রস" কি কি জ্বরের মহৌষধ।

নবজ্বরে "জ্বর কালান্তক রস" ধন্বন্তরি।

পুরাতন জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অমোঘ।

প্লীহা জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ব্রহ্মাস্ত্র।

কম্পজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" যম।

পালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অব্যর্থ।

ঘুসঘুসে জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অদ্বিতীয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রসই" একমাত্র ভরসার স্থল।

কালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" কাল।

মজ্জাগত জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" মন্ত্রৌষধি।

"জ্বর-কালান্তক রস"—

কুইনাইনের আটকান জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দোষযুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে ইন্দ্রিয় বজ্র। "জ্বর-কালান্তক রস"—

আসামের কালাজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দিনাজপুরের ভূতজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

ধোকালীন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পাণ্ডু কামল জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস" বাতজ্বরের মহৌষধ।

এই "জ্বর-কালান্তক রস" সেবনে নবজ্বর যথা—সামান্যজ্বর, স্বল্পবিরামজ্বর, সন্দিজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নবজ্বর ত্বরায় উপশম হইবে।

সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর যথা ;—

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পাণ্ডু কামলা, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর নিবারণ হইবে।

এতদ্ব্যতীত—আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য-দেশজাত কালাজ্বর, কুইনাইনের আটকান জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরক্তজ্বর, নাসাজ্বর, স্ফোটক জ্বর, আভিঘাতিক জ্বর, (কোনা ঘা ফোড়া ও স্থানিক আঘাত বশতঃ জ্বর) প্রভৃতি যাবতীয় জ্বরে যথেষ্ট ফল পাইবেন। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে এই "জ্বর-কালান্তক রসের" তুল্য জ্বর নিবারণের দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই।

ছোট ৪ আউন্স ১ শিশির মূল্য ॥৵০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা ৩ শিশি ১॥৵০ ডাঃ মাঃ ॥০ আনা, ৬ শিশি ৩৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸০ আনা। বড় ৮ আউন্স ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৪নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

Registered No C. 439.

১ম বর্ষ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা] [মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্,এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ; পি দত্ত F.C.S.PH.B. ; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতা, ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেসে" শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০) প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)

কেশরঞ্জন তৈল

22.31.P.66

কেশের জন্য

কেশরঞ্জন।

কেন না—কেশরঞ্জন কেশকে যেরূপ মসৃণ কোমল কুঞ্চিত, ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিতে পারে—এমন আর কিছুই নাই। কেশরঞ্জন নিত্য মাখিলে চুল উঠা বন্ধ হয়, টাক দূরে যায়, কেশমূল দৃঢ় হয় আর বার্দ্ধক্যে নবীন যৌবন সঞ্চার হয়।

বিলাস ভোগে

কেশরঞ্জন

যাঁহারা একবার কেশরঞ্জন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার গুণে স্পিরিটভরা গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা—ইহাতে শত সহস্র সুগন্ধি মিশ্র কুসুমের সুরাভি সম্ভার সমাহিত। পূজাব তত্ত্বে, বিবাহ-ক্ষেত্রে ইহা উপাদেয় উপহার।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	।৶০ তিন আনা।

অর্শোহর বটিকা।

আমাদের 'অর্শোহরবটিকা' সেবন করিলে—বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ কষ্টকর অর্শ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে ভাবেন, অর্শ রোগ একবার হইলে আর আরাম হয় না। ইহা তাঁহাদের মহাভ্রম। প্রথম হইতে সাবধান হইয়া আমাদের 'অর্শোহর বটিকা' ব্যবহার করিলে রোগের উপশম ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে রোগ একেবারে নিরাময় হইতে পারে। আমরা দর্প করিয়া বলিতে পারি, যদি অর্শরোগের প্রকৃত ঔষধ কোথাও থাকে, ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। প্রত্যেক রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি কৌটার মূল্য	...	১।০ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	।৶০ তিন আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"সুরমা" শ্রেষ্ঠ কেশতৈল কেন? সুরমার সুগন্ধ দিবারাত্র চিত্তের প্রফুল্লতাসাধন করিয়া থাকে। সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা জন্মে। সুরমার ন্যায় সহজপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ কেশরাগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। চুল কাল কোমল ও কুঞ্চিত করে।

সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে মাথায় আটা হয় না। চুল বেশ নরম থাকে, কালো চুল আরও কালো হয়। বেণীরচনার সময় চারিদিকে "সুরমার" সুগন্ধ বহিতে থাকে। আর গৃহমন্দিরে শত শত প্রস্ফুটিত বেলা মল্লিকা-চামেলির সুবাস ফুটিয়া উঠে।

মূল্যাদি।—বড় এক শিশির মূল্য ৸০ মাশুলাদি ।৶০ তিন শিশি ২৲ মাশুলাদি ৸৶০।

স্বদেশী এসেন্স্!



বকুল। আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর। এই বকুলে সিক্ত রুমালখানি বুকে থাকিলে মনে হয়—বুক ফুড়িয়া বুঝি বকুলফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে!

দিল্ অব্ রোজ্। একটী ফুলের ফুলসার নহে, কতক গুলি কুসুমের সুমিষ্ট পুষ্পসার একত্রে মিশ্রিত। ইহার সৌরভ বলিয়া বুঝাইবার নহে। সকলকে একবার আমাদের 'দিল্ অব্ রোজ' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। প্রতি শিশি ৸০ মাঃ ।৵০

এস, পি, সেন এণ্ড কোং ১৯।২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



লালা লাজপৎ রায়।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। | মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল। | ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

বাণী।

ওগো সুন্দরি-শুভ্র সেফালি বরণা,
রক্ত কমলগঞ্জিত অয়ি স্বতঃ রঞ্জিত চরণা,
ওগো অশোক অধর হসনা,
ওগো বিশদ কুন্দ দশনা,
ওগো অতসী পীতবসনা,
ওগো সুধা সঙ্গীত রসনা—
এস—অন্তরে এস চির আনন্দ
অধম-দীন-শরণা;
বরিষ আশীষ-উৎপল নীল নয়নে
(তব) গোলাপ-গণ্ড-শয়নে,
বিকসিত কর চিত্ত কমল—
বিভাসিত কর চিত্ত কমল
(ঐ) চরণ নখর-কিরণে!
দেহ-সঙ্গীতে, বীণাসঙ্গীতে, হৃদি সঙ্গীতে গো—,
এ হৃদয় মরুভূ কর উর্ব্বর
অয়ি নিত্য নিখিল-শরণা,
তোমার—
অপরাজিতা অসিত কেশে
আনগো শান্তি মোহন বেশে
বিস্তারি দেহ চক্ষে বক্ষে
ওগো সব অশান্তি হরণা!

শ্রীশ্রীধরস্বামী ॥

অহং বেত্তি শুকোবেত্তি
ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভারতের গৌরব-রবি শ্রীশ্রীধরস্বামী একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। অনেকের মতে গুর্জ্জরদেশে শ্রীধরস্বামীর জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের * ৫ খণ্ডের লিখিতানুসারে তিনি ভারতের পূর্ব্বদেশ বাসী ছিলেন।

স্বামীজী পূজ্যপাদ্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলোকন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার গীতার সুবোধিনী নাম্নী টীকার মঙ্গলাচরণের পরবর্ত্তী শ্লোকটীই প্রমাণ। অনেকে ইহাঁকে, বৈষ্ণবীয় রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-স্বামীর অল্পকাল পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। এরূপ অনুমানের কারণও আছে।

শ্রীস্বামীজী বাল্যকালে অতি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। পরে উপযুক্ত বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হন। তারপর একদা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দীয়

"সংসারসাগরদুস্তরমূর্ত্তীতির্ষোঃ
নান্যঃপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।"

* উইলসন্ সাহেব ৫ম খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত স্বামীজীকে ভারতীয় পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়া স্বীকৃত করিয়াছেন।

ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেম-পিপাসু হইয়া উঠে; এবং ভগবৎ প্রেম পিপাসার সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা ক্রমশই সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে। এই সময়ে উক্ত স্বামীজীর সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগকে পূর্ণ আনুকূল্য পাইয়া স্বামীর ভগবদ্দর্শনলালসা বলবতী হইয়া উঠে। পত্নী বিয়োগের পর; শ্রীস্বামীজী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে "এই সদ্যোজাত শিশুকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব।" শ্রীস্বামীজী এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া সদ্যোজাত শিশুর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহের উপরিভাগ হইতে একটী টীক্‌টীকির ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; এবং তাহার মধ্য হইতে একটী ছানা বাহির হইয়াই সমীপবর্ত্তী একটী মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিল। স্বামীজী এই আশ্চর্য্য জনক ঘটনা দর্শন করিলেন; এবং ভাবিলেন—যিনি জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই জীবের পালনকর্ত্তা; যে দয়াময় এই সদ্য-প্রসূত ছানাটীর আহার যোগাইয়া দিলেন সেই দয়াময় এই শিশুটীরও আহার যোগাইবেন। অতএব সেই করুণাময় শ্রীভগবানের আশ্রয়ে এই নিরাশ্রয় শিশুটীকে রাখিয়া একান্তে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই প্রতিবেশীগণ সেই শিশুটীকে লইয়াগিয়া বল্লভীপতি রাজা নরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য দিলেন। কালক্রমে এই মাতৃপিতৃহারা বালকটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। "ক্রমমাল" রচয়িতা, ভট্টিকাব্যের

২২ সর্গের ৩৫ শ্লোক "কাব্যমিদং বিহিতং ময়াবলভ্যাং শ্রীধর-সূনু নরেন্দ্রপালিতায়াং" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ইহাঁকেই "ভট্টিকাব্যের" কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক এদিকে শ্রীশ্রীধরস্বামী ভারতীয় বিবিধ তীর্থপর্য্যটন করিয়া যথা সময়ে শ্রীকাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই তিনি শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধুময়ী টীকা রচনা করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে গীতা ও ভাগবতের এই স্বামী কৃত টীকাই বিশেষ আদরণীয় ও সুখপাঠ্য। কাশীধামের পণ্ডিত-সমাজে স্বামীকৃত গীতার টীকা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। পরে পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীবিশ্বেশ্বর সমীপে ইহার মীমাংসা প্রার্থনা করিলে, শ্রীবিশ্বেশ্বর স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন ;—

"অহং বেত্তি শুকোবেত্তি ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥"

স্বামীজী গীতা ও ভাগবতের টীকা ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের টীকা, এবং অমানুষী প্রতিভা বলে "মহিমন্ স্তব" নামক শিবস্তোত্রের বিষ্ণুস্তোত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর রচিত "ব্রজবিহার" নামে একখানি অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ আছে। এই কাব্যের শ্লোকগুলি অতি মধুর। উক্ত গ্রন্থের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺হরিমোহন প্রামাণিক স্বামীজীকে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

ভগবানের শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তিই ইহাঁর উপাস্য দেবতা ছিল। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর নিকটে ইনি বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। "মহিম্ন-স্তবের" বিষ্ণু-স্তোত্র-রূপ ব্যাখ্যাই ইহার শেষ রচনা, এবং এই রচনার অল্পকাল পরেই ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি কতকাল মর্ত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার এখনও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

"ভক্তমাল" রচয়িতা, শ্রীশ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ; প্রয়োজনীয় বোধে তাহারও কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জয় শ্রীশ্রীধর স্বামী ভুবন পাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন॥
তাঁহার বৈরাগ্য কথা আশ্চ বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী হৃদয়ে উদয়॥
মহা ভাগোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্যজন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥
হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে একজ্যেঠী ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়িগেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকষিয়া
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হৈলা।
ভট্টি নামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা॥

শ্রীগৌরগোপাল সেন।
মালদহ।

আর্য্যশক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩

"উপপ্লবায় লোকানং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন। কোন্ সময়ে বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন, এ প্রবন্ধে উহাই আলোচ্য বিষয়। আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত * প্রদেশে থাকিয়া, রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন, তখন এই বঙ্গদেশ ভয়াবহ বন্য হিংস্রজন্তু সমাকুল নিবীড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। এমন কি, সে সময় মগধরাজ্যেও আর্য্যসভ্যতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃকণা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন অসভ্য অনার্য্য নিবাস বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কারণ আর্য্যগণ তখন মগধের যথেষ্ট নিন্দা করিতেন। † তৎকালে "অঙ্গও" অনার্য্যদিগের বাসভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ‡ বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের আবাস স্থলই "পৌণ্ড্র" নামে অবিহিত; সেই পুণ্ড্রগণও দস্যু স্বরূপ অনার্য্যে পরিগণিত ছিলেন। (১) প্রাচীন অনেক গ্রন্থে বঙ্গও সেই সময়ে অনার্য্য নিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। (২) সংহিতা রচনা কালের বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হয় নাই।

ভগবান মনু প্রণীত তখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থানে ব্রাহ্মণ বাস নিষিদ্ধ ছিল; কেবল মাত্র তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেই ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত দেশাদিতে গমনাগমন করিতেন। (১) রামায়ণ রচনার সময়েই বঙ্গে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতিঃকণা ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ-বাসের সূত্রপাত হয়। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাক্জ্যোতিষপুর অর্থাৎ কামিখ্যা দেবীর স্থান কামরূপ স্থাপন করেন। প্রাক্জ্যোতিষপুর যাইতে হইলে, বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়; যে হেতু আর্য্য-সভ্যতা ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতেই পূর্ব্ব ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ অমূর্ত্তরজা প্রাক্জ্যোতিষপুর স্থাপন করিলেন, অথচ মধ্যস্থানে বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ আদৌ স্থাপিত হইল না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক বঙ্গদেশ নিবীড় অরণ্যপূর্ণ হইলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কোন স্থানে আর্য্যনিবাস যৎ সামান্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহাভারতের সময়ে যে বঙ্গদেশ আর্য্যগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, উহার যথেষ্ট প্রমাণই আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন বঙ্গে মহারাজ সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেছিলেন; মহাবল ভীমসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সমস্ত আর্য্যভূমি জয় করেন। পরিশেষে দ্বিতীয় পাণ্ডব বঙ্গদেশে উপস্থিত

---

* সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানেই "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নামে অভিহিত হইত।

† ঋক্বেদ সংহিতা ৩৫৩।১৪ দ্রষ্টব্য।

‡ অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।১৪ দ্রষ্টব্য।

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮ দ্রষ্টব্য।

(২) ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১ দ্রষ্টব্য।

(১) "অঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।" মনুসংহিতা।

(২) তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাক্জ্যোতিষং পুরম্। ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থং—ইতি রামায়ণম্।

হইয়া বঙ্গরাজ সমুদ্র সেনকে পরাজয় করিয়াছিলেন। (১) কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেও বঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণ যথেষ্ট শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২) আর তীর্থ যাত্রা কালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করতঃ কলিঙ্গদেশে বৈতরনী নদীর তীরে সমুপস্থিত হন। যে স্থান মনুসংহিতায় অনার্য্য-নিবাস বলিয়া অভিহিত হইয়া ছিল, পাণ্ডবগণ তথায় "যজ্ঞিয় গিরি শোভিত সততং দ্বিজসেবিত" আর্য্য নিবাস সন্দর্শন করিয়াছিলেন। (৩) ফল কথা, তৎকালে ঋষিগণের যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বহুতর অনার্য্য-নিবাসও পবিত্র পুণ্য—ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ বৈদিক আর্য্যগণের বসতি ছিল না,—যখন কেবল অসভ্য ম্লেচ্ছগণের ও বন্য শ্বাপদ ভৈরব-নিনাদে এই বিস্তৃত বনভূমি প্রকম্পিত হইত, তখন আর্য্যগণ এতদ্দেশে আগমনে মহাবিপদের আশঙ্কা করিতেন; কারণ এই প্রদেশে আসিলে, আর্য্য-ধর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিবারই সমধিক সম্ভাবনা ছিল। এ জন্যই বোধ হয় ভগবন্ মনু এই প্রদেশ অনার্য্য নিবাস বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। কিন্তু মনুর সময়েও তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই প্রদেশে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল না।

মনুর বহুকাল পরে আর্য্যগণ প্রবল পরাক্রমে এতদ্দেশের অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করতঃ অরণ্যাদি কাটাইয়া, নূতন নূতন নগর ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আর্য্য হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণ শূন্য হইলে চলিত না ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যগণ এই প্রদেশে আগমন করিয়া, জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া, ম্লেচ্ছাচার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, ইহা কখন ও সম্ভবপর নহে। পূরকালে ক্ষত্রিয়রাজগণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ক্রিয়াই সম্পাদিত হইত না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় না হইলে চলিত না। (১)

সুতরাং মহাভারতের সময় যে বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারি বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। অপর কোন রাস্তা দিয়া কলিঙ্গে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহারাজ রঘু বঙ্গ অতিক্রম করিয়াই কলিঙ্গে সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন। (২) পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন বঙ্গে মহারাজ বাসুদেব রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহার রাজ্যে কলিঙ্গের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল বলিয়া প্রমান পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাইতেছে, বহু প্রাচীন পৌরাণিক যুগ হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। কুরু

---

(১) সমুদ্রসেন নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্। তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ মহাভারতম্।

(২) ক্ষত্রিয় কাণ্ডের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) "এতে কলিঙ্গাঃ যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রা যজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণ মেত্যবৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥
মহাভারতম্।

(১) মনুসংহিতা ৯।৩।২২ দ্রষ্টব্য।

(২) "স তীর্ত্বা, কপিশাং সৌ নৈার্বদ্ধরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥"
রঘুবংশম্।

পাণ্ডবগণের সময়ে এপ্রদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহা নিশ্চিত রূপে বলিবার জন্য আমরা যত্নবান হইব। বৈদিক যুগে সারস্বত ব্রাহ্মণ-গণেরই সবিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারাই প্রথম কোশল, তৎপর বিদেহ বা মিথিলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। দেব বৈশ্বানর সদানীরা নদীর পরপাড় দগ্ধ করেন নাই বলিয়া, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ উক্তনদীর পরপাড়ে যাইতেন না। অধুনা বহুতর ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠান করায় উহা ব্রাহ্মণ বাস যোগ্য হইয়াছে। (১)

হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে আর্য্যক্ষত্রিয়ের অপ্রতিহত বল বীর্য্যকে, আর্য্য বৈশ্যের অতুল বিষয় বিভবকে, আর্য্য শূদ্রের অক্লান্ত শ্রমকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে পরিণত করিয়া আর্য্য-সমাজের পুণ্যস্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলে; তোমার বিধানে যে আর্য্য-সমাজে যাগ, যজ্ঞ, দান ধ্যানের, নিত্যই উৎসব হইত, যে আর্য্য-সমাজের নিত্য ক্রিয়া কলাপ ও চেষ্টাসমূহ দেখিলে এমন কি নাস্তিক ও ঈশ্বরকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া, পিতৃ-লোক ও দেবলোক মনুষ্যের অতি সন্নিহিত বলিয়া পরকালের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া বোধ করিত, এক্ষণে সেই আর্য্যসমাজ আর পারমার্থিক সমাজ নাই; ধর্ম্ম সংস্থানে, ধর্ম্মজীবন উদ্দেশ্যে আর এ সমাজের লোক সকল সমবেত নয় পরন্তু বিষয় সংস্থানে বিষয় বিভব বিস্তৃত করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার বাসনায়, সমাজের উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই একত্রিত হইয়াছে হে ব্রাহ্মণ! যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত নাই, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আচারের তারতম্যে যে সমাজে উচ্চ নীচ গণনা হয় না, যে সমাজে মনুষ্যত্বের, বীরত্বের, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের প্রতিযোগিতা নাই; পরন্তু বিষয় বিভব অনুসারে যে সমাজে উচ্চ নীচ গণনা, যে সমাজে কেবল মাত্র বিষয় কোলাহল, বিষয় প্রতিযোগিতা ও কামোপভোগই যে সমাজের সমগ্র পুরুষার্থ; সেই সমুদায় সমাজকে, সেই সমুদায় দেশকে, তুমি যে ম্লেচ্ছসংজ্ঞা প্রদান করিয়া গর্ব্ব করিতে, এক্ষণে তোমারই প্রতিষ্ঠিত সেই সনাতন সমাজ ঘোর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উন্নতি কামনা করিতেছে। এক্ষণে আর্য্য সমাজ কাহারও স্বাভাবিক বৃত্তি স্থির নাই—জীবিকার স্থির নাই সুতরাং জীবিকার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়াতে জীবিকার উপরে এক্ষণে প্রতিযোগীতা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আর্য্য সন্তানকে ২৪ ঘণ্টাকাল এক জীবিকাদায়ে শৃগাল কুক্কুরের মতন সংগ্রাম ও শ্রম করিতে হইতেছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য জীবিকা হওয়াতে আর্য্যক্ষেত্রে আর বিদ্যার জন্য বিদ্যার আলোচনা নাই—ধর্ম্মের জন্য আর বীরত্বের চর্চ্চা নাই, মনুষ্যত্বের উন্নতি করিবার জন্যও আর অকপট ধর্ম্মভাব নাই। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার অতএব বৃত্তি বিধান -বর্ণ-ভেদ প্রথা অতি গুরুতর পাপ, মুখে এই কপট ভ্রাতৃভাব দেখাইয়া আধুনিক আর্য্যগণ কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে অন্নপানে বঞ্চিত করিবার জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, কল কৌশল লাভে সর্ব্বতোভাবে অহোরাত্র যথেষ্ট শ্রম করিতেছে। জীবিকা লাভ হইলেই যথেষ্ট, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে পারিলেই যে ক্ষেত্রে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের চরমফলে উপনীত হওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে সুতরাং প্রকৃত বিদ্বান্ প্রকৃত বীর ও প্রকৃত ধার্ম্মিক কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিবে। হে ব্রাহ্মণ। যে তোমার পুণ্য-

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০—১৭ দ্রষ্টব্য।

বিধানে গৃহস্থ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞকে গৃহস্থাশ্রমের প্রধান কার্য্য বলিয়া কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এক্ষণে সেই গৃহস্থাশ্রমে ভূত সেবা ও মনুষ্য সেবা হওয়া দূরে থাকুক পিতৃসেবা ও মাতৃসেবা হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। বিষয় প্রবর্ত্তিত হওযাতে, মনুষ্যত্বের, ভ্রাতৃত্বের এমন কি আশ্রমসুখ, আশ্রম ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ! যে তুমি তপোবলে আচারকে ধর্ম্মের মূল, স্বাস্থ্যের মূল—দীর্ঘ জীবনের মূল জানিয়া সমাজ সংস্থাপন আবার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া রাখিলেন, এক্ষণে সমাজ সংস্থান বিপরীত হওয়াতে এ সমাজে সম্যক্ আচার প্রতিপালন করিবার সুযোগ নাই সুতরাং বিবিধ প্রকার উৎকট উৎকট রোগ সকল সংহার মূর্ত্তি দেখাইয়া আর্য্যের পরমায়ু দিন দিন ক্ষয় করিতেছে আর্য্য জীর্ণ দেহে, ভগ্ন মনে এই জীবন ভার বহন করিতেছে। যাহা কিছু দুষ্কর, যাহা কিছু দুস্তর যাহা কিছু দুরূপ সকলই তপস্যা সাধ্য বলিয়া তপস্যার শ্রেয়ঃ সাধন মানসে তোমার বিধানে আর্য্যক্ষেত্রে কি রাজা, কি প্রজা কি কৃষক, কি বণিক, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে সমাজ সংস্থান বিপরীত হওয়াতে তপোবলের নিদর্শন দেখিতে না পাওয়াতে লোকে আর তপস্তত্ত্বের উপর বিশ্বাস করে না সুতরাং সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ তপস্যার পথ রুদ্ধ হওয়াতে, নব নব তত্ত্বের আবিষ্কারের পন্থার রোধ হওয়াতে আর্য্যক্ষেত্রের সুকৃতি দিন দিন ক্ষয় হইতেছে।

হে ব্রাহ্মণ! আর্য্যসমাজে এক্ষণে সকল বিষয়েই ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত। আহারে, ব্যবহারে, শয়নে, পরিচ্ছদে, দেব দেবী মন্ত্র তন্ত্র শৌচাশৌচ সংস্কারে, ঔষধ চিকিৎসা দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন উপস্থিত। যাহা কিছু প্রাচীন তাহা ভঙ্গকর জাতীয় সমুদায় সংস্কার, জাতীয় চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ কর এবং রাজশ্রীর অস্তিত্বে মিশাইয়া উন্নতি কামনা কর এই বীজ মন্ত্র। আর্য্যক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এ যাবৎকাল কত শত প্রগাঢ় মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের আবির্ভাব হইল, কত কোটী কোটী লোকের সমাগম হইল, কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! তোমার বিধান ও শাস্ত্র উপদেশের উপর কাহারও কখন বুদ্ধি ক্ষোভ বা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই—কিন্তু এক্ষণে কালের কি মায়া, বাল্যসংস্কারের কি প্রভাব। নবীন আর্য্যগণ মিল্, কোমট ইত্যাদি রাক্ষসী মায়া অবলম্বনে পজিটিভিষ্ট হইতে পারেন, অলৌকিক ক্ষমতা লাভ প্রত্যাশায় ইংরেজ গুরুর শিষ্য হইয়া থিওছপীষ্ট হইতে পারেন এই সকলেরই জন্য আধুনিক আর্য্য-জাতিত্ব, জাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের উপর বাল্যকালাবধি তাঁহার এমনই কুসংস্কার, যে ইহার জন্য তিনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে চাহেন না—ইহার জন্য এ কটুত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেই বিস্তর অপকার্য্য করিলেন, এই বোধে তাঁহার মনে গ্লানি উপস্থিত হয়।

হে ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কি এই সব পরিবর্ত্তন, এই সকল অনাচার, অবিচার অত্যাচারে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই, সত্য সত্যই কি ভারতের উপর তোমার এরূপ নির্ব্বন্ধ হইয়াছে যে তুমি ইহার সকল বিষয়েই নিদ্রিত ভাব ধারণ করিয়া থাকিবে, সত্য সত্যই কি হিন্দুগণ আর ধর্ম্মভাবে একতা লাভ করিবে না, যে সমাজে পুণ্য সঞ্চয় অনায়াসলব্ধ বলিয়া দেবতারা ও

স্বর্গলোক পরিত্যাগ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন সত্য সত্যই কি তাই সমাজের পরিণাম এইরূপ ঘটিল, ব্রাহ্মণ্যদেব! কোন পাপে আর্য্যের বুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল যে সে বিষয় লালসা প্রেরিত হইয়া জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য দেহ মন সুস্থ করিয়া আত্মোন্নতি ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের ও পরকালের বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইল, কোন্ পাপেই বা আর্য্যসমাজে আর তপস্যার চর্চ্চা নাই, স্বাধীন চিন্তা শীল গ্রন্থকার, প্রকৃত বীর পুরুষ, দানধর্ম্ম নিরত অতুল বিষয় বিভবশালী লোক সকলও আর জন্মগ্রহণ করে না, পরন্তু রুগ্ন দেহ ও ভগ্নমনা পুরুষের সংখ্যা অধিক হইল! ব্রাহ্মণ্যদেব! আমাদিগকে এইসব কথার নিগূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দেও যাহাতে আমরা তোমার উপদেশ সমূহকে তোমার বেদ বেদাঙ্গ, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সকলকে বুদ্ধির সন্নিহিত করিয়া তোমার অনুসরণ করিতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় আপ্ত বচনের প্রমাণে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে চলিবে না পরন্তু বিংশশতাব্দীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ইত্যাদি আর্য্যধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমূহের ধর্ম্ম কি বুঝাইয়া দাও। ব্রাহ্মণ্যদেব! তুমি আর্য্যের হিত-কামনায় আবার জাগ্রত হও আর্য্যসমাজ হইতে রোগ, শোক দুঃখ দারিদ্র অন্তর্হিত হউক; জ্ঞানানন্দে, বিষয়ানন্দে আবার আর্য্যমুখ উদ্ভাসিত হইতে থাকুক আবার জগৎ দেখুক, দেহ মন আত্মার সভ্যতা কাহাকে বলে, দানও ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা কি, তপো বলের অসাধ্যই বা কি আছে; প্রকৃত বীরত্ব এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে কহে। এই সব কামনায় আমরা বারম্বার তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার উদ্বোধন করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যদি মৎস্যের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্পদিনে যে খুব লাভবান হইতে পারিবেন, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। দেশে দিন দিন যেরূপ মৎস্যের অভাব হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, এই সময়ে মৎস্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ যৎসামান্য মূলধন দ্বারাই আরম্ভ করা যাইতে পারে ও আমাদিগের প্রকৃতির উপযোগী সামান্য পরিশ্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে। কলিকাতা মহানগরীর কোন এক প্রসিদ্ধ ধনী একদিন বলিয়াছিলেন, "একটি টাকা মূলধন লইয়া অল্পসময়ের মধ্যে একলক্ষ টাকা করিতে হইলে মৎস্যের ব্যবসায়।

মৎস্যের কারবার অনেক রকমে করা যাইতে পারে। যাঁহাদিগের মূলধন নিতান্ত কম, অথচ বেশী লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমতঃ মৎস্যের চাষ করাই উচিত। আর যাঁহারা বেশী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহারা শুধু পুকুরে চাষ না করিয়া বড়বড় নদী হইতে মৎস্য ধরাইয়া বিক্রয় করিতে পারেন। মৎস্যের ব্যবসায় যত রকম করা যাইতে পারে তাহা আমরা ক্রমে নিম্নে লিখিলাম।

১। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ গৃহস্থবর্গেরই আপন আপন বাড়ীর সীমার মধ্যে দুই একটি পুকুর আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে স্ব স্ব পুকুরে রীতিমত মৎস্যের চাষ করিয়া, আপনাদিগের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় মৎস্যের পূরণ করিতে কিম্বা বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহাদিগের

সুবিধানুরূপ পুকুর নাই, অথবা যাঁহারা সহরবাসী, ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে কি সহরে দুই একটি পুকুর জমা লইয়া মৎস্যের চাষ করিতে পারেন। পল্লীগ্রামে পুকুর জমা লইতেও অধিক টাকার প্রয়োজন হয় না, দুই তিন বিঘা জলকর এমন এক একটি পুকুর বার্ষিক ১৫।১৬ টাকা খাজনায় পাওয়া যাইতে পারে, তবে স্থান বিশেষে অর্থাৎ সহরে কি সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের পুকুরগুলির খাজনা কিছু বেশী হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক যদি নিজের পুকুর থাকেত ভালই, নতুবা সুবিধা অনুসারে বৎসরের শেষে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে মৎস্যের ডিম্ব ফুটান যাইতে পারে, এমন পুকুর জমা লইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশস্থ পুকুর সমূহে সাধারণতই কিছু কিছু মৎস্য থাকিতে দেখা যায়, ঐ সকল মৎস্যের অধিকাংশই শাল, বোয়াল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয়, অতএব এই হিংস্র জাতীয় মৎস্যগুলি ধরিতে যেন ভুল না হয়। সময়ে এই সকল মৎস্য পুকুরে এত প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে তাহা বিক্রয় করিলে অনায়াসে পুকুর পরিষ্কার ও মৎস্য ধরাইবার ব্যয় উঠান যাইতে পারে, এমন কি যদি সুবিধা হয়, তবে ঐ ব্যয় উঠাইয়া ভাবী মৎস্যের চাষ করিবার জন্য কিছু মূলধনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাসের প্রথমে পুকুরে ডিম ছাড়িবার পূর্ব্বে, আর একবার পুকুর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, তৎপর রোহিত, মিরগেল কাতলা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব মূলধন অনুসারে ক্রয় করিয়া ছাড়িতে হইবে; উক্ত মৎস্য সমূহের এক এক ভার ডিম্ ছয় সাত টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে, পুকুরে ডিম্ ছাড়িবার এক সপ্তাহ পরে, ডিম্ ফুটিলে পর আর এক সপ্তাহ কাল রীতিমত খাদ্য প্রদান করিয়া একটু বৃদ্ধি করত অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে। যাঁহারা কিছু বেশী মূলধন (অন্তত একশত টাকা) লইয়া মৎস্যের চাষ করিতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সময়ে বিক্রয় না করাই যুক্তিসঙ্গত। রীতিমত মৎস্যের চাষ করত ভোঁদড় (উদ্) ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া এক বৎসর অন্তে বিক্রয় করিলে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহাদিগের মূলধন নিতান্ত কম, কি একভার ডিমের অধিক ক্রয় করিবার সুবিধা হয় না, এবং নিজের দুই একটি পুকুর ব্যতীত আর পুকুর নাই, কিম্বা জমা করিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারাই উল্লিখিত রূপে বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত পুকুরে চারি পাঁচবার ডিম্ ফুটাইয়া অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারা যায়, এবং শেষের বারে যে সকল ডিম্ ফুটান যাইবে তাহার কিছু বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চাষের জন্য রাখা যাইতে পারে।

২। যাঁহাদিগের কোন রকম পুকুর নাই কিম্বা জমা করিয়া লইবার সুবিধা হয় না, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও মৎস্যের ব্যবসায় করিতে পারেন। যাঁহারা মৎস্যের চাষ করেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিম্বা মৎস্যের আড্ডা হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া লোক রাখিয়াই হউক কি অন্য কোন উপায়েই হউক বাজারে খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিতে পারা যায়। এইরূপে মৎস্যের ব্যবসায় করিতে হইলেও বেশী মূলধনের আবশ্যক করে না, দশ বার টাকা কি ইহার ন্যূন হইলে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৩। যাঁহারা মৎস্যের চাষ করিতে ইচ্ছা করে না, অথচ কিছু বেশী মূলধন লইয়া কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ, পাণ্ডুয়া, মুঙ্গের প্রভৃতি মৎস্যপ্রধান দেশ হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতা কি অন্যান্য প্রদেশে চালান দিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আজকাল এতদ্দেশে রেলওয়ের বিস্তার হওয়াতে 'চালানী' কারবার সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যে সকল স্থলে রেলওয়ের সুবিধা নাই, কিম্বা যদি কোন স্থলে জীয়ন্ত মৎস্যের চালান পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে নৌকা দ্বারা কি অন্য কোন উপায়ে অনায়াসে প্রেরণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এতদঞ্চলে কই, মাগুর, শোল ইত্যাদি যে সকল জীয়ন্ত মৎস্যের আমদানী হয়, তাহা সমস্তই নৌকায় আসিয়া থাকে। চালানী ব্যবসায়ীগণ শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলার বিলাঞ্চল হইতে এই সকল জীয়ন্ত মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং ইহাদিগকে সংগ্রহ করিতেও বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। বিলাঞ্চলবাসী জিয়ানী, নিকারী ও অন্যান্য মৎস্য ব্যবসায়ীগণ, বড় বড় বিল হইতে মৎস্য ধরিয়া স্থানীয় হাট বাজারে আমদানী করিয়া থাকে, ঐ সকল হাট বাজার হইতে চালানী ব্যবসায়ীগণ মৎস্য ক্রয় করিয়া নৌকা বোঝাই করত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করে। ২৫০।৩০০ মণ মাল ধরে এমন এক এক খানি নৌকা ৩।৪ দিনে অনায়াসে বোঝাই করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ যাহারা পূর্ব্বোক্ত জিয়ানী কি নিকারীদিগকে কিছু অগ্রিম বা "দাদন" দিয়া রাখে তাহাদের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। দাদনপ্রাপ্ত জিয়ানী কি নিকারীগণ, দাদন দাতার নিকট মৎস্য বিক্রয় না করিয়া অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারে না এবং বাজার দর অপেক্ষা ইহাদিগের কিছু সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকে।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এতদ্দেশে কই, মাগুর প্রভৃতি যে সকল জীয়ন্ত মৎস্যের আমদানী হয়, তাহা দেখিতে বড়ই বিশ্রী, দেহের অংশ শুকাইয়া যাইয়া কেবল মাথাটি অবশিষ্ট থাকে, এবং খাইতেও তত সুস্বাদু হয় না। এইরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নয়, মৎস্য ব্যবসায়ীগণ অজ্ঞতা বশতঃ মৎস্য ধরার পর হইতে নিরীহ মৎস্য সমূহকে কিছুই আহার দেয় না, এবং এক এক খানি নৌকায় এত অধিক মাছ বোঝাই করে, যে ইহারা যৎসামান্য রূপেই একটু নড়িতে চড়িতে পারে। এমন কি, আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, অনেকে প্রত্যহ নূতন জল না দিয়া ৩।৪ দিন অন্তর জল পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় এই সকল জীয়ন্ত মৎস্য সবল ও সুশ্রী অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার কোনই আশা করা যাইতে পারে না, ইহাদিগের জীবন নিতান্ত কঠোর করিয়া তবু এক রকম জীবিত থাকে।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্তরূপ চালানী কারবার সাধারণতঃ শীত কালেই বেশী হয়, কারণ ঐ সময়ে বড় বড় নদীতে বড় একটা তুফানের আশঙ্কা থাকে না। শীত ঋতুতে ঢাকা ও ফরিদ পুরের বিলাঞ্চল হইতে এক এক খানি বোঝাই নৌকা ৭।৮ দিনে অনায়াসে এতদঞ্চলে পৌঁছিতে পারে। অধিকাংশ চালানী ব্যবসায়ীদিগের বড় বড় আড্ডায় এক এক জন মোকামী থাকে, ঐ সকল মোকামীগণই প্রত্যহ খুচরা হিসাবে স্থানীয় জেলেদিগের নিকট মৎস্য বিক্রয় করে।

যাহাদিগের মোকামী নাই তাহারা কোন আড়ত-দারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এইরূপে আড়াই শত মণী এক এক খানি নৌকার মৎস্য ১০।১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

রোহিত, মিরগেল, কাতলা প্রভৃতি পোনা মৎস্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ হইতেও সময়ে সময়ে বিস্তর আমদানী হয়। কিন্তু ইলিশ মৎস্য গোয়ালন্দ ও তন্নিকট-বর্ত্তী বেলগাচি, রাজবাড়ী ভিন্ন অন্য কোন স্থল হইতে বড় বেশী আমদানী হয় না। এবং ঐ সকল স্থান হইতে ইলিশ মৎস্যের চালান যাইয়া থাকে, এই জন্যই কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় ইলিশ মৎস্যের আমদানী অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। গোয়ালন্দের নীচে পদ্মানদে জেলে-গণ ব্যবসায়ার্থ মৎস্য ধরে, তাহাদিগের নিকট হইতে নিকারী বা চালানী ব্যবসায়ীগণ মৎস্য ক্রয় করিয়া বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালান দেয়। রেলওয়ে দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালান মৎস্য পাঠাইতে ইহাদিগকে বিশেষ কোন কষ্টও স্বীকার করিতে হয় না। মৎস্য ক্রয় করিয়া ঝুড়ি বোঝাই করত কলিকাতা কি অন্যান্য প্রদেশে আপন আপন এজেন্টের নামে প্রেরণ করিয়া থাকে, এবং এই সকল এজেন্টগণ স্থানীয় জেলেদিগের নিকট ঝুড়ি হিসাবে বিক্রয় করে। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা মৎস্য পাঠাইতে হইলে, আজ কাল মণকরা দেড় টাকা হিসাবে রেল ভাড়া দিতে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিক টাকার ইলিশ মৎস্যের ক্রয় বিক্রয় "হালি"। কিম্বা কুড়ি হিসাবে হইয়া থাকে। মৎস্য যখন অত্যন্ত ধরা পড়ে তখন এক পয়সায় এক হালি কি দেড় হালি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারা যায়, এমন কি অত্যন্ত সুলভ প্রযুক্ত সময়ে সময়ে খরিদ্দার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অপর্য্যাপ্ত মৎস্য যে প্রত্যেক বৎসরেই ধরা পড়ে তাহা নহে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে মাছ খুব বেশী ধরা পড়ে, এবং সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই সময়ে এক টাকায় আট নয় হালি ক্রয় করিতে পারা যায়, কিন্তু শীতকালে এক টাকায় ছয় সাত হালির বেশী কদাচিৎ বিক্রয় হইয়া থাকে, কারণ এই সময়ে মাছ খুব কম ধরা পড়ে।

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

ভূমিকম্প।

জ্যোতিষ শিক্ষার্থীগণের পক্ষে ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের লাহোরের ভূমিকম্প বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত কি না, তাহার প্রমাণ এরূপ সুন্দরভাবে পাওয়া সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। যদ্যপি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিনা পরীক্ষায় অগ্রাহ্য না করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুশীলন করেন তাহা হইলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং জগতের অনেক ঘটনাই যে গ্রহদিগের আকর্ষণশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

যে শাস্ত্র দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে কোন দিনে বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে পারে জানিতে পারি, সে শাস্ত্রের উপকারিতা যে

কত বহুমূল্য তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপার যে ঘটিবার বহুপূর্ব্বে জানা আধুনিক কালে অসম্ভব, তাহা নহে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সামান্য আলোচনায় ইহা স্পষ্ট জানা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ (অবশ্য সকলেই নহে) জ্যোতিষশাস্ত্র আর্য্যদিগের কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করেন।

কিন্তু যে অবিশ্বাস অনুসন্ধান না লইয়াই যে কোন বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা সর্ব্বাংশে বিপদজনক এবং যার পর নাই ঘৃণিত। যাহা অনুসন্ধান না লইয়াই ঘটনায় আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকে সে রূপ অন্ধ বিশ্বাসও বরং ভাল, কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারী অবিশ্বাস অজ্ঞানতারই একরূপ প্রকার ভেদমাত্র। আগন্তুক ঘটনা সমূহে অতি সামান্য কারণেই আদ্যোপান্ত মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করে, এরূপ অদূরদর্শী ছিদ্রান্বেষী বিরুদ্ধবাদীর কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু উক্ত বিষয় যতই কেন দুরূহ এবং মানব-শক্তির সাধ্যাতীত হউক না, যিনি ধীর, প্রশান্ত এবং ক্লেশসহিষ্ণু পরীক্ষক, যিনি প্রকৃতির প্রতীক্ষায় সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং অতি সন্তর্পণে প্রকৃতি দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিই কেবল মাত্র কোন নূতন সত্য প্রচারে সমর্থ হন। যদি বিজ্ঞানোৎসুকগণ বুঝিতে পারিতেন যে তাহাদের যথেচ্ছবিচারবুদ্ধি এবং প্রগাঢ় অবিশ্বাস দ্বারা তাঁহারা যে এত ভালবাসেন সেই বিজ্ঞানকে কতদূর হীন প্রভ করিতেছেন তবে তৎপ্রতি নিশ্চয়ই অধিক উদারতা ও অমায়িকতা প্রদর্শন করিতেন। এই মন্তব্য হইতে স্বতঃই মনোমধ্যে অন্য একটী ভাবের উদয় হয় তাহারা কি যথার্থই বিজ্ঞানামোদী না বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাহাদিগের উপজীবিকা স্বরূপ? যদ্যপি তাঁহাদিগের বিজ্ঞান-প্রীতি অকৃত্রিম হইত তবে বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান বৃক্ষে যে সুফল প্রসূত হইত সন্দেহ নাই, এবং এই সংশয়ও সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইতেছে কারণ যথার্থ বিজ্ঞান উপাসক এবং অকৃত্রিম বিজ্ঞানামোদী ব্যক্তিগণ সকলেই সরল-প্রকৃতি বিশিষ্ট, কুসংস্কার-শূন্য এবং অনুসন্ধিৎসু;—প্রত্যেক নূতন অনুমানের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক নূতন বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উদ্ধত প্রকৃতি বা আত্মম্ভরী নহেন, কিন্তু বিনীত এবং বিবেকবুদ্ধিযুক্ত অনুসন্ধানকারী। তাহারা স্বকীয় অবিজ্ঞতা ও অযোগ্যতা বুঝিতে পারেন এবং জানেন যে তাহারা প্রকৃতির কার্য্য বুঝিতে এখনও নিতান্ত ক্ষীণ শক্তি এবং প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে কখনই তাঁহারা সাহসী হন না অথবা প্রকৃতির শক্তির কোন সীমা নির্দ্দেশও করেন না। তাঁহারা সন্তুষ্ট মনে স্বীকার করেন যে কোন তত্ত্ব নূতন বলিয়া সন্দেহ করিবার কিছু নাই, কারণ উহা সত্য হইতেও পারে। কেবল তাহাদিগের স্বকীয় ঘটনা সমষ্টির জ্ঞান নিতান্ত সামান্য বলিয়া এবং যে পথ অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাও অনিশ্চিত রহস্যের মধ্যে স্থাপিত বলিয়াই অসম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বদাই প্রমাদপূর্ণ। অতএব যে কোন প্রদেশেই প্রজ্জলিত হউক না কেন, পৃথ্বীপ্রান্তোদ্ভাসিনী প্রতি আলোক রশ্মিকে অপরিচিত অভ্যাগত প্রায় আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে, প্রফুল্লমনে এবং সাদরে অভ্যর্থনা করা উচিত।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা গণনা পূর্ব্বক গ্রহগণের সঞ্চার নির্ণয় করিয়া ভূমিকম্প সংঘটন, পূর্ব্ব হইতে স্থির করা যায় কি না। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকম্পের সাধারণ কারণাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সাধারণতঃ সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের অল্প-কাল পরেই ভূমিকম্প সম্ভাবিত হইয়া থাকে।

২। ভূমিকম্প সময়ে গ্রহদিগের মধ্যে '৬০, ৯০, ১২০, বা ১৮০ অংশ ব্যবধান থাকে অথবা কয়েকটী গ্রহ একত্রেও অবস্থান করে; এবং পূর্ব্ববর্ত্তি গ্রহণ পরিবেশ কালে অথবা পূর্ণিমা বা অমবস্থায় গ্রহদিগের বিশেষতঃ রবি ও চন্দ্রের—অবস্থিতি স্থান হইতে উক্তরূপ ব্যবধান দৃষ্ট হয়।

৩। যৎকালে গ্রহগণ বিশেষতঃ ইন্দ্রগ্রহ (uranns) শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল, বৃষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তৎকালে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৪। বৃহস্পতি যৎকালে শুক্র বা বুধ হইতে ১৮০ অংশ ব্যবধানে, একত্রে অথবা সমান্তরল ভাবে—বিশেষতঃ বৃষ বা বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান কালে—থাকিলে, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৫। যৎকালে বহুগ্রহ রবিকাষ্ঠা প্রদেশে (Tropics) বা নিরক্ষবৃত্তে অবস্থান করে, তৎকালে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৬। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায়, বৃহস্পতি বা শনি যে স্থানের শম্যোত্তর রেখা (Meridion) বা অধঃস্বস্তিকে (Nadir) অবস্থান করে সেই স্থানেই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুগণ ঘটনা অতিবাহিত হইবার পর বিজ্ঞ হইয়া থাকেন। কিন্তু, উপরোক্ত নিয়মাবলীর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে যে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ গণনার ন্যায়, ভূমিকম্পও নির্ণয় করা যায়। এজন্য উক্ত নিয়মের সত্যতা অবগতির জন্য দেখান যাইতেছে যে বিগত ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লাহোরের ভীষণ ভূমিকম্পের সহিত জ্যোতিষ নির্ণীত গ্রহগণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

৪ঠা এপ্রিলের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয়। লাহোরে রাত্রি ১১টা ৪৯ মিনিটের সময় গ্রহণ আরম্ভ হয়। উক্ত সময়ে শায়ন বৃশ্চিকরাশির ১৭ অংশ ৫৩ কলা উদিত হইতেছিল, সুতরাং লগ্ন হইতে চতুর্থ গৃহের আরম্ভ স্থান অর্থাৎ অধঃস্বস্তিক কুম্ভরাশির ২৪ অংশ ৩ কলা, এবং শনিও উক্ত সময়ে কুম্ভরাশির ২৪ অংশ ১৯ কলায় অবস্থান করিতেছিল। উপরোক্ত ষষ্ঠ নিয়ম হইতে উক্তস্থানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক উক্ত সময়ে গ্রহগণ কিরূপে অবস্থান করিতেছিল নিম্নে গ্রহগণের রাশ্যাংশাদি প্রদত্ত হইল।

রবি রাশ্যাদি ১১।০।২৮
চন্দ্র রাশ্যাদি ৫।০।২৮
মঙ্গল রাশ্যাদি ৭।১৬।৯
বুধ রাশ্যাদি ১০।১৫।৩২
বৃহস্পতি রাশ্যাদি ০।২৬।৫১
শুক্র রাশ্যাদি ০।১৬।১৯
শনি রাশ্যাদি ১০।২৪।১৯
ইন্দ্র রাশ্যাদি ৯।৩।১৬

উক্ত সময়ে মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে এবং বুধ তথা হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত। তৃতীয় নিয়মানুসারে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। এক্ষণে কবে উক্ত ঘটনা সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

প্রথম নিয়মে কথিত হইয়াছে যে গ্রহণের অল্পকাল পরে ভূমিকম্প হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় নিয়মানুসারে উক্ত গ্রহ সংস্থান হইতে কবে গ্রহ

সকলের মধ্যে ৬০, ৯০ অংশ প্রভৃতি ব্যবধান হইবে দেখা যাউক।

উক্ত গ্রহণের পরবর্ত্তী ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মঙ্গল গ্রহ বৃশ্চিক রাশির ২৫ অংশে বক্রী হইবে এবং গ্রহণ কালের শনির অবস্থিতি স্থান হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে আগমন করিবে, সুতরাং তৃতীয় নিয়মানুসারে উক্ত দিবসই ভূমিকম্পের বিশেষ সম্ভাবনা।

বিগত ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে ৬টা ১০ মিনিটের সময় লাহোরে বাস্তবিকই ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছিল, ভারতে এ প্রকার ভীষণ ভূমিকম্প কখনও হয় নাই।

উক্ত সময়ে সায়ন মেষরাশির ২০ অংশ ৪৭ কলা উদিত হইতেছিল। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বৃষরাশিতে ও মঙ্গল শনি হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে বৃশ্চিক রাশিতে ও লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে (মারক স্থানে) অবস্থিতি করিতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মানুসারে ভূমিকম্পের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সংঘটন গুলির মধ্যে উপরোক্তরূপ সংঘটন আকস্মিক অভ্রান্ত লক্ষণ।

উপরোক্ত ঘটনার ন্যায় অন্য সমস্ত ভূমিকম্পও উক্ত নিয়মাবলীর সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

কি কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে ডাক্তার প্রিষ্টলী ও ডাক্তার স্ক্রুয়ী বৈদ্যুতিক আকর্ষণে ভূমিকম্পহয় বলেন। তাঁহাদের মতই আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ, যদি গ্রহদিগের আকর্ষণে ভূমিকম্প সূচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণই ইহার প্রকৃত কারণ হইবে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এ বিষয় মীমাংসিত হইবে। যাহা হউক, গ্রহগণের যেরূপ সংঘটন বশতঃ এতাদৃশশোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা সকলের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে, তাহা সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তার অভি-প্রেত,—সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

"কত চতুরানন, মরি মরি,
যায়ত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমায়ত,
সাগর-লহরী-সমানা।"

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিশাস্ত্রী, F. C. S.
২১।১।১, নবাদ্রী ও প্রাগবের লেন, কলিকাতা।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন—তাই কেন বলনা "যাহা হয় হউক তুমি আমার কথামত যুদ্ধ কর ?"

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি যে পণ্ডিত সাজ তাই বলি। তুমি ভক্ত হইলে ও সময়ে সময়ে জ্ঞানী হইতে চাও। যখন ভক্ত থাক তখন তুমি আমার; কাজেই তোমার কিছুই নাই, আমি যাহা বলিব তাহাই তোমার কার্য্য। ভক্তের কোন বিচার থাকে না। প্রিয় বস্তুর অস্তিত্বেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব। সে যাহাই বলুক ভক্ত তাহাতে দ্বিরুক্তি করে না। দ্বিরুক্তি তাহার আসে না। ভক্তের অহং নাই। তাহার অহংকেই ভক্ত অহং করিয়া কার্য্য করে। তুমি এইরূপ থাকিলে এতক্ষণ আমার এ সমস্ত কথা বলিতে হইত না। কিন্তু তুমি একটু জ্ঞানী সাজিয়াছ এজন্য একটু অবিশ্বাস সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে আসিয়াছে আমি

তোমার সমস্ত কথা বুঝিতেছি না এইরূপ তুমি ধারণা করিতেছ তাই তুমি তোমার হৃদয়ের সংশয় গুলি বলিতেছ। সংশয়গুলি কিছুই নয় কেবল তুমি আমা হইতে পৃথক হইয়াছ, কাজেই তোমার ভাব আমি বুঝিতে পারি না এইমাত্র ভাবিতেছ। জ্ঞানী হইতে চাও আমি তোমায় জ্ঞানী করিতেছি। জ্ঞানে "তুমিই আমি।" আমরা অভেদ। কাজেই তোমার কথা স্বতন্ত্র আমার কথা স্বতন্ত্র এরূপ নহে তখন দুই নাই এক। এখানে দেহ আছে, কিন্তু দেহ জড় তুমি আমি এক চৈতন্য দুই দেহে এক সঙ্গে এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। যেমন দুই বটে, এক আকাশ অখণ্ড অথচ পূর্ণভাবে থাকে সেইরূপ। তবেই দেখ আমাকে কিছুই বলিতে হয় না আমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তৎক্ষণাৎ তোমার আমার উভয়ের শরীর দ্বারা তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত হয়। তবেই দেখ জ্ঞানী ও ভক্ত একই। জ্ঞানী সাজিলেই পাপ পুণ্য। আমার ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছা হইল না তখন তুমি আমি স্বতন্ত্র। তোমাকে যে উপদেশ দিতেছি তোমায় আমায় এক হইব বলিয়া। ভক্তের সন্মুখে তাহার আরাধ্য বস্তু থাকা চাই প্রিয় বস্তুর কথা কওয়া চাই সে জড়বৎ, যাহা বলা যায় তাহাই করিয়া চলে তাহাতেই তাহার আনন্দ আর জ্ঞানীর কোন আকারের আবশ্যক নাই; কোনরূপের আবশ্যকতা নাই জ্ঞান মার্গে পতনের ভয় বেশী। ভয়ঙ্কর তাহা নাই। সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রিয়বস্তু রহিয়াছে সে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। তোমাকে জ্ঞান যোগ দিয়া ভক্ত করিয়া লইতেছি পরে যাহাই বলিব তুমি তাহাই করিবে, পাপ পুণ্য কিছুই বিচার আসিবে না। তুমি আমার বড়ই প্রিয় সকলেই প্রিয়। কখন আমি সম্মুখে থাকিয়া আজ্ঞা করি; দেখিতে পাও না পাও স্বধর্ম্ম পালন কর ইহাই তোমার কার্য্য ইহাতে পাপপুণ্য আমার। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহা বলি তাহাই তাহার কার্য্য। দেখ অর্জ্জুন শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই লোকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে এরূপ ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে বলা বৃথা। এজন্য আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহার উপস্থিত শোক দূর করিতে হয়। যখন ধারণা হয় দেহ জড় ইহার জন্য শোক মোহ অনুভব নাই আর আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহাতেও শোক মোহ স্পর্শ করে না, তবে কে কাহার জন্য দুঃখ করে? যখন উপস্থিত শোকের লাঘব হয় নাই সময়ে স্বধর্ম্ম পালন না করিলে কিরূপে অনিষ্ট হয় ও পরমার্থ নষ্ট হয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হয়। এইরূপে চিত্তমল দূর করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মের উপদেশ হয়। আপনি কর্ম্ম করি ও করিতে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা জন্মিলে পুনর্ব্বার তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হয়। অর্জ্জুন! আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব বিচার ও লৌকিক স্বধর্ম্ম বিচার দ্বারা কর্ম্ম করিবার পথে আনিতেছি শোন। যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইবে ও পরে আত্মদর্শন লাভ করিতে পারিবে। তখন কর্ম্ম তোমার পক্ষে অনাবশ্যক হইলে ও কেবল জগতের হিতের জন্য আমি যে ভাবে কর্ম্ম করিতেছি তুমি ও সেই ভাবে কর্ম্ম করিবে অথচ কোন প্রকার কর্ম্ম বন্ধন বা সংসার হইবে না।

অর্জ্জুন—সাংখ্য কি?

ভগবান—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত আছে বলিয়া উপনিষদকে সাংখ্য বলে। ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের নাম সাংখ্য জ্ঞান। পরবর্ত্তী শ্লোকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছি।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

ভগবান—কামনা অর্থ পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগের ইচ্ছা। যেখানে ভোগেচ্ছা নাই অথচ কর্ম্ম করিতেছ, কেবল আমার আদেশ প্রতি-পালনার্থ আমার প্রীতির জন্য সেখানে কর্ম্ম নিষ্কাম।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম যোগের বিঘ্ন ঘটিলেও নিষ্ফলতা নাই কেন ?

ভগবান—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে কৃষি-কর্ম্মফলের বিঘ্ন ঘটে কিন্তু আমার আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিতেছ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই তুমি শুধু কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ আমি ফলদাতা এই নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কিরূপে ? যতটুকু হইবে ততটুকু আমি তোমার হইব। আমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করাই আমার আরাধনা। কর্ম্ম করিয়াছ তুমি আমার নিকট পুরস্কার চাহিতেছ না। আমার আদেশ মত কর্ম্ম করাতেই তোমার প্রীতি। ফল আমার হাতে এজন্য আমাকে অর্পিত কর্ম্মকে অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশ মত কর্ম্ম বা শাস্ত্র বিহিত আমার উপদিষ্ট কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এ কর্ম্মে কোন বিঘ্ন নাই।

অর্জ্জুন—সুচারুরূপে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে এ কর্ম্ম করিতে না পারিলেও পাপ হয় না কেন ? সংসার ভয়ই বা যায় কিরূপে ?

ভগবান—যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মে অঙ্গহীন হইলে ঠিক ফল লাভ ত হয় না বরং যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর অমঙ্গল সাধিত হয়। এই সমস্ত বিঘ্নের মূল কারণ ফলানুসন্ধান রাহিত্য। কিন্তু ফলানুসন্ধান রাহিত্যই নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব। তুমি যেরূপ ভাবেই এই কর্ম্ম কর না কেন আমি বুঝিতেছি আমার আদেশ মত এই কর্ম্ম করিতেছ। আমার আদেশ মত এই কর্ম্ম করিতেছ। আমার আরাধনার্থ আমার সন্তোষার্থ তোমার এই নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেছে। তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ এজন্য তোমার মনে আনন্দ থাকিবেই। আনন্দ আত্মার স্বরূপ তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই। আমাকে বিস্মৃত হইলেই দুঃখ। বিশেষ আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিতে যখন তোমার বিরক্তি বোধ হয় তখন আমার উপর তোমার প্রীতি নাই নিশ্চয়ই। আমার উপর অনুরাগ রহিয়াছে এজন্য আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিয়া তোমার পাপ হইবে না। যেরূপ করিয়া কর্ম্ম কর না কেন যতটুকু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে পারিয়াছ তাহাতেই তুমি প্রাণে প্রাণে ধারণা করিয়াছ 'তুমি আমারই'। এই 'আমি তোমারই' ইহাই ভক্তিযোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ একই। এই কর্ম্মে সর্ব্বদাই আমার স্মৃতি থাকে এজন্য ইহাতে সমস্ত পাপ দূর হয়, সংসারে ভয় থাকে না। যে সর্ব্বদা আমার স্মরণ করে তাহার কোন প্রকার ভয় থাকে না।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্মের অল্পমাত্রাও মহৎ সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান—জনম মরণই সংসার ভয়ের লক্ষণ। অমুক সুন্দর সংসার করিতেছে ইহার অর্থ এই যে তাহার অর্থের সংস্থান আছে; অন্নকষ্ট নাই, পরিবার মধ্যে শান্তি আছে। কাহারও রোগ শোক নাই বেশ সংসার। সংস্থান করি কেন ? যদি অন্ন না থাকে খাইতে পাইব না। পুত্র কন্যাদি না খাইতে পারিয়া মরিবে। উহাদিগকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করা চাই। অর্থ সঞ্চয় সুখ আছে অর্থাৎ অর্থ দ্বারা রোগাদি নিবারণ হইবে, ভালরূপে আহার নিদ্রা চলিবে, মন কোন কিছুর অভাবে অসুস্থ হইবে না। অন্য লোককেও

সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব। যেদিকে দেখ মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষার জন্য সংসার। ভাল খাইতে পাইতেছি না মরিয়া যাইব। ভাল নিদ্রা হয় নাই অসুখ হইবে মরিয়া যাইব। পরিবার মধ্যে অশান্তি জীবন ক্ষয় হইতেছে, সর্ব্বত্রই এই ভয় হইতে রক্ষার চেষ্টা জীব করিয়া থাকে। কিন্তু লোক জীবন ধরিয়া সংসার করে মৃত্যু ভয় যায় কি? অর্থ স্ত্রী পুত্রাদির বস্ত্র, অলঙ্কার, পুরুষানুক্রমে সুখে থাকিবার জন্য সংস্থান করিতেছে, মৃত্যুভয় নিবারণ হয় কি? হইতে পারে না। সংসার বা মৃত্যুভয় নিবারণের একমাত্র উপায় আমাকে স্মরণ করা। সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ। যে আমার স্মরণ করে তাহার চিত্ত আমার আকারে আকারিত হইয়া যায় এবং আমার মত সেও আনন্দে থাকে। আমাতে দৃঢ় ভাবনা বা দৃঢ় স্মরণ থাকিলেই তাহার প্রাণে সর্ব্বদা আনন্দ থাকে। যেখানে দৃঢ় আনন্দ সেখানে ভয় কোথায়? সন্তান জননীর নিকট থাকিলে কোন সঙ্গীকে ভয় করে না। রক্ষাকর্ত্তার নিকট ভয় কিরূপে থাকিবে? ভক্ত ভগবানের কাছে থাকিলে মৃত্যুকে ডরায় না। সে সর্ব্বদাই দেখে আমার ভগবান আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। মৃত্যুকে সে এই রক্ত মাংসময় এই নিতান্ত মলিন দেহ দিয়া আতিবাহিক দেহে নিত্যপ্রিয় বস্তুর সঙ্গ করে। মৃত্যুতে তাহার কতই সুখ কারণ স্থূল দেহ থাকে বলিয়া সে নিত্যপ্রিয় সঙ্গ করিতে পায় না। জ্ঞানীও মৃত্যু দেখিয়া হাস্য করে। সেই এই একি রহস্য তোমার! এই রূপে দেখ আমার আদেশে কর্ম্মকর আমার স্মৃতি রহিত আনন্দে রহিয়া তুমি আমাতেই রহিয়া গেলে। গোশৃঙ্গে একটী সর্ষপ যতক্ষণ থাকে ততটুকু সময় থাক, মহৎ সংসার ভয় তোমার ঘুচিয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি সকাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটে কিন্তু তুমি যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিতেছ ইহাতে তোমাকে বান্ধা যায় অন্য সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া যায়।

ভগবান—আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটে কিন্তু তুমি কিছুতেই দায়ী হইলে না। ফলাফল জন্য তোমার আসক্তি রহিল না আমার প্রীতিই তোমার লক্ষ্য কাজেই অতিশয় উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইলে। আবার নিজে কর্ত্তা অভিমানে কার্য্য করিলে তোমার বন্ধন ঘটিল।

অর্জ্জুন—তোমার অবতার গ্রহণের সময় তোমার মুখে শুনিয়া কার্য্য করিলাম কিন্তু যখন তোমার অবতার না হয় তখন কাহার প্রীতির জন্য মনুষ্য কর্ম্ম করিবে? কিরূপেই বা উহাদের কর্ম্মে উৎসাহ থাকিবে?

ভগবান:—আমি মাত্র ব্যাপী আমার উপদেশই শাস্ত্র বাক্য, এবং আমিই গুরুরূপী। গুরুকে ভাল না বাসিলে কখন শাস্ত্র বাক্যমত কার্য্য করিয়াও চলিতে পারিবে না। এইজন্য গুরুকে ভাল বলিয়া গুরু, শাস্ত্র এবং মন্ত্র এক করিয়া কার্য্য কর। তোমার সংসারে ভয় দূর হইবে। যতক্ষণে গুরুতে অনুরাগ না জন্মে ততদিন সমস্ত শুষ্কবোধ হইবে। গুরুতে অনুরাগ জন্মিলে তাঁহার আদেশমত কার্য্যে অনুৎসাহ হইবে না। তখন নিজের অনুভব, গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য এক হইয়া তুমি সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করিবে। আমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি। আমাকে দৃঢ় ভাবনা কর। আমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি সর্ব্বদা তোমার বক্ষে নৃত্য করিবে সংসারে

সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়া সর্ব্বদা আমার সহিত খেলা করিতে করিতে তোমার জীবন উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। তোমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। সেইজন্য বলিতেছি সংসার পার হইতে হইলে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আবশ্যক।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

হত্যা রহস্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রহস্য।

মোহনলাল উপবেশন করিলে হেমচন্দ্র কহিলেন, "মহাশয় হত্যারাত্রে কি অমর আপনার সহিত ছিল ?"

মো। এ কথা আপনাকে কে বলিল ?

হে। অমর বলিয়াছে।

মো। হাঁ, অমর আমার সহিত জুয়া খেলিতে গিয়াছিল, পাছে বাবা জানিতে পারেন সেইজন্য আমি তাহাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু ধন্য তাহার বন্ধুত্ব, এত বিপদ সত্ত্বেও যখন সে প্রকাশ করে নাই, তখন সে দেবতা। যদি আবশ্যক হয় আমি এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ দিতে পারি।

হে। তাহাত হইল, কিন্তু খুন করিয়াছে কে ? আর অমরের নিকট টাকা পাওয়া গেল কোথা হইতে ?

মো। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কিন্তু আমার বোধ হয় তারা এ বিষয়ে সমস্তই জানে। চলুন দেখি তাহার কাছে যাই।

পরে হেমচন্দ্র ও মোহনলাল উভয়েই হাওড়ায় তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে তারা কহিল, "মহাশয়, বাটীর সরকার হামিদ যখন তাহাকে এখানে দেখিয়াছে তখন নিশ্চয়ই সে খুন করিয়াছে।"

তারার কথায় হেমচন্দ্রের হামিদের উপর বিলক্ষণ সন্দেহ হইল। তিনি হামিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুন্নার গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথি মধ্যে রহমনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রহমন হেমচন্দ্রকে চিনিত। সে কহিল "মহাশয়, হত্যা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিলে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে কি ? হেমচন্দ্র কহিলেন, "অবশ্য পাওয়া যাইবে। ৫০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।"

র। এ হত্যা হামিদ কর্তৃক হইয়াছে।

হে। প্রমাণ কি ?

র। এই কাগজ গুলি।

এই বলিয়া রহমন হেমচন্দ্রকে কতকগুলি কাগজ দিল। কাগজ গুলি রহমন মুন্নার নিকট হইতে চুরি করিয়াছিল। কাগজগুলি তারার কয়েকখানি পত্র। মুন্না ও তারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া কিরূপে বিষয় হস্তগত করিবে লেখা ছিল। অবশ্য হামিদ এ বিষয় কিছু জানিত না। তাহাকে তারা খুন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল এবং খুন করিলে তাহাকেই বিবাহ করিয়া সমস্ত বিষয় সুখে ভোগ করিবে। এসমস্ত পরামর্শের মূল মুন্না। এই কর্তৃত্ব হামিদ জানিত না। সে জানিত তারা তাহাকে ভাল বাসে, সুতরাং এ বিষয়ে তাহার স্বার্থ আছে দেখিয়া খুন করিয়াছিল। এসমস্ত কথা উক্ত পত্রগুলিতে লেখা ছিল।

কাগজগুলি পাইয়া হেমচন্দ্র বড়ই আনন্দিত হইলেন। এবং দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী লইয়া হামিদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মুন্নার গৃহে হামিদ ধৃত হইল। হত্যা সম্বন্ধে হামিদ কহিল, সে কিছুই জানে না। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বলদেখি, হত্যাবাত্রে অমরকে এখানে দেখিয়াছিলে কি না, নতুবা তুমি যে খুন করিয়াছ তাহা প্রমাণ করিতে বড় বিলম্ব হইবে না। তারাই সাক্ষ্য দিবে তুমি খুন করিয়াছ।"

কথা শুনিয়া ভয়ে হামিদের মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভীত ও কম্পিত স্বরে কহিল, "মহাশয় তারা মানবী নহে পিশাচী; সে পূর্ব্বে আমাকেই হত্যা করিতে অনুরোধ করিত, এবং আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সে সম্ভবতঃ নিজে হত্যা করিয়াছিল, এবং আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্বীকার করাতে আমি অমরকে হত্যারাত্রে দেখিয়াছি বলি এক্ষণে আবার বলে কি না আমি হত্যা করিয়াছি।

হেমচন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "তবে তুমি আমাদের সহিত আইস, এবং তারা হত্যাকারী এই কথা তাহাকে বলিবে চল, নতুবা তোমাকেই হত্যাকারী বলিয়া চালান দিব।"

হামিদ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। যাইবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র একজন পুলিশকর্ম্মচারীকে মুন্নাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মুন্নাও যথা সময়ে থানায় আনীত হইল।

হামিদকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্র হাওড়ায় তারার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, "আর আসিয়া কি করিবেন, আমার লীলা ফুরাইয়াছে। আপনাদের আসিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছি সব প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এখন আর আপনি আমার কিছুই করিতে পারেন না।"

হেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে বলিয়া তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ হত্যা কে করিয়াছে?"

তারা কহিল মহাশয়, বাল্যকালে আমি মুন্না কর্ত্তৃক লালিত হইয়া ছিলাম, এখনও সেই জন্য সে আমার উপর একটু কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। এরূপ পরামর্শ সেই দেয়, কিন্তু হত্যা কার্য্যে সম্মত না হওয়ায়, সেই নিজে হত্যা করিয়াছে। এ হত্যা করিবার স্বার্থ যে আমি তাহার পুত্র হামিদকে বিবাহ করিয়া সমস্ত বিষয়টা ভোগ করিব। অমর এ বিষয়ে নির্দ্দোষী। তাহার নিকট যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহা মুন্নাই লোক দ্বারা তাহার পকেটে রাখাইয়াছিল।

তারা আর কথা কহিতে পারিল না, ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এসময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঔষধাদি প্রয়োগ করাতে তারার সামান্য চৈতন্য হইল, সে কহিল, "মহাশয়" আমায় আর বড় দেরী নাই, অমরকে বলিবেন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন, আর মুন্নাকে বলিবেন, সে যদি হত্যা না করিত তাহা হইলে হয়ত জীবনে একটু সুখ পাইতাম। কিন্তু বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। তারা আর কথা কহিতে পারিল না, ক্রমে চক্ষু নীমিলিত করিল এবং প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। হেমচন্দ্র মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া হামিদকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

যথা সময়ে বিচার হইল। বিচারে অমর সম্মানের সহিত মুক্তি পাইল। হামিদ নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইল এবং মুন্না হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। মুন্নার সমস্ত বিষয় রহমন ও হামিদ প্রাপ্ত হইল। অমরের সহিত অলকার মহাসমারোহের সহিত বিবাহ হইল। হেমচন্দ্রও অমর ও অলকার নিকট হইতে অনেক অর্থাদি উপহার পাইলেন।

শ্রীঃ—

দুঃখ ও নিবৃত্তি।

—ঃ০ঃ—

দুঃখ কাহাকে বলে? যাহা ভাল লাগে না, তাহারই নাম দুঃখ। দুঃখ বলিলে আকাশ পাতাল কিছু বুঝায় না, বুঝায় একরকম "লাগা" অর্থাৎ ভাল না লাগা। একপেট আহারের পর কাশী হইতে আনিত টাটকা মালাই একহাঁড়ি খাইতে পারিতেছ না বলিয়া ভাল লাগিতেছে না, তখন দুঃখ হয়। পূজার সময় আত্মীয় স্বজন তোমাকে ভাল কাপড় না দিলে ভাল লাগে না, তখন দুঃখ হয়। কোন ধনী-আত্মীয় মৃত্যুর সময় তোমাকে তাহার সমস্ত বিষয় উইল না করিলে, ভাল লাগে না, দুঃখ হয়। অফিসের বড় বাবুর তিরস্কার মিষ্ট বোধহইবে কিন্তু বন্ধুর হিতোপদেশ ভাল লাগিবে না, তখন দুঃখ হইবে। বুঝা গেল যে, ভাল না লাগাই দুঃখ। দর্শনকার বলিতেছেন যে, এমন যে ভাল না লাগা, তাহার নিবৃত্তিই মুক্তি। কথাটা কি ঠিক?

আচ্ছা, দেখা যাক্। বুঝিলাম, দুঃখ একটা কিম্ভুত-কিমাকার বস্তু নহে। এমন কি দুঃখ কোন বস্তুতে নাই। তবে দুঃখটা কোথায়? দুঃখ বাহিরে নাই, আছে কেবল নিজের চিত্তে। যদি দুঃখ কোন বস্তুতে থাকিত, তাহা হইলে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইলেই দুঃখ আসিত; কিন্তু তাহাত হয় না। যে বস্তু একজনের দুঃখপ্রদ সেই অন্যজনের সুখপ্রদ। ক্ষুধাতুরের পক্ষে একমুষ্টি অন্ন অতি সুখপ্রদ আর একপেট আহারের পর একটামাত্রও এস্প্রেসগজা ভাল লাগে না। কেহ হয়ত একটী কন্যারত্নের জন্য হাহাকার করিতেছে আবার কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভাবিতেছে তাহার একটীও সন্তান না হইলেই ভাল ছিল। বুঝা গেল যে, দুঃখ আর কিছুই নহে, ঐ যে ভাল না লাগা, ঐ টুকুই দুঃখ। আর দুঃখ দূর হইলেই দুঃখ হইতে মুক্তি বা সুখ।

দুঃখ কত রকমে হয়? প্রথমতঃ, শরীরে রোগ হইলে ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা শারীরিক দুঃখ। দ্বিতীয়, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মানসিক উদ্বেগ হইলেও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা মানসিক দুঃখ। তৃতীয়, শত্রু, অন্য মানুষ, পশু প্রভৃতি হইতে যে অনিষ্ট হয় তাহাও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ এইদুঃখ ভূতপদার্থের দ্বারা সংঘটিত হয়। চতুর্থ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, ঝড় প্রভৃতি দৈব বিপদও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা আধিদৈবিক দুঃখ। আর অন্য কোন রকম দুঃখআছে কি? আরকোন রকম আছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

এখন দেখা যাউক, এসব দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না। কারণ, দুঃখ

দূর হইলে সুখ এবং এই সুখই মুক্তি। শাস্ত্রকার কিন্তু বলেন, "বিবেকজ্ঞানই মুক্তির উপায়।" বিবেক জ্ঞানটা কি? যখন জানিব জগতে সমস্ত মিথ্যা, জগতে সুখ বলিয়া প্রকৃত কিছু নাই, যাহা আছে তাহাও দুঃখের প্রকার ভেদ। যতক্ষণ না মনে হইবে জগতে আমি বা আমার কিছু নাই—সমস্তই মিথ্যা, ততক্ষণ দুঃখ, আবার উহা মনে হইলেই বিবেক অর্থাৎ জগতের কার্য্য ও বুদ্ধি হইতে আত্মার পার্থক্য জ্ঞান হইবে এবং তাহাই মুক্তির উপায়। এইরূপ জ্ঞান বড় সহজে হয় না, অনেক জন্মে, অনেক যত্নে, বিবেকজ্ঞান হয়। ভগবান্ই বলিয়াছেন, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

বিবেকজ্ঞান দ্বারা বাস্তবিক দুঃখ দূর হয় কিনা তাহা পরে দেখা যাইবে এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সকল সহজে দূর করা যায় কি না। প্রবাদ আছে, "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ, ইষ্ট সার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" অর্থাৎ যদি আকন্দবৃক্ষে মধু পাওয়া যায়, তবে পর্ব্বতে যাইবার প্রয়োজন কি? অভিলষিত প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকেন?

পূর্ব্বোক্ত দুঃখসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যত্ন করিলে শরীর দুঃখের, যাহাতে মনের সন্তুষ্টি লাভ হয় এরূপ কার্য্যাদির দ্বারা মানসদুঃখের, শত্রু ও পশ্বাদি প্রভৃতি হইতে নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক এবং সুদৃঢ়, ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত স্থানে বাস দ্বারা ঝড়, ভূমিকম্প বজ্রাঘাত প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। যদি এরূপ উপায়ে দুঃখ দূর হয় তবে কষ্ট স্বীকারের আবশ্যক কি?

কথাটা বড় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে বড় বেশী সময় লাগে না। দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নানা প্রকারে সাবধান হইয়াও দুঃখ দূর হয় নাই, কতক পরিমাণে হয়ত দুঃখ দূর হইয়া থাকিবে কিন্তু সেই দুঃখের পুনরায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহা যদি হইত তবে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর ইংলণ্ডেশ্বরের বা সমস্ত রুষিয়ার একমাত্র অধীশ্বর জারের কোন দুঃখ থাকিত না। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রকার বলেন যে, বিবেক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উৎপাটিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দুঃখের সমুচ্ছেদ সাধন হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কার মত আর দুঃখের পুনরায় আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে তাহা হইতে ফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দেখা যাউক, কথাটা সত্য কি না।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা ভাল। যদিও সংসারে বিচিত্র সুখভোগ করেন, এমন প্রাণীর অভাব নাই, তথাপি জরা ও মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ দুঃখ স্বরূপ ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কেন না, জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। কিন্তু সুখের জন্য বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। তথাপি সাংসারিক সুখও দুঃখযুক্ত, দুঃখ হীন নহে। মাথার উপর তীক্ষ্ণধার অসি অতি সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে—কখন ছিঁড়িয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; এই অসির নিম্নে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করার মত, এই সংসারের সুখ। সুতরাং সংসার

দুঃখপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া সংসারে কি আদৌ সুখ নাই? উক্ত উপমায় বেশ বুঝা যাইবে যে সংসারে সুখ আছে, কিন্তু দুঃখের তুলনায় তাহা নাই বলিলেও চলে। দুঃখরাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

সকলেই জানেন, কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যের সহিত কারণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। শাস্ত্রকার বলেন, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু যে বৃক্ষের বীজ তাহা হইতে সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হয়। কাঁঠালগাছে আম ফলে না, আম গাছেও কাঁঠাল হয় না। বীজ বিকৃত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়। অতএব কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে, ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সংসার সুখ, দুঃখ ও বিষাদে পূর্ণ। এবং সংসারের সমস্ত বস্তুই সুখ, দুঃখ ও বিষাদের হেতু হয় বলিয়া উহা সুখ-দুঃখ-বিষাদাত্মক রূপে নিশ্চিত হয়। জগৎ সুখ-দুঃখ ও বিষাদাত্মক বলিয়া উহার কারণও সুখ-দুঃখ-বিষাদাত্মক হইবে। কিন্তু এই সমস্তই পরাপেক্ষী অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে সুখ, দুঃখ ও বিষাদ, যে যেরূপ ভাবে অনুভব করে সেই বস্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ হয়। সুতরাং সেই পর ব্যক্তিই পুরুষ বা আত্মা। ইহা হইতে আরও স্থির হইল যে আত্মা নিজে সুখ, দুঃখ বা বিষাদ নহে, কারণ আত্মা বা পুরুষ এই সুখ-দুঃখ-বিষাদের উপভোগ বা অনুভব করে।

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ব্ব শরীরে এক আত্মা নহে। সমস্ত শরীরে এক আত্মা হইলে, একের জন্মে সকলের জন্ম ও একের মরণে সকলের মরণ হইত, অথবা তোমার অর্থপ্রাপ্তি হইলে আমার অর্থপ্রাপ্তি বা তোমার শত্রুর আহ্লাদে তোমারও আহ্লাদ হইত। শাস্ত্রকার বলেন, এক এক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব্ব গৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মানুসারে শরীরের উৎপত্তি হইলেই সংসারে আসিতে হয় এবং তাহা হইলেই দুঃখের আর শেষ থাকে না।

কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় কিরূপে? শাস্ত্রকার বলেন, "আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব ও নাই, এইরূপ বিবেক বিষয়ে অভ্যাস করিলে, বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং বিবেক জ্ঞান-বাসনা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করে।" যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমতি প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকিলেও যাহার বিবেক খ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না। হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, এবং তাহা হইলে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না।

কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম প্রভাবে অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর

কিছুকাল অবস্থিত থাকে। ভগবান্ই বলিয়াছেন, "যা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের পরে জ্ঞানীর দেহ-পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজ-ভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধ-বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন অবশ্যম্ভাবী ও অবিনাশী দুঃখ নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রকার কথিত দুঃখ নিবৃত্তিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্ও বলিতেছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

শ্রীধরণীধর শাস্ত্রী।

কালা-জ্বর।

—:০:—

কয়েক বৎসরাবধি ইহা আসামে দৃষ্ট হইয়াছে মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই পীড়ায়—সবিরাম বা স্বল্পবিরাম ভাবের জরের ব্যবস্থায় পাল্টাইয়া পড়া, রক্তাল্পতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি, শরীরের দিন দিন জীর্ণতা, লোম শরীরের বর্ণের অপেক্ষাকৃত কাল হওয়া এবং শেষে জ্বরের বৃদ্ধি উদরাময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বা ফুস্ফুস্থ পীড়া হইয়া মৃত্যু।

বাটীর কাহারও এ পীড়া হইলে ক্রমশঃ জ্বর সকলের বার বার হইয়া থাকে; এইরূপে ইহা নিজবাটীতে পরে পল্লীতে পরে সমুদয় গ্রাম বিস্তৃত হয়।

সচরাচর পীড়া ৫।৭ মাস স্থায়ী এই কালের মধ্যে রোগীর প্রায়ই মৃত্যু হয়—শীতকাল অপেক্ষা ইহা গ্রীষ্মকালে অধিক প্রবল।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে আক্রান্ত হইয়া ১০ বৎসরের নিম্নে শতকরা ২৫টী আক্রান্ত ১০—২০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৪টী; ২০—৩০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৩৩ টী।

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে দরিদ্র লোকেদের মধ্যে এ পীড়া দৃষ্ট হয়—এমন কি ইয়ুরোপিয়ানদিগের এ পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। অহিফেন সেবীদিগের এ পীড়া ভোগ অল্প।

এ পীড়া কোন স্থানে উদ্ভূত হইলে ৬ বৎসরের অধিক তথায় থাকে না। কিয়ৎ পরিমাণে এ পীড়া সংক্রামক যে স্থানে ইহা বর্ত্তমান, তথায় সকল লোকেরই প্রায় আক্রমণ হয়; যে স্থানে পুনর্ব্বার বসতি হইলে, তাহাদিগেরও আক্রমন হয়; এসকল ব্যক্তিদিগের—সহিত কোন প্রকার সংস্রব না হইলে অন্যলোকের আক্রান্তি হয় না। অনাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রথম হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, পীড়িত হইবার সম্ভাবনা অল্প।

এই পীড়ার জরের কোন নিয়মিত গতি নাই। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম—সকল প্রকার জ্বরই ইহাতে দেখা যায়—শেষোক্ত প্রকারের জ্বর প্রথম আক্রমণ হইলেই ১০৫ পর্য্যন্ত তাপ হইতে দেখা যায়—যে ভাবেই জর দৃষ্ট হউক না কেন, বারম্বার পালটাইয়া পড়ে এ পীড়ার একটী জ্ঞাপক লক্ষণ। প্রথমবারের ১।২ সপ্তাহ থাকিয়া ছাড়িয়া যায়; ১-৪ সপ্তাহ পর আবার জ্বর উদ্রিক্ত হয়। ১।২ বা পালটাইয়া পড়ার পর জ্বর হইলে রোগী

তাহা বুঝিতে পারে না, এমন কি যথাকালে জরগায় কার্য্য করিতেছে চিকিৎসক দেখিয়া ১০২'৩' জর কহিয়াছেন।

প্রথম জরোদ্রেক সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জর অধিক দিন থাকে; সবিরাম জরকেও এককালীন ২ মাস ধরিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

যকৃত প্লীহার শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। রক্তাল্পতা আসিয়া পড়ে; এক তৃতীয়াংশ রোগীতে চক্ষুর যোজকত্ব সাদা হয়—অবশিষ্ট পীতবর্ণের হয়। বিশেষতঃ যকৃতের অধিক বিবৃদ্ধি থাকিবে। রক্তাল্পতা জরের পরিমাণ অনুসারে স্বল্পজরে স্বল্প-রক্তাল্পতা।

মুখ গহ্বরে ও জিহ্বারস্থানে কালাচে বর্ণের হয় —চর্ম্মের বর্ণও অপেক্ষাকৃত কাল হয়।

শোথ দৃষ্ট হয়; গুল্ফ বেড়িয়া ও চরণের কিঞ্চিৎ স্ফীতি দৃষ্ট হয়। পীড়ার শেষাবস্থায় সদাস শোথ দৃষ্ট হয়। অর্দ্ধেক রোগীর কোন প্রকার শোথ দৃষ্ট হয় না।

হৃৎপিণ্ডেই দুর্ব্বল প্রতিঘাত, কিন্তু রক্তাল্পতা জনিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা এবং তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল ক্রিয়া হেতু রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত এবং নিম্নাঙ্গের শোথ।

স্নায়ুমণ্ডলের বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, অনেক রোগী রাত্রিতে দেখিতে পায় না। জর কালীন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শীতকালে অনেক রোগীর ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ হইয়া মৃত্যু। দুই তৃতীয়াংশ রোগীতে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় অতি সাধারণ।

পুরুষদের লোপ ও স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের লোপ। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৬ হইতে ১০১২। অতি সামান্য পরিমাণ অণ্ডলাল ও ফস্ফেট প্রস্রাব বর্ত্তমান।

দূরে বিশেষতঃ বেদনা হয়—অনেক সময়ে এই লক্ষণ দৃষ্ট, রোগীর বাত ব্যাধি পীড়া বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

প্লীহা বা যকৃতের পীড়ায় শেষাবস্থায় যেমন মুখ রোগ বা স্থানীয় পবণ দৃষ্ট হয়—ইহাতেও তাহা হয়।

এ পীড়ায় শতকরা ৯৬ টী মৃত্যু সংখ্যা।

আরোগ্যস্থলে, জরের, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধির হ্রাস হইয়া শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্তের সঞ্চার হয়।

এ পীড়া নূতন রোগ নহে। স্থানও জলবায়ুর দোষে কঠিন প্রকারের ম্যালেরিয়া প্রশ্নতায় এই প্রকার ভাব ধারণ করে।

চিকিৎসা—সাধারণ জর ও ম্যালেরিয়া যে চিকিৎসা, ইহা তাহাই। কাম্ফেরিয়া, সন্দয়া, সিলিকা আর্সেনিক, নেট্রম মিয়ুরিয়টিকম্—এবং উহাদিগের সংযুক্ত ঔষধ অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হইবে। ইহা ব্যতীত এপিস্, বেলিডোনিয়ম্, ইউপেটোরিয়ম্, প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার হয়।

ডাক্তার জে, মৈত্র।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

পোঃ সিমলা,

কলিকাতা।

রমানাথ।

—:০:—

রমানাথ, ওরফে বুড়ো বক্কেশ্বরের বাস এক পল্লীগ্রামে। রমানাথ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার মা ও স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না।

রমানাথের পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যজমান ক্রিয়ায় তাঁহার রোজগার মন্দ ছিল না। তিনি গুছাইয়া সংসার করিতে জানিতেন, সুতরাং মরিবার সময় স্ত্রীর হাতে বেশ দুই পয়সা রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের মধ্যে পুত্রের অপোগণ্ড অবস্থায়ই তাঁহাকে ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রমানাথের মা খুব বুদ্ধিমতীছিলেন না, তবে ভোলাথোলা গোছের ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু শোক সত্বর সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিগণ, আত্মীয় স্বজন তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকলে সমান ছিলেন না। কেহ কেহ বা প্রকৃতই দুঃখে দুঃখী ছিলেন। কেহ কেহ বা অবসর বুঝিয়া বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া টাকা কড়ি গুলি হাতাইবার চেষ্টায় ছিলেন। বাহিরে মায়ার কান্না কাঁদিয়া বড়ই আপনার বলিয়া জানাইতেন। বিধবাকে ফাঁকি দেওয়াই জগৎ সংসারের নিয়ম।

যাহা হউক শোক দুঃখ মানুষের চিরকাল থাকে না। ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। রমানাথই তাঁহার মায়ের সর্ব্বস্ব ধন। রমানাথের মা মনে মনে ভাবিলেন, কর্ত্তা যা টাকা কড়ি রাখিয়াগিয়াছেন, গুছাইয়া চলিতে পারিলে আমার রমানাথের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দুঃখ হইবে না। তবে একজন মাথার উপর লোক চাই। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি রমানাথের লেখাপড়া শিক্ষার দিকটা একেবারেই দেখিলেন না। কিন্তু গুরুদশার বৎসর অতীত হইলে পর রমানাথের বিবাহ দিলেন।

মানুষ ভাবে এক হয় আর; ইহাই সংসারে দেখিতে পাই। এ সংসারে কে কার অভিভাবক? রমানাথের পিতাও একদিন তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভিভাবক ছিলেন কিন্তু তিনি এখন কোথায়? এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। রমানাথের বিবাহের এক বৎসর পরে রমানাথের শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইল। রমানাথের শ্বশুর বাড়ী সমূলে নির্ম্মূল হইল। থাকিলেন কেবল শাশুড়ীঠাকুরাণী নিরুপায়া, নিরাশ্রয়া। তিনি এখন রমানাথের গলগ্রহ হইলেন। সংসারের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! আজ যেখানে হাসির ছটা, কাল সেখানে কান্নার ঘটা! হাসি, কান্না লইয়াই সংসার।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল রমানাথ এখন বেশ বড় হইয়াছেন। সুদীর্ঘ গুম্ফ মুখে শোভা পাইতেছে। তিনি এখন সংসারে মুরুব্বি। পাড়ার নব্য সম্প্রদায়ের বৈঠকে তিনি যোগ দেন। তর্ক বিতর্ক করেন। সে তর্কের মাথাও নাই মুণ্ডুও নাই, কেবলমাত্র অসার কথার সমষ্টি। যাহা হউক পাড়ার ছেলেরা তাঁহাকে লইয়া হাস্য পরিহাস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন তর্কের অবতারণা করিত। একদিন তর্ক উপস্থিত হইল গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি চারপাওয়ালা জানোয়ারেরা দুধ দেয় কিন্তু দুই পাওয়ালা পাখীর মধ্যে কোন না কোন পাখী নিশ্চয়ই দুধ দেয়। যখন পাড়ার ছেলেরা রমানাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পরস্পর ঘোরতর তর্ক বিতর্ক করিতেছিল তখন রমানাথ বলিয়া

উঠিলেন, "আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে লছমন্ সেখ নামে এক মুসলমান অনেকগুলি পায়রা পুষিয়াছিল তার মধ্যে একটী পায়রা রোজ আড়াইসের করিয়া দুধ দিত।" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলে পর রমানাথ বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমরা হাস্‌ছ যে ও রকম দুই একটী পারাবত দুগ্ধবতী থাকে।" এইরূপভাবে দু পাঁচটী বৈঠকে রমানাথের বক্তৃতার পর পাড়ার ছেলেরা রমানাথকে "বকেশ্বর" উপাধি ভূষণে বিভূষিত করিল। ইহার কিছুদিন পরেই এই উপাধির পূর্ব্বে—বুড়ো এই নূতন উপাধিটা যোগ করিয়া দিল। ক্রমে রমানাথের মায়ের কাণে একথা পোঁছিল। তিনি একদিন পাড়ার ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা রমানাথকে বুড়ো বুড়ো কর কেন? সত্যি উহার মাথার চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু রমানাথ আমার সেদিনকার ছেলে, চুলগুলিতো বয়সে পাকেনি।" তৎপরে গ্রাম্য নাপিতের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই নাপিত বেটা যত বুড়োলোকের চুল ছাটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া আসিবে আর সেই কাচি দিয়া রমানাথের চুল ছাটিবে আর সেই ক্ষুর দিয়া রমানাথের দাড়ি কামাইবে। আমি হাজার বার বারণ করিয়াছি কিন্তু বেটা যে কেমন এক-গুঁয়ে কিছুতেই আমার কথা শুনে না, ইহাতে কি বাপু চুল দাড়ি না পাকিয়া থাকিতে পারে।" রমানাথের মায়ের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা শুনিবার পর হইতে আর পাড়ার ছেলেরা কেহ প্রকাশ্য ভাবে রমানাথকে 'বুড়ো বকেশ্বর' বলিত না।

এইরূপ আমোদ প্রমোদে ও স্বচ্ছন্দে আরও কিছুকাল রমানাথের সংসার কাটিয়াগেল, সংসারের যে দিন যায় সেই দিন ভাল। কাল কি হইবে কে বলিতে পারে? রমানাথের মা সঞ্চিত টাকার সুদে সংসার চালাইবেন মনে করিয়া অধিকাংশ টাকা সুদে খাটাইতেছিলেন। কিছুকাল লোকে রীতিমত সুদ দিয়াছিল এখন অনেকেই আর সুদ দেয় না। বেগতিক দেখিয়া আসল টাকা চান, তাহাও লোকে আজ কাল করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সংসার বড়ই কষ্টে চলিতে লাগিল। রমানাথের গৃহিনীর এতদিনের পর মুখ ফুটিবার অবসর উপস্থিত হইল। তিনি এক দিবস "রমানাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "বুড়ো মিনসে কেবল বসে বসে খাবে টাকা কড়ি রোজগারের ধান্দা নাই।" এই তিরস্কার শুনিয়া রমানাথের মনে বড়ই ধিকার উপস্থিত হইল, তিনি পরদিন প্রাতে কাপড় চোপড় লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। কোথায় যাইবেন লক্ষ্য নাই। কিয়দ্দূর আসিয়া মনে করিলেন শুনিয়াছি কলিকাতা খুব বড় সহর, সেখানে দেশ বিদেশের লোক টাকা রোজগারের জন্য যায়; সুতরাং আমি কলিকাতাই যাইব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমানাথ কলিকাতায় আসিলেন বটে কিন্তু কলিকাতা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। কি করেন, কোথায় যান, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একজনের বাটীর বহির্ভাগে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামীর হিন্দুস্থানী চাকর প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে যাইতেছিল, বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে দেখিয়া তীক্ষ্ণ গম্ভীরস্বরে বলিল "তোম্ কোন হ্যায়"? রমানাথ কিছুই বুঝিলেন না, উত্তর করিলেন, "বাপু আমি বামুন, বাস কৃষ্ণগঞ্জে।" চাকরও আনকোরা হিন্দুস্থানী। রমানাথের উত্তর বুঝিতে পারিল না, চটিয়া একে

ঘারে আগুন। সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বলিল, "শালা চোট্টা হ্যায়, কোকেন খোর হ্যায়, চুরীকরনেকা মতলব হ্যায়, শালা নিকালো হিঁয়াসে!!" রমানাথ বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিলেন, সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এখানে আর কোন গোলমাল নাই। ক্রমে রজনী ঘোর হইল; রাজপথে লোকজন চলা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। দুই দিনের মধ্যে দুই পয়সার মুড়ি ছাড়া রমানাথের আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সহর জায়গা, পল্লীগ্রাম নহে যে কাহারও বাড়ী গিয়া অতিথী হইবেন। সদর রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন; পরিশেষে পথপ্রান্তে এক ঘোড়ার আস্তাবল দেখিতে পাইয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে দিবস পূর্ণিমা-তিথি ছিল। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন ঘোড়ার আহার্য্যার্থ স্তূপীকৃত তৃণ রহিয়াছে। তিনি সেই তৃণগুলি ঠেস দিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করিল। আস্তাবলের সহিস, কোচোয়ানেরা উচ্চে মঞ্চে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, সুতরাং কেহই আর এ ব্যাপার জানিতে পারিল না। ক্রমে রাত্র শেষ হইয়া আসিল। সহিস কোচয়ানের ঘুম ভাঙ্গিল। রমানাথ তখন গভীর নিদ্রা যাইতেছেন এবং নাসিকার ডাকের চোটে আস্তাবল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সহিসেরা তাঁহার নাকের ডাক শুনিয়া আলো জ্বালিয়া নীচে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন মাতাল মনে করিয়া রমানাথের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া রমানাথের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহার পর তাহারা যে ব্যবহার করিল তাহাতে রমানাথ ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন তারপর সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, পথে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত রমানাথের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রমানাথ নিজের দুঃখ জানাইলেন। বৃদ্ধা রমানাথের দুঃখে দুঃখী হইলেন। রমানাথকে চারিটী পয়সা দিলেন আর বলিলেন, "বাবা" এখানে তোমায় কে সাহায্য করিবে? যাও, এই রাস্তা ধরিয়া যাও, চৌরঙ্গীতে গিয়া পড়িবে সেখানে হামেসা সাহেব বিবিরা বেড়ায় তাদের মন ভাল, তাহাদের কাছে ভিক্ষা করিলে তোমার একটা উপায় হইয়া যাইতে পারে। রমানাথও বৃদ্ধার কথামত কার্য্য করিলেন। বাস্তবিক হ্যাটকোটধারী এক বাঙ্গালী সাহেবের নিকট হইতে সেদিন তিনি চারি আনা রোজগার করিলেন, সে দিন গুজরানের মত হইল। ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল মাথা গুঁজিবার স্থান নাই সম্মুখে গড়ের মাঠ, সেইখানেই রাত্রে আশ্রয় লইলেন। খানিক রাত্রে এক পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত, পাহারাওয়ালা রমানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল তাঁহার এখানে কোন আশ্রয় নাই ভিক্ষা করিয়া দিন কাটান। পাহারাওয়ালা রমানাথকে পাকড়াইয়া থানায় লইয়া গেল, তৎপর দিবস যথারীতি ও যথা সময়ে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে আনীত হইলেন। বিচারে রমানাথের তিন সপ্তাহ কারা-দণ্ড হইল।

এই সহরের এক ধনী পুত্র ঝোঁকে পড়িয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন ঘটনাক্রমে তাঁহারও সেদিন বিচারের দিন ছিল। বিচারে তাঁহারও তিন সপ্তাহ কারাদণ্ড হইল। রাজ-দ্বারে ধনী নির্ধন নাই, সকলের উপর সমান

বিচার। এক ধনী ও এক নির্ধনের পুত্র তিন হপ্তার জন্য আজ জেলে চলিলেন। আজ উভয়েই এক ভাগ্যাধীন। এক ভাগ্যাধীন হইলে বন্ধুত্বও সহজ ঘটে। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দুই জনের একই কর্ম্মক্ষেত্র ধনীপুত্র রমানাথকে সোণার চক্ষে দেখিলেন এবং তিনি তাহার প্রতিপালনের ভার লইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন সপ্তাহ ফুরাইয়া গেল। দুজনের কারামুক্তি হইল। ধনী পুত্র বাড়ী আসিবার সময় রমানাথকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ধনীগৃহে রমানাথের সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যাহাতে রমানাথের বেশ দুপয়সা রোজগার হয় ধনীপুত্র এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন তিনি রমানাথকে বলিলেন "দেখ তোমার মা ও স্ত্রীকে কলিকাতায় আন, আর দেশে ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না।" ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইলে বুদ্ধিরও পরিবর্ত্তন হয়, লোকে বলে এ বোকা, সে বুদ্ধিমান্, কিন্তু কিছুই নহে সবই ভাগ্যাধীন।

রমানাথ ধনী পুত্রের কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন। ধনীগৃহে সকলের বসবাস চলিল। সংসার সময়ের দাস। সময়ের পরিবর্ত্তন হইলে ঘরের পরিবার হইতে বাহিরের লোক পর্য্যন্ত খাতির যত্ন করে। রমানাথের স্ত্রী স্বামীর আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে স্বামীকে দেবতার অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। একদিন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখ আমি না বুঝিয়া তোমায় একদিন তিরস্কার করিয়াছিলাম সে কথা আর এখন মনে স্থান দিও না।" রমানাথ উত্তর করিলেন, দেখ "তোমার সেই তিরস্কারই আমার উন্নতির মূল। তবে তিরস্কারের প্রণালী আছে। স্বামীকে যেভাবে স্ত্রীর বলিবার অধিকার আছে তুমি সেভাবে বল নাই ইহাই তোমার দোষ। কিন্তু তোমায় সে দোষ দিই না। কালেরই দোষ দিই আর হতভাগ্য বঙ্গদেশের অদৃষ্টের দোষ।" এইরূপে ধনীগৃহে সকলের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ক্রমে রমানাথও বেশ দু পয়সা গুছাইয়া লইলেন।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

হেক্টোগ্রাফ।—একখানি লেখা হইতে অনেকগুলি নকল প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি সহজে ও সুন্দররূপে লিথোগ্রাফের মত ছাপা উঠে। প্রথমে ৫ ভাগ জলে ও ৩ ভাগ এমোনিয়া দ্রাবকে ৪ ভাগ উত্তম শ্বেত শিরীষ ভিজাইয়া নরম করিতে হইবে। পরে উহা উত্তাপ দ্বারা গালাইয়া ৩ ভাগ চিনি ও ৮ ভাগ গ্লিসিরিণ মিশাইয়া বেশ করিয়া ঘঁাটিয়া লইবে ও উত্তাপ দ্বারা ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইবে। গরম থাকিতে থাকিতে এই মিশ্রিত দ্রব্যগুলি একটী মোটা ব্রুস দ্বারা একখানি সাদা ব্লটিং কাগজে উত্তমরূপে মাখাইয়া লইবে এবং ২।৩ দিবস শুখাইয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। ইহাতে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উপায় কালী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং লেখা কাগজ হইতে ইহাতে লেখা আনিবার পূর্ব্বে ইহাকে ভিজা স্পঞ্জ দিয়া একবার ভিজাইয়া লইতে হইবে এবং ২।১ মিনিট জল ঝরিয়া পড়িবার জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে।

যে লেখা বা ছবি নকল করিতে হইবে, নিম্নলিখিত উপায়ে কালী প্রস্তুত করিয়া একটী নূতন ষ্টিলপেনে করিয়া তাহা লিখিতে হইবে। সেই লেখা শুকাইয়া গেলে লেখা দিকটী উক্ত ব্লটীং কাগজের উপর রাখিয়া বেশ করিয়া চাপ দিতে হইবে, এবং সেইভাবে ২।৩ মিনিট রাখিয়া আসল কাগজ খানি তুলিয়া লইবে। পরে তাহার উপর এক এক খানি সাদা কাগজ রাখিয়া অল্প অল্প চাপ দিয়া যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি নকল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কায শেষ হইলে পুনরায় স্পঞ্জে করিয়া অল্প জলদ্বারা উক্ত ব্লটিং কাগজ ধৌত করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। কাগজে লিখিবার জন্য কালি প্রস্তুত করিতে হইলে, নিগ্রোসিন ব্লাক ১ ভাগ, জল ১৪ ভাগ, গ্লিসিরীণ ৪ ভাগ একত্রে মিশাইতে হইবে।

অদৃশ্যকালী।—আইওডাইড অব্ ষ্টার্চ জলে গুলিয়া কালীকরিয়া তদ্দারা লিখিলে ঠিক ৪ সপ্তাহ পরে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং সেই কাগজে যে কখনও কিছু লেখা ছিল তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।

প্রত্নওক।

—:০:—

আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান "প্রত্নওক" নামে বেদে উক্ত হইয়াছে। এই "প্রত্নওক" কোন্ দেশ তাহার মীমাংসা আবশ্যক। এ বিষয়ে অন্ততঃ দশবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ইহা বাক্‌ট্রিয়া (Bactria) প্রদেশ; কোন মতে ইহা আমুনদীর উপত্যকা কোন মতে আসিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূখণ্ড বিশেষ; কোন মতে ভারতবর্ষ। বেবরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থে স্থির করিয়াছেন যে প্রত্নওক ককেশস পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী। এই সিদ্ধান্ত দোষাত্মক প্রণালীর দ্বারা কষ্টকল্পিত বলিয়া হৃদ্য নহে, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক তাঁহার উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

হিমালয়ের উত্তরে যে আর্য্যদিগের উপনিবেশ ছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, বাহ্লীক, কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি বিবিধ আর্য্যজনপদের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয় "তস্মাৎ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচন পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি "বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে।" হিমালয়ের উত্তরে উত্তরকুরু এবং উত্তরমদ্র এই দুই জনপদ। উত্তরকুরু বর্ত্তমান কাসগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। বাল্মীকি রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে লিখিত আছে যে যখন সুগ্রীব বানরগণকে সীতার অন্বেষণে উত্তরদিকে প্রেরণ করেন তখন বানর-রাজ হিমালয়ের কৈলাস ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পর্ব্বতের পর উত্তরকুরু জনপদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ও আদিপর্ব্বে উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন দিগ্বিজয়কালে মানসসরোবরের উত্তরস্থ গন্ধর্ব্ব নগরের উত্তরে স্থিত উত্তরকুরুতে প্রয়ান করেন। আদিপর্ব্বের ১২০ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই পাণ্ডুনৃপতি কুন্তীকে বলিয়াছিলেন:—

"অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥

তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারং সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূৎ বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ ॥
প্রমাণ দৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেযু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
অস্মিংস্তু লোকে ন চিরাৎ মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।"

পূর্ব্বকালে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ছিল, সকলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। স্ত্রীলোকেরা স্বামী প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনিবার্য্য হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়ার নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিত। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা অধর্ম্মে পতিত হইত না, যেহেতু তৎকালে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। মহর্ষিরা অদ্যাপি উত্তরকুরু প্রদেশে এই ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করেন। সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেই অনাবৃত অর্থাৎ স্বাধীন ও সর্ব্বদর্শনযোগ্য।

উত্তরকুরু প্রদেশ অতি রমণীয় বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্লীক প্রদেশ আধুনিক বাল্খদেশ; ইহা পূর্ব্বে আর্য্যদিগের নিবাস ছিল। কম্বোজদেশও বর্ত্তমান বোখারার নিকটবর্ত্তী। এই সকল আর্য্যদিগের উপনিবেশ ছিল।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর ইন্দরালয় নামে একটী স্থান আছে। অমরকোষে, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি ইহার উল্লেখ আছে। জনষ্টোনসাহেব কৃত আসিয়া মহাদেশের বৃহৎ মানচিত্রে "ইন্দরালয়" দৃষ্ট হয়। ইন্দরালয়ের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রালয়। ইহাই আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৭ সূক্তের ৯ ঋকে লিখিত আছে যে ইন্দ্রদেব আর্য্যদিগের পুরাতন বাসস্থানের সর্ব্বরক্ষক প্রভু ও বহুজন পালক ছিলেন। ইহা শীত প্রধান দেশ ছিল তাহা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের প্রভাবে জানা গিয়াছে যে প্রাচীনকালে আর্য্যবংশের বর্ত্তমান সপ্তবিভাগ একত্র বাস করিত। সপ্ত বিভাগ যথা ১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জর্ম্মাণদিগের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি; ৪ রুসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী শ্লাভোনিয়ান (Slavonion) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীশদেশবাসী পিলাসজি (Pelasi) এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি।

"ইন্দ্রালয়" নামই প্রতিপন্ন করিতেছে যে ইহাই ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত আর্য্যদিগের আদিভূমি। ইন্দ্রদেব আর্য্যগণের রক্ষক বলিয়া আর্য্যগণ তাঁহাদের আদি বাসভূমির ইন্দ্রালয় নাম রাখিয়াছিলেন। আধুনিক ইন্দ্রালয় প্রাচীন ইন্দ্রালয়ের প্রায় দুইশত ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া অনুমান হয়। ইন্দ্রালয় অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ ছিল। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে হিমপ্রধান প্রদেশে বাস করিতেন। আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার হিমপ্রধানদেশবাসীদিগের ন্যায় ছিল। তাঁহারা হিমঋতু লইয়া বৎসর গণনা করিতেন। তাঁহারা মাংসভক্ষণ, উষ্ণপরিচ্ছদ পরিধারণ প্রভৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, কম্বোজ, বাহ্লীক প্রভৃতি আর্য্য উপনিবেশ সকল ইন্দ্রালয়ের সন্নিহিত। ইন্দ্রালয়ে তাঁহারা সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিলেন এবং কোন কারণে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতিকালে আর্য্যদিগের যে ভাষা ছিল তাহার নাম ব্রহ্মভাষা। ব্রহ্মভাষার ও ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ উপনিষদাদিতে

বহুত্র দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে উপনিবেশান্তর আর্য্যগণ এই ব্রহ্মভাষার সংস্কারপূর্ব্বক উহাকে সংস্কৃতে পরিণত করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

দেশলাই।

—:০:—

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী দেশলাই আমরা চক্ষে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল প্রতিবৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ টাকার দেশলাই বিলাত প্রভৃতি বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হইয়া থাকে।

ইহার পূর্ব্বে দেশলাইএর জন্য আমাদের কি খরচ হইত? কালীপূজার সময়ে ছেলেদের খেলিবার প্যাঁকাটি হইতে দু-এক আটি রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আধ-পয়সা বা সিকি-পয়সার গন্ধক কিনিয়া দেশলাই করিলেই, তখন সম্বৎসর কাটিয়া যাইত, কেবল সোলা চকমকিতেই সংসারীর সুখে কাল অতিবাহিত হইত। এখন পঁচিশ লক্ষ টাকার যে পরিমাণ বিলাতী দেশলাই পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ প্যাঁকাটীর দেশলাই করিতে ৬।৹ মণ গন্ধক লাগিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কার্য্য পঁচিশ বা ত্রিশ টাকায় হইত এখন তাহার জন্য পঁচিশ লক্ষের অধিক টাকা দিতে হয়।

আমরা সচরাচর যে "পয়সায় দুই বাক্স" দেশলাই ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই সুইডেন দেশীয়। দেশলাইয়ের কাঠী যত শীঘ্র করিতে পারা যায় এবং লোকের মজুরী যত কম হয়, দেশলাই তত সস্তায় বিক্রয় হয়।

প্রথমতঃ আবশ্যক মত পুরু কাঠের তক্তাকে কলের করাত দ্বারা ছোট ছোট সমান অংশে কাটা হয়। এই সকল কাঠের টুকরা লম্বে দেশলাই-কাঠীর সমান, প্রস্থ এবং পুরু ইচ্ছামত এক মাপের। যাহাতে সকল প্রকার কাষ্ঠ অত্যন্ত শীঘ্র ও সুবিধায় কাটা যায়, সে জন্য এখন আমেরিকায়, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে নানা কৌশলময় যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে। এদেশে দেশলাই করিতে হইলে, সেরূপ যন্ত্র আমরা যে নিজে *নির্ম্মাণ করিব এমনটা এখন অসম্ভব। বিদেশীয়* যন্ত্রের উপর নির্ভর করাই ভাল।

যন্ত্রের দ্বারা কাঠীগুলি কাটা হইলে, হস্তের দ্বারায় কিম্বা যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি লইয়া আঁটি বাঁধে। আটি বাঁধিয়া ভিজা থাকিলে শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইয়া তাহার মুখগুলি, লোহার চাদর গরম করিয়া লাল হইলে, তাহাতে ঘষিয়া লয়, এইরূপে কাঠীর মুখগুলি ঈষৎ পোড়া পোড়া হইলে, একটা পাত্রে অল্প কেরসিন বা টার্পিণের ন্যায় শীঘ্র দহনীয় তৈল রাখিয়া সেই মুখগুলি তাহাতে স্পর্শ করাইলেই অমনি একটু তৈল শুষিয়া লয়। ইহার পর অগ্নি-উৎপাদক একটী মিশ্র পদার্থে কাঠীর মুখগুলি ডুবাইয়া লইলেই দেশলাই প্রস্তুত করা শেষ হয়।

এই মিশ্র পদার্থের উদ্দেশ্য অগ্নি উৎপাদন করা। কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহা অল্প বা অধিক উত্তাপে বায়ু লাগিলেই জ্বলিয়া উঠে। এই পদার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণত পাঁচ প্রকার বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

১। পোটাশিয়ম্ ক্লোরেট ২৬ আউন্স;
২। ম্যাঙ্গানীজ পেরক্সাইড ২৫ ঐ
৩। বাই ক্রোমেট অব্ পোটাশ ২০ ঐ
৪। লেড্ সিয়ানাইড ২৫ ঐ

৫। এণ্টিমনি অক্‌সিসল্‌ফাইড্‌ ২০ আউন্স

উক্ত দ্রব্য সমূহ প্রথমে পৃথকভাবে চূর্ণ করিতে হইবে পরে ধীরে ধীরে খানিকটা জলে ১২ আউন্স গঁদ ভিজাইয়া সমস্ত গুলি মিশ্রিত করিতে হইবে। এমন করিয়া জল দিতে হয় যে, এই মিশ্রণ আটার মত ঘন হয়। এইরূপ অনেকক্ষণ নাড়িয়া দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া মিশিলে পর, তাহার সহিত উত্তমরূপে গুঁড়ান কাচের টুকরা ৪ আউন্স মিশ্রিত করিলেই দেশলাইএর মসলা প্রস্তুত হইল। এইবার পূর্ব্বোক্ত কাঠীগুলি একটা অল্প গভীর লোহার পাত্রে যতটুকু ডুবিবে সেই মত পুরু মসলা ঢালিয়া তাহাতে এক মুখ ডুবাইয়া প্রায় ২০ মিনিট ঝুলাইয়া রাখা হয়;—বেশী মসলা থাকিলে, তাহা ঝরিয়া পড়ে, এবং কাঠীর মুখ নীচুভাবে থাকাতে বেশ গোল ফোঁটার মত হয়।

মসলা লাগান হইলে, কাঠীগুলি বাতাসে রাখিয়া শুকান হয়। তাহাতে অসুবিধা হইলে একটা ঘরের মধ্যে কলের সাহায্যে গরম বাতাস প্রবিষ্ট করাইয়া সেই ঘরে উহা শুকান হয়। শুকান হইলে তাহা বাক্‌সের মধ্যে রাখা হয়।

বাক্‌সের কাঠ কলে কাটা হয়; বাক্সের যে যে স্থানে ভাঁজ পড়ে, কলে সেই সেই স্থানে খাঁজ কাটা থাকে; সুতরাং একজনে চক্ষু বুজিয়া দিনে পাঁচ ছয় শত বাক্স মুড়িয়া এক এক খণ্ড কাগজ লাগাইয়া দেয়। আবার দেশলাই ঘসিবার কাগজও স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা হয় না। কাচের গুড়া ও শিরীষে একটা আটা করিয়া বাক্সের দুই পার্শ্বের কাগজে লাগাইয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণ দেশলাই করিবার প্রক্রিয়া। এই দেশলাই যদিও এখনও অনেক প্রচলিত আছে, তবু অনেকে ইহা ব্যবহার করেন না এবং অনেক দেশলাইকারক তাহা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন না। কেন না, এই দেশলাই যেথা সেথা একটু চাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। কারিকরেরা বাক্সবন্দী করিতে অনেক বিপদ ঘটাইয়াছে। এই সকল বিপদ নিবারণ জন্য সেফ্‌টিম্যাচ বা আপদ শূন্য দেশলাই আবিষ্কার হয়। ইহাতে এমর্ফস (Amorphos) ফস্‌ফরস্‌ ব্যবহৃত হয়। এই এমর্ফস ফস্ফরাস্‌ সাধারণ ফস্ফরসের মত দাহগুণ বিশিষ্ট নহে। ইহার বর্ণ লাল; ইহাতে বায়ু লাগিলে জ্বলিয়া উঠেনা বা ধূম নির্গত হয় না; অধিক উত্তপ্ত না হইলে ইহা জ্বলে না। ইহা কেবল বাক্সের গায়ে শিরীষের সহিত ব্যবহৃত হয়। কাঠির মসলা ক্লোরেট অব্‌ পোটাশ, এই ফস্ফরাসের একটুমাত্র সংস্পর্শে আসিলে জ্বলিয়া উঠে।

এই দেশলাই প্রস্তুত করিতে হইলে ক্লোরেট অব্‌ পোটাশ ওজনে ৬ ভাগ, সলফাইড অব্‌ এণ্টিমনি (সুর্ম্মা) ২ বা ৩ ভাগ, শিরীষ ১ ভাগ লইয়া গরমজলে প্রথমে পোটাশ ও শিরীষ গুলিতে হইবে পরে তাহাতে এণ্টিমনি মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় কাঠি প্রস্তুত করিতে হইবে। বাক্সের গায়ের জন্য এমর্ফস ফস্ফরাস ১০ ভাগ, ম্যাঙ্গনীজ অক্সাইড বা সলফাইস অব্‌ এণ্টিমনি ৮ ভাগ, শিরীষ ৩ হইতে ৬ ভাগ উত্তমরূপে জলে গুলিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া বাক্সের গায়ে লাগাইতে হয়।

দেশলাই তৈয়ারির সমগ্র যন্ত্রাদির মূল্য প্রায় সতের হাজার টাকা এবং তৎসহ বিজ্ঞাপনাদি ও লোকজনের মজুরি প্রভৃতির খরচ জন্য মাসে প্রায় ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে বৎসরে প্রায় ৭০ হাজার টাকার দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারিবে। আজ কাল স্বদেশী আন্দোলনে কলিকাতায় ছট একটী

দেশলাইয়ের কারখানা খোলা হইয়াছে এবং আশা করা যায় এরূপ লাভজনক ব্যবসায় এদেশীয় ধনীদিগের দৃষ্টি পতিত হইবে।

শ্রীসত্যচরণ দত্ত, বি, এ।

আন্দুল-ঝোড়হাট বঙ্গ-বান্ধব সমিতির উৎসব।

—:০:—

বিগত ২রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় উক্ত সমিতির মঠভবনে সমিতির দশম সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সনাতনধর্ম্ম প্রচারিণী সভার নেতা পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরাও আহূত হইয়া সভাপতি মহোদয়ের শ্রীচরণ দর্শন ও উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম।

স্থানটী দেখিলাম, শীতলবাহিনী সরস্বতী-তরঙ্গ-চুম্বিত। পাদদেশে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য নীলাকাশের গায় চিত্রলেখবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। গৃহের নবীন সংস্করণ, অস্তোন্মুখ তপনের আরক্তিম বিভায় যেন শক্রধনুর বিভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় এই নব সংস্কৃত দ্বিতল গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ-স্বামীর কল্যাণ বিধান করিলেন এবং তদীয় পাদস্পর্শে সুরম্য গৃহটীও পবিত্র হইল।

ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আন্দুলবাসী বালক যুবক ও বৃদ্ধলোকেরা ঐ স্থানে সমবেত হইলেন। যে গাড়ী মহর্ষির জন্য আনা হইয়াছিল সকলে তাহার অশ্ব বিযুক্ত করিয়া স্বয়ং টানিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা-পুরুষ গাড়ীতে উঠিলে বহুসংখ্যক দর্শক গাড়ীর অগ্র পশ্চাৎ চলিল। মহর্ষির গাড়ী এই বিশাল জনসঙ্ঘের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ঐ পথের এক পার্শ্বে সেই শীতলবাহিনী সরস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা, অপর দিকে গৃহস্থ ভদ্রমহিলাগণ মহর্ষির দর্শনলালসায় স্বীয় প্রাঙ্গণে, গবাক্ষে, দ্বারদেশে ও ছাতেরউপরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে যেমন গাড়ীঅগ্রসর হইতে লাগিল দর্শকেরা অমনি "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ও "গুরু-দেবের জয়" শব্দে ঠাকুরের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। গুরুদেবও গাড়ীর উপর হইতে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য জনাইয়ের জমীদার ও উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষির সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক ব্যজন করিতে-ছিলেন। এ দৃশ্য বর্ণনাতীত, যে সকল ভাগ্যবান সেই শোভা দর্শনার্থ উপস্থিতছিলেন তাঁহারাই সেই বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কুল রমণীগণ রাস্তার ধারের বাড়ী হইতে প্রাচীন প্রথানুসারে মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি সহযোগে প্রণাম দ্বারা অসাধারণ ভক্তি ও সম্বর্দ্ধনার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ক্রমে গুরুদেবের গাড়ী সভাস্থলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখেউচ্চ নহবৎমঞ্চে শ্বেত, লোহিত, নীল, পীত, হরিত পতাকা সকল পত পত শব্দে উড্ডীন হইয়া যেন ধর্ম্মপিপাসু জনমণ্ডলী পরিবেষ্টিত মহর্ষিকে সাগত সম্ভাষণ করিতেছিল; এবং বাদ্যকরগণ সুমধুর গভীর নিক্বণে বাদ্যধ্বনি দ্বারা শুভানুষ্ঠানের সূচনা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

সভাতোরণ পূর্ণকুম্ভ কদলীবৃক্ষ, নানাবিধ বর্ণের ধ্বজা, পতাকা, বৃক্ষশ্রেণী ও বিচিত্র

রংএর কাগজের মালায় সজ্জিত হইয়াছিল। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রাঙ্গণটী নানাবিধ পত্র পল্লব ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। যেথানে যেটী সাজে সেথানেই সেইটী রহিযাছে—কিছুরই অভাব দেখি নাই। সভাস্থলের সাজ সজ্জা ও চিত্রণ দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধশক্তির (aethetic culture) পরিচয় পাইলাম।

যে মহাত্মা স্বদেশ ও স্বজাতির স্বধর্ম্ম উন্নতি-কল্পে নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছেন, যিনি চিরজীবন ধর্ম্ম ও নীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া অসামান্য অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, উদ্যম, পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আজ ধর্ম্ম জগতে আমাদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হই-য়াছে, যিনি আমাদিগের নেতা, উপদেষ্টা ও আমাদের ইষ্টগুরু সেই অলৌকিক প্রতিভাশালী, ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন, নিখিল জনহিতাকাঙ্ক্ষী প্রাতঃস্মরণীয় নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়কে আজ বাজগঞ্জে শুভাগমন করিতে দেখিয়া আন্দুলের অদূরবর্ত্তী চারি পাঁচখানি গ্রামসমূহ হইতে অন্যূন সহস্রাধিক ভদ্রসন্তানগণের সমবেত হইয়াছিল এবং কলিকাতা হইতেও বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গ এই ধর্ম্ম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বহুকাল এরূপ ধর্ম্মসভা হয় নাই, এমন ধর্ম্ম বক্তৃতাও বহুদিন শুনা যায় নাই এবং এত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির একত্র সমাবেশ অনেককাল দেখি নাই। গুরুদেবের বক্তৃতার অনেকগুলি নূতনত্ব দেখিলাম, তন্মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ববিধ নরনারীর প্রাণের উপযুক্ত ও মধুর হইয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা অনেকের নিকট শুনা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রাণ মাতান বক্তৃতা আমরা কখনও শুনি নাই। মহর্ষির বক্তৃতার আরও একটী মোহিনীশক্তি দেখিলাম যে, বক্তৃতার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ৩।৪ ঘণ্টাকাল এতগুলি লোকের প্রাণ ধর্ম্মরসে বিগলিত করিয়া তাঁহা-দিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে "হরিধ্বনি" ও ভক্তবৃন্দের উচ্ছ্বাসমাত্র শ্রুত হইয়াছিল।

যথা সময়ে সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহার পুরোভাগে মৃদঙ্গ, সেতার, কর-তালাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ভাদুড়ী প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত কর্ত্তৃক কয়েকটী ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইয়াছিল। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা গুরুভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ও জাতীয় উন্নতির উপায় প্রভৃতি অতি সরল, প্রাঞ্জল ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। অবশেষে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের উৎপাতে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতি, শস্যহানি ও দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলি-লেন যে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যকল্পে উক্ত সমিতি যথাসাধ্য অর্থদান করিয়াছেন। যে সভার এই সকল সাধু উদ্দেশ্য আমরা কায়মনোবাক্যে তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সভাভঙ্গের পর ভক্তবৃন্দ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিকে পূর্ব্ববৎ শকটারোহন করাইয়া শকটখানি পূর্ব্বোক্ত হর্ম্ম্য পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎপরে উক্ত হর্ম্ম্যে কলিকাতাবাসীগণকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এই ভোজনব্যাপার দর্শনে স্বতঃই

মনে উদিত হইয়াছিল যেন ত্রেতায় রাজর্ষিজনক কর্ত্তৃক ধর্ম্ম মহাসম্মিলনীতে ভোজন হইতেছে। ইহাও মহর্ষির একটি নূতন কীর্ত্তি। পুরাকালে এইরূপেই হিন্দুধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইত। তাই মনে হয় দেশের হাওয়া ফিরিতেছে। ভগবান্ মুখ তুলিয়াছেন।

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী।

প্রতিভা।

—:০:—

মানবদেহ নশ্বর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু যতদিন জগত থাকিবে ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরস্থায়ী,—প্রতিভাই চির-আদরণীয় ও পূজনীয়।

প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তির পরিচায়ক ও তাঁহারাই মানুষের আদর্শ। প্রতিভা দৈবশক্তি বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের শক্তি বিসর্পিত।

প্রায় দুইশত পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে এক ঘটিকার সময় ইংলণ্ডের লিঙ্কন প্রদেশস্থ উল্‌ষ্টারওয়ার্থগ্রামে একজন দরিদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র কুটিরে এক অসীম প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়। যাঁহার প্রতিভার বিকাশে জগত বিস্মিত ও চিরকৃতজ্ঞ, যাঁহার প্রতিভা এই জগতকে জ্ঞানালোকে বিভাসিত করিয়াছে, সেই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মহামতি সার আইজাক্ নিউটন্।

নিউটনের পিতামহের মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে, এবং তাঁহার মাতার বিবাহের কয়েক মাস পরেই নিউটনের পিতার মৃত্যু হয়। নিউটনের মাতা গর্ভাবস্থায় বিধবা হইলেন। অদৃষ্টক্রমে নিয়মিত প্রসবকালের পূর্ব্বে নিউটনের জন্ম হইল। এত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া নিউটন জন্মগ্রহণ করেন যে তাঁহার মাতা বলিতেন, যে তাঁহাকে সে সময়ে সম্ভবতঃ একটী ক্ষুদ্র কলসে রাখা যাইতে পারিত, এবং যাহারা তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী কোন চিকিৎসকের নিকট গিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে চিকিৎসক লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বালকটী মরিয়া যাইবে। কিন্তু, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। যে ক্ষীণ দেহ দেখিয়া সকলে ভাবিয়াছিল বালক এখনই মরিবে, সেই দেহ ক্রমে সবল হইয়া সুস্থভাবে পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত জীবন ধারণে সমর্থ হইল।

সুতরাং বলিতে হইবে নিউটনের জন্ম শুভমুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইয়াছিল। মানুষ জগতে তাহার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া থাকে; যেরূপ কার্য্যে সে নিয়োজিত হয়, সেই রূপ মুহূর্ত্তেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে। নিউটনের জন্ম সময়ে তুলারাশির ২০ অংশ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল; রবি মকররাশির ১৪ অংশে, চন্দ্র কর্কট রাশির ২ অংশে, বুধ ধনুরাশির ২১ অংশে, শুক্র কুম্ভরাশির ২৭ অংশে, মঙ্গল বৃষরাশির ৭ অংশে বৃহস্পতি মীন রাশির ১৪ অংশে, ও শনি মীন রাশির ২০ অংশে, অবস্থিত ছিল।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে নিউটন বিদ্যাশিক্ষার্থ নিকটস্থ এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। একে শৈশবে—জন্মের পূর্ব্বেই—পিতার মৃত্যু, অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তদুপরি বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ বড় সহজ নহে, সুতরাং অতি কষ্টে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন

মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ও বিনা বাসা খরচে ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইলেন। এইস্থানে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি কৌতূহল বশতঃ একখানি ফলিত জ্যোতিষের পুস্তক ক্রয় করেন এবং তাহা পাঠকালে তাঁহার গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল।

ফলিত জ্যোতিষে নিউটনের বিশেষ আস্থা ছিল। প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি এই শাস্ত্র সম্যক্ রূপে আলোচনা করিতেন। দুঃখের বিষয় যে, ফলিত জ্যোতিষ মহামতি নিউটন, বেকন, কেপ্লার প্রভৃতি মনস্বীগণ সত্য বলিয়া বিশেষ আদর করিতেন আধুনিক কতিপয় শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তি সেই ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অগ্রে এই শাস্ত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া পরে অবিশ্বাস করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই এই শাস্ত্র অসত্য প্রমাণে সমর্থ হন নাই, বরং যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিউটন বড় কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় বড় স্নেহপূর্ণ ছিল, এমন কি কথিত আছে যে তাঁহার প্রিয় সারমেয় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমুদায় নষ্ট করিলেও, তিনি কেবল দুঃখ পূর্ণ ও স্নেহময় স্বরে বলিয়াছিলেন, "তুমি জান না আজ কি ক্ষতি করিয়াছ।" তাঁহার ন্যায় ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট লোক ইহ সংসারে অতি বিরল।

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিউটন কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রয়েল সোসাইটীর একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি যে প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাহা তখন সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বৃক্ষ হইতে একটী আপেলের ভূতলে পতন দৃষ্টে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটীর প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই।

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের বিশেষ মানসিক পরিশ্রমে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে নিউটনের শরীর ভগ্ন হইল। এই সময়ে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য ছিল না, সর্ব্বদাই বিষাদচিত্তে অবস্থান করিতেন।

অজীর্ণ ও যকৃতের পীড়ার একটী প্রধান আনুষঙ্গিক লক্ষণ, বিষাদচিত্ততা। বয়সকালে নিউটন বাতরোগেও আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং চিকিৎসকেরা তাঁহার মূত্রাশ্মরী রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় অজীর্ণাদি রোগে আক্রান্ত হন; তদুপরি উৎসাহ ভগ্নতার ও দারিদ্র্য দুঃখের জন্য সরল ও নম্র প্রকৃতি নিউটনের যে মানসিক বিকার উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। অবশ্য নিউটনের যে চিত্তবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল তাহা নহে; তাঁহার জীবন তাঁহার নিকট নানা কারণে বিষাদপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত; জীবনে আদৌ সুখানুভব করিতে পারেন নাই। যদি একবারে তাঁহার মানসিক বৈলক্ষণ্য হইত তাহা হইলে তিনি তাঁহার সময় বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করিতে ও নূতন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারিতেন না। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে বুধগ্রহ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার

মানসিক বিষাদপূর্ণতা সূচিত হয়, এবং চন্দ্র কর্কট রাশিতে (উদর বোধক,) মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় অজীর্ণাদি রোগ সূচিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে, চন্দ্র ও রবি কর্কট বা মকর রাশিতে অবস্থান করিলে জাতকের রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের স্পৃহা বুঝায়। নিউটন অধিকাংশ সময় ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু জীবনের এক সময় বিশেষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎ পূর্ব্ব হইতে উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সদস্য ছিলেন।

নিউটনের প্রতিভা কেবল বৈজ্ঞানিক জগতে নহে, নানা বিষয়েই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা যতকাল জগতে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে ততদিন সকলের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এত প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন বিষাদপূর্ণ ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহার জীবনের মহাকষ্টের এক প্রধান কারণ। দারিদ্র দোষই গুণরাশি নাশ করিয়া থাকে। অর্থকষ্ট হেতু রয়েল সোসাইটীর বাৎসরিক সামান্য চাঁদাও দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে উক্ত সভার সদস্যতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমে এই অসীম ও অতুলনীয় প্রতিভাকে একটী বিদ্যালয়ের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং যদি জনৈক বন্ধুর সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে সেই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। নিউটনের প্রতিভা সম্বন্ধে কবি পোপ বলিয়াছেন,

"Nature and Natur's laws, lay hid in night,
God said, 'Let Newton be !' and all was light"

যদিও নিউটনের প্রতিভা যথা সময়েই বিকাশপ্রাপ্ত ও স্বীকৃত হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার দুঃখ কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। এরূপ অসামান্য প্রতিভা দেশের লোক কর্তৃক যথার্থ আদর প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহাকে জীবিকার নিমিত্ত জনৈক বন্ধুর উপর নির্ভর করিতে হইত। এরূপ দুর্দ্দশা তাঁহার কোষ্ঠী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ভাগ্যাধিপতি বুধ, শনি দৃষ্ট, এবং শুভগ্রহ বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে শনিযুক্ত, সুতরাং জীবনে শনির প্রাবল্যই অধিক। শনির প্রভাবেও তৃতীয়স্থানে বুধ থাকায় এবং অন্যান্য শুভগ্রহ দৃষ্ট হওয়াতে বিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য বুঝায় এবং রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রে থাকায় বহু সম্মান লাভ বুঝায়। দ্বিতীয়াধিপতি অর্থাৎ ধনাধিপতি মঙ্গল অষ্টমস্থ অর্থাৎ কুস্থানে স্থিত ও শনিদৃষ্ট সুতরাং জীবনে অর্থকষ্ট স্পষ্ট বোধগম্য হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনায় বেশ বুঝা যায়, কেন একজন নীচ, স্বার্থপর ও কুস্বভাব বিশিষ্ট লোক সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করে, এবং কেনই বা একজন সরল, উদার, প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ উপেক্ষিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুসারে এ জগতে সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। প্রতিভা ও জগতের সুখ সম্পদ তুল্য মূল্য নহে; একটী অমূল্য অন্যটী অকিঞ্চিৎকর; একটী চিরস্থায়ী অন্যটী নশ্বর।

সামান্য কৃষকের গৃহে প্রতিভার উদয় জগতে সর্ব্বোচ্চ চিরস্থায়ী সম্মানলাভ তাঁহার পরিণাম। জ্যোতিষশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত দারিদ্র-যোগ অভ্রান্তরূপে মিলিয়াছিল, আবার "দৃশ্যতে যুজ্যতে বাপিচন্দ্রজেন বৃহস্পতিঃ। শিরসা শাসনং তস্য ধারয়ন্তি নৃপাস্তদা॥" এই বাক্যটীর সত্যতা সহজে উপলব্ধি হয়। তৃতীয় স্থান হইতে বুধ

বৃহস্পতির উপর দৃষ্টি করিতেছে, স্থতরাং বিদ্যা-সম্বন্ধে (তৃতীয় স্থান স্থচক) অতুল সম্মান লাভ স্থচিত হয়।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ নিউটন অত্যন্ত পীড়িত হন এবং চিকিৎসক মীড্ তাঁহার বৃহদশ্মরী রোগ নির্ণয় করেন। ২০শে মার্চ্চ সোমবার প্রাতে এক ঘটিকা ও দুই ঘটিকার মধ্যে ৮৫ বৎসর বয়সে নিউটন ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। বৃষরাশিতে অষ্টমস্থ মঙ্গল মারক, স্থতরাং জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে বৃহদশ্মরী রোগে মৃত্যুস্থচিত হইতেছে।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নিউটন বলিয়াছিলেন, "আমি জানি না, জগত আমাকে কিরূপ ভাবে ভাবিবে; কিন্তু আমি জানি যে সামান্য বালকের ন্যায়, অকুল সমুদ্রের বেলা ভূমিতে খেলা করিতে করিতে দুএকটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু সম্মুখে বহুমূল্য রত্নপূর্ণ অসীম জ্ঞান সাগর প্রচ্ছন্ন ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে।"

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিকার।

—০:(*):০—

সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম হিতব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের হিতকামনায়—বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার পিতৃদেবের মন্ত্রশিষ্য সুজাগঞ্জের ব্রজমোহন রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দেশের সমগ্রবিপদবিনাশী এক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সাতদিন সাতরাত্র ধরিয়া এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। এই যজ্ঞের নাম "সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ" দেওয়া হইবে এবং যজ্ঞ-সমাপনান্তে যজ্ঞদর্শনেচ্ছু সমবেত জনসঙ্ঘকে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রকৃত অবনতি ও অধঃপতনের কারণ সমূহ যথাসম্ভব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। সাধু যাঁর উদ্দেশ্য ভগবান তাঁর সহায়। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কিছুরই অভাব হইল না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর এমন কি বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জন সমূহ যজ্ঞদর্শন মানসে বিজয়পুরে সমবেত হইতে লাগিলেন। সাতদিন সাতরাত্র ধরিয়া মহাযজ্ঞের মহানুষ্ঠান চলিল। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপনান্তে সর্ব্বভৌম মহাশয় সমবেত জন সমূহের সমীপে দেশের প্রকৃত অধঃপতনের বিষয়গুলি—বিশদরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জন সঙ্ঘও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বাক্যগুলি অভ্রান্ত বলিয়া—শ্রবণ করিতে লাগিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় ধীর গম্ভীরস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—বাঙ্গলা নদ নদী বহুলদেশ, প্রতি নদ নদীর তীরভূমি মনুষ্য এবং স্থলচর প্রাণি-গণের বাসস্থল, পরন্ত নানা জাতীয় ফল পুষ্প প্রসূ তরু, গুল্ম, ক্ষুপ বল্লরীর প্রশস্তক্ষেত্র। বাঙ্গলার মাঠ, গো প্রভৃতি তৃণভোজি পশুগণের উৎকৃষ্ট চারণভূমি; সে দেশের নিয়তর স্থান উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র। বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য ও ভীরু-তার অপবাদ নাই। স্থতরাং এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ একটী নহে; বহুকারণ সমবেত হইয়া বাঙ্গলার অবস্থান্তর সংঘটন করিয়াছে এবং বাঙ্গালীকে অধঃপাতে

দিতে বসিয়াছে। সেই সমস্ত কারণের মধ্যে বাঙ্গালার পার্থিবী বিপরিণতি, বাঙ্গালার জঘন্য যুগের আবির্ভাব, বাঙ্গালীর অব্রহ্মচর্য্য, বীজদোষ, ক্ষেত্রাশুদ্ধি, অসত্ম্য আহার, অনুচিত বিহার, আচার ভ্রংশ, অনুচিত অনুকরণপ্রিয়তা, শিক্ষা-বিভ্রাট এবং বাঙ্গলার দেশও প্রকৃতি, মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিকূল রাজবিধি ও চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা এই দ্বাদশটী কারণ সর্ব্বাগ্রগণ্য। দীর্ঘকাল যাবত বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী উক্ত কারণ সমুচ্চয়ের বশবর্ত্তী রহিলে অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হইবে। দেশের উপচিকীর্ষু নেতৃগণ প্রতি-কারণের উচ্ছেদে যত্নপরায়ণ রহিলে দেশের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাদৃশ দুষ্করকার্য্যে জন-সাধারণের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণের সাহায্য না পাইলে দেশহিত ব্রত পরায়ণ নেতৃগণ সিদ্ধ মনো-রথ হইবেন না।

ভূস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে জায়মান বা উপচীয়মান অবস্থায় জল-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন ছিল, বর্দ্ধমান অবস্থায় অরণ্য এবং বনচর প্রাণীর আবাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে, দেশ সুস্থিত হইলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য আসিয়া তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করে।

বাঙ্গালাদেশের প্রবাহিত একটী নদ বা নদীর তটদেশ হইতে অপরের তীরভূমি বহুদূরে অবস্থিত নহে। উভয়ের মধ্যস্থিত স্থলভাগ নাদেয়ান্তরাল ক্ষেত্র নামে অভিহিত। নাদেয়ন্তরালের মধ্যবর্ত্তী-ভূমি নিম্নপ্রান্তর বা বিল। সেই নিম্নস্থান ক্রমশঃ নদতটাভিমুখে উৎসারিত হইতে হইতে উভয়ের তটভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতর ভূমির জল নিঃসরণের জন্য নাদেয়ান্তরালের মাঝে মাঝে খালও বিদ্যমান ছিল। বঙ্গদেশের সুস্থিতিকালে বঙ্গসাগরের তীরভূমি, অধুনাতনী ভূমির ন্যায় নিম্নতর ছিল না; লোক-বসতির উপযোগী উচ্চতর ক্ষেত্র ছিল। নদ-নদীর তটদেশে এবং সাগরের উপকূলে আদৌ লোকালয়ের পত্তন হয়। তার পর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, নদীতটের দূরবর্ত্তী উচ্চতর স্থানে, আর কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত, কৃষক এবং ধীবর প্রভৃতি জাতি, নিম্নতর খাল বিলের ধারে বাসভূমি রচনা করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল। এইরূপে কালক্রমে বাঙ্গালাদেশ নানা-জাতীয় নরনারীর অধ্যুষিত ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এক নূতন রাজ্য এবং রাষ্ট্রিকের সৃষ্টি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, রাজ্য, বাঙ্গালা নামে আর রাষ্ট্রিক বাঙ্গালী নামে অভিহিত।

বাঙ্গালা যখন সুস্থিত ছিল, তখন সমস্ত শাখা-প্রশাখা নদ-নদীর এবং খাল-বিলের মোহনা উন্মুক্ত ছিল। বিপুল পার্ব্বতীয় স্বাদু-সলিলরাশি আর বর্ষার প্রভূত জল অবাধে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়িত। উচ্ছ্বসিত সাগরের জল সেই নদীবেগে প্রতিহত হইত, তজ্জন্য ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অত্যুৎকট বিস্বাদু সাগরের জল ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে নদীপথে সংক্রমণ করিতে পারিত না। আর তখন সাগরের উপকূলভাগও এখনকার মত নিম্ন ছিল না। সুতরাং উচ্ছ্বসিত সাগর-জল দেশ ডুবাইতে ও শস্য হানি করিতে বাধা পাইত। এই সকল কারণে এবং বক্ষ্যমাণ অন্যান্য কারণে সুস্থিত বঙ্গভূমি "সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা" ছিল। বাঙ্গালার জলও মনুষ্য ও পশুগণের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল না। আর খাদ্যাভাবে লোকের শরীর জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইত না।

যে দেশের স্রোতস্বতী সকল অনিরুদ্ধগতি, প্রভূত বৃষ্টির জলে যে দেশের বাসতের ভূমি এবং নিম্ন স্থানে সঞ্চিত রিষ্ট আবর্জ্জনা নিধৌত হইয়া অবাধে ও নিঃশেষে স্রোতজলে পড়িয়া নদ্দদ্বে অপসারিত হয়, যেখানে বহুল ছায়া বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়া বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণশীল দুষ্টবাষ্প শোষণ করিয়া পবনকে পবিত্র করে, যে দেশের বনরাজির তুষ্টিপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য, পর্জ্জন্যদেব যথাকালে প্রচুর সলিল বর্ষণ করে, যথায় স্নান-পানাবগাহনের উপযোগী প্রশস্ত জলাশয় বিদ্যমান থাকে এবং যে দেশে জীবের আজীব ফল-শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত হয় না, সেই দেশকে সুস্থিত দেশ বলে। এক সময়ে এই বঙ্গদেশ সুস্থিত ছিল। সেই সুস্থিতি কাল কত দীর্ঘ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কালক্রমে প্রকৃতির প্রতিকূলতায় এবং মনুষ্যের কর্ম্মদোষে সেই সুস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিবর্ত্তনাধীন। বিবর্ত্তিত অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া কিছুই একভাবে ক্ষণমাত্রও স্থির রহে না। সকল ভাবই অনুক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশও এই নিয়মাধিন। যে উপাদানে বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছিল, যাহার সু-সংস্থানে বঙ্গদেশের সুস্থিতি ঘটিয়াছিল, সেই জল আর জলগত পার্থিব রেণু শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালার জল-স্থলের বিপরিণতি ঘটাইয়াছে। আজিও সে ঘটনার বিরাম নাই।

প্রকৃতির আনুকূল্যে দেশ সুস্থিত হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় দেশের বিপরিণতি ঘটে, কখন কখন দেশ নিরন্ন হইয়া যায়। দেশ, প্রকৃতির লীলাভূমি, মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্র। লোকের কর্ম্মগুণে দেশের সুস্থিতিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কর্ম্মদোষে তাহার বিঘ্ন ঘটে। মনুষ্যের কর্ম্মদোষে বাঙ্গালার যে অবস্থান্তর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহাও অতি ভয়াবহ। প্রকৃতির ক্রীড়া এবং মানবের অবিমৃষ্যকারিতায় দেশের বিপরিণতি ঘটিয়াছে। সুতরাং পার্থিবী বিপরিণতি দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাকৃত, অপর লোককৃত। দেশ রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উভয় প্রকার বিপরিণতির প্রতিকার করিয়া দেশকে সুস্থিত করিতে হইবে।

আর ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠবল উপলব্ধি করিয়া এবং এ বিশ্ববিধানে আমাদের প্রাণপাতের একটা নিশ্চয়ই প্রতিদান আছে এই ধ্রবসত্যের উপর আস্থাস্থাপন করিয়া দেশহিত ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে।

(সমাপ্ত)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
কবিরত্ন।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]　　　　[চৈত্র ১৩১৪ সাল।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ; পি দত্ত F.C.S.PH.B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-কুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষা-র্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতা, ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট, আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা।)

(প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)



চীনের বর্ত্তমান সম্রাট।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। } চৈত্র ১৩১৪ সাল। { ১২শ সংখ্যা

গূঢ়শক্তি।

—:০:—

এই বিশ্ববিধানে অসম্পূর্ণ কোন ব্যাপারই সৌভাগ্যবশতঃ মানবজাতিকে বিশ্রামভোগের জন্য স্বল্প অবসরও প্রদান করে না। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যখন কোন একটি জাতি জাতীয় জীবনের হীনতা ও দুর্ব্বলতা জানিতে পারে,—উপলব্ধি করিতে পারে, তখন পরস্পর যেরূপ এক রক্তের, জাতির, ভাষার ও দেশের বন্ধনে বদ্ধ, সেইরূপ উদ্দেশ্যে, আকাঙ্ক্ষায় ও একতায় পরস্পর অভিন্ন হইয়া পড়ে। যখন কোন জাতির মধ্যে এরূপ একটা গভীর ও বহু বিস্তৃত ভাবের প্রাধান্য ঘটে, তাহা নিতান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও উপেক্ষনীয় নহে ইহা ধ্রুব সত্য। জাতিটীর এই ঘোর বিবর্ত্তনশীল অবস্থার সময় জানিনা কি এক মহীয়সীশক্তি তাহাদের শত মতান্তর, শত মনান্তর, শত বিদ্বেষ বহ্নি প্রশমিত করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইবার পক্ষে অলক্ষ্যে সহায়তা করে। এই অভিনব বলে বলীয়ান্ হইয়া জাতিটি যেন জগৎ সংসারকে

লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, "জগৎ, কালস্রোতের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না, জাতীয় হীনতার যুক্তি-দ্বারা আমাদিগকে পবিচালিত করিতে চেষ্টা করিও না। আমাদের সম্মুখে এক্ষণে দুইটী পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইতেছি,—একপথ জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্বিত ও সন্তোষ তৃপ্ত হওয়া; অপর পথ চির-আক্ষেপ ভূমিতে, লজ্জায় ও ঘৃণায় নতশীর হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।" বস্তুতঃ জাতিটী যখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় তখন তাহার প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; আর তাহাদের সাধনাও যে ব্যর্থ হইবার নহে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ তাহাদিগের মধ্যে নীরবে যে মহাশক্তি দিন দিন তাহাদিগকে এক মহা জাতীয়-ভাবে সম্মিলিত করিয়া, মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষার্থ তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রাণের মধ্যে এক নবীন উদ্যম ও উৎসাহ জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার গতিরোধ করা মানবশক্তির ও মানব কৌশলের অতীত। এবং যাঁহারা এখনও বলিতে সাহস করেন যে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তার জন্মলাভ করে নাই তাঁহাদের প্রতিবাদ যে নিতান্ত অসার ও ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তৎপ্রতিপাদনার্থ অধিক দূর যাইতে হইবেনা। কারণ জাতীয় জীবনের এক একটী জ্বলন্ত প্রাণপাতের ব্যাপারই এইরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। জাতিটীর এই ঘোর পরিবর্ত্তনের দিনে তাহার হৃদয়ে কত আশা, কত পিপাসা, কত আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, জগত সংসার বলিতে পারেন, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা সমূহ নিতান্ত অসাময়িক; কিন্তু মানবের সকল আদর্শই কালাতীত হইয়া থাকে; এবং উন্নতির আশা না থাকিলে, মনুষ্যজীবন নিতান্তই অর্থহীন ও লক্ষ্য-হীন। আদর্শ না থাকিলে, কোন আশাই থাকে না; এবং আশা না থাকিলে ধর্ম্ম বল, আকাঙ্ক্ষা বল, উৎসাহ বল, সৎকর্ম্ম বল, কিছুই থাকে না। প্রকৃত আদর্শ, স্বপ্ন ও অসার কল্পনা নহে—ইহা মানবের অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং সকল হিতকর কার্য্যের গূঢ়শক্তি।

সিন্ধুপারে।

—:০:—

তুমি চলগো সিন্ধুপারে,
তুমি লওগো সাথে মোরে,
রবির কিরণে আমারি তুমি
আমারি ঝটিকা তুফানে।

ঋতুর পরে ঋতু যায়,
কিন্তু বাঁধা যে ভালবাসায়,
চিরদিন তার টান্ যে সমান—
যাক্‌না কেন যেথানে।

নিয়তি থাক্ চেয়ে কঠোর চখে,
সে কভু নহেগো অসহ;
জীবন—সে ত মিলিন তব সনে
মরণ—তোমারি বিরহ।
তবে, চলগো সিন্ধুপারে,
তুমি লওগো সাথে মোরে,
বহেনা যেথায় ঝটিকা তুমুল
চলগো যাই দু'জনে।
ঋতুর পরে ঋতু যায়,
কিন্তু বাঁধা যে ভালবাসায়,
চিরদিন তার টান্ যে সমান—
যাক্‌না কেন যেথানে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস।

—:০:—

গোবিন্দ দাস, বৈদ্যবংশজাত চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠপুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত দামোদরের দৌহিত্র সন্তান—শ্রীখণ্ডে ইঁহার মাতুলালয়। কুমার নগরে চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস। ইনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া সেখান হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দ দাসের মাতামহ একজন শক্তি-উপাসক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাহায্যে গোবিন্দ দাসও প্রথম বয়সে শাক্ত হন। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, গোবিন্দ দাসের জন্ম সময়ে তদীয় জননী যখন প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন সেই সময় তাঁহার মাতামহ ভগবতী পূজায় নিরত ছিলেন। দাসী এই সংবাদ তাঁহার গোচর করিলে তিনি কথা না কহিয়া হস্ত ভঙ্গিমার দ্বারা দুর্গাদেবীর যন্ত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে এই যন্ত্র প্রদর্শন করাইলেই নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হইবে। কিন্তু দাসী তাহা বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্র ধৌত করিয়া জলপান করাইলে গোবিন্দ দাস ভূমিষ্ঠ হন।

গোবিন্দদাস এক সময়ে গ্রহণী রোগাক্রান্ত হওয়ায় কাতরভাবে ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করেন। প্রবাদ আছে যে ভগবতী স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূজা ব্যতীত তোমার মুক্তি হইবে না।

এই প্রত্যাদেশ শ্রবণের পর প্রেমধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত বড় অস্থির হইয়া উঠে। তিনি অবিলম্বে মন্ত্রগ্রহণমানসে কুমার নগর হইতে জাজীগ্রামে আচার্য্য ঠাকুরের নিকট আগমন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছেন। এ সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে শ্রীখণ্ডে ও কাঞ্চন গরিয়ায় উৎসব সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র ও অন্যান্য শিষ্য সঙ্গে বুধরী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধে গোবিন্দদাসকে দীক্ষিত করেন। ১৫৭৭খৃঃ তাঁহার এই দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া নীরোগ হইলেন। দীক্ষান্তে গোবিন্দদাস আচার্য্যের অনুরোধে "গীতামৃত" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

গুরুদেবের আদেশক্রমে তিনি নির্য্যাসতত্ত্ব মতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদরচনা করিতে আরম্ভ করেন। নির্য্যাসতত্ত্ব একখানি কুলার্ণব গ্রন্থ, ইহাতে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের বিধি আছে। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী ঈশ্বরীর সহিত তিনি খেতরী হইতে বৃন্দাবনধাম গমন করেন, সেখানে জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি ব্রজবাসী মোহান্তগণ তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার "গীতামৃত" পাঠে জনৈক ব্রজবাসী বলিয়াছিলেন—"কবীন্দ্র শ্রীগোবিন্দরূপ মলয়গিরি হইতে চঞ্চল বসন্তানিলানীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুধাময় কবিতাবলীর পরিমল, শ্রীজীবরূপ সুরতরুআশ্রিত অলিকুলকে আমোদিত করিয়া ব্রজবাসী সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে।" জাহ্নবী ঈশ্বরীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব মহান্তগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া বুধরীতে ফিরিয়া আসেন।

তৎপরে তিনি আচার্য্য ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে কখনও আজীগ্রাম, কখন শ্রীখণ্ড, কখনও বুধরী, কখনও খেতরীতে সংকীর্ত্তনানন্দে ভাগবৎ ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মপ্রচারে দিনপাত করিতেন। গোবিন্দদাসের পদ সমূহ কাঁচা গড়ীয়ানিবাসী চৈতন্য সহচর দ্বিজ হরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদামদ্বারা বৈষ্ণব মণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত এবং গীতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভু ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন।

নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে তিনি "সঙ্গীতমাধব" নামক রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় এক নাটক রচনা করেন। ইহাছাড়া অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু পদও তাঁহার রচিত।

গোবিন্দের ২৫।২৬ বৎসর বয়সে তদীয় পত্নী মহামায়ার গর্ভে দিব্যসিংহের জন্ম হয়। তিনিও পিতার অনুরূপ ভক্ত ছিলেন। দিব্য সিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। ইনিই "কর্ণামৃত" নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা।

কবি বিদ্যাপতির উপর গোবিন্দ দাসের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় গোবিন্দদাস মিথিলার বিস্‌ফি গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া আসেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদও তিনি উদ্ধার করিয়া আনেন। অনেক স্থলে বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দদাসের নামের যুগ্মভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদগুলি সম্পূর্ণ করিয়া বিনীতভাবে বিদ্যাপতি নামের নীচে নিজ নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিতায় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের এবং তদীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের এবং রাজমহলের ফৌজদার রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য সন্তোষ রায়ের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাস ১৬১৩ খ্রীঃ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দদাসই পদ কর্ত্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কৈশোর, মধ্যাহ্নলীলা, নৌকা বিহার, দীনলীলা, রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার রূপ, নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বাসকশয্যা, মান, বিরহ প্রভৃতি বিবিধচিত্রে গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তি যেন সহস্রমুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন চরাচরের জন্য স্বর্গীয় সুধা ও সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিবার জন্য গোবিন্দদাসের কবিত্বের সৃষ্টি। গোবিন্দ দাসের ভাষায় যদিও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মতভাবের গভীরতা কিম্বা বিদ্যাপতির ন্যায় বর্ণনা চাতুর্য্য নাই কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা মধুর করুণ উচ্ছ্বাস, প্রেমের সংযতভাব, সৌন্দর্য্য বর্ণনের অপূর্ব্বকৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দ যোজনার পারিপাট্যে, এবং ভাবের প্রগাঢ়তায়, গোবিন্দদাস তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সমস্ত কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শব্দ বৈভবের সীমা ছিল না। তিনি অনেকগুলি পদ একটি আদ্য অক্ষরের কথা দিয়া রচনা করিতে পারিতেন অথচ তাহাতে ভাব শব্দশৃঙ্খলাবদ্ধ হইত না।

এক্ষণে আমরা অমর কবির কবিতায় মন্দাকিনীধারা, প্রেমের উৎস যে বৈকুণ্ঠের দিকে

ছুটিয়াছে, কবির প্রাণের দেবতার মন্দির, সংসারের বহু উর্দ্ধে যে স্পর্শ করিয়াছে তাহারই কয়েকটী চিত্র তাঁহার পদাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

প্রেমের নীরব আকর্ষণের স্বর্গীয় চিত্র কবির অমর তুলিকায় কি সুন্দর ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে ;—

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে॥
যদি চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থিরনা বান্দে।
গোবিন্দদাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥

কবি একস্থলে লিখিয়াছেন ;—

দরশনে ন হত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে মরম মাহা পৈঠত
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন দুঁহু ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

আহা মরি মরি প্রেমের কি প্রগাঢ়তা! হৃদয়ের কি ঐকান্তিকী আকুলতাই চিত্রিত হইয়াছে।

সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ-প্রেম—যে প্রেম সংযত, যে প্রেমে তন্ময়তা আছে, যে প্রেম ভক্তিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, যে প্রেমে অভিমান চিরদিনের তরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাধিকা বলিতেছেন ;—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

সখি, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার শ্রীচরণের দাসীই করুন অথবা মহা কষ্টেই রাখুন, কিম্বা দেখা না দিয়া আমার প্রাণ হরণই করুন, অথবা তিনি বহু বল্লভ হইয়া যথাতথা বিচরণই করুন, তিনিই আমার প্রাণবল্লভ।

স্থানান্তরে ;—মরিব মরিব সই নিশ্চয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউমে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুক্তি এই বর সার॥"

তন্ময় ছাড়া, মহাভাবে মিশিয়া যাওয়া ছাড়া রাধিকার প্রেমক্ষুধা আর কিসে মটিবে?

রাধিকা বলিতেছেন ;—

"প্রেমক দহন প্রেম পরে শীতল
আন হোয়ত নাহি আন॥"

কবি বলিতেছেন ;—

যে তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যামজলরস আশে।
সো অবনীরে ঘন সিঞ্চহি
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥

যে প্রেমতরু শ্যামজলদ-জল আশায় রোপণ করিয়াছ, এই নয়ন কমলের অশ্রুধারা সিঞ্চন কর উহাতেই সে পরিণতি লাভ করিবে—প্রাণনাথের দর্শন পাইবে বৈকি?

গোবিন্দ, অমর কবি গোবিন্দদাস, সাধক কবি গোবিন্দদাস! তোমার এ আশ্বাসবাণি কি শুধু শ্যাম পাগলিনী শ্রীরাধিকার পক্ষে না সমস্ত নর-নারীর পক্ষে, না সমস্ত পাপী তাপীর পক্ষে, না

সমস্ত অতৃপ্ত প্রাণের পক্ষে; ইহা কি আশ্বাস-বাণি না জলন্ত সাক্ষ্য! না জলন্ত অনুভূতি! এ উক্তি তোমার ন্যায় সাধক কবির মুখেই শোভা পাইয়াছে।

প্রেমের শেষ পরিণাম তন্ময়তা, তাই রাধিকা বলিতেছেন :—

যাঁহা যাঁহা পঁহু অরুণ চরণ চলিয়াত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী, হও মঝু গাত॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখচাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তছু মাহ॥
যো সরবরে পঁহু নিতি নাহ্।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোহ বীজনে পঁহু বীজহত গত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ধাম॥

প্রভু তোমাতে আমাতে অভিন্ন। আমি কেমন করিয়া তোমায় ছাড়িয়া থাকিব?—তুমি কমল, আমি জল, তুমি নিশ্বাস, আমি বায়ু, তুমি তরু, আমি ছায়া, তুমি জলধর আমি গগন, তুমি সঙ্গীত আমি শব্দ, তুমি চিত্র আমি বর্ণ তোমাতে আমাতে অভিন্ন। কবি কি সুন্দর তন্ময়তার চিত্রই আঁকিয়াছেন!

পরিশেষে অমর কবি হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি মহাভাবের অনন্ত প্রবাহে ফেলিয়া দিয়াছেন; জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য চির আকাঙ্খিত দেবতার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন। কবি গাহিয়াছেন ;—

"যাকর চরণ নখর রুচি হের ইতি
মুরছয়ে কত কোটীকাম।"

ধন্য সাধক কবি গোবিন্দ দাস! ধন্য তোমার কবিত্ব! ধন্য তোমার কবিত্বের শক্তি! ধন্য-তোমার কবিত্বের সৌন্দর্য্য; ধন্য তোমার কবিত্বের ভাষা! যে দিক দিয়াই দেখি সবই বিচিত্র। যিনি সাধক তিনিই তোমার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। আমরা তোমার পদাবলী পড়িয়া ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি।

ঝটিকা।

—:*:—

"When the planets,
In evil mixture, to disorder wander,
What Plagues ! and what portents ! what mutiny !
What raging of the sea ! shaking of the earth !
Commotion in the winds !"—SHAKESPEARE.

আধিদৈবিক বিপদের মধ্যে ঝড় অন্যতম। যে পবন জগতের প্রাণ স্বরূপ, তিনিই আবার সৃষ্টিধ্বংসের প্রধান কারণ। যে পবনদেবের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে তাপিতের ও শ্রম-পীড়িতের প্রাণ শীতল করে, যাঁহার মধুর হিল্লোলে চন্দ্রমা-চুম্বিত কুমুদ-কহ্লারের প্রমুদিত অঙ্গ-শিহরণ ও মধুময়ী প্রকৃতি মধুরিমায় গরিমময়ী হইয়া উঠে, সেই পবনদেবেরই বিক্রম প্রকাশে প্রলয় উপস্থিত হয়, —প্রকৃতির রাক্ষসীতালে ভীষণ নৃত্য, পৈশাচিক ভাষায় গুরু গম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি সমুত্থিত হয়! পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যত ক্রোধ বৃক্ষদের উপর পতিত হয়, সুতরাং তাহাদের কাহাকেও কবন্ধ, কাহাকেও হস্তহীন, কাহাকেও বা পদহীন করেন। তাঁহারই উত্তেজনায় মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়। একা ঝড়ের বিক্রমই অসহ্য, তার উপর যখন

দুইভাই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করেন, তখন কে সহিতে পারে বল? বৃক্ষেরা তখন বার বার ভূতলে ন্যস্ত হইয়া যেন বলে, "প্রভো! আর না, নিরস্ত হউন, যথেষ্ট দুর্দ্দশা হইয়াছে।" কে শোনে সে কথা?

কি কারণে পবনদেব উত্তেজিত হইয়া উঠেন তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু বায়ুচাপবৈষম্য যে ঝটিকার একটী কারণ, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত! যে কারণেই হউক পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং যদি পূর্ব্বাহ্নে পবনের উত্তেজনার সম্ভাবনা জানা যায় ও সাবধান হওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী বিপদের প্রতীকারে বহুল পরিমাণে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্ট ঝটিকা প্রভৃতির সম্ভাবনা নির্দ্ধারনার্থ ভারতের নানা স্থানে আবহ মানমন্দির (Meteorological Observatory স্থাপন) করিয়াছেন, এবং যদিও তাহাতে কতক পরিমাণে উপকার সাধিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের ফল বিশেষ সন্তোষজনক নহে। অনেক সময়ে, বড় জোর ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভাবী ঝটিকার সম্ভাবনা অবগত হওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা কোন বিশেষ উপকার সাধিত হয় না। এত অল্প সময়ের পূর্ব্বে সাবধান হওয়া—বিশেষতঃ যে সমস্ত জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রবক্ষে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে—এক প্রকার অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে আবার ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাধান্য স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, যদি এরূপ দেখান যায় যে রাশিচক্রে গ্রহদিগের বিশেষভাবে অবস্থিতিদ্বারা ঝটিকা সূচিত হয়, তাহা হইলে সহজে গ্রহদিগের উক্তরূপ অবস্থিতি গণনা দ্বারা অবগত হইয়া অনেক পূর্ব্বে ভাবী ঝটিকাদি সম্বন্ধে স্থির করা যাইতে পারে।

যে বিষয় আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই তাহা ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য অনেক বিষয় সত্য হইতে পারে, অথচ তাহার প্রমাণ দেওয়া সহজ নহে। আবার কোন কোন বিষয় একজনের নিকট সত্য বলিয়া অনুমিত হয়, অন্যের নিকট মিথ্যা বোধ হইতে পারে। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এই প্রকার যুক্তি চলে না। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ফল ব্যতীত কোন অনুমান বা যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক মত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি গ্রহদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ভাবে অবস্থিতির সহিত বাতাবর্ত্ত, বৃষ্টিপাত, আবহের উষ্ণতা চাপ ও আনুসঙ্গিক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সুভিক্ষাদির সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে গ্রহদিগের স্থিতি অনুসারে পার্থিব ব্যাপারের পরিণাম গণনা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বৃষ্টিতত্ত্বের * আলোচনায় আমরা কিরূপে রাশিচক্রে গ্রহদিগের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। সাধারণতঃ প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে গ্রহস্ফুট ও তাহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান সহজে অবগত হওয়া যাইবে। কেবল ইন্দ্রগ্রহের (Uranus) স্ফুট এবং গ্রহসমূহের ক্রান্ত্যংশ (Declination) ও চন্দ্রের অয়নান্তবৃত্তে (Solistitial Colure) অবস্থিতি জানিতে হইলে নাবিক পঞ্জিকা (Nautical Almanac) হইতে স্থির করিতে হইবে। স্থূলভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে, এই কয়েকটী বিষয় বাদ দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

---

* আর্য্যভূমি ১৫২-১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যখন কোন গ্রহ নিরক্ষবৃত্তে (Equator) অবস্থান করে, তখন তাহার শূন্য ক্রান্ত্যংশ হইয়া থাকে। যখনই কোন ঝড় বা বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়, তখন শনি, ইন্দ্র বা বুধগ্রহ হয় নিরক্ষবৃত্তে, নতুবা রবির সহিত একত্রে, সমক্রান্ত্যংশে, বা রবি হইতে ৬০, ৯০, ১২০ কিম্বা ১৮০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত থাকে; অথবা প্রবর গ্রহসমূহের (Superior planets) * মধ্যে দুইটীগ্রহ উক্তরূপ একত্রে, সমক্রান্ত্যাংশে বা পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধানে অবস্থিত ও তন্মধ্যে একটীর সহিত বুধগ্রহ উক্তরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কোন প্রবরগ্রহের সহিত বুধগ্রহ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং তৎসহ চন্দ্রও উক্তপ্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ কিম্বা অয়নান্তবৃত্তে অবস্থিত থাকে,—বিশেষতঃ, সেই সময় পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিকট হইলে,—ভীষণ ঝটিকাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রের উক্তরূপ সম্বন্ধ গ্রহদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সমাপ্তির অনুসারে ঝটিকাদি দুই চারি দিবস শীঘ্র বা দেরীতে হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক উপরোল্লিখিত নিয়মগুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ কি না। চিরস্মরণীয় আশ্বিনের ঝড় হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান বাতাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে তৎসমুদায়েই উক্ত নিয়মগুলি পরীক্ষা করা যাউক।

ইংরাজী ১৮৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে চারিঘণ্টা কাল স্থায়ী প্রলয় সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম, হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ রসাতল গত করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

এই ভীষণ বাতাবর্ত্তে অতি অল্পলোকেরই গৃহাদি রক্ষা পাইয়াছিল; বৃক্ষবল্লী সমুদায় সমভূম হইয়াছিল—কত জনক-জননী পুত্রকন্যা বিয়োগে হাহাকার করিয়াছিলেন,—কত বালক বালিকা পিতৃমাতৃ-বিয়োগজনিত সকরুণ রোদন ধ্বনিতে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক করিয়াছিল; কত স্বামীশোকবিধুরা বরাঙ্গনার মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বনের পশু, বৃক্ষের বিহঙ্গও কাঁদিয়া ছিল। ধবিত্রীগাত্রে, এবং নদনদীবক্ষে গতাসু নরদেহ দর্শনে দুঃসাহসিকেরও আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল; কতলোক সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়া ছিল। এই বিষম বিপৎপাতে হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটী জেলার লক্ষাধিক লোকের জীবনহানি হইয়াছিল।

কত শারদীয়া পঞ্চমী আসিতেছে ও যাইতেছে কিন্তু সেই পঞ্চমীতেই উক্তরূপ ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানের কারণ কি? গ্রহদিগের বিশিষ্টভাবে অবস্থিতি ভিন্ন অন্য কারণে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। উক্তদিবসের পরদিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করিতেছিল এবং তৎপর দিবস বৃহস্পতি হইতে বুধের ৬০ অংশ দূর ব্যবধান সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বৃহস্পতি হইতে বুধের উক্তরূপ ব্যবধান বাতাবর্ত্ত সূচক। কিন্তু তৎপূর্ব্ব দিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করাতে উক্ত ব্যবধান সম্পূর্ণ হইবার দুইদিবস পূর্ব্বেই এই ভীষণ বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়।

ইহার তিন বৎসর পরে ইংরাজী ১৮৬৭ সালের ১লা নবেম্বরে বিখ্যাত কার্ত্তিকের ঝড় হয়।

* রবি চন্দ্র, বুধ, ও শুক্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহসকলকে প্রবর গ্রহ কহে।

এই ঝড়ে প্রায় ৩০ হাজার গৃহভগ্ন হইয়াছিল, অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি ডুবিয়া গিয়াছিল, এবং প্রায় ৯০ হাজার লোক মরিয়াছিল। নিম্ন বঙ্গের বিশেষ শস্যহানি হইয়াছিল। এই দিবসেও চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে অবস্থান করিতেছিল এবং ইহার পূর্ব্বদিবসে মঙ্গল ও শনি দুইটী প্রবরগ্রহ একত্রে অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং ইহাদ্বারা ভীষণ ঝটিকা স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে।

পুনরায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানে মেদিনীপুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই মাসে প্রায় প্রত্যেক দিনেই রবি ও বুধগ্রহের সহিত প্রবর গ্রহসমূহের পূর্ব্ব কথিত দূর ব্যবধান দৃষ্ট হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার উপকূলে ভীষণ ঝটিকায় প্রায় পঞ্চসহস্র লোকের জীবনহানি হইয়াছিল। উক্ত দিবসে মঙ্গল ও ইন্দ্র দুইটী প্রবরগ্রহ পরস্পর ৬০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং তৎপূর্ব্বদিবসে রবি ও ইন্দ্রগ্রহ সমক্রান্ত্যংশে অবস্থিত ছিল।

১৮৮৮ সালের ৭ই এপ্রেল ঢাকা প্রদেশে এক ভীষণ ভ্রমি (tornado) উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দিবসে বুধগ্রহ ইন্দ্রগ্রহের সহিত সমক্রান্ত্যংশে এবং তৎপূর্ব্ব দিবস রবি ও মঙ্গল উক্তভাবে অবস্থিত ছিল।

১৮৯৭ সালের ২৪শে অক্টোবর চট্টগ্রামের ভীষণ বাতাবর্ত্তের কথা এখনও সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। উক্তদিবসে শনি বৃহস্পতি হইতে ৬০ অংশ ব্যবধানে এবং শনি ও ইন্দ্রগ্রহ একত্রে অবস্থিত ছিল।

বিগত ১৯০২ সালের ১লা মে ঢাকা প্রদেশে এক ভয়ঙ্কর ভ্রমির আবির্ভাব হয়। উক্ত দিবসে বুধ, বৃহস্পতি হইতে ৯০ অংশ দূরব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

উপরে যে কয়েকটী প্রধান প্রধান ঝটিকার উল্লেখ হইল, তাহাদের সমস্তগুলিতেই পূর্ব্ব কথিত নিয়মগুলির সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। পাঠকগণও যে কোন ঝটিকার দিনে উক্ত নিয়মগুলি পরীক্ষা করিতে পারেন।

ঝটিকাতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, যাহাতে সহজে সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন এরূপ ভাবেই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং যদি পাঠকবর্গের কৌতূহল আকর্ষণ করে তাহা হইলে বারান্তরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী
F. C. S.

হরিনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

—:o:—

হরিনাথ ন্যায়পঞ্চাননের বাস নদীয়া জেলার অধীন এক গণ্ডগ্রামে। পূর্ব্বে অনেক ন্যায়পঞ্চানন, তর্কপঞ্চানন, কবিরত্ন, ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ, বেদান্তচঞ্চু, গ্রাম খানিতে বাস করিতেন। কিন্তু এখন আর তাঁহারা ইহ সংসারে নাই। গ্রামে অনেকগুলি টোল ছিল, সেগুলিও বন্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি টোল আছে সে টোলের অধ্যাপক হরিনাথ ন্যায়পঞ্চানন। হরিনাথের পিতা বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ মহাশয় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "পাত্রাধার তৈল

কি তৈলাধার পাত্র" গোছের ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল। তিনি পণ্ডিত হইলেও ঘোর সংসারী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গ্রামেতো পণ্ডিত কুল নির্ম্মূল হইল, আর যে ক দিন আমি আছি তার পরতো গ্রামের নাম লোপ হইবে। যাহা হউক ছেলেটার যে স্থূল বুদ্ধি তাহাতে'ত ইহার রীতিমত একজন পণ্ডিত হইবার কোন আশা নাই। তবে ব্যাকরণের দুইপাতা, কাব্যের দুইপাতা ও ন্যায়ের দুইপাতা পড়াইয়া ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রিয়াকাণ্ডগুলিও শিক্ষা দিই। বছর দুই বাদে ছেলেটা-দুই একটা শ্লোক আওড়াইতে শিখিলে একবার টোলের বার্ষিক পরীক্ষার সময় বিল্ব গ্রামের শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আনাইয়া পরীক্ষা করাইব এবং তাঁহার দ্বারা "ন্যায়পঞ্চানন" এই উপাধিটা দেওয়াইয়া দিব, আর অতবড় লোকে উপাধিটা দিলে লোকে নিতান্ত অমান্য করিতে পারিবেনা, লোকে বলিবে ন্যায়বাগীশের বেটা ন্যায়পঞ্চানন, তবুও আমার কতকটা নাম থাকিবে।

হরিনাথের 'ন্যায়পঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্তির পর দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ মহাশয় পরলোক গত হইলেন। ছয়মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার স্বাধবী সতী পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিলেন। সংসারে রহিলেন হরিনাথ, তাঁহার যুবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধা পিসি।

হরিনাথের বুদ্ধি স্থূল ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ঠিক বিপরীত ছিল। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সংসারে অভিভাবকের মধ্যে বৃদ্ধাপিসি ছাড়া আর কেহই নাই, তিনি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন সংসারের যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার মত না লইয়া করিতেন না। হরিনাথ সময়ে সময়ে পিসির উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি হরিনাথের স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। হরিনাথের স্ত্রীও এই বীরত্ব প্রকাশের জন্য মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। তিনি বিনীত ভাবে স্বামীকে দশ কথা বুঝাইয়া বলিতেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।'

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর পর হরিনাথের অনেক বন্ধু জুটিতে লাগিল। এই সকল নবাগত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটি বাস্তুঘুঘু ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও পরামর্শে ক্রমে ক্রমে হরিনাথের মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পর হরিনাথের বৈঠকখানায় তিনি ও হরিনাথ উপস্থিত আছেন, মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ বুঝিয়া সময়োপযোগী প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। হরিনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"ওহে ন্যায়পঞ্চানন, শাস্ত্রে শুনিতে পাই পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা সোমরস পান করিতেন, এই সোমরস জিনিষটা কি জান?" হরিনাথ গাঁ, গোঁ করিতে লাগিলেন, কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন ঘুঘুটি বলিতে লাগিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন, তুমি কেবল ন্যায়েরই পণ্ডিত, কাব্যের তো ধার ধার না; অমরকোষে সোমের পর্য্যায় কি আছে মনে পড়ে?—সোমঃ তামরসঃ ইত্যমরঃ।" হরিনাথ তখন টিকি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ মনে পড়িয়াছে বটে।" তারপর হরিনাথের বন্ধু বলিলেন,পণ্ডিত,মনে পড়ে ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে,"ময়োর্লয়োর্ণভেদঃ।" সুতরাং তামরস' আর 'তালরস' একই কথা। এই তালরসের অপভ্রংশে, তাড়ি হইয়াছে, এখন বুঝিলে 'সোমরস' জিনিষটা কি? দেখ, ন্যায়পঞ্চানন, ধরিতে গেলে এখন তুমি আমাদের গাঁয়ের মাথা, তুমিই আমাদের গ্রামের মুখোজ্জ্বল

করিয়া আছ, এখন হইতে একটু একটু সোমরস পান করিতে আরম্ভ কর। মুনি ঋষিদের ন্যায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে। ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে।" হরিনাথ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুর কথা শুনিতেছিলেন এক্ষণে উত্তর করিলেন, "তাহাতে আপত্তি কি!" ইহার পর হইতে সোমরস পানের ব্যাপার আরম্ভ হইল ক্রমে টোলের ছাত্রেরা এ ব্যাপার জানিতে পারিল, গ্রামের দশজনের কানে উঠিল, টোল বন্ধ হইবার উপক্রম। গ্রামের দশ জন দুঃখিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ন্যায়বাগীশ মহাশয় দেবতুল্য লোক ছিলেন, তাঁহার এত বড় নাম, কিন্তু দেখিতেছি ওঝার বেটা বন গুরুই হইল।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের অনেকগুলি ধর্ম্মকার্য্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এক একটি করিয়া সমস্তই বন্ধ হইল। কেবল রহিলেন বার্ষিক কালীপূজা। কারণ এটি বন্ধ করা হরিনাথের বন্ধু বান্ধবের অভিপ্রেত ছিলনা। সোমরসের ব্যাপার ক্রমে ক্রমে এতদূর অধিক মাত্রায় উঠিয়াছিল যে, একবৎসর পূজায় বলিদানের সময় হরিনাথের জনৈক বন্ধু কর্ম্মকারের উপর অধিক মাত্রায় বীরত্ব প্রকাশ করায় কর্ম্মকার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতো বন্ধ হইবে না, হরিনাথ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা বলিদানের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। হরিনাথ ধরিলেন পাঁঠা, একজন ধরিলেন খাঁড়া কিন্তু কে কাহাকে ধরে? খাঁড়া হাত হইতে ভূমে পড়িল, পাঁঠাও ছুটিয়া পালাইল। সাম্‌নে একটা কুকুর দাঁড়াইয়াছিল, পাঁঠা ভ্রমে হরিনাথ তাহাকেই ধরিয়া হাঁড়ি কাঠে পুরিলেন। কুকুর প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। হরিনাথ সোমরস পানে উন্মত্ত। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি, সকলের সময় ভ্যা ভ্যা আর আমার সময় 'খেউ খেউ,' এই বলিয়া কুকুরকে তুলিয়া এক আছাড়। কুকুরতো প্রাণ ভয়ে পলায়ন করুক। এইরূপে সে বৎসর বলিদান ব্যাপার সম্পন্ন হইল, কিন্তু এই ব্যাপারে পাড়া প্রতিবেশী মর্ম্মাহত হইলেন। হরিনাথের স্ত্রী গললগ্নীবাসে মহামায়ার নিকট ভূমিষ্ঠা হইয়া হত্যা দিলেন। স্বামীর এই ব্যাপারের জন্য মহামায়ার নিকট সজল নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, পাড়ার দুই একটি মাতব্বর লোক হরিনাথের বাড়ীতে আসিলেন। হরিনাথকে দুই কথা বুঝাইয়া বলিলেন, হরিনাথ অবনত মস্তকে সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন নাই। উত্তর করিলেন "আপনারা আমায় চিনিবেন না, যদি চেনেন তবে বড় দিব্বি।" ইহার পর হইতে আর কেহ হরিনাথের বাড়ী পদার্পণ করেন নাই।

মানুষের অধঃপতন হইতে অধিক দিন লাগেনা। পর্ব্বতে উঠাই কঠিন, কিন্তু একবার পদস্খলিত হইলে অধঃপতন মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্ঘটিত হয়। হরিনাথের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বলিদানের ব্যাপার ক্রমে লোক পরম্পরায় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে একথা প্রচার হইয়া পড়িল। প্রায় সকলেই হরিনাথের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। কেবল মাত্র দুই একটি বনিয়াদি শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। কারণ বনিয়াদি ঘরের নিয়ম যে পিতৃ পিতামহ হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে হঠাৎ তাঁহারা তাহার একটা পরিবর্ত্তন করিতে চান না।

হরিনাথ ক্রমে ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রাণের বন্ধু, অর্থের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। তাহারাই হরিনাথের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। হরিনাথের স্ত্রী অবসর পাইলেই অতি করুণভাবে হরিনাথকে নানা রূপ বুঝান, পা ধরিয়া কাঁদেন, আর বলেন, "আমি এত বড়লোকের পুত্রের বৌ, আমার শ্বশুরের এত নাম, আজ সে নাম একেবারে ডুবিয়া গেল" এই সমস্ত আক্ষেপে হরিনাথের কঠিন হৃদয় যে দ্রব হইত না, একথা বলিতে পারি না। কারণ, সাধ্বী সতী স্ত্রীর আকর্ষণে স্বামীর যদি ক্ষণমাত্র পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত জগতে সতীমাহাত্ম্য থাকিত না। স্ত্রীর আক্ষেপে ও উপদেশে হরিনাথের যে পশু-প্রকৃতি তাঁহার দেব প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহা অপসারিত হইত, কিন্তু কুসংসর্গের কি মহিয়সী শক্তি, যেই হরিনাথ বৈঠকখানায় আসিয়াছেন, আর জানিনা কি যাদুবলে তাঁহার সমস্ত দেবভাব কোথায় চলিয়া যাইত। তখন তিনি যে হরিনাথ সেই হরিনাথ। হরিনাথ যদি এক পা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন ত তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দশ পা পিছনের দিকে টানেন সুতরাং হরিনাথ পিছনের দিকেই অধিক হাঁটিতে লাগিলেন। হরিনাথ এখন অভাব সাগরে ভাসিতেছেন। হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, বিবেকের হিতবাণি আর সে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় না। এখন তিনি অর্থের জন্য যে কোন কার্য্য করিতে পারেন। তিনি এখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য।

যে বৎসর কালীপূজার সময় বলিদানের ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয় তাহার পরবৎসর দুর্গা পূজার সময় অর্থের জ্বালায় এক অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হরিনাথ মনে মনে মতলব আঁটিলেন, এবার পূজায় এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাড়ী যাইব। বেটাতো সহজে আমার অভাব মোচন করিবে না, এক ফন্দি করিয়া কিছু হাতাইতে হইবে। এই রূপ মনে করিয়া সেবার পূজার সময় জনৈক বনিয়াদি শিষ্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্যও তাঁহাকে উৎসবের সময় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং সমাদর করিলেন। ক্রমে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী কাটিয়া গেল, হরিনাথ যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন সফল হইল না। হরিনাথের ক্রমে ভাবনা বাড়িতে লাগিল। নবমীর দিন প্রাতে শিষ্যের একমাত্র শৈশব পুত্রের উপর হরিনাথের নজর পড়িল। হরিনাথ দেখিলেন ছেলেটীর গায়ে প্রায় সহস্রাধিক টাকার গহনা রহিয়াছে। সেইগুলির উপর হরিনাথের লোভ পড়িল, তিনি সমস্ত দিন অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বৈকাল বেলায় দেখিলেন একটী অল্পবয়স্কা বালিকা ছেলে-টীকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। হরিনাথ তাহার কোল হইতে ছেলেটীকে নিজের কোলে লইলেন এবং এদিক ওদিক করিতে করিতে এক নিভৃতস্থানে লইয়া গেলেন এবং যে সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলা সহজ সাধ্য সেইগুলি খুলিয়া লইয়া নিভৃতস্থানে রাখিলেন এবং ছেলেটীকে লইয়া গিয়া শিষ্যের জনৈক চাকরের কোলে দিলেন। চাকর গোলমালে অত বুঝিতে পারিল না। হরিনাথ ইত্যবসরে শশব্যস্তে শিষ্যের নিকট উপ-স্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন আমাদের গ্রামের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার এইমাত্র সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, গতকল্য রাত্রে আমার স্ত্রীর কলেরা হইয়াছে জীবন সঙ্কটাপন্ন।" শিষ্য পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন দশ টাকার

তিনখানি নোট রহিয়াছে তাহাই হরিনাথকে দিলেন। হরিনাথ নিভৃতস্থান হইতে গহনাগুলি লইয়া চম্পট দিলেন। ইহার একঘণ্টা পরেই গহনার খোঁজ পড়িল। সকলেই চাকরটীর উপর সন্দেহ করিল। এবং চাকরটীকে একটী ঘরে আটকাইয়া রাখা হইল। এদিকে হরিনাথ যখন শিষ্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বহির্গত হন তখন দিনমণি পাটে বসিয়াছেন। সম্মুখে এক দীর্ঘ প্রান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে। হরিনাথ ক্রমে প্রান্তরের উপান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতি দেবী যেন হরিনাথের এই পাপদৃশ্য স্থাবর জঙ্গম সকলকে দেখাইবার জন্য অসংখ্য দীপমালা জ্বালিয়া ফেলিলেন। হরিনাথ মনের আনন্দে চলিয়াছেন। মূর্খ হরিনাথ! ইহসংসারে ধর্ম্মপথে থাকিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জনের ধন লোকে ষোল আনা ভোগ করিতে পারে না আর তুমি এই চুরীর ধন ভোগ করিবে, কি তোমার দুরাশা! হরিনাথ ক্রমে মাঠের শেষ ভাগে আসিয়া পড়িলেন। সম্মুখে এক নদী পার হইতে হইবে। নদীতীরে বিস্তৃত শ্মশান। হরিনাথ সেই বৃক্ষমূলে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার দুইপার্শ্বে যমদূতাকৃতি দুই দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিয়াইতো হরিনাথের নাভিশ্বাস উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন অপর জনকে বলিল, "বেটার কাছে একটা পুঁটুলি দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে, কিছু মালপত্র আছে। কিন্তু বেটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। সাবাড় করে ফেলতে হবে। তুই বেটাকে সামলে রাখ, আমি শ্মশান থেকে একটা বাঁশ তুলে আনি।" এই বলিয়া দ্রুতগতিতে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল। যেমন একটী বাঁশে হাত দেওয়া অমনি এক বিষধর সর্প বাঁশের ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া ডাকাইতের হাতের সহিত বাঁশের সহিত জোরে জড়াইয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া রহিল। ডাকাত মহাশয়ের তো নড়ন চড়ন রহিত। একদিকে হরিনাথ আসন্ন মৃত্যুবুঝিতে পারিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন কিন্তু কে কার কান্না শোনে। এইরূপে ক্রমে ৪।৫ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় ডাকাইত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল; সে পরিশেষে হরিনাথকে সেই বৃক্ষমূলে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়া সঙ্গীর অনুসন্ধানে চলিল। শ্মশানে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতো একেবারে আক্কেল গুড়ুম। দিশিহারা হইয়া সর্পটীকে মারিয়া বন্ধুকে উদ্ধার মানসে যেমন আর একটী বাঁশে হাত অমনি ছিদ্র হইতে এক কৃষ্ণ সর্প বাহির হইয়া হাতে বাঁশে আচ্ছা করে বাঁধিয়া ফেলিল। দুই মহাপ্রভু তো নাগপাশ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ওদিকে হরিনাথ বৃক্ষমূলে আবদ্ধ। রজনীদেবী এই সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য যেন শীঘ্র শীঘ্র পোহাইয়া গেলেন প্রত্যূষে নদীবক্ষে একখানি নৌকা ঝপ্ ঝপ্ করিয়া বাহিয়া যাইতেছিল। মাঝিরা নদীকূলের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইল। নৌকা থামাইল একজন মাঝি শশব্যস্তে ডাকিতে লাগিল দারোগা বাবু শীঘ্র বাহিরে আসুন, দুটা লোক শ্মশানে অমন করে দাঁড়ায়ে আছে কেন?

দারোগা বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়াতো স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কৌতূহল বশতঃ দু চারিজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া তীরে নামিলেন, তিনি ডাকাইত দুজনের সমীপবর্ত্তী হইলে সর্প দুইটী দুইজনকে বন্ধনমুক্ত করিয়া চল্ চল্ করিয়া চলিয়া গেল। লোক

দুইটীর আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া দারোগা বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলেন। ডাকাইত মহাশয়-দিগের নিকট ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় তাহারা প্রথমতঃ সমস্ত গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ধনঞ্জয় শর্ম্মার চোটে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া পড়িতে হইল। আগাগোড়া হুড়হুড় করিয়া বলিয়া ফেলিল। তখন দারোগা বাবু অনুচরবর্গ লইয়া হরিনাথের উদ্ধারসাধন করিলেন। এবং বমাল শুদ্ধ তিন মহাপ্রভুকে নৌকার উপর লইয়া গেলেন। হরিনাথকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে আঁা আঁা করিতেছিলেন। তারপর বেগতিক দেখিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিতে হইল। দারোগা বাবু হরিনাথের শিষ্যের বাসগ্রাম যে থানার এলাকাধীন সেই থানায় মালপত্রসহ হরিনাথকে চালান দিলেন। এই ঘটনায় একমাসপূর্ব্বে ইহারই সমীপবর্ত্তী একখানি গ্রামে এক ধনাঢ্যের বাড়ী ভয়ানক ডাকাতি হইয়াছিল। তাহার তদন্তের ভার দারোগা বাবুর উপর ছিল। তিনি এক্ষণে এই দুই জন ডাকাত মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন তাহারা উক্ত দলের সহিত ছিল এই দুই জনের সাহায্যে দারোগা বাবু সমস্ত ডাকাতের দল ধরিয়া ফেলিলেন। ওদিকে হরিনাথের ব্যাপার লইয়া থানায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে থানার দারোগা বাবু হরিনাথের শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অলঙ্কারগুলি তাঁহার পুত্রের বলিয়া শিষ্যটী স্বীকার করিলেন। দারোগা বাবুকে ব্যাপারটী চাপা দিবার জন্য শিষ্য অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইল। শিষ্য হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। হরিনাথ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। শিষ্য বলিলেন, "তোমার টাকার দরকার হইয়াছিল আমাকে জানালেই হইত। এরূপ কার্য্য করিয়া সকলেরই মুখ হাসাইলে। যাহা হউক ২০০৲ টাকা দিতেছি লইয়া রাত্র প্রভাতে ঘরে যাও। আর এরূপ প্রবৃত্তি যেন কখন না হয়।" হরিনাথ টাকা লইতে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যে কোথায় গেলেন কেহ সন্ধান বলিতে পারিল না। ইহার পর আর কেহ তাঁহাকে কখনও দেখিতে পায় নাই।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জনপ্রণালী।

—:*:—

জলে নীল গুলিয়া ঐ জলে এক টুকরা রেশম ও এক টুকরা কার্পাসের সূতা ডুবাইলে রেশমে নীল ধরিবে; কিন্তু কার্পাস সূতা কিছুমাত্র রং ধরিবে না। এই রূপ অনেক রং আছে যাহার কতক গুলি কার্পাস, ও কতক গুলি রেশম ও পশম রং করিবার উপযোগী।

ম্যাজেণ্টা ও আলিজারিন উভয়ই লাল রং। উহাদিগকে দুইটি ভিন্ন পাত্রে জলের সহিত গুলিয়া লইয়া তন্মধ্যে এক টুকরা করিয়া পশম ছোপাইলে দেখা যাইবে ম্যাজেণ্টার পাত্রে যে পশম টুকু ছোপান হয় উহা রক্তবর্ণ হইয়াছে কিন্তু আলিজারিনেও পাত্রের পশম ধূসর বর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কতক গুলি রঙ্গের মধ্যে কাপড় বা সূতা দিলে উহা সঙ্গে সঙ্গে ঐ রংএ রঞ্জিত হয়; আবার এমন কতকগুলি রং আছে তাহাতে কাপড় ছোপাইলে উহা সেই রং না হইয়া অন্য রং হইয়া যায়।

আলিজারিনের নিজ রং কাপড়ে ধরাইতে হইলে, প্রথমে কাপড়কে টার্টার ক্রমেটিক

ও আলুমিনিয়ম সালফেটের জলে ছোপাইয়া, পরে উহাকে আলিজারিনের পাত্রে ছোপাইতে হয়,—তাহা হইলে কাপড় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ অনেক রং আছে, যাহারা অন্য কোন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত বস্ত্রাদিতে নিজ নিজ বর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না।

হরিতকীর রস বা হিরাকসের জল ইহারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাপড়ের উপর কোন রং দিতে পারে না। এস্থলে প্রথমে কাপড়কে হরিতকীর জলে ছোপাইয়া পরে উহাকে হিরা-কসের জলে ছোপাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

উপরোক্ত উদাহরণ কয়েকটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে (১) বিভিন্ন প্রকার সূত্রের জন্য বিভিন্ন রং আবশ্যক; (২) কোন রং স্বাধীন ভাবে বস্ত্রাদিতে ধরে; (৩) আবার কোন কোন রং অন্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত নিজবর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না; (৪) এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে যাহারা নিজে কোন রং নয় কিন্তু অপর কোন পদার্থের সহযোগে বিশেষ বিশেষ রং উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এইরূপ নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রং ও রঞ্জন কার্য্যকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন :—

(১) স্বাধীন রং (direct dyes)—যাহারা অপর কোন রংএর সাহায্যের অপেক্ষা করে না যথা :—কঙ্গোরেড, কুসুম, হরিদ্রা প্রভৃতি।

(২) ক্ষার রং (Basic dyes) যে রং ধরাই-বার জন্য বিশেষ কোন ক্ষার মিশ্রিত জলের আবশ্যক হয় যথা :—ম্যাজেণ্টা, মিথিল, ব্লু, প্রভৃতি।

(৩ অম্ল রং (acid dye)—যে রং ধরাই-বার জন্য বিশেষ কোন ক্ষার মিশ্রিত জলের আব-শ্যক হয়, ইয়োসিন এ্যাসিড ম্যাজেণ্টা ইণ্ডিগো এক্‌ষ্ট্রাক্ট।

(৪) কষজ রং (mardant dyes) বর্ণহীন বা বিভিন্ন বর্ণের পদার্থের সংমিশ্রনের উৎপন্ন রং যথা :—লগউড্, লাক্ষা প্রভৃতি। এইগুলির প্রত্যেকটীর বিভিন্নরূপে আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু তাহা না করিলে রঞ্জন সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধাতু উদ্ভিদ পাথুরে কয়লা প্রভৃতি হইতে অসংখ্য রং উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রত্যেকটির ব্যবস্থার প্রণালী স্বতন্ত্র। রঞ্জন ক্রিয়া সম্বন্ধে ইংরাজি বহুতর গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এ বিষয়ে আগ্রহশীল লোকদিগের ঐ গ্রন্থগুলির আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সূত্রের সহিত স্বাধীন রং (direct dyes) গুলির একটী স্বাভাবিক (রাসায়নিক) সংহতি আছে। রং মিশ্রিত জল ফুটাইয়া,—তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া, উহাতে কাপড় ছোপাইয়া লইলেই উহা রঞ্জিত হয়। কিন্তু অন্য রং গুলির কাপড়ের সহিত কোন সংহতি নাই। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাকে লোকে সাধারণত কষ বলিয়া থাকে। কাপড়ের সহিত ইহাদের যেরূপ সংহতি বা আকর্ষণ, রংয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এইজন্য প্রথমে কাপড়কে কোন বিশেষ কষের মধ্যে ছোপাইয়া লইতে হয়। কাপড়ের উপর কষ লাগিয়া গেলে তাহার পরে, ঐ কষের সহিত যে রংয়ের আকর্ষন আছে, তাহার মধ্যে কাপড় পুনরায় ছোপাইলে উহা ইচ্ছামত রঞ্জিত হইবে। বস্ত্রাদি রং করিবার ইহাই সাধারণ নিয়ম।

অনেক সময় দেখা যায় কাপড় ঠিক এক

প্রকার সূত্রের দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই উহাতে হয়ত কতক রেশমই কতক পশম, বা কতক কার্পাস ও কতক রেশম অথবা কতক পশম এবং কতক কার্পাস। হয়ত টানা এক প্রকার সূত্রের, ভরণ অন্য প্রকার সূত্রের; অথবা উপরের অংশ ও নীচের অংশ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের দ্বারা বয়িত। এরূপ মিশ্রিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদি রং করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। এক্ষণে অতি সাবধানে রং বিশেষণ করা আবশ্যক। মনে কর রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত এক খানি বস্ত্র লাল রং করিতে হইবে। আমাদিগকে এরূপ একটী রং বাছিয়া লইতে হইবে যাহা রেশম ও কার্পাস উভয়কেই ঠিক একরূপে রঞ্জিত করিতে পারে। ডায়ামাইন স্কারলেট বি (Diamine scarlet B) নামক একটী রং আছে, তাহা এই উদ্দেশ্য সফল করে। আধ পোয়া সাবান, এক পোয়া সোডা সালফেট ও এক ছটাক উপরোক্ত রং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে কাপড়খানি দিয়া ফুটাইয়া লইলেই উহা লালবর্ণ হয়। যদি ঐরূপ একটী কোন বিশেষ রং (যাহা রেশম ও কার্পাস উভয়েরই উপযোগী) না পাওয়া যায় তবে কাপড় খানির রেশম ও কার্পাসকে দুইবারে দুই পৃথক প্রক্রিয়া দ্বারা রং করিতে হইবে। অ্যাসিড ম্যাজেণ্টা সোডা সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জল মধ্যে কাপড়খানি ছোপাইয়া ফুটাইলে কাপড়ের কেবল রেশম অংশ টুকু রঞ্জিত হইবে; অবশিষ্ট কার্পাস অংশ এই প্রক্রিয়ায় রঞ্জিত হয় না। রেশম অংশ রঙ্গিন হইলে পর কাপড়খানিকে ট্যানিক ও টার্টারিক অ্যাসিড এবং টার্টার এমেটিকের জলে ছোপাইতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস অংশও রেশমঅংশের মত রঞ্জিত হইবে। এইরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিশ্রিত সূত্রোৎপন্ন বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়।

নানাবিধ রঞ্জন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং বিষয়টীও অতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও ইহার অনেক অত্যাবশ্যক অংশ বাদ দিতে হয়। একে পত্রিকায় আমাদের স্থান অতি অল্প, তাহাতে আবার বর্ষ শেষ, কাজেই প্রবন্ধটির এইখানেই সমাপ্তি আনিতে হইল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রবন্ধ আমাদের প্রবন্ধের অবলম্বন। সেই সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত দ্রব্যাদির ব্যবহারের উল্লেখ আছে তাহাদের নাম আমাদের কানে বড় একটা শ্রুতি মধুর বলিয়া বোধ হয় না; পাঠকগণের অনেকে ইহার মধ্যেই হয়ত ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং উপরে অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র রঞ্জনকার্য্যের মূল প্রণালীমাত্র বর্ণনা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিলাম।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

"আমাদের দেশে বৎসর বৎসর কত মাছ যে নষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে যত কেন মাছ আমদানী হউক না, প্রায় কাটিয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষ মধ্যে কলিকাতার ন্যায় সহর কয়টি আছে। যে সকল স্থানে অধিক মাছ ধরা পড়ে, সে সকল স্থান হইতে মাছ সহরে আমদানী করা সকল সময়ে বা কখনই সুবিধা হয় না, কাজেই এক এক

সময়ে শত শত মণ মাছ খরিদ্দার অভাবে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। টাট্‌কা মাছ বিক্রয় না হইলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ইলিশ মাছ "লোণা" করিয়া রাখিবার প্রণালী এবং অপর দুই একটা মাছ শুট্‌কী করিয়া রাখিবার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দুইটি প্রণালীর কোনটিই অধিক প্রচারিত নহে, এবং শুটকী মাছ বা লোণা মাছ অনেকেই খান না এবং পছন্দ করেন না, এবং বিদেশে রপ্তানী হইবার উপযুক্তও নহে। বিলাত, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অনেক মাছ এইরূপ প্রকারে রাখা হইয়া থাকে যে, তাহা অনেক দিন থাকিলে পচিয়া বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হইতে পারে না। যে প্রণালী মতে তাহারা মাছ রাখে তাহা অতি সামান্য, অল্প আয়াসেই আমরা সেইরূপ প্রকারে মাছ রাখিতে পারি, অথবা অবস্থাভেদে সেই সকল প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইলেও করা কঠিন নহে। বিলাতে স্যামন নামক এক প্রকার সুস্বাদু মাছ বাক্স বন্দী করিয়া রাখা হয়। স্যামন মাছ দেখিতে আমাদের দেশের বড় রুই মাছের মত। তাহারা প্রথমে মাছের মাথাটা কাটিয়া ফেলে, পরে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া আধসের আন্দাজ এক এক খণ্ড টিন পাত্রে পূর্ণ করে, তৎপরে পাত্রের খোলা মুখটি বন্ধ করিয়া "ঝালিয়া" দেওয়া হয়। তৎপরে ৫ ফুট প্রশস্ত ও ৪ ফুট উচ্চ পাত্রে রাখিয়া তাহাদিগকে "বয়লারের" মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া এক ঘণ্টাকাল উষ্ণ বাষ্পের সংযোগে রাখা হয়। পরে বাহির করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। পাত্রের ঢাকনির মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র রাখা হয়, যে ছিদ্র এপর্যন্ত ঝালিয়া বন্ধ করা থাকে। পাত্র গুলি ঠাণ্ডা হইলে লোহা গরম করিয়া, সেই ছিদ্রের ঢাকনিটি খুলিয়া দেওয়া হয়, পাত্রের মধ্যে যে বায়ু ও অন্যান্য বাষ্প থাকে তাহা এই ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। পাত্রগুলির ছিদ্র সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া লুণ গোলা ফুটন্ত জলে দুই ঘণ্টাকাল ফেলিয়া রাখা হইয়া থাকে। পরে সেই জল শুদ্ধ তাহাদিগকে ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ প্রকার প্রণালী মতে স্যামন মাছ রাখিলে তাহা আর সহজে নষ্ট হয় না। বিলাত, ইউরোপ, আমিরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ মাছের যথেষ্ট কাট্‌তি, এমন কি এদেশেও টিনেপোরা স্যামন আমদানি হইয়া থাকে, এবং ইংরেজ ব্যতীত আমাদের দেশে অনেক লোক তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ফরাসী দেশের দক্ষিণ উপকূলে সার্ডিন নামক এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়; ইহা দেখিতে আমাদের দেশের ছোট বাটা মাছের মত। সার্ডিন রাখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। একটা তামার পাত্রে তেল ফুটিতে থাকে; সার্ডিন মাছ বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া একটা চালুনিতে রাখিয়া সেই ফুটন্ত তেলে এক মিনিট কি দুই মিনিট ডুবাইয়া ধরিতে হয়। তাহার পর তেল হইতে তুলিয়া ধরিলে বাড়তি তেলটা চালুনি দিয়া গলিয়া পড়ে। তৎপরে ছোট টিনের বাক্সের মধ্যে যতগুলি মাছ ধরে ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিয়া ঠাণ্ডা পরিষ্কার তেল দিয়া বাক্সপূর্ণ করিয়া ঢাকনিটা বাক্সের মুখে ঝালিয়া দেওয়া হয়। ফরাসীরা ইহার জন্য জলপাই তেল ব্যবহার করে। তামার পাত্রে যে তেল ফুটিতে থাকে, তাহাতে মাছের তেল মিশিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া পড়ে; সেই জন্য তাহা শীঘ্র শীঘ্র বদলাইয়া দেওয়া হয়। একা বিলাতেই বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ টিনে-পোরা সার্ডিন মাছ ফরাসী দেশ হইতে আমদানী হইয়া

থাকে, ভারতবর্ষেও এই মাছের আমদানী আছে। ছোট চিংড়ি মাছ রাখিবার প্রণালী আরও স্বতন্ত্র ও সহজ। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া চিঙ্গড়ি মাছ জলে ফুটিতে থাকে ও সেই জলে মাঝে মাঝে অল্পপরিমাণ লুণ যোগ করিতে হয়। জল হইতে চিঙ্গড়ী মাছ তুলিয়া মাটীর উপর বিছাইয়া শুকাইতে দিতে হয় এবং শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে উল্‌টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তিন চারি দিন মধ্যে মাছ শুকাইয়া যায়। সেই সময়ে হাত অথবা পা দিয়া ঘসিলে খোলা পৃথক হইয়া পড়ে। খোলাগুলিকে উড়াইয়া দিয়া মাছ ব্যাগ বা থলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইলিশমাছ মধ্যে মধ্যে যেরূপ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা নষ্ট হইতে না দিয়া যদি স্যামন মাছের মত "রাখা" হয়, তাহা হইলে যে সময়ে মাছ দুর্ম্মূল্য হয়, তখন বেচিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত বিলাত প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিয়া দেখা উচিত, বিদেশে ইহার কাট্‌তি হয় কি না। ইলিশ মাছ যেরূপ সুস্বাদু, তাহাতে বিদেশে ইহার আদর হইবার খুব সম্ভব। বিদেশে ইহার আদর হইলে ইলিস মাছ "রাখার" ব্যবসা ক্রমে এক বৃহৎ ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভব।

আমরা বিবেচনা করি ইলিশ মৎস্যের ন্যায় তপস্বী মৎস্যও (Mangofish) উল্লিতরূপ "রক্ষা" করিয়া বিলাত ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিলে লাভ হইবার খুব সম্ভাবনা তপস্বী মৎস্য সাহেবদিগের বড়ই আদরের জিনিস। কলিকাতা নিবাসী জেলেগণ এই মাছ "ফেরি" করিয়া সাহেব মহলে প্রায় পনের আনা বিক্রয় করে, অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে তাহাও বাজারে বিক্রয় করে। তপস্বী মৎস্য বারমাস পাওয়া যায় না, জেলেগণ চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে ধরিয়া থাকে। এই কয়েক মাস তপস্বী মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা জেলেদিগের একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়, ইহার এক এক শত মাছ (ডিমওয়ালা) পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা দরে বিক্রয় হয়।

গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে জেলেগণ বারমাসই মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং এই মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় দ্বারা ইহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করে। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, গোয়ালন্দের নীচে পদ্মানদে বর্ষাকালে যে সকল ধীবরগণ মৎস্য ধরিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সময়ে এক এক দিনে পাঁচ ছয় শত টাকা লাভ করে। আমরা বিবেচনা করি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যদি এই মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্প দিনে খুব লাভবান হইতে পারিবেন। যাহাহউক, মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় নানাপ্রকার, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তারিতরূপে লেখা এক রকম অসম্ভব। যাঁহারা মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে জেলেদিগের সহিত যোগদান করিয়া অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

—:০:—

অর্জ্জুন—কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করিব ?

ভগবান—সকাম ব্যক্তিদিগের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড। যাহাদের ভোগেচ্ছা আছে তাহারা ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি রাখিতে পারে না এজন্য

বেদবিধি মত তাহারা স্বেচ্ছাচরী এবং আত্মন্ন না হইয়া অশ্বমেধাদি কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হইতে পারে এইজন্য তাহাদের প্রতি সকাম কর্ম্মের বিধি। যে যেমন কামনা করে কর্ম্মকাণ্ডে কামনা সিদ্ধির জন্য সেইরূপ উপদেশ আছে। সকাম কর্ম্মেই সংসারে জড়িত হইতে হয় তুমি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। ভোগেচ্ছাশূন্য কর্ম্মই নিষ্কাম।

অর্জ্জুন—শীতোষ্ণ নিবারণের জন্য বস্ত্র গৃহাদি আবশ্যক এ সমস্ত ত ভোগ তবে ভোগেচ্ছা যাইবে কিরূপে?

ভগবান—শীত' উষ্ণ মান অপমান সুখ দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর।

অর্জ্জুন—ঐ সমস্ত অসহ্য দুঃখ কিরূপে অভ্যাস হইবে?

ভগবান—সত্ত্বগুণে থাকিলে লোকে ধৈর্য্যশীল হয় রজ তমোগুণ পরাস্ত করিয়া সর্ব্বদা সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে। কোন যন্ত্রণাদ্বারা অভিভূত হইবে না। রজ ও তমোগুণে চিত্ত বহির্ম্মুখ হয় কিন্তু সত্ত্বগুণে চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইয়া আনন্দে মগ্ন থাকে সুখ ও দুঃখ দেখিবার অবসর থাকে না।

অর্জ্জুন—ক্ষুধা তৃষ্ণা ত আছে? কিরূপে সত্ত্বগুণে থাকিব? ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য যাহা নাই তাহার লাভের চেষ্টা ত করিতে হইবে নতুবা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব? সে জন্যও ত উপার্জ্জন ও রক্ষা চাই?

ভগবান—তুমি উপার্জ্জন ও রক্ষা দুই ত্যাগ কর। আত্মবান হও।

অর্জ্জুন—আত্মবান কি?

ভগবান—আমার ঈশ্বর আছেন তিনিই আমার যোগ ক্ষেম বহন করিবেন এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া তাহার ভাবনা কর এবং তাঁহার সন্তোষার্থ তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—সকাম কর্ম্ম করিয়া ফললাভ করিতে আনন্দ আছে কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া কি আনন্দ পাওয়া যায়?

ভগবন—নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সমস্ত প্রকার আনন্দই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হও। একলাভে তোমার সমস্ত লাভ হইবে। কিন্তু তুমি এখনও তোমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই এজন্য কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন—যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে চলিবে?

ভগবান—না ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ফলে যাহাতে জন্মিতে পারে এরূপ তৃষ্ণাও ত্যাগ কর। যদি ফল না পাইলাম তবে দুঃখ করিয়া কর্ম্ম কেন করিব এ ভাবিয়া কর্ম্মত্যাগ করিও না।

অর্জ্জুন—ভবিষ্যতের ফলাকাঙ্ক্ষা ত দূরের কথা উপস্থিত সুখ না পাইলে কর্ম্ম ভাল লাগে না এবং অনিচ্ছা সত্বে কর্ম্ম করা অতিশয় ক্লেশকর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা যায় না তুমি বল 'করিয়া চল' যাহাতে পারি তাহাই বল।

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি আমায় ভালবাস। ভাল লাগুক বা না লাগুক সুখ পাও বা দুঃখ পাও কোন বিচার না করিয়া কেবল মনে রাখ আমি এই কার্য্য করিতে বলিতেছি ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া চল। পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ বলিয়াছি। এই সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান ভাব রাখিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। জ্ঞান-যোগের বিষয় আত্মবিচার তোমার চিত্ত অশুদ্ধ এখনও ইহা কোন আরাধ্য বস্তুতে একাগ্র হয় নাই। তোমার চিত্ত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ও মূঢ়াবস্থায়

নিতান্ত চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছে। এজন্য জ্ঞানে তোমার অধিকার নাই। তোমার কর্ম্মেই অধিকার। কিন্তু যদি লাভালাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম কর তবে তোমার চিত্ত কখন একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় পৌঁছিবে না। তোমার কর্ম্ম তখন তোমার বন্ধন মোচন না করিয়া সংসারে তোমায় আরও দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। এজন্য তোমার প্রিয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে এই ভাবিয়া কর্ম্ম কর। এরূপ অবস্থায় দেখ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে লক্ষ্য নাই বলিয়া চিত্ত চঞ্চল হইতেছেনা। যদি কোন লক্ষ্য রাখে তবে সে প্রিয়বস্তুর আজ্ঞা পালন করিতেছে ইহাই লক্ষ্য করিয়াছে। এই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যে সমান বুদ্ধি তাহাই যোগ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্‌, এ।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

—:০:—

ওয়াটার প্রুফ ক্যানভাস।—জিলেটিন ও ক্রোমঅ্যালাম সমান ভাগে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জলের সহিত মিশ্রিত কর। ক্রোম অ্যালাম শীতল জলের সহিত মিশ্রিত হয়, জিলেটিন হয় না। জিলেটিন জলের মধ্যে দিয়া জল গরম করিলে উহা গলিয়া যায়। মোটা কাপড় (ক্যানভাস) এর উপর জিলেটিনের এক পরদা সমানভাবে মাখাইয়া দাও। পরে ঐ ক্যানভাস ক্রোমঅ্যালামের জলে ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দাও। অবশেষে শুকাইয়া লইলেই উহা ওয়াটার প্রুফ হইল। অয়েল ক্লথ প্রস্তুত করিবার ইহাই সাধারণ নিয়ম।

মরিচা হইতে লৌহ রক্ষা।—১০ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া উহার মধ্যে লৌহকে কিছুক্ষণ রাখিয়া দেও, ইহাতে উহার উপরের তৈলাক্ত পদার্থ দুরীভূত হইবে। তাহার পরে পরিষ্কার জল ও সূক্ষ্ম কাঠের গুঁড়া দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তুঁতিয়ার জলে ঐ লৌহ কিছুক্ষণ রাখিয়া দেও।

অল্প সময়ের মধ্যে উহার বক্তাভ হইয়া আসিবে। তুঁতিয়া হইতে তুলিয়া উহাকে আবার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেল। পরে হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ও হাইপোসালফাইট অব সোডার মিশ্রণের মধ্যে লৌহখণ্ডকে কিছুক্ষণ রাখ। দেখিবে উহার উপরে শীঘ্র একটি গাঢ় নীল আবরণ আসিয়া পড়িতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে ঐ নীল আবরণ জমিলে লৌহকে ধৌত করিয়া রাখিয়া দেও। এখন আর উহাতে মরিচা ধরিবে না।

হিন্দু না আর্য্য?

—:*:—

"হিন্দু" এ শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্রই যেন আমরা আনন্দে আটখানা হইয়া যাই! "হিন্দু" শব্দটির মধ্যে বিশেষরূপে প্রবেশ না করিয়া, "হিন্দু" শব্দটির প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আজ আমরা আহ্লাদের সহিত আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকি! কিন্তু, বাস্তবিক "হিন্দু" শব্দটি আমাদের গৌরববাচক নহে। মুসলমান-গণ যে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারত-বাসীকে আয়ত্তীকৃত করেন; সেই সময়ে তাঁহারা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ছলে ভারতবর্ষের নাম "হিন্দু-

স্থান" এবং ভারতবাসীর নাম "হিন্দু" দিয়াছিলেন। এই "হিন্দু" শব্দটি পারস্য ভাষার। ইহার প্রকৃত অর্থ "কাফের" "কৃষ্ণবর্ণ" "বিধর্ম্মী" "পাতকী" ইত্যাদি। আমার মনে হয়,—মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাবকালে তাহাদের কঠোর শাসন ভয়ে ভীত হইয়াই তদানীন্তন ভারতবাসী লজ্জাজনক অপমানসূচক এই "হিন্দু" শব্দটিকে নিজেদের গৌরব-বাচক পদটী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই বাদর্থ "হিন্দু" শব্দটির অর্থবোধহীনতাপ্রযুক্ত আমরাও আজ তাহাকে সত্যসত্যই গৌরববাচক মনে করিয়া শত মুখে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকি। পরন্তু উক্ত "হিন্দু" শব্দটিকে গৌরব-বাচক মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় যদি কোন একজন পারস্যভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আমাদের অনভিজ্ঞতা দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন না। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, এক মেরুতন্ত্র ব্যাতিরেকে আমাদের উপনিষদ পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে কোথাও "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ নাই। কেবল ইংরেজী, পারস্য, হিন্দী ও অধুনাতন বাঙলা ভাষায় "হিন্দু" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুতন্ত্রে লিখিত আছে—"হীনং দূষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ"। বলাবাহুল্য এই মেরুতন্ত্র প্রাচীন শাস্ত্র নহে। ভারতবর্ষ যে সময়ে মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক "হিন্দুস্থান" আখ্যা ধারণ করে; তাহার অনেক কাল পরে "মেরুতন্ত্র" রচিত হইয়াছে। "হীনং দূষয়তে" ইত্যাদি "হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্তিটি মেরুতন্ত্র রচয়িতারই প্রথম কল্পনা প্রসূত। এবং রাজা সার রাধাকান্ত দেব মহাশয়ও এই মেরুতন্ত্রের দোহাই দিয়াই তাঁহার শব্দকল্পদ্রুম অভিধানস্থ সংস্কৃত শব্দাবলির পার্শ্বেই "হিন্দু" শব্দটির স্থান দিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহার স্থানে যাহার পরিবর্ত্তে "হিন্দু" শব্দের ব্যবহার করি; তাহার নাম "আর্য্য"। অনুসন্ধিৎসু পাঠক! বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ভারতবর্ষকে "হিন্দুস্থান" না বলিয়া "আর্য্যস্থান" বা "আর্য্যভূমি" বলাই শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। "হিন্দুধর্ম্ম" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক; "আর্য্যধর্ম্ম" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই শাস্ত্র সঙ্গত।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

বঙ্গে পঞ্জিকা বিভ্রাট।

——(*)——

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতবর কোড়াপত্মপুত্র বঙ্গপ্রদেশে প্রচলিত পঞ্জিকার দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া দৃষ্ট গ্রহানুসারে "পটবর্দ্ধনী" নামে একখানি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা প্রদেশে পণ্ডিতবর চন্দ্রশেখর সিংহ, হরিচন্দন মহাপাত্র, মান্দ্রাজে রঘুনাথ আচার্য্য, বঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত ও সুন্দরেশ্বর শ্রৌতী এবং কাশীতে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়গণ নিজ নিজ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়াদেখেন যে, বর্ত্তমান পঞ্জিকায় ভয়ানক ভুল দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহারা সময়ানুযায়ী গ্রহগণের অবস্থা স্থির করিয়া কেহ কেহ করণগ্রন্থ কেহ কেহ বা নূতন পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

উপরোক্ত কয়েকজন পণ্ডিতেরই জ্যোতিষ-

শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ভিন্ন সকলেই ইংরাজী জ্যোতিষশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী। পণ্ডিত-বর চন্দ্রশেখর উড়িষ্যা প্রদেশের মন্তপড়ার করদ রাজা মাননীয় সাধুচরণ মহাসিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য। তাঁহার বিদ্যাভিমান,যশোলিপ্সা বা জিগীষা কিছুই ছিল না। তিনি একজন পরম ভাগবত। জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধান এবং ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না, কেবল শাস্ত্রালোচনা ও নিজের অসাধারণ অধ্য-বসায় এবং দৃঢ় যত্নে স্বকৃত নলিকাদি যন্ত্রদ্বারা গ্রহদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদনুসারে "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" নামক একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

স্বর্গীয় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে পঞ্জিকা-সংশোধনের জন্য কলিকাতায় তিনবার সভা হয়, এবং সভার অনুমতিক্রমে ৺মাধবচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" নাম দিয়া ১২৯৭ সালে হইতে ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে গণনা করিয়া এক খানি বিশুদ্ধ পঞ্জিকা বাহির করেন। উক্ত পঞ্জিকাখানি এখনও প্রচলিত আছে। পঞ্জিকা যদিও নির্ভুল বটে তত্রাচ এখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই; কিন্তু প্রচলিত সমস্ত পঞ্জিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বিগত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকামঠের অধীশ্বর জগদ্গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য মহাশয় দেশের কল্যা-নের জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের নানাদেশ হইতে ১৫১ জন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষবেত্তাও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বোম্বাই সহরে পঞ্জিকাশোধন জন্য একটী বৃহৎ সভা করেন। ঐ সভায় বঙ্গদেশের নয় জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রায় দশদিন ব্যাপী তুমুল আলোচনায় স্থির হইল যে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি ভ্রমপূর্ণ থাকার জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত পণ্ড হইতেছে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়াছে, অতএব সভার অনু-মোদিত ও গৃহিত মতানুসারে সর্ব্বত্রের পঞ্জিকা-কারগণ তাঁহাদের পঞ্জিকা সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া প্রকাশ করিবেন। দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত কেহই তাহা করেন নাই। আগেকার "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাই" সূক্ষ্মরূপে গণিত হইয়া প্রকাশিত হই-তেছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "সরল ফলিত পঞ্জিকা" নাম দিয়া ১৩১২ সাল হইতে একখানি সূক্ষ্মরূপে গণিত পঞ্জিকা বাহির করিতেছেন। সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ন্যায় সরল-ফলিত পঞ্জিকাও ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে গণিত সুতরাং অভ্রান্ত। পূর্ব্বকালের প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ সারণী হইতে গণনা অপেক্ষা ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে পঞ্জিকার গণনা সহজ ও অভ্রান্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের এখনও এবিষয়ে দৃষ্টিপাত হয় নাই। নাবিক পঞ্জিকা প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ভূকেন্দ্রিক গ্রহস্ফুট বাহির করা অতি সহজ এবং যখন তদ্দ্বারা গণনা অভ্রান্ত হইয়া থাকে তখন সকলেরই সেই মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পঞ্জিকাতে কয়েকটী নূতন বিষয় আছে; তন্মধ্যে আকাশতত্ত্ব অন্যতম। আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত নিয়মানুসারে বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পাদির গণনা যদি এই আকাশতত্ত্বে দেওয়া হয় তাহা হইলে ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রত্যহ কলিকাতায়

প্রাতঃকাল ৫।৫৪ সময়ের গ্রহস্ফুট দেওয়া আছে। এবং তৎসহ রবির ক্রান্তি (Declination) এবং রবি ও চন্দ্রের উদয়াস্তের সময় দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রত্যেক দিনের "কাল সমীকরণ" (Equation of time) প্রদত্ত না হওয়ায় সাধারণের পক্ষে যথার্থ উদয়াস্ত নির্ণয় করা কঠিন হইবে। আশা করা যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগামী বৎসর এইরূপ কয়েকটী ত্রুটীর সংশোধন করিবেন। বঙ্গদেশে এরূপ নির্ভুল পঞ্জিকার প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক, এবং শশীবাবু যে স্বদেশের এক মহদুপকার সাধনে উদ্যোগী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

সায়ন্ত-চিকিৎসা।

চতুর্থ অধ্যায়।

নানাপ্রকার আগন্তশোথের চিকিৎসা।

—(*)—

নানা কারণে নর-নারী শরীরে বিবিধ প্রকার আগন্তশোথ জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ কারণজাত শোথের চিকিৎসা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যে প্রকার শোথে যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায় তাহা কথিত হইতেছে।

শরীরের স্থান বিশেষে প্রবল আঘাত লাগিলে যে বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে তাহাকে অভিঘাতজ শোথ বলে। নিম্নলিখিত প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অভিঘাতজ শোথ প্রশমিত হয়।

১

কাঠের কয়লার আগুনে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া লইবে। যে পরিমিত তাপে পোড়াইলে তেঁতুলের মধ্যের শাঁস বা মজ্জা তরল হয়, সেই পরিমাণের তাপে পোড়াইতে হইবে। তারপর বীজ ও খোসা বাদ দিয়া মজ্জা বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণের গুঁড়া মিশাইয়া একটু গরম করিয়া শোথের উপর প্রলেপ দিবে। পুনঃ পুনঃ এই প্রলেপ লাগাইলে অতি সত্বর ফুলা ও বেদনা ভাল হইয়া যায়।

২

টাট্‌কা লেওয়া চূণ ও কাঁচা হলুদের রস সমান পরিমাণে লইয়া একত্র মিশাইবে। তারপর উহা একখানি মেটে পাত্রে রাখিয়া গরম করিতে হইবে। অল্প অল্প গরম থাকিতে অভিঘাতজ শোথের উপর প্রলেপ দিলে ফুলা ও বেদনা শীঘ্রই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

যদি কাঁচা হলুদ না পাওয়া যায় তাহা হইলে শুক্‌না হলুদের গুঁড়া ও লেওয়া চূণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

৩

উত্তমরূপে রশুনের খোসা ছাড়াইয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। অত্যন্ত বেদনাযুক্ত প্রবল অভিঘাতজ শোথের উপর উক্ত প্রলেপ লাগাইলে অচিরে উপকার লাভ করা যায়। এই প্রলেপ কদাচ কোমল অঙ্গে প্রয়োগ করিবে না।

৪

শজুনার ছাল, অল্প ভাজা কৃষ্ণজীরা এবং মেথী সমান পরিমাণে লইয়া জল দিয়া বাটিয়া লইবে। তারপর অল্প গরম করিয়া শোথের উপর পুনঃ পুনঃ লাগাইলে উপকার লাভ করা যায়।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

—:o:—

ক্ষতান্তক মলম ও তৈল—কবিরাজ শ্রীযুক্ত তড়িৎকুমার সেন গুপ্ত কাব্যবিনোদ কৃত। কবিরাজ মহাশয় ক্ষত চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয় ইঁহার চিকিৎসায় দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগ মুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ছোট আদালতের ক্লার্ক অব দি কোর্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেন, "আয়ুর্ব্বেদ মতে ক্ষত চিকিৎসা হয় এ বিশ্বাস আমার পূর্ব্বে ছিল না। আমার পারিবারিক চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে যে সকল দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয়।" কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা নিপুণতায় ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং, এল, এম, রক্ষিত এণ্ড কোং, গিরীশচন্দ্র বসাক এণ্ড কোং, মহানন্দ কেশবচন্দ্র দাস এণ্ড কোং প্রভৃতি কলিকাতাস্থ অনেক গণ্যমান্য মহোদয়গণের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পারিতোষিক বিতরণ।

গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দরজীপাড়াস্থিত গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বীণাপাণি হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে না এ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের মত উল্লেখ করিয়া মহারাজাধিরাজ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কুলের জনৈক সভ্য ডাক্তার ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায় মহামান্য গভর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে স্কুলটীর প্রায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। অত্র বিদ্যালয়ের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া স্কুলগৃহ প্রস্তুত কল্পে মহারাজাধিরাজ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালিকাদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে চারিটী রৌপ্য পদকের ব্যবস্থা আছে দেখিয়া স্বনামখ্যাত ডাক্তার এম্, কে, মল্লিক এবং ডাক্তার ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দুইখানি রৌপ্য পদক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য।

—:o:—

আর্য্যভূমির ১মবর্ষ শেষ হইল। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গ আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

আর্য্যভূমি।

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [বৈশাখ ১৩১৪ সাল]

প্রস্তাবনা।

" যস্মাদ্বৈজায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্মঃ
প্রবর্ত্ততে।
নমস্তুভ্যং পিতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ
নমোঽস্তুতে॥"

যাঁহা হইতে এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি, যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, হে ব্রহ্মরূপ সাক্ষাৎ জগৎপিতঃ, তোমার শ্রীপাদ পদ্মে অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক আজ আমরা এই শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম।

মানবগণের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি স্ব স্ব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। ধীশক্তি সম্পন্ন মানব মাত্রেই স্বীয় দুঃখ ও অবনতির জন্য দৈবের উপর, অদৃষ্টের উপর কিম্বা রাজার উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। কারণ তাঁহারা জানেন, নিজের সুখ, দুঃখ নিজের হস্তেই রহিয়াছে। তাঁহারা আত্ম শক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই শক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ও যত্ন নিয়োজিত করেন। সেই অমোঘ উদ্যম ও যত্নের নিকট সহস্র বাধা বিঘ্ন পরিপন্থীরূপে দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা উদ্যম হীন করিতে পারে না। ফলতঃ আত্মনির্ভর রীতিই, স্বাবলম্বনবৃত্তিই মানবগণকে উন্নতির সোপানে লইয়া যায়, উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত করে। ব্যক্তিগত জীবনে আত্মনির্ভর রীতি যেরূপ সুফল প্রদান করে, জাতিগত জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। ইতিহাস এবিষয়ের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমাদের আর্য্যভূমি ভারতভূমি আজ স্বাবলম্বন বৃত্তিহীনা তাই অবনতির পরাকাষ্ঠায় উপনীতা হইয়াছেন। উন্নতির পর অবনতি অবনতির পর উন্নতি জগৎ সংসারের নিয়ম। এমন কি কোন একটী জাতি অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আর্য্যভূমি সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উষার ক্ষীণালোক দেখা

দিয়াছে। এক দিন এই ক্ষীণরশ্মি দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া আর্য্যভূমির মুখোজ্জ্বল না করিবে কে বলিতে পারে।

"আর্য্যভূমিতে" বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিমাসে বাহির হইবে। ধর্ম্ম নীতি, সমাজনীতি সাহিত্য বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতমাতার প্রতি আমেরিকার পত্র।

——:o:——

প্রিয়তমা ভগিনি! বহুদিন পর্য্যন্ত তোমার আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায়, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার জন্য আশা করিয়া আছি, কিন্তু হায়! আমার সে আশা পূর্ণ করিবার কোন উপযুক্ত অবসর দেখিতে পাইতেছি না। পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ না ঘটিলে মনোগত অভিপ্রায় বলিবার ও শুনিবার সুযোগ ঘটে না। আমার যে সকল প্রিয় সন্তান কর্ম্মক্ষম, পণ্ডিত ও বহুদর্শী তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আমার মনোগত কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না, বিশেষতঃ মহাসমুদ্র পারে তোমার অবস্থিতি, সন্তানগণ সাহসী ও কুসংস্কার-বিহীন হইলেও তাহাদিগকে দূর-দেশে পাঠাইতে আমার ইচ্ছা করে না। কেন না পথে পদে পদে বিষম অনর্থ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, পাছে, তাহাদের কোন অমঙ্গল হয়, তাহাতে তুমিও বিরক্ত হইবে, আমিও মনে বড় বেদনা পাইব। এক্ষণে পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ সাহায্যে তোমার সংবাদ লইবার জন্য অধিক কষ্ট করিতে হইবে না জানি, কিন্তু তোমার যে সংবাদ পাইবার জন্য আমি আকাঙ্খা করি তাহা টেলিগ্রাফে হয় না বরং পোষ্ট আফিস দ্বারা কতক সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু পথে যেরূপ দৌরাত্ম্য তাহাতে সে আশা সফল হইবার পক্ষে সম্ভাবনা অল্প। যাহাই হউক আইস এক্ষণে আমার শক্তিতে যতদূর পারা যায় নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরে বলাবলি করিতে আরম্ভ করি। তোমার যে ২১টি সন্তান এখানে আসিয়াছিল আমি তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি; কিন্তু সে সুখ হরিষে বিষাদ মাত্র। তাহারা অদ্যাপি মানুষ হইতে পারে নাই। তোমার পূর্ব্বকার সন্তানগণ যেরূপ উপযুক্ত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহাদিগের বিশেষ করিয়া পরিচয় লইতে হয়। কারণ ইহাদের সে বেশ নাই সে ভাষা নাই সে আকার নাই, সে অসাধারণ শক্তি নাই। সুতরাং অনেক পরিশ্রমের পর জানা যায় যে তাহারা তোমার সন্তান বটে। কিন্তু হায়! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমার পূর্ব্বগৌরব, স্মৃতি পথে উদিত হইয়া মনে যে বেদনা হয় তাহা আর কি বলিব।

বারম্বার পর-পীড়ন সহ্য করিয়া গৃহ বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকর ফল-লাভ করিয়া আত্ম-কলহ যে কি ভীষণ কুফল উৎপাদন করে, তাহা কি তোমার সন্তানগণ বুঝিতে পারিয়াছে? নিজের দেশ নিজের স্বাধীনতা অপরকে দিলে যে সকল আশায় বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা কি জানিতে পারিয়াছে? বিজেতৃগণ শিরারোহণ পূর্ব্বক যে নানাবিধ কষ্ট প্রদান করে সে পীড়নের কঠোরতা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে? বিদ্যার সুমধুর আস্বাদ-লাভে সমর্থ হইয়া এক্ষণে কি তোমাকে সুখী করিবার জন্য তাহাদের কোন চেষ্টা আছে না মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছে? তাহাদিগের অভি-

আর কি কিছু অনুভব করিতে পারিতেছ? আমি মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে তাহারা এক্ষণে যে রাজার বশীভূত সেই রাজার ঔদার্য্য গুণে সন্তুষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্যতালাভ করিয়া তোমাকে কতক পরিমাণে সুখী করিতেছে। বিদ্যার গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কি বীরত্বের গৌরব করিয়া থাকে? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যেমন মনের বল বাড়িতেছে শারীরিক শক্তির উত্তেজনার পক্ষে তাহাদের সেইরূপ দৃষ্টি আছে কিনা? তাহারা পুস্তকে যাহা অধ্যয়ন করে, শিক্ষকের নিকট যে বিষয়ের উপদেশ পায়, কার্য্যে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে অদ্যাপি সমর্থ হইয়াছে কি না? অথবা শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাহাদের আন্তরিক অভিলাষ আছে কি না? তাহাদের জাতীয় গৌরব রক্ষার বিষয়ে ঊদাসীনতা না আগ্রহতা পরিলক্ষিত হয়? তাহারা যে শিক্ষা করে সে শিক্ষা আত্মোন্নতির না পরসেবার জন্য। কি মানসে তাহাদের শিশুগণ শিক্ষালয়ে প্রবেশ করে, কোন অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষাকাল অতিবাহিত করে? কোন্ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে পাঠাগার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহির্গত হয়? শ্যামলশস্যপূর্ণ তোমার দেহ কি তাহাদের মনোহরণ করে? তাহারা কি তোমার নাম তোমার গৌরব, তোমার [illegible] করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর? তাহাদিগের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তোমার মনে কি কোন আশার উদ্রেক হয়? না নিরাশা-নীরে হৃদয় নিমজ্জিত হইয়া মৃয়মাণ হও? এ সম্বন্ধে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কথা প্রসঙ্গে কখনও অবগত না হইলেও সংবাদ পত্রাদি পাঠে অনেক আভাস পাইয়াছি।

কিন্তু ভগিনী! তোমার সন্তানগণের রাজভক্তি সন্দর্শন করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। এমন রাজভক্ত সন্তান আর কোন দেশ প্রসব করিতে পারেন নাই।

তোমার দেশের শাস্ত্রকারগণ রাজভক্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শুনিলে প্রকৃত পক্ষেই পুলকিত হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—"ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য্য, অগ্নি, এবং কুবের এই অষ্ট দেবতার অংশে রাজা নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। দেবতার অংশে নির্ম্মিত বলিয়াই অন্য প্রাণী অপেক্ষা রাজাদিগের প্রভাব অধিক। রাজা বালক হইলেও মনুষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ভাবিতে হইবে"।

রাজার বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের এরূপ নির্দ্দেশ অযৌক্তিক নহে। দেখ ভগিনি! দেশে রাজা না থাকিলে, প্রজাগণ কখনই নিরাপদে থাকিতে পারিত না। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর সর্ব্বদা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত, কুলবালিকাদিগের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যাইত না, লোকের ধন প্রাণ দস্যুদিগের ক্রীড়া সামগ্রী হইত। যে রাজার প্রভাবে দস্যুগণ পরস্বাপহরণে সঙ্কুচিত হয়, দুর্বৃত্তগণ হিংসা হইতে বিরত হয়, বলবান দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে ভীত হয়, সেই রাজাকে দেবতা বলা যুক্তিসঙ্গত। রাজা দুষ্টের দমন না করিলে পৃথিবী অশান্তির বাসভূমি হইত।

রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, অপক্ষপাতে বিচার করিয়া ন্যায্য অধিকার হইতে প্রজাগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজাগণ লোকবিগর্হিত অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইলে

শাস্ত্রানুশীলনে স্ব স্ব জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, বাণিজ্যাদির দ্বারা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইতেছে, বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা অভিনব তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করিয়া দেশের এবং জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছে, এই সকল দেখিলে রাজা অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। অন্য দিকে যে রাজার প্রজা কষ্টে আছে, দারিদ্র্য দুঃখে নিপীড়িত, সাহিত্য বিজ্ঞানুশীলন দ্বারা উন্নতি করা দূরে থাকুক, উদরান্ন সংস্থানের জন্যই ব্যাকুল, সেই রাজা কখনই সুখী নহেন। তাঁহার মন সর্ব্বদাই কিসে প্রজার মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া আকুল হয়। সদাশয় মহাত্মা নরপতিগণ স্ব স্ব সুখ দুঃখকে সুখ দুঃখ বলিয়া ভাবেন না, প্রজার সুখ দুঃখকেই প্রকৃত সুখ দুঃখ মনে করেন।

প্রিয় ভগিনি! ধ্যানাসক্ত শমীক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলে ঋষিকুমার শৃঙ্গী মহারাজকে যে অভিসম্পাত প্রদান করেন তদুপলক্ষে ধর্ম্মপরায়ণ ঋষি প্রবর পুত্রকে রাজভক্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন বস্তুতঃ তাহা যে জগতের আদর্শ তৎপক্ষে অণুমাত্র সংশয় নাই। ঋষি বলিলেন "হে পুত্র! রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত, আমরা ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, আমরা যথা সুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না। হে বৎস! ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া থাকি, সুতরাং রাজা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ধর্ম্মের অংশ ভাগী। অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হয়। বৎস! দেশ অরাজক হইলে সর্ব্বদা দস্যু ভয় প্রভৃতি নানা দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজাই দণ্ডবিধান করিয়া শাসন করেন, যখন সকলেই রাজদণ্ডভয়ে সাতিশয় ভীত হয়, তখনই শান্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ বা যাগাদি ক্রিয়া করিতে পারে না, সুতরাং রাজা হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতেই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ভূপাল কর্ত্তৃক সমুদায় যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি হইতেই শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এবং শস্যাদি হইতে জনগণ জীবন ধারণ করে। রাজা রাজ্য রক্ষা করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের ধাতা, ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে রাজা দশ সংখ্যক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান মান্য। রাজাকে শাপ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

প্রিয় ভগিনি! সত্য পথে থাকিয়া যাহাতে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারা যায় প্রকৃতি পুঞ্জের তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। সকলেরই এক প্রমাদ হইয়া থাকে, রাজারও হইতে পারে।

পিতার কার্য্যে ভ্রম হইলে পুত্রের তাহা যেরূপে দেখাইয়া দেওয়া উচিত রাজার ভ্রম ও প্রজার সেইরূপ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। রাজাকে লোকের নিকট নিন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে, বা তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি কমাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোন দোষের কথা বলা অতীব গর্হিত। রাজার ভ্রমের কথা বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার সত্যাসত্যতার বিষয় সম্যক অবগত হইয়া, ভক্তি সাবধানে প্রকাশ্য করা কর্ত্তব্য।

যদি রাজা প্রকৃতপক্ষেই অত্যাচারী হন, প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজে ভোগ বিলাসে নাপৃক্ত থাকেন, তথাপি হঠাৎ রাজার

নিন্দা না করিয়া বা প্রতিকূলাচরণে সম্মত না করিয়া, বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে শত সহস্রবার তাঁহাদের ত্রুটি বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। রাজদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা একই কথা; কাহারও এ পাপে লিপ্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

জল।

করুণাময় পরমেশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ে কি অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে যতই পর্যালোচনা করা যায় ততই ক্রমশঃ তাঁহার অসীম দয়া ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিমোহিত হইয়া থাকিতে হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য যে দ্রব্যের যেরূপ প্রয়োজন তিনি সে দ্রব্যের সেরূপ যোজনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায় বায়ু, জল ও খাদ্য। তন্মধ্যে বায়ু সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, সে কারণ জগদীশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বায়ু সাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। জল আমাদের জীবন রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। বায়ু ব্যতীত এক মুহূর্ত জীবিত থাকা অসম্ভব বটে, কিন্তু জল ব্যতীত অধিক দিন জীবিত থাকাও সম্ভবপর নহে। জল জীব রক্ষার ঈদৃশ অন্যতম প্রধান সাধন বলিয়া পরম কারুণিক ভগবান এই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জলে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণী-জগতের পক্ষে জল যেরূপ প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদ জগতের পক্ষেও সেরূপ প্রয়োজনীয়। এই দুই জগতের অস্তিত্ব জলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। জল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে এরূপ একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুতরাং ইহার পরিমাণ যাহাতে একেবারে হ্রাস হইয়া না পড়ে তজ্জন্য যে সমস্ত নৈসর্গিক উপায়ের বিধান রহিয়াছে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে মহান্ মহেশ্বরের সৃষ্টি ও পালন বিষয়ে অনির্বচনীয় কৌশল অবগত হইয়া একেবারে আনন্দরসে পরিপ্লুত এবং ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইতে হয়। এই সকল বিষয় নিম্নে ক্রমশঃ সংক্ষেপ ও পরিস্ফুটভাবে বিবৃত করা যাইতেছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থল এবং দুই তৃতীয়াংশ জলে পরিপূর্ণ। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি একটি জীব দেহের ভার ১৫০ একশত পঞ্চাশ পাউণ্ড হয় তবে তাহার ১০০ একশত পাউণ্ড জল এবং পঞ্চাশ পাউণ্ড অপরাপর পদার্থ। উদ্ভিদের জলের পরিমাণও প্রায় এইরূপ আমরা বাজারে শাক সবজী বা অপরাপর তরকারী খরিদ করিয়া যে মূল্য দিয়া থাকি তাহার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জলের মূল্য।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রূঢ় ও যৌগিক। তাঁহারা বলেন এই পৃথিবীতে কতক গুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কোন বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহারা সেই সকল পদার্থকে রূঢ় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পুনরায় তাঁহারা বলেন যে জগতে এমন অনেক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং রাসায়নিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাঁহারা এই সমুদায় পদার্থকে যৌগিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এবং এই সকল

যৌগিক পদার্থ কোন্ কোন্ বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন তৎসমুদায় পৃথক করিবারও নানাপ্রকার উপায় স্থির করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে জল রূঢ় পদার্থ নহে। একটী যৌগিক পদার্থ।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা কল্পনা শক্তির বলে জলকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া স্থির করেন নাই। নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এ বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা রেশম জড়িত দুইটী সরু তাম্রের তারের এক এক মুখ এক এক খণ্ড প্লাটিনম্ সংলগ্ন করিয়া সলফিউরিক্ এসিড্ মিশ্রিত বিস্তৃত মুখ বিশিষ্ট একটী জলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করতঃ অপর অপর মুখ বুনসেন কিম্বা গ্রোভের তাড়িত ব্যাটারি-সংলগ্ন করিয়া দুইটী জলপূর্ণ কাচের নলের খোলা মুখ প্লাটিনম্ খণ্ডদ্বয়ের উপর যথাক্রমে বিপর্য্যস্ত করতঃ ধরিয়া রাখিয়া দেখিয়াছেন অল্পক্ষণ পরে কাচের নল দুইটীর মধ্যে বুদ্ বুদ্ উঠিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটী কাচের নল জল শূন্য হয় এবং অপরটি অর্দ্ধেক জল পূর্ণ থাকে। ইহার কারণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে যেমন কাচের নল দুইটীতে গ্যাস সঞ্চিত হইতে থাকে অমনি নল দুইটী জল শূন্য হইতে আরম্ভ করে; তাঁহারা তৎপরে উক্ত কাচের নল দুইটীর খোলামুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অথবা ছোট ছোট দুই খানি কাচের প্লেটের দ্বারা আবদ্ধ করতঃ বিপর্য্যস্ত করিয়া দুইটী নলের মধ্যে যথাক্রমে দুইটি জলন্ত দেশলাই প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছেন একটীতে প্রবেশ করাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই নিবিয়া যায় এবং অপরটিতে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে এতদ্বারা তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, যে কাচের নলে দেশলাই প্রবেশ করাইয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে নিবিয়া যায়, সেই নলটিতে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং যে নলটিতে জলন্ত দেশলাই প্রবেশ করাইলে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে সেই নলটিতে অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। তাঁহারা ইহাও নির্ণয় করিয়াছেন যে এই দুই প্রকার গ্যাস যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত করিলে জল উৎপন্ন হয় না। তাঁহারা বলেন দুই তৃতীয়াংশ হাইড্রোজেন গ্যাস ও এক তৃতীয়াংশ অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত করিলে এক অংশ জল উৎপন্ন হয়। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুই স্বতন্ত্র গ্যাস ২ : ১ এই অনুপাতে সংমিশ্রিত করিয়া জল উৎপন্ন করা ব্যতীত আরও কয়েকটী উপায়ে জল উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন মূলে সকল গুলিই একরূপ। তাঁহারা হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়াইয়া জল উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে উত্তপ্ত কপার অক্সাইড্ উপরে হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়িয়া দিলে জল উৎপন্ন হয়। এইরূপে দেখা যায় তাঁহারা নানা যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কোন না কোন উপায়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সংমিশ্রিত না করিলে জল উৎপন্ন হয় নাই।

রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা জলকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জল, দ্বিতীয়তঃ অবিশুদ্ধ জল তৃতীয়তঃ এফার-ভেসেন্ট জল, চতুর্থতঃ ক্যালিবিয়েট জল, পঞ্চমতঃ গন্ধক জল। তাঁহারা বলেন কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টি হইলে পর বাতাসের সহিত যে সমুদায় অবিশুদ্ধ অপরিষ্কার পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহা ধৌত হইয়া যায়। তৎপরে যে বৃষ্টির জল পতিত হয় সেই জলই

বিশুদ্ধ জল এবং এই জলকে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন নদী প্রভৃতি অপরাপর জলাশয়ের জলে নানা প্রকার খনিজ ও অপরিষ্কার পদার্থ মিশ্রিত থাকে সুতরাং সেই সমুদায় জলাশয়ের জলকে বিশুদ্ধ জল বলা যাইতে পারে না। এই সমুদায় জলকে তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। যে সকল জলে কারবণিক্ এসিড্ গ্যাস মিশ্রিত থাকে সেই সমুদায় জলকে তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। যে সকল জলে লৌহ ঘটিত যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ রহিয়াছে সেই সকল জলকে তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। আর যে সকল জলে হাইড্রোজেন ও গন্ধক ঘটিত যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণ রহিয়াছে সেই সমুদায় জলকে তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা জলের যে সমুদায় সাধারণ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয় নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা জলের চারিটী সাধারণ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ অসঙ্কোচশীলতা, দ্বিতীয়তঃ সান্দ্রতা, তৃতীয়তঃ স্থিতিস্থাপকতা, চতুর্থতঃ স্থান-বিরোধকতা। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওরষ্টেড্ নামক একজন পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত পিজোমিটার নামক একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তদ্দ্বারা তিনি নিরূপণ করেন যে এক বর্গইঞ্চি আয়তন জলের উপরে যে ১৫ পাউণ্ড বায়ুর চাপ পড়ে তাহাতে কেবলমাত্র উক্ত আয়তনের দুই সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র সঙ্কোচিত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে জলকে একরূপ অসঙ্কোচশীল বলা যাইতে পারে। জল যে সান্দ্রতা গুণবিশিষ্ট ইহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে জলের ভিতর হস্ত কিম্বা অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি। জল সান্দ্রতা গুণবিশিষ্ট না হইলে কখনই আমরা স্বেচ্ছাক্রমে জলের ভিতর হস্ত কিম্বা অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করাইতে পারিতাম না। জল অল্প পরিমাণে সঙ্কোচশীল, এই গুণের উপর ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ নির্ভর করিতেছে। জলের চতুর্থ গুণ স্থান-বিরোধকতা। এই গুণটীর বিষয় আমরা সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারি, একটী জল পূর্ণ পাত্রে যদি কোন বস্তু নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে তাহার সম আয়তন জল উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। জলের স্থান বিরোধকতা গুণ বশতঃ এরূপ সংঘটিত হয়। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা জলের কয়েকটী সাধারণ গুণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বিশুদ্ধ জল স্বাদ বিহীন এবং গন্ধ বিহীন। অগভীর অবস্থায় বর্ণ বিহীন এবং সমধিক গভীর অবস্থায় নীলবর্ণ বিশিষ্ট। পার্ব্বতীয় অনেক হ্রদের পরিষ্কার জল সুন্দর নীলবর্ণ বিশিষ্ট দেখা যায়, এবং ঐ সকল জলের বর্ণ বিশুদ্ধ জলের স্বাভাবিক বর্ণের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

সান্ত্বনা।

(১)

বিমান রথেতে চড়ি সুরলোক মাঝে
গিয়েছ কুমার;
দুরাশার হায় সুখের স্বপন যত
ভেঙেছে আমার;
জীবনের মরীচিকা, জীবনের প্রহেলিকা,

খেলেনা উঠেনা চিতে আর বার বার।
বাসন্তি হৃদয় মোর হ'ল ছারখার!

(২)

সরগের পারিজাত, আলোকের তুমি
নন্দন কানন,
সরগের ছবিখানি মরতে হাসিবে
হয় কি কখন।
জানিনা কি মনে করে, বিধি দুদিনের তরে,
খেলাইলা হাসিটুকু মরত ভবনে!
লুকাইলা দুই দিনে কেনবা গোপনে।

(৩)

রে অবোধ প্রাণ, ভাসিবিরে আঁখি জলে
আর কত দিন?
মিছে কেঁদে দেহ প্রাণ আর কত কাল
করিবিরে ক্ষীণ?
কেঁদে কেঁদে হলে সারা, জানিনা কেমন ধারা,
রে অবোধ, চিরদিন নয়ন আসারে,
ভাসাও উরস্ যদি পাবেনা তাহারে।

(৪)

এক দিন তুই এ দেহ পিঞ্জর হতে
করিবি প্রয়াণ,
তবে আর মিছে কেন কাঁদিস্‌রে মোর
অবোধ পরাণ?
মুছে ফেল্ আঁখি জল, হৃদয়ে জাগারে বল,
কেবা কার এসংসারে কেহ কারো নয়।
এসংসারে সব ফাঁকি, সব মায়াময়।

(৫)

এ সংসার রঙ্গভূমে আসে নাই কেহ
চিরদিন তরে,
খেলা সাঙ্গ হলে পরে কে কোথা পলায়
শূন্য মঞ্চ করে,
খেলিতে খেলিতে হায়, খেলিতে দিলেনা তায়,
সে পরাণ সহে হয় এরূপ আঘাত,
নির্দ্দয় নির্দ্দয় এই যম দুরাচার।

(৬)

শিশুর সুন্দর খেলা লাগেনাকো ভাল
যাহার নয়নে;
পড়িল নয়ন তার কলুষেতে ভরা
কেন সয় মনে;
দেবজন মনোলোভা, শিশুর বদন শোভা,
দেখি প্রাণে দয়া যার না হয় সঞ্চার,
নিশ্চয় পাষাণে গড়া হৃদয় তাহার।

(৭)

বৃথা গঞ্জি আজ মোরা নিষ্ঠুর শমনে
নাহি দোষ তার;
বিধির বিধান যাহা অবহেলি চলে
সাধ্য আছে কার:
দুদিনের লাগি সবে, নারিছ ভুলিতে ভবে,
হাসিরাশি মোরা তার ভুলিব কেমনে,
নাহতে সময় তেঁই হরিল সে ধনে।

(৮)

ফোটে ফুটে নাই সবে কুসুমের কলি
সৌরভে আকুল,
দুদিনের তরে গৃহ যেন আলোময়
উপমা অতুল,
পেয়ে হায় নিরবধি, স্নেহের নীহার যদি,
পেত রে ফুটিতে এই কুসুমরতন,
পাশরিতে পারিতে কি জনমে কখন।

(৯)

আধ আধ ভাষা আর আধ আধ খেলা
কটি বা খেলেছে,
ফোটেনাকো বোলনা, আজো জীবনের পাতা
সে খালি রয়েছে,

যদিরে পরাণ খুলি, খেলিতাম খেলাগুলি,
সে গাথা গাহিতে কিরে ভুলা'ত জীবনে,
সে যে অনন্তের গাথা ফুরাবে কেমনে।

কর-বিজ্ঞান।

অবতরণিকা।

মনুষ্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে হইলে করতল পর্য্যবেক্ষণই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র মনুষ্যের দোষ ও গুণ দর্শনের ক্ষমতা জন্মে তাহা নহে দোষ ক্ষালনের উপায়ও জানিতে পারা যায়। গুপ্ত ও বাহ্য উভয়বিধ দোষ ও গুণের স্ফূর্তি এবং প্রকাশ, সংশোধন এবং বিনাশ, এই সমুদয়ই করতল দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়।

কর-বিজ্ঞান বিবরণ জানিতে হইলে ঐতিহাসিক যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আদিম অবস্থার অনুসন্ধান লইতে হইবে। ইতিহাস দ্বারা আমরা ইহা অবগত হই যে আর্য্যঋষিগণের সময় হইতেই এই শাস্ত্র প্রচলিত আছে। উপস্থিত এতদ্বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ দৃষ্টে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আমাদের দেশে ইহা অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কথা এক্ষণে আমাদের পক্ষে নিবিড় ঘনাচ্ছন্ন অমারজনীর তুল্য। একটি নক্ষত্রও নাই, ধূসর চন্দ্রের একটি ক্ষীণ কিরণ-রেখাও নাই যাহা আমাদিগকে এই দারুণ অন্ধকারে কোন প্রকারে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। সুতরাং, জ্ঞাত বিষয়ের ক্ষুদ্র সীমার ধারে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞাত সাগর পানে তাকাইয়া থাকি। সেই অনন্তসাগর তীরে দাঁড়াইয়া ভূগর্ভোত্থিত মনুষ্যখোদিত প্রস্তরখণ্ড কিম্বা কোন আশ্চর্য্যজনক পদার্থ বিশেষের ভগ্নাংশাদি কদাচ কুড়াইয়া পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। অবশ্য এ সমুদয় জ্ঞানমার্গে সহায়তা করে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা দুস্তর সমুদ্রের বালুকাময় তীরে তুচ্ছ আগাছা সমষ্টি মাত্র। এতদ্দ্বারা আমরা জ্ঞাত হই যে, আমাদের এই বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে জ্ঞানালোক বিভাষিত যুগসমূহ ছিল, আমাদের বর্ত্তমান নরবংশের পূর্ব্বেও বহুতর বিচিত্র জ্ঞানমণ্ডিত মানবমণ্ডলী বিদ্যমান ছিলেন, বসুন্ধরা শস্যসম্ভার-শোভিতা ছিল; সভ্যতাও পূর্ণ বিকশিত ছিল; কিন্তু আজ সে সকলই অতীতের অন্ধকার ক্রোড়ে চিরদিনতরে লুক্কায়িত হইয়াছে।

যাঁহারা এই শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন আমরা তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের, অলৌকিক পাণ্ডিত্যের এবং সূক্ষ্মদর্শী গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হই। যখন রোম ও গ্রীস মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান করিতেছিল, যখন তাহাদের নামও ব্যক্ত হয় নাই তাহারও বহুযুগ পূর্ব্বে ভারত পাণ্ডিত্যের শুভ্র জ্যোতি অভ্রভেদী হিমাচল শিরে উদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অব্দের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যদিগের জ্যোতিষের অসীম জ্ঞান তাঁহাদের নির্ম্মিত বিচিত্র দেবমন্দির গাত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেব অয়নাংশে এক রাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করিতে অন্ততঃ দুইসহস্র বৎসর গ্রহণ করেন। অতএব কত শতসহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভাস্করের অয়নাংশ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি আমাদের ধারণার সীমা বহির্ভূত নহে?

এই ঘটনার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অসীম শক্তি সামর্থ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বর্ত্তমান অবতারিত প্রস্তাব এই সমুদয় মনস্বী জ্ঞানবৃদ্ধ পিতৃ-

পুরুষগণের অমিত জ্ঞানানুশীলনের একমাত্র ফল। ইহাদেরই শিক্ষা দেশ দেশান্তরে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এক্ষণে সর্ব্বত্র জ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হয়। অনেকের মতে আমাদিগের বেদচতুষ্টয় গ্রীসীয়দিগের শিক্ষার একমাত্র ভিত্তি।

যে আর্য্যমহাপুরুষগণ জ্ঞানবলে ঈদৃশ উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের পরিত্যক্ত জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র কণিকা পাইয়া জগতে আপনাদিগকে জ্ঞানাভিমানী বলিয়া পরিচয় দিতেছি, আধুনিক অতি সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক তত্ত্বগণনার অকিঞ্চিৎকর, বাষ্পীয় লৌহযান প্রভৃতির রচনা বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ, সুতরাং সত্যমূর্খ ছিলেন, এই অশ্রদ্ধেয় কথা অসৎ সমীপে প্রচার করিয়া উপহাসাস্পদ হইতেছে, এমনও অনেক নির্ব্বোধ আছে।

এই ফল-বিজ্ঞানও সেই মনস্বী মহোদয়গণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। যদি জগতের যাবতীয় শিক্ষার মূলে তাঁহারাই আমাদের একমাত্র গুরুস্থানীয়, তবে কোন সাহসে আজি আমরা ক্ষীণবুদ্ধি লইয়া এই ফল-বিজ্ঞানকে হতাদরে আবর্জ্জনা স্তূপের উপর নিক্ষেপ করিব?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকেই এরূপ ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছেন যে, তাঁহারা যে বিষয় স্বয়ং বিশ্বাস করেন না, তাহাই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইহা একেবারে ভিত্তিশূন্য। যতক্ষণ না প্রমাণ করিতে পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন প্রকার মতামত প্রচারে যে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, একথা একেবারে বিস্মৃত হন। "আমি বিশ্বাস করি না" কেবলমাত্র এই কথা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে; সুতরাং, স্বতঃই মনোমধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, "পুরাকাল হইতে বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাত্মবিৎ আচার্য্য সহস্র যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, তিনি তাহার মূলতত্ত্বের অধ্যয়ন এবং অনুশীলনে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন কি না?" এবং যদিও সন্দেহসূচক প্রস্তাব দেন, এবং যদিও সমালোচনার অনুসন্ধানও করিয়া থাকেন, তথাপি সেই গভীর তত্ত্বান্বেষীও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এখনও এ প্রশ্নের স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কথার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, সংশয়ের মধ্যে একজনও অবিশ্বাসী ব্যক্তি নাই। তাঁহারা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, কারণ তাঁহারা কখনও সে কথার অর্থ এবং প্রকৃত তত্ত্ব গভীর আলোচনা করিয়া দেখেন নাই।

প্রারম্ভে সমুদয় বিজ্ঞানই কেবল কতকগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনার সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে মনস্বী মহাত্মাগণ কর্তৃক তৎসমুদয় পরীক্ষিত, প্রমাণিত এবং পরিমিত হইয়াছে। সাধারণ লোকেরাই কেবল পার্থিব নীতির বলে জগৎ পরিচালিত হইতেছে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সাধারণ ও নিত্য ঘটনার বাহিরে যাহা কিছু তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, তাহাকেই তাঁহারা অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিতেন; কিন্তু জ্ঞানালোক প্রাপ্তিতে অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া কিছুই নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন, কি আধ্যাত্মিক জগতে (Moral World) কি আধিভৌতিক জগতে (Physical World) সর্ব্বত্র একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল বিদ্যমান রহিয়াছে। উপযুক্ত তত্ত্বান্বেষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে যাহা কিছু আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক বা সার্ব্বলৌকিকজ্ঞানকারী ঘটনা বা যেটি দৃষ্ট হইয়া থাকে তৎসমুদয়ই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তবে এমন হইতে পারে মধ্যে একটী শৃঙ্খল হারা-

ইয়া গিয়াছে বলিয়াসেই সমুদয় অনুসন্ধানই নিষ্ফল হইয়াছে ; যদিও আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সসীম পর্য্যবেক্ষণ সেই শৃঙ্খলের অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া সত্য, তথাপি নিশ্চয়ই সেই শৃঙ্খলের সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

যিনিই কালের লক্ষণসমূহ অন্বয়ের সহিত নির্দ্ধারিত করিতেছেন তিনিই জানিতেছেন, যে শনৈঃ শনৈঃ ক্রমেই বিধ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে ; অতীতের অশ্রদ্ধেয় ধারণানিচয় ধীর প্রশান্তচিত্তের অনুধাবন ফলে ক্রমেই মীমাংসিত হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকেই অলীক গল্প বলিয়া বিশ্বাসযুক্ত, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের আত্মবোধোচিত নির্ম্মল সত্যকে এতদিনে যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপ সত্যের সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে একটি নিবিড় অন্ধকারাময় পথ দিয়া চলিতে হইবে ; ভ্রমসঙ্কুচিত পথেও পদার্পণ করা অসম্ভব নহে। তদ্ব্যতীত লোকের অজস্র বিদ্রূপবাণও সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ ঐকান্তিক উদ্যমশীল ... বহুতর সত্যরত্ননিচয়ের প্রসূতি স্বরূপিণী ...

(ক্রমশঃ)

পি, দত্ত, F. C. S., Ph. B.

ত্যা রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হত্যা।

দয়ালচাঁদ ... একজন প্রসিদ্ধ ধনী। প্রায় ত্রিশ বৎসর নানা ... র ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থসংগ্রহ ক ... ; বৃদ্ধ বয়সে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাওড়ায় গঙ্গাতটে একখানি বাগানবাটি ক্রয় করিয়া নির্জ্জনবাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যাকালে দয়ালচাঁদ তাঁহার বৈঠকখানায় পায়চারি করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরের প্রতি বিরক্তি মিশ্রিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অমরও বিষণ্ণবদনে গবাক্ষ হইতে অদূরস্থিত কলকলনাদিনী ভাগীরথীর তীরে চাহিয়া রহিয়াছে।

অমর দেখিতে অতি সুপুরুষ। সংসারে তাহার একমাত্র পিতা ও অতি দূর সম্পর্কীয় একটি আত্মীয়ের কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিলনা। বাল্যকালেই অমর মাতৃহীন হয়। বৃদ্ধ দয়ালচাঁদও তাঁহার পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং পত্নীবিয়োগে অন্য দারপরিগ্রহ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন নাই। একমাত্র সন্তান বলিয়া অমর পিতার আদরে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, দয়ালচাঁদ ক্রোধবিমিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি আর তোমাকে সাহায্য করিব না ; অনাহারে মর সেও ভাল।"

অমর উত্তর করিল, "তাহা হইলে অনাহারেই মরিতে হয়।"

দ। তোমার মাতামহ তোমাকে দশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি দিয়াছেন। তোমার বয়সে আমার পাঁচশত টাকারও সম্পত্তি ছিল না।

বিষাদের হাসি হাসিয়া অমর ধীরভাবে বলিল, "ও টাকাতে আমার কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।"

সা। তাত বটেই। ঐ টাকাতে অনেক বড় বড় পরিবার সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়, আর তোমার হাত খরচ হয় না। তা যাক্, তুমি আমার নিকটে থাকনা কেন।

"এ স্থানটা আমার আদৌ পছন্দ হয় না।"

"কেন, মন্দটা কি? আমার পক্ষে কিন্তু বেশ। তা যা হোক, তুমি বলছ,—দেনাটা তোমায় দিতেই হইবে?"

"নতুবা আমার একবারে মান যায়; ভদ্র সমাজে মুখ দেখান ভার।"

"যখন তোমার শোধ করিবার টাকা নাই, তখন ধার করা কি উচিত ছিল?"

"আমি আপনার কাছে পাবার আশা করি।"

"কত টাকা ধার?"

"২০,০০০ বিশ হাজার টাকা।"

"সেই জন্যইত আমার বেশী ভয়; সে টাকা না দিতে পারিলে একবারে ভদ্র সমাজে মুখ দেখান ভার হইবে। মানসম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইবে।"

"তাতে আমার কি?"

ক্রোধে ও অপমানে অমরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল "তা হলে কি আপনি ব'লতে চান যে, আমার মান সম্ভ্রম যাক্ বা আমি অপমানিত হইলে আপনার কোন ক্ষতি নাই?"

"নিশ্চয়ই।"

"দেখুন, লোকে আপনাকে নীচ ও স্বার্থপর বলে, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না।"

"কেমন, এখন ত হোল।"

"সে কথা আমি বল্‌তে চাই না। আমার প্রার্থনা যে আপনি এবারের মত টাকাগুলি দিন।"

বৃদ্ধ তাচ্ছল্যের সহিত বলিলেন, "তুমিও আমার প্রার্থনা খুব শুনিয়াছিলে কি না?"

"আপনি তাহারই কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ, সেত আমার সুরূপা কৌশী ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত অমর কহিল, "সেই ত আরও একটা কারণ যেজন্য তাহার সহিত আমার বিবাহ হতে পারে না। বিশেষতঃ এ বিবাহ প্রস্তাব আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।"

"কেন?"

"মাপ করুন; এ বিবাহ অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল।"

"বিবাহ কর, আমি তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিব।"

"দেখুন, এ প্রলোভন কিছু বেশী নয়। আপনি এই বিবাহ ছাড়া যা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

"কেন? সে একজন ভদ্র ঘরের কন্যা।"

"তা হোক, আমার উপযুক্ত নয়।"

"বেশ, বেশ, এ বিষয়ে আর বেশী বলিতে চাহি না। এই অবাধ্যতার জন্য তোমাকে এক দিন বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে।"

"আপনার ইচ্ছা আমি তাহাকে বিবাহ করি?"

"কেন, হ'তে পারে সে একটা [illegible] সুন্দরী নয়, কিন্তু তা ব'লে ত কুৎসিৎ নয়। [illegible]"

"সে যা হোক আমি বিবাহ [illegible] না।"

"আঃ যাক্, তবে এ বিষয় [illegible] আর তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই; আমি [illegible]মাকে আর এ প্রস্তাব করিব না।"

"তাতে আমি অত্যন্ত সুখী [illegible]।"

"তোমারও আর এখানে এ[illegible] কাজ নাই।"

অমর অত্যন্ত বিস্মিত হই[illegible] কহিল, "কেন? আমি ত অনেক দিন পরে এখানে এসেছি।"

"না, না, তোমাকে [illegible] আর আসতে হবে না।"

"তবে এখানে আমি আসতে পাব না ?"

"না যতদিন না তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন কর, ততদিন এখানে এসও না"

"লোকে আপনার কথা শুনিলে, আমাকে চোরের ও অধম বিবেচনা করিবে।"

"জুয়া খেলে দেনা করা বড় পৌরুষের কাজ ?"

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া অমর বলিল, "দেখুন আপনি আমায় অপমান করিবেন না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "কালে কালে কতই দেখিব। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

"আমি আপনাকে ভয় দেখাই নাই।"

"তবে আমি কাণে কম শুনি। যাক্, এখন তুমি যাও।"

"তবে আপনি আমাকে তাড়ালেন ?"

"হাঁ। তোমার সঙ্গে আর দেখা না হইলে কোন ক্ষতি নাই।"

"দেখুন, কোন লোক হয়ত আমার বিরুদ্ধে আপনাকে কোন কিছু বলে থাকবে তার জন্য কিন্তু আপনাকে পরে পরিতাপ করিতে হইবে।"

"...র আমায় শাসাচ্ছ, অ্যা ?"

জ্বলন্ত ক্রোধে অমর বলিল হাঁ। এই টাকা আমি আপনার কাছ হইতে জোর ক'রে লব।"

"আমার আগে আমি মরি, তবে।"

"মরিবার আর বেশী দেরি নাই।"

"কি তুমি আমাকে মেরে ফেলবার ভয় দেখাও নাকি ? যাও দূর হও।" যুবক তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। একটি ভৃত্য সেই সময়ে বৃদ্ধকে তামাক দিতে আসিলে, বৃদ্ধ কহিলেন, "দেখ, যদি ও—আবার কখন এখানে আসে ওকে এবাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ না। সে আমাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়াছে।"

সেই রাত্রে বৃদ্ধ সকাল সকাল শয়ন করিতে গেলেন। মনের অসুস্থতা নিবন্ধন আদৌ ঘুম হইল না। বহুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা আসিল, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি চমকিয়া শয্যার উপরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহার শয়নের পাশের ঘরে চলিয়া বেড়াইতেছে। সেই ঘরে তাঁহার একটী লৌহ নির্ম্মিত সিন্দুক ছিল এবং তাহাতে তাঁহার টাকাকড়ি ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র থাকিত।

তাঁহার সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে, শয্যা ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বারে অতি সন্তর্পণে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে যেন দুইজনের মৃদু কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়াতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন দুইজন লোক তাঁহার লৌহসিন্দুক খুলিতেছে। তাহাদেরও একজনের আকৃতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চমকিত ও ভীত হইয়া যেমন চিৎকারে উদ্যত হইলেন, অমনি পশ্চাদ্দেশ হইতে একজন তাঁহার মস্তকে একটী ভীষণ লগুড়াঘাত করিল। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। চোরেরাও তাহাদের কার্য্যসাধন করিয়া পলায়ন করিল।

আঘাত সাংঘাতিক হইলেও, দয়ালচাঁদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল না। প্রায় দুই সপ্তাহ তিনি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন।

ঘটনার পরদিনই পিতৃহত্যা অভিযোগে অমর ধৃত হইল। চাকরটাই বলিয়াছিল যে, অমর তাহার পিতাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কেবল তাহা নহে, দীনদয়ালের সরকার হামিদও অমরকে সেই রাত্রে বাটীর চারিধারে বেড়াইতে দেখিয়াছিল।

সংবাদপত্রে এই শোচনীয় ঘটনার বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। সকলেরই অমরের দোষ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

আঘাত লাগিবার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধনলাল চাঁদের একবারও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় নাই। সর্ব্বদাই কেবল প্রলাপ বকিতেছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে "অমর! তোর বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিলি!" বলিয়া চীৎকার করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

করোনারের তদন্তে 'জানা' গিয়াছিল যে লৌহ সিন্দুকে প্রায় বিশসহস্র মুদ্রা ছিল। ধৃত হইবার সময় অমরের নিকট প্রায় অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা পাওয়া গেল।

কোথা হইতে সে এত টাকা পাইল, জিজ্ঞাসা করাতে অমর উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া কেবল বলিল "আমি নির্দ্দোষী।"

খুনের রাত্রিতে সে কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করাতেও উত্তর দিতে পুনরায় অস্বীকার করিল।

করোনারের বিচারে স্থির হইল যে ধনলাল-চাঁদ তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

আমোদপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল অমর ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে চলিল।

(ক্রমশঃ)

মহারাষ্ট্রীয় গল্প।

(সিংহগড় দুর্গ)

বিজাপুর রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর, মহারাষ্ট্র সিংহ শিবাজী আপনাকে বিপৎ-পরিহারে সুরক্ষিত ও নিশ্চিন্ত মনে করিলেন। তখন দক্ষিণাপথে মোগলদিগের সহিত আপনার শক্তি পরীক্ষা লইবার জন্য তাঁহাদের অধীনস্থ স্থান সকল জয় করিতে উদ্যোগী হইয়া দুর্গাদি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইলেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। শিবাজী কোন রাজ-বংশ সম্ভূত নহেন। অলৌকিক সাহস ও অধ্য-বসায়ের প্রভাবেই তিনি সেই সময়েই, আপনাকে সামরিক পরাক্রমশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং তখন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়াও একমাত্র স্বাধীনতার জন্যই [illegible] মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে সন্ধির সময় বিজাপুরের সুলতানও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। শিবাজীর পূর্ব্বে কেহ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহসী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই। মোগলের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শিবাজীর কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। এখানে তাহার বিশেষ আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। সেই মহা-পুরুষ মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজীর অলৌকিক কাহিনীর একাংশ লইয়াই আমাদের এই ক্ষুদ্র গল্প।

শিবাজী মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গের পর দুর্গ, গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিতে লাগিলেন। তখন ভারতীশ্বর দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া রাজ্যের বিপদ মোচন হইবার জন্য অম্বর রাজ গৌরব জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর অধীনে বিপুল সৈন্য শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এই বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৬৬৫ সালে শিবাজী মোগলের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্ত্ত অতি কঠিন ছিল, ও [illegible] অধিকৃত দুর্গাদির

মধ্যে অধিকাংশ দুর্গ তিনি মোগল সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, অবশিষ্টগুলি মোগল সম্রাটের জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিতে পারিবেন নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহা হউক শিবজী তখন এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিলনা। এই রূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর বিজাপুর অল্প দিনের মধ্যেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। এবং ইহাতে শিবজীর বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িল। এই সময়ে শিবজী সম্রাট কর্তৃক দিল্লীতে আমন্ত্রিত হন। বিশেষরূপ শিক্ষিত না হইলেও শিবজী রাজনৈতিক কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই আমন্ত্রণ বড় ভাল বিবেচনা করিলেন না। তজ্জন্য প্রথমে সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। শেষে রাজা জয়-সিংহের কথায় ও মৌখিক মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়া দরবারে যোগদান করিবার জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কথা ছিল দিল্লীতে উপস্থিত হইলেই শিবজী একজন প্রধান মোগল সেনাপতি বলিয়া গন্য হইবেন। এই উচ্চ সম্মানলাভ হইবে বলিয়া শিবজীও যে মনে মনে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত না হইতেছিলেন তাহা নহে। এদিকে আরঙ্গ-জেবের মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল; শিবজীকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার ছলনা করিয়া তাঁহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাটের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামী যেরূপ প্রবল ছিল, রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতেন না। শিবজীর ন্যায় একজন উদারচেতা বীরপুরুষকে মিত্ররূপে দাক্ষি-ণাত্যের পশ্চিমাংশে পাইলে তিনি স্বল্পকালের মধ্যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সম্পূর্ণরূপ বশীভূত করিতে পারিতেন. কিন্তু আরঙ্গজেবের সেরূপ দূরদর্শীতার বড়ই অভাব ছিল। সাম্রাজ্যমদগর্ব্বে গর্ব্বিত, দুর্দ্দর্শ সম্রাট কর্তৃক শিবজী দিল্লীতে যেরূপ অনাদরে গৃহীত হইলেন, তাহাতে ঘৃণায় ম্রিয়মান ও ক্রোধে তাঁহার হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মোগলের [illegible] ইচ্ছা অন্তর হইতে অপহৃত হইল। [illegible] পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে শিবজী [illegible] উপস্থিত হওয়ার পর রাজকীয় কোন [illegible] তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপ-স্থিত হন [illegible] কেবলমাত্র জয়সিংহের পুত্র তাঁহাকে [illegible] করাইয়া দরবারে লইয়া আসেন। [illegible] রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার আসন [illegible] নাই। সামান্য পাঁচ হাজারী মনসবদারগণের মধ্যে আসন গ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং রাজধানীতে নজরবন্দী অবস্থায় থাকিয়া অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধি প্রভাবে কৌশল পূর্ব্বক রাজপ্রহরী ও অন্যান্য সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আইসেন।

এই অলৌকিক পলায়ন কাহিনী জানিতে পারায় সম্রাট আপন নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এবং কোন প্রকারে পুনরায় শিবজীকে প্রলোভন বা বন্ধুতা দেখাইয়া স্ববশে আনিবার চেষ্টায় থাকিলেন কিন্তু সকলি বৃথা হইল। বেরার প্রদেশের অধিকাংশ জায়গীর স্বরূপ প্রদান ও রাজা উপাধীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াও আরঙ্গজেব তাঁহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না। শিবজী হিন্দুবংশে জন্মিয়া-ছিলেন, মন উচ্চ ছিল, সুতরাং প্রথমবার সরল বিশ্বাসে সম্রাটের প্রতারণায় ভুলিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন সম্রাট মিত্রতাছলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন তখন তাঁহার হৃদয়ে

প্রজ্বালিত অগ্নির তেজে পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল। এবং মোগলের শত্রু হইয়া তিনি এক নূতন হিন্দু রাজ্য স্থাপনে যত্নবান হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহের নিকট হইতে শিবজী সংবাদ পাইলেন যে সম্রাট গোপনে তাঁহার জীবন বিনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবজী মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অমঙ্গল অনেক সময়ে মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে দেখা যায়। শিবজী সম্রাট কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত না হইলে আজ দাক্ষিণাত্যে যেরূপ হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে চলিল ইহা কখনই সম্ভবিত না। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা কি ছলে কি হিতকার্য্য সাধন করে কে জানিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

ভাগবদ্গীতা পাঠ।

শ্রীযদুনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

১—৩। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! অর্জ্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেও আপনার পুত্রগণের নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রাপ্তির কোন আশা নাই কারণ, সর্ব্বকৃত-ব্যাপিনী কৃপায় বশীভূত অর্জ্জুনের বিগলিত হৃদয়, বিষাদ নিমগ্ন এবং বাষ্পাকুললোচন অবলোকন করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! এই বিষম রণসঙ্কটে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যদিগের নিতান্ত অযোগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক অসুখকর। হে পার্থ! ক্লীবত্ব ত্যাগ কর, ইহা তোমাতে শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূর কর, যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও।

৪—৫। তখন অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, মধুসূদন! আমি কিরূপে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমি কাতর হইয়া এরূপ পরাঙ্মুখ হইতেছি না। অসম্ভব আমার নিবৃত্তির কারণ :— যাঁহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগকে বধ করিব কিরূপে? অতএব শ্রেয়ঃ না ইহাতে যদি আমায় ভিক্ষা উপজীবিকাও করিতে হয় ইহাও আমার ভাল। যদি বল ভীষ্ম দ্রোণাদি পূর্ব্বে পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে [illegible], কারণ পিতামহ নিজেই বলিতেছেন।—

"মনুষ্য অর্থেরই দাস, আর কাহারও দাস নহে, আমি কৌরবের অর্থে বড়ই আবদ্ধ। অতএব ইহাদিগকে বধ করিলে ইহাদের রুধির লিপ্ত ভোগ লাভ হইবে। ইহাতে ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হইব। গুরু বধ অপেক্ষা ভিক্ষাই শ্রেয়ঃ।'

ভগবান। কিন্তু যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্য। ইহা তোমার পক্ষে পরধর্ম্ম এজন্য নিষিদ্ধ।

৬। অর্জ্জুন।—যুদ্ধেই বা শ্রেয়ঃ কি? জয়লাভ যে পক্ষেই হউক, উভয় পক্ষে কুলনাশ অবশ্যম্ভাবী। কুলনাশ করিয়া জীবনে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? বিশেষ উভয়ের পরাজয় সমানই দাঁড়ায়, এ জন্য স্বজন বধ করিয়া জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না।

৭। হে কেশব! আমার চিত্তে দীনতা আসিয়াছে ধর্ম্মে সন্দেহ জন্মিয়াছে, কি কারণ, নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার গুরু, নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও কি করিব?

৮—৯। যদি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পাই; এমন কি ইন্দ্রত্বও লাভ হয়, তাহা হইলেও স্বজন বধ জনিত শোক কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না, অর্জ্জুন এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

১০। শ্রীভগবান অর্জ্জুনের বিষাদ দেখিয়া তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।

১১। অর্জ্জুন! তুমি শোক করিতেছ—, তাহাও যাহাদের জন্য শোক হইতে পারে না, তাহাদের জন্য; মুখে জ্ঞানের কথা কহিতেছ, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যিনি পণ্ডিত তিনি শোক করেন না—মৃতের জন্যই কি আর জীবিতের জন্যই কি!

অর্জ্জুন—অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছি কিরূপে?

ভগবান;—এই যে সমস্ত লোক দেখিতেছ, ইহাদের আত্মা হত হইবে, এই জন্য কি শোক না আত্মার দেহান্তর ঘটিবে তজ্জন্য শোক অথবা ইহাদের দেহ বিনষ্ট হইবে, তজ্জন্য তোমার শোক?

অর্জ্জুন,—যুদ্ধে কি ইহারা মরিবেন না?

ভগবান—তাহাইত জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি মরিবে? দেহ ত জড়। মাটি, জল, আগুন, বায়ু, ও আকাশ এই পঞ্চভূতে দেহ গঠিত। কতক মৃত্তিকা থাকিল বা গেল তাহাতে কাহার দুঃখ? যে কাপড়খানি পরিয়াছ, তাহা যদি ছিড়িয়া যায়, তবে কি মনে কর তুমিও মরিলে? তুমি আত্মা—আত্মা চৈতন্য স্বরূপ ইহার মৃত্যু নাই; ইনি অবিনাশী, তবে শোক করিবে কি জন্য? পণ্ডিত ব্যক্তি জানেন, চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্, তুমি পণ্ডিতের মত কথা গুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ। বলিতেছ দেহ নাশ হইলেও আত্মা থাকে। তোমার এই কথাতে তাহার পরিচয় পাইতেছি। মুখে পণ্ডিতের মত কথা না বলিয়া কার্য্যে তুমি যে পণ্ডিত তাহাই দেখাও। পণ্ডিতের মত চৈতন্যের স্বরূপ কি জান, তখন দেখিবে মৃত বা জীবিতের জন্য পণ্ডিতের শোক হয় না।

১২। আরও দেখ, আমি পূর্ব্বে যে ছিলাম না তাহা নহে। আর তুমিও যে ছিলে না, অথবা এই রাজাগণ ছিলেন না, কিম্বা আমরা যে আবার হইব না তাহা নহে। তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাভরণ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব হইয়া যাই নাই।

(ক্রমশঃ)

হোমিওপ্যাথি কি?

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিকিৎসা জগতে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে হোমিওপ্যাথীর উৎপত্তি ও সৃষ্টি হয়। আজ যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে তাহার জন্মদাতা মহাত্মার নাম জানিতে কাহার না ঔৎসুক্য হইয়া থাকে? স্যামুয়েল হানিম্যান নামক একজন নগণ্য লোক কর্ত্তৃক এতবড় একটি বিজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়াছে শুনিলে সকলেই বোধ হয় আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক কি উহা আশ্চর্য্যের বিষয়? জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে আমরা কি সতত দেখিতে পাই না যে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সমুদয়ই নগণ্য সাধারণ লোক হইতেই হইয়াছে। হানিম্যানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এলোপাথিই—যাহাকে সাধারণ লোকে আজও চলিত কথায় "ডাক্তারী চিকিৎসা" বলিয়া থাকে—একমাত্র চিকিৎসা (বিজ্ঞান সম্মত) বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে হানিম্যানের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে "যাহা প্রয়োগে শরীরে যে সমুদয় রোগ বা লক্ষণের উৎপত্তি আবার তাহা প্রয়োগেই তৎ-তৎ ব্যাধি বা লক্ষণের উপশম হইতে পারে।" কথাটি একটু

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ;—মনে কর কেহ একজন অজ্ঞাতসারে আর্সেনিক নামক বিষ পান করিয়াছে ; এখন তাহাতে আমরা মোটামুটি দেখিতে পাইতেছি যে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অস্থিরতায় অনবরত ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ; ভয়ানক তৃষ্ণা ; গাত্রজ্বালা এবং ক্রমেই শরীরে নিস্তেজাবস্থা আসিয়া পড়িতেছে ; মহাত্মা হানিমানের মতে উক্ত লক্ষণাবলী যদি তুমি কোন রোগীতে দেখিতে পাও তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত আর্সেনিক নামক ঔষধ ব্যবহার করিলেই তোমার রোগী উপশম লাভ করিবে। হানিমানের এই theory বা অনুমিতির লাটিন নাম "Similia Similibus curantur" এবং ইংরাজীতে উহাকে "Likes cured by likes" বলে। আমাদের সংস্কৃতে উহাকে "বিষস্য বিষমৌষধম্" "সমঃ সমং শময়তি" বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে চলিত কথায় প্রবাদ আছে যে "কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করা" "জল দিয়া জল বাহির করা"; ইহাই হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র বলিয়া জানিবে। সুস্থদেহে কোন একটি ঔষধ সেবনে শরীরে যে সমুদয় লক্ষণের উদ্ভব দেখা গিয়াছে অসুস্থ শরীরে সেই সমুদয় লক্ষণদৃষ্টে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগ শান্তি হইবে।

হানিমানের এই থিয়রী যে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছিল তাহা নহে। তিনি স্বয়ং সমুদয় ঔষধ সুস্থাবস্থায় প্রথমে নিজের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন পরে শিষ্যগণকে উহার ফল প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এত কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিয়া তিনি জগতে নিজ আবিষ্কৃত চিকিৎসার সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঔষধাবলীর এই সত্যতা নিরূপণ বৈজ্ঞানিক জগতে "প্রুভিং" নামে খ্যাত আছে। পুরাতন মতের চিকিৎসার সহিত হানিমানের নবাবিষ্কৃত চিকিৎসার আর একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে ইহাতে কেবলমাত্র একটী ঔষধ ক্রমানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তাহাও অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার হইবে। ঔষধের মাত্রা যত অল্প হইবে উহার শক্তিও তত অধিক হইবে। এজন্য হানিমান নির্দেশ করেন যে, মূল ঔষধের কোনরূপ ব্যবহার না করিয়া তাহাকে স্পীরিট বা এলকোহলের যোগে শক্তীকৃত করিয়া তবে ব্যবহার করিবে। হোমিওপ্যাথীর এই শক্তিতত্ত্ব বিষয় লইয়া অনেকে কতপ্রকার উপহাস করিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে "চারিধারে এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইয়া এক অঞ্জলি জল পান করিলেই রোগ সারিয়া যাইবে"। এই সমুদয় লোকে কি একবারও সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব কতদূর হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখেন না? এই যে ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতি দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা কখন চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সেইরূপ এই হোমিওপ্যাথীর সূক্ষ্মশক্তি একমাত্রায় কত কঠিন রোগ আরোগ্যলাভ করিতেছে তাহা যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না বা পারেন না।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের আর একটি মহদ্গুণ এই যে, ইহাতে মূল ঔষধের মাত্রা অতি অল্প থাকায় সহজে কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অবশ্য আমি এমন কথা বলি না (যেমন সাধারণ অনেকেই বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ এক বাক্স সেবন করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না) যে এই ঔষধ একেবারে অনিষ্টকারক নহে। ইহার অপব্যবহারেও শরীরের অনেক অনিষ্ট আসিয়া পড়ে, সহজে কোন ঔষধ ব্যবহার [illegible]

লাভ হয় না; তখন আবার ঐ ঔষধের প্রতিষেধক অথবা ব্যবহার করিয়া পরে পুনরায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে তবে ফললাভ হইবে। ইহাও সামান্য ক্ষতিকারক নহে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে এই বিশোধক ঔষধ সেবনেও মুহূর্ত্তমধ্যে লোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে ইহা একেবারে ক্ষতিকারক নহে?

সাধারণে ঐ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকার জন্যই আজকাল সকলেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামে অনায়াসে পরিচিত করিতে সাহসী হয়েন। কিন্তু বাস্তবিকই কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এত সহজ? তাহা নহে। যিনি আমাদিগের ভৈষজ-তত্ত্বের কোন দুই একটি ঔষধ পাঠ করিয়াছেন তিনিই স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, প্রায় সমুদয় ঔষধই একপ্রকার গুণবিশিষ্ট। আরও এক মহা বিপদ এই যে এলোপ্যাথিক যেমন প্রত্যেক লক্ষণের জন্য একটি করিয়া ঔষধ দিয়া ৪।৫।৬।৭টি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, ইহাতে কেবলমাত্র একটি ঔষধের মধ্যেই রোগীর সমুদয় লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকা চাই। রোগীর সমুদয় লক্ষণ অর্থাৎ Totality of symptoms যে ঔষধে পাইবে তাহাই হোমিওপ্যাথি মতে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ জানিবে। এলোপ্যাথি মতে কতকগুলি ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করা সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলিতে চাহি। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে কোন কথা এখানে না বলিয়া আমরা কেবলমাত্র উহার ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যে যে লক্ষণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া কয়েকটি ঔষধ মনোনয়ন করা হইল তাহাদের মিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন নূতন ফলোদয় হয় কি না তাহা কে বলিতে পারে। যদি স্বীকার করা যায় যে নূতন ফলোদয় হয় তাহা হইলে আমাদের হোমিওপ্যাথি যে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এখানে বলা যায় কারণ ৪।৭টি মিশ্রিত করিয়া যে ফললাভ হইবে তাহা হোমিওপ্যাথির একটী মাত্র ঔষধেই দর্শাইবে।

হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠত্ব আমরা আর একটি বিষয়ে দেখিতে পাই যথা, ইহা বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী গর্ভিণী প্রভৃতি সকলকেই নিঃসন্দেহে সেবন করাইতে পারা যায়। অবশ্য গর্ভাবস্থায় ইহা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন কারণ জরায়ুর সঙ্কোচনকারক ঔষধ ব্যবহৃত হইলে গর্ভস্রাব সম্বন্ধে আশঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে। কতকগুলি পীড়ায় যেমন, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, শিশুরোগাবলী ইত্যাদি—ইহা একপ্রকার Specific system of medicine বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবশ্য এই বিশ্বাসের কারণও প্রচুর আছে। নূতন ও পুরাতন প্রকারের চিকিৎসার তুলনায় দেখা গিয়াছে যে উক্ত রোগাদিতে পুরাতন অপেক্ষা নূতন প্রকারে শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিতে জ্বরাদির চিকিৎসা ভাল হয় না। ইঁহাদের মনে করা উচিত যে চিকিৎসায় ওলাউঠা বসন্ত, প্লেগের সঙ্কট রোগী আরোগ্য হইতেছে তাহাদ্বারা সামান্য জ্বর সন্নিপাত, অবিরাম বা ম্যালেরিয়া সংযুক্ত—আরোগ্য হয় না ইহা কি প্রকারের অসম্ভব কথা। ফল কথা এই যে এলোপ্যাথি মতে কুইনাইনাদি প্রয়োগে যত সত্বর জ্বর চাপা দেওয়া হইয়া থাকে ইহা দ্বারা তাহা হয় না। আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা হইতেছে এই যে, জ্বর

চাপা দেওয়া ভাল না তাহা একেবারে radically আরাম করা ভাল। নিউমোনিয়া টাইফয়েড, টাইফস্ প্রভৃতি প্রকারের কঠিন কঠিন জ্বর আমাদের এই সামান্য হোমিওপ্যাথি প্রয়োগে কেমন সুন্দর ও সহজে আরোগ্য হইয়াছে যিনি তাহা সচক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহার বিশ্বাস হওয়া কঠিন। রোগীর যেরূপ নিস্তেজাবস্থায় এলোপ্যাথিরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রাণ্ডি দিয়া ষ্টিমুলেণ্ট করাইয়া থাকেন সেই স্থলেই আমরা সামান্য ২।১ মাত্রা প্রয়োগে কত আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকি তাহা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যিনি দেখিয়াছেন তিনিই আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। সময়ে সময়ে আমরাও ইহার শক্তি পরিচয় পাইয়া মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি এবং ইহার আবিষ্কার কর্ত্তার নামে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকি।

গৃহস্থের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নানা কারণে অধিক প্রয়োজনীয় বটে (১) ইহা সেবনে কোন প্রকার গোলযোগ নাই, সকলেই চাহিয়া খাইয়া থাকে, (২) ঔষধ সেবনের জন্য নানা-প্রকার আনুসঙ্গীক দ্রব্যাদি যথা মসলা, ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না। (৩) অল্প খরচে চিকিৎসা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, (৪) গৃহে একটি হোমিওপ্যাথি বাক্স এবং নিজে প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ ও ২১ খানি পুস্তক থাকিলেই সহজে নিজেই সামান্য রোগাদি চিকিৎসা করিতে পারেন। (৫) প্রতিবাসী দরিদ্রগণকেও বিনা খরচে ইচ্ছা করিলে চিকিৎসা করিয়া সুনাম অর্জ্জন ও পরকালের কার্য্য সাধন করিতে পারেন।

ডাক্তার মৈত্র
১৮।১ অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

(আমরা প্রতিমাসে সাধারণের সুবিধার জন্য সহজ সহজ রোগ ও তাহার চিকিৎসা ইহাতে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহার এসম্বন্ধে কিছু জানিবার প্রয়োজন হইবে তাহা পত্রদ্বারা আমাদিগকে জানাইলেই তাহার ব্যবস্থা যথাসম্ভব করিয়া দিব।—সম্পাদক)

:০:

লেখনী অবতার।

(১)

হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে বিখ্যাত উকিলপাড়ায় "মর্জ্জিনাচ, সঠিশিরোমণি ও এক্সনাবিশারদ কোম্পানি" নামক এটর্ণী আফিসে শ্রীমান্ লেখনীঅবতার কালী একজন বিশ্বস্ত কেরাণী। পাঁচ বৎসর এটর্ণী আফিসের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে একজন কেরাণী অনায়াসে উপযুক্ত এটর্ণী হইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কত পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি অবতারবাবু এটর্ণী হইতে পারেন নাই। বড় কষ্টে বি, এ, পাশ করিয়া এটর্ণী হইবার আশায় কাজ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে তিনি যে কেরাণী সেই কেরাণীই রহিলেন।

অবতার বাবুর দেহায়তন খর্ব্ব। শরীরের গঠন প্রণালীতে বিলক্ষণ লালিত্যের অভাব দৃষ্ট হয়। তিনি স্বভাবতঃই নিরীহ এবং শান্ত প্রকৃতির লোক। তাঁহার শিক্ষানবিশ জীবনে কেবল মাত্র দুইটি ঘটনায় ব্যতীত আর কোন প্রকারে চাঞ্চল্য বা অসহিষ্ণুতার দৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য আর কিছুই না তিনি একখানি দশটাকার নোট অসময়ে উপকারে আসিবে বলিয়া মোটা জিন কোটের বুকপকেটে অতি সাবধানে সেলাই

করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুষ্ট রজক ইস্ত্রিকালে কোনরূপে টের পাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল। অবতার বাবু যখন জানিতে পারিলেন, রজকের নিকট গিয়া তাহাকে ব্যবসা ও ধর্ম্মের দিব্য দিয়া টাকাটী ফেরত দিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। দুষ্ট রজক ধর্ম্মের দোহাই না মানিয়া অম্লানবদনে অস্বীকার করিল। তদবধি তিনি রজককুলের উপর মহাকুপিত হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দিতেন না, স্বহস্তেই পরিষ্কার করিয়া লইতেন। আর একবার তিনি আফিসের আবশ্যক কয়েকখানি কাগজ পত্র অন্যমনস্কতা হেতু জল গরম করিবার সময় চুলীমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শেষে যার পর নাই বিরক্ত হইয়া জন্মের মত গরম জল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দুইটী ঘটনার পর অবতার মহাশয় যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে যথাক্রমে সুখের পর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন সে পক্ষে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

(২)

প্রকৃত পক্ষে অবতার বাবু সুখী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৪০।৫০ টাকা হইয়াছিল। একমাত্র প্রভুর অটল বিশ্বাসই তাঁহার প্রভুত্ব ও সুখের মূল। তদ্ব্যতীত তাঁহার সরল স্বভাব ও সদ্ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। যাহা হউক, এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের ভিতরেও সময়ে সময়ে তিনি কেমন একটা কি অসুখ বোধ করিতেন। যদি কেহ কখন অবতার বাবুকে কোন গানের মজলিসে দেখিয়া থাকেন এবং যখনই গায়ক কোন প্রেমসঙ্গীত গান করেন, সেই সময়ে একবার তাঁহার মুখের পানে বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন যেন তাঁহার নীরস চক্ষু সরস হইয়া ক্রমে অশ্রুপাত করিবার উপক্রম করিতেছে, আর তিনি যেন অতি কষ্টে সেই অশ্রুসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই প্রচ্ছন্ন মনোভাবের ক্রমে এই ভাবে বিকাশ হইত,—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, অসংলগ্ন দেহের ভঙ্গি অলস ও উদাস, ওষ্ঠাধরযুক্ত গুড়গুড়ী নলের অকালে অধঃপতন, শেষে "ম্যারীকে" আনো, "শ্যাম প্রিয়া" বোলাও, গোলাপ লেয়াও ইত্যাদি শব্দে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতেন।

ফল কথা অবতার বাবু একটী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সঙ্গিনীর একান্ত অভাব বোধ করিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যের বশীভূত হইবার পূর্ব্বেই তিনি কেবল মাত্র বংশরক্ষার্থে বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দাম্পত্যজীবনের প্রণয়রসাস্বাদে একান্ত লোলুপ হইয়া অবিবাহিত জীবনের স্বাধীনতা রত্নটী বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

(৩)

পাত্রীও জুটিল। পেন্‌শনী অবতার মহাশয়ের ভাগ্য ক্রমেই কিঞ্চিৎ বয়স্থা পাত্রীর সহিতই শুভ বিবাহের পর, ফুলশয্যার রজনী অতীব কমনানন্দ কৌতুকিনী হইয়াছিল। আমরা জানি, উক্ত রজনী যোগে অত্যাধিক আনন্দবশতঃ তিনি একাদিক্রমে উপর্য্যুপরি ছয় বার তামাকুর অগ্নি সংস্কার করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে এরূপও ঘটিয়াছিল যে, তিনি আশে পাশে রহস্যের গন্ধ আঘ্রাণমাত্র অতি উচ্চরবে হাস্য করিয়া নিদ্রাতুর বালকবালিকাগণের যথেষ্ট ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—জীবনে আজ কি সুখের দিন! কেমন চন্দ্রিকাময়ী রজনী! পার্শ্বদেশে কেমন লাবণ্যললিতাঙ্গী ললনা! মরি মধুরার সৌন্দর্য্য কি মনোহর! কি সুন্দর অলস আঁখিপাত! না, না, মধুরা নহে, বুঝি কপট

মিত্রার মিজিতা ;—এইটাই সম্ভব। কারণ নিশ্চয়ই প্রণয়িনী আমার কথোপকথন ও রসিকতা শ্রবণে মনে মনে কতই আনন্দ অনুভব করিতেছে।

বহু বিলম্বে ঘটিলেও সেই দিন যে তাঁহার সুখের দিন আসিয়া পঁহুছিল তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন। পাছে বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রীতিভোজ দিতে হয় এই ভয়ে বিবাহটা অতি গোপনেই সমাধা করিয়াছিলেন। এমন কি এই বিবাহ ব্যাপার তাঁহার মনিব মহাশয়দেরও অজ্ঞাত ছিল।

(৪)

ইহার পর কিছুকাল গত হইলে তিনি পত্নী সহ শ্বশুর সন্দর্শনে যাইবার জন্য মনিবের নিকট তিন দিনের ছুটী লইলেন। এতদিন যে বিলাস লালসা ভয়ে ভয়ে তাঁহার ছায়া মাড়ায় নাই, আজ তিনি পত্নীর বিশেষ অনুরোধে সেই বিলাসের শিকারভূত হইলেন। আজ তাঁহার পায়ে ফুল-কাটা লাল রংএর মোজা, তদুপরি বার্ণীস করা পম্প জুতা, পরিধানে ফরাসডাঙ্গার মিহি চওড়া কালাপাড় ধুতি। গায়ে রামধনু রঙের রেশমী পাঞ্জাবী আছেন্। যজ্ঞোপবীত আকারে বাঁধা সুন্দর কুঞ্চিত চাদর। অঙ্গুলীতে হীরক অঙ্গুরীয়ক হস্তে পিচের ছড়ি মুহূর্তকালও বিশ্রাম না পাইয়া অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে। পকেটে লতা পাতা পাখী আঁকা রুমালে এসেন্সের মিঠা গন্ধ মন্দ পবনে ভুর ভুর করিয়া উড়িয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। মুখে নানাপ্রকার সুগন্ধি মশলা মিশ্রিত মিঠা পান জোড়ার তীক্ষ্ণ দন্তে চর্ব্বিত হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াও রসদানে বিরত ছিল না এবং সুরার দুর্গন্ধনাশে বিশেষ চেষ্টিত ছিল। ওষ্ঠাধর সংলগ্ন গোলাপী বাঁড়ির কুণ্ডলী-কৃত ধূম যেন অনন্ত বায়ুর শোভা ধূসর বর্ণের বিড়ালীর মত তাঁহারই মুখের কাছে আনন্দে লাঙ্গুল নাড়িয়া ঘুরিতেছিল। তাঁহার মাথার ঊর্দ্ধ-মুখ কণ্টকোপম কেশগুলি মনোহর ও সুগন্ধময় সুবাসিত তৈলের সহবাসে যেন কিছু শক্ত ভাব ধারণ করিয়া মস্তকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তেড়ীরূপ রাজপথটী দেখাইয়া দিতে ছিল।

লেখনী অবতার প্রণয়িনী ও তাঁহার অত্যাবশ্যক পেটারা ও পোঁটলাগুলির সহিত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছকড়গাড়ী ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে চলিলেন। যাইতে যাইতে তিনি প্রিয়তমাকে কহিলেন, "প্রিয়ে, দেখ, আজ আমাদের কি সুখের দিন।" প্রিয়তমা স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া অধরকোণে একটু মৃদু হাসির রেখামাত্র ফুটাইলেন। তাহাতে এরূপ বোধ হইল যেন দিনহীন ভিখারীকে লক্ষমুদ্রা দান করিয়া তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে অবতার মহাশয়ের কানে কানে কে যেন কহিল, "ভাই হে, আনন্দ চিরস্থায়ী নহে।" কি জানি ক্ষণেকের তরে তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িয়া তখনই আনন্দস্রোতে মিশাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী ফকিরচন্দ্র দত্ত।

শোক-দুঃখে লোক কাঁদে কেন?

শোক দুঃখে লোক কাঁদে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে লোক সুখের জন্য কাঁদে। দুঃখ দূরীভূত হইয়া সুখ হউক এ চিন্তা কার না আছে?

এই মরণধর্ম্মশীল জগতে সকল জীবই সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত। সুখের সুমধুর আস্বাদ অনুভব করিবার জন্য আপামর সাধারণ সমুদায় প্রাণী লালায়িত। সুখের ব্যাঘাত ঘটুক, দুঃখ আসুক, এ প্রার্থনা কেহই করে না, কেহই ভাল বাসে না। হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন—প্রাণাধিক সন্তান পিতা মাতার বর্ত্তমানে, অবনীর সমুদায় লীলা বিসর্জ্জন করিয়া কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গেলে, তদীয় জনক জননী শোক-ভারাক্রান্ত হইয়া রোদন করেন। তাঁহারা শোক-তাপে তাপিত হইয়া রোদন করেন কেন? দুঃখের দারুণ নিষ্পেষণে পীড়িত হইতে তাঁহারা অভিলাষী নহেন। শোকে কাঁদিলে দুঃখের হ্রাস হয়, অর্থাৎ সুখের সঞ্চার হয়। জীবের চিত্তে সুখের অধিকার না হইলে, কখনই শোক লঘু হইতে পারে না। লঘু হইতে চায় না। বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন স্থান এক কালে শূন্য থাকিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের নিয়মও সেইরূপ, মন সর্ব্বদা চিন্তা-বিরহিত নহে। যখন মনে শোকের অধিকার, তখন সুখ থাকে না, আবার যে সময় সুখের অধিকার, তৎকালে শোক স্থান পায় না, কিন্তু কোনটির কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষিত হইলেই, অপরটী অমনি জীবের অজ্ঞাতসারে সেই স্থল অধিকার করিয়া বসে।

যে দম্পতি পরস্পরে পবিত্র প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে, পৃথিবীর সমুদায় দ্রব্য, সকল কার্য্য, সমস্ত ব্যাপারই আনন্দদায়ক বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, শোকের বা কষ্টের ছায়া মাত্রও যাহাদিগের হৃদয়-কমলে পতিত হয় নাই। সমুদায় বাসনা, সমস্ত প্রবৃত্তি মনোমত চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে, পরমেশে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া জগতের সার সুখ ভোগ করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, দৈব দুর্ঘটনাক্রমে তাঁহাদের অন্যতরের বিচ্ছেদ হইলে বা কালের করাল কবলে আত্ম বিসর্জ্জন করিলে, যে বর্ত্তমান থাকে, তাহার পক্ষে এই ভবধাম অন্ধকারময়। কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। জগতের যে সমুদায় বস্তু পূর্ব্বে তাহাদের প্রীতি উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল, এক্ষণে সে সমুদায় অসুখের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বিমল পবিত্র বদনের সে স্নিগ্ধ হাসির ছটা লুকাইয়া যায়। হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া নিরন্তর ভীষণ আঘাতে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। সুরভি কুসুমের আঘ্রাণ মলয় মারুতের ব্যজন কিছুই তাহার নিকট প্রীতিদায়ক হয় না। তখন তাহার বিষণ্ণ হৃদয় আত্মীয় জনের—বন্ধু জনের রোদনের সহিত কাঁদিতে পাইলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে শোকাপনয়ন করিতে সমর্থ হয়—সুখের আভা দেখিতে পায়; শোকও ক্রমশঃ অন্তরিত হইতে থাকে। মর্ম্ম বেদনা ব্যথার ব্যথীকে বলিতে পারিলেই শোকের অনেক হ্রাস হয়, এবং তাহাতেই যন্ত্রণা ভার ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে। সুতরাং সুখ উপস্থিত হয়। লোক শোকে কাঁদে সুখের জন্য। বাসনা সাধন করাই সুখের মোক্ষ কার্য্য।

লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত শোক-প্রভাবে চক্ষের জল না ফেলে, ততক্ষণ তাহার শোকের লাঘব হয় না। যেই নয়নাম্বু ধরাতল স্পর্শ করে, অমনি শোকের কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়। শোকের সেই হ্রাসের অবকাশ স্থানে সুখ স্বীয় অধিকার স্থাপন করে অর্থাৎ তখনই সুখের সঞ্চার হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন স্থান শূন্য থাকিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সেইরূপ কোন মানসিক ভাবের অভাবে, অন্য একটী ভাব সেই স্থান অধিকার করিবেই করিবে।

কোন বস্তু নষ্ট হইয়া গেলে, কোন প্রিয় বস্তুর

অভাব ঘটিলে কষ্ট হয়—মনোস্তাপ হয়, সেই কষ্ট ও মনোস্তাপ কিসে নষ্ট হয়? দুঃখের ভাবনা ভাবিলে, সুখের উদয় হয়; এই সুখের নামই প্রবোধ। প্রবোধই মনুষ্যজীবনকে সুখের অধিকার দানে সক্ষম শোক-যাতনায় বা দারিদ্র্য কষ্টের যত অপনয়ন হইতে থাকে, মন ততই প্রবোধ মানে। মন প্রবোধ মানিলেই সুখের অধিকার উপস্থিত হয়। তাই বলি লোক সুখ লালসায় শোকাবেগে রোদন করে।

শ্রী—

কদম্ব।

(১)

পবিত্র কদম্ব কিবা বিটপী সুন্দর।
শিরঃপরে পত্রগুচ্ছ শোভে থরেথর।
নবহরিতিমাময়, চন্দ্রাতপ সনে হয়,
তার মাঝে পুষ্পরাজি কিবা মনোহর।
বিশ্বশিল্পী এমনি বিচিত্র কারিকর।

(২)

ধন্যরে জনম তব ওহে তরুবর,
তোমার সৌভাগ্য হেরি প্রফুল্ল অন্তর।
এ বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার করুণাদৃষ্টি,
বড়ই দেখিয়ে তরু তোমার উপরে।
তুমিই সৌভাগ্যশালী অবনী ভিতরে।

(৩)

তরুরাজ, বল বল সুধাই তোমায়।
শ্যাম কি আসেন আর তোমার তলায়?
সঙ্গেলয়ে গাভীধন, রাখাল বালকগণ,
প্রমোদে মাতিয়ে সবে করেগো নর্ত্তন।
আর কি আসেন তলে সেই শ্যামধন?

(৪)

বন ফুল মালা গলে করিয়া ধারণ।
আর কি আসেন তলে রাধিকারমণ?
পরিয়া সে পীতধড়া, বাঁধিয়া মোহনচূড়া,
রাখাল বালক সনে করেন নর্ত্তন?
কদম্বরে বল ধরি দুইটি চরণ।

(৫)

কদম্বরে বল ধরি দুইটী চরণ।
আর কি বাজান বাঁশী সে বংশীবদন?
শুনি যে বাঁশীর স্বর, গোপকুল নারী সব,
প্রেমস্রোতে ভাসমান হ'ত নিরন্তর।
আর কি শুনিতে পাও সে বাঁশীর স্বর।

(৬)

আর কি শুনিতে পাও সে বাঁশীর স্বর।
যে মধুর রবে হ'ত মোহিত অন্তর।
গোপকুল নারী যত, ভক্তি ভরে হয়ে নত,
পতিরূপে ভগবানে আরাধিত সবে।
প্রেমডোরে বাঁধিতরে সেই ভবধবে।

(৭)

ভক্তি নাই, প্রেম নাই, চিত্ত মরুভূমি।
দেখাবে কি শ্যামধনে দেখাবে কি তুমি।
কলুষকালিমাময়, মন প্রাণ সমুদয়,
বিন্দুমাত্র আছে মোর চক্ষে অশ্রুজল।
পাব কিগো শ্যাম ধনে কদম্ব রে বল্।

(৮)

বিষয় বাসনা চিত্তে হয়েছে প্রবল।
ভক্তি, প্রেম ভালবাসা শুষ্ক সে সকল।
সৃষ্টির প্রধান জ্ঞান, পূর্ণদস্ত অভিমান,
কিরূপে হইবে বল এ পাপীর গতি।
কদম্বরে বল মোরে করি এ মিনতি।

আর্য্যভূমির সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ৴০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে অথবা স্থগিত না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্র পাঠাইতে থাকিব।

৩। মূল্য পাঠাইবারকালে অথবা অপর কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নিজের নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এই কথাটী লিখিবেন। পত্র প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। হস্তাক্ষর অপরিষ্কার হইলে, ছাপার ভুল অপরিহার্য্য। প্রবন্ধ লেখক ও সংবাদদাতা মাত্রেই আর্য্যভূমি একখানি বিনা ব্যয়ে পাইবেন। প্রবন্ধ ও সংবাদগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। সংবাদদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপন আপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকগণকেও বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইঁহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনা মত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।	শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
৮৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।

১৭ নং কেনাল ষ্ট্রীট "সিংহ প্রেস" হইতে শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।] [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

লেখকগণের নাম।

আ[illegible] মজুমদার এম্, এ, শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্ এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী সহ সম্পাদক) শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, পি দত্ত F. C. S, PH; B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র ও সম্পাদক।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা) (প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা)

আর্য্যভূমি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

" অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥"

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সাল

আহ্বানবাণী।

এই বিশ্ববিধানে কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে। এবং চিরনিদ্রা ব্যতীত মানবের সকল নিদ্রারই এখানে একটা শেষ আছে। কোন একটী জাতি হয়তো বহুকাল পর্য্যন্ত অন্ধকারের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত মনে মগ্ন হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদ অঞ্চলে লইয়া তাহার গৃহ-দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিয়া ফিরিয়া গেল তাহার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিল না; বিধাতার অযা-চিত সেই আশীর্ব্বাদ জগতের কত জাতিকে, কত দেশকে নব জীবন দান করিয়া ধন্য করিল, কিন্তু অভাগা জাতি তাহার আলস্যে ও অবহেলায় উঠিল না, জাগিল না,—তাহার গৃহদ্বারে বিধাতার আহ্বান বাণী সে শুনিল না। কিন্তু কি জানি কি শুভক্ষণে কি শুভলগ্নে এই বিশ্বের মর্ম্ম মধ্যে বিধাতার যে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই প্রতিধ্বনি সহসা অন্তর মধ্যে উপলব্ধি করিল। এতকাল পরে আজ পুনরায় তাহার সর্ব্বশরীরে ও মনে জীবন ও জাগরণের একটা বহুমুখী চেষ্টা ও চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেখা গেল; সহস্র স্বর্ণ কিরণ আজ জাতীয় জীবনের নব প্রভাতকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে দেখিয়া সকলে সুখী হইল। এই জাতীয় জীবনের শুভ প্রভাতে দেখা গেল জাতিটী সংসারবিমুখ, নির্জ্জন-বাস ও শুষ্কতপস্যা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্য জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। মাতৃভূমির শিক্ষিত, ধীশক্তি সম্পন্ন, জন হিতোৎসাহী, স্বার্থত্যাগী সন্তানমণ্ডলী চতুর্দ্দিক হইতে সমবেত হইতেছেন। তাঁহারা সকলেই জীবনের উচ্চতম ও পবিত্রতম উদ্দেশ্যে

উত্তেজিত [illegible] প্রতি করিয়া সাধনে এবং পরিবর্ত্তন, এবং স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচনে দৃঢ়চিত্ত। জগতের [illegible] অলীক আনন্দ ও অহঙ্কার এবং মানব জীবনের সকল উদ্দেশ্যের অতীত এক উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের চির আকাঙ্ক্ষায় আকুল ও আবিষ্ট। তাঁহারা জানিলেন, যে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাঁহারা এক্ষণে এক নূতন জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং এক্ষণে সকলকে এই নূতন অবস্থার উপযোগী পথাবলম্বন করিতে হইবে। ইহাও তাঁহারা জানিলেন, যে তাঁহাদের সম্মুখে এক্ষণে যে সকল সমস্যা উপস্থিত কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও দর্শনের অনুশীলনে, তাহার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব এবং নিজ নূতন অবস্থার মধ্যে যদি তাঁহারা উন্নতি লাভে ইচ্ছুক হন তাঁহাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই নবজীবনের আভাস ভারতের সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে। জানি না ভগবানের "আহ্বান বাণী" মোহ নিদ্রায় অভিভূত আর্য্য সন্তানগণকে জাগরিত করিয়া জাতীয় নবজীবন প্রদান করিয়াছে কি না। এ সমস্যার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

বিজনে মল্লিকা।

(১)

কে তুমি রে সাদা ফুল নিৰ্জ্জন গহনে,
আপনার মনে দোল প্রফুল্ল আননে,
মলহীন পরিমলে, বিতরি বনজ দলে,
কানন সৌরভ পূর্ণ কর সযতনে ;
কেবা করে সমাদর, গন্ধে কর ভর ভর,
বনে ফুটে বনফুল বনে [illegible],
যতনের সনে কেহ না করে [illegible]।

(২)

মলয় মারুত কিবা মৃদুমন্দ বেগে,
মাখিয়া পরাগ অঙ্গে মধু ভার লয়ে,
স্বরবে না যদি কাছে, উচ্চৈঃ অকপটে,
তোমার মহিমা সদা অশান্ত হৃদয়ে,
ভক্তিভরে সমাদরে, গাহিতে চরাচরে,
আনন্দে নিশ্চিন্তে চির বাখানি বখান,
গুণী বিনা কে জানিবে গুণীর সম্মান।

(৩)

গুঞ্জরি ভ্রমর গীত মধুর নিক্কণে,
গায়িছে অমিয়মাখা সঙ্গীত শিঞ্জনে,
তব গুণ গান সদা, করিতেছে অবিরত,
শ্রবণ বিবরে সদা সুধা বরিষণে ;
সদানন্দ সাধুচিত, হয়ে কিবা আনন্দিত,
গুণীগণ গুণগ্রাম করিতে কীর্ত্তন,
তাহাকি করিতে পারি সদা স্মরণ ?

(৪)

কুসুমে সুষমারাশি হেরিয়া নয়নে,
আমার সৌরভে সাধ কেন নাহি মনে,
কেমনে বা এ সদন, নিৰ্জ্জন গহন বন,
সফল হইবে তব প্রীতি সম্ভাষণে ;
নিৰ্জ্জন বিপিনবাসি, ত্যজি এই অভিলাষ,
কুসুমকাননে তুমি করহে গমন,
তুমি যে রতন তব সেই নিকেতন।

(৫)

কহিল সরল ফুল বিনয় বচনে,
বরষিল সুধা যেন শ্রবণে শ্রবণে,
বাসনা মনের সাধ, হিংসাপূর্ণ যে সমাজ,
সরলতা উদারতা শূন্য যেই মনে,
মহেশের কীর্ত্তিরাশি, সুধা মাখা প্রাণ হাসি,

এ বিজন বিপিনেতে করিব প্রচার,
যে শক্তি পেয়েছি তার এই সদাচার।

লেখনী অবতার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

যথা সময়ে রণবাদ্যের সহিত নাচিতে নাচিতে বাতব্যাধিদুষ্ট পক্ষিরাজধ্বয় কোনক্রমে আরোহী সমেত গাড়ীখানিকে হাওড়া ষ্টেসনে পহুঁছাইয়া দিল। ভাড়া চুকাইয়া তাঁহারা জিনিসপত্র সহ ষ্টেসনে নামিলেন।

ট্রেণও ছাড়িতে বড় বিলম্ব ছিল না। পাহাড়ী অজগর সর্পের মত ইঞ্জিনমুখ দিয়া অতি উচ্চ ফোঁস ফোঁস শব্দ বাহির হইতেছিল। অবতার বাবু মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া পত্নীকে অগ্রে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। অতি কষ্টে, অতি দ্রুততার সহিত জিনিসপত্রগুলি একে একে প্রায় সমস্তই গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে তাঁহার 'উত্তমঅর্দ্ধাঙ্গিনী' ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ঐ যা, কি ক'ল্লে, টিনের ভাঙ্গা বাক্সটা কি হল?"

স্বামী। তাতে আর এমন কি আছে?—যাক্‌গে।—না হলে দেরী হ'য়ে যাবে।

স্ত্রী। বল কি গো! তাতে আমার আর্সি চিরুণী, এ সব আছে। দেখ, দেখ, যদি পাওয়া যায়। সে ঐ গাড়ীতেই ফেলে এসেছি।

সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া অবতার বাবু ভাঙ্গা বাক্সের সন্ধানে চলিলেন। তিনি ভগ্ন বাক্সটি পাইলেন বটে, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইলেন। এইবার অবতার বাবুর ভাগ্যচক্র আবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে দুঃখের প্রান্ত দেখাইয়া দিল। গাড়ী ছাড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অবতার বাবুর প্রিয়তমাকে চুরি করিয়া দুষ্ট লৌহশকট ছুটিয়া পলাইল। তখন হতবুদ্ধি ও আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ও ব্যাকুল কণ্ঠে "বাঁধ, বাধ" শব্দে প্লাট্‌ফর্‌মের উপর দিয়া অবতার বাবু ছুটিলেন। রেলের লোকেরা বহু কষ্টে তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?" অবতার বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ থাকিয়া কহিলেন, "সে একলা কোথায় চ'লে গেল!"

সকলে কহিল, "কে মহাশয়?"

অবতার। আর কে? আমার মাথা আর মুণ্ডু!

সকলে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া—কোন পরামর্শ না করিয়া—বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত প্লাট্‌ফর্‌মের উপর পদচারণা করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী মেলগাড়ীতে পত্নীসন্ধানে যাইতে মনস্থ করিলেন।

অঘোর কুহকিনী আশা ব্যঙ্গচ্ছলে পত্নীহারা উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের চিত্তে একটী লাল রঙের আলো জ্বালিয়া বিষাদ কালিমা ঢাকিয়া দিল। গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে পহুঁছিল। অঞ্জনানন্দনের অনুকরণে তিনি এক লম্ফেই ট্রেণে আরোহণ করিলেন। গাড়ী ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল। মুহূর্ত্ত তাঁহার পক্ষে শতাব্দী বোধ হইতেছিল। শেষে গাড়ী ছাড়িল। এই শ্রীরামপুর, এই চন্দননগর, শেষে মেল মহাশয় হুগলীতে 'বাপ্‌ বাপ্‌' শব্দে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিল। অবতার বাবুও অবিলম্বে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্রামাগার কয়টীতে হারাণ সিকি বা দুয়ানির মত তন্ন তন্ন করিয়া পত্নীর অনুসন্ধান করিলেন। হায়, সকলই নিষ্ফল হইল!

এমন কি ষ্টেসনের প্রত্যেক কুলিকে পর্য্যন্ত কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পাইলেন না। শেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া বিষন্ন বদনে এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে এই ভাব উদয় হইল, "তবে কি প্রিয়-তমা আমার অদর্শনে আমারই অনুসন্ধানে পুন-র্ব্বার কলিকাতা রওনা হইয়াছে? না জানি, এতক্ষণ আমাকে হাওড়ায় দেখিতে না পাইয়া হয়ত অজস্র অশ্রুপাত করিতেছে।"

(৬)

চিন্তা অচিরে তাঁহাকে কার্য্যে প্রণোদিত করিল। তিনি প্রত্যেক ষ্টেসনে সংবাদ লইবার জন্য একখানি যাত্রীট্রেনে কলিকাতাভিমুখে চলিলেন। গাড়ী যখন চন্দননগরে থামিল, সংবাদ লইবার জন্য তিনিও অবতীর্ণ হইলেন। সেখানে সংবাদ পাইলেন, অবিকল তাঁহার পত্নীর মত একটী কামিনী অসুস্থ হওয়াতে গাড়ী করিয়া তথা হইতে চুঁচুড়ায় গিয়াছে। লেখনী অবতার আর কাল বিলম্ব না করিয়া চুঁচুড়ার দিকে ছুটিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। আকাশে মেঘমালা ফুলিয়া ফুলিয়া কালরাত্রির সূচনা করিতেছিল। তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবলই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকালয় ছাড়িয়া যখন মাঠে উপস্থিত হইলেন, তখন দুর্দ্দৈব, যে দুর্দ্দৈবের সহযাত্রী, যেন এ কথারই সত্যতার প্রমাণের জন্য মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত রূপে দেখা দিল। কিন্তু প্রেমিক কি বজ্রপাতে ভয় পায়? তবে তাহাকে লোকে প্রেমিক বলিবে কেন? অন্ততঃ এই জন্যই বোধ হয় অবতার মহাশয় তাঁহার বড় সাধের বেশভূষা ভিজাইয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে কোথাও আশ্রয় না লইয়া চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে লোকের মুখে জ্ঞাত হইলেন, যে পার্শ্বস্থ বাটীতে সত্যই একটী স্ত্রীলোক পীড়িত অবস্থায় আসিয়াছে। তাঁহার তখন বিশ্বাস গাঢ় হইল। বিশ্বাস হইল এ রমণী আর কেহই নহে তাঁহারই হারান হৃদয়-মণি। দ্বারে করাঘাত করিলে সমাগত দাসীর মুখেও ঐ কথা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পরে দাসী কহিল, "আপনার কি আবশ্যক?"

তিনি কহিলেন, "'কি আবশ্যক'?—খবর পাইবামাত্র তাহারই জন্য এই বড় জল মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিতেছি।"

দাসী কহিল "তবে আসুন, আমরা আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" দাসী তাঁহাকে রুগ্নার শয্যা গৃহ দেখাইয়া দিল।

গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া তিনি গবাক্ষের বস্ত্র মধ্য হইতে স্তিমিত দীপালোকে রুগ্না রমণীর মুখমণ্ডল অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। দর্শন মাত্র ঝটিকা-সন্তাড়িত প্রেমিক আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রুগ্নার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। রুগ্না এই আকস্মিক ব্যাপারে যার পর নাই ভীত ও চমকিত হইয়া "মাগো ম'লাম গো" শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া বাটীর ভৃত্য ও দাসী কার্য্যান্তর হইতে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্য বলপূর্ব্বক অবতার বাবুকে টানিয়া লইয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?

অবতার মহাশয় ত অবাক!

রুগ্না অতি কষ্টে কহিল, "এই পাষণ্ড কোথা হইতে আসিয়া আমার উপর অত্যাচার করিতেছে।"

ভৃত্য তখন বজ্রাদপি গম্ভীরস্বরে কহিল, "হারামজাদ, পাজী, কে তুই?"

হতবুদ্ধি দাসী এতক্ষণে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ওমা, তবে কি তুমি ডাক্তার নও?"

ভৃত্য তখন স্বকীয় সুকোমল হস্ত ও পদের সাহায্যে অবতারকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিয়া উত্তম মধ্যম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

'অতি প্রেমিকতা' বলিয়া যে পেত্নীটা এতক্ষণ অবতারের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, প্রহারের চোটে পলাইতে পথ পাইল না। তখন প্রহারে অচৈতন্যপ্রায় অবতার বাবু আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আর আমাকে মারিও না, এবার মারিলে মরিয়া যাইব। আমি ভুল করিয়াছি,—আমার স্ত্রী হারাইয়াছে, খুঁজিতে আসিয়া এই বিপদে পড়িয়াছি।"

ক্রমে তাহারা আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রেমিককে ছাড়িয়া দিল।

(৭)

আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, সেই ভগ্ন টিনের বাক্সটী এতাবৎ অবতার বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। প্রহারে জর্জ্জরিত, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়, বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত, নিরাশ প্রেমিক ভগ্ন বাক্সটী হস্তে লইয়া বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, অবতার বাবুর বাটী হুগলী সহরে। নিশাকালে নিঃশব্দে একজনকে বাক্স হস্তে যাইতে দেখিয়া চোর অনুমানে একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। পদে পদে বিপদের পদদলিত হইয়া অবতারের হৃদয়টা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। অবতার ভাবিলেন, "ভগবান আজ আমাকে লইয়া বুঝি কোন রঙ্গ করিতেছেন।"

তাঁহাকে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি?"

অবতার। শ্রীলেখনী অবতার কানী।

ইন্‌। তুই কি করিস্?

লেখনী অবতার মনে মনে ভাবিলেন, "ভাগ্যে যাহা আছে ঘটুক, যথার্থ কথাই বলি।" পরে বলিলেন, "আমি কলিকাতার সুবিখ্যাত 'শঠশিরোমণি, বঞ্চনাবিশারদ' কোম্পানীর এটর্ণী আফিসের একজন বিশ্বস্ত কেরাণী।"

ইন্‌স্পেক্টার সহাস্যে কহিলেন, "তোর এরূপ স্পষ্ট কথায় আমার অনেক কষ্ট বাঁচিল। আচ্ছা, তুই চোর চূড়ামণিকে চিনিস্?"

অবতার। হাঁ, চিনি।

ইন্‌। তুই জানিস্ যে চূড়ামণি জাল করে টাকা নিয়েছে? তুই ত তার সহায়তা করেছিস্?

এই কথা শুনিবামাত্র অবতার বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, এবং ভয়ে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে অবতার মহাশয় নির্দ্দোষী ছিলেন। সাহস তাঁহাকে আশ্রয় করিল। গাম্ভীর্য্যের সহিত সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "অবতার বিশ্বাসঘাতক এমন কথা কে বলে? পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও অবিশ্বাসের কাজ আমার দ্বারা হইতে পারে না। এক বিশ্বাসের জোরেই আমি এটর্ণী অফিসে চির সম্মানিত।"

তাঁহার এইরূপ সতেজ উত্তর শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টার একটু বিস্মিত হইলেন, পরে কহিলেন, "নে, নে, আর বাক্‌চাতুরী করিস্ না;—এই দেখ্ তোর মনিবগণ আমাদের কি লিখেছেন।"

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার তাঁহাকে একখানি পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রে লেখা ছিল ঃ—

মহাশয়,—আমাদের অফিসের দুইজন কেরাণী জাল করিয়া কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে। শুনিলাম তাহারা দুই জনেই হুগলীর টিকিট কিনিয়াছে।...একজনের নাম, চোর চূড়ামণি; তাহার আকৃতি নিম্নলিখিত প্রকার, ... ইত্যাদি। এই ব্যক্তিই জাল করিয়া টাকা লয়।

আর এক জনের নাম লেখনী অবধান কালী। আকৃতি ..ইত্যাদি প্রকার। এই বার চূড়ামণির সহায়তায় ছিল আমাদের এরূপ বোধ হয়। অবতার গত কল্য বাটী যাবে বলিয়া তিন দিবসের ছুটি লয়। অনুসন্ধানে জানা গেল সেও বাটী যায় নাই।. ইত্যাদি।"

পত্র শুনিয়া অবতার মহাশয় নির্দোষী হইলেও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন এবং অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ইন্‌স্পেক্টরের হুকুমে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাজতে লইয়া যাওয়া হইল।

(৮)

ঝড় বৃষ্টি ক্রমে থামিয়া আসিল। আকাশব্যাপী কাল কাল মেঘ সমূহ জল হইয়া ঝরিয়া গিয়াছিল। প্রভাতে মেঘমুক্ত নীলাকাশপটে বালরবির রাঙা ছবিখানি আঁকিয়া স্বর্ণমণ্ডিতা প্রকৃতি দেবী মধুর হাসি হাসিতে ছিলেন। প্রকৃতির কি বিচিত্র পরিবর্তন। এই কান্না, এই হাসি। হাসি কান্না লইয়াই জগৎ।

সংবাদ পাইয়া এটর্ণী অফিসের শঠশিরোমণি মহাশয় হুগলীর থানায় প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনিবকে দেখিয়া পদপ্রান্তে পতিত হইয়া অবতার কহিলেন, "মহাশয়, কি অপরাধে অধীনকে এই দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে"?

মনিব কহিলেন, "শনিবার বৈকালে তোমায় যে চেক দেওয়া হয় তাহার টাকা আমাদের খাতে নাই কেন?

অবতার বাবু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "এইবার সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি। তাড়াতাড়িতে বোধ হয় সেটাদের টাকা জমা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তবে চূড়ামণি নিশ্চয়ই চেক চুরি করিয়াছে।" এই বলিয়া নিজের বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিলেন।

মনিব কহিলেন, "এখন আমরা বুঝিলাম চূড়ামণিই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। তুমি নির্দোষী।"

এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে চূড়ামণি মুক্তাবস্থায় থানায় আনীত হইল। চূড়ামণিকে দেখিয়া অবতার মহাশয় সাহসী হইয়া তাহার সহিত কহিলেন, "ওরে চূড়ামণি, বিশ্বাসঘাতক, কোন অপরাধ পাইবার হয়। কেন নিরপরাধকে ক্লেশ দিতেছ?"

মনিবও বলিলেন "চূড়ামণি, আমরা সমস্তই জানিয়াছি; এইবার তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।"

চূড়ামণি মনিবের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কহিল, "এ দাসকে মাপ না করিতে হইবে। অবতার নির্দোষী, আমিই সমস্ত দোষী।"

শঠশিরোমণি মহাশয়ের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ হাতকড়ি লাগাইয়া চূড়ামণিকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইল। অবতারও মুক্তি পাইলেন। মনিব মহাশয় অবতারের নির্দোষীতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার এক সপ্তাহ ছুটি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

(৯)

মুক্তি পাইয়া অবতারের আনন্দের সীমা রহিল না। সমস্ত হারানর কথা একবারেই বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। অবিলম্বে বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাতৃ স্নেহের ধন একটী মাণিক, আঁধার ঘরের দীপ, অবতার লোক কাননের একমাত্র পারিজাত স্বরূপ প্রিয়তমা প্রণয়িনীকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া যেন হাতে আকাশের

চাঁদ পাইলেন। অতঃপর প্রিয়ার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একটু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "হায় প্রিয়ে, তোমাকে হারাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি তাহা ভগবানই জানেন। আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি কেমন করিয়া জানাইব? যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত এখনই একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী আনিয়া চিরিয়া দেখাইতাম।"

পত্নী স্বামীর মুখে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "মেয়ে মানুষের মাথায় যে বুদ্ধিটুকু আছে ভগবান কি তোমার ঘটে তত-টুকুও দেন নাই! হুগলিতে গাড়ী আসিবা মাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। মুটে নিকটে আসিলে তাহাকে মোট দেখাইয়া দিলাম। তাহাকেই কিছু পুরস্কার দিব বলায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া দিল। আমি গাড়োয়ানকে আমাদের ঠিকানা বলিলে নির্ব্বিঘ্নে পহুঁছাইয়া দিল। তুমি না আসাতে আমরা বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। মা ও বাবার বিনোদ ঠাকুরপোকে তোমার অনুসন্ধানে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। যা' হোক্ তোমার বুদ্ধিকে ধন্য! যে জন্য এত বিপদ ঘটিল কই আমার সেই ভাঙা বাক্স?"

স্মিতমুখে বেথনী অবতার কহিলেন, "ভবী ভোলবার নয়। প্রিয়ে হে, তুমি আর ভাঙা বাক্সর কথা তুলিও না। উহাই সকল বিপদের মূল।"

স্ত্রী। সে কি! যার জন্য এত কাণ্ড তাহাই হারাইলে! তবে তোমারই হার।

তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া অবতার কহিলেন, "আনিয়াছি, বাহিরে আছে।"

স্ত্রী। না, না, ফাঁকে বেথ'না, নিয়ে এস।

অবতার বাবু অচিরে আদেশ পালন করিলেন। তখন পরিহাসরসিকা অবতার হৃদয়তোষিণী মৃদু হাস্যে কহিলেন, "যাও, এখন স্নান করে এস, মাথা ঠাণ্ডা হোক্। ছিঃ, ছিঃ, এমনও হয়; রাম! রাম!

সমাপ্ত।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

ভারতমাতার প্রতি আমেরিকার পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয়তমে ভগিনি! তোমার আর্য্যঋষিগণ যে কেবলমাত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় কালাতিপাত করিয়াছেন এরূপ মনে করি না। তাঁহাদের রাজনীতি সম্বন্ধীয় চর্চ্চাও বহুল পরিমাণে ছিল। আর্য্যঋষিগণ বহুপরিশ্রমসাধ্য বহুদিনব্যাপী প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে যে সমস্ত জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা ধীর ভাবে আলোচনা করিলে যে কত অত্যদ্ভুত বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু কালের এমনি কুটিল গতি যে মানবপ্রকৃতি সেই আবর্ত্তনে পড়িয়া কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে। এমন কি তোমার যে সকল সন্তান সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও অলৌকিক বিবেক শক্তির ভূয়সী প্রমাণ দিয়াছেন তাঁহাদেরও সেই অলোকসামান্যবিবেকিনী শক্তি স্থানে স্থানে প্রতিহত হইয়া ভ্রমসঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হয়। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংসর্গের অসদ্বিবেকবতী শক্তিতে তোমার সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই হিন্দু আচার, ব্যবহার, রাজনীতি,

ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রানুশীলন, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই বীতশ্রাদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। জানিনা তাহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিবিধ বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারাদির দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষের কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছে কিনা। সুতরাং কাল স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া আজ আমি আর্য্য রাজনীতির সহিত পাশ্চাত্য রাজনীতির সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। এরূপ করিবার প্রয়োজন এই যে সহসা পলিত কেশ, স্খলিত কায়, গলিতবয়াঃ আর্য্যঋষিগণের মার্জ্জিত রুচি প্রসূত বিষয়গুলির অবতারণা করিলে বিংশ শতাব্দীর আত্মাভিমানী, অনুকরণপ্রিয়, শিক্ষিতম্মন্য তোমার সন্তানগণ বিশ্বাস করিতে কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। ভগবান্ কামন্দক বলিয়াছেন ;—

"নিষ্ফলং ক্লেশবহুলং সন্দিগ্ধ ফলমেব চ।
নকর্ম্ম কুর্য্যাম্মতিমান্ সদা বৈরানুবন্ধিচ" ॥

অর্থাৎ যে কার্য্য ফলদায়ক নহে, অথবা যে কার্য্যে সর্ব্বদা শত্রুতা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, এমন সকল কার্য্যে বুদ্ধিমানগণ হস্তক্ষেপ করিবেন না। পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর বার্ক (Burke) মহোদয় আমেরিকানদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিলন (Conciliation with America) বিষয়ে বক্তৃতাকালীন যুদ্ধের অনিশ্চিততা বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন : —"It may subdue for a moment, but it does not remove the necessity of subduing again ; and a nation is not governed, which is perpetually to be conquered" ইহার তাৎপর্য্য এই বল প্রয়োগ দ্বারা প্রথমতঃ কোন একটী জাতিকে জয় করা যাইতে পারে, কিন্তু একবার জয় করা হইল বলিয়াই যে বিজিত জাতি চির অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? তাহারা পুনরায় বিদ্রোহ হইলে পুনরায় তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে। সুতরাং যে জাতিকে ক্রমাগতই জয় করিতে হইল, সে জাতি বিজিত কেমন করিয়া বলিব?"

প্রিয়তমে ভারতি! পাশ্চাত্য প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ বার্ক (Burke) সাহেবের উক্তি যেন ঠিক কামন্দকীয় শ্লোকটীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধ দ্বারা কোন দেশ জয় করা অপেক্ষা যদি সামাদি উপায় দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলোপধায়ক হইতে পারে। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা জয় পরাজয় উভয়ই সংঘটিত হইতে পারে কিন্তু অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ফলপ্রাপ্তির আশা অধিক। অন্য উপায়ে ব্যর্থ মনোরথ হইলেও অবশেষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার উপায় থাকে। কিন্তু প্রথমতঃ যুদ্ধে বিফল মনোরথ হইলে আর উপায়ান্তর থাকে না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ বার্ক মহোদয় লিখিয়াছেন—

"My next objection is its uncertainty. Terror is not always the effect of force ; and an armament is not a victory. If you do not succeed, you are not without resource ; for conciliation failing, force remains, but force failing, no further hope of reconciliation is left. Power and authority are sometimes bought by kindness ; but they can never be begged as alms by an impoverished and defeated violence"

ইহার তাৎপর্য্য এই, আমার আর এক আপত্তি যুদ্ধের অনিশ্চয়তা। বল প্রয়োগে সতত লোকদিগকে ভীত করিয়া বশীভূত করা যাইতে পারে না। আর অধিক সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্রাদি

থাকিলেই যে নিশ্চিত জয়লাভ হইবে তাহারও কোন কারণ দেখিতেছি না। যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই। কারণ, সন্ধি করিতে গিয়া যদি সন্ধি স্থাপন না হয় তাহা হইলে অবশেষে বল প্রয়োগ করিবার অবকাশ থাকিবে। কিন্তু প্রথমেই যদি যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজয় হয় তাহা হইলে সন্ধি হইবার আর আশা থাকিবে না। কখন কখন সদয় ব্যবহারে প্রতাপ ও আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরাজিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া কখনই প্রতাপ ও আধিপত্য লাভ করিতে পারে না।

আর্য্যরাজনীতিজ্ঞগণ চারিটি উপায় দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনের উপদেশ দিয়াছেন। সেই চতুর্ব্বিধ উপায় এই—সাম দান, ভেদ, ও দণ্ড। উপরোদ্ধৃত বার্ক মহোদয়ের মতের পরিপোষকতার জন্য, এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের লক্ষণাদি বলিবার পূর্ব্বে উহাদিগের উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে আর্য্য রাজনৈতিক মহোদয়েরা কি বলিয়াছেন তাহাই বলিব। নীতিশাস্ত্রোক্ত চতুর্থ উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ যুদ্ধেন কদাচন॥"

ইহার অর্থ প্রথমতঃ সাম প্রয়োগে অর্থাৎ প্রীতি, সমাদরদর্শন, হিতকথনাদিদ্বারা, অথবা দান দ্বারা অর্থাৎ হস্তি, অশ্ব, স্বর্ণাদি দিয়া কিম্বা ভেদ সংঘটনে অর্থাৎ বিপক্ষ রাজার অমাত্যাদি অথবা তাঁহার অনুজীবিবর্গের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিয়া উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে একটীর দ্বারাই হউক অথবা দুই তিনটীর দ্বারাই হউক শত্রু জয় করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু চতুর্থ উপায় যুদ্ধের দ্বারা নহে। রাজনীতিজ্ঞ আর্য্যঋষিগণের এই সকল উক্তি শ্রবণে তাঁহাদিগকে অনেকে কাপুরুষ মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কারণ বিবেকী ব্যক্তি মাত্রেই ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা অধিক এবং অনিষ্ট সম্ভাবনা আদৌ নাই অথবা যদিও অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহার পরিমাণ অতিশয় অল্প, এমন কার্য্যে বিবেকিগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ মনু যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুদ্ধমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ যুদ্ধকালে যখন জয় পরাজয়ের কোনরূপ নিত্যতা দৃষ্ট হয় না, তখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করাই উচিত। তবে কি ভগবান্ মনুর মত যে, কোন ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না? তাহা নহে। তাঁহার মতে যুদ্ধ রাজনীতি শাস্ত্রের শেষ উপায়। যখন আর কোনরূপ উপায়ের সুবিধা নাই, তখন সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এবিষয়ে ভগবান্ মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানাম সম্ভবে।
তথা যুদ্ধ্যেত সংযুক্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপায় যথা সাম, দান, ভেদ ইহাদিগের প্রয়োগে ও যেখানে যাহাতে জয়লাভ হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। জয়লাভ না ঘটিলে সম্মুখ সমরে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে কিন্তু কখনই যুদ্ধে ভঙ্গ দিবে না।

প্রিয়তমে ভগিনি! আর্য্যঋষিগণ তেজস্বীতার পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারা কখনই ভীরুতার প্রশ্রয় দেন নাই; তবে দুঃসাহসিকতার বিরোধী। সহসা কোন কর্ম্মই করিবে না, একথা তাঁহারা

পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শুদ্ধ বিষয়ে সহসা প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দেন নাই। তাই বলিয়া তাঁহারা যে জাতকের প্রশংসা দাতা এরূপ মনে করা কাহারও উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

কর-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

হস্ত-বিবরণ।

যে শাস্ত্র শরীরচিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহ জানাইয়া দেয় তাহাকে সামুদ্রিকশাস্ত্র কহে। কর-বিজ্ঞান সামুদ্রিক-শাস্ত্রের প্রধান অংশ। ইহাদ্বারা করতল, করপৃষ্ঠ, অঙ্গুলী, নখর ও অপরাপর হস্তস্থিত চিহ্ন হইতে মনুষ্যপ্রকৃতি ও বিকাশের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী সমস্তই স্পষ্ট বুঝা যায়।

এতাবৎ কালের মধ্যে পৃথিবীতে এরূপ কোন যন্ত্র, কল বা কৌশল মানবের আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা অশেষপ্রয়োজনসাধক মনুষ্যহস্তের ন্যায় কার্য্যোপযোগী। কিম্বা মনুষ্য নিজের মত সর্ব্বকর্ম্মক্ষম এমন কোন সম্পূর্ণ যন্ত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। হস্তের বর্ত্তমানতা ও কোমলতা দৃষ্টে কর্কশ কিম্বা সুকুমার কার্য্যোপযোগী নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য চিহ্নের দ্বারাও কোন প্রকার কার্য্যে উপযুক্ত স্পষ্ট জানা যায়। এবং হস্তরেখাদিও তাহাদের নিয়ন্তা বুদ্ধিবৃত্তির ভাণ্ডার মস্তিষ্কের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাপন করে। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই হস্তের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আবশ্যক হওয়া উচিত।

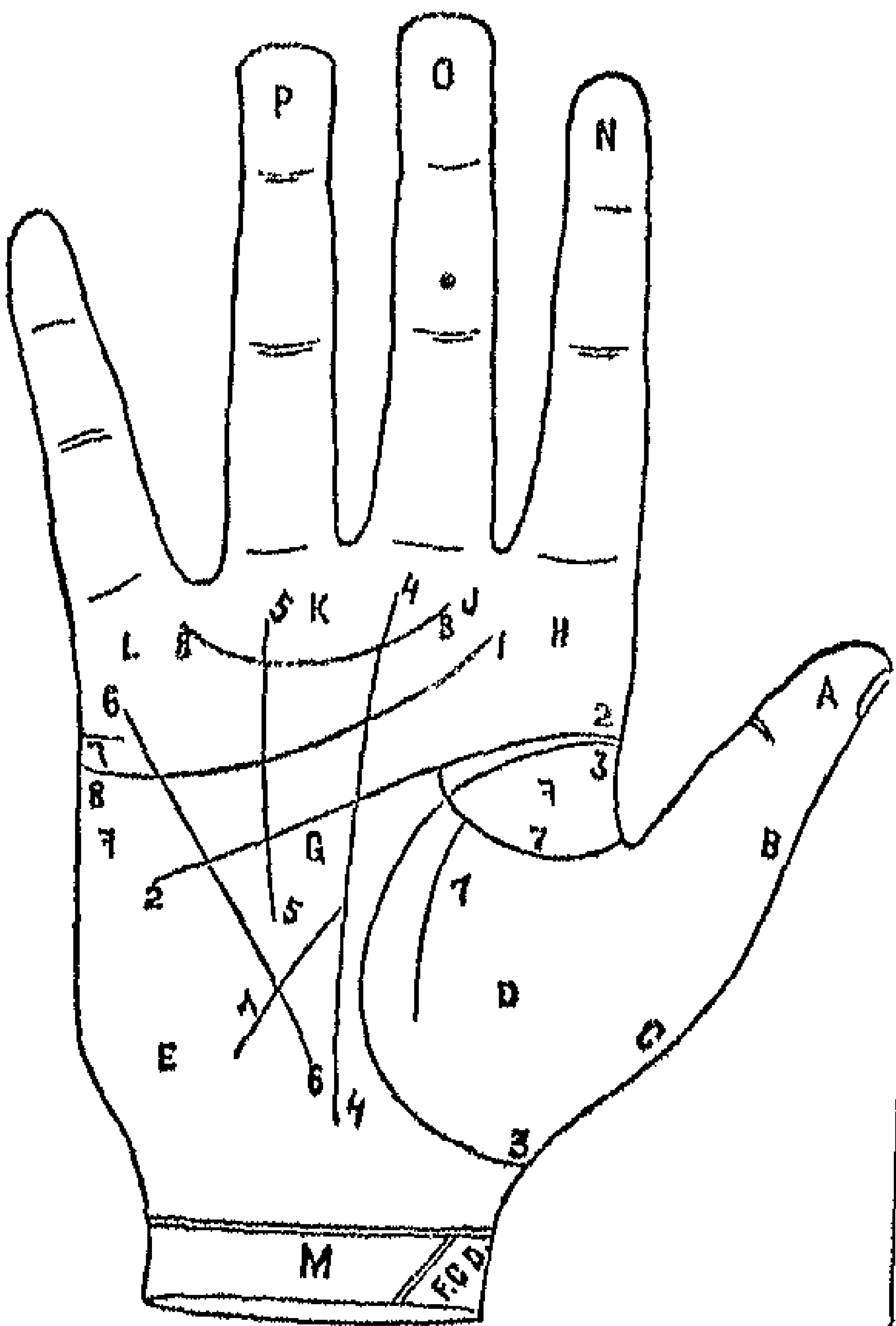
এই শাস্ত্র অনুসারে হস্তস্থিত চিহ্নের ব্যাখ্যার দ্বারা মনুষ্যের বিকাশের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী ও চরিত্রের দোষ এবং গুণ তন্ন তন্ন করিয়া জানা যায়। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসক রোগের পরিণাম কি হইবে যে ভাবে স্থির করেন করতলদৃষ্টে ভবিষ্যৎ কথনও প্রায়শঃ সেইরূপ, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাকে অন্ধ কুসংস্কারের অন্তর্গত করা উচিত নহে। কারণ, করাঙ্কিত যে রেখা সমূহ ভবিষ্যৎ ঘটনা সমূহের চিহ্ন প্রকাশ করে, সেই রেখাসকলের পরিবর্ত্তন, সংযুক্ত ও মিলাইয়া যাইতেও দেখা যায়। ইহা কেবল অদৃষ্ট-গণনাও নহে; কিন্তু প্রমাণবর্জ্জিত মানব-চরিত্র-চিত্রাঙ্কদর্শন। যে শক্তি বাসনা বশীভূত করে, এবং মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, করাঙ্কদর্শনে বিস্ময়কর জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। সাধারণ দর্শকগণ কেবলমাত্র ফলাফল দেখিতে পান, কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞানী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেন এবং অধিকতর সুস্পষ্টভাবে স্বরূপ-বিবৃত করিতে প্রয়াসী হন।

এই শাস্ত্রদ্বারা স্বাস্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি এবং মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ও এই জ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। [illegible] বিজ্ঞানবিদের কোন বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্ব্বে অতি সাবধানে এবং সূক্ষ্মভাবে চিত্রদর্শনে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

কোন ব্যক্তির দোষসমূহের এবং অকৃতকার্য্যতার বিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত সামান্য নহে। যদি আমরা এইরূপে সংসারের ভগ্নোৎসাহীকে সাহসপ্রদান করিতে পারি এবং অশান্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে পারি, তবে যে ইহা অতীব লোকহিতকর হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কর-বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইবার

পূর্ব্বে আমাদের নিম্নলিখিত চিত্রটী স্মরণ রাখা আবশ্যক।



A. ইচ্ছাশক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্ব।

B. বিচারশক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয়পর্ব্ব।

C. প্রায়শক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয় পর্ব্ব।

D. শুক্রের স্থান। E. চন্দ্রের স্থান।

F. মঙ্গলের স্থান। G. মঙ্গলের ক্ষেত্র।

H. বৃহস্পতির স্থান। J. শনির স্থান।

K. রবির স্থান। L. বুধের স্থান। M. মণিবন্ধের রেখা।

N. সূচ্যগ্র বা শুণ্ডাকার অঙ্গুলী। O. চতুষ্কোণ অঙ্গুলী।

P. স্থূলাগ্র অঙ্গুলী।

1-8 হৃদয়-রেখা।	3-3 আয়ু-রেখা।
2-2 শিরোরেখা।	4-4 ভাগ্যরেখা।
5-5 রবিরেখা	6-6 স্বাস্থ্যরেখা।
7 বিবাহ-রেখা	8-8 শুক্রবন্ধনী।

মনিবন্ধ অবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত করতলের বহির্ভাগের নাম "করভ"। অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় গ্রন্থির বহির্দ্দেশে ও মনিবন্ধের সহিত অঙ্গুষ্ঠের সংযোগস্থলকে "কোণ" কহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হস্তবিভাগ।

পশ্চাদ্ভাগ হইতে দেখিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকলের গঠন কতপ্রকার বিভিন্ন ভাবের তাহা করাঙ্কদর্শনপটু সকলেই অবগত আছেন।

এই পার্থক্য দর্শনেচ সামুদ্রিকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হস্তকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপ এক এক শ্রেণীর হস্ত এক একরূপ চরিত্রের নিদর্শন বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সপ্তগ্রহানুসারে হস্তের শ্রেণীবিভাগ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক মতে প্রধানতঃ হস্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,— শুণ্ডাকার, স্থূলাগ্র এবং চতুষ্কোণ। কিন্তু সূক্ষ্মাগ্র এবং মিশ্রলক্ষণ সমন্বিত এই দুই ভাবে হস্তের নিজস্ব লক্ষণও বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকন্তু, অবিমিশ্র লক্ষণান্বিত অর্থাৎ অঙ্গুলী সমূহ সম্পূর্ণভাবে শুণ্ডাকার, স্থূলাগ্র অথবা চতুষ্কোণাকৃতি কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়।

শুণ্ডাকার অঙ্গুলী, কল্পনা-শক্তি; স্থূলাগ্র, কার্য্যকারিতা-শক্তি; এবং চতুষ্কোণ, বিচার-শক্তি প্রকাশ করে।

শুণ্ডাগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তির কার্য্যকারিতা

শক্তি অপেক্ষা কল্পনা প্রবণতাই অধিক ; বিশেষতঃ যদি হস্ততালু কোমল হয়, তাহা হইলে ইহারই আধিক্য বুঝায় ।

স্থূলাগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তি কার্য্যে তৎপর হন। বিশেষতঃ যদি হস্ততালু কোমলতাশূন্য হয় তবে তাঁহারা স্বহস্তে কার্য্য করিতে ভাল বাসেন। করতল কোমল হইলে তাঁহারা অন্যের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লয়েন। কোনপ্রকারে কার্য্য তাঁহাদের চাইই ।

যাঁহাদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চতুষ্কোণ তাঁহারা কারণানুসন্ধায়ী হন ; প্রমাণ ব্যতীত কোন কার্য্যেই তাঁহারা অগ্রসর হয়েন না।

শুণ্ডাকার অঙ্গুলী-বিশিষ্ট হস্ত যদ্যপি কঠিন ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া বোধ হয় তবে তাহারা স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করে।

মিশ্রাঙ্গুলীযুক্ত হস্তের বিষয় কেবল প্রবল লক্ষণগুলির দ্বারা বিচার্য্য। অর্থাৎ, যদি পাঁচটী অঙ্গুলীর মধ্যে তিনটী বা ততোধিক স্থূলাগ্রবিশিষ্ট বা সূচ্যগ্রবিশিষ্ট হয় তবে তাহা মিশ্রিত স্থূলাগ্র বা মিশ্রিত-সূচ্যগ্র-লক্ষণযুক্ত বলিতে হইবে ।

প্রত্যেক অঙ্গুলীর লক্ষণও পৃথকভাবে পরীক্ষা করা উচিত, এবং তৎপরে ভাল মন্দ বিচার করা কর্ত্তব্য।

অঙ্গুলী সকলের লক্ষণ সমূহ ।

তর্জ্জনী ।

সূচ্যগ্র বা শুণ্ডাকার—অনুভূতি, পাঠানুরক্তি ।
স্থূলাগ্র—কার্য্যবাহুল্য।
চতুষ্কোণ —সত্যপ্রিয়তা।

মধ্যমা ।

সূচ্যগ্র—লঘুচিত্ততা।
স্থূলাগ্র—কার্য্যতৎপরতা।
চতুষ্কোণ—পরিণামদর্শিতা।

অনামিকা।

সূচ্যগ্র—কলাকৌশল-চিন্তা (artistic thought)
স্থূলাগ্র—সাহিত্য, চিত্র বা নাটকানুরাগ।
চতুষ্কোণ সামান্য শিল্প বা কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য সাহিত্যাদির আলোচনা।

কনিষ্ঠা।

সূচ্যগ্র- -নিপুণতা (tact)
স্থূলাগ্র -কার্য্যদক্ষতা।
চতুষ্কোণ শিক্ষাপটুতা।

অঙ্গুষ্ঠ।

সূচ্যগ্র—দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি।
স্থূলাগ্র—প্রবল ইচ্ছাশক্তি।
চতুষ্কোণ—স্বমতাভিমানিতা।

তর্জ্জনী শুণ্ডাগ্র বা সূচ্যগ্র হইলে অনুভূতি (*perception*) ও পাঠানুরক্তি বুঝায়, এবং অপরাপর অঙ্গুলীচয়ের দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে কিয়ৎপরিমাণে স্বভাবের কোমলতা উৎপাদন করে। সেইরূপ কনিষ্ঠাঙ্গুলী সূচ্যগ্র হইলে, অপরাপর চতুষ্কোণ অঙ্গুলীর কঠোর তার্কিকতা, নিপুণতার (অর্থাৎ, যেখানে যেরূপ ভাবে চলা উচিত ঠিক সেইরূপ ভাবে কর্ম্মকুশলতার) দ্বারা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাব আনিয়া দেয় ; অথবা, যেমন কোন সূচ্যগ্র হস্তে মধ্যমাঙ্গুলী চতুষ্কোণ হইলে পরিণামদর্শিতার দ্বারা অবিমৃষ্যকারিতার সংশোধন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী ।

হত্যা রহস্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুন্না।

জগন্নাথ ঘাটের অতি সন্নিকটে একখানি মুদিখানার দোকান। দোকানে জিনিসপত্র অতি অল্প; সামান্য সামান্য নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়াই দোকান।

দোকানখানি অধিকারিণীর নামেই খ্যাত ছিল। সকলেই তাহাকে "মুন্নার দোকান" কহিত মুন্না একজন আধাবয়সী স্থূলা স্ত্রীলোক; তাহাকে দেখিলে এক কালে সুন্দরী ছিল বলিয়াই বোধ হইত।

যদিও বহু দিবস হইল মুন্না এই দোকানের অধিকারিণী; কিন্তু দোকানে যে অধিক জিনিস-পত্র বিক্রয় হইত তাহার কোন লক্ষণ ছিল না। পরন্তু এই দোকান সম্বন্ধে প্রতিবাসীরা গোপনে নানাপ্রকার জল্পনা করিত। গভীর রাত্রে নানা-প্রকার নূতন লোক তাহার দোকানে গোপনে আসা যাওয়া করিত। কাজেই প্রতিবাসীরা মুন্নাকে কেবল মুদিখানা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় লিপ্ত থাকিতে সন্দেহ করিত। পুলিসের লোকেরাও তাহাকে চোরাইমালবিক্রেতা বলিয়া অনেকবার ধরিয়াছিল এবং এখনও তাহার উপর তীক্ষদৃষ্টি রাখিত। যাহা হউক এই প্রকার কোন গুপ্ত ব্যবসায়ে মুন্না কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর মুন্না আহারাদি সমাপন করিয়া দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একজন কদাকার, গুণ্ডাকৃতি, লোক দোকান ঘরে প্রবেশ করিল।

আগন্তুক কহিল, 'কিগো, কি হচ্ছে? এবার বড় শীগ্‌গির এসেছি, না?"

মুন্না উত্তর করিল, "আমি মনে করেছিলাম তুমি কাশীতে গিয়েছ।"

"না কোন কাজ জুটলো না, কাযেই যাওয়া হ'ল না। সবই বরাতের দোষ।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মুন্না কহিল, "তাইত! তোমার আবার দোষ কিসের?"

"সে যা হোক, কিছু টাকা চাই।"

"এবার আমার কাছে তোমার কিছু হবে না।"

"সে আমি জানি - তুমি আগেই অমন 'দেব না' বল।" এই কথা বলিয়া আগন্তুক একটী ছোট মদের শিশি বাহির করিয়া তাহা হইতে খানিকটা পান করিল।

মুন্না দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি আগেও দেব না, পরেও দিচ্ছি না।"

আ। আমিও টাকা না নিয়ে যাচ্ছি না। টাকা না যদি নিতে পারি তবে আমার নাম রহমন নহে।

মু। দেখ্ মুখপোড়া এখনি তোকে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

"দেখ, সোয়ামীকে কি অমন ব্যাভার কর্‌তে আছে? সোয়ামীকে কোথায় মান্যি করে টাকা কড়ি দেবে, তা নয় পুলিসের ভয় দেখাচ্ছ!"

"আ মরে যাই, মিন্‌সের কথা দেখ, আমি মেয়ে মানুষ, আমি টাকা দেব?"

"কেন, তোমার যা আছে তা ঐ পেঁচামুখো ছোঁড়াটার জন্যে রাখবে নাকি?"

মুন্না বলিল, "খবরদার, তাকে গালাগালি দিও না তোমার ভাল হবে না, বলছি।"

"কেন, আমি কি বল্লুম?"

"না, কিছু বল নি!"

"তবে যে তুমি ব'কছ?"

"আমার যা কিছু, সব তার।"

"সেটা লোকা।"

"কেন, তোমার মত চোর নয় বলে ?"

"তোমার আগেকার সোয়ামীও আমার মত ছিল।"

"দূর্‌, তা কেন ? সে আমায় খুব ভালবাসতো।"

"তা, আমিও তোমায় কোন কম ভালবাসি ?"

"কেন, আমিই কি তোমায় যত্ন করি না ?"

"থাক্‌, আর পীরিতে কাজ নেই! এখন কিছু টাকা দাও।"

"তুমি কি মনে কর, তুমি চুপ করে বসে থাকবে, আর আমি রোজকার ক'রে তোমায় খাওয়াব ?"

"টাকা না দিস্‌ নেই নেই, অত কথায় কায কি ? তোর দেরাজে ফিতে বাঁধা যে চিঠিগুলা আছে সেগুলোর কথা যাকে বল্লে টাকা পাব, তার কাছেই যাই।" কথা শুনিয়া মুন্নার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তবে রে মুখপোড়া, আমার কোথায় কি থাকে তুই যে বড় দেখিস্‌ ?"

"সোয়ামীর কাছে পরিবার কিছু লুকোয় রে মাগী ?"

"কতদিন তুই কাগজগুলা দেখেছিস্‌ ?"

"হপ্তা খানেক হবে।"

"পড়েছিস্‌ ?"

"কি করি ? না পড়ে থাকৃতে পাল্লেম না।"

"এখন বুঝি তাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্‌ ?"

"এইবার থাতে জমেছে !"

"কাজেই। যতদিন তোকে টাকা দিব ততদিন চুপ ক'রে থাক্‌বি ত ?"

"নিশ্চয়ই ; কে সাধ ক'রে অমবক্সের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ? যা হোক, কাগজ পড়ে জানলাম তুমিও কম নও, তুমি একখানি।"

কম্পিত স্বরে মুন্না কহিল, "চুপ !"

"আবার কি বল্‌তে হবে কিছু টাকা চাই ?"

মুন্না কয়েকটী টাকা লইয়া তাহাকে দিয়া বলিল, "যাও, এই নাও, কাল আবার কিছু দেব। কিন্তু দেখ, এরূপ দাবিদাওয়া বড় বেশী হবে না।"

"কে তোমায় দান দিচ্ছে ?"

"তোমাকে টাকা দেওয়া ত আমার দান করা।"

"তা যা বল, তাতে আমার বড় আসে যায় না, আমার টাকা পেলেই হ'ল।"

"তা ব'লে তুমি যে মন মন চাইবে পাবে আর আমি দেব, তা হবে না; কালে আমি আর এক পয়সাও দেব না, তাতে আমার যা হবার হবে।"

এমন সময় একজন ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক যুবক তথায় প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সংমনও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এই তরুণ বয়স্ক যুবক, দয়ালচাঁদের সরকার গেঁটু।

মুন্না তাহাদিগকে দোকানে বসিতে বলিয়া একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক কোণে একটী দেরাজ ছিল। দেরাজ খুলিয়া মুন্না তাহার চিঠির তাড়া দেখিতে পাইল না;—চক্ষে অন্ধকার দেখিল, চীৎকার করিয়া ভূতলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গেঁটু সরকার।

তিন দিবস হইল দয়ালচাঁদ পুলিস কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। সহরে এ বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সংবাদপত্রের বিশেষ

টাঁরেরা জীর্ণ, কীটদষ্ট, স্বেদগন্ধি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নোটবুকহস্তে সংবাদসংগ্রহের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান। বাজারে ক্রেতাবিক্রেতা দর দস্তুর ভুলিয়া গিয়া কেবল হত্যাসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একজন বলিতেছে, "বাপ্! কলি-কালের ছেলের কাণ্ড দেখ! জন্মদাতা পিতা—তাকে খুন!" অপরজন বলিল "যেমন দিনকাল পড়েছে তা এর আর আশ্চর্য্য কি?"

এইরূপ যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল সে তাহাই বলিতে লাগিল। কেহ বা এইকথা লইয়া অপরের সহিত তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল। মোট কথা হত্যাবিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হইতেছিল।

আজ এমন সময়ে হেমচন্দ্র তাঁহার অফিস-গৃহে একাকী উপবিষ্ট আছেন। হেমচন্দ্র পুলিস-বিভাগে প্রায় দশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া এক্ষণে স্বাধীনভাবে ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নামে বড় বড় বদমাইসও ভীত হইত। যদিও তিনি অত্যন্ত অধিক পারিশ্রমিক লইতেন বটে, তথাপি তাঁহাকে কার্য্যাভাবে একদিনও বসিয়া থাকিতে হইত না; বরং, তাঁহার হস্তে এত অধিক কার্য্য আসিত যে তজ্জন্য তাঁহাকে অন্যলোক নিযুক্ত করিতে হইত।

হেমচন্দ্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন লোক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে। লোকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ও হৃষ্টপুষ্ট। চুলগুলি কটা। পরিধানে কেবলমাত্র একখানি ছোট কাপড়।

হেমচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া আগন্তুক কহিল, "আমার নাম ঘেঁটু সরকার।"

"ঘেঁটু সরকার" বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে হেমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন।

ঘেঁটু কহিল, "কি করব ম'শাই, বাপ মা নাম রেখেছেন, তাতে আমার কি দোষ?"

"তাহলে তোমার নাম ঘেঁটু?"

"মা ঐ ব'লে ডাকৃত'।"

"ভাল; হেসেছি মনে কিছু ক'রনা"

"কি মনে ক'রব, ম'শাই?"

"থাক্; তোমার কি চাই বাপু?"

"কিছুই না।"

"তোমার কিছু আবশ্যক না থাকিলে আমার কাছে এসেছ কেন?"

"আর একজনের জন্যে।"

"ভাল, তার কি দরকার?"

"আপনাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে।"

"কি কাজ?"

"আজ্ঞে, ম'শাই, যাতে ধর্ম্মের জয় হয়।"

"এ বেশ কথা। যে লোকের হ'য়ে তুমি এসেছ সে কে?"

"একজন মেয়েমানুষ।"

"তাঁর নাম?"

"নাম বল্‌তে পার্‌বনা মশাই।"

"তা, আমাকে কি দরকার?"

"হাওড়ায় খুনের কথা আপনি শুনেছেন?"

"কোন খুন? দয়ালচাঁদ পুত্র কর্ত্তৃক হত হয়েছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, ঐ খুনের সম্বন্ধেই দরকার। কিন্তু দয়ালের ছেলে খুন করেনি—কারণ, তাহ'লে আপনি ও আমি খুন করেছি।"

"তবে তুমি অমরকে নির্দ্দোষী মনে কর?"

"তা না হ'লে আমি আপনার কাছে আস্‌ব' কেন?"

"কিসে তুমি তাকে নির্দ্দোষী মনে কর?"

"এই মেয়েমানুষটী আমাকে বলেছেন, অমর নির্দ্দোষী।"

"এই কথাতেই তোমার বিশ্বাস সে নির্দ্দোষী?"

"হাঁ, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ। আপনিও যদি অমরকে দেখে থাকেন, তাহ'লে আপনিও তাকে নির্দ্দোষী বলবেন।"

"আমি অমরকে খুব জানি।"

"আপনি কি তাকে খুনী মনে করেন?"

"যেরূপ ঘটনাচক্র দেখিতেছি তাহাতে তাহাকেই খুনী বলিয়া বোধ হয়।"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঘটনাচক্রের অনেক সময় ভুল হয়।"

"তা সত্য বটে।"

"তাহ'লে আপনি অমরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে পারেন।"

"আগে তুমি বল, কে আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে?"

"তা ব'ল্‌তে পারবনা।"

"তবে আমিও এ কাজ লইতে পারিব না।"

ঘেঁটু সরকার অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "কি জানেন, ম'শাই, নামটা পাছে পেরকাশ হয়, তাই ভয়।"

"আমি কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।"

"তবে এতক্ষণ বলেন নি কেন?"

"এখনত বলিলাম।"

"তাঁর নাম অলকা,—বিনোদলাল কেদারের মেয়ে।"

"বিনোদলাল না জেজারতির কার্য্য করেন?"

"হাঁ।"

"তুমি কি তাঁর বাটীতে কাজ কর?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"তোমাকে কি কাজ কর্ত্তে হয়?"

"রাতদিন অলকার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে হয়, কিছু দরকার হ'লে এনে দিতে হয়, এই সব কাজ কর্ত্তে হয়। মোটকথা আমি তার সমস্ত তদারক করি"।

"তাহ'লে অলকার রক্ষক তুমি?"

"তা নিশ্চয়ই।"

কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র কিছুতেই হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। হাস্যের প্রবল বেগে চক্ষু হইতে জল নির্গত হইল। অতি কষ্টে হাস্য-বেগ থামাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন, "ঘেঁটু, তুমিই আমার কাল হ'লে দেখ্‌ছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

রামধনু।

(১)

কে তুমি সুন্দর মরি ছড়ায়ে কিরণ ছটা,
ঝটিকার অবসানে আকাশে করেছ ঘটা,
জানিতে বাসনা তব চাহিনা বিজ্ঞান কাছে,
কে তুমি জেগেছ মরি উদার গগন মাঝে।

(২)

অনন্ত বিশাল ধনু সপ্তবর্ণ সুরঞ্জিত,
অনন্ত বিমান পথে হয়ে সদা প্রকাশিত,
সৃষ্টির সুষমা রাশি করিছ প্রচার কিবা,
ছড়ায়ে গগনমাঝে অতুল উজ্জ্বল বিভা।

(৩)

দিগন্তপ্রদেশব্যাপী মহেশের কীর্ত্তিরাশি,
দিগন্তপ্রদেশব্যাপী সুধামাখা মধুহাসি,
যাঁহার শকতি বলে করিছ প্রচার তুমি,
সে মহান্ মহেশেরে চায় সদা চিত্তভূমি।

(৪)
জ্ঞানবান্ নর বলি, মিছা করি অহঙ্কার,
অজ্ঞানভাণ্ডার মম হয়ে যাক্ ছারখার,
মহেশের কীর্ত্তিরাশি প্রচারে কি আছে মন,
করেছি কি তার তরে কিছু আমি আয়োজন।

(৫)
প্রকৃতি-দেবীর প্রিয় নিসর্গের সুসন্তান,
অনন্ত বিমানব্যাপী বিশাল ধনুকখান,
নিরখি তোমার রূপ মনে হয় অবিরত,
তুচ্ছ তব কাছে হায় মানব ভূষণ যত।

(৬)
জলদ পটল হেরি সুনীল গগণ কায়,
করিছে নর্ত্তন শিখী হইয়া উন্মত্ত প্রায়,
বিস্তারি কলাপকুল, করি পুচ্ছ প্রসারণ ;
তোমার ও রূপরাশি করি তায় নিরীক্ষণ।

(৭)
মেঘসনে উভজনে, আবদ্ধ কি প্রেম জালে,
তাই কি উন্মত্ত হও হেরিলে গগণভালে ?
বিভাবসু অনুরাগ কর তুমি নিরীক্ষণ,
উপেক্ষিয়া দিবাকরে করে শিখী নরতন।

(৮)
নীরব বাসনা তব নীরব তোমার ধর্ম্ম
নীরবে সাধিছ তুমি বিশ্বনিয়ন্তার কর্ম্ম,
নিসর্গই শিক্ষাদাতা, নীরবে শিখায় সব,
কি সঙ্কেত কি ইঙ্গিত করিছেন ভবধব।

(৯)
শ্রেষ্ঠ জীব আমি নর, মিছা করি অহঙ্কার,
অহঙ্কার করিবার কিবা বল আছে আর,
নিত্য ত্যাজি অনিত্যেতে আমার মানস ধায়,
সংসারের সুখজালে মজিতে সতত চায়।

(১০)
যেই শিক্ষা শিখায়েছ নীরবে সুন্দর ধনু,
ভুলিবনা যতদিন রহিবে এ ক্ষীণ তনু,
নীরবে করিব কাজ নীরব বাসনা হবে,
প্রাণমন চিন্তাশক্তি বিভুকাজে সদা রবে।

আর্য্যশক্তি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য। সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদিগের দেশে চিরকালই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত আছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিটী জাতি। চতুর্ এবং বর্ণ, এই দুইটী শব্দে সমাস করিয়া "চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিভ্যঃষ্যঞ্" এই পাণিনীয় সূত্রে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা এই চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, চতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণ চতুষ্টয় শব্দের যে অর্থ, চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দেরও সেই অর্থ।

এই চারিটী বর্ণ ভিন্ন আমাদিগের দেশে পঞ্চম বর্ণ নাই। তবে এই চারিটী বর্ণের অসবর্ণ বিবাহ হইতে কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সমস্ত সঙ্কর জাতি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে আর অসবর্ণ বিবাহ নাই, সুতরাং আর নূতন বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি হইতেছে না। এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত ; এবং শূদ্র এক জাতি। কারণ, প্রথম তিন জাতির উপনয়নাদি সংস্কার আছে, এজন্য ইহাদিগকে দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাতি বলে। উপনয়ন সংস্কার দ্বিজদিগের দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ। দ্বে জাতি জন্মনী যস্য ইতি দ্বিজাতিঃ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি পদ বাচ্য ; আর শূদ্র দ্বিজাতি নহে,

একজাতি ; কারণ, ইহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই; আর বৈদ্য প্রভৃতি যে জাতি আছে, তাঁহারা যে বর্ণপদবাচ্য তাহারও যে সকল শাস্ত্রীয় বচন আছে উহা অনধিকার চর্চ্চা দোষে এস্থানে আলোচনা করা হইল না। যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

এই চরাচর-বিশ্ব সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সমস্তের মধ্যেই ক্রমিকত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। একেবারে কোনও বস্তুই পরিপুষ্টি বা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহা হইতে ক্রমে শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি বহির্গত হয়, অনন্তর কাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ; অবশেষে একটী বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। জীব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্ব্বাবয়বপূর্ণ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর দন্তোদ্গম, হস্তপদাদির পরিপুষ্টি ক্রমে হইতে দেখা যায়। বাহ্য অবয়বাদিতেও যেরূপ ক্রমিকত্ব দেখা যায়, অন্তরিন্দ্রিয়াদিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অবশ্য সকলেরই অন্তরে জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির বীজ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুযায়ি উপ্ত আছে। সেই বীজ কালসহকারে ক্রমেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমন কখনও দেখা যায় না যে, বালক পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই শাস্ত্রাদিতে প্রাবীণ্য লাভ করিয়াছে অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভে জীবন্মুক্ত হইয়াছে। অতএব আমাদিগের পূর্ব্ব মনীষিগণ এই সমস্ত বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে আমাদিগের ক্রমাধিকার নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
কর্ম্মণা যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥"

অর্থাৎ জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণের পুত্র "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য হইবে, উপনয়ন সংস্কার হইলে "দ্বিজ" পদবাচ্য হইবে ; আর যাগাদিক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা "বিপ্র" সংজ্ঞা লাভ করিবে এবং উপরোক্ত তিনটী নিমিত্ত থাকিলে "শ্রোত্রিয়" এই উপাধি লাভ করিবে। এই চারিবর্ণ ব্রহ্মার মুখ, বাহু, ঊরু এবং পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"

(ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত।)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য ঊরুদেশ হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

এই চারিটী স্থানের প্রাধান্যাপ্রাধান্যানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রুতি যেরূপ বলিয়াছেন, বেদার্থোপদেষ্টা ভগবান্ মনুও সেইরূপ বলিয়াছেন,

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

প্রজাবৃদ্ধির জন্য ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় মুখ বাহু ঊরু এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রজাতিকে সৃষ্টি করিলেন।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন বলিয়া ইঁহাদিগের প্রাধান্য হইল ; তাহার পর ক্ষত্রিয়, তাহার পর বৈশ্য, এবং তাহার পর শূদ্র পরিগণিত হইলেন। ইহাতে যে সমাজে কেহ নিকৃষ্ট বলিয়া গণিত হইবেন তাহা নহে। যাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষাপকর্ষ, তাঁহাকে সেইরূপ পদবী প্রদান করা হইয়াছে ; এবং তদনুসারে কার্য্যও দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের

আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে ইহাদিগের সত্ত্বগুণের সমধিক বিকাশ হইয়াছে, এজন্য ইহাদিগকে বিষয়কর্ম্ম অর্থোপার্জ্জনাদি হইতে একরূপ পৃথক রাখিবারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সতত ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া অপর সাধারণের কিরূপে মঙ্গল সাধিত হয়, তজ্জন্যই চেষ্টা করিবেন। কেবল যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, এরূপ অর্থোপার্জ্জনাদিদ্বারা কালাতিপাত করিবেন। সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন ও সদুপদেশ প্রদানই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানাম্ কল্পয়ৎ॥

অর্থাৎ ছাত্রদিগকে শাস্ত্রপাঠনা, স্বয়ং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, দেবপূজা যজ্ঞাদি, অন্য লোককে দেবপূজা যজ্ঞাদি করান অথবা স্বয়ং তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া দেবপূজাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অন্যকে দান, এবং দান প্রতিগ্রহণ, এই ছয়টী ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের অর্থোপার্জ্জনের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। দান গ্রহণ অথবা যজ্ঞাদির দক্ষিণা হইতে যাহা কিছু অর্থাগম হইতে পারে, তাহাদ্বারাই ইহারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন অন্য কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য বা কৃষিশিল্পাদিরূপ অর্থাগমোপায় অবলম্বন করিতে ব্রাহ্মণগণের নিষেধ। এই কারণেই ব্রাহ্মণগণের মনীষা এত অধিক। সতত শাস্ত্রালোচনাদিতে নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের আত্মা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে; আত্মার উৎকর্ষ যখন এত অধিক তখন তাঁহারা সমাজে সর্ব্বোচ্চস্থান পাইবেন না কেন? যাঁহারা বিষয়চিন্তা ভোগসুখাদি সমস্ত পরিত্যাগে সতত পরোপচিকীর্ষায় অরণ্যবাসী বল্কলধারী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিবেন না কেন? সমাজের নিয়মই এই, যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবেন, তিনি তদুপযুক্ত সম্মান ও প্রাধান্য লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য এবং পরার্থতৎপর বলিয়াই সমাজে তাঁহাদিগের শীর্ষস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
সোমপ্রকাশ-সম্পাদক।

টাইফয়েড্ জ্বর।

প্রায় ৭।৮ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় এই পীড়ার বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমি এমন বলিতেছিনা যে পূর্ব্বে এ পীড়া আদতেই দেখা যাইত না তবে এই, যে আজকালকার মত উহা এরূপ সাধারণ ছিল না। অনেকে বলিতে পারেন যে দিন দিন কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য নানা প্রকারে সহস্র সহস্র টাকা স্রোতের ন্যায় ব্যয় হইয়া যাইতেছে অথচ পীড়া সকল উপশমিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে কেন? একথার উত্তর বড় সহজে দেওয়া যাইতে পারে না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সহরে দিন দিন চারিদিকে উন্নতিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতি ঘন বসতি থাকায় এবং বস্তির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা ও রৌদ্র এবং আলোকের সমাগম না থাকায় ঐ সমুদয় বস্তিগুলিই সহরে পীড়ার আকর হইয়াছিল। অধুনা মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক সেইগুলি অপসারিত হইয়া এবং তৎস্থানে এক একটি পার্ক প্রস্তুত হইয়া সহরের শোভা

বর্দ্ধিত এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের প্রভূত স্বাস্থ্যোন্নতিও সাধিত হইয়াছে। এই জন্যই কয়েক বৎসর যাবৎ রোগের প্রকোপ এখানে আর তেমন লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু জগতে কখন কিসের মধ্য হইতে কি উৎপত্তি হয় তাহা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানযুগেও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। সু এবং কু দুইটি পৃথক জিনিষ হইলেও সর্ব্বদাই পাশাপাশি চলিয়া থাকে এ কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, যেমন সু হইতে কু'র উৎপত্তি হইয়া থাকে তেমনি কু হইতেও সু'র উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরে সেই প্রকার নানাবিধ স্বাস্থ্যোন্নতিক নিয়ম ও উপায় হইতেই কু উৎপত্তি দেখিতে পাই। এই যে সহরের আবদ্ধ পয়ঃপ্রণালী হইতে সর্ব্বদা গ্যাস্ উত্থিত হইতে থাকে উহা নিতান্ত বিষজনক এবং উহা হইতেই নানা পীড়ারও উদ্ভব হইয়া থাকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সহরেই সমুদয়— "খোলা পায়খানা" ছিল, প্রতিদিন প্রাতে মেথরে উহা পরিষ্কার করতঃ মলাদি লইয়া দূরে মাঠে ফেলিয়া দিত। এখন উক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তে সমুদয় "ড্রেনের পায়খানা" করিবার অনুমতি হইয়াছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহরের বার আনা কি চৌদ্দ আনা অংশে উহা প্রচলিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও ভরসা করেন যে, ২।৪ বৎসরের মধ্যে সহরে আর একটিও "খোলা পায়খানা" থাকিবে না। এই পরিবর্ত্তনে কর্ত্তৃপক্ষের অনেক সুবিধা ও সাশ্রয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণের প্রকৃত সুবিধা কিছু হইয়াছে কি? প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত জলের কলে সকল সময়ে রীতিমত জল নিষ্কাশন হয় না, দ্বিতীয়তঃ জল ভালরূপে নিষ্কাশিত না হওয়ার জন্য মলাদি বিশেষরূপে ধৌত হইতে না পারায় ড্রেনের মধ্যেই জমাইয়া থাকে; সুতরাং রাত্রিতে উহা হইতে বহুই বিষময় গ্যাস্ উত্থিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য ডাঃ [illegible] চিকিৎসকগণের মতে টাইফয়েড্ জ্বর হওয়ার কয়েকটী কারণ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গ্যাসেই একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হয়। আমরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে বাড়ীতে এই পীড়া হইয়াছে সেই সমুদয় বাড়ীর মল প্রভৃতি ড্রেনের পায়খানাতেই পোষানহ এই আবদ্ধ মলমূত্রের পচন বা গলন (decomposition) হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহাকে সিউয়ার গ্যাস্ (Sewer Gas) বলে। ইহা এতই ভয়ানক যে উহার নিঃশ্বসনে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি কিছু দিন হইল ভবানীপুরে একজন কুলী পথের ম্যান্হোল (Manhole) উন্মুক্ত করিয়া পরিষ্কারার্থে উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া যায়। উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর একজন কুলীও তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হয়ত হতভাগ্যদের তখনও জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কিন্তু প্রাণের মমতায় আর কেহই তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে চাহিল না। ইহা দেখিয়া এক জন বাঙ্গালী যুবক নগরচন্দ্র কুণ্ডু, তাহাদের উদ্ধারার্থে সাহসপূর্ব্বক তথায় নামিবা মাত্র তাহাদের সহগামী হইলেন। পরে কৌশল পূর্ব্বক দড়ায় বাঁশ বাঁধিয়া একে একে তাহাদিগকে যখন উত্তোলিত করা হইল তখন দেখা গেল যে, সকলেই মারা গিয়াছে। যে গ্যাস এরূপ বিষাক্ত তাহা উত্থিত হইয়া সহরে বিপজ্জনক পীড়ার সূত্রপাত করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

(ক্রমশঃ)

[illegible] সেন।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন। দুঃখ সহ্য করিলে কি হয়?

ভগবান্। সুখে দুঃখে যে ধীর ব্যক্তি অবিচলিত থাকিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী। দুঃখ কিছুই নয় ইহা একেবারে অনুভব করা নিতান্ত কঠিন। দেহ মিথ্যা, দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্নে দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় ভ্রমকল্পনা মাত্র, চিত্তস্পন্দন মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, চিত্তকে ভ্রম দেহাদি হইতে ছাড়াইয়া লও। ইহা বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বিচার দ্বারা দেহ কিছুই নয় জগৎ কিছুই নয় বুঝিলেই বৈরাগ্য আসিল। সুরাপায়ী যদি ক্রমাগত অভ্যাস করে সুরাতে তৃপ্তি নাই তবে সে সুরা ছাড়িতে পারে। বৈরাগ্য আসিলে অভ্যাস দৃঢ় ভাবে হইতে থাকে। চিত্তকে সজাগভাবে ব্রহ্মে রাখাই অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস প্রত্যহ পালন করিতে করিতে ইহা দৃঢ় হয়। যাহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না, সর্ব্বদা অহঃরহঃ তাহাদের প্রণব জপ বা মন্ত্র জপ বা নিষ্কাম কর্ম্ম আবশ্যক। তথাপি পুর্ব্বসংস্কার বশেচিত্ত এক বিষয় ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ে গমন করে, এক বিষয়ের আকার ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্য বর্জ্জিতভাব তাহাকেই তুমি নির্ম্মল চৈতন্য বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। অহঃরহঃ ঈশ্বর প্রণিধানে তুমি সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে অভ্যাস কর। হুসিয়ারে থাক। অভ্যাস দৃঢ় হইলে দেখিবে জাগ্রত নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রিত নহে, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার যে সনাতনরূপ সর্ব্বদা তুমি তাহাই। চিত্তে কোন বিষয়ের উদয় বা প্রলয় অনুভব করিও না, ক্ষোভ ও বিক্ষোভ রহিত হইয়া যথা সুখে অবস্থান করিও দেখিবে জগৎ মিথ্যা, সুখ দুঃখ মিথ্যা, সমস্তই ভ্রম; সুখ ও দুঃখের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? এই রূপে চিত্ত ব্রহ্মে গমন করিলে চিত্তের স্পন্দন রহিত হইল। চিত্তের স্পন্দন রহিত হইলেই জগদাড়ম্বর ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ এই জগৎ চিত্তস্পন্দন কল্পনাজাত ইন্দ্রজাল মাত্র। যতদিন যাওয়া আসা বা যত দিন স্পন্দন যতদিন কোন প্রকার গতি থাকিবে ততদিনই জনম মরণরূপ ভ্রম থাকিবে। যাহার কোনপ্রকার গতি আছে তাহারই মৃত্যু আছে। চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন হইলে সর্ব্বপ্রকার গতি রহিত হইল। কাযেই সুখও নাই, দুঃখও নাই, সুখ দুঃখ সমান হইয়া গেল। সুখ দুঃখ সমান বোধ যাঁহার হইল তিনিই অমরত্ব লাভ করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, সুখ হউক দুঃখ হউক অগ্রাহ্য করিয়া সহ্য করিতে থাক তবেই চিত্ত ব্রহ্মে লাগিতে থাকিবে। অথবা চিত্ত ব্রহ্মে রাখিবার অভ্যাস যে করিবে প্রথম অবস্থায় তাহাকে সুখ ও দুঃখে অবিচলিত হইতে হইবে। সুখও অগ্রাহ্য দুঃখও অগ্রাহ্য। এইরূপে সুখ দুঃখে সমান বোধ করিতে করিতে অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলেই অমর হইয়া গেলে। ইহাই জীবন্মুক্তি; এখন বুঝিলে সুখ দুঃখ সহ্য করিলে কি হয়?

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

সিংহদ দুর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দাক্ষিণাত্যে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত করিতে সমুৎসুক হইয়া মহারাষ্ট্ররাজ প্রথমেই কোন্দণা দুর্গ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই বিষয়ের সুপরামর্শ ও কোন পথে কি উপায়ে কার্য্য করিলে সফলকাম হইতে পারিবেন উমারথের সুবাদার তানাজীমালশ্রীর সহিত সেবিষয়ে যুক্তি করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা এবং একপ্রাণতা বর্ত্তমান ছিল। একদা উভয়ে পাশাপাশি থাকিয়াই পুনার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তাখাঁর গৃহাধিকার করিয়াছিলেন; আফজুল খাঁর সহিত যুদ্ধে এই দুজনেই অতুল সাহসের পরিচয় দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তানাজী আনন্দ সহকারে শিবজীর মতে মত দিয়া আপনি কোন্দানা দুর্গাধিকারের সম্যক্ ভার গ্রহণ করিলেন। এবং ঐ দিবস (৫ই মাঘ) হইতে ৪ দিবসের মধ্যেই দুর্গের শীর্ষ প্রদেশে শিবজীর হরিদ্রা বর্ণের পতাকা উড্ডীন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

তানাজী দুঃসাহসে ভর করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু দেখিলেন যে উহা নিতান্ত সহজে হইবার আশা নাই। কারণ দুর্গ একে স্বভাবতঃই সুদৃঢ় তাহার উপর পুনরায় বিগত কয়েক বর্ষের যুদ্ধকালে বিশেষ কৌশলে ও যত্নপূর্ব্বক অতিরিক্তরূপে সুরক্ষিত ও সুগঠিত করা হইয়াছে। ইহার পাদদেশে এবং পাহাড়ের মধ্যপথে মারুস ও কোলিশ নামক দুই বলিষ্ঠ জাতি বসবাস করিত। ইহারা দুর্গাধিপতির নিমকের চাকর এবং বাহ্য শত্রুর আগমন সংবাদ দুর্গাভ্যন্তরে জ্ঞাপন করাই উহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। পর্ব্বতের সর্ব্বোপরি দুর্গমধ্যে একটি রাজপুত সেনাদল বসতি করিত; এই সেনাদলের অধিনায়ক উদয়ভানু একজন সুবিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। অল্পদিন হইল সম্রাট তাঁহার যশোপ্রভাবে সুখী হইয়া নূতন প্রদেশ রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এতগুলি দুরূহ বাধা তানাজীর সম্মুখে থাকিলেও তাঁহার অনুকূল অবস্থারও অভাব ছিল না। পূর্ব্বে এই কোন্দণা দুর্গ শিবজীরই ছিল এবং তাঁহার মহানুভবতা ও প্রজাপালনে যত্নশীলতা আজও দুর্গবাসীরা ভুলিতে পারে নাই। তানাজী বেশ জানিতেন যে মারুস এবং কোলিশ জাতিদিগকে সহজেই তিনি আপন পক্ষে আনিতে পারিবেন। ভগবান্ যখন যাহার সহায় থাকেন তাহার প্রাণে উদ্যম থাকিলে উপায়ের জন্য অধিক চিন্তা করিতে হয় না; উহা যেন আপনা হইতেই আসিয়া চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে থাকে। এক্ষেত্রে তানাজীরও তাহাই হইল। কোলিশদিগের নায়ক সায়জীর কন্যার সহিত পুনানিবাসী তানাজীর বন্ধু দৌলত রাওয়ের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে, ঐ দিবস বিবাহ। বিবাহের খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে, নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া আছে। এমন দিনে একজন চারণের গীত শুনিয়া সকলে হর্ষের পূর্ণমাত্রা লাভ করিবার আশা করায় বরপক্ষকে একজন চারণ সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তানাজী কি এই স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি বন্ধু দৌলতরাওয়ের সাহায্যে বিখ্যাত গান্ধালী চৌটারাম গায়কের ছদ্মবেশে বিবাহ সভায় সকলের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গীত গাইয়া সমবেত সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের গীতাবলী শ্রবণে যখন

সকলেই মুগ্ধ চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন তখন তানাজী শিবজীর জন্ম ও বাল্যজীবন বিষয়ক একটি সুন্দর গাথা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গায়ক পর পর কেমন করিয়া অম্বাবাইএর প্রার্থনায় দেবাদিদেব কৈলাশেশ্বর শঙ্কর স্বয়ং অবতাররূপে জিজিবাইএর গর্ভে মোগলধ্বংশের জন্য শিবজীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, কেমন করিয়া শিবজী বাল্যকালে গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নাবালক হইয়া হেতকরী ও মাউলীগণকে যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কেমন করিয়া উনবিংশতি বর্ষকালে টোর্ণার পার্ব্বতীয় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন ইত্যাদীপ্রকার শিবজী জীবনের ঘটনাবলী সুস্বরে গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষকালে গায়ক গীতস্বরেই কতকটা অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে আজও তোমরা হিন্দু হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছ। স্বাধীনতা হারাইয়া পরের পাদুকা স্পর্শে আপনাকে ধন্য করিতেছ, পরাধীন জীবন কি এতই সুখময়, হা ধিক্, শতধিক্ তোমাদের জীবনে"। গায়কের এই বাক্যগুলি এতই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে সমবেত সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তানাজী সকলের মুখভাব অবলোকন করিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পরিশ্রম বৃথায় ব্যয়িত হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী চলিয়া গেলে রায়জীর নিকট তানাজী আত্ম প্রকাশ করিয়া সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। রায়জীও সমুদয় শ্রবণ করিয়া মার্‌স ও কোলিশ জাতিদ্বয় দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য হইতে পারে তাহা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এখন কেবল রাজপুত সেনানিবেশটি কোন রূপে বশ করিতে পারিলেই দুর্গটি দখল করিতে পারা যায়। জগদীশ্বর সহায় হইলে কোন কার্য্যেরই বাধা থাকে না। এ বিষয়েও বেশ এক সুযোগ সত্বর উপস্থিত হইল। পরদিন সন্ধ্যার সময় রায়জীর সহ একত্রে ভ্রমণকালে তানাজী দুর্গের ঠিক তলদেশে একজন রাজপুত সৈনিককে আহত করিয়া বন্দী করেন। এই আহত সৈনিকের নাম জগৎসিংহ, ইহার নিকট দুর্গাধিপতি উদয় ভানুর পূর্ব্ব পরিচয়ও পাওয়া গেল। এই প্রবন্ধের সহ উহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় আমরা পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে তাহার বর্ণনা করিলাম।

উদয়ভানুর পিতা এক জন উদয়পুরের ওমরাহ ছিলেন ; ইহারই ঔরসে এক দাসীকন্যার গর্ভে উদয়ভানুর জন্ম হয়। লোক সমাজে জারজ পুত্র বলিয়া গণ্য হওয়াতে উদয় দেখিলেন যে রাজস্থানের সমুদয় উচ্চ কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্য। ইহাতেও উদয়ের মন তেমন বিচলিত হয় নাই। কমলকুমারী নামে একটি সর্দ্দার কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। বংশমর্য্যাদাভিজ্ঞ কন্যার পিতা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া এই উত্তর করেন যে "রাজহংস কখনও পাতিহাঁসের সহ সংযুক্ত হয় না"! উদয় ইহাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া এই অপমানের বিশেষরূপে প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করেন। তথায় আপনাকে মেওয়ারের সর্দ্দার বলিয়া পরিচয় দিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ মুসলমানধর্ম্মপরিগ্রহণ করিয়া সম্রাটের সুনজর প্রাপ্ত হয়েন। যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের উপর সন্দিগ্ধ হইয়া সন্দিগ্ধমনা সম্রাট এই উদয় ভানুকেই বহু সেনা সমভি-

ব্যাঁদের যশোবন্তের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। ইহার উপর সম্রাটের এমন আদেশও ছিল যে সম্ভব হইলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বকও শিবজীকে ধৃত করিয়া বন্দী করিবেন। এইরূপ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে গৌরবান্বিত হইয়া উদয় ভানু মনে করিলেন যে দাক্ষিণাত্যে যাইবার পূর্ব্বে একবার মেওয়ারে যাইয়া আপনার পদমর্য্যাদা দেখাইয়া আসিবেন। সেই জন্য একদা মেওয়ারের সীমান্তে আসিলে ঘটনাচক্রে তিনি এমন সময় এক দৃশ্য অবলোকন করিলেন যে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পাঠক এমন কোন ঘটনা আছে যাহাতে রাজপুতবীরের হৃদয় স্তম্ভিত হইতে পারে। নিশ্চয়ই কোন সম্মুখ শত্রুর প্রতিকৃতি দেখিয়া নহে। উদয়ভানু দেখিলেন যে সম্মুখে তাঁহার নয়নানন্দদায়িনী রূপলাবণ্যময়ী কমলকুমারী বিষাদিনী বেশে মৃত পতির সহ চিতানলে অনিত্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে পতিদেবের সহ চিরানন্দে বাস করিবার আশায় পতির চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য এবং পীড়ার কারণতত্ত্ব। ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে নরনারীর সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকে পড়িয়া বুঝিতে পারে এরূপ সরল ভাষায় লিখিত। সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বঙ্গবাসী স্বাস্থ্যবিসর্জ্জন পূর্ব্বক দিন দিন অবনতির কিরূপ চরম সীমায় উপনীত হইতেছে তাহাও সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচারের আশা করি। পুস্তক প্রাপ্তির স্থান ১৮।১ [illegible] চৌধুরীর লেন কলিকাতা।

জাতীয় মহাসমিতি। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড্ মাষ্টার, নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল, প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে জাতীয় মহাসমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গত অধিবেশনের সম্পূর্ণ বিবরণের বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। নানা অনিবার্য্য কারণে জাতীয় মহাসমিতির সকল কার্য্যই ইংরাজীতে হইয়া থাকে, সুতরাং দেশের জনসাধারণ সমিতির কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিবার সুবিধা পান না। নরেন্দ্র বাবু এ অভাব মোচন করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ নরেন্দ্র বাবু বর্ষে বর্ষে সমিতির কার্য্যপ্রণালীর বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া সমিতির জাতীয় কর্ম্মের সবিশেষ সাহায্য করেন। পুস্তক প্রাপ্তির স্থান ৬৬।২ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দৈবাস্ত্রযোগ। শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী কৃত। গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় "দৈবাস্ত্র অসত্য নহে।" পুস্তকখানি লেখকের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইহাতে নানা শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোরম এবং পুস্তকখানি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলপূর্ণ। প্রত্যেক সমাজ তত্ত্বজ্ঞেরই পাঠ করা উচিত।

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা সাতিশয় আনন্দ সহকারে "আশা" ও "সঙ্গতি" নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আর্য্যভূমি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১৸০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ৴০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে অথবা নিষেধ না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্র পাঠাইতে থাকি।

৩। মূল্য পাঠাইবারকালে অথবা অন্য কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এ কথাটী লিখিবেন। পত্র প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। হস্তাক্ষর অপরিষ্কার হইলে, ছাপায় ভুল অপরিহার্য্য। প্রত্যেক লেখক ও সংবাদদাতা মাত্রেই আর্য্যভূমি একখানি বিনা মূল্যে পাইবেন। প্রবন্ধ ও সংবাদগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। সংবাদদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপন আপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকগণকে বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইঁহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনামত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা, মাসে প্রতি কলম ২ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৮৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
[illegible], সম্পাদক ও প্রকাশক।
[illegible]।

৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীট "আর্য্যভূমি প্রেসে" [illegible] দ্বারা মুদ্রিত

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [আষাঢ় ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

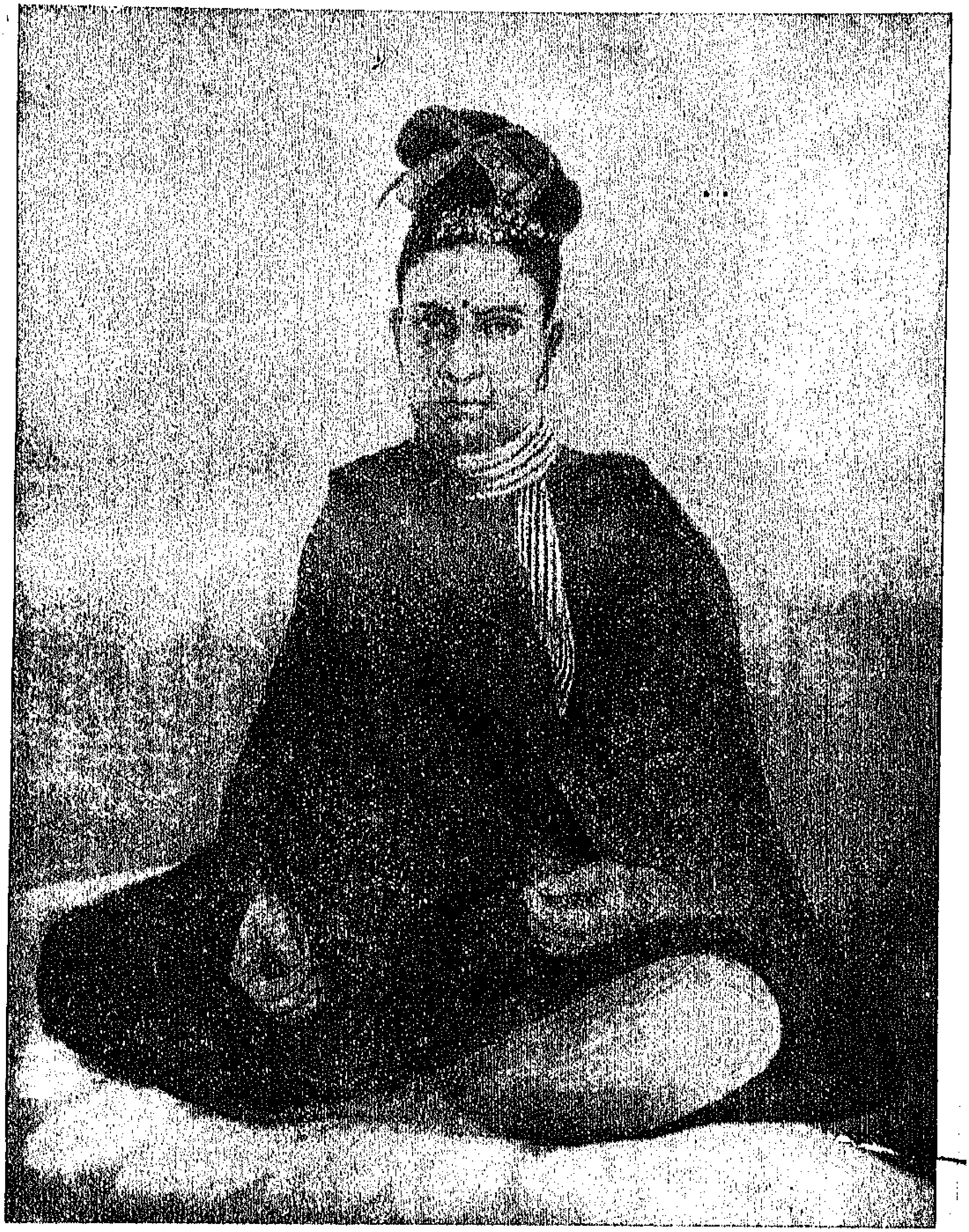
লেখকগণের নাম।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ, শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি; পি দত্ত F. C. S. PH. B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র ও সম্পাদক।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৷০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা)





স্বর্গীয়া মাতাজী তপস্বিনী।

(ভারত মহিলা হইতে গৃহীত)

[১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [বৈশাখ ১৩১৪ সাল]

আর্য্যভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

কলিকাতা।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা) (প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য ৵৹ আনা)

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ। ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে এক দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাপানি কাস ক্ষয় কাস, রক্ত উঠা, গঙ্কাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ এক বটিকা সেবন করিবা মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সকপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, মাঃ ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ পোঃ বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

দেলবাহার তৈল।

এই মনোহর সুগন্ধি স্নিগ্ধ তৈল ব্যবহারে মেচেতা ব্রণ প্রভৃতি বদন মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন সকল তিরোহিত হয়, মুখখানি শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঢল ঢল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতে চর্ম্ম সুকোমল, বর্ণ সুবর্ণাভ হয়। লাবণ্য কুসুম বিকসিত হইয়া উঠে। এই সুবাসিত তৈলে গাত্র ফাটা, ছুলি, ঘামাচি, শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়।

ডজন	৯৲	প্যাকিং ইত্যাদি	॥০
শিশি	৮০	ঐ	৵০

নেপালজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কস্তুরী। (মৃগনাভী) এইখানে পাওয়া যায়।

আর, পি সাধুর উৎকৃষ্ট সুলভ

গোলাপজল।

পাইট্ বোতল ডজন	২।০
বড় বোতল ডজন	৫৲
পাইট বোতল	।০
বড় বোতল	॥০

এইচ্, পি, মুখার্জ্জি

অথবা

আর, পি, সাধুর নিকট

১৬৩ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

দাঁত থাকিতে দাঁতের যত্ন করুন।

বিলাতি মাজন সকলেরই অপেক্ষা দন্তমঞ্জন থাকিতে আপনি কেন অপকৃষ্ট বিলাতি ব্যবহার করেন? ইহার গুণ যেমন অধিক, মূল্যও তদ্রূপ অল্প। একদিন ব্যবহারেই প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সর্বোৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন আর কখনও প্রস্তুত হয় নাই। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দন্তমঞ্জনের গুণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশংসাপত্র।

মেদিনীপুর কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ মহোদয় বলেন যে "আমি বি দাসের টুথ-পাউডার ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। ইহা দ্বারা মাড়ির ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়।"

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের [illegible]।

গেকমনের কিউরেটার শ্রীযুক্ত জি, ডবার মহোদয় বলেন যে "আমি বাবু বি, দাস কর্তৃক প্রস্তুত টুথ পাউডার রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম যে ইহা দন্তরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নির্দোষ উপাদান সমূহ দ্বারা প্রস্তুত এবং অত্যন্ত সুগন্ধ।"

মূল্য প্রতি কৌটা ৴০ আনা।

ঠিকানা—বি, দাস। ৫নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান টুথ প্রিজার্ভার।

যাবতীয় দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ॥০।

এজেণ্ট—এ, এম, জান।

গোপাইটার স্বদেশী সিগারেট কোম্পানী ১০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের প্রমেহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ ও নিত মেহ জনিত অবসাদ সংশোধনের এবং যাবতীয় ব্যাধিসমূহ নির্মূলকরণক্ষম এবং শারীরিক অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য ৩২ বটিকায় এক কৌটা এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা পুলিসকোর্টের মোকদ্দমা হইতে নিষ্কৃত, উত্তম পরীক্ষিত।

কামশাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রাপ্ত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনামূল্যে ডাকমাশুলে পাইবেন।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১৬৬ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [আষাঢ় ১৩১৪ সাল

গৃহলক্ষ্মী।

পুরুষও রমণী লইয়াই সংসার। এই সংসার-রূপ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রমণীগণ পুরুষের দক্ষিণ হস্ত। তাঁহারা মাতৃরূপে আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন, ভগিনীরূপে স্নেহ করিতেছেন, মমতা দেখাইতেছেন, পত্নীরূপে জীবনের সঙ্গিনী হইয়া আছেন। রমণীগণ অশেষ প্রকারে পুরুষের কল্যাণসাধন করিতেছেন। এই রমণী সমাজের প্রতি প্রত্যেক পুরুষেরই সবিশেষ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করা উচিত। আমার বিশ্বাস অন্যান্য সভ্য প্রদেশের ন্যায় আমাদের দেশও রমণীগণের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনে ন্যূন নহে। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমাদের দেশ রমণীগণকে 'গৃহলক্ষ্মী' এই যে বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন, ইহা হইতেই উপলব্ধি হয় কি উচ্চ ও পবিত্রভাবের সম্মান স্ত্রীসমাজকে প্রদান করা হইয়াছে। ফলতঃ রমণীগণ প্রকৃতই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী দেবী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমাদের ঈদৃশী হিতকারিণী রমণী-গণের সুশিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের উপর সন্তানগণের লালনপালনের ভার রহিয়াছে সংসার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। যে শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে শিক্ষা কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নহে। এই নিয়মের বৈপরিত্য বশতঃই বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এই শিক্ষা বিভ্রাটের দিনে, এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়, মহারাষ্ট্র দেশীয় এক বীর রমণী অধঃপতিত বঙ্গ-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুকুমারীগণের

শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই বীর রমণীর নাম মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী। কয়দিন হইল ইহার দেহের অবসান হইয়াছে। আর এই প্রাতঃস্মরণীয়া তপস্বিনী ইহ সংসারে নাই। কিন্তু তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি, তাঁহার পবিত্র নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী।

বঙ্গদেশে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি।

যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য যশঃ সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধিকারিণী, যিনি লোকহিতার্থে আজীবন ব্রহ্মচারিণী সেই নিখিল জনগণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী অলৌকিক প্রতিভাশালিনী রমণীকুলভূষণা, পরদুঃখকাতরা যথার্থে ও পরহিতে উৎসর্গীকৃত জীবনা প্রাতঃস্মরণীয়া যশস্বিনী মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী সেই ভগবতী তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করাইয়া সুখধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় শক্তিশালিনী নারীর বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যভূমিতে অতি বিরল। ইঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের অনেক স্থান বিশেষতঃ "মহাকালী পাঠশালা" অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়। স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই, আর যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে। অতএব উন্নতিকামী ব্যক্তিদের পক্ষে, যাহারা প্রাচীন যুগের স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, জাতি ও দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের মত প্রাচীন অতি গৌরবময় দেশেরই অতীত ইতিহাস এমন সমুজ্জ্বল। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভারতীয় ললনা অতি উচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এদেশের তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী আমাদিগকে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আদেশ করিতেন, তাঁহারই কন্যা এবং বালিকা ও ভাবী বিদ্যালয়ের উপরে আমাদের আশার স্থান পাইয়াছে।

কোন দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে দেশের রমণীকুল কতদূর উঠিয়াছে। যে দেশের নারীকুল উঠিতে পারে নাই, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। কারণ স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধ শক্তি। সুতরাং রমণী দুর্ব্বল থাকিলে সে সমাজ কখন সবল হইতে পারে না। এখানে যে বলের উল্লেখ করা হইল, তাহা শুধু শারীরিক বল নহে, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বল। এই তিন প্রকার বল স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই পূর্ণ বিকাশের পরিণাম। স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই বিকাশক্ষম, সুতরাং তাহাকে বিকশিত হইতে দেওয়া উচিত। এই বিকাশের গতি রোধ করা জগৎ স্রষ্টার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। সুতরাং অধর্ম্ম। বিশেষতঃ একের বিকাশ অপরের বিকাশ সাপেক্ষ। বিধাতার এমনই অদ্ভুত কৌশল, যে পাছে প্রকৃতি পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া সৃষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাত সম্পাদন করে, এইজন্য প্রকৃতি

পুরুষকে তিনি অনন্য সাপেক্ষ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং একের অধোগতি অপরের ঊর্দ্ধগতির বিঘ্নকারিণী। যেখানে পরস্পর—সংলগ্ন প্রকৃতি পুরুষের বল সমান, অথচ গতি ভিন্নমুখী সেখানে পরস্পরের বল পরস্পরকে ক্ষয় করিবে। কিন্তু যদি উভয়েরই গতি ঊর্দ্ধমুখিনী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে দ্বিগুণ বল পাইবে। সুতরাং উভয়ের ঊর্দ্ধগামিনী গতি ও দ্বিগুণিত হইবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশের স্ত্রী ও পুরুষের বলের গতি বিপরীত গামিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অশিক্ষা-নিবন্ধন মহিলাগণ প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধিনী, সুতরাং পুরুষের ঊর্দ্ধমুখিনী গতি নারী জাতির অধো-মুখিনী গতি দ্বারা নিরন্তর প্রতিহত হইতেছে। এইজন্য এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অতি অল্পই উন্নতি হইতেছে। এই বিপরীত গতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

স্ত্রীজাতিকে ঊর্দ্ধগতি প্রবণ করিবার জন্য মাতাজী জগতের পুরাণাদি ইতিহাস হইতে অতীতের রমণী রত্নের চিত্র লইয়া মহাকালী পাঠশালার কুমারীদিগকে উপহার দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। এই রমণীগণের চরিত্র শ্রবণে ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী মাতৃ স্বরূপ সুকোমল মতি বালিকাবৃন্দ যে নিশ্চয়ই উন্নত হইবেন—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মাতাজী বঙ্গমহিলাগণের সম্মুখে যে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র যে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থল এরূপ নহে, অনেক বিষয়ে পুরুষগণেরও আদর্শস্থল। আত্মোৎসর্গে পুরুষ জাতিকে ইঁহাদের নিকট নিশ্চয় মস্তক অবনত করিতে হইবে।

পারিবারিক ধর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, বিনয়বিহীনধার্ম্মিক, মীন-হীন সরোবর ও তরু-হীন জনপদ অনুশোচ্য; সতীত্ব-বিহীন রমণী ততোধিক অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত্য ব্রত অতি কঠোর। এই ব্রত আত্মোৎসর্গের পূর্ণ বিস্ফূরণ। প্রকৃত পাতিব্রত্য কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে; আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্ব ও সেই আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্বের বাহ্য-ক্রিয়া—এই দুইটী ইহার অঙ্গীভূত। যখন আর্য্য-ভূমিতে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল,—স্ত্রীজাতির আপন আপন আদর্শপতি নির্ব্বাচনে অধিকার ছিল,—সেই পবিত্র সরল ও সত্যনিষ্ঠ পুরাকালেই ভারতে সতীত্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই সতীত্বগুণে ভারতললনা—চিরদিন জগতের আদর্শ-রূপিনী আছেন।

সতীত্বগুণেই পতিকে দেবতাবে পূজা আর কোন দেশের মহিলা কখন করিয়াছিলেন কি না জানি না। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, গিরিসুতা—সতী, শকুন্তলা, দ্রৌপদী—প্রভৃতি আর্য্য-ললনাগণ চরিত্রের আদর্শে ও সতীত্বের উজ্জ্বল মহিমায় জগৎ বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের আধুনিক ইতিহাসেও রাজপুত রমণীগণের সতীত্বের অমিত তেজ ও আত্মোৎসর্গের—বীরত্বের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পদ্মাবতী, দুর্গাবতী প্রমর রাজপত্নী, পৃথ্বিরাজমহিষী, কৃষ্ণকুমারী, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী, কর্ণাবতী এবং তারাবাই প্রভৃতি বীর রমণীগণ আত্মোৎসর্গে ও সতীত্বরূপ চরিত্র গৌরবে অদ্যাপি জগতের আদর্শস্থল হইয়া আছেন। রমণীর সতীত্ব ও আত্মোৎসর্গ পারিবারিক ও জাতীয় সুখের নিদানীভূত বলিয়া তপস্বিনী মাতাজী আমাদের বাঙ্গলায় আসিয়া সেই সকল আদর্শ সতীর ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণা রমণীকুলের ছবি তুলিয়া বঙ্গকুল বালিকাগণকে উপহার

দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয় মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য, দণ্ডনীতি ও কুশলতা প্রভৃতি গুণে এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে যাঁহারা ললনাকুলের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগেরও ছবি আঁকিয়া উপহার প্রদান করিয়া পবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।

প্রায় বিংশতি বৎসর গত হইল তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বঙ্গদেশে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিয়াছেন। পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অবশ্যই তিনি গভীর নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা বড় ছিল না। এ দেশে ধর্ম্মবন্ধন নিতান্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মাতাজী মহারাণী অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইতেন। এ দেশের সাধু তপস্বীগণ সাধারণতঃ জনসংসর্গে বিমুখ, কিন্তু সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী নারী হইয়াও তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী সকল লোক হিতকর স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যে এত মনোযোগী হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় মহিলাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্যই তিনি প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইল মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। "মহাকালী পাঠশালা" তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের ফলে এখন এ দেশে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার প্রতি পল্লীতে, হাবড়া কাসুন্দিয়া, সাঁতরাগাছী, বরাহনগর, পানিহাটী, শান্তিপুর, নদীয়া, পাবনা, বহরমপুর, কাশী, রাওয়ালপিণ্ডী প্রভৃতি ২০।২৫টী স্থানে মহাকালী পাঠশালার শাখা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বালিকা এই সকল পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। একটী তেজস্বিনী নারীর কেবল একমাত্র বাঙ্গালা দেশের এইরূপ কার্য্যকারিণী শক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই তাঁহার একটী না একটী কীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কখন কখন সহস্রাধিক টাকা তপস্বিনী মাতাজী নিজ তহবিল হইতে সাহায্যদান করিতেন এবং তদ্দ্বারা কেবল মাত্র বঙ্গদেশের এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। জানি না—সন্ন্যাসিনী এই অর্থ কোথায় পাইতেন। তবে ইঁহার ন্যায় তপস্বিনীদের অর্থাভাব না হইবারই কথা। বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এই চেষ্টার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

যাঁহারা একদেশদর্শী ও সবিশেষ শাস্ত্রচর্চ্চাবিহীন তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহাদের হৃদয়কন্দর কুসংস্কারান্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানসূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ না হইলে সে অন্ধকারজাল ছিন্ন হইবে না। মাতাজী তপস্বিনী তাঁহাদিগকে দুই একটী কথায় এমন যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, বালিকা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রথমে যে গুরুতর মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর হইয়া গেল। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষের সনাতন বেদোক্ত ধর্ম্মের বিরোধী। তাঁহারা আর্য্যসন্তান বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু আর্য্যাচার্য্যদিগের কার্য্যকলাপের অনুসরণে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের বেদে কি লিখিত আছে তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধিৎসা বর্জ্জিত। অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যমহিলাগণ কীদৃশী সুশিক্ষালাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

পুরাকালে আমাদের এই বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা

পুস্তক পড়িতেন না, অথবা অক্ষর আঁকিতে জানিতেন না ; কিন্তু তাঁহাদের গৃহস্থালি বা গার্হস্থ্য উপযোগী শিল্প অথবা সিবন, বিনয়, নম্রতা, সদাচার পূজা পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রমণীগণের প্রকৃত শিক্ষা হয় না; আর এরূপভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে প্রকৃত শিক্ষা হওয়ারও কখন সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতার তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞান নাই যে, কন্যাকে ধর্ম্মকথা শুনাইবেন। পূর্ব্বে কথকতা প্রণালী প্রচলিত থাকাতে রমণীগণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণিত সদুপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চভাব লাভ করিতেন, কিন্তু এখন সে পদ্ধতিও লুপ্ত প্রায়। প্রাচীনা রমণীগণ উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা জানিতেন; কন্যা কি বধূর কোন ত্রুটি দেখিলে, তাহা আওড়াইয়া, তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন,—এই সকল ব্যাপার মাতাজী মহারাণী যখন কলিকাতা ও বঙ্গদেশে প্রথমবার আগমন করিয়াছিলেন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখনকার রমণীরা সে সকল উপদেশপূর্ণ বাক্য গ্রাহ্য করেন না তাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়াছেন, নানা রসের উপন্যাস ও নাটকাদি পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন; এখন কি আর সে সকল বাজে কথা ভাল লাগে? প্রাচীনা রমণীগণ অনেক গুণে বিভূষিতা ছিলেন, গৃহকার্য্য তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য লোকে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। প্রাচীনা রমণীগণ পরদুঃখে কাতরা ও পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইংলণ্ড মার্কিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহারা বলেন, বালক এবং বালিকাদিগের শিক্ষাগত কোন পার্থক্য থাকা বিধেয় নহে। কিন্তু তপস্বিনী মাতাজী বলিতেন, বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই স্ত্রীশিক্ষা যে প্রাচীন আর্য্যেরা কিরূপভাবে প্রদান করিতেন, তাহা এখন আর কেহ দৃষ্টিগোচর করেন না। আর্য্যগণ যখন স্ত্রীশিক্ষা দিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সে স্থলে যে প্রকারে হউক বালিকাগণকে শিক্ষা দিলেই হইল ইহাই আমাদের দেশের অনেকের ধারণা। ফলতঃ কি প্রণালীতে, কি কি শিক্ষা দিলে, আর্য্যমহিলাগণের হৃদয় অধিকতর পবিত্র ও প্রশস্ত হইবে, সে সম্বন্ধে প্রায় কেহই চিন্তা করেন না। এখন কেবল বঙ্গদেশে নয় ভারতের অন্যান্য দেশের রমণীগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু নরনারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিলে পরিণামে তাহারাও বালকদিগের ন্যায় হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক। বর্ত্তমান শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। অধুনা ভারত গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বশ্রেণীর মহাত্মাগণই আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের চরিত্রে বিহিনতা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। যে শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালক এবং যুবকগণের চরিত্রে দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারা হিন্দু মহিলার হৃদয় আরও পবিত্র ও উন্নত হইবে,—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের এক প্রকার পরম শত্রু। পুরুষের

শিক্ষালাভার্থে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা অন্তর্গত মানসিক চিন্তা এ সমস্ত ও রমণীর পক্ষে বর্জনীয়। কারণ ঐ সকল কার্য্য দ্বারা নারী জীবনের সার প্রধান ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও তাহাদের প্রতিপালন শক্তি সম্পাদিত হইতে পারে না। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, নারীদের মস্তিষ্কের আত্যন্তিক আলোচনায় জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পরিপূরণের জন্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, সুতরাং রমণীগণের অন্যান্য অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে তাহাদিগের শক্তি পরিপুষ্ট হয় না। অতএব তাঁহাদের দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি সদ্গুণগুলি যাহাতে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়, তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে হিন্দু মহিলাগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা না পাওয়া এবং বিজাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদিগের বালিকারা বিজাতীয় রীতিনীতির অনুকরণপ্রিয়া ও জাতীয় রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহারে শ্রদ্ধা বিহীনা হইয়া উঠিতেছেন।

যাহারা নরনারীর প্রকৃতির বিভিন্নতা অস্বীকার করেন তাঁহাদিগকে একদিন আমাদের মাতাজী মহারাণী কহিলেন, তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল এবং উল্লিখিত যুক্তিদ্বারা তাঁহাদের উহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। মাতাজী তপস্বিনী বলিলেন, নারী-প্রকৃতি দয়াপ্রবণ হইলেও তাহে পুরুষের প্রাধান্য প্রত্যক্ষ, অতএব সমাজবিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান কেবল মাত্র পুরুষগণই প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নারীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, চিন্তাশক্তি প্রবল, কল্পনা প্রাণময়ী, তথাপি নারীর গম্ভীর আত্মনিবেশের শক্তি পুরুষদিগের তুলনায় ন্যূন। তবে তাঁহাদের গভীর আত্মনিবেশের পথে একটা অন্তরায় আছে, এ কথা সত্য। যাহাদিগকে নিয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কর্ম্মে এবং শিশুপালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদিগের গভীর আত্মনিবেশের অভ্যাস হওয়া কঠিন ব্যাপার। পুরুষের সুযোগ সুবিধা অনেক এবং এই হেতু একের প্রাধান্য ও অপরের অক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়াছে। নারী-প্রকৃতির অন্য এক বিশেষত্ব বাৎসল্যভাব হইল নারীর আত্মসংযোগ। দয়া, স্নেহ, পরসেবা নিঃস্বার্থতা, পরহিতৈষিতা, আত্মত্যাগ এ সমুদায়ই নারীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক ভাব সকলের বিকাশের সহায়তা করিতে পারে, বিপথ শিক্ষার দোষে তাহার বিকৃত হওয়া সম্ভব। নারীজাতির অনেক দুর্ব্বলতা ও দোষ যে কুশিক্ষার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভীরুতা, চিত্তের দুর্ব্বলতা, মনের ক্ষুদ্রতা, আত্মপরায়ণতা প্রভৃতি যে সকল দোষ বালিকাগণের কুশিক্ষার ফল। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক বালিকা শিক্ষার যেরূপ প্রণালী তাহাতে বাহিরে আমাদিগের দেশে ধর্ম্মনাশ, অনাচারিতা ও ব্যভিচার ঘটিবে; কারণ আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে সমুদায় বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার কোনটিতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয় না, অথবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সেবা, পাতিব্রত্য এবং হিন্দু শাস্ত্র বোধক পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা নির্দ্দেশাত্মক কোন সদ্ভাবের শিক্ষা দেওয়া হয় না। অঙ্গনাদিগের বিদ্যাশিক্ষা সত্য। আবশ্যক ধর্ম্মশিক্ষা তদপেক্ষা প্রয়োজন। সাহেবদিগের মেমেরা বিদ্যার সহিত কিছু ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে তাহারা ক্রমশঃ বিপথগা হইয়া উঠে। বিশেষ হিন্দু বালিকাগণ শৈশবকালে বিজাতীয় ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত করিয়া, গৃহকার্য্য, পাকবিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ দক্ষতালাভ করিতে পারেন না,

অথচ অনেকেরই মুখে শুনা যায় যে, বালিকাগণ লেখা পড়া শিখিয়া যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় সুচারুরূপে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বঙ্গের অধিকাংশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে, প্রায় অনেক স্থলেই উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণ সেই প্রাচীন আর্য্য মহিলাদের ন্যায় সুচারুরূপে অথচ অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু যে স্থলে ম্লেচ্ছ শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে কুশিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকেই আবার নানারূপ বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন।

নারীজাতির শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে নারী-প্রকৃতির আলোচনা প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু নরনারীর প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই কেন থাকুক না, যথার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষায় নরনারী ভেদ থাকে না। নারীর প্রকৃতির পার্থক্য উল্লেখ করিয়া যাঁহারা তাঁহাদের উন্নত শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, স্বর্গীয়া দেবী মাতাজী বলিতেন—যে, ঐ সকল ব্যক্তি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র বিষয়ে যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয় তাঁহাদিগের চিত্তকে উন্নত অবস্থায় রক্ষা করিতে হইলে, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। এই উচ্চ অঙ্গের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা কেবল মাত্র পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী মহাকালী পাঠশালায় দেখাইয়া গেলেন। কেহ কেহ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের এরূপ শিক্ষালাভ সমাধা হইতে পারে না বলিয়া মনে করিতেন। কারণ সাধারণের নিকট ইহা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন ঐ সকল ব্যক্তি মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন করিয়া যাইলেন তখন মাতাজী মহারাণীকে মনুষ্যরূপধারিণী দেবী না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

গার্হস্থ্য জীবন এবং নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সকল দেশেরই সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক। জাতীয় উন্নতি বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শিশুগণ গৃহে জননীর নিকট যে শিক্ষালাভ করে তাহাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া গণনা করিতে হয়। নারীগণের চিন্তা এবং জীবন উন্নত না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত মহত্বলাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। জননীই সন্তানগণের হৃদয়ে যথাসময়ে মহত্ত্বাবের বীজ রোপণ করিতে সক্ষম হন। মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানেরা সুশাসিত হয়, তাহারা শৈশবকালেই অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না। মাতা অশিক্ষিত হইলে সন্তানের সম্মুখে সকল প্রকার আলাপ করিতে থাকেন। এইরূপে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকগণ অনেক সময়ে তাঁহাদের অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা সন্তানের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, যে মাতা নিজেই শিক্ষা-করেন নাই, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করিবেন? তিনি তাহার লালনপালনের ভার লইতে সক্ষম, কিন্তু তাহাকে শাসন করিতে একেবারে অক্ষম। এই জন্য আমাদের দেশে অনেক সন্তান আদরেই নষ্ট হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইলে এই ভয়াবহ দোষটী আমাদের দেশ হইতে নিশ্চয়ই দূর হইবে। ইহা সেই তপেশ্বরী আমাদিগকে ভূয়োঃভূয়ো বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা যে এক সময়ে বিশেষ উন্নত ছিল, প্রাচীন সাহিত্য পুরাণাদি তাহার সাক্ষী। বেদের ঋষিপত্নীগণ, গার্গী, অরুন্ধতী,

শাণ্ডিলী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি সনাতনী রমণীগণের নাম সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইঁহাদের কি জ্ঞান গরিমা, কি কঠোর বৈরাগ্য, কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, কি মধুর সহানুভূতি এই দেব প্রকৃতি নারী সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিয়া প্রাচীনকালে ভারতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্বে মাতাই নিজ বালিকাগণকে শিক্ষাদান করা স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে মনে করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে মাতার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সে প্রথা একেবারে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অধুনা দেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দেখিতেছি যাহা পুরুষের শিক্ষণীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা পাইতেছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের উভয় জাতীয় শিক্ষা না হইলে, সংসারের কখনই উন্নতি হইবার আশা নাই। গৃহস্থলি, গার্হস্থ্য শিল্পাদি পাকবিদ্যা ও পূজা পাঠাদি, এই সকল স্ত্রীলোকের প্রধান ও অবশ্য শিক্ষিতব্য। বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাতে এ সকলের অভাব-বশতঃ সমাজ নানা প্রকারে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পতিব্রতা ধর্ম্মই আর্য্যমহিলার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা ও ধর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমান রাজা আমাদের বিজাতীয়, তাঁহাদের ধর্ম্ম রীতি, নীতি ও সামাজিক অবস্থা হিন্দুদের হইতে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। বালক ও যুবকগণ বাধ্য হইয়া শৈশবকাল হইতে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু মহিলাদিগকেও কেন সেই বিজাতীয়ভাবে, বিজাতীয় শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্ত্রীপুরুষের উভয়েই যদি শৈশবকাল হইতে বিজাতীয় ভাষা ও বিজাতীয় রীতিনীতির অনুকরণ করেন, তবে এ দেশে জাতীয় উন্নতি যে কখনও হইবে না তাহা কোন্ সহৃদয় মহাত্মা অস্বীকার করিবেন?

মহারাণী মাতাজী তপস্বিনীর পরিচয় সকলেই জাত আছেন। সহযোগী "যুগান্তর" বলিয়াছেন তিনি আরকোট রাজবংশ সম্ভূত এবং দক্ষিণের হিন্দুকুলচূড়ামণি যে মহাপুরুষের নামে ইংরাজ সরকার এখনও চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন ইনি সেই মহারাষ্ট্র বীরপুরুষ মহা তেজস্বী রাজনের কুমারী। মাতাজী অদ্বিতীয়া পণ্ডিতা ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। অশ্বারোহণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন; নেপালের বীরগণ তাঁহার নিকট অশ্বচালনা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমরা মাতাজী মহারাণীর জীবনের অপরাপর অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। এই সংখ্যায় কেবল তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের আভাস মাত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক)

যামিনী।

হাসে নিশিথিনী, চম্পকমালিনী,
যেন দেববালা, বরণ উজলা,
কহিনূর মণি দিয়া মাথায়।
সরোজ আননে, মৃদুল গমনে,
সুনীল অম্বরে, তারকা নিকরে,
কি সুন্দর সাজে ঢাকিল কায়।
দেখলো যামিনী, মুখকুমুদিনী
সলিল দর্পণে, হরষিত মনে,
সাধনে সজনে কহি তোমায়।
কোথা হেন আছে, ধনী তব কাছে,
শশী তারামণি, অসংখ্য যে আছে
সাজাইল কে দিয়ে এ সবায়।

মঞ্জুল সমীর, ব্যজনে সুধীর,
মৃদু মন্দ ভাবে, তার সেবা পাবে,
এমন আরাম আছে বা কার।
নিদাঘে তাপিলে, মলয় অনিলে,
সহসা আসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
করে ক্লেশ দূর সুখ অপার।
ফুল্ল ফুল দল, অতি নিরমল,
ভেটিয়া সৌরভ, তোমার গৌরব,
যতন করিয়া কত বাড়ায়।
খদ্যোত আসিয়া, সিথী বিরচিয়া,
তব শির পরি, অবস্থান করি,
অপূর্ব্বরূপে সাজায় তোমায়।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ রবে, ঝিল্লী যত সবে,
শুভ অবসরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
গাইছে ধরিছে আনন্দে তান।
নীরব নিশায়, ঝিল্লীগণ গায়,
বিহঙ্গম সবে, সুমধুর রবে,
যাবৎ প্রভাতে না ধরে গান।
নিদ্রার প্রসাদে, কোলাহল নাদে,
নাহি শুনা যায়, মোহন মায়ায়,
যেন অচেতন রয়েছে সবে।
ঘোর অবসাদ, নাই কলনাদ,
অথবা প্রমাদ, গভীর বিষাদ,
ঢালিয়া দিয়াছে নিখিল ভবে।
যেই জন স্থান, উন্মত্ত সমান,
এবে সে আরাম, লভে অবিরাম,
হয়ে জ্ঞান হীন আছে শয়নে।
নিশাচর প্রাণী, করি কানাকানি,
লভিতে আহার, করয়ে বিহার,
দিক দিগন্তরে অতি গোপনে।
শুভ অবসরে, প্রশান্ত অন্তরে,
যত যোগীদল, সুকবি সকল,
ভাবপূর্ণ মনে সুখে কাটায়।
গভীর নিশিথে, পাপী তাপী চিতে,
ঘোর অনুতাপে, হৃদয়ের তাপে,
নয়ন আসার বহিয়া যায়।
পায় সে রতন, যাঁহার কারণ,
উৎসৃষ্ট জীবন, মোহের কানন,
করি উৎপাটন জ্ঞানাস্ত্র ক্ষেপণে।
হে শুভে যামিনি, আরাম দায়িনি,
দুঃখ বিনাশিনি, শোক সংহারিণি,
নিদ্রায় কর সুখী দীন জনে।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরমা নদীর সঙ্কীর্ণ খাতের উভয় পার্শ্ব জল-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন, মধ্যে শীর্ণ জলধারা ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর উচ্চ পাহাড়ে অনেক গুলি ছোট বড় পল্লী অবস্থিত, তন্মধ্যে বিজয়পুর একখানি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম। বিজয়পুরের অব্যবহিত পশ্চিমে বেজপুর। বেজপুরও সুবিখ্যাত পল্লী। উভয় গ্রামই অধুনা সুরমার উত্তর তটে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে; পূর্ব্বে নদীর গতি এবং গ্রামদ্বয়ের সংস্থিতি অন্যরূপ ছিল। তখন বেজপুর সুরমার উত্তর তটেই অবস্থিত ছিল কিন্তু বিজয়পুরের দক্ষিণে নদী ছিল না। নদী পশ্চিম দিক্ হইতে সরল রেখায় চলিয়া আসিয়া বেজপুর গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া উত্তর বাহিনী হইয়া বিজয়পুরের পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বদিক বেষ্টন করত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত ছিল। সুরমা শাখা নদী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মাতৃ নদীর সহিত সুরমার সম্বন্ধ দূর হয় নাই। সুতরাং নদীর আয়তন খুব প্রবল

ছিল। ৯৯৯ বঙ্গাব্দের বন্যার জলে দেশ ভাসিয়া যায়। বন্যাবাহিত প্রভূত বালুকারাশি বেজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত নদীর বাঁকে জমিয়া বন্যার জলের গতিরোধ করে। জলরাশি বাধা পাইয়া বিজয়পুরের দক্ষিণ পার্শ্বে খাত কাটিয়া পুরোবর্ত্তিনী পূর্ব্বদিগ্‌ বাহিনী নদীতে পড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। তদবধি সুরমার জলস্রোতঃ বিজয়পুর ঘুরিয়া প্রবাহিত হইত না। কালক্রমে বিজয়পুরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের নদী মজিয়া পুরিয়া উঠিয়াছে; উত্তরদিকে স্থিত নদীর অংশ একটা বিস্তীর্ণ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। লোক সেই জলাশয়কে বিজয়পুরের বাঁওড় বলে।

বিজপুর আর বেজপুর বহু নরনারীর বাসক্ষেত্র। পূর্ব্বে গ্রাম দুখানি নদীর এপারে ওপারে অবস্থিত ছিল। ৯৯৯ সালের বন্যার পর, নদীর ব্যবধান দূর হইলে উভয় গ্রাম সম্মিলিত হইয়া এক বিপুল সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামদ্বয়ের অবস্থা ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। বিজয়পুর বেষ্টিত নদীর উভয়তীরে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, শাঁখারি, কাঁসারি প্রভৃতি শিল্পিগণ এবং নানা শ্রেণী ব্যবসায়িবর্গ পাড়া বাঁধিয়া বাস করিত। নদী মজিয়া গেলে তাহাদের কার্য্য সৌকর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিল এবং স্থানে স্থানে বিষম জলকষ্ট উপস্থিত হইল। বিজয়পুরের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তি জনগণের জলকষ্ট ছিল না, তাহারা বাঁওড়ের জল ব্যবহার করিত। কিন্তু বদ্ধজল ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। তজ্জন্য গ্রামের উত্তর পাড়ায় নানা রোগ সংক্রমণ করিতেআরম্ভ করিল। ১০১৬ বঙ্গাব্দে উক্ত উভয় গ্রামে মহামারি উপস্থিত হয় তাহাতে প্রায় দুই সহস্র নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জয়নারায়ণ রায় ভূষণপুর পরগণার ইজারদার ছিলেন। তিনি বিজয়পুরের অধিবাসী। রায় মহাশয় খুব প্রতাপশালী এবং ধনী লোক ছিলেন। মহামারির সময়ে তিনি লোকের উপকারের জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বেজপুরে তখন অনেক বৈদ্যের বাস ছিল। কয়েকজন কৃতবিদ্য কর্ম্ম কুশল চিকিৎসকও সে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারাও সেই দুঃসময়ে আর্ত্তের উপকারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ গ্রাস করিয়া মহামারি প্রশমিত হইয়াছিল।

মহামারি প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু একটা তমোময়ী বিষাদচ্ছায়া সমস্ত নরনারী মুখে অঙ্কিত রহিল। কেহ পুত্রহীন হইয়াছে, কাহারও মেয়ে মরিয়াছে, কেহ কেহ বা পুত্র কন্যা উভয়ই হারাইয়াছে। কেহ মাতৃহীন, কেহ পিতৃহীন, কাহার কাহার মাও গিয়াছে বাপও মরিয়াছে। অনেকেই ভ্রাতা ও ভগিনীর শোকে ম্রিয়মাণ। কেহ মনোবৃত্তানুসারিণী মনোরমা ভার্য্যার শোকে বিষন্ন, কোন হতভাগিনী বিধবা হইয়াছে। সকলেরই মন বিষন্ন, শরীর অবসন্ন। যাহারা মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘকাল যাবৎ ফিরিয়া পায় নাই। অনেকের দেহে রোগের শেষ রহিল। কেহ প্লীহাগ্রস্ত, কাহারও শরীর যকৃদ্ দোষ দুষ্ট, খোস পাচড়া অনেকেরই অঙ্গ ভূষণ হইয়া রহিল। বেলা শেষে সকলেরই শরীর অবসন্ন হয়। জনসঙ্ঘ নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম এবং জড়প্রায় হইয়া রহিল। অধ্যাপকের টোলে ছাত্র আসে না, গ্রামের পাঠশালা গুলিও বন্ধ হইয়া গেল।

ইজারাদার জয়নারায়ণ রায় মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। সে বছরের পৌষ কিস্তির খাজনা নিজ তহবিল হইতে সারিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রজাবর্গের যেরূপ অবস্থা তাহাতে চৈত্র কিস্তির খাজনা আদায় হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি সুজাগঞ্জের তহসিল দারকে জানাইলেন যে, চৈত্র কিস্তির খাজনা আদায় হইবে না। প্রজাবর্গের অবস্থা অতি মন্দ। কৃষকেরা চাষ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, তাঁতিরা তাঁত বন্ধ করিয়াছে এবং অন্যান্য শিল্পজীবী ও ব্যবসায়িরা অবসর হইয়া পড়িয়াছে। তারপর বর্ত্তমান বাঁওড়ের উত্তরে যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড রহিয়াছে, নদী মজিবার আগে তাহা আওয়ান শস্য ক্ষেত্র ছিল। এখন ফাল্গুণ চৈত্র পর্য্যন্ত সেই বিশাল ভূমিখণ্ড জলময় থাকে সুতরাং কোন ফসলই তাহাতে জন্মে না। এই সকল কারণে আদায় তহসিলের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এ বিষয়ে হুজুরের কৃপা প্রার্থনীয় তহসিল দার উত্তরে জানাইলেন যে আমি দুনিয়ার মালিক নহি, কিস্তি কিস্তি আমাকে নবাব সরকারে খাজনা পাঠাইতে হয়। তুমি যেমন করিয়া পার চৈত্র কিস্তির খাজনা যথাসময়ে পাঠাইবে। কড়া তাগিদ আরম্ভ কর। সুতরাং গাঁয়ে তহসিল হইতে লাগিল। দেশে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল।

শ্রীশীতলচন্দ্র কবিরত্ন।

কর-বিজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়।

করতল এবং হস্তাঙ্গুলী।

——(*)——

অঙ্গুলীর তুলনায় করতলের আকৃতি বিচার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে না; কিছুকাল অভ্যাসদ্বারা যথার্থ পরিমাণ সহজেই আয়ত্ত হইবে। খর্ব্ব অঙ্গুলী চিন্তা এবং কার্য্য বিষয়ে দ্রুততা ও হঠকারিতার পরিচয় দেয়। খর্ব্বাঙ্গুলীবিশিষ্ট ব্যক্তি সমুদয় ঘটনা সমষ্টিকেই গ্রহণ করিয়া, সূক্ষ্ম বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করে।

দীর্ঘ অঙ্গুলীতে খুঁটিনাটী করিয়া দেখিবার শক্তি বুঝায়; সূক্ষ্ম বিষয় অনুশীলনে তৎপর; সহজেই বিরক্তি এবং কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়। করতল ও অঙ্গুলী দীর্ঘে সমান হইলে স্বভাবও সমভাবাপন্ন হয়; সুতরাং, তাহারা অংশ ও সম্পূর্ণ উভয়ই নিখুঁতভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। করতলের সীমা মণিবন্ধের প্রথম রেখা হইতে মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত, এবং অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে হইলে মধ্যমার অগ্রভাগ হইতে করতলের পশ্চাদ্দিকস্থ শেষ গ্রন্থি পর্য্যন্ত লইতে হয়।

সরল, সুগঠিত এবং সমস্ত অঙ্গুলীর সহিত মনোজ্ঞভাবে সজ্জিত অঙ্গুলীকে "সুফলপ্রদায়ক" অঙ্গুলী কহে। অতি দীর্ঘ, অতি হ্রস্ব, অথবা বক্রভাবাপন্ন অঙ্গুলী "কুফলপ্রদায়ক" বলিয়া বুঝিতে হইবে।

করতল সম্পূর্ণভাবে মুক্তাবস্থায় ধরিলে যে অঙ্গুলী অন্য সকল অঙ্গুলী অপেক্ষা উচ্চ হইয়া থাকে তাহাকেই "বলবান" বলিয়া ধরিতে হইবে; এবং সেই অঙ্গুলীটী ও তন্নিম্ন "গ্রহ-স্থানকে" মানবচরিত্রের কুঞ্চিকা বলিয়া জানিবে।

বিভিন্ন অঙ্গুলী সমূহ যে যেরূপ গুণ প্রকাশ করে, তাহাদের ক্ষমতানুসারে গুণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করিতে হইবে।

তর্জ্জনী।

সুফলপ্রদায়ক—কর্ত্তৃত্ব।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্য)—অত্যাচার।

" " (খর্ব্ব)—দায়িত্বে অনিচ্ছা।

বক্র—আত্ম-সম্মান-বোধহীনতা।

মধ্যমা।

সুফলপ্রদায়ক—পরিণামদর্শিতা।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে)—বিষাদপ্রিয়তা।

" " (খর্ব্বে)—অব্যবস্থিতচিত্ততা।

বক্র—বায়ুগ্রস্ততা।

অনামিকা।

সুফলপ্রদায়ক—সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা।

কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে)—দ্যূতপ্রিয়তা ; আউতি খরিদ-বিক্রয়শক্তি।

" " (খর্ব্বে)—সৌন্দর্য্যবোধহীনতা।

খর্ব্বে—শিল্পসাহিত্যাদির নিষ্ফল আলোচনা।

কনিষ্ঠা।

সুফলপ্রদায়ক—বাণিজ্য সম্বন্ধীয় খরিদ বিক্রয়ে বিশেষ পারদর্শিতা।

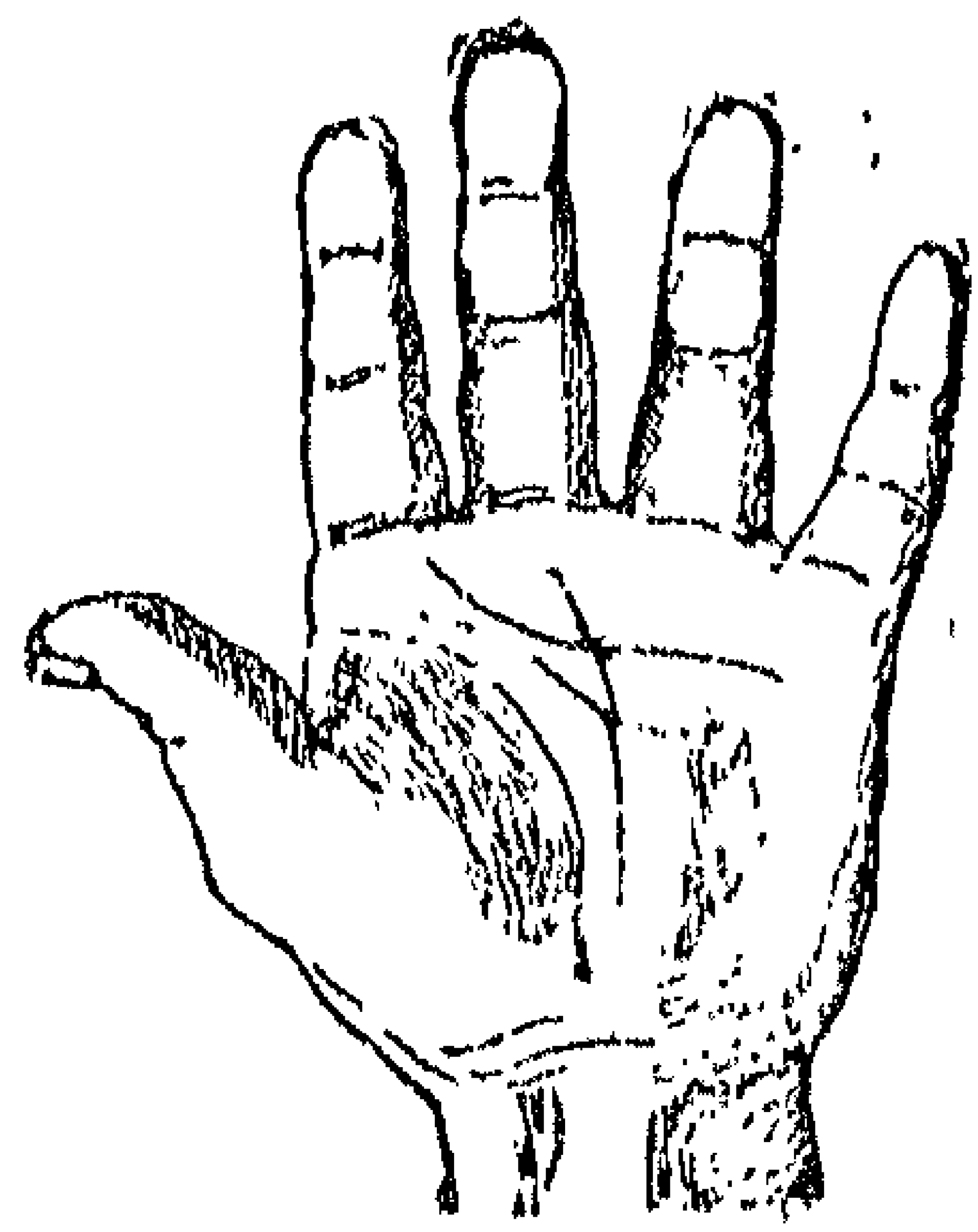
কুফলপ্রদায়ক (দৈর্ঘ্যে—চাতুর্য্য।

" " (খর্ব্বে)—নির্ব্বুদ্ধিতা।

বক্র—কার্য্যতত্ত্বাবধারণে অক্ষমতা।

যদি অঙ্গুলী সকল সমরেখায় স্থাপিত হয় তবে জীবনের সফলতা জ্ঞাপন করে। যদি কোন অঙ্গুলী অপরগুলি অপেক্ষা কিছু নিম্নে স্থাপিত হয়, তবে তাহার কিছু গুণাবলীর হ্রাস বুঝায়। কনিষ্ঠাঙ্গুলী যদি নিম্নাবস্থিত হয় তবে অবস্থার প্রতিকূলতা জ্ঞাপন করে; সুতরাং তাহাকে জীবনসংগ্রামে রত থাকিতে হয়। তদ্রূপ তর্জ্জনী নিম্নাবস্থিত হইলে, অসামাজিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়। অনামিকা উক্তরূপ হইলে সাহিত্য শিল্পাদি শিক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। মধ্যমা কদাচ নিম্নাবস্থিত হয়।

ঘনসন্নিবিষ্ট অঙ্গুলী ও সংকীর্ণ করতল সামাজিক আচার ব্যবহার পালনেচ্ছা প্রকাশ করে। মঙ্গল, বুধ ও চন্দ্রস্থান (প্রথম অধ্যায়ের চিত্র দেখ) অপরিপুষ্টতার জন্য করতল সাধারণতঃ সংকীর্ণ হয়। সুতরাং সে সমস্ত লোকের সাহস, কল্পনা-শক্তি ও প্রফুল্লতার অভাবদৃষ্ট হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মঙ্গল, চন্দ্র ও বুধ যথাক্রমে সাহস, কল্পনাশক্তি ও প্রফুল্লতার পরিচায়ক ; আবার, কখনও বা বৃদ্ধাঙ্গুলী করতলের অভিমুখে সংলিপ্ত থাকায় করতল সঙ্কীর্ণ দেখায় ; কাজেই করতল হইতে অঙ্গুষ্ঠের দূরত্ব হ্রাস হওয়াতে অনপেক্ষা উদারতার বিঘ্ন প্রদান করে।



চতুষ্কোণ-করতল-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণতঃ নির্ম্মল বায়ু সেবনপ্রিয় ; কিন্তু যদি ইহা কঠিন এবং সমতল হয়, তবে দৈহিক-ক্রীড়া-নিপুণতা ব্যক্ত করে।

রবি-চন্দ্রাদি গ্রহস্থানের পরিপুষ্টতাবশতঃ করতল প্রশস্ত হয়। করতলের মধ্যে যদি সমতল হয় এবং চতুর্দ্দিকস্থ রবিচন্দ্রাদি স্থানের সহিত সমকোণ হয়, তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিপুষ্ট বুঝিতে হইবে। এবং এইরূপ লক্ষণান্বিত ব্যক্তি সংসারে যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া

পরিণামে জয়ী হয় ; এবং উক্ত ব্যক্তির বিবাদ ও কলহপ্রিয়তা বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে।

যাহার করমধ্যস্থল গভীর হয় সে ব্যক্তি ভীরু-স্বভাব, অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলে, এবং সহজেই ভগ্নোৎসাহ হয়। এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। যদি কোন বালকের হস্তে এই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তবে তাহাকে কোন কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা পরিহাসাদি না করিয়া উৎসাহিত করিলে সুফল ফলে। এইরূপ লোক সামান্য পরিহাসেই মর্ম্মাহত হয় এবং তাহার প্রত্যেক উদ্যমশীলতা শিথিল হইয়া পড়ে।

করতলের সর্ব্বত্র সুসঙ্গতি দেখা আবশ্যক। যদি কোন হস্ত চক্ষেও কোমল দেখায়, ফলতঃ দৃঢ় হয়, ইহা উদ্যমশীলতার পরিচায়ক। যাহার করতল কঠিন, সমতল এবং দৃঢ়, তিনি প্রায় কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হন না, এবং দুর্দ্দমনীয় উদ্যমশীলতা ও চঞ্চলচিত্ততার দৃষ্টান্তস্থল হয়েন। আবার করতল অতিশয় কঠিন হইলে যদিও উদ্যমশীলতার ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচায়ক, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তির হীনতা বুঝায়।

করতলের স্থিতিস্থাপকতা বর্ত্তমান থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্যমশীলতা, এবং কঠিন হস্তের সমস্ত সদ্গুণের পরিচায়ক। এইরূপ ব্যক্তিরাই স্বনামধন্য পুরুষ হয়েন।

যদি হস্ত কোমল ও স্ফীত বা শিথিল, তবে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত যদি অঙ্গুলী সকলের তৃতীয় পর্ব্বগুলি এবং করপৃষ্ঠ স্থূল হয়, তবে ভোগবিলাসপ্রিয়তা সূচিত করে ; এই সকল ব্যক্তি স্বহস্তে স্বকর্ম্ম করিতে নিতান্তই অক্ষম,—এমন কি অপরে তাহাদের হইয়া চিন্তাও করিয়া দিলেই যেন তাহাদের পক্ষে ভাল হয়।

উক্ত শ্রেণীর করতল আবার যদি কোমল না হইয়া কঠিন হয় তবে তাহাদের সকল উদ্যম ভোজনব্যাপারেই পর্য্যবসিত হয়। কেবল আহারই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ক্ষীণ (পাতলা) এবং সমতল করতল দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য-লোকের লক্ষণ। উত্তম স্বাস্থ্যের লক্ষণ—দৃঢ় অনতিবৃহৎ, উষ্ণস্পর্শ ও অনতিকঠিন করতল।

স্থূল ও কদাকার করতল পাশবিকতার এবং আত্মম্ভরীতার লীলাক্ষেত্র। স্থূলতাই আত্মম্ভরীতার লক্ষণ।

নমনীয় করতল, সেই ব্যক্তির সর্ব্বাবস্থায় উপযুক্ততা ও মানসিক নমনীয়তা, এবং বৈচিত্র ও পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বিকাশস্থল। এইরূপ করতলবিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য্যে উপযুক্ত, কোন বিষয় শীঘ্রই বুঝিতে পারে, উদার এবং প্রায়ই অপরিমিতব্যয়ী। তাহারা নীচকর্ম্মে বা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দেখাইতে নিতান্ত ঘৃণা করে। তাহারা সরল ও কৌতূহলপূর্ণ।

করতল পাটল-বর্ণ হইলে স্বাস্থ্য ও রক্তের পরিষ্কারতা বুঝায়। এই প্রকার করতলবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রফুল্লচিত্ত ও প্রীতিপূর্ণ হয়।

করতল শ্বেতবর্ণ হইলে রক্তহীনতা বুঝায়। এই প্রকার করতল স্বার্থপর, নীচ, ক্রূর ও সন্দিগ্ধচিত্তের পরিচায়ক।

রক্তাভ করতল শরীরে রক্তের আধিক্য বুঝায়। এই প্রকার করতলবিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অনুরাগী ঈর্ষাযুক্ত, উগ্রস্বভাব ও অতি শীঘ্রই ক্রোধযুক্ত হয়। অন্যান্য কুচিন্তা সংযোগে তাহারা অতিশয় কামুক হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

হত্যারহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘেঁটু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন ম'শাই কি করেছি!

হে। আর বাপু, তোমার নাম আর কাজ শুনেই বুঝি প্রাণটা যায়।

ঘেঁ। আজ্ঞে, বলেন কি? আপনার পরাণ যায়—সে কি কথা? ডাক্তার ডাকব' নাকি? কি বলেন?

হে। ডাক্তার ডাক্‌তে হয়, পরে ডাকা যাবে; এখন বল দেখি অলকার কেন অমরের জন্য এত কষ্ট?

ঘেঁ। আজ্ঞে, ওরা দুটীতে ছেলেবেলা থেকে যেন মানিকজোড়ের মত খেলাধুলা কর্ত্তো, তাই অত ভাব।

হে। কিন্তু একটা কারণে আমি একাজ হাতে নিতে সাহস করি না।

ঘেঁ। ভয় কি মশাই, অলকার নিজের ঢের টাকা আছে।

হে। টাকার জন্য নয় হে, টাকার জন্য নয়; আর একটা কারণ আছে।

ঘেঁ। কারণটা কি?

হে। যে রকম প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বড় সুবিধা বোধ হয় না।

ঘেঁ। তবু চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারেন তো?

হে। হাঁ, তা পারি। আচ্ছা, অমর ত বলেছে, খুনের সময় সে হাওড়ায় ছিল না, বাধা দিয়া ঘেঁটু কহিল, "নিশ্চয়ই তবে ছিল না।"

হে। তবে কোথায় ছিল তুমি জান?

ঘেঁ। আমি? বাপ্‌রে! কোথায় ছিল আমি কেমন করে জান্‌ব?

হে। তবে তুমি যে বলো, সে ছিল না।

গম্ভীরভাবে ঘেঁটু কহিল, "মহাশয়, ফাঁসির সময় লোকে কি কখন মিথ্যাকথা ব'ল্‌তে পারে?"

একটু হাস্য করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "বেশ বুদ্ধি বাপু তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি আবার কথা গুলিও মিষ্ট।"

ঘেঁটু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "কথাগুলিও মিষ্টি হবারই কথা।"

"কেন?'

"আমি বড় মিষ্টি খাই।"

"থাম বাপু, তুমি বেশ রগড়ের লোক। এখন অলকার সঙ্গে কিসে আমার দেখা হয় বল দেখি?

"আমি তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

"দেরি হবে যে।"

"এলুম বলে।"

"আরে বাপু, অলকাদের বাড়ী এখানথেকে অনেকদূর, এখনি আসবে কি ক'রে?"

"নীচে গাড়ীতে বসে আছে, ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

ঘেঁটু সরকার এই বলিয়া অলকাকে ডাকিয়া আনিতে গেল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চুরি।

পতনের শব্দ শুনিয়া হামিদ দ্রুতবেগে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, "কি হয়েছে, মা?"

কোন উত্তর পাইল না। মুন্না অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হামিদ খানিক জল লইয়া তাহার মুখে চোখে দিল; ক্রমে মুন্নার চৈতন্য হইল। অপ-

কাল পরে সে অস্ফুটস্বরে কহিল, "কাগজ—"

হামিদ কহিল, "কি কাগজ মা ?"

কোন উত্তর না দিয়া মুন্না পুনরায় উঠিয়া দেরাজ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিল, কোথাও কাগজের সন্ধান পাইল না। পরে নিতান্ত হতাশ হইয়া বিবর্ণমুখে ভূতলে বসিয়া পড়িল ও নিশব্দে অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। হামিদও ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অল্পকাল পরে মুন্না চুপ করিল। অতীব গম্ভীরস্বরে কহিল, "হামিদ, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

হা। তোমার কি কিছু চুরি গেছে ?

মু। হাঁ, কতকগুলা দামী কাগজ গেছে।

হা। এ কি কোম্পানির কাগজ।

মু। না, এ বড় গোপনীয় কাগজ, এ গুলি গেলেই আমার মৃত্যু।

হা। কাকে চোর বলে তোমার সন্দেহ হয় ?

মু। আবার কে ? মিনসে নিজেই নিয়েছে।

অশান্তির সহিত হামিদ কহিল, "ওঃ, বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই নিয়েছে।"

"তা হলেই বাঁচি।"

"কিছু টাকা দিয়ে কাগগুলা পাওয়া যায় না ?

"কেবল ঐ উপায়ই আছে। তুমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।"

"কোথায় তাহার দেখা পাইব ?"

"মোড়ের মাথায়, মদের দোকানে।"

হামিদ তখন রহমনের সন্ধানে মদের দোকানে চলিল। সেখানে তাহাকে একখানি বেঞ্চের উপরে বসিয়া মদ্য পান করিতে দেখিতে পাইল।

রহমন হামিদকে দেখিয়া কহিল, "কি গো, তুমি কি মনে করে ?"

হামিদ কহিল, "মা তোমার সহিত একবার দেখা করিতে চায়।

র। আহা, আমি বাহিরে থাকিলে বেচারীর বড় কষ্ট।

হা। বিশেষ আবশ্যক, এখনি যাইতে হইবে।

র। এখন যেতে পার্‌বো না, দেখ্‌ছ। নেশা কর্‌ছি।

হা। চল, চল, বড় দরকার—দেরী করো না।

র। কি দরকার ?

হা। মা কাগজগুলা চায়।

র। কি কাগজ ?

হা। কেন, মা তুমি দেরাজ থেকে নিয়েচ ?

র। আমি দেরাজ থেকে কিছু লই নাই। আর আমিই বা লব কেন, বাপু ?

হা। তুমিই কাগজগুলা নিয়েছ।

র। নিয়ে থাকি, মা পুলিস ডাকুতে বলগে না।

হামিদ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিল, "তুমি বেশ যান সে তা পারে না।"

"তা হলে এইবার বুঝেছেন আমি তাঁর কে ?"

"তা হলে স্বীকার কর্‌ছ, তুমি কাগজগুলা নিয়েছ।"

"আমি কিছুই স্বীকার অস্বীকার করি নাই। যা, যা মিছে ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিসনে।"

"তুমিই তার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে।"

"কে বল্লে, তার সর্ব্বনাশ কর্ব্ব ?"

"কাগজগুলা না পেলেই তার সর্ব্বনাশ হবে।"

"কিছু টাকা খরচ কর্ত্তে বল্‌গে না।"

"মা ১০০্‌ টাকা দিতে চায়।"

"ও ত বড় কম টাকা।"

"তুমি কত চাও ?"

"আমি কিছুই চাই না।"

"তুমি তা হলে দেরাজ থেকে কাগজগুলা লও নাই ?"

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহমন কহিল, কতবার তোকে ঐ কথা বল্‌ব? ফের যদি তুই ঐ কথা বলিস্‌, এই বোতলের বাড়ীতে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।” শ্রী— ক্রমশঃ।

বিশ্বে ভগবানের প্রকাশ।

১

নমি তোমা বিশ্বপতি,
তুমিই জগত গতি,
এ বিশ্ব আলেখ্যে সদা
আছ বিদ্যমান।
আছ বিদ্যমান,
করুণা নিধান,
নীল চন্দ্রাতপে
ঊর্দ্ধে শোভমান,

২

বিবিধ বরণ বিভা,
অসংখ্য মূরতি কিবা,
অনন্ত আকাশ পটে
শোভে থরে থর।
শোভে থরে থর,
মূর্ত্তি মনোহর,
অনন্ত অস্ফুট
অধিক সুন্দর।

৩

আরোহি বিমানরথে,
ভ্রমিলে অম্বরপথে,
কতই হে বিশেশ্বর,
দেখিতে যে পাই,
দেখিতে যে পাই,
যে দিকে তাকাই,
কোটী দীপরূপে
জ্বলিছ সদাই।

৪

গ্রহ উপগ্রহরূপ,
ধরি হে নিখিল ভূপ,
ভ্রমিতেছ মহাকক্ষে
অনন্ত রচনা।
অনন্ত রচনা,
পরাস্ত কল্পনা,
এ বিশ্বের সীমা,
শুধু বিড়ম্বনা।

৫

প্রভাতে অরুণবিভা,
সমুজ্জ্বল করে দিবা,
নিসর্গের শোভা যবি
কতই বাড়ায়।
কতই বাড়ায়,
কতই সাজায়,
প্রকৃতি সতীরে
মোহন ভূষায়।

৬

কৌমুদী ধবলবাসে,
সাজিয়া ধরণী হাসে,
সুনীল গগন তলে
কিবা মনোহর।
কিবা মনোহর,
সুনীল অম্বর,
বক্ষে তার শোভে
তারকা নিকর।

৭

এ হেন অসংখ্যরূপ,
ধরিয়া নিখিল ভূপ,
ভাতিছ এ বিশ্বপটে
অনন্ত শকতি।

অনন্ত শকতি,
ওহে বিশ্বপতি,
যে দিকে তাকাই,
জীবন্ত মূরতি।

৮

কে বলে অদৃশ্য তুমি,
বিশ্ব তব লীলাভূমি,
ফলিত তোমার মূর্ত্তি
এ বিশ্বদর্পণে।
এ বিশ্বদর্পণে,
ভূতলে গগনে,
তড়িতের সনে,
ভীম প্রভঞ্জনে।

৯

প্রীতি তব পুষ্পরাশি,
তুমিই উষার হাসি,
বিহঙ্গ কুলের ধ্বনি,
অশনির রব।
অশনির রব,
ওহে ভবধব,
তুমিই অনন্ত
নিখিলের সব।

১০

তুমি দীপ্ত হুতাশন,
তুমি স্নিগ্ধ সমীরণ,
তুমিই বিশ্বের তেজ,
বিশ্বের জীবন।
বিশ্বের জীবন,
অনাদি কারণ,
জগত পালক
অনাথ শরণ।
তুমিই নিদাঘ রবি,
তীক্ষ্ণ খরতর ছবি,
টানিয়া সাগর বারি
কর বরিষণ।
কর বরিষণ,
ভূতলে পতন,
ভূতলের জল
জগত জীবন।

১১

শরতে বিমলাকাশে,
পূর্ণচন্দ্র কিবা হাসে,
এ বিশ্ব আনন্দময়,
কিবা অপরূপ।
কিবা অপরূপ,
দেখাও স্বরূপ,
নেহারি উচ্ছলে,
ভাব প্রেমকূপ।

১২

নিশির শিশির ঝরে,
পত্রে, পত্রে, রবি করে,
কিবা অপরূপ রূপ
করি সন্দর্শন।
করি সন্দর্শন,
ভুবন মোহন,
নেহারি সেরূপ
মোহিত নয়ন।

১৩

সুনীল ভূধর গায়,
স্রোতস্বিনী বয়ে যায়,
তরুণ অরুণ বিভা
কিবা মনোহর।
কিবা মনোহর,
ওহে বিশ্বেশ্বর,

কি মোহন রূপ
নেত্রে তৃপ্তি কর।

১৪

বিবিধ বরণ পাখী,
পুষ্পিত ফলিত শাখী,
লতাবধূ কুঞ্জবন
দেয় পরিচয়।
দেয় পরিচয়,
নব দূর্ব্বাচয়,
হরিত শাদ্বল
নব কিশলয়।

১৫

সুখময় মধুমাসে,
ধরা যেন প্রেমে ভাসে,
নব পরিচ্ছদ পরে
তরুলতা চয়।
তরুলতাচয়,
সব শোভাময়,
মলয় পবন
ধীরে ধীরে বয়।

১৬

কুঞ্জবনে রাত্র দিবা,
সঙ্গীত লহরী কিবা,
উঠিতেছে ধীরে ধীরে
শ্রবণ জুড়ায়।
শ্রবণ জুড়ায়,
পরাণ মাতায়,
প্রেম স্রোতগতে
ধীরে বয়ে যায়।

১৭

নমি তোমা বিশ্বেশ্বর,
তুমি ব্যাপ্ত চরাচর,
কিবা তুমি দও দেখা
প্রেমিক নয়নে।
প্রেমিক নয়নে,
নেহারে গগনে,
ভূধরে সাগরে,
নির্ঝরে কাননে।

১৮

যে দিকে নয়ন যায়,
প্রেমিক দেখিতে পায়,
তব অপরূপ রূপ
নিখিল ভুবনে।
নিখিল ভুবনে,
জীবনে মরণে,
আঁধারে আলোকে
তোমার আননে।

ভগবদ্গীতাপাঠ।

অর্জ্জুন। অস্ত্রাঘাত জনিত দুঃখও কি লাগিবে না?

ভগবান্। স্থূলভাবে দেখ লোকে যখন যুদ্ধে মাতিয়া যায় তখন কোন অঙ্গ কর্ত্তিত হইলেও মন যুদ্ধে তীব্র নিযুক্ত বলিয়া ঐ সময়ে কিছুই অনুভব হয় না। পরে যখন যুদ্ধাবসানে মন যুদ্ধ চিন্তায় আর মাতিয়া থাকে না, তখন এই দেহ আকারে আকারিত হইয়া দেহের যাতনা অনুভব করে। একমাত্র আত্মাই সৎ। দৃশ্য জগৎটা জড় ও অসৎ। অসৎ ত্যাগ করিয়া সৎ বস্তুতে থাকিতে অভ্যাস কর অমর হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিও অসতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু সতের কোথাও কখন অভাব নাই। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব জানেন।

অর্জ্জুন। অসতের সত্তা বা অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই ইহা বুঝিলাম না।

ভগবান্। অসৎ কি আগে বুঝ।

অর্জ্জুন। বল।

ভগবান্। যাহা দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ।

অর্জ্জুন। দেশ পরিচ্ছিন্ন ইহার অর্থ কি?

ভগবান্। যাহা সর্ব্বদেশে সমভাবে থাকে না তাহাই দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এই সম্মুখবর্ত্তী তোমার দেহ এখন এখানে আছে কিন্তু এই সময়ে পুষ্করে নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বদেশে সমভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার দেশ পরিচ্ছেদ নাই।

অর্জ্জুন। কালপরিচ্ছেদ কি?

ভগবান্। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই অবিকৃত ভাবে থাকে না তাহাই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। 'অসৎ' তিন কালে সমান থাকে না বলিয়া পরিণামী। একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বকালে অবিকৃত।

অর্জ্জুন। বস্তু পরিচ্ছেদ কি?

ভগবান্। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ এই তিন প্রকার।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্প ফলাঙ্কুরঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয় শিলাদিতঃ।

বৃক্ষের অন্তর্গত পুষ্প, পত্র, ফল, অঙ্কুরাদি যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ এবং বৃক্ষ হইতে শিলা মনুষ্যাদির অন্য বস্তুর যে ভেদ তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ, কোন বস্তু এরূপ পাইবে না যাহার এই তিন ভেদ নাই। আকাশ, কাল, দিক অন্যত্র অনবচ্ছিন্ন হইলেও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কেবলমাত্র ব্রহ্ম এই তিন ভেদ ভিন্ন।

অর্জ্জুন। অসতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই কিরূপে? অসতের ভাব নাই ইহার অর্থ কি? নামরূপ ত অসৎ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তুমি আমার কথা শুনিতেছ, এই দেখিতেছি তোমার গলদেশে বনমালার পরিবর্ত্তে এই যুদ্ধক্ষেত্রে একছড়া পদ্মমালাকে আদর করিয়া পরাইয়া দিয়াছে। বক্ষাবরণ সরাইয়া তোমার অপরূপ রূপ দেখিবার নিমিত্ত সূর্য্যরশ্মিও নিরত হইতেছে। চক্ষের উপরে দৃশ্য প্রপঞ্চও দেখিতেছি অসৎ—কিন্তু অস্তিত্ব নাই কিরূপে? যতক্ষণ দেখিতেছি ততক্ষণ ত আছে বলিতে হইবে।

ভগবান্। এই দেহ ইহা সত্যই নাই। যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্ন দেখার মত। দেখ একটু অন্যমনস্ক হইলে এই দেহ থাকে না। স্বপ্নে থাকে না। জন্মের পূর্ব্বে ইহা ছিল না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না। উপস্থিত যাহা দেখিতেছ তাহার অস্তিত্ব থাকে ইহা কি প্রমাণ করিতে পার? নিদ্রাকালে যাহা দেখ তাহার মত ইহা বোধ হইতেছে। যাহা অসৎ যার —আগে—বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ তাহার অস্তিত্ব নাই, তবে যে দেখ তাহা ভ্রমমাত্র। স্বপ্নকালে যাহা দেখ, জাগিয়া তাহা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পার। রজ্জু দেখিয়া যে সর্প মনে কর, এ সর্প কি আছে বলিতে পার? বন্ধ্যাপুত্র সর্প আছে বলিয়া কি বস্তুতঃ আছে? সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পূর্ণ পদার্থে —জগৎ ভ্রম হইয়াছে। অস্তি ভাতি প্রিয়ই আছে তাহার উপর নাম রূপ কল্পনা মাত্র, এজন্য নামও রূপ মিথ্যা। একমাত্র আদি মধ্য অন্তবর্জ্জিত সত্য ব্রহ্মই জগদ্রূপে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ভাসিতেছেন। নামরূপ সম্বলিত জগৎ ভাব মিথ্যা; ব্রহ্মভাব সত্য। স্বর্ণবলয়ে সুবর্ণ ব্যতীত আর কি? আশ্রিত অবিদ্যারূপ স্বপ্নে ব্রহ্মে জগৎ না থাকিলেও ইন্দ্রজাল মত জগৎ দেখাইতেছে। চিত্ত সর্ব্বদা বাসনাময় এজন্য সর্ব্বদা আকুল। দর্পণে সূর্য্যের তেজ পড়িল। সূর্য্য

প্রতিবিম্ব দর্পণ হইতে দেয়ালে প্রতিবিম্বিত হইল। দর্পণকে চঞ্চল কর দেখিবে ছায়া কতই চঞ্চল। সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত দর্পণে চৈতন্য সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইয়া শূন্যে তাহার প্রতিচ্ছায়া খেলা করিতেছে। ইহাই গমনশীল জগৎ। চিত্ত স্পন্দন রহিত কর জগৎ নাই দেখিবে। রাগ ও দ্বেষভাব চিত্তস্পন্দনের কারণ চিত্তকে অনুরক্তি বিরক্তি শূন্য কর দেখিবে ব্রহ্মই রহিয়াছে, জগৎ ভ্রম দূর হইয়াছে, যেমন স্পন্দন ব্যতীত বায়ুর পৃথক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ চিত্ত স্পন্দন ব্যতীত জগৎ পরিণতির অন্য উপাদান নাই। বুঝিলে অসতের অস্তিত্ব নাই কিরূপে?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম অসৎ ভ্রম কল্পনা মাত্র। কিন্তু এই ভ্রম কল্পনাও ত সেই সৎ হইতে জাত। সৎ কিরূপে অসতের কারণ?

ভগবান্। অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরই বুদ্ধি মান্দ্য বশতঃ স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ বৃথা কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করিয়া থাকে।

দুর্ব্বুদ্ধিভিঃ কারণ কার্য্যভাবং সঙ্কল্পিতং দূরতরে বুধেষু।

তদেব তৎসত্য মনাদি মধ্যং জগত্তদেতৎ স্থিতমিত্যবেহি॥

স্থিতি ১-৩৬। যোঃ বাঃ

একমাত্র আদি মধ্য ও অন্তবর্জ্জিত সত্য ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জগৎ ভাব নাম রূপ মাত্র। জগৎ ভাব মিথ্যা। ব্রহ্মভাব সত্য।

অর্জ্জুন—কার্য্য কারণ কি তবে মিথ্যা?

ভগবান্—মিথ্যা বৈ আর কি? ব্রহ্মকে যাহারা জগৎ কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাদের বোধ মোহ কলুষিত। শ্রুতি কার্য্য কারণের পৃথক সত্ত্বা কল্পনা করেন না। একমেবা দ্বিতীয়ং ইহাতে একই আছে বলা হইয়াছে।

কার্য্যস্য তৎকারণতাং প্রযাতং সংকল্পিতং সঙ্কল্প বিমূঢ় বোধৈঃ।

দৈবর্ণাম তৎকার্য্যমুদেতি তস্মাৎ দৈবঃ কারণাদ্যৈঃ সহকারীভির্দৈবৈঃ॥

স্থিঃ ১-৩৫ যোঃ বাঃ।

মায়া সম্বন্ধে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ প্রযুক্ত কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে ন্যায়ের আরম্ভবাদ এবং সাংখ্যের পরিণামবাদ ও উপাসকের পরিণামবাদ খাটিলনা। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদ মাত্রই গ্রহণীয়।

শ্রী রামদয়াল মজুমদার এম, এ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান।

টাইফয়েড্ জ্বর।

পল্লীগ্রামে এই টাইফয়েড্ জ্বর বড় অধিক দেখা যায় না। কারণ তথায় মল মূত্র প্রায়ই উন্মুক্ত মাঠে নিঃসৃত হওয়ায় অনন্ত আকাশ তদস্থিত অনন্ত বায়ুতে মিশিত হইয়া যাওয়ায়, এবং রৌদ্রের প্রখর কিরণে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় decomposed (গলিত পচিত) হইতে পায় না। এই হেতুই উহা হইতে তথায় গ্যাসও উত্থিত হইতে পায় না। এই স্থানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ মহর্ষিগণ নিঃসৃত মলমূত্র হইতেই নানা প্রকার পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে জানিতেন বলিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে বাস্তুর বিপরীত দিকে খোলা যায়গায় একটা বাণ নিক্ষেপ করিলে যেখানে উহা পতিত হইবে তথায় মল মূত্র ত্যাগ করিবে। কি না তাহা হইলে আর উহার বিষে বায়ু বিষময় হইয়া তোমার গৃহ বিষময় করিতে পারিবে না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে এখন আর সেরূপ করা সম্ভবমত নয়। বিশেষতঃ সহরে। তথাপি

আমাদিগের মতে, সমুদয় ড্রেণ উত্তমরূপে বিধৌত (flushed) হইবার উপায় নিরূপিত না হইলে ড্রেণের পায়খানা অপেক্ষা তোলা পায়খানা থাকাই ভাল, কিন্তু উহাও আবার নিয়মিতরূপে প্রত্যহ পরিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন; ড্রেণের পায়খানা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহরে অতি উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, যদি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইবার বন্দোবস্ত থাকিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজকাল কার বর্ত্তমান ড্রেণের কার্য্য প্রণালী একেবারেই বৈপরীত্য সাধক এবং কর্ত্তৃপক্ষও তৎ-সংশোধনে প্রায় নিশ্চেষ্টবান্। সুতরাং সহরে যে উত্তরোত্তর টাইফয়েড্ জ্বর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখানে সংক্ষেপে আমরা উক্ত জ্বরের লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে ২।১টী উপদেশ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। বিশদভাবে চিকিৎসা ও রোগ বিবরণাদি চিকিৎসা গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্থান বাহুল্যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া গেল না।

এই জ্বর প্রথমে ২।৪ দিন প্রত্যহ প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্নে ২ ডিগ্রী করিয়া বর্দ্ধিত থাকে, যেমন ১ম দিন প্রাতে ৯৯ ডিগ্রী অপরাহ্নে ১০১ ডিগ্রী এবং তৎপর দিন প্রাতে ১০০ এবং অপরাহ্নে ১০২। এই ক্রমানুগতিক তাপানুবৃদ্ধি টাইফয়েড্ জ্বরের একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে। প্রায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস হইতেই জ্বরের উত্তাপ ১০৫। ১০৬ ডিগ্রী বা ততোধিক হইয়া থাকে এবং এই তাপ বৃদ্ধিপ্রায় সমভাবেই দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এখন জ্বরের যদি কোন বিশেষ কঠিন উপ-সর্গ না থাকে তাহা হইলে আপনা হইতেই জ্বর কমিতে থাকে কিন্তু উপসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয় সপ্তা-হেও এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এই পীড়ার আর একটি বিশেষত্ব এই যে রোগী সত্বর অতিশয় দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

এই জ্বর প্রায়ই ২৮ দিনের কমে সারিতে দেখা যায় না; কোন কোন স্থলে ৪২ দিন পর্য্যন্তও ইহা স্থায়ী হয় এবং কদাচিৎ ২।১ স্থলে—অতি কঠিনাবস্থায়—৬১।৬২ দিনও লাগিয়া থাকে। এই পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহটি বড়ই বিপদের সময়, অনেক স্থলেই রোগী ১৩ বা ১৪ দিনের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে এইজন্য এই সময়কে পীড়ার critical state অর্থাৎ সঙ্কট অবস্থা বলে। এই সময়টি উত্তীর্ণ হইলে পীড়া ক্রমশঃ অল্পে অল্পে কমিতে থাকে; পীড়া বর্দ্ধিত হইবার সময়—যেমন ক্রত-গতিতে বাড়িতে থাকে কমিবার সময় আবার তেমন স্বল্পাকারে কমিতে থাকে—জানিবে। তৃতীয় সপ্তাহে রোগ স্বল্পাকারে থাকিয়া চতুর্থ সপ্তাহে উহা একেবারে কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই চতুর্থ সপ্তাহটিও—কোন কোন স্থলে পীড়ার বৃদ্ধির সময় জানিবে।

রোগী এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রায়ই জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে; ২।১ স্থলে রোগীর আন্তরিক জ্ঞানের বিলোপ না হইলেও বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত থাকায় নিজের উপর কোনই control রাখিতে সমর্থ হয় না। এই পীড়ার ডিলিরিয়ম বা প্রলাপ বকা একটি প্রধান উপসর্গ জানিবে। মস্তিষ্কে ঘোরতর রক্তাধিক্য হইয়া ডিলিরিয়ম উৎ-পত্তি হয়। রোগী তখন উঠিয়া বসিতে চাহে, জোর করিয়া পলাইতে চাহে, শুশ্রূষাকারীগণকে মারিতে থাকে, কামড়াইতে যায়, গাত্রে বস্ত্রাদি রাখিতে চায় না। ইহার সময় বক্ষে শ্লেষ্মার আধিক্য হওয়ায়, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন বক্ষরোগ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বালক ও যুবকগণই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; স্ত্রীলোকগণের

এই পীড়া অতি অল্পই হইয়া থাকে; পীড়ার ৭।৮ দিবস পরে গাত্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল স্ফোট দেখা যায় উহাকে Typhoid rash কহে। কোন কোন স্থলে এই স্ফোট মোটেই উদ্ভূত হয় না। এই স্ফোট দেখিতে ঠিক মশার কামড়ের ন্যায় এবং পৃষ্ঠে বক্ষে. উরুদেশে ও পদে দেখা যাইয়া থাকে। উহা কখনই অধিক মাত্রায় দেখা যায় না।

এখানে সামান্যরূপে যে নৈদানিক পরিবর্ত্তন টাইফয়েড জ্বরে হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিব। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে এই জ্বর বিশেষতঃ মল মূত্রের পচনাবস্থা হইতে উত্থিত গ্যাস হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ টাই-ফয়েড্ জ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদেও দেখা যায়। এই মৃতদেহ পরীক্ষায় আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে ক্ষত উদ্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তাহা প্রায়ই পীড়ার সাংঘাতিকত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা একটি মন্দ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। প্রথম সপ্তাহে ইহাতে উদরাময় দেখা যাইবার সম্ভব কিন্তু পরে উহা কোষ্ঠবদ্ধে পরিণত হইয়া থাকে, এমন কি ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত মলবদ্ধ থাকিতে দেখা গিয়াছে।

রেমিটেণ্ট বা অবিরাম জ্বর হইতে সহজে বড় ইহার পার্থক্য অনুভব করা যায় না। কিন্তু পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ চিকিৎসক নিম্ন বর্ণিত দুটি লক্ষণেই প্রায় স্থলে পীড়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। এই টাইফয়েড জ্বরে প্রথম সপ্তাহে ক্রমানুযায়িক তাপ বৃদ্ধির কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসি-য়াছিলাম। তাহা একটি জ্ঞাপক লক্ষণ এবং দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ কুক্ষি- ও কুঁচ্‌কি প্রদেশের মধ্যস্থলে হাত দিয়া টিপিলে গল্ গল্ শব্দ শ্রুত হইবে। অনেক সময়ে এই রোগের লক্ষণ মাত্র দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে [illegible] নির্ণীত হইয়া থাকে। পীড়া নিরূপণ করিবার মানস করিলে বিশিষ্ট টাইফয়েড লক্ষণ অর্থাৎ অবস্থা-বস্থা দৃষ্টেও রোগ জানিতে পারা যায়।

অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে এই পীড়ার ৮।১০ দিন পর হইতেই বাতরোগ হইয়া যায় এবং আত্মীয় স্বজন কাহাকেও চিনিতে পারে না। পীড়া সাং-ঘাতিক অবস্থায় রোগীর হাত, পা, ঠোঁট জিহ্বা, সমুদয় কালবর্ণ হইয়া যায় এবং দেখিলে মনে হয় যেন কেহ কালি মাখিয়া দিয়াছে। এই লক্ষণটি বড়ই সাংঘাতিক জানিবে।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এরূপ পীড়া আরোগ্য হওয়া সম্ভব কিনা? এবং উগ্র অ্যালোপ্যাথী ঔষধ ব্যবহার না করিয়া সরল হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসকের রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে কিনা? যাঁহারা মনে করেন যে উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ (কার্য্যে না হউক ব্যবহারে উৎকট) প্রয়োগ না করিলে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে ভূয়োভূয়ঃ (হাসপাতালে ও প্রাই-ভেট প্রাক্টিসে) দেখা গিয়াছে যে এই সকল হোমিওপ্যাথী মতের চিকিৎসায় শতকরা ৮০।৮৫ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে। অ্যালোপ্যাথের ভক্তগণ যাহাই কেন বলুন না এরূপ সফলতা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে আজও লাভ ঘটে নাই।

চিকিৎসা দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা (১) প্রতিষেধক এবং (২) আরোগ্য। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে Prevention is better than cure অর্থাৎ উৎপন্ন রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা উহা উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই [illegible] ব্যবস্থা। ইহা একটি অতি সহজ [illegible]

অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি প্রভৃতি সকল দিকেই ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়, এ কারণ আমরা প্রথমে এই বিষম রোগ যাহাতে উদ্ভূত হইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

অনেকের মতে ইহা একটি সংক্রামক (Contagious) পীড়া বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আমরা যে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী তাহা নহে। তবে আমরা এমত বলি না যে উক্ত পীড়াগ্রস্ত রোগীকে স্পর্শ করিলেই ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িবে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী প্রভৃতি কেহই বড় উহার কবল হইতে উদ্ধার পাইতেন না। যাহা হউক যথাসাধ্য প্রত্যেকরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই পীড়া যখন যেস্থানে আরম্ভ হয় তখনই প্রায় বহুব্যাপী (Epidemic) হইয়া পড়ে তাহার কারণ আর কিছুই নহে শুশ্রূষার অসাবধানতা নিবন্ধন অনেকেই আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমরা পুনঃপুন বলিয়া আসিতেছি যে টাইফয়েড্ পীড়ার মলমূত্রই দূষিত পদার্থ এবং উহা হইতেই গ্যাস উত্থিত হইয়া বায়ুকে সংস্পর্শ দোষাক্রান্ত করে এবং সেই বায়ু প্রশ্বাসিত হইয়া আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করতঃ ঐ রোগ আনিয়া ফেলে। অতএব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র সাবধানে দূরে নিক্ষেপ করিবে অথবা মাটির নিম্নে উহা প্রোথিত করিয়া ফেলিবে কিন্তু সাবধান (পল্লীগ্রামে হইলে) কদাচ যেন পাতকুয়ার ধারে উহা প্রোথিত না হয় কারণ তাহা হইলে, বৃষ্টির জলে উহা ধৌত হইয়া পাতকুয়ার জল দূষিত করিতে পারে। এই রোগীর নিশ্বাসও বড়ই দূষণীয় এজন্য চিকিৎসক, শুশ্রূষক প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। রোগীর শয্যা প্রায়ই বদলাইয়া রৌদ্রে দেওয়া প্রয়োজন নতুবা রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্মে ও দেহ দূষণীয় হইয়া উঠে। এক কথায় উক্ত রোগীর শরীর নিঃসৃত সমুদয় প্রকার পদার্থই দূষণীয় জানিয়া তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবে। (ক্রমশঃ)

ডাঃ মৈত্র।

স্বায়ম্ভ-চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রণ—ব্রণশোথ।

আমরা যাহাকে ঘা বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ব্রণ। ক্ষত ব্রণরোগের অপর একটি প্রসিদ্ধ নাম।

ব্রণ দুই প্রকার—এক প্রকারের নাম শারীর ব্রণ, অপর প্রকারকে সদ্যোব্রণ বলে।

শরীরের দোষে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের প্রকোপে শরীরে যে ব্রণরোগ জন্মে, তাহার নাম শারীর-ব্রণ। আর অস্ত্রে কাটিলে, শর বিঁধিলে, আগুনে পুড়িলে কিম্বা ঘর্ষণ ও আঘাত প্রভৃতি অন্যান্য কারণে শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির অপচয় ঘটিলে যে ব্রণরোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে।

শারীর-ব্রণ জন্মিবার পূর্ব্বে প্রায়ই বেদনাযুক্ত বিবর্ণ স্থানিক শোথ উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে স্থানে ব্রণ জন্মিবে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে, টাটানি ও ছেঁচানি প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনাযুক্ত হয় এবং সেই স্থানের বর্ণ বিপর্যয় ঘটে। এই প্রকার শোথ বা ফুলাকে ব্রণশোথ বলে। লোকে সচরাচর ব্রণশোথকেই ব্রণ বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ব্রণ নহে, ব্রণরোগের পূর্ব্বরূপ। ছোট-বড় ফেঁদ, স্ফোটক, ফোড়া এবং চার প্রভৃতি ব্রণশোথের চলিত নাম।

ব্রণশোথ আপনা আপনি বিদীর্ণ হইলে কি বিদারণ করিয়া দিলে শারীর-ব্রণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোথ ছয় প্রকার—বাতশোথ, পিত্তশোথ, কফশোথ, ত্রিদোষশোথ, রক্তশোথ এবং আগন্তু-শোথ।

যে শোথের বর্ণ খুব লাল বা কাল, শোথযুক্ত স্থানে হাত বুলাইলে খস্‌খসে বোধ হয় এবং শোথ টিপিলে বসিয়া যায় অর্থৎ ঠোল খায় তাহাকে বাত-শোথ বলে। বাতশোথে টাটানি, শূলানি এবং দপ্‌-দপানি প্রভৃতি যাতনা কখন বোধ হয় কখনও বা জানিতে পারা যায় না। বায়ু বিকৃত হইয়া ত্বক্ মাংস ও রক্তাদি আশ্রয় করিয়া বাতশোথ উৎপাদন করে।

যে শোথ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, শোথের বর্ণ পীত বা লোহিত হয়, শোথের, মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে এবং শোথ টিপিলে ঠোল খায় না অথচ কোমল বোধ হয় তাহাকে পিত্তশোথ বলে। কুপিত পিত্ত রক্ত-মাংসাদি আশ্রয় করিয়া পিত্তশোথ উৎ-পাদন করে।

কুপিত কফ, স্থানসংশ্রয় করিয়া যে শোথ উৎপাদন করে তাহাকে কফজশোথ বলে। কফজ-শোথ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, শোথের রং পাণ্ডু বা শুক্ল এবং চাক্‌চিক্যযুক্ত। এই শোথ খুব কঠিন হয় এবং শোথে চুলকণা প্রভৃতি যাতনা থাকে।

যে শোথে উক্ত তিন প্রকার শোথের লক্ষণ দেখা যায় তাহার নাম ত্রিদোষ শোথ।

মাকড়শা, ভিমরুল ও বোলতা প্রভৃতি কীট পতঙ্গের দংশনে, সবিষ প্রাণীর মল-মূত্র সংযোগে এবং বিষাক্ত গাছের লতা, পাতা এবং আঠা প্রভৃতি লাগিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তুশোথ বলে। দুষ্ট বায়ু এবং দূষিত জলের সংস্পর্শেও আগন্তু শোথ জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রণশোথের চিকিৎসা।

ব্রণশোথ প্রকাশ পাইলেই তাহা বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা যাহাকে 'বসান দেওয়া' বলি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে বিম্লাপন বলে। ব্রণ-চিকিৎসার সাতটী ক্রমের মধ্যে বিম্লাপন আদ্যক্রম। প্রথমেই, বিম্লাপনের জন্য অর্থাৎ শোথ বসাইবার জন্য প্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয় এইজন্য ইহাকে আদ্যক্রম বলা যায়।

ব্রণশোথ বসাইয়া দিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে তন্মধ্যে প্রলেপ দেওয়া অনায়াস বা অল্পায়াস সাধ্য প্রক্রিয়া। এক-মাত্র প্রলেপ প্রয়োগেই অনেক স্থলে সুফল লাভ করা যায়।

একই প্রকার প্রকার প্রলেপ প্রয়োগে সকল প্রকার শোথ প্রশমিত হয় না, শোথ বিশেষে প্রলেপ বিশষের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তজ্জন্য বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ শোথের লক্ষণ দেখিয়া যে শোথে যে প্রকার প্রলেপ দিবার উপদেশ আছে সেই প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রলেপ প্রয়োগ করিবার কয়েকটী বিশেষ বিধি।

শোথ বসাইবার প্রলেপ দিনের বেলায় দিতে হয়, রাত্রিকালে দিতে নাই।

শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দিতে হয়। যদি ব্রণশোথের স্থান বিশেষ উচ্ছ্রিত হয় অর্থাৎ উঁচু হইয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ উঁচু স্থান আদৌ বিদীর্ণ হইয়া পুঁজ রক্ত প্রভৃতি নির্গত হইবে। এরূপ উঁচু স্থানকে লোকে ফোড়ার মুখ বলে। ফোড়ার মুখ আলগা রাখিয়া শোথস্থান আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

যে দ্রব্যের যেরূপ স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ এবং আস্বাদ তাহা যদি ঠিক থাকে তাহা হইলে যে দ্রব্য

ভাল আছে বুঝিতে হইবে। প্রলেপের জন্য ভাল দ্রব্য অবশ্যই গ্রহণ করিবে। টাট্‌কা গাছ গাছড়ার প্রয়োজন হইলে সতেজ গাছের ছাল, মূল, পাতা প্রভৃতি লইতে হইবে। প্রলেপের দ্রব্য বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। পোকায় ধরা লতা পাতা ফল মূল কদাচ গ্রহণ করিবে না। বেণে-মসলাও যাহা টাট্‌কা থাকে তাহাই লইবে।

যে খলে বা শিলায় প্রলেপ বাটিতে হইবে তাহা যেন খুব পরিষ্কার হয়। বাটিবার নোড়াও বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

প্রলেপের দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে বাটিয়া লইতে হইবে।

এক আঙ্গুল পুরু প্রলেপ দিলেই কার্য্যসিদ্ধ হয়। তার চেয়ে পুরু প্রলেপ দিলেও হানি নাই। ঘসা চন্দন প্রভৃতি এরূপ ঘন করিয়া লইবে যে প্রলেপ দিলে গড়াইয়া না পড়ে।

প্রলেপ শুকাইয়া আসিলেই তাহা উঠাইয়া নূতন প্রলেপ দিতে হয়। শোথের উপর প্রলেপ সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

একবার দেওয়া প্রলেপ কদাচ পুনর্ব্বার দিবে না। অনেকক্ষণ বাটিয়া রাখা প্রলেপ কি বাসি প্রলেপ দিতে নাই।

রোমাবলী উৎক্ষেপ করিয়া নীচের দিক্ দিয়া উপরের দিকে প্রলেপ যোজনা করিবে।

বাতজ ব্রণশোথের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদি বাতজ ব্রণশোথে টাটানি, শুলানি এবং দপ্‌দপানি প্রভৃতি নানা প্রকার যাতনা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিয়া স্বেদ অর্থাৎ তাপ্ দিলে সত্বর যাতনার লাঘব হয় এবং ফুলা কমিয়া যায়।

১

কৃষ্ণতিলের অর্থাৎ কালতিলের শাঁস এরণ্ড বীজের অর্থাৎ ভেরেণ্ডার বীজের শাঁস এবং তিসি এই দ্রব্য তিনটির প্রত্যেক দ্রব্য তুল্য পরিমাণে ওজন করিয়া জল দিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে।

ব্রণশোথের উপর সেই বাটনার পুরু প্রলেপ দিয়া, প্রলেপের উপর কলার কচি পাতা রাখিয়া তাহাতে তাপ দিবে। লোহার হাতা আগুণে গরম করিয়া কি কাপড়ের পৌঁটলা গরম করিয়া মৃদু মৃদু তাপ দিতে হইবে।

২

গাওয়া ঘি গরম করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া শোথের উপর রাখিবে। তদুপরি অল্প অল্প গরম ঘি পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করিলে বাতজ শোথের যাতনা কমিয়া যায়। যেরূপ গরম লাগিলে রোগী সোয়াস্তি বোধ করে সেইরূপ গরম অবস্থায় ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩

যজ্ঞডুম্বুর গাছের টাট্‌কা নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা লইয়া সেই আঠার উপর প্রলেপ লাগাইলে শোথ বসিয়া যায়।

৪

যজ্ঞডুম্বুরের গাছের বা শিকড়ের ছাল শীতল জলের সহিত বেশ করিয়া বাটিয়া অল্প গরম করত পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলেও উপকার লাভ করা যায়।

৫

ডেউয়া বা ডহুয়া অথবা মাদার প্রভৃতি নামে পরিচিত গাছের আঠায় সৈন্ধব মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বাতজশোথ অচিরে বসিয়া যায়। বাঘী নামক অতি দুষ্ট শোথও এই প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

৬

বেগুণের ফুল এক ভাগ ও মরিচ সিকি ভাগ একত্র জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপ-

কার লাভ হয়। শোথের আয়তন বুঝিয়া ঔষধের ফুলের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণশোথ বসাইবার প্রক্রিয়া।

তুল্যরূপ।

১

শীতল জলের সহিত রক্তচন্দন ঘসিয়া খুব ঘন করিয়া লইবে। সেই ঘসা চন্দন পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণশোথের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। যেমন একটী প্রলেপ শুকাইয়া আসিবে অমনি সেটী ধুইয়া অপর একটী প্রলেপ লাগাইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপে প্রলেপ লাগাইলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

২

দূর্ব্বার মাইজ শীতল জলের সহিত বাটিয়া তাহার সহিত ঘসা রক্ত চন্দন মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

৩

দূর্ব্বা, নলের মূল, যষ্টিমধু চূর্ণ এবং রক্ত চন্দনের গুঁড়া একত্র জল দিয়া বাটিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে উক্ত উভয় প্রকার শোথ বসিয়া যায়।

যদি ফোড়ায় খুব জ্বালা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

৪

কৃষ্ণতিল মেটে পাত্রে রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুণের তাপে অল্প ভাজিয়া কোন পাত্রস্থিত গরুর দুধে ফেলিবে। তারপর সেই দুধে ভিজা তিল বেশ করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথের জ্বালা জুড়াইয়া যায়।

ঘায়ে জ্বালা থাকিলেও উক্ত প্রলেপ ঘায়ের উপর লাগাইবে। ইহার ন্যায় ঘায়ের জ্বালা নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

Swadeshi Case — স্বদেশী কেস্ প্রকাশিত, মূল্য ।৵ আনা। এ গ্রন্থে স্বদেশী সম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি মোকদ্দমা হইয়াছে তৎসমুদায়ের ধারাবাহিক কাহিনী এবং সংবাদাদি লিখিত আছে। কি প্রকারে সামান্য 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কর্তৃপক্ষের অন্তঃকরণে বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল তাহা পাঠ করিলে যথার্থই বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। পুস্তকখানি কলিকাতা সিটিবুক সোসাইটিতে প্রাপ্তব্য।

ভারতমহিলা—আষাঢ়। এই সংখ্যায় কয়েকটী সুন্দর চিত্র আছে তন্মধ্যে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর "গোদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে" নামক চিত্রটীই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রবন্ধগুলিও বঙ্গ সাহিত্যে খ্যাত প্রতিষ্ঠ লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত। 'ভারতমহিলা' মহিলাসমাজের গৌরবের জিনিষ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার সবিশেষ উন্নতি কামনা করি।

নতি নলিনী। শ্রীযামিনীনাথ সান্যাল প্রণীত। মূল্য দুই আনা। যামিনীনাথ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহার নতি নলিনী পদ্য। সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাণী ভক্তি, নীতি ও বিনয়াদি বাস্তবিক এত সরল যে পাঠ করিলে "শান্তি শতক" পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

আশা—বৈশাখ। 'আশার' বৈশাখ সংখ্যা পাইলাম। অনেক প্রসিদ্ধ লেখক এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন। কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আশার লেখা সাহিত্য ক্ষেত্রে বেশ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

Rani Sri (5) Damban Kumari Devi আত্মকাহিনী; মূল্য ১৲ টাকা। মহারাণী শ্রী

শ্রীমতী দময়ন্তী কুমারী দেবী নেপাল রাজ্যের প্রধান সচিব সুবিখ্যাত মহারাজ সার দেববাহাদুরের চতুর্থ কন্যা এবং মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ ধীর বিক্রমের পত্নী। দময়ন্তী কুমারী নিজে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতা এবং শিকারাদি কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার স্বলিখিত আত্মকাহিনী অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। কালের কুটিল গতি বশাৎ কি প্রকারে অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজরাজ্য হইতে আত্মীয় কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারই বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহার ধৈর্য্যের ও মহদন্তঃকরণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত রমণীর এইরূপ শৌর্য্য বীর্য্য কাহিনী প্রত্যেক ভারতবাসীরই পাঠ করা উচিত। এই দুঃখের সময়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তিনিই বলিতেছেন, "যদপি জন্ম বভূব পয়োনিধৌ নিবসনং জগতাং পতিমস্তকে। তদপি নাম পুরাকৃত কর্ম্মণা পততি রাহু-মুখে খলু চন্দ্রমা॥" ভগবান তাঁহাকে শান্তি প্রদান করুন।

আর্য্যভূমি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

—(*)—

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ৵০ তিন আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে অথবা স্থগিত না করিলে আমরা নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাঠাইতে থাকিব।

৩। মূল্য পাঠাইবারকালে অথবা অপর কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে পুরাতন গ্রাহক নিজের নম্বর লিখিবেন, নূতন গ্রাহক, 'নূতন' এই কথাটী লিখিবেন। পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ৭ দিবস পূর্ব্বে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নোটিস দিতে হইবে।

৪। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৫। লেখিকা ও নূতন লেখকগণকেও বিশেষরূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহাদের কোন প্রবন্ধের কোন অংশের পরিত্যাগ কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে সম্পাদক বিবেচনা মত করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ও পত্রাদি একপক্ষ পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হয় না। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৭। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।
খাদিয়া গাড়ুলীয়া।

৩৮নং শিবনারায়ণদাসের লেন ঘোষ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও প্রিণ্টার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]　　　　[শ্রাবণ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি; পি দত্ত F. C. S. PH, D. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার বৈদ্য প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য।০ আনা)
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা সোমপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।



মাতাজী মহারাণীর মৃত্যু সংবাদে মহাকালী পাঠশালার
ছাত্রীবৃন্দ শোক করিতেছে।

আর্য্যভূমি।

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [শ্রাবণ ১৩১৪ সাল।

স্পর্শমণি।

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ঈশ্বরপরায়ণ, সাধু মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের হৃদয়শায়ী ভূত ভাবন ভগবান্ ভূত কল্যাণের জন্য তাঁহাদের মুখ দিয়া যাহা বলান তাঁহারাও ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাহাই বলেন। এই সকল সারবান্ উক্তি মহাপুরুষের মহাবাক্য নামে খ্যাত; এবং ধর্ম্ম জগতের অমূল্য রত্ন। মানবগণ যখন সংসার মৃগতৃষ্ণিকায় আকুল হইয়া পড়ে, অজ্ঞানান্ধকারে পথভ্রান্ত হয়, গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না, তখন এই মহাপুরুষগণের উপদেশাবলীই তাহাদিগের পক্ষে সুশীতল বারির কার্য্য করে, এবং তাহাদিগকে প্রকৃষ্ট সরণি দেখাইয়া দেয়। জানি না এই সকল উপদেশাবলী কি অমোঘ শক্তি সম্পন্ন, কি ঐশীবলে বলীয়ান্, যে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মানবের চিত্ত বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়, পাপজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, হৃদয়ের মালিন্য সংস্কৃত করে, কঠিন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

শুনিয়াছি স্পর্শমণি সংযোগে কঠিন লৌহও সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, লৌহের কৃষ্ণবর্ণ পীতবর্ণ ধারণ করে। স্পর্শমণি কেহ কখনও দৃষ্টিগোচর করে নাই, সুতরাং স্পর্শমণি অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু অবহিত চিত্তে প্রণিধান করিলে প্রতীতি হয় স্পর্শমণি অলীক স্বপ্ন নহে। এই সত্যসন্ধ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু মহাপুরুষগণই প্রকৃত স্পর্শমণি। ইঁহাদের চরণরেণু স্পর্শে, উপদেশাবলী কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিলে, প্রকৃতই লৌহবৎ মলিন কঠিন হৃদয়ও সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল ও নমনীয় আকার ধারণ করে।

এই সকল সাধু পুরুষেরাই ধন্য, ইঁহারাই মানব সমাজের আদর্শ এবং ইঁহারাই মানবমণ্ডলীর জীবনাদর্শ। নিম্নে এক মহাপুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল। অতঃপর ইঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশাবলী 'সৎসঙ্গপ্রসঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়া প্রতিমাসে ধারাবাহিক রূপে আর্য্যভূমিতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর উক্ত দিবস ভারতবর্ষের হিন্দু প্রধান প্রদেশ মাত্রেই মহাসমারোহে এক উৎসব হইয়া থাকে, তাহার নাম গুরুপূজা মহোৎসব। আর্য্য-ভূমির সর্ব্ববিধ স্থানের মন্ত্রশিষ্য, শাস্ত্রশিষ্য প্রভৃতিগণ স্ব স্ব গুরুদেবকে যথাবিহিত পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল এই বাঙ্গালায় এই গুরুপূজা প্রথা দেখা যায় না। কলিকাতায় কেবলমাত্র পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর শুভাগমনের ফলে মহাকালী পাঠশালায় এই গুরুপূর্ণিমা উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমতী কুমারীবৃন্দ প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুরুপূজা উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্বর্গীয়া মহারাণী মাতাজী তপস্বিনীর কৃপায় বঙ্গদেশে এই গুরুপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা সাতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভায়ও আজ কয়েক বৎসরাবধি মহাসমারোহে গুরুপূজা মহোৎসব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসরও উক্ত সভায় গুরুপূজা উপলক্ষে বহুসংখ্যক দীন দুঃখী কাঙ্গাল এবং বহুল সাধু সন্ন্যাসীগণকে অন্নাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এ সংবাদে সাত্ত্বিক সৎকার্য্যের প্রশংসা আছে—যাঁহারা ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া কেবল পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পরহিতে ব্রতী হইয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে জীবনোৎসর্গ করেন, তাঁহাদিগের আসন সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে। এই সভার পূজ্যপাদ আচার্য্য যিনি বহুদিন হিমালয়, বহুজন সুখায় নিজ সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের নরনারীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তাহাদিগের দুঃখের গভীরতা প্রত্যক্ষ করতঃ তন্নিবারণকল্পে মনোযোগী হইয়া ভগবৎ কৃপায় মহাপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজত্বের রাজধানী এই মহানগরী কলিকাতায় শুভাগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশবাসীকে অপূর্ব্ব তেজোদৃপ্ত স্বধর্ম্মানুকূল বীরবাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছেন, সেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমাসভূত—সেই লোকহিতার্থে আবাল ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ স্বামী নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়ের অপার করুণায় ও ঐকান্তিক যত্নে আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

ইনি স্বদেশভক্ত স্বজাতিবৎসল, সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে দেশের গণ্যমান্য ও রাজপণ্ডিত বরপুত্রের সংখ্যাই অধিক। ইনি একাহারী, নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন নিরীহ ব্যক্তি। এই জন্য, তাঁহার শরীরে প্রভূত বল না থাকিলেও তাঁহার মনের শক্তি ও সামর্থ্য অতিশয় প্রবল। সমাজের সাম্প্রদায়িক কলহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও অনৈক্য নিবারণে এই মহাপুরুষ বদ্ধপরিকর করিয়াছেন। ইঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও ওজস্বিনী—অমৃতোপম উপদেশাবলীর গুণে অনেকে এমন কি দস্যু ও

পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক সুনিয়মের অধীন হইয়াছে। যাহারা কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, ধর্ম্মের মধুর ভাব তাহাদের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিলে বড়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাহার আকর্ষণ বড়ই প্রবল হয়। তাই বলিতেছি, যে ব্যক্তি একবার এই মহাত্মার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যত বড় দুর্ব্বৃত্ত হউক না কেন তাঁহার সামান্য কএকটী বাক্য সেই ব্যক্তির কর্ণ কুহরে অমৃত বর্ষণের ন্যায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতেই হইবে। এবম্বিধ সৎকার্য্যের নিমিত্ত স্বদেশবাসী তাঁহাকে রাজপূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই অলৌকিক প্রতিভাশালী সাধু পুরুষ এই খানেই স্বীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করেন নাই। স্বজাতির এবং ভক্তগণের উন্নতির অন্যবিধ পবিত্র পন্থাও অবলম্বন করিয়াছেন। যে বাঙ্গালী জাতি আত্ম-কলহে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিত ইনি তাহাদের মধ্যে একতা ও সহানুভূতির সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত করিতেছেন—এ মহাস্ত্র মহাপুরুষগণের হৃদয় দুর্গে রহিয়াছে। প্রতি রবিবারেই বাঙ্গালীর অবকাশ থাকে, সেই অবকাশে আর যাহাতে আমরা বৃথা অলীক আমোদে অথবা আত্ম-কলহে সময় ক্ষেপণ করিতে না পারি, তজ্জন্য ইনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং গীতোক্ত স্বধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আমাদিগকে স্বধর্ম্মাস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া প্রকৃষ্ট ধর্ম্মরূপ রণাস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত করিতেছেন।

এই ভারত ভূমিতে কাল প্রভাবে নানাদেশীয় নৃপতি আসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু অধুনাতন ইংরাজ রাজত্বে বৃটিশ রাজ বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন বটে তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি বিহীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। অধুনা ভারত গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্ব শ্রেণীর মহাত্মাগণই আমাদের দেশের বালক এবং যুবকগণের চরিত্র বিহীনতা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। অনেকেই বলেন ইংরাজী শিক্ষাই এই সমূহ অনিষ্টের মূল; কারণ অধুনাতন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, রাজভক্তি এবং অপরাপর গুরুজন ভক্তি ও স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ইংরাজী বিদ্যা নানারূপে আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হইলেও শিক্ষা প্রণালীর দোষে এক প্রকার পরম শত্রু। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে এই ইংরাজী শিক্ষার সহিত বাল্যকাল হইতেই বালকদিগকে স্বধর্ম্ম রক্ষা করা সম্বন্ধে উপদেশ না দেওয়াতেই অধুনা আমাদের দেশের শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে এতদূর ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ— "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" একমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষাতেই মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রভূত কল্যাণের মূল স্বরূপ স্বকীয় ধর্ম্মেরই প্রতি যাহার আস্থা নাই তাঁহার মাতৃপিতৃ গুরুজন ভক্তি কিংবা রাজভক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্বধর্ম্মে অনাস্থাশীল ব্যক্তি হিন্দুই হউন মুসলমানই হউন, অথবা খ্রীষ্টানই হউন, কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেন না।

এই স্বধর্ম্মানুকূল শিক্ষা দিবার উপযুক্ত সময়ই বাল্যকাল। কারণ সুকুমার মতি বালকদিগের কোমল হৃদয়ে যে উপদেশ একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আজীবনকাল থাকিয়া যায়। যে উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়ের বালকগণ ক্রমশ

কদাচার এবং অখাদ্য অব্যবহার্য্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া সুশিক্ষা লাভ করে তন্নিমিত্ত এই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন স্বদেশ প্রেমিক মহা-তেজস্বী তপোধন "পেট্রিয়টিক ইনষ্টিটিউসন" নামক একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় সর্ব্ববিধ লোকের জ্ঞানের জন্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে-ছেন। এখানে আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রভৃতি হিন্দু নরনারীর সকলেই ইহাঁর উপদেশ প্রাপ্ত হইতে-ছেন।

ইনি একাহারী, নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন নিরীহ ব্যক্তি। এইজন্য, তাঁহার শরীরে প্রভূত বল না থাকিলেও তাঁহার মনের শক্তি ও সামর্থ্য অতিশয় প্রবল।

স্বামী নগেন্দ্রনাথের বাল্য লীলার বিষয় আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কারীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, তাঁহার মেধা-শক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রম পটুতা দর্শনে পাঠশালার গুরু অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন এই বালক যেরূপ মেধাবী ও ধর্ম্মপিপাসু এবং ইহার স্মৃতি শক্তি যেরূপ প্রবল তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শীতা দেখাইতে পারিবে এবং উত্তরকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবে। "ব্রাহ্মণ" বলিলে পূর্ব্বে বিস্তর কথা বুঝাইত বটে; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিলে আজকালকার দিনে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা প্রায় কিছুই নয়; কেবলমাত্র একটা অনেক দিনের পুরাতন আভিজাতিক উপাধি মাত্র। ইনি বাল্য-কালে বাস্তবিক এ প্রকৃতির সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বাচ্য দ্বিজ ছিলেন না, তিনি অতি শৈশবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসী সন্ধ্যাহ্নিক পূজা এবং নিত্য নিয়-মিত পূজা পাঠে নিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পাঠদশায় তাঁহার অসংখ্য কার্য্যের মধ্যে, ইংরাজীর অশেষ আলোড়নের মধ্যে প্রত্যহ প্রত্যূষ কাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টী পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। ইহা করিতে তাঁহার কোনও দিনই সময় ও অবকাশাভাব হইত না।

স্বামী নগেন্দ্রনাথ যেরূপ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাহাতে ইনি ধর্ম্ম জগতে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। অতি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন। পল্লীগ্রামস্থ একজন জমীদারের সন্তান হইয়াও বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ দেওয়া এবং সংসার সুখ সম্ভোগ করা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। বস্তুতঃ স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভ্যাস করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব হয়। যাঁহার সুতীব্র ধর্ম্মপূর্ণ, মর্ম্মস্পর্শী, সরল বক্তৃতায় লোকের শিক্ষা সাধিত ও সমাজের বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইয়া থাকে, স্বদেশের হিতকর ধর্ম্মের কার্য্যে যিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর, এই বঙ্গ-ভূমিতে ধর্ম্ম আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্য যিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, দীন দরিদ্রের ক্লেশে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা বিগলিত, বিপন্ন ও শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ মোচনে যিনি আপনার শক্তির অতীত দান করিতেছেন, শাস্ত্রবাদিতায় যাঁহার সমকক্ষ এ দেশে খুব কম, যাঁহার অলোকসামান্য সদ্‌গুণরাজীর কথা সর্ব্ববিধ লোকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, তিনিই আমাদের গুরুদেব।

গুরু কে—এক অদ্বিতীয় ভগবান্। তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ? এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখা

যায়, তাহাই তাঁহার মূর্ত্তি।

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে শঙ্করি! শ্রবণ কর; যে মন্ত্র সেই গুরু, আবার যে গুরু সেই হরি, সেই ব্রহ্মা, সেই মহেশ্বর অর্থাৎ আমি, আর সেই তুমি। যথাঃ—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মা বাপি হরো বাপি ত্বংবাপি শৃণু শঙ্করি॥
ইতি তন্ত্রসারে।

আমরা বারাণসীধামে বহুকাল পূর্ব্বে একদিন মহাকালী পাঠশালা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই যখন পূজনীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীকে জিজ্ঞাসা করি,—"আমরা গুরুর মূর্ত্তির কিরূপে সেবা করিব, তাহা বলুন"।

মাতাজী বলিলেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে সাধুগণে ও ভক্তগণে ভগবানের প্রকাশ অধিক-রূপে দেখা যায়। কারণ তাঁহাদের ভিতর ভগবান জ্ঞান, চৈতন্য ও আনন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগকে গুরুর মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিবে।

আমি বলিলাম। আমরা আজকাল সাধু-দিগের মধ্যেও ছোট বড় বিচার করিয়া থাকি। সেইজন্য সকলকে সমভাবে ভক্তি করিতে পারি না এবং সকলের কথা সমভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এক্ষণে আমরা কিরূপগুরু মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে পারি, তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

মাতাজী মহারাণী পুনরায় বলিলেন। সাধুও ভক্তদিগের মধ্যে যাঁহাতে ভগবানের প্রকাশ অধিক দেখিবে তাঁহাকেই গুরুমূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিবে।

আমার অনেক সঙ্গী বলিলেন, "কাহার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অধিক আছে তাহা কিরূপে জানিব? তাহার লক্ষণ কি? অনু-গ্রহ করিয়া বলুন। আর মা! আজ কালকার দিনে এরূপ গুরু দেখিতে পাওয়া যায় না। শিষ্যের ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলেও এরূপ গুরু এখন আর নাই।" ইহাতে মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী একটু বিরক্ত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে বলিলেন "এই যে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে আমার নিকট আসিয়াছেন উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর উঁহাদের যিনি গুরুদেব তিনি একজন মহাপুরুষ, তিনি গোপনে অতি সাবধানে সাধন ভজন করিতেছেন।" এই বলিয়া আমাদের গুরুদেবের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন আমাদিগের অপর একজন বন্ধু যখন পুনরায় তাঁহার বিষয় সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন তিনি বলি-লেন—"বৎস! তাঁহার দর্শন না পাইয়াও যখন তাঁহার জন্য তোমাদের চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে তখন এমন একদিন আসিবে যে তোমরাই তাঁহার শ্রীচরণে বিরাজ করিবে।" অতঃপর আমাকে আদেশ করিলেন—"বৎস! তোমার সঙ্গীগণ তোমার ন্যায় বড় ধর্ম্ম পিপাসু দেখিতেছি অতএব নগেন্দ্র বাবুর নিকট ইহাদিগকে লইয়া গিয়া প্রকৃত গুরু যে কি বস্তু তাহা দেখাইয়া দিয়া ইহা-দের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবে। ভাদুড়ী মহাশয় সকলেরই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা জগতে অতুলনীয়; লোকাভিরাম নগেন্দ্র নাথ আপনার সুশীল ও শান্ত-স্বভাব এবং অনুপম সৌজন্য দ্বারা সর্ব্বসাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। অতএব এমন একজন মহাপুরুষের দর্শন লাভ বহুভাগ্যের কথা। তাঁহার কৃপা লাভ করিবার আশায়, তোমাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত অনেক যুবক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আস

উপদেশ গ্রহণে গমন করিয়া থাকে।

পরমারাধ্যা ভগবতী তপেশ্বরী মাতাজী মহারাণী যে মহাপুরুষের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—আজ আমরা তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে যথার্থই বিরাম করিতেছি। আজ এই আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমার দিবস তাঁহারই কৃপায় এই মহানগরী কলিকাতায় গুরুপূজা মহোৎসব হইতেছে। এই আশ্রমটীর নাম "সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী নিকেতন।" এখানে গুরু পূজার দিন বহু-লোকের সমাগম হইয়াছিল। সহরের যে সকল গণ্য মান্য ব্যক্তি ও ভদ্র-মহিলাগণ আমাদের পরম আরাধ্য দেবতা ঠাকুরকে গুরুতুল্য ভক্তি করেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় বিবিধোপচারে পূজনীয় গুরুদেবের পূজা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই আমরা এই আশ্রমের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই অপার আনন্দ লাভ করিলাম। দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালা, আম্রপল্লবশ্রেণী সুশোভিত এবং সশীষ নারিকেল ও আম্রপল্লব সহ মনোহর মঙ্গল ঘট সকল বারি পরিপূর্ণ! কোন স্থানে যন্ত্র বাদ্যবাদকগণ আপন আপন যন্ত্র বিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছিলেন; অধিকন্তু গুরুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখানে বীণাযন্ত্রে ভজন করিতে করিতে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তৎপার্শ্বস্থ গৃহে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও আন্দুলনিবাসী জনৈক ভক্ত সুমধুর স্বরে হরি গুণ গান করিয়া শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন; এই পবিত্র আশ্রমে যে সমস্ত সম্রান্ত কুল-কামিনীগণ গুরুপূজা করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না; মহিলাগণের জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত এই বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমরা অন্য কোন স্থানে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

ক্রমে উপরে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ পার্শ্বের এক সুবিস্তৃত গৃহের মধ্যে সুচারুভূষণে ভূষিত বহু মূল্য বস্ত্রমণ্ডিত অপূর্ব্ব একখানি সিংহাসনে সেই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন ঋষিপ্রতিম পরমারাধ্য সাধু-পুরুষ সমাসীন। আকর্ণ বিস্তৃত অক্ষিযুগল স্থির-নিশ্চল-নিমীলিত, যেন অন্তরে কি এক অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন! অধর ওষ্ঠ অতি মৃদুভাবে কম্পিত! ধীরে অতি ধীরে ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত! মহাপুরুষ যেন মহাধ্যানে মগ্ন।

এই ধূর্জ্জটিপ্রতিম তপোধন যেন নিমীলিত নেত্রে তপোনিরত রহিয়াছেন। ঠাকুরের পরিধানে বারানসী ধুতি অঙ্গে সেই উত্তরীয় শোভিত হইয়া বহু মূল্যবান অলঙ্কার সকলকে লজ্জা দিতেছে। পশ্চাদ্দেশে নাতি দীর্ঘ প্রবাল-নীবিড় জলদকান্তি কেশজাল বিলুণ্ঠিত, সম্মুখেও সুদীর্ঘ শ্মশ্রু সমূহ মারুত স্পর্শে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন সাক্ষাৎ ভূতভাবন পতিতপাবন কৈলাশ-বিহারী পরম পিতা মহেশ্বরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। গুরুদেবের এই স্বর্গীয়মূর্ত্তি দর্শনে কিরূপ ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কারণ সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বর্ণনাতীত!

এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন:—

মনুষ্য চর্ম্মণাবদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
সশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতিক্ষিতৌ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

বাস্তবিকই সাক্ষাৎ ভগবান পরম শিব মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুরুরূপে শিষ্যকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন।

মহা পুরুষের সম্মুখে কিছুদূরে শিষ্য মণ্ডলী পদ্মাসনীকৃতাসনে অবস্থান করিতেছিলেন। সকলের

আনন্দিত। সকলের মুখমণ্ডল পবিত্র আনন্দে উৎফুল্ল। শিষ্যগণ যখন গুরুপূজা আরম্ভ করেন তখন এক অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই আশ্রমটী প্রকৃত প্রস্তাবে একটী অতি পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে পরিণত। এই গুরুপূজা উৎসব, ভক্তিমান্ আস্থাবান্ হিন্দু মাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ করে। ঠাকুরের সে দিনের সেই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনেই সংসার দাব দগ্ধ দর্শকের তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ঢালিয়া দিয়াছিল।

পূজনীয় ঠাকুরের সম্মুখে অর্থাৎ শ্রীপাদ পদ্মের প্রান্তদেশে একখানি নয়নরঞ্জন মনোহর ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি তদীয় সুবর্ণ খচিত রজত নির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় বিরাজিত। এরূপ সুন্দর চিত্রিত পাদুকা বঙ্গবাসীগণ কেহ কখনও দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তদুপরি আবার নানাবিধ বনজ পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিরসের আবির্ভাব করিয়া দিতেছিল। ঠাকুরের পাদুকায় অঙ্কিত চিত্রের অতি গূঢ় মর্ম্ম আছে।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল যে পূজোপকরণ যাবতীয় পূজার সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপধারে ধূপ ধূনা অগ্নি সহযোগে মধুর গন্ধ বিস্তার করিয়া সেই পবিত্র গৃহটী আমোদিত করিতেছিল। নানাবিধ স্থলজ জলজ পুষ্পরাশি পুষ্পাধারে অবস্থান করিয়া এই মহাপুরুষের অভয় চরণে স্থান লাভ করিবার অপেক্ষা করিতেছিল। আর সম্মুখেই একখানি সুচারু আসন প্রসারিত ছিল। ভক্তবৃন্দ আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া গুরু পূজা করিবেন বলিয়া এরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল। শিষ্য মণ্ডলী শ্রেণী বদ্ধ হইয়া একে একে যখন গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ পুষ্পাদি দ্বারা গুরু চরণ পূজা করিতে লাগিলেন বেদমন্ত্র সমস্বরে শ্রীগুরু স্তোত্র পাঠ করিলেন তচ্ছ্রবণে তখন প্রকাশ্যে স্বীকার না করুক ঘোর নাস্তিকের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইত। এই সময়ে ঠাকুরের নিকট কত লোকে মানসিক করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া যান। এরূপ অলৌকিক দৃশ্য বঙ্গদেশে অদ্যাপি কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় নাই। বস্তুতঃ পূজনীয় গুরুদেব বঙ্গে এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়া দিতেছেন। তিনি যে বীজ উপ্ত করিতেছেন তদ্ভূত বৃক্ষে অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রকেই নবজীবন প্রদান করিবে।

ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি এবং তদীয় অমৃতময়ী উপদেশাবলী পাঠকবর্গকে সময়ান্তরে উপহার প্রদান করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

আকাশ।

১

অনন্ত আকাশপট,
কে জানে কোথায় তট,
বিবিধ অসংখ্য ছবি
শোভে থরেথর।
শোভে থরেথর,
মূর্ত্তি মনোহর,
বিবিধ বরণে
রঞ্জিত সুন্দর।

২

জলধর শশধর,
গ্রহদল দিবাকর,
ধূমকেতু উল্কা কত
ধরেছ উদরে।

ধরেছ উদরে,
তারকা নিকরে,
মহাকক্ষে তব
ভুবন বিচরে।

৩

বিমল প্রভাতে কিবা,
অরুণের চারুপ্রভা,
হে নভো অরুণোদয়ে
মনে মনে গণি।
মনে মনে গণি,
সুষমা এমনি,
নীলোৎপলে শোভে
পদ্মরাগমণি।

৪

মধ্যাহ্নেতে দিবাকর,
বরষিয়া তীক্ষ্ণকর,
উজ্জ্বল প্রভায় করে
প্রদীপ্ত সকল।
প্রদীপ্ত সকল,
তব মধ্যস্থল,
প্রকাণ্ড হীরকে
শোভে নীলাচল।

৫

দিনমণি অস্তে যায়,
শোভিছে তোমার কায়,
অস্তগামী রবি কর
লোহিত প্রভায়।
লোহিত প্রভায়,
রবি শোভা পায়,
হেম পিণ্ডরূপে
শোভে নীলকায়।

৬

প্রদোষ হইলে গত,
রূপের নানামত,
তোমার অগাধ দেহে
অনন্ত অম্বর।
অনন্ত অম্বর,
তারকা নিকর,
কুমুদেতে পূর্ণ
নীল সরোবর।

৭

পূর্ণিমা শুভ্র যামিনী,
কৃষ্ণা অমা মিলিথিনী,
ধবল অসিত বাসে
সাজায় তোমায়।
সাজায় তোমায়,
মোহন মায়ায়,
স্বর্ণ চুমকী
কত শোভা পায়।

৮

হেমন্ত ও শীতকালে,
আচ্ছন্ন শিশির জালে,
মধুময় বসন্তেতে
সুরভি সমীরে।
সুরভি সমীরে,
ঢাকিয়া শরীরে
প্রমোদে মাতিয়ে
চল ধীরে ধীরে।

৯

নিদাঘে তাপিত হয়ে,
প্রাবৃটে জলদোদয়ে,
বিগত বিপদাপদ
হলহে কেবল।

ত ওহে কেবল,
শরতে নির্ম্মল,
সুরদেশে সাধি
জলদ পটল।

১০

মুক্ত পক্ষে উড়ে যায়,
সারি সারি বলাকায়,
স্থান দান কর সবে
ওহে মহাকায়।

ওহে মহাকায়,
যত বলাকায়,
সূত্রহীন মাল্যে
তোমারে সাজায়।

১১

সলিল শীকর-চয়,
রবির কিরণ-ময়,
প্রাবৃটে তোমার অঙ্গে
শোভে রামধনু।

শোভে রামধনু,
অপরূপ তনু,
ধরে নাম এক
আর ইন্দ্র-ধনু।

১২

সুদীর্ঘ তোরণ যেন,
শোভে মনে লয় হেন,
বিমোহিত হয় চিত্ত
স্তম্ভ হীনতায়।

স্তম্ভ হীনতায়,
যেন শোভা পায়,
নিসর্গের শোভা
কতই বাড়ায়।

১৩

বিদ্যুৎ চমকে কত,
অপরূপ রূপ যত,
তোমার সুনীল কায়,
পুনঃ মিশে যায়।

পুনঃ মিশে যায়,
বজ্র ধ্বনি তায়,
ভৈরব রবেতে
সৃষ্টি নাশে ধায়।

১৪

প্রাবৃটে জলদ দলে,
মত্ত হয়ে কুতূহলে,
সাজায়ে আপন দেহ
ময়ূরে নাচাও।

ময়ূরে নাচাও,
চাতকে বাঁচাও,
নব নীর দানে,
চকোরে কাঁদাও।

১৫

তোমার বিহনে হায়,
রহিত শব্দ কোথায়,
জগত জীবন বায়ু
কিরূপে বহিত।

কিরূপে বহিত,
প্রকাশ পাইত,
অনলের শিখা
তিমির নাশিত।

১৬

তোমা বিনা বাষ্প রাশি,
কোথায় উঠিয়া আসি,
মেঘ দল সাজাইত
বরিষণ তরে।

বরিষণ করে,
সব চরাচরে,
রক্ষিবার তরে,
পৃথিবী উপরে।

১৭

ভো মহো অনন্তকায়,
এ বিশ্ব বাড়িয়া যায়,
যতই কল্পনা করি
তব অপরূপ।

তব অপরূপ
দেখায় স্বরূপ,
বিশ্ব বিধাতার
সে দেহ কিরূপ।

১৮

ভক্তি পূর্ণ মনে আমি,
পূজি সে জগত স্বামী,
যে দেহ স্বরূপ ধরি
তোমাতে প্রকাশ।

তোমাতে প্রকাশ,
দেখিতে আকাশ,
সেই নিত্যধনে
সদা অভিলাষ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

অতীতের যবনিকা অন্তরালে যে এক নয়ন-মনোহর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি উহা কোন মহাপুরুষের? কি নর-দুর্লভ গম্ভীর ভাব-স্নেহ, প্রীতি ও করুণার সহিত মাখামাখি করিয়া মুখ-মণ্ডলে বিরাজমান রহিয়াছে! কি বিস্ফারিত নেত্র-যুগলে বৈরাগ্যের ছটার সহিত মিশিয়া পূর্ণ সমাধিকতা পরিস্ফুরিত শ্রী ও প্রশান্তি। ঐ অরবিন্দসুন্দর নয়নদ্বয়ের সৌন্দর্য্য দেখিলে কাহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হয়?

পাঠক শুনিবেন এ প্রতিমূর্ত্তি কাহার? সমস্ত পৃথিবী অবাক হইয়া যে সন্ন্যাসী বাঙ্গালী যুবকের প্রতিভার আলোচনা করিয়াছিল জ্ঞান গরিষ্ঠ ইংলণ্ড ও আমেরিকা অবনত মস্তকে যে বাঙ্গালী সাধুর কথা শুনিয়াছিল—যাঁহার অপরিমেয় উদ্যমে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইয়াছিল, ইহা সেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্ত্তি।

জীবনী-সমালোচনা লোক-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তির জীবনী-সমালোচনায় অনেক শিখিবার আছে। বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী-আলোচনায় পুণ্য আছে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে সন ১২৬৯ সালের ২৯ শে পৌষ সোমবার রাত্রি ১১।২৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শিমলায় বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতৃ-দত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রেরা তিন ভাই। নরেন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মহেন্দ্র মধ্যম ও ভুপেন্দ্র কনিষ্ঠ। কালের কুটিলগতিবশতঃ আজ ভুপেন্দ্র রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়া কারাবাসে।

নরেন্দ্র ছেলে বয়সে বড় আমোদে ছিলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু বলেন যে "তাঁহার মত ভাগ-ক্রীড়ায় আমোদ প্রমোদে ধুমপানেও গীতবাদ্যাদিতে এমন আর ছুটী ছিল না। কিন্তু ঐ আমোদের মধ্যে কোন কদর্য্যতা দেখা যাইত না। প্রাণটা যেন খোলাগড়ের মাঠ—যত মাড়িয়ে যেতে পার মাড়িয়ে যাও।"

বাল্যকালে নরেন্দ্রের বড় ধর্ম্মের প্রতি টান ছিল না; বরং তিনি একজন সংশয়বাদী ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৯১ সালে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতেও তিনি সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিতে-ছিলেন। এই সময়ে, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। জগদীশ্বর করুণা বলিতে হইবে, দেশের সৌভাগ্য বলিয়াই এখন মনে হয়, আইন পাঠ তাঁহার সমাপ্ত হইল না।

অদৃষ্টের অলক্ষ্য গতি তুমি আমি কি বুঝিব? আইন পাঠে নরেন্দ্রের পুরুষকারের পূর্ণ পরিচয় ত পাইলাম; কিন্তু অদৃষ্ট আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিল। অদৃষ্ট-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া বিবেকানন্দকে অন্যপথে চলিতে হইল। একে যৌবনকাল, তাহাতে আমোদ প্রিয়তা, এই আমোদ প্রমোদের সময়েই তাঁহার এক স্পর্শমণির সঙ্গলাভ হইল। পুরুষকার বিফল হইল বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় ছিল; ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজবপন হইল, বৃষ্টি হইল না; সুতরাং ফসলও ফলিল না; অদৃষ্টের দোষ; কিন্তু প্রতিষ্ঠা যাইবে কোথায়? আইন শিক্ষায় ব্যাঘাত হইল সত্য, কিন্তু তাহা না হইলে কি আজ নরেন্দ্রকে কেহ চিনিত, না ভক্তি করিত? এই সময়ে যে স্পর্শ-মণির সঙ্গলাভ হইয়াছিল, মহাত্মা রামকৃষ্ণই সেই স্পর্শমণি। ভগবান্ রামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের পর নরেন্দ্র—বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন—দশ বৎসর ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া ভারত পর্য্যটন করিলেন—আমেরিকায় গিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। ভারতের গৌরব দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইল।

চিকাগোনগরের ধর্ম্ম মহাসমিতির কথা চির স্মরণীয়। এসম্বন্ধে বিবেকানন্দের অনৈক বিশেষ পরিচিত বন্ধু যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা বলিতেছি।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে ধর্ম্মের মহাসমিতি আহুত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই মহাসমিতিতে উপস্থিত হন। অপরিচিত অজ্ঞাত-নামা স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে সেই মহা-সমিতিতে উপস্থিত হন। তখন পর্য্যন্তও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে কি এক মহাশক্তি, কি এক অপূর্ব্ব প্রতিভা ঐ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত আছে—কি অতুল বাগ্মীতা—কি অপরিমেয় শাস্ত্রজ্ঞান কি পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা ঐ গৈরিক বসনের নিম্নে লুকা-য়িত আছে।

মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ খ্যাতনামা ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের মত ও মহিমা ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক, স্বনামখ্যাত বাগ্মী স্বর্গীয় প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই মহাসভায় বক্তৃতা করিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতের ব্যাখ্যা করিলেন।

তাহার পর গৈরিক বসন ধারী, গৈরিক উত্ত-রীয় ও গৈরিক শিরস্ত্রাণধারী অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক—বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে তখন যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতে-ছিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—সেই পণ্ডিত-গণের সভায় একজন অপরিচিত অজ্ঞাতনামা যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই যুবক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন—ক্রমে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার সুর উঠিতে লাগিল—হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র ব্যাখ্যা যুবকের মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। যুবকের বক্তৃতা শক্তি—যুবকের শাস্ত্রজ্ঞান—যুবকের অকাট্য যুক্তিতর্কের প্রণালী দেখিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী, সাধুসমাজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই বাঙ্গালী যুবকের কথা শুনিতে লাগিলেন,—সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—সমস্ত আমেরিকায় এই বক্তৃতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল,—সে আন্দোলন, সে প্রশংসাধ্বনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে নূতন ও পুরাতন পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ সত্য সত্যই প্রতিভাব অবতার স্বামী বিবেকানন্দ সত্যসত্যই মহাজ্ঞানী পুরুষ। তখন ভারতবর্ষ জানিতে পারিলেন—বঙ্গভূমি কি অমূল্য রত্নের প্রসবিনী।

এইবার আমরা বিবেকানন্দের জন্ম পত্রিকা ও তাহার বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আজকাল জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে জ্যোতিষীগণের গণনার ফল প্রায়ই মিথ্যা হইত না। এক্ষণে ফল না মিলিবার প্রধান কারণ এই যে আধুনিক জ্যোতিষীগণের গণনা পদ্ধতি অশুদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি মূলগ্রন্থ হইতে গণনাদি না করিয়া স্থূলমার্গে রচিত ভ্রমসঙ্কুল নিয়মে গ্রহগতি নিরূপণ প্রভৃতি যাবতীয় গণনা সম্পন্ন হয় বলিয়া নিয়তই ফলের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থাদি অনুমোদিত দৃক্-গণিতের সাহায্যে এই মহাপুরুষের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া তৎপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ প্রাতে ৬টা ৩৩ মিনিটের সময় সায়ন তুলা রাশির দ্বাদশ অংশ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল। এই সময়েই বিবেকানন্দের জন্ম হয়। নিম্নে সায়নগ্রহ সকল স্ফুট প্রদত্ত হইল।

রবি রাশ্যাদি ৯।২২।৫৫
চন্দ্র রাশ্যাদি ৬।১৮।৪৮
বুধ রাশ্যাদি ১০।৪।৫৩
শুক্র রাশ্যাদি ৯।২৯।৫৬
মঙ্গল রাশ্যাদি ০।২৮।৩৮
বৃহস্পতি রাশ্যাদি ৬।২৭।১
শনি রাশ্যাদি ৬।৫।৩২
রাহু রাশ্যাদি ৮।১৯।৮
কেতু রাশ্যাদি ২।১৯।৮

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তুলালগ্নে শনি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, মঙ্গল কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হইয়া জন্মসময়ে উদিত হইতেছিল। চররাশি উদিত লগ্ন ও ছয়টী গ্রহ চরস্থ হওয়াতে তাঁহার লোক বিমোহিনী প্রতিভার সূচনা স্পষ্টরূপেই জানা যায়।

মনোবৃত্তির উচ্চাবস্থায় তিনি সাধন মার্গেই কল্পনায় জনসাধারণের অদম্য শক্তির পথ উদ্ভাবনা করিতে পারিতেন। তুলালগ্নের ফলে বিবেকানন্দ দেশান্তর ভ্রমণকারী, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মব্যবসায়ী; চন্দ্র ও বৃহস্পতি একত্রে উদিত হওয়ায় অলোকসামান্য স্থূলদেহ অনুমিত হয়। বুধ এবং শনি তুঙ্গী থাকায় জাতকের সৌভাগ্য ও সম্মান সূচিত করিতেছে। ... শনিযুক্ত ও মঙ্গল কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় ... কোন প্রকার অদ্ভুত পথাবলম্বন ... সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বোধ হয়। আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে দশমাধিপতি চারিটি গ্রহের সহিত কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক মুক্তিলাভ করে অথবা চারিটিগ্রহ লগ্নে অবস্থান করিলে জাতক

সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। লগ্ন হইতে গণনার প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। এস্থলে দশমাধিপতি চন্দ্রদেব, বৃহস্পতি ও শনিযুক্ত, মঙ্গল, রবি, বুধ ও শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং কেন্দ্রে অবস্থিত, আরও কেন্দ্রে ছয়টী বলবান গ্রহ, সুতরাং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ খুব স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে।

লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান বৃশ্চিকরাশি, তাহার অধিপতি মঙ্গল স্বক্ষেত্রগত হইয়া সপ্তমস্থ, ইহাতে জাতকের অর্থসম্বন্ধে কখন অসচ্ছলতা সূচিত করে না, বরং বন্ধুবান্ধবাদি হইতে অর্থলাভ জ্ঞাপন করে।

চতুর্থভাবপতি শনি তুঙ্গী হওয়ায় জাতক যে দেশে গমন করুননা, সেখানে পূজিত হইতেন এবং সকলে আদরে তাঁহাকে স্থান দিত।

পঞ্চমস্থান বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানলাভ প্রভৃতিও অনুমিত হয়। পঞ্চমভাব কুম্ভরাশি, অধিপতি শনি তুঙ্গী, এস্থলে বুধ ও উচ্চস্থ হইয়া অবস্থিত, সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জ্ঞাপন করিতেছে। প্রথমতঃ কুম্ভরাশি ও শনি ধর্ম্মবিষয়ে, সন্ন্যাস বিষয়ে ঔৎসুক্য বুঝায়, তথায় বুধ উচ্চস্থ, সুতরাং তাঁহার অতুল বাগ্মীতা, অপরিমিত শাস্ত্রজ্ঞান, এবং পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

ষষ্ঠস্থান শত্রু ও পীড়াবোধক। ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নস্থ শনিদৃষ্ট এবং মঙ্গলকর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট; সুতরাং তুলারাশি অবস্থিতি হেতু উক্ত রাশিবোধক অঙ্গে পীড়া সূচিত করে। স্বামীজি বহুমূত্র পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সপ্তমস্থান বিবাহবোধক। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল শনি চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় এবং অংকরূপ উৎকট সন্ন্যাসযোগ থাকায় বিবেকানন্দের বিবাহ হয় নাই।

লগ্নপতি ও অষ্টপতি উভয়ই শুক্র। এই গ্রহ রাবিযুক্ত কিন্তু কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি না পাওয়াতে দীর্ঘায়ুযোগ ভঙ্গ হইয়াছে।

বঙ্গের দুর্ভাগ্যে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মাসে রাত্রি ৯॥০ সময় পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে, বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের দেবাত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। আজ ঠিক পাঁচ বৎসর হইল দেখিতে দেখিতে বঙ্গের অতুল কীর্ত্তিমান্ বিবেকানন্দ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি সাধুপুরুষ, তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সান্ধ্যভ্রমণ করিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং প্রায় একঘণ্টা ভগবানের প্রার্থনা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। একঘণ্টা পরে নিদ্রিত অবস্থায় দুইটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমরবাঞ্ছিত দেবলোকে সহসা গমন করিলেন।

যে গুণে বিবেকানন্দের এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সে গুণ ইহ-সংসারে এখন সুদুর্লভ। তাঁহার যে গুণের কথা স্মরণ করিয়া, আজ বহুসংখ্যক ভারতবাসী শোকাচ্ছন্ন, বিদেশী বিজাতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাঁহার সেই গুণে বিমুগ্ধ হইতেন। গুণসংস্পর্শে লোকের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন হয়, বিবেকানন্দের সেগুণ অনেক ছিল। যে গুণ থাকিলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চাহে, এবং যেগুণ থাকিলে মানুষ বাহ্যজগৎ ভুলিয়া সেই গুণবানেরই সম্পূর্ণ সত্তায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সেগুণও বিবেকানন্দের অনেক ছিল। স্থূল কথা, যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না। বিবেকানন্দ যে সিংহাসন শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে কি না, অন্তর্য্যামীই জানেন।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

হত্যারহস্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অলকা ও হেমচন্দ্র।

ক্ষণকাল পরে ঘেঁটুর সহিত অলকা হেমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। অলকা উপবিষ্ট হইলে ঘেঁটু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

অলকা সুন্দরী। তাহার নীলোৎপলসদৃশ শ্রুতিবিশ্রান্ত নেত্রদ্বয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তারকা দুটী যেন ঢল ঢল করিতেছে। মাথার কুঞ্চিত কাল কাল কেশগুলির মধ্যে অলকার মুখমণ্ডল যেন অম্বরে ক্ষণপ্রভাবৎ কমনীয় দেখাইতেছে।

অলকার গঠন মধ্যমাকৃতি বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর—সবেমাত্র চরণের চপলতা নয়নে আশ্রয় লইতেছে।

অলকা উপবেশন করিলে, হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার চাকর আমাকে অমরের বিষয় তদন্তের জন্য অনুরোধ করিতেছিল, আমি সে বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"
বীণাবিনিন্দিত স্বরে সলজ্জভাবে অলকা বলিল, আমি তাহা হইলে আপনার নিকট বিশেষ বাধিত হইব এবং আপনার যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত আছি।"

"সেকথা পরে হইবে। তুমি কি ইতিমধ্যে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ ?'

"না মহাশয়, এখনও সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই।"

"তবে সাক্ষাৎ করিও না ; কারণ তাহা হইলে এবিষয় সাধারণে জানিতে পারিবে।"

"বেশ, তবে তাহাই করিব।"

"আচ্ছা, তোমার মতে অমর নির্দোষী ?"

"হাঁ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

"তবুও তাহার নির্দোষীতা প্রমাণের কিছু উপায় বল্‌তে পারছ্‌ না ?

"দেখুন, তিনি তাঁর পিতাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ত্তেন, কখন কোন প্রকার অসন্তোষের কথা তাহার মুখে শুনি নাই।"

"তবে পিতাপুত্রে একত্রে থাকিত না কেন ?"

"পিতাপুত্রের স্বভাব ভিন্ন প্রকারের ছিল। বিশেষতঃ তাহার মাতামহ দত্ত সম্পত্তির আয় যথেষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে টাকা লইতে হইত না।"

"তবে যে দয়াল চাঁদের একজন চাকর বল্‌ছে যে, হত্যার দিবস টাকা লইয়াই পিতাপুত্রে বচসা হয়।"

"চাকরে মিথ্যা বলিতে পারে।"

"এ লোকটার কথা যেন বিশ্বাসযোগ্য বলেই বোধ হচ্চে।"

"কিন্তু এ লোকই বলেছে সে আড়াল থেকে শুনেছে।"

"তা হলে পিতাপুত্রের এই বিবাদের কথা তুমি বিশ্বাস কর না ?"

"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

"তবে বল, কি উপায়ে আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি ?"

"সে উপায় আপনিই দেখুন, আমি—" বাধা দিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "আমি ত তাহাকে জেল ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিতে পারি না।"

কুন্দদন্তে বিম্বাধর দংশন করিয়া ধীরে অলকা কহিল, "আমি তাহা বলিতেছি না ; যাহাতে যথার্থ বিচারে তিনি মুক্তি পান তাহা। উপায় করুন।"

হে। হাঁ, তাহা আমি করিতে পারি।

অ। আপনি কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?

হে। তুমি যদি বল, করিতে পারি।

অ। বোধ হয়, তাঁহারই নিকটে আপনি এ বিষয়ের কোন সন্ধান পাইতে পারেন।

হেমচন্দ্র সম্মুখস্থ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বেলা প্রায় এগারটা; আমি এখনই অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার তাহাকে কিছু বলিবার আছে?"

ম্লানমুখে অলকা কহিল, "বলিবেন, আমি তাঁহাকে এখনও নির্দোষী বিবেচনা করি।"

হেমচন্দ্র "আচ্ছা" বলিয়া বহির্গত হইলেন, অলকাও ঘেঁটুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

শ্রীঃ—

[ক্রমশঃ]

ভগবদ্গীতাপাঠ।

অর্জ্জুন। কার্য্য কারণ সম্বন্ধে কিরূপ মতামত আছে?

ভগবান্। সৃষ্টি কারণ মধ্যে তিনটি প্রধান মত।

(১) আরম্ভবাদ—পিতামহকৃত পুরাতন গৃহ ভগ্ন হইলে, তাহার ইট সুরকি দিয়া যেমন নূতন গৃহ হয়, সেইরূপ কার্য্যরূপ যে পৃথিবী তাহার নাশ হইলে যে পরমাণু থাকে তদ্দ্বারা অন্য পৃথিবী আদি আরম্ভ হয়। ইহাই ন্যায়ের আরম্ভবাদ। ইহাতে কার্য্য কারণ ভেদ আছে। মায়িক সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য।

(২) পরিণামবাদ—যেমন দুগ্ধের পরিণাম বা বিকার দধি সেইরূপ; সাংখ্যমতে প্রকৃতির এই জগৎ। প্রকৃতি ও মায়া এজন্য জগৎ। মায়িক ব্যাপারে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। উপাসক মতে ব্রহ্মের পরিণাম জীব এবং জগৎ। কিন্তু ব্রহ্ম পরিণামী নহেন। এই মতেও কার্য্য কারণ অভেদ।

(৩) বিবর্ত্তবাদ—যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, কার্য্য কল্পিত মাত্র। সেইরূপ নির্বিকার ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম মাত্র। এই কার্য্যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত (কল্পিত কার্য্য মাত্র) বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে কার্য্যকারণের বোধ কৃত অভেদ।

তবেই দেখ মায়া সম্বন্ধে কার্য্য কারণ প্রয়োগ করিতে পারিলেও মায়া যখন মিথ্যা তখন কার্য্য কারণ মিথ্যা ভিন্ন আর কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি এক অকারণ রূপে বিরাজিত ছিলেন, সৃষ্টি প্রারম্ভে মায়িক লীলাবশতঃ তিনিই আপনাতে কারণ ভাব উপস্থিত করার মত করিলেন। সেই কারণ ভাব অবিচার অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। ইহা মায়া প্রভাবে সমুদিত এবং পরম প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ। অজ্ঞানের নাম প্রকৃতি। জগৎ অজ্ঞানের শরীর।

অর্জ্জুন। পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি; দেখ কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র রহিয়াছে, জানিতেছি ঘট হইবে। তুমি বলিতেছ ঘট অসৎ। তাহাই হউক কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণ রূপে এই ঘটের সত্তা ছিল। এই জন্য কেহ কেহ না বলিয়া থাকেন যে কল্পকালে এই জগৎ বীজ মধ্যে অঙ্কুর অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন। কল্পাবসানে পুনরায় বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়।

মহাকল্পবিষয়ে দৃশ্যমাত্রে বীজইবাঙ্কুরঃ।
পরেভ্য উদেত্যেতত্ এবেতি কিংবদ॥

স্থিঃ ১-১৯ যোঃ বাঃ।

এবম্বোধাঃ কিমজ্ঞা স্মাবাক্ত্যা ইতি চ প্রুটম্।
যথাবাৎ ভগবান্ ব্রূহি সর্ব্বসংশয়শান্তয়ে॥

ঐ ২০।

ভগবান্। যাহারা বলেন ব্রহ্ম ছিল। ব্রহ্মটী আছে বলিয়া ইহার অস্তিত্ব নাই বলিতে পার না। বীজ মধ্যে অঙ্কুরের মত ইহা রহিল। এইরূপে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ এই বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে অবস্থান করে। তাঁহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ। এই বাক্য শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই মোহজনক। ইহা মূঢ়দিগের জল্পনা মাত্র। এবং ভ্রান্তির প্রকার ভেদ।

ইদং বীজেঙ্কুর ইবদৃশ্যমাস্তে মহাশয়ে।
জ্ঞতে য এবমজ্ঞত্ব মেতত্তস্যহস্তি শৈশবম্।

স্থিঃ—১-২১ যোঃ বাঃ।

ব্রহ্ম বীজ স্থানীয় ও জগৎ অঙ্কুর স্থানীয়, এ দৃষ্টান্ত ভুল। বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এজন্য ধান্যাদি বীজ পত্রাঙ্কুরার্থ কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অতি সূক্ষ্ম, যাহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, যিনি অযোগী পুরুষের নিকট অসৎ বলিয়া পরিচিত হয়েন, সাধারণ লোকে যাঁহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, সেই সূক্ষ্ম পুরুষকে কিরূপে বীজ বলা যায় কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহাকে বুঝান যায় না, তিনি নিজ বোধ রূপ। তবে যে রজ্জুতে সর্প ভ্রম ইত্যাদি বলা ইহাও ঠিক নহে। কতকটা আভাস দেওয়া যায় মাত্র। "গগনং গগণাকারংসাগরং সাগরোপমঃ।"

আর একটা ব্রহ্ম নাই যে তাহার সহিত ইহার তুলনা হইবে। একটা আকাশ তাই বলিতে হয় আকাশ আকাশের মত। তাহাকে কোন বস্তুর কোন পদার্থ বলা যায় না। তবে যে ব্রহ্ম-পদার্থ বলা হয় বাক্যে তাহাকে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া পদার্থ বলা হয়। শব্দও নয়, কারণ শব্দবাক্যে প্রকাশ হয় না। সামান্য আভাস দেওয়া যায় মাত্র। যাহা কোন বস্তু নহে তাহাতে জগৎ থাকবে কিরূপে? সূর্য্য কিরণে কি অন্ধকার থাকিতে পারে? না জ্ঞানে অজ্ঞান থাকে? সাকার বটে বীজাদিতে অঙ্কুরের স্থিত যুক্তিযুক্ত কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে সাকার জগৎ স্থিতিযুক্তি বিরুদ্ধ। এজন্য বলিতেছি কার্য্যাবস্থানের কথা যাহারা বলেন তাহাদের বাক্যের যৌক্তিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। প্রলয়ে জগদবস্থিতি কল্পনা, অনুভব বিরুদ্ধ।

আরও স্থূলভাবে তোমায় বুঝাই শুন। লোকে বলে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। মৃত্তিকা দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি—কারণ হইতে ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিলাম। কিন্তু কার্য্যটী যদি অসৎ হয় তবে কারণটিও অসৎ হইবে ইহা কে বলিল? কার্য্যরূপ ঘট যদি না থাকে তবে কারণরূপ মৃত্তিকা কি থাকিবে না? দুইটী অসৎ বস্তুরই এর কারণ সৎ বস্তু এক। বুঝাইবার জন্য বলিতেছি এর ঘট অসৎ তাই বলিয়া মৃত্তিকাও কি অসৎ? তবে কিরূপে বলা যায় কারণে অসৎরূপ জগৎ সদা রহিয়াছে।

আর একটু উপরে উঠ। ঘট মৃত্তিকার বিকার, বিকারের উৎপত্তি আছে, নাশও আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও নাশের পরে বিকারী বস্তুর আত্ম থাকা কি সম্ভব আর উপস্থিতে যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রম মাত্র। আকাশে নীলিমার মত, নিদ্রার স্বপ্নের মত।

ঘট ও মৃত্তিকা সম্বন্ধে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল মৃত্তিকা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে তাহা প্রযোগ কর। কারণ ব্যতিরেকে কখন মৃত্তিকারূপ কার্য্যের উপলব্ধি সম্ভব নহে। এজন্য

কার্য্যের উপলব্ধি কারণ উপলব্ধির অধীন। কিন্তু কার্য্যে উপলব্ধি না হইলে যে কারণ উপলব্ধি হইবে না তাহা বলা যায় না। যাহা সৎ তাহা কোন কিছু থাক্ বা না থাক্ সদাবস্থায় থাকিবে। যাহা সদাবস্থায় থাকে না তাহাই অসৎ। যাহারা সত্ত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাহাই অসৎ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

মেঘ।

১

জলদ পটল হেরি
সুনীল গগণ কায়,
চঞ্চলা চপলা বালা
হেসে কোথা ছুটে যায়।

২

গরজিছে ঘন ঘন,
নাশিতে উদ্ধত ভবে,
চমকিয়া উঠে প্রাণ
শুনি সে ভীষণ রবে।

৩

বিস্তারি ময়ূখমালা
প্রসারিয়া পুচ্ছকব,
নাচিছে কলাপীকুল
শুনিয়া মেঘের স্বর।

৪

তিমির ভুবন মগ্ন,
চপলা দেখায় পথ,
জীবকুল ছুটে যায়,
গণিয়া মনে বিপদ।

৫

ছেয়েছে জলদ দল
সুনীল গগণ গায়,
অতল জলধি দেখি
হয়েছে উন্মত্ত প্রায়।

৬

উত্তাল তরঙ্গ তুলি
আনন্দ উচ্ছ্বাস সবে,
ভেটিতে জলদকুলে
চলেছে ভীষণ রবে।

৭

জলরূপে পরিণতি,
অন্তেতে জলদ যার,
যাঁহার নিয়মে বদ্ধ,
তাঁর পদে নমস্কার।

৮

হে নাথ জগতপতি,
অজ্ঞান জলদচয়,
ছেয়েছে মানসাকাশ,
অন্ধ যে নয়নদ্বয়।

৯

কিরূপে দেখিব পথ
কিরূপে চলিব আমি,
বিদ্যুৎ ছটায় পথ
দেখাও জগত স্বামী।

১০

ক্ষণে তমঃ, ক্ষণে আলো,
পড়িলে বিপদে ঘোরে,
যদি পথে পড়ে বষ্ট,
হাত ধরে তুলো মোরে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান।

টাইফয়েড্ জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই পীড়ার চিকিৎসায় অত্যন্ত ধৈর্য্যের প্রয়োজন কারণ এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে "রোগ আমাদিগের বশে যাইবে না কিন্তু আমাদিগকে রোগের বশে যাইতে হইবে"। রোগের গতিরোধ করা যাইতে পারে না এবং তাহা করা উচিতও নহে। এখানে এক কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তবে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? তিনি যদি পীড়ার গতিরোধই করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন কি? আমরা ইহার উত্তর এই দিয়া থাকি যে, চিকিৎসক ধৈর্য্য সহকারে পীড়ার সহ যাইতে যাইতে কেবল এইমাত্র দেখিবেন, যেন উহা বিপথে গমন না করিয়া সুপথে চলিতে থাকে এবং যখনই দেখিবেন যে সামান্য বিপথে যাইতেছে তখনই তদুপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার দ্বারা [illegible] ফিরাইতে চেষ্টা করেন। [illegible] মতের [illegible] ও [illegible] [illegible] আমাদিগের বিশ্বাস যে উপযুক্ত সময়ে [illegible] তাহা জ্ঞাত হইয়া উপযুক্ত ঔষধ [illegible] অধিকাংশ স্থলেই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন তবে রোগী মারা যায় কেন? আমরা বলি যে উহা [illegible] মানুষের সাধ্যাতীত। তবে আমরা ইহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে, নিতান্ত খারাপ রোগীদের ও ঔষধ প্রযুক্ত হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বেই আমরা একস্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, হোমিওপ্যাথী মতে এই পীড়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। এখানে আমরা কেবলমাত্র পীড়ার বিকাশ অনুযায়ী চিকিৎসায়, কোন্ কোন্ ঔষধ কি কি লক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইয়া আসিব। বিশেষ ভাবে যাঁহারা ইহার আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কোন চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় রোগীর সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে, একোনাইট, জেলসিমিয়াম [illegible] অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার পর কোন কোন বিশেষ লক্ষণের জন্য যেমন শিরঃপীড়া ইত্যাদি সময়ে সময়ে বেলাডোনা, ব্রায়োনিয়া, আর্সেনিকাম অথবা শরীরে সাধারণ বেদনার জন্য—রস টক্স ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে টাইফয়েড অবস্থার বিকাশ হেতু, সাধারণতঃ রস টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে [illegible]

বিকৃতাবস্থা জন্য ব্যাপ্টিসিয়া বা মার্কিউরিয়স প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং যদি উহাতে উপকার না পাওয়া যায় এবং লাল, শুষ্ক জিহ্বা, অজীর্ণতা, অতীব তৃষ্ণা, ও দুর্গন্ধী—জলবৎ মলত্যাগ হইতে থাকে, তাহা হইলে কার্বোভেজ (বিশেষতঃ মোহাবস্থা comatose বর্তমান থাকিলে) কিংবা টেরেবিন্থিনা (উদরের ফাঁপ ও অন্যান্য উদরিক লক্ষণ বর্তমানে) ব্যবহারে আসিয়া থাকে। মানসিক নিশ্চেষ্টতা সহ প্রাতিশ্যায়িক আন্ত্রের পাদাহিক অবস্থা বর্তমানে ফস্ফরিক আসিডের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পাকাশয়িক প্রতিশ্যায়ে—হাইড্রাষ্টিস নির্দেশিত হইয়া থাকে। স্নায়বীয় উত্তেজনা অধিক দৃষ্ট হইলে হায়সায়ামস্ (অতিশয় প্রলাপ বকা), ষ্ট্রামোনিয়ম্ (ডিলিরিয়মে হাসিতে থাকে, কামড়াইতে যায়) এবং আগারিকস্ (অঙ্গকম্পন ও কাঠিন্যতা সহ প্রলাপ) ব্যবহৃত হয়। নিস্তেজ (low) ডিলিরিয়ম সহ মাংসপেশীর অবসাদতা লক্ষিত হইলে, হাইড্রোক্লোরিক আসিড্ এবং অতিশয় টাইফয়েড অবস্থা সহ সাধারণ হিমাঙ্গ অবস্থা ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্যাক্ষমতার লক্ষণ দেখিতে পাইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে হামামেলিস্ (উদর মধ্য দিয়া আন্ত্রিক রক্তস্রাব) টের্পেন্টাইন (উদরে বায়ুপূর্ণতা, দুর্গন্ধী মল এবং সঙ্গে সঙ্গে এল্বুমিনুরিয়া) হাইড্রাষ্টিস (অতিশয় ক্লেদাবৃত জিহ্বা ইত্যাদি) এবং ইপিকাকুয়ানা (নাভির নিম্নে সাময়িক শূল-বেদনা) ব্যবহৃত হয়।

উপরে আমরা যে প্রকার ঔষধ ব্যবহারের কথা বলিয়া আসিলাম তাহা সাধারণতঃ উপসর্গ বিহীন পীড়ায় প্রযুজ্য মাত্র। কোন প্রকার উপসর্গ দেখা যাইলে অন্য প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পীড়ায় বক্ষ আক্রান্তি (chest complaints) একটি বিশেষ লক্ষণ এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। সামান্য প্রকার বক্ষ আক্রান্তি (যেমন ব্রঙ্কাইটিস্) দৃষ্ট হইলেই উহা বেশ করিয়া তুলা ও ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে—যেন কোন প্রকারে বাহিরের exposure না লাগে। সামান্য ব্রঙ্কাইটিস হইতে নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত ইহাতে হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় অ্যালোপ্যাথ মহাশয়েরা যে পোল্‌টিস্ ব্যবহার, ব্লিষ্টার প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের মত নিরর্থক ত বটেই, উপরন্তু ঐ গুলিকে আমরা অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকি। উহা দ্বারা রোগের উপশম হউক বা না হউক, রোগীকে বিরক্ত করা এবং কষ্ট দেওয়া হয় বলিয়াই আমরা মনে করিয়া থাকি। যে উদ্দেশ্যে অ্যালোপ্যাথেরা ঐ সমুদয় ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত তুলা ও ফ্লানেল্ ব্যাণ্ডেজ দ্বারাই—সাধিত হইতে দেখিয়াছি। এই তুলার প্যাড ও ফ্লানেলের ব্যাণ্ডেজ দুই প্রস্থ রাখা উচিত, কারণ ঘামে সিক্ত হইলে একপ্রস্থ খুলিয়া রৌদ্রে দিতে হইবে এবং সেই সময় অন্য প্রস্থ দ্বারা শরীর—আবরিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রধানতঃ ব্রোমিন, আইয়োডিয়ম, ব্রায়োনিয়া, ফস্ফরস, সাঙ্গুইনেরিয়া প্রভৃতি প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি ঔষধ দক্ষিণ ফুস্ফুস্ আক্রান্ত স্থলে ও শেষোক্ত ৩টি বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হইলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সহ যকৃতের আক্রান্ত থাকিলে এবং ফুস্ফুস্ হইতে রসস্রাব (exudation) না হইতে থাকিলে এবং উহা অতিশয় রক্তাধিক্যযুক্ত বোধ হইলে, ফিপার সাল্ফের প্রয়োজন হয়। রোগী স্কুফুলা ধাতু প্রকৃতির হইলে এবং নখে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে অধিক ঘর্ম দৃষ্ট

হইতে থাকিলে, এ অবস্থায় ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মস্তিস্কে জলসঞ্চয় আর একটি বিশিষ্ট এবং ভয়াবহ লক্ষণ, এজন্য ইহার চিকিৎসাও যথাসম্ভব নিয়ে প্রদত্ত হইল। এ অবস্থায় হেলিবোরস্; মিউরিয়াটিক আসিড্, জিঙ্কম্ ও এপিসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হেলিবোরসে মোহাচ্ছন্নভাব অধিক লক্ষিত এবং সদা বালিসে মস্তক চালনা করিতে থাকে; মিউরিয়াটিক আসিডে রোগী ক্রমাগত শয্যায় পাদদেশাভিমুখে নামিয়া আসিতে থাকে এবং জিঙ্কমে সদা একখানি পদ বা হস্ত চালনা করিতে থাকে, ঠিক যেন অটোমেটিকভাবে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এপিসে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় খুব জোরে চীৎকার করিতে থাকে এবং প্রস্রাব স্বল্প পরিমাণে হয় ও তৃষ্ণা থাকে না। কন্‌ভল্‌শন লক্ষণ দেখা যাইলে এবং তাহার সহ মস্তিস্কে রক্তাধিক্য লক্ষণ থাকিলে, প্রথমে বেলাডনা দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে উক্ত কন্‌ভল্‌শন অধিক দৃষ্ট হইতে থাকিলে কুপ্রম, সিকুটা বা জিঙ্কমের ব্যবহার প্রয়োজন। সিকুটার রোগী বাঁকিয়া ঊর্দ্ধদিকে ডোঙ্গা হইয়া উঠে, জিঙ্কমে মস্তক একপার্শ্বে বাঁকাইতে থাকে।

অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব দেখিতে পাইলে ওপিয়ম, নক্স-মস্‌চাটা ও কেলি ব্রোমেটম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; উদর অতিশয় ফাঁপিতে থাকিলে নক্স-মস্‌চাটা, কার্ব্ব-ভেজি; ক্রিমি লক্ষণে সিনা এবং অতিশয় নাক খোঁটা, এমন কি খুঁটিয়া রক্ত বাহির করা, লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এর মট্রিফাইলম প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

উদরের ফাঁপ, স্বল্প জ্বরাবস্থায় ঘোর ডিলিরিয়ম, উদরাময়, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি এই পীড়ায় বড়ই মন্দ লক্ষণ, এ কারণ যত সত্বর সম্ভব ইহা বিদূরীত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি সুনির্ব্বাচিত ঔষধে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হয়, তাহা হইলে একমাত্রা সল্‌ফর প্রয়োগ করিয়া পরে পুনরায় সেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এইমাত্র আমরা এই পীড়ায় প্রচলিত সমুদায় প্রকার ঔষধের বর্ণনা করিয়া আসিলাম এবং এখন কতকগুলি আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের এখানে অবতারণা করিতেছি। ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক যে, শুধু মাত্র ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না, রোগের শুশ্রূষা ও তাহার পথ্যাপথ্যই অধিক মাত্রায় রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। বক্ষের কোন প্রকার আক্রান্তি স্থলে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূত্রপাতাবস্থাতেই—তুলা ও ফ্লানেলের ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা আবশ্যক তাহা, পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। আর আর যাহা করা আবশ্যক হইয়া থাকে এখানে তাহাই বলিব। মস্তিস্কের গোলযোগে মাথায় জলসিঞ্চন ও বাতাস দেওয়া প্রয়োজন। মাথায় জলপটি দেওয়া অপেক্ষা নাক, মুখ, চোখ, ও কপাল বেশ করিয়া ভিজা বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছাইয়া লইয়া, ধীরে ধীরে বাতাস করিতে থাকিলে, রোগী বেশী আরাম পাইয়া থাকে আমরা দেখিয়াছি। মস্তিস্কে অতিশয় রক্তাধিক্য এবং তাহার সহ ঘোর ডিলিরিয়ম থাকিলে, মস্তকে আইস্ ব্যাগ (ice-bag) দেওয়া প্রয়োজন। উদরের ফাঁপ অতিশয় থাকিলে এবং তাহার সহ মলমূত্র রুদ্ধ থাকিলে, গরম জলের ফোমেণ্ট করা অথবা hot-water-bag প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে, কদাচ দাস্ত পরিষ্কারের জন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না—ক্যাষ্টর অইল বা পিচ্‌কারী করা ত দূরের কথা। উদরে

পর্য্যায়ক্রমে গরম ও শীতলতা প্রয়োগ করিলেও, অনেক সময়ে মলমূত্র ত্যজিত হইয়া উদরের ফাঁপ ও বায়ু পূর্ণতা কমিয়া থাকে।

অতিশয় নিস্তেজাবস্থা উপস্থিত হইলেও, কদাচ ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে ক্ষণিক একটু জীবনী শক্তির উত্তেজনা দেখা যায় বটে কিন্তু তৎপরেই এমন অবসাদতা আনয়ন করিয়া থাকে যে, তাহা হইতেই অনেকস্থলে রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে আমাদের মতে ২।১ মাত্রা আর্সেনিক বা কার্ব্ব-ভেজি প্রয়োগ করিলেই, অনেক সময়ে আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে দেখিয়াছি। গাত্রতাপ কমাইবার জন্য কাহারও কাহারওও মতে গরম জলে গা ধোয়াইয়া দিয়া, পরে শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া মুছাইয়া একখানি গরম কাপড়ে বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক-স্থলে এই উপায়ে জ্বরের বেগ কমিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পীড়ায় উহাতে তেমন কোন স্থায়ী ফললাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কেহ কেহ আবার ঠাণ্ডা জলেই গাত্র ধোয়াইয়া থাকেন ইহা আরও বিপদজনক।

ক্রমশঃ।

ডাক্তার মৈত্রে।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

রামজয় আগম বাগীশ একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, তন্ত্র শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে তিনি বিলক্ষণ সুকুশল ছিলেন। কৃষ্ণ-গঞ্জে তিনি বাস করিতেন। সুজাগঞ্জের ব্রজমোহন রায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রায় মহাশয় হলদি-বেড়ে পরগণার তহশিলদার। কৃষ্ণগঞ্জ অন্য পর গণার অন্তর্গত। তখন অত্যাচার অবিচারের দিন, বিশেষতঃ নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর স্থানে স্থানে বিশেষ অত্যাচার হইত। একজন মুসলমান কৃষ্ণগঞ্জের তহশিলদার ছিলেন। ব্রজমোহন রায় তাঁহার গুরুদেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সপরিবারে সুজাগঞ্জে আনয়ন করেন। বহুলোকের আগ্রহে বিজয়পুরে সুরমাতীরে তাঁহার বাস ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আগমবাগীশ মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের নাম রাম-কমল। যে সময়ে তিনি পিতার সহিত বিজয় পুরের নূতন বাটীতে আইসেন, তখন তিনি ষোড়শ বৎসর বয়স্ক যুবক। সেই তরুণ বয়সে তিনি শব্দ ও দর্শন শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আগমবাগীশ মহাশয় বিজয়পুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্বীয়পুত্রকে, শিক্ষার্থে বিদেশ গমনে আদেশ করেন। পিতার আদেশক্রমে রামকমল নবদ্বীপ এবং মিথিলা প্রভৃতি স্থানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করত বিজয়পুরে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্পদিনেই নানা দেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি-ষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অনেকগুলি ছাত্র নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত; কুড়ি পঁচিশটী ছাত্রের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর তখনও তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দেবার্চ্চনা এবং সংযম নিয়মে নিয়মিত ছিলেন, বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার খেয়াল তাঁহার ছিল না। পিতা আগমবাগীশও তদ্বিষয়ে

উদাসীন ছিলেন। অকৃতদার সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কোন সাংসারিক কষ্ট ছিল না। তাঁহার পিতা প্রাচীন, মাতাও প্রাচীনা। কিন্তু সে প্রাচীন প্রাচীনার কার্য্য সামর্থ্য নিতান্ত হীন ছিল না। সংসারে তাঁহার দুই পিসি ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাল বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণী ও সদাচারিণী। তাঁহাদের শারীরিক শক্তি অসাধারণ ছিল, মানসিক বলেরও উনতা ছিল না। ব্রহ্মচর্য্য এবং সদাচরণে হিন্দু বিধবারা যে পরমানন্দ উপভোগ করেন, লালসা বর্দ্ধিতে পুনঃ পুনঃ আহুতি দিয়া সকামা রমণীগণ সে সুখ অনুভব করিতে পারেন না। একথা যাহারা বুঝেন না তাহারা হিন্দুঘরের দেবীদিগকে ভোগসুখে আসক্ত করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের অনুভূতি অতি ঘৃণ্য তজ্জন্য সেই সকল মহাত্মার সহানুভূতি প্রশংসার যোগ্য নহে।

সে যাহা হউক সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিষ্কণ্টক সংসার সুখেই চলিতেছিল। কিন্তু ১০২৬ সালের মহামারীতে তাঁহাকে বড়ই ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রতিবেশীগণের হাহাকারে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, টোল বন্ধ হওয়াতে তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। মারীভয়ে বিদেশীয় ছাত্রেরা স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে, প্রত্যাগমন করে নাই, গ্রামস্থ ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়া গিয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও জীর্ণ, শীর্ণ, শোকগ্রস্ত, সুতরাং পড়িতে আসে না। ইহাতে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মাতা ও পিসিমাতাদিগের সাংসারিক কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছিল; ফুলতোলা গৃহস্থিত দেববিগ্রহ পূজা করা এবং সন্ধ্যোপাসনা ভিন্ন তাঁহারও কাজ খুব অল্প ছিল। এই কার্য্যহীনতা তাঁহাদের সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী [illegible] নাম তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি অপরের নাম [illegible] করিয়া, আদিত্যদেবের ব্রত নিরূপণ করিলেন।

একদিন পিতা পুত্রে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। দেশের কথা, দশের কথা, বাজারের কথা, [illegible] কথা ইত্যাদি নানাবিষয়ক কথোপকথন চলিতেছিল। আগমবাগীশ মহাশয় পুত্রকে তেত্রিশ কোটী দেবতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমরা যেমন শালগ্রাম শিলায় সর্ব্বশক্তি সমন্বিত পরমপুরুষ নারায়ণের আরাধনা অর্চনা করি, সেইরূপ ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে তেত্রিশকোটী দেবদেবীর প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র কল্পনা করিয়া অর্চনা করিলে পরম পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে। লোকহিত ব্রতের ন্যায় মহাব্রত ইহলোকে আর নাই। তুমি সেই ব্রত গ্রহণ করিয়া লোকহিতে রত হইলে আমার কুল উজ্জ্বল হইবে। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রবর মহাশয় সার্ব্বভৌম সার্ব্বভৌম [illegible] গ্রহণ করিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রী[illegible]

স্বায়ত্ত চিকিৎসা।

কফজ প্রপশোথ।

১

মধুবার মূল [illegible] জল দিয়া বাটিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ বসিয়া যায়।

শজিনার মূলের ছাল, দেবদারু কাষ্ঠ চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ শ্বেত সর্ষপ, এবং সাদা পুনর্নবা শাক সমভাবে লইয়া কাঁজি অর্থাৎ পুরাতন আমানি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে কফজ শোথ বসিয়া যায়।

যে দেবদারু কাষ্ঠ মসলার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এ দেশীয় দেবদারুর কাষ্ঠ গ্রহণ করিবে না। শ্বেত পুনর্নবা শাককে কোন স্থানে সাদা গাদো শাক কোন স্থানে শ্বেতপুণ্যা শাক বলে। শ্বেত সর্ষপ সিতি সরিষা নামে বিখ্যাত। কাঁজি না পাইলে অগত্যা জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

উক্ত প্রলেপটীর প্রতি সকলেই লক্ষ্য রাখিবেন। প্রলেপটী যেমন কফজ শোথ বসাইবার ভাল ঔষধ সেইরূপ অস্থিগত বাত বেদনার মহৌষধ। অস্থি অর্থাৎ অস্থি-সন্ধিস্থল বা গাঁইট সকল যদি বেদনাযুক্ত হয়, উক্ত প্রলেপে বিশেষ উপকার করে। নিয়মিত প্রলেপ দিলে, সন্নিপাতশোথ, বাতশোথ, কফশোথ এবং আর সকল রকম শোথ অচিরে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। এই প্রলেপটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ সচরাচর শোথ বসাইবার জন্য যত প্রকার প্রলেপ চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে কোনটাই ইহার ন্যায় ফলপ্রদ নহে। এই প্রলেপের মাহাত্ম্যে অনেক স্থলে অনেক লোক ভীষণ ব্রণশোথ ও বিসর্প প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—অন্য চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয় নাই।

যে যে গাছের ছাল লইয়া সেই মহান উপকারী প্রলেপ তৈয়ার করিতে হয় তাহা বলিতেছি।

৩

বট, অশথ বা অশ্বথ, প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড়, যজ্ঞডুমুর এবং অম্ল বেতস অর্থাৎ বৈঁকল এই পাঁচ প্রকার গাছের ছাল তুল্য পরিমাণে লইয়া শীতল জল দিয়া পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দিয়া বেশ করিয়া বাটিয়া লইবে। সেই বাটনার সঙ্গে, প্রত্যেক ছাল যে পরিমাণে লওয়া হইয়া থাকে ততটুকু পুরাতন ঘি মিশাইয়া শোথের উপর পুরু করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

বট, অশথ এবং যজ্ঞডুমুর সম্ভবতঃ সকলেরই চেনা গাছ। প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড় গাছও অজ্ঞাত নহে। অশথের পাতা ও পাকুড়ের পাতা প্রায় একই রকম। একটু বিশেষ আছে—অশথের পাতার অগ্রভাগে একটী লম্বা শীষ থাকে, কিন্তু পাকুড়ের পাতার আগায় তার চেয়ে ছোট শীষ থাকে। আর পাকুড়ের পাতার রং গাঢ় সবুজ, অশথের পাতার বর্ণ ফিকে সবুজ। পাকুড়ের গাছকে কোন কোন স্থানে পাকড়ও বলে।

অম্লবেতস বা বৈঁকলের গাছ সকল স্থানে পাওয়া যায় না, রংপুর প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেখানে না, সেখানে সেই ছালের পরিবর্ত্তে বেতসের মূল দিলেও কাজ চলিবে।

ঠুনকো নামক স্তনশোথের ঔষধ।

স্তন্যাদি স্রোতঃ দোষদুষ্ট সংযুক্ত হইলে প্রসূতির এবং দুগ্ধদায়িনী মাতার একটী বা উভয় স্তনে বেদনাযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং কঠিন শোথ জন্মে। এই শোথের নাম স্তন-বিদ্রধি। বাঙ্গালার অনেক স্থলে ইহাকে ঠুনকো বলে। ইংরাজী নাম ম্যামারি এব্‌সেস্।

এই শোথ উপেক্ষা করিলে শোথ পাকিয়া উঠে। বিদীর্ণ হইলে মহান অনর্থকর নালী রোগে পরিণত হয়। শোথের সঞ্চার জানিবামাত্রেই বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। কদাচ উপেক্ষা করিবে

না। নিম্নলিখিত প্রলেপ দিবসে পাঁচ সাত বার লাগাইলে ৩৪ দিনেই স্তনশোথ বসিয়া যায়।

খোসা ছাড়ান যবের গুঁড়া এক ভাগ, কাঁচা সোণামুগ কলাইয়ের গুঁড়া এক ভাগ এবং ময়দা এক ভাগ লইয়া শীতল জলে গুলিবে। তারপর একখানি মেটে পাত্রে রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুনের জালে পাক করিবে। প্রলেপ দেওয়ার মত ঘন হইলে নামাইয়া রাখিবে। অল্প অল্প গরম থাকিতে স্তনের শোথস্থানে পুরু প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপ শুকাইয়া আসিলে উঠাইয়া পুনর্ব্বার প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত প্রলেপে অন্যান্য প্রকার ব্রণশোথ ও বিদ্রধি অর্থাৎ ফোঁড়া নামে প্রসিদ্ধ শোথও বসিয়া যায়।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

স্তব-পঞ্চক। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত। মূল্য।০ আনা। মহাস্তোত্র, মহিম্ন স্তোত্র, বগলা স্তোত্র, তারা স্তোত্র নব গ্রহ স্তোত্রের অবিকল অনুবাদ। শশিভূষণ বাবু রঙ্গপুরের একজন সদাশয় জমিদার। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সাহিত্যানুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। তাঁহার এই "স্তব পঞ্চক" তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও ঈশ্বরভক্তির উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। অনুবাদে তাঁহার বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। মূল সংস্কৃতের সৌন্দর্য্য এই অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কি পদলালিত্যে, কি ভাব বিকাশে শশীবাবু বাস্তবিকই গ্রন্থখানিকে বিশেষ মনোজ্ঞ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চিন্তা। নূতন মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। দুঃখের বিষয় কার্য্যাধ্যক্ষ বা সম্পাদক কাহারও নাম দেওয়া নাই। সামাজিক প্রবন্ধাদি আলোচনা ও চিন্তাই 'চিন্তার' প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও ক্ষুদ্র আকারের তথাপি ইহাতে অনেক গভীর বিষয়ের চিন্তা আছে। 'চিন্তা' সাময়িক সাধারণের চিন্তার উপযুক্ত বটে।

আর্য্যভূমি পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।০ আনা মাত্র। ।৵০ আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার এক মাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৩। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৪। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৫। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়মোহন হালদার।
স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও
প্রকাশক।
খালিশা মালদহ।

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল বৈদ্যরত্নের আবিষ্কৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

বাতবিজয় তৈল।

"আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

আমাদের এই "বাতবিজয় তৈল" মালিশে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অর্থাৎ প্রমেহ ও উপদংশজনিত বাত, কোমরের, কনুয়ের, হাতের কব্জির, পায়ের গাঁঠের বাত, ঝিঁঝিবাত, আমবাত, পক্ষাঘাত, খঞ্জ, পঙ্গু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনা, ফুলা, কন্‌কনানি এবং আঘাতপ্রাপ্তি জন্য বেদনা, এত সত্বর আরোগ্য হয় যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত মহামাষ তৈলাদি দ্বারাও সুদীর্ঘকালে, সেইরূপ ফল পাওয়া যায় না। অথচ শাস্ত্রোক্ত তৈলাপেক্ষা, কম ব্যয়ে কম সময়ে এই তৈল মালিষে বাতব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন কারণে বেদনা হইলে, এই তৈল একটু হাতে লইয়া ৫।৭ মিনিটকাল সেই স্থানে মালিষ করিলে, মন্ত্রশক্তির ন্যায় তৎক্ষণাতই ব্যাধি-যন্ত্রণার উপশম হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ।০।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রভৃতি রোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ

অম্লশূলান্তক চূর্ণ।

আমাদের অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে, অম্লজনিত বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার, আহারান্তে বমন বা দমকা ভেদ, উদর ভার বোধ, মাথা জ্বালা, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ, বদ্ধতা, পেটে বায়ু জমা, মুখ দিয়া জল উঠা, বমি বমি বোধ, পেটের ভিতর চাকা মত হওয়া, এবং কোঁ, কোঁ ভুটভাট ও কলকল শব্দ হওয়া খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অম্লপিত্তের উপসর্গ হউক না কেন, অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। যে রোগী অম্লশূল বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট করিতেছেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, দেখিবেন আগুনে জলে পড়ার ন্যায়, তখনই ব্যাধিযন্ত্রণার উপশম বোধ হইবে। মূল্য ছোট শিশি ॥০ আনা, বড় শিশি ১৲ মাঃ।০ আনা।

প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ ধ্বজভঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর প্রভৃতি রোগের মহৌষধ

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ণ।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তদুপসর্গ মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্‌-টনানি, সপূয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলদে বা সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হওয়া স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত সূতার ন্যায় পড়া, কিম্বা খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, বাহ্যে বসিয়া বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্রনির্গত হওয়া স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্র শুক্র পতন বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে কুচিন্তা জাগিয়া থাকা, বদ হজম, ক্ষুধা লোপ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়া, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হইবে আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক মহৌ-

এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একমাস সেবনোপযোগী দুইপ্রকার ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা মাঃ। ।০ আনা।

দাদের মলম।

"২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

যত দিনের এবং যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন, এই ঔষধ ব্যবহারে এক দিবসের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা, মাঃ ।০ আনা। ২ কৌটার কম পাঠান যায় না। একমাশুলে ১২ কৌটা পর্য্যন্ত যায়। এক ডজন একসঙ্গে লইলে মাশুল লাগে না।

শ্বাস কাসান্তক।

হাঁপানী ও কাসরোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ।

এই ভয়াবহ রোগ প্রকাশ মাত্রেই, আমাদের "শ্বাস কাসান্তক" সেবন করুন, ইহাতে হাঁপানী কাস-ক্ষয় কাস, রক্ত উঠা, যক্ষাকাস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। শ্বাসের প্রবল বেগের সময়, এই ঔষধ এক বটিকা সেবন করিা মাত্রেই, হাঁপানির প্রবল টান ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার উপশম হয় এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই করা, শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকা, স্বরভঙ্গ, বুকে পিঠে, পার্শ্বদেশে এবং মেরুদণ্ডের বেদনা ইত্যাদি মন্ত্রশক্তির ন্যায় তিরোহিত হয়।

মূল্য ১ কৌটা ১৲, মাঃ ।০ আনা।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ ভাণ্ডার।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্ পোঃ বিডন স্কোয়ার,

কলিকাতা।

দেলবাহার তৈল।

এই মনোহর সুগন্ধি স্নিগ্ধ তৈল ব্যবহারে মেচেতা ব্রণ প্রভৃতি বদন মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন সকল তিরোহিত হয়, মুখখানি শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঢল ঢল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাতে চর্ম্ম-সুকোমল, বর্ণ সুবর্ণাভ হয়। লাবণ্য কুসুম বিকসিত হইয়া উঠে। এই সুবাসিত তৈলে গাত্রে ফাটা, ছুলি, ঘামাচি, শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি দূর হয়।

ডজন	৯৲	প্যাকিং ইত্যাদি	॥০
শিশি	৸০	ঐ	৵০

নেপালজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কস্তুরী (মৃগনাভী) এইখানে পাওয়া যায়।

আর, পি সাধুর উৎকৃষ্ট সুলভ

গোলাপজল।

পাইট্ বোতল ডজন	২৷০
বড় বোতল ডজন	৫৲
পাইট বোতল	।০
বড় বোতল	॥০

এইচ্, পি, মুখার্জ্জি

অথবা

আর, পি, সাধুর নিকট

১৬৩ নং আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] [ভাদ্র ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীরাসবিহারী মজুমদার এম, এ,
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম,এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ,
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী,
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ, (সোমপ্রকাশ সম্পাদক)
শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি ; পি দত্ত F. C.
S. PH, B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখো
পাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহি-
ত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায়
লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্যসর্ব্বত্র ১৸০ টাকা) (প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা ঘোষপ্রেসে সর্বানাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল বৈদ্যরত্নের আবিষ্কৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

বাতবিজয় তৈল।

"আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

আমাদের এই "বাতবিজয় তৈল" মালিসে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অর্থাৎ প্রমেহ ও উপদংশজনিত বাত, কোমরের, কনুয়ের, হাতের কাঁধের, পায়ের গাঁঠো বাত, ঝিঁঝিঁবাত, আমবাত, পক্ষাঘাত, খঞ্জ, পঙ্গু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনা, ফুলা, কন্‌কনানি এবং আঘাতপ্রাপ্তি জন্য বেদনা, এত সত্বর আরোগ্য হয় যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত মহামাষ তৈলাদি দ্বারাও সুদীর্ঘকালে, সেইরূপ ফল পাওয়া যায় না! অথচ শাস্ত্রোক্ত তৈলাপেক্ষা, কম ব্যয়ে কম সময়ে এই তৈল মালিসে বাতব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন কারণে বেদনা হইলে, এই তৈল একটু হাতে লইয়া ৫।৭ মিনিটকাল সেই স্থানে মালিস করিলে, মন্ত্রশক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যাধি-যন্ত্রণার উপশম হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ ।০।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রভৃতি রোগের
সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ

অম্লশূলান্তক চূর্ণ।

আমাদের অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে, অম্লজনিত বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার, আহারান্তে বমন বা দমকা ভেদ, উদর ভার বোধ, মাথা ঘোরা, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ, বদ্ধতা, পেটে বায়ু জমা, মুখ দিয়া জল উঠা, বমি বমি বোধ, পেটের ভিতর চাকা মত হওয়া, এবং কোঁ, কোঁ ভুটভাট ও কলকল শব্দ হওয়া খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অম্লপিত্তের উপসর্গ হউক না কেন, অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। যে রোগী অম্লশূল বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, দেখিবেন [illegible] পড়িতে পড়িতে, তখনই ব্যাধিযন্ত্রণার উপশম বোধ হইবে। মূল্য ছোট শিশি ॥০ আনা, বড় শিশি ১৲ মাঃ ।০ আনা।

প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া বা
ঔপসর্গিক মেহ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকের
প্রদর প্রভৃতি রোগের মহৌষধ

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ন।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তদুপসর্গ মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্‌টনানি, সপুঁয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলুদে বা সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগে। ইচ্ছা হওয়া স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত সূতার ন্যায় পড়া, কিম্বা খড়িগোলা মত প্রস্রাব হওয়া, মলে নামিয়া বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্রনির্গত হওয়া স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্র শুক্র পতন, বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে কুচিন্তা লাগিয়া থাকা, বল হরণ, ক্ষুধা বোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইয়া, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও শক্তিশালী হইবে আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও বীর্য্যস্তম্ভক মহৌ



"গোলাপ-গন্ধ" সুবাসিনী তৈল।

ইহার মনোহর মিষ্টগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক ; ইহা তিন তৈলে প্রস্তুত নহে। মস্তক শীতলকারী।

মূল্য ৩ আউন্স শিশি	।৶০	প্যাকিং ৵০	ডাঃ মাঃ	৷০
৮ " "	১৷৵০	" ৵০	"	৷৶০
২৪ " "	৩৲	" ৷০	"	৷৷০

স্বদেশী এসেন্স ও পারফিউমারি।

এসেন্স রোজ — বিলাতী এসেন্স রোজ হইতেও উৎকৃষ্ট ১৷০

ভিক্টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ২৲

কেশ সুন্দরী—নানা জাতীয় ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১৷০

কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের মনোহর গন্ধ ৷৷০

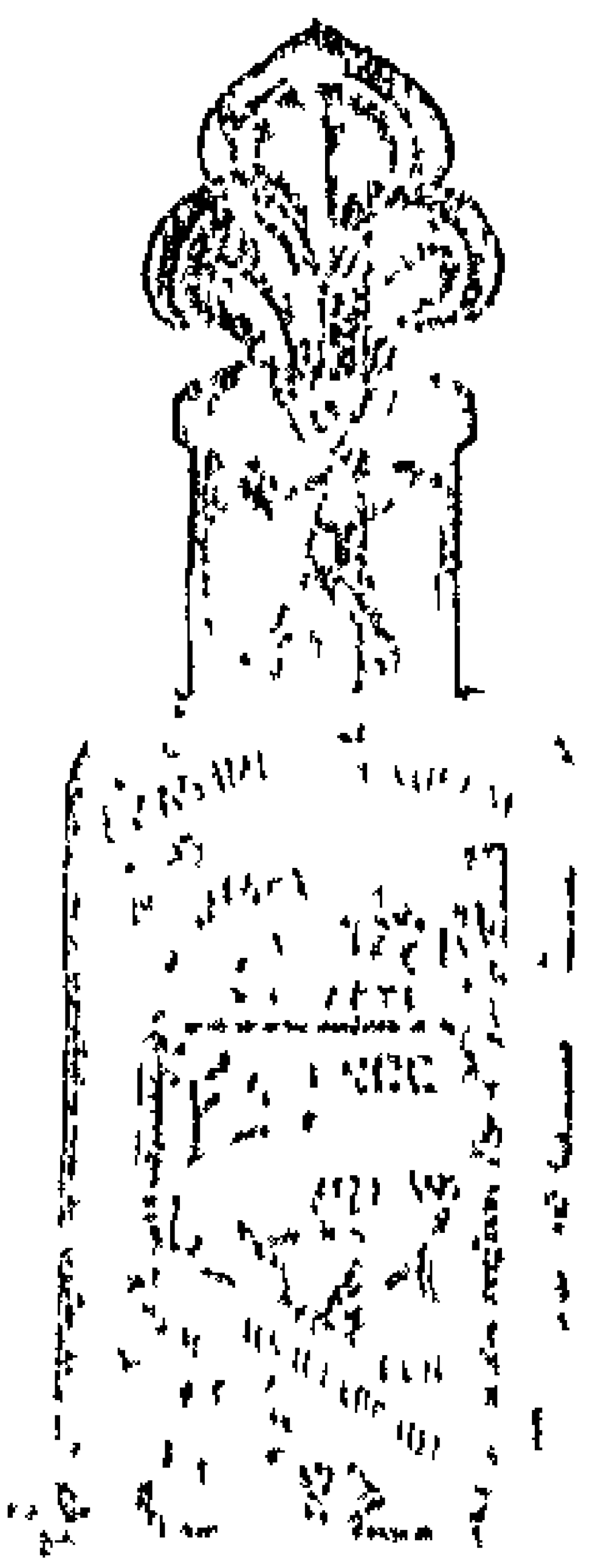
হোয়াইট রোজ—সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ ৸০

ডামাস্ক রোজ—আসল দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸০

এসেন্স রজনীগন্ধা—সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸০

বকুল—স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ বড় শিশি ॥৵০ ছোট শিশি ।৵০।

খস্—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষণ স্থায়ী ৸০



কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলের গন্ধ ৷৷০

গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ ফুলের স্থায়ী গন্ধ ৷৷০

চেরি—চোরগমের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ ৸০

জেসমিন—প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের স্থায়ী গন্ধ ॥০

কুমুদিনী—সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের স্থায়ী গন্ধ ৷৷০

টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ৷৷০

শেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵০

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ ৷৷০

চম্পক—প্রস্ফুটিত নবক চম্পকের স্থায়ী গন্ধ ৸০

চামেলী—সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা স্থায়ী গন্ধ ৸০

ভুল না আমায়— ২৲

বেলা—বেলফুলের গন্ধ ৸০

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—মনোহর ও স্থায়ী ॥৵০

অডিকলোন— ॥০

কারখানা—৩৮, ৩৮।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, দর্জিপাড়া, কলিকাতা।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল ৩রা পৌষ বুধবার কৃষ্ণা নবমী রাত্রি ৮ দণ্ড।

স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল ৪ঠা আষাঢ় বুধবার শুক্লা নবমী রাত্রি ১০টা ৭০ মিনিট।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগু‍র্ণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [ভাদ্র ১৩১৪ সাল।

ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে ১২৪৭ সালের ৩রা পৌষ কৃষ্ণানবমী তিথিতে উমেশচন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরমোহন দত্ত; মাতার নাম সর্ব্বমঙ্গলা দাসী।

গ্রাম্য পাঠশালায়—উমেশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ। পাঠশালার পাঠসমাপন করিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উমেশ-চন্দ্রের অধিকদিন বিলম্ব হইল না। দশম বর্ষবয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাল্য জীবনেই সংসারের ঘাত প্রতিঘাত আসিয়া পড়িল; সংসারের ঝঞ্জাবায়ু জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। যে বীণাপাণির আরাধনা জীবনের নিত্যব্রত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন সেই ব্রত উদযাপনের জন্য শ্রমশীলতার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অবশেষে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর উচ্চশিক্ষালাভার্থ তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময়ে তাঁহাকে স্বহস্তে প্রাতে ও সায়াহ্নে পাককার্য্য, সম্পাদন করিতে হইত; এবং সংসারের ব্যয়ভার আনুকূল্যার্থে অর্থাগমের উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

যে সকল মহাপুরুষ ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যশঃপ্রভায় পৌর্ণমাসী রজনীর সুধা-করের কিরণজালের ন্যায় দিক দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন, যে সকল কর্ম্মবীর স্ব স্ব কর্ম্মপাদপের সুধাময় ফলধারা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া-

গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে বাল্যজীবনের প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। ইহাই ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি এবং বিবিধ বিপদসঙ্কুল অবস্থার শিক্ষাই ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের বীজ। জ্ঞান শক্তির উন্মেষ দ্বারা এই বীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পরিশেষে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ রূপে পরিণত হয়। জানিনা এই সকল প্রতিকূল অবস্থার শিক্ষার কি মহীয়সী শক্তি!—ইহা যেমন একদিকে মানবকে উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পক্ষে সহায়তা করে তেমনি, অন্যদিকে দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য, সভ্যতা প্রভৃতি বিবিধসদ্গুণে মানবের চিত্তক্ষেত্রকে বিভূষিত করে। এই পরীক্ষা এবং শিক্ষার মধ্যদিয়া যে মহাপুরুষের জীবন গঠিত হয় তাহা জগতের আদর্শ। কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্রের জীবনেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। তিনি বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় অবলম্বিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বাবিংশ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বাল্যসাধনার সিদ্ধি হইল; তিনি বাল্যজীবনে যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উদযাপন হইল।

তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই খানে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষ। সম্মুখে বিশালকর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত। কর্ম্মবীর কর্ম্মকরিবার, অবসর প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর উমেশচন্দ্র যথাক্রমে নিবধু, হরিনাভী কোন্নগর প্রভৃতি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। পরিশেষে সিটিকলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। জীবনের কয়েক বৎসর সুযোগমাত্র তিনি এই কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। যেখানে সৎপ্রসঙ্গ, সদনুষ্ঠান, সৎ[illegible] সেখানে তিনি বিদ্যমান থাকিতেন। [illegible] পরপীড়া বর্জ্জন, সকলের প্রতি সরল প্রীতি ও শিষ্টাচারিতা, যথাশাস্ত্র [illegible] উমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই [illegible]। তিনি কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে যাবজ্জীবন কঠিন ভাবে পালন করিয়াছেন। কাল কোথায় [illegible] তাহার নিকট অপরিচিত ছিল। তাঁহার ধর্ম্মভাব বড়ই উদার ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইয়াও তিনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও [illegible] পরামর্শ দেন নাই। শোক মানবের ধৈর্য্য ও জ্ঞানকে নষ্ট করে, শোকের সমান শত্রু আর নাই। এমন কি দেব চরিত্রেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না; কিন্তু যে দিন পতিপ্রাণা সাবিত্রী সতীলক্ষ্মী প্রিয়তমা পত্নী ইহ সংসার হইতে অনন্ত [illegible] বিদায় গ্রহণ করেন; প্রাণাধিকা দুহিতা [illegible] এ সংসার পরিত্যাগ করেন সেইদিন [illegible] যাহারা তাঁহার [illegible] এবং তাৎকালিক কর্ত্তব্য পালনে [illegible] দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি অতি শৈশব কাল হইতেই কঠোরতায় ও সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি নিত্য প্রকৃতি লোকদিগকে লইয়া একজন লোক [illegible] কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে এতদূর প্রবল ছিল, যে তিনি [illegible] বলিয়া স্থির করিতেন [illegible] এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিতেন। জানিনা এই নৈতিক [illegible] না করিয়া পারেন কি

মহীয়সী শক্তি। যে কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রণোদিত হইয়া মহাজ্ঞানী সক্রেটিস্ তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"ক্রিটো! আমি সর্ব্বজনাদিগত অপার বর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থ কোথায় গমন করিব?" যে নৈতিক বাধ্যতা প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মবীর ঈশা অসহ্য ক্রুশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; মহাত্মা সেণ্টপল রোমনগরস্থ কারাগৃহে সিংহমুখে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন; বীর হৃদয় মার্টিন লুথার "পোপের" বিরুদ্ধে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, স্বদেশ প্রেমী ম্যাটসিনি মাতৃভূমি ইটালিকে অষ্ট্রীয়ান দিগের দাসত্ব নিগড় হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য অম্লান বদনে নির্ব্বাসন যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; ধর্ম্মবীর পার্কার মার্কিন দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে এবং কাফ্রিদাস দিগকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে দৃঢ় ব্রত হইয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, চিরস্মরণীয় ল্যাটিমার আপনার বিচারকদিগের সম্মুখে নিজ মতের দৃঢ়তা বশতঃ ধীর [illegible] সহকারে অঙ্গীকার করিয়া আপনার দক্ষিণ [illegible] পূর্ব্বে [illegible] পূর্ব্বক বলিলেন "ইহা লেখনী চালাইয়াছে"; কেবল বিদেশীয় মহাপুরুষদিগের কথা কেন বলিতেছি, যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত নানক পঞ্জাবে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতে গিয়া কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন অপেক্ষা করেন নাই, শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রিগণের ইষ্টক বৃষ্টির মধ্য দিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন; রামমোহন রায় প্রাণহানির সম্ভাবনা সত্ত্বেও অকুণ্ঠিত চিত্তে উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রণোদিত কর্ম্মবীর উমেশচন্দ্র কর্ত্তব্য সম্পাদনে স্বকীয় জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? ধর্ম্মবীর উমেশ চন্দ্রের বিশ্বজনীন প্রেমের বিষয় ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যথার্থ মহাপুরুষগণ আপনাদিগকে তৃণ হইতেও লঘু মনে করেন, আত্মাভিমান তাঁহাদের কিছুই নাই। তাঁহারা মনে করেন নিখিল তাঁহাদের এবং তাঁহারা নিখিলের সুতরাং সমস্ত প্রাণী জগৎ তাঁহাদের প্রেমের বিষয়ীভূত। ইহ সংসারে তাঁহাদের দ্বেষ্য কেহ নাই সকলই প্রিয়। ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন দেশের লোকে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। অত্যাচারে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, [illegible] ব্যথিত হয়, তিনি সে সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন এবং অত্যাচারীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট না [illegible] বলিয়া জ্ঞান হয়।

বঙ্গভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাহাদের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সরল এবং প্রায় সকল গুলিই ভক্তি রসাত্মক। স্ত্রীলোকদিগের সুখপাঠ্য পত্রিকা বামাবোধিনীর সম্পাদক তিনিই। তাঁহার পরিচালিত বামাবোধিনীর প্রভাবে অনেক স্ত্রীলোক মহোপকার লাভ করিয়াছেন। বামাগণের রচনাতে গদ্য প্রবন্ধ ও পদ্য রচনায় তিনি তাঁহাদের গুরু ছিলেন। কোন নারীর সুশীলতার পরিচয় পাইলে বা রচনা শক্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাইলে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন, তাঁহার বামাবোধিনী হিন্দু, ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের জন্য উন্মুক্ত।

সিটিকলেজ ও মুকবধির বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইতে বর্ত্তমান সমুন্নতি প্রধানতঃ উমেশ চন্দ্রেরই চেষ্টার ফল। হরিনাভী প্রভৃতি স্থানের স্কুল, নানা স্থানের ব্রাহ্মমন্দির, স্বর্গীয় মহাত্মাদের স্মৃতি সভা, পাঠাগার, পুস্তকালয়, দাতব্য ভাণ্ডার, দাতব্য চিকিৎসালয়, [illegible] প্রতিষ্ঠান, [illegible]

উমেশচন্দ্রের ভূয়িষ্ঠ সংযোগ ও সহানুভূতি ছিল। রাত্রিকালে কয়েকঘণ্টা মাত্র তিনি নিদ্রা যাইতেন। কর্ম্মেই তাঁহার স্বচ্ছন্দ ছিল এবং কর্ম্মেই তিনি বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেন। উমেশচন্দ্র প্রকৃত পক্ষে একজন পরম ঈশ্বর পরায়ণ সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ভগবদ্ প্রেম ও ভগবদ্ প্রীতির বিষয় ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। মুমূর্ষু সময়ে যখন এককালে সংজ্ঞালোপ, পুত্র কন্যা দত্ত জলবিন্দু ওষ্ঠপ্রান্তে গড়াইতেছে, নাভিদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত, তখন তাঁহার বদনে 'মা' 'মা' 'মা' এই অমৃতাক্ষর নিস্পন্দিত হইতেছে। মহাযোগী যোগ নিদ্রায় অভিভূত, মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি! অপূর্ব্ব মাধুরী! জীবাত্মা দেহ পিঞ্জর হইতে ধীরে ধীরে পরমাত্মায় বিলীন হইতেছে, এ মহাসঙ্গম! এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতে হয়। যেন স্বতঃই মনে হয় মা আনন্দময়ি! একি তোমার বিচিত্র লীলা,—শুনিয়াছি সাধুদিগের জীবনে তুমি আনন্দময়ীরূপে সপ্রকাশ থাকো, মরণেও আনন্দময়ীরূপে সপ্রকাশ। একি তোমার আনন্দের লীলা খেলা! মা! তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১০॥ টার সময় মহাযোগীর মহাসমাধি হইল। কর্ম্মবীরের কর্ম্মের অবসান হইল, ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদযাপন হইল, কিন্তু যতদিন সিটিকলেজ বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন অনাথাশ্রম, মূকবধির বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত মদাশয়তার ও পরোপকারিতার মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সত্যের মহিমা জগতে বিঘোষিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের প্রতি সম্মান জগতে সংরক্ষিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে সতত বিরাজিত থাকিবেন। তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়, তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন মগধ রাজ্যের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহের আধুনিক নাম রাজগির। এই নগর রাজা জরাসন্ধের পুরাতন রাজধানী ছিল; এবং নন্দ বংশ হইতে বিম্বিসার নরপতি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ভূপালগণ এই নগর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। কুশাগ্র নামে এই রাজগৃহ নগরকে গঙ্গা ও শোণ সঙ্গম স্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। যে শিল্পী এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মহাগোবিন্দ। এই পুরাতন মগধের রাজধানীর অন্য নাম গিরিব্রজ এবং কুশাগ্রপুর। কথিত কুশ তৃণ প্রাচীনকালে ঐ স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং এক্ষণও জন্মে, সেইজন্য ঐ তৃণের নামানুসারে ঐ নগরের নাম কুশাগ্রপুর করা হইয়াছিল। রাজগৃহ নগর পাঁচটী পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত সেইজন্য জরাসন্ধের রাজধানীর পুরাতন নাম গিরিব্রজ রাখা হইয়াছিল। যখন বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজা হন, তখন তিনি গিরিব্রজ নগরে আর রাজধানী রাখিলেন না, বিপুল পর্ব্বতমালার উত্তরে সরস্বতী নদীর পূর্ব্বে রাজগৃহ নামে এক নূতন নগর স্থাপন করিয়া রাজধানী করিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬০ অব্দে বিম্বিসার কর্ত্তৃক এই নগর প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নূতন রাজগৃহ একটী অসমান পঞ্চভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার এক সীমা অতি দীর্ঘ; অন্য চতুঃসীমা দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান, সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ ক্রোশ স্থান পরিবেষ্টন করিয়া এই নগর অবস্থিত।

বুদ্ধের জন্মের অব্যবহিত পরে এই নূতন রাজধানী অত্যন্ত ধন সমৃদ্ধি শালী হইয়াছিল। যখন অশোক রাজা হন তিনি এই নগর ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া পাটলি পুত্রে রাজধানী স্থাপন করিলেন

খৃষ্টপর ৬৩৭ অব্দে ব্রাহ্মণেরা সেখানকার একমাত্র অধিবাসী ছিলেন এমন কি এক্ষণ পর্য্যন্তও সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। কথিত আছে পুরাতন রাজগৃহ নগরে মহারাজা অশোক একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি দক্ষিণা দিবার জন্য ১৫০০ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি রাজগৃহ নগরের শাসনভার কয়েকজন প্রধান ব্রাহ্মণগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত ও সেখানে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতা প্রায় পূর্ব্ববৎই পরিলক্ষিত হয়। জরাসন্ধের রাজত্ব সময়ে গিরিব্রজ বা কুশাগরপুর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা অতি মনোরম ছিল এবং দুরাক্রম্য দুর্গসমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত পরিলক্ষিত হইত।

মহাভারতে উল্লেখ আছে অর্জ্জুনের সহিত জরাসন্ধবধার্থে অভিযানকালে বসুদেব এই নগরের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ দেখ পার্থ! বিবিধ পশুসমাকীর্ণ, সুগভীর জলাশয় সংযুক্ত, সুরম্য হর্ম্যে অলঙ্কৃত, উপদ্রবশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈহারা, বরাহ, বৃষভ, ঋষি গিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্ব্বত রহিয়াছে। এই সুশীতল দ্রুমসমূহশোভিত, উন্নত শিখর পর্ব্বত সকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। পুষ্পিত শাখা বিশিষ্ট সুগন্ধযুক্ত, কামীজনপ্রিয়, মনোহর লোধ্রবনরাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে।”

পরে বসুদেব অর্জ্জুন সর্ব্বভব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিয়া রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ শোভা প্রভৃতি সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে গিরিব্রজ নগর অট্টালিকা ও ধনসমৃদ্ধিশালী লোকে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থানে কীর্ত্তিকলাপ পূর্ণ বহুবিধ কার্য্য মহোৎসবে সম্পন্ন হইয়াছে, অদ্য সেই স্থান জনহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কোনও ব্যক্তি এক্ষণে সেই স্থান পরিদর্শন করিলে তাহার অন্তঃকরণ দুঃখে দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে না।

খৃষ্ট পর ৪০০ অব্দে যখন চীনপর্য্যটক ফাহিয়ান এই স্থান পরিদর্শন করেন তখন সমস্ত অট্টালিকা ও দুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তিনি প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন,” ৫টী পর্ব্বতে ৫টী প্রাচীরের ন্যায় নগর পরিবেষ্টিত করিয়া আছে, এই নগর রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজধানী। পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে এই নগর দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে দেড় ও দুই। ক্রোশ এখানে অশ্বজিতের সহিত শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। এখানে নির্গনাথ বুদ্ধের প্রাণসংহার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইখানেই অজাতশত্রু একটী কাল হস্তীকে মদ্যপান করাইয়া বুদ্ধকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই নগরের উত্তরদিকে একটী অপ্রশস্ত উপত্যকায় অম্রপালি নামক উদ্যানে চিকিৎসক জীবক একটী বিহার নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে তাঁহার ১২৫০ জন শিষ্য সমেত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নগর মধ্যে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। এই স্থান এখন মানবহীন মরুভূমিবৎ রহিয়াছে এই স্থান কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই তীর্থস্থান এই পুরাতন রাজগৃহে ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের [illegible] প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী-গণের প্রতিপত্তির সময় নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ]

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

শিশু।

আনন্দ কমল ফুল বিমল বদন,
কোমল ললিত কায় মাধুরী সদন।
নিয়ত হাসির ছটা না ধরে অধরে,
দামিনী ঝলকে যথা শশীর গোচরে।
পীযূষ পূরিত চারু বচন নিচয়,
শুনিতে কামনা করে লোক সমুদয়।
চঞ্চল লোচনযুগ ফুল্ল ভ্রম করে,
অবিরত হাসি কান্না বিরাজে অধরে।
সুচারু চরণযুগ, চপল চপল,
খেলিতে নিয়ত রত করে কোলাহল।
ভাবনা বিহীন মন, কামনা সদা,
জানিতে বিবিধ তত্ত্ব করে কল কল,
ভোজনের তরে করে নিয়ত রোদন,
পুলকিত পরিশেষে পাইলে ওদন।
ঘোর ফের কিছু নাহি নিবসে অন্তরে,
সতত মানসে ভয় বিচরণ করে।
নকল করিতে পটু চপল হৃদয়,
যা দেখে বা শুনে তাহা শিখে সমুদয়।
লেখা পড়া শিখ শিশো এইতো সময়,
হেলায় হারালে কাল সমুচিত নয়।
সযতনে বিদ্যাধনে পূর হৃদাগারে,
তমস আবৃত চিত্ত দীপ্ত করিবারে।
সুকোমল কায় মন, এমন সময়,
নীতি রসে সিক্ত কর নবীন হৃদয়।
নীতিপরায়ণ হও নয়ন-বাছা,
সংসারে সমস্ত সুখে জীবন যাপনে।
কচি কচি ডাল বৃক্ষ নোয়াইলে যত,
উচ্চ শির কভু নহে সদা অবনত।
তেমতি বালক বালা যদি কভু শিক্ষাগুণে,
হবে মানে জ্ঞানে গুণে সংসার কাননে
নোয়াইয়া এ কচি ডাল করিয়া যতন,
শিখাবে সদাই সদাচার আচরণ।

প্রাচীন।

বলিত লোলিত কায় বিকল শরীর,
চলিতে চরণযুগ নিয়ত অধীর।
[illegible]
লোচন বিকল [illegible]।
[illegible] শুনিতে শক্তি [illegible] কথা,
নাসা আশা নাহি করে গোলাপ [illegible]।
চিবাইতে অশন চর্ব্ব দশন বিকল,
[illegible] কঠিন [illegible] পর পর।
[illegible] রসনা,
বালকের মত করে বিনয় বাসনা।
কাঁচা চিক্কণ চারু চিকুর নিচয়,
ধবল বরণে তার শোভে অতিশয়।
বিচলিত চিত্ত সদা ভাবিয়া আকুল,
থেকে থেকে কত কাঁদে কত মনে ভুল।
বিগত যৌবন সব মানসে ভাবনা,
বাড়ায় যাতনা যত ভাবনা আপনা।
হাহাকার শীর্ণ কায় সদাই মানসে,
পরিবার পরিজন নহে নাকো বশে।
আহা বাল যুবাগণ! ভাবি দেখ সব,
আমাদিগে কোন মনে পুরে মনোরথ।
[illegible],

আমাদের দেশে রত মন কর যতনে।
বিগত যৌবন যবে হবে শেষ কাল,
তখন বিশাল মন হবে না ভয়াল।

কর-বিজ্ঞান।

চতুর্থ অধ্যায়।

অঙ্গুলী "পর্ব্ব।"

অঙ্গুলীর উভয় গ্রন্থির ব্যবধানকে "পর্ব্ব" কহে। নখের মুক্ত পর্ব্ব হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব গণনা করা হয়। এই পর্ব্বত্রয় তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্বসমূহ, কল্পনা রাজ্য, দ্বিতীয় পর্ব্ব সমূহ মানসিক-রাজ্য, এবং তৃতীয় পর্ব্ব সকল, বাস্তব-রাজ্য সূচিত করে। সুতরাং, হস্তের মধ্যে অঙ্গুলী সকলের যে পর্ব্ব সমূহ দীর্ঘ হয়, মনও সেই পর্ব্বসূচক রাজ্যে বিচরণ করে।

প্রথম পর্ব্ব হস্তের লক্ষণ প্রকাশ করে, সুতরাং তদ্দ্বারা হস্ত যে শ্রেণীভুক্ত তাহা জানা যায়।

অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা প্রথম পর্ব্ব সকলের দীর্ঘতা, রমণী লাস্যের পরিচায়ক। সেইরূপ দ্বিতীয় পর্ব্ব-সমূহ দীর্ঘ হইলে বুদ্ধিজীবি লোকের স্বভাব জ্ঞাপন করে; এবং তৃতীয় পর্ব্বগুলির সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতা ও স্থূলতা পার্থিব বিলাস-লালসা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ। যদি তৃতীয় পর্ব্বগুলি করতলের ঠিক উপরিভাগেই পরিপুষ্ট হয়, আত্মসুখ, পানভোজনে স্পৃহা জানা যায়। কিন্তু এইরূপ তৃতীয় পর্ব্ব কোমল হইলে অতিরিক্ত সুখ পানেচ্ছাও সূচিত করে।

যাহাদের তৃতীয় পর্ব্ব ক্ষীণমধ্য, তাহারা ঔদরিক নহে, কিন্তু তাহাদিগকে সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না। যাহাদের তৃতীয় পর্ব্ব সমূহ 'চ্যাপটা' ও সাধারণ ভাবের, তাহাদের ভোজনেচ্ছা প্রবল তা নহে।

পর্ব্ব সমূহের দীর্ঘতা।

তর্জ্জনী।

প্রথম পর্ব্ব—কুসংস্কার।
দ্বিতীয় পর্ব্ব—উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা গৌরব লালসা।
তৃতীয় পর্ব্ব—শাসন কর্ত্তৃত্ব।

মধ্যমা।

প্রথম „— অবসাদ বা বিষণ্ণতা।
দ্বিতীয় „—কৃষিকার্য্য প্রিয়তা।
তৃতীয় „— মিতব্যয়িতা।

অনামিকা।

প্রথম „—সুকুমার বিদ্যাপ্রিয়তা।
দ্বিতীয় „—সাহিত্য-দর্শন প্রিয়তা।
তৃতীয় „—(তৎসহ শিরো রেখা দীর্ঘ ও সরল হইলে) অর্থপ্রিয়তা।

কনিষ্ঠা।

প্রথম „—শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য।
(অতি দীর্ঘ—মিথ্যাবাদিতা)
দ্বিতীয় পর্ব্ব— কার্য্যপটুতা।
তৃতীয় „—ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপ্রিয়তা (ঝোঁক)।

অপর অঙ্গুলীর দিকে নত ভাবযুক্ত অঙ্গুলীর বিচার করা আবশ্যক। যদি সমস্ত অঙ্গুলী মধ্যমা-অঙ্গুলীর দিকে নত হয় তবে সমস্ত জীবন বিষাদময় জানিবে।

তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠের দিকে নত—স্বাতন্ত্র্যে স্বাধীনতা প্রিয়তা। তর্জ্জনী মধ্যমার দিকে নত—নানা কারণে স্বীয় জীবনের নিষ্ফলতার জন্য বিষাদপূর্ণ আত্মাভিমানিতা।

মধ্যমা তর্জ্জনীর দিকে নত—কুসংস্কার জন্য বিষণ্ণতা।
মধ্যমা অনামিকার দিকে নত—সামান্য বিষণ্ণতা।
অনামিকা মধ্যমার দিকে নত বিষাদময় বৃথা গর্ব্ব।
অনামিকা কনিষ্ঠার দিকে নত—কোনও উপজীবিকার্থ

সামান্য বা নগণ্য শিল্প বা শক্তি আলোচনা।

কনিষ্ঠা অনামিকার দিকে নত—বিজ্ঞান ও শিল্প প্রিয়তা।

অঙ্গুলী সকলের প্রসারতা;

এক অঙ্গুলী হইতে অন্য অঙ্গুলীর ব্যবধানই সেই অঙ্গুলীটির প্রসারতা অধিক তাহারই জানলা স্বীকার করিতে হইবে।

বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর মধ্যে বদান্যতা।

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে—স্বাধীন চিন্তা।

মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে সদানন্দচিত্ত।

অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত-কারিতা বা স্বাধীন কার্য্যকারিতা।

সহজেই অঙ্গুলী সকল প্রসারিত হইলে সমাজ বন্ধনে থাকিতে অনিচ্ছা, এবং সমস্ত অঙ্গুলী অন-মনীয় ও অনমায়বিষ্ট হইলে, সমাজ বন্ধনে থাকিবার অভিলাষ বুঝা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

অঙ্গুষ্ঠ।

কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাই মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ বুঝা যায়। ইহাই মানব-চরিত্র-চিত্রণের সর্ব্ব প্রধান তুলিকা।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর তিনটী পর্ব্ব নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ করে।

প্রথম পর্ব্ব—ইচ্ছাশক্তি।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—ন্যায় বিচার শক্তি।

তৃতীয় পর্ব্ব—প্রণয়।

প্রথম পর্ব্ব।

যদি দীর্ঘ, দৃঢ়বদ্ধ ও স্থূলাগ্র হয় তবে স্থির হয় এবং অন্যের মতাপেক্ষী হয় না। ক্ষীণ মধ্য, তোষামোদ প্রিয়তার লক্ষণ। যদি শুণ্ডাগ্র ও কোমল হয়, তবে যতই দাম্ভিক হউক না কেন, ইচ্ছাশক্তির অক্ষমতা এবং এরূপ ব্যক্তি অপরের দ্বারা চালিত হয়। পূর্ব্বে স্থূলতা অবিবেচক হঠকারিতার (অর্থাৎ এক গুঁয়েমির) লক্ষণ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

দীর্ঘ, দৃঢ় ও সমভাবে পুষ্ট হইলে যৌক্তিক বিচার চিন্তাশীলতা ও প্রত্যেক বিষয়ের উভয়পক্ষ দর্শন করিয়া বিচার শক্তি প্রদান করে, এবং আবেগ বা উত্তেজনা দমন করে। আবার ইহার সহিত প্রথম পর্ব্বের স্থূলতা সংকীর্ণতার বা হৈর্য্যাভাবের লক্ষণ। ক্ষীণ মধ্য দ্বিতীয় পর্ব্ব নিপুণতা ও একদেশদর্শীতা ব্যাপক।

তৃতীয় পর্ব্ব।

শুক্র স্থানের নিম্ন ভাগে অবস্থিত। উক্ত পার্শ্বের দৈর্ঘ্যানুসারে বিশেষভাব ক্রমশঃ সূচিত হয়। ইহার সহিত শুক্রস্থান পরিপুষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা সূচিত করে। এই পর্ব্ব সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে, প্রবৃত্তি সকল কল্পনাপূর্ণ হয়। সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইলে, প্রবৃত্তি সকল পার্থিবভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

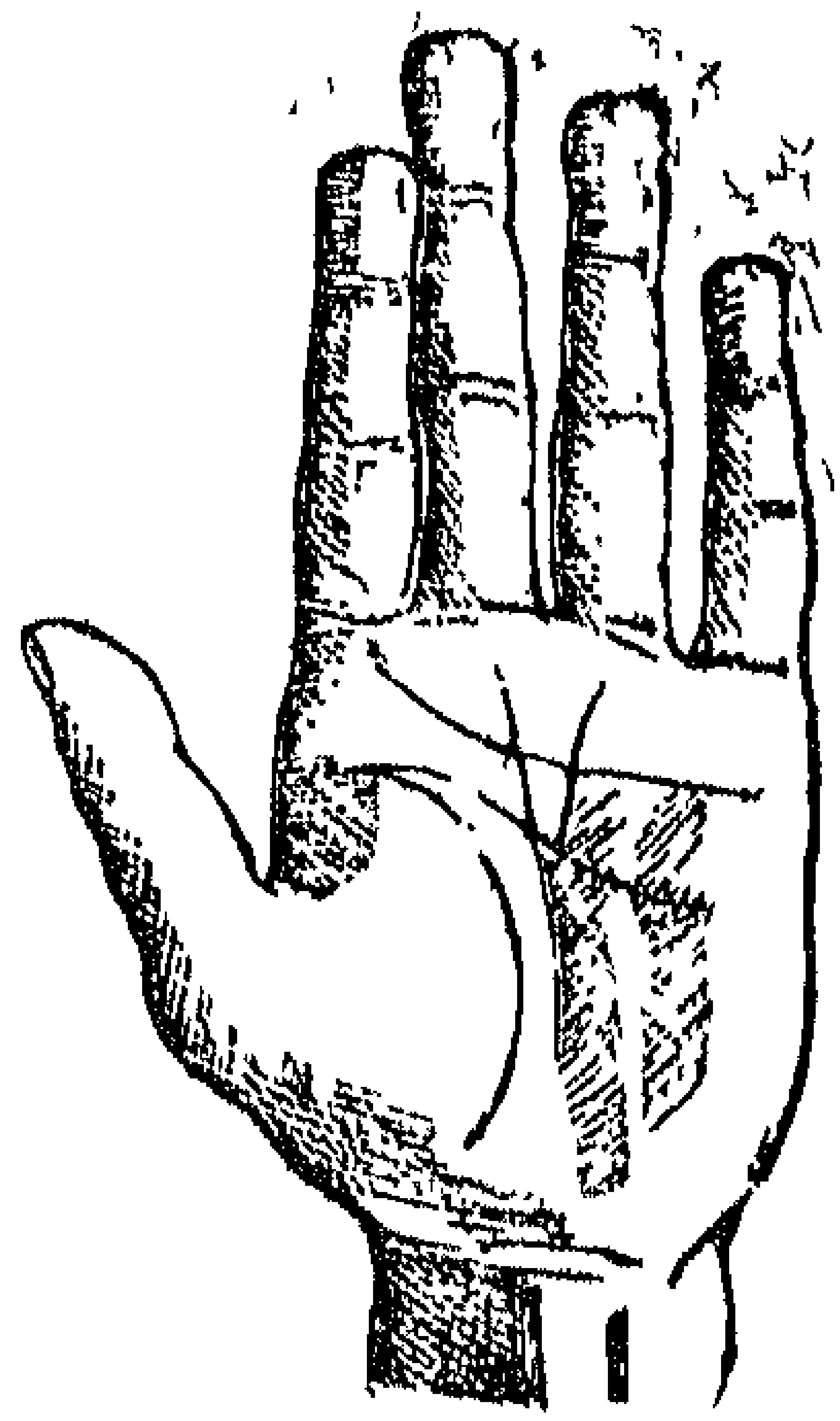
যদি অঙ্গুষ্ঠের পশ্চাদ্দিকস্থ কোণ সকল স্পষ্ট হয়, তবে সঙ্গীতশাস্ত্রে তালমান বোধ বুঝায়। উপরিস্থিত কোণ তালবোধক, নিম্নস্থ কোণ স্বর-বোধক।

অঙ্গুষ্ঠের অবস্থিতি।

যদি অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ এবং সমকভাবে অবস্থিত থাকে কার্য্যোদ্যোগ এবং যোগ্যতাহীনতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু যদি উচ্চাবস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ প্রথম পর্ব্ব পশ্চাদ্ভাগে বক্র হয়, কেবল স্বার্থের দাস সূচিত করে।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ব্যবধান অধিক হইলে উদারতা জ্ঞাপন করে। উক্তরূপ দূরব্যবধান সহিত প্রথমপর্ব্বের পশ্চাদ্ভাগে বক্রতা, অপরিমিত

ব্যয়িতার লক্ষণ। যদি এইরূপ ভাব প্রথম দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হয়, অর্থ ব্যয় বিষয়ে সদসৎ বিচার থাকে না। সমস্ত অঙ্গুষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগে নত, অভিনয় শক্তির অন্যতম পরিচায়ক। অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব সকল সুগঠিত, দৃঢ় এবং দীর্ঘ হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে অটল থাকে।



সুগঠিত অঙ্গুষ্ঠ বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিকে নিজ ইচ্ছা শক্তিবলে দমন করিয়া বহুল পরিমাণে করতল নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের অন্যান্য সমস্ত দোষ ক্ষালন করে। এইরূপ ব্যক্তি পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য বোধে আলস্য ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীলতা অবলম্বন করে। ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা স্বাস্থ্যনাশক বিবেচনায় ইন্দ্রিয়দমনে অনেকাংশে সমর্থ হয়।

আবার বিচারশক্তিহীন দুর্ব্বল অঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য গুণাবলীকেও নষ্ট করে। ক্ষুদ্র সূচ্যগ্র প্রথম পর্ব্ব, ক্ষীণ মধ্য দ্বিতীয় পর্ব্ব এবং সমস্ত অঙ্গুষ্ঠের ক্ষুদ্রতা, অব্যবস্থিত চিত্ততা, দুর্ব্বল চিত্তে ঐকান্তিকতাযুক্ত অর্থাৎ দুর্ব্বলচিত্ত অথচ একগুঁয়ে মনুষ্যের লক্ষণ। এরূপ ব্যক্তি অধ্যবসায়শূন্য ও সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য। তাহারা কিছুই সুসম্পূর্ণ করিতে পারে না, সহজেই লোকের কথায় বিচলিত হয়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃ শাস্ত্রী।

হত্যা-রহস্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলহ।

রহমানের কথা শুনিয়া হামিদ একটু উদ্ধতস্বরে কহিল, "তুমি কি মনে কর, তোমার গায়ে জোর আছে ব'লে তোমাকে ভয় কর্ত্তে হবে?"

অর্দ্ধোত্থিত হইয়া রহমান কহিল, "কি তুই আমাকে তাচ্ছিল্য কচ্ছিস্?"

"না, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে চাই না।"

"হাঁ, তাই বল্। যদিও এখন বয়স হয়েছে তবু এখনও তোর মত দশটাকে নিকেশ কর্ত্তে একটুও মেহনত হয় না।"

"আচ্ছা, তুমি কি হিতকথা শুনবে না?"

"কেন শুনব' না?"

"দেখ, মা তোমার বিশেষ উপকার করে থাকে।"

"কে আমার উপকার করে সে আমিই বেশ বুঝি; তোকে বল্তে হবে না, তুই থাম্।"

"তাকে কি এখানে নিয়ে আসব'?"

"কেন রে?—মদ খাবে নাকি?"

"ঐ ত তার দোষ,—মদে কত মজা বুঝতে পাল্লে না।"

"মা এসে তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌তো।"

"কি বুঝাবে?—কোন মদে কত মজা হয়?

কি বুঝাবে তাত তুমি জান।"

"আমি জানি?—বলিস কি রে?"

"তার দেরাজ থেকে তামাসা করে যে কাগজগুলা নিয়েছ সেই জন্য।"

রহমন উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "তা হ'লে, তামাসা ক'রে কাগজগুলা নিয়েছি?—হাঃ, হাঃ, কথা শুনে ভারি হাসি পাচ্চে।"

"সে যাহোক্, কাগজগুলা ফিরে দিলে পাঁচশত টাকা পাবে।"

"সত্যি, তোর কথাশুনে বড় লোভ হচ্চে যে।"

হামিদ মৃদুস্বরে কহিল, "মা কখন তোমাকে কোন জিনিস দিতে অস্বীকার করে নাই, করেও না।"

"আহা, তা হ'লে বেচারী কিছুতেই আমাকে ছাড়্‌চে না।"

"তুমি কি তার অনিষ্ট ক'র্‌বে?"

"আমি কি তার কিছু অনিষ্ট ক'রেছি?

"হাঁ।"

"কি বলত বাবা—কি করেছি?

"তোমারই এই কাজের জন্য তার সর্ব্বনাশ হবে।

"সর্ব্বনাশ হবে—এখনও হয়নিত? যদি এটা আমার তামাসাই হয় তবে এত ভয় কেন?"

"কাগজগুলা ফিরে দিবে?"

"আমিত লই নাই বাপ।"

"কে নিয়েছে জান?"

"কেমন ক'রে জান্‌বে'?"

"আচ্ছা, কালতুমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌বে?"

রামদীন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "দেখাযাবে, যদি হাতে কাজ না থাকে তবে দেখা কর্‌ব।"

বিষণ্ণ বদনে হামিদ শুঁড়িখানা পানে ... গুপ্তার দোকানাভিমুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কারাগৃহ।

পিতৃহত্যা অভিযোগে অমরের বিচার শেষ হয় নাই। অমর হাজতে। হাজতের একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া অমর আজ বিষণ্ণবদনে নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন।

অনেকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র অল্পক্ষণ মধ্যেই হাজত গৃহে অমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অমর কহিল, "মহাশয়, আপনি বড়ই গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছেন। আমার নির্দোষীতা প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব।"

হেমচন্দ্র বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "তবে কি দোষী?" অ। না, মহাশয়, আমি দোষী নহি। ভগবানই জানেন, আমি দোষী কি না।"

হে। কে এ কার্য্য করিয়াছে জান?"

অ। কেমন করিয়া বলিব বলুন?

হে। যদি তুমি নির্দোষী, তবে এত ভয় কেন?

অ। কি করিয়া বলিব? সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

হে। তোমার পিতার মৃত্যুতে তোমার সুবিধা; বাধা দিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া অমর কহিল, "মহাশয়, যদি কোন শাস্ত্রের নিয়ম থাকে তাহা এই;—পিতার মৃত্যুতে আমার কিছুই নাই; তাঁহার উইল যখন পড়া হবে, দেখিবেন তিনি আমাকে এক কপর্দকও দেন নাই।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

অমর কহিল, "আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই নহে ;—তিনি আমার জন্য একটী পাত্রী স্থির করিয়াছেন, যাহাকে বিবাহ না করিলে আমি এক কপর্দ্দকও পাইব না।"

হে। বিবাহ না করিলে সম্পত্তি কাহার হইবে?

অ। তাহা ঠিক বলিতে পারি না ; বোধ হয়, সেই পাত্রীটীই পাইবে।

হে। এই পাত্রীটী কে?

আমাদের কোন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয় কন্যা, নাম তারা।

হে। বিবাহ বিষয়ে তাহার মত লওয়া হইয়াছিল।

অ। অবশ্যই। অর্থ থাকিলে তারা বিজাতীয়কও বিবাহ করিতে নারাজ নয়।

হে। তুমি পিতার সহিত যে দিবস রাত্রে বিবাদ করিয়াছিলে?

অ। হাঁ, কিছু টাকা চাওয়াতে তিনি দিতে অস্বীকার করেন, তাহাতেই রাগের মাথায় কোন বিপরীতকর কথা বলে থাক্‌বো।

আচ্ছা তারার সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে?'

"কিছুমাত্র না।"

"সে কি তোমার পিতার উইলের বিষয় জানে?"

"সম্ভবতঃ জান্‌তে পারে।"

"তবে সে নিজের সুবিধার জন্য খুন করিতে পারে?"

"না, তাহা হতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে অনেক আগে অন্য প্রকারে তাঁহাকে মারিতে পারিত। আরও একাপে খুন, সে করিতে পারে না।"

"খুনের সময় তুমি কি নিকটেই ছিলে?

"আজ্ঞে না।"

"তবে কোথায় ছিলে তুমি?

অমরের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ হইয়া গেল; কাঁপিতে কাঁপিতে অমর কহিল, "ক্ষমা করুন, সে কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না।

হেমচন্দ্র অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অমর হত্যা সময়ে কোথায় ছিল বলিল না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে সেই দিবস অমর অলকার ভ্রাতা মোহনলালের সঙ্গে ছিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হেমচন্দ্র মোহনলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়বাজারে অলকাদের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিবস তাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

হেমচন্দ্রের মনে ধারণা হইল যে হত্যাকাজে অমর ও মোহন লাল উভয়েই কোন প্রকার বিশেষ গুপ্তকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, নতুবা অমর তাহা সহজেই প্রকাশ করিত।

পর দিবস প্রভাতে স্বীয় অফিস-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হেমচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, মেটুসনকার একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া একখানি বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, অলকা আসিবে।"

মেটু একটু বিমর্ষ ভাবে কহিল, "আর মশাই, আমাদের কি কবে? কাল সেই আপনি কি ফ্যাসাদ্ করে গেলেন, সেই থেকে বাছা একবারে শুকিয়ে গেছে।"

"তাইত, বড় দুঃখের বিষয়।"

"আপনি দুঃখিত হ'লেন বলে তার কিছু উপকার হবে না।"

"সে কথা ঠিক, তুমি বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলেছ।"

"আজ্ঞে, আমার বাপ পিতেমো আমাদের গাঁয়ের মধ্যে বড় পাণ্ডিত গোচের লোক ছিলেন, সকলে তাদের পরামর্শ নিয়ে কায কর্ত্ত।"

"বটে! পণ্ডিতের বংশ তোমাদের!

ঘেঁটুর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল, কহিল সাবধান হয়ে কথা বল্‌বেন, নয়ত দাঙ্গা হাঙ্গাম হয়ে যাবে। আমার পিতেমো পণ্ডিত ছিলেন আপনি তাঁদের ঠাট্টা কর্ত্তে পারেন না। ভগবান তাঁদের পণ্ডিত করেছিলেন—সেটা কি তাঁদের দোষ?"

আমি ত বাপু তোমার পিতা, পিতামহকে উপহাস করি নাই।"

"হতে পারে; কিন্তু যদি আমি সাবধান না করে দিতুম তাইলে পরে হয়ত অপমান করে ফেল্‌তেন।"

"বেশ বাপু, তুমি খুব সাবধানী। যা হোক, তুমি অলকাকে বলিও অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।"

"আজ্ঞে সে তা জানে। কারণ, কালকে খাবার সময় আপনি দেখা করবেন বলে গেলেন।"

"হাঁ, অলকাকে বলিও যে এখন অনেক আশা আছে, বোধ হয় কৃতকার্য্য হইব। আর যদি পারে তবে যেন আমার সহিত শীঘ্র একবার দেখা করে।"

"যে আজ্ঞা ম'শাই" বলিয়া ঘেঁটু সরকার গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারদেশে মোহন লালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া প্রস্থান করিল।

ঘেঁটু চলিয়া গেলে মোহন লাল হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। পরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি কাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন শুনিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

মোহন লাল গৌরবর্ণ। শরীর নাতিদীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব পদ সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে কোঠরস্থ চক্ষু ও শুষ্ক মুখ রাত্রিজাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

অলকা ও মোহন লালের পিতা বিখ্যাত ব্যবসাদার লোক। প্রায় ৫।৭ লক্ষ টাকার কারবার। কিন্তু লোকটী ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। পুত্র মোহন লাল একটু উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের এবং তাহারই সঙ্গদোষে অমরের অধঃপতন হইয়াছিল। মোহনলাল পিতার নিকট সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইত, তথাপি তাহার চরিত্র সংশোধনে কিছুমাত্র চেষ্টা করিত না। ভগ্নী অলকা তাহাকে অত্যধিক স্নেহ করিত এবং সেই সুযোগে মোহনও তাহার আবশ্যক অর্থাদি ভগ্নীর নিকট হইতে মিথ্যা কারণ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইত এবং তদ্বারা নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিত।

[ক্রমশঃ]

টাইফয়েড্ জ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ইহার চিকিৎসায় যেমন ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সুবিবেচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থার প্রয়োজন, তদ্রূপ পথ্যের সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পীড়ার প্রথম হইতেই কোন প্রকার, অতরল (Solid.) পদার্থ আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ যদিই উহা সম্যক পরিপাচিত না হয় তাহা হইলে উদরাময় আনয়ন করিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি, যে, উদরাময় অথবা তাহার প্রবণতা এই পীড়ায় বড়ই মন্দ লক্ষণ; একারণ যথাসাধ্য উহা যাহাতে না হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অতরল পদার্থ উদর মধ্যে যাইয়া অন্ত্র মধ্যে উপদাহ (irritation) উৎপাদন করিয়া রক্তস্রাব আনয়নও করিতে পারে। ইহা আরও মন্দ লক্ষণ। এই সকল উপসর্গের হাত হইতে

রোগীকে রক্ষা করিবার জন্য সাগু, বার্লী বা আরোরুট ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদরাময় প্রবণতা লক্ষিত হইলে উহা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে জলের সহ প্রস্তুত করিতে হইবে নতুবা জল মিশান দুগ্ধের দ্বারা (ঘন দুগ্ধে উদরাময় আসিতে পারে) প্রস্তুত করিয়া দিতে পারা যায়। মেলিন্স্ ফুড্ বা হর্লিক্স্ মল্টেড মিল্ক কি বেঞ্জারস্ ফুড (উদরাময় স্থলে বিশেষতঃ) প্রভৃতি বিলাতী পথ্য ও জল বা দুগ্ধের সহ সেবন করিতে দিতে পারা যায়। এখানে আমরা স্বদেশী না হইয়া বিদেশীর আশ্রয় লইতেছি বলিয়া হয়ত অনেকে রাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে বিলাতী ঔষধ যখন ব্যবহার করিতে দোষ নাই, সেইরূপ রোগীর পথ্যস্থলে (উহাও ঔষধ বলিয়া ধরিয়া) বিলাতী ফুড ব্যবহার করা দোষ হইতে পারে না। আজকাল কতকগুলি স্বদেশী ফুড্ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা এখনও সম্যকরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। বহু পরীক্ষিত দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া জীবন মরণের সংগ্রাম স্থলে আমরা কোন মতেই অপরীক্ষিত স্বদেশী ফুডের প্রচলন করিতে ব্যবস্থা দিতে পারি না। ইহাতে যদি আমাদের কোন স্বদেশী ভ্রাতা রাগ করেন বা বিরক্ত হন তাহা হইলে আমরা নাচার।

যাহা হউক আমরা যাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাই আরম্ভ করা যাউক—স্বদেশী বিদেশীর তর্ক এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। যবের মণ্ড, খই-এর মণ্ড, মুসুরির যূষ প্রভৃতিও আমরা অনেকস্থলে ব্যবস্থা করিয়া সুফল পাইয়াছি। অধিক অবসাদাদি ও দৌর্ব্বল্য স্থলে মাংসের যুস্ (কচি পাঁটা কিম্বা ছানা মুরগী হইলেই ভাল হয়) অথবা উহার জল্ সুপ (Tug-soup) করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কবুতরের মাংসও অনেকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন দেখিয়াছি। এইত গেল জ্বর থাকা কালে, এখন জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইলেও সত্বর অন্ন পথ্য করান কর্ত্তব্য নহে; অন্ততঃ ১০।১২ দিন যাবৎ নিতান্ত লঘু পথ্য দিতে হইবে—আমরা এমতস্থলে সুজি সিদ্ধ, খই বা যবের অথবা সিঙ্গী-কি মৌরলা মৎস্যের ঝোলসহ সেবন করাইয়া থাকি। ইহাতে রোগীও বেশ আনন্দ বোধ করে দেখিয়াছি।

এখানে আমাদের আবিষ্কৃত (ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী দ্বারা আবিষ্কৃত) এসেন্স অব্ মস্থরীর সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিতে ইচ্ছা করে। নিতান্ত নিস্তেজাবস্থায় আমরা অনেকস্থলে ইহা ব্যবহারে মাংসের যুস্ অপেক্ষাও অধিক ফললাভ হইতে দেখিয়াছি জ্বরাবস্থায় অথবা আরোগ্যাভিমুখীন (convalescence) অবস্থায় প্রতিবার পথ্যের পর ১০ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত বয়সানুসারে) ব্যবহারে সহজে পরিপাক হইয়া শরীরে বলাধান হইতে দেখা গিয়াছে।

আমাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত দুইটি অতিশয় কঠিন রোগীর বিবরণ দিয়া এই খানে প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। বিবরণ পাঠেই জানিতে পারিবে যে কেমন মুমূর্ষু রোগীও মহাত্মা হানিমানের পুণ্য কীর্ত্তি ফলে আরোগ্য লাভ করিয়া হোমিওপ্যাথীর—সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

দিনাজপুরের মহারাজার—ভূতপূর্ব্ব নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু পেয়ারী মোহন বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের এই পীড়ার সপ্তম দিবসে আমি আহুত হইয়া চিকিৎসার ভার লইয়াছিলাম। এ দিবস অপরাহ্ণে যাকে আমি দেখিলাম সে বালকটি (৬ বৎসরের বালক) প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে,—উদর স্ফীত, দাস্ত বা প্রস্রাব হয় নাই, জ্বর প্রায় ১০৫ অথচ গাত্রতাপ

অধিক নহে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মও হইতেছিল, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে। বাড়ীতে সকলেই এই অবস্থা দৃষ্টে মৃত্যু নিকট ভাবিয়া কান্নাকাটি করিতেই প্রবৃত্ত। অবস্থা দৃষ্টে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত প্রথমে হইয়াছিলাম। তাহার পর সকলকে আশ্বাস দিয়া ওপিয়ম (৩০) একমাত্রা বালককে সেবন করাইলাম এবং উদরে গরম জলের ফোমেণ্ট করাইতে লাগিলাম। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই একবার বেশ প্রস্রাব হইয়া গেল এবং সামান্য দাস্তও হইল। তাহাতে বালক সুস্থবোধ করিল পরদিন হইতে বালকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। জ্বর ১০৪ এর নীচে নামে না, ক্রমে ঘোর ডিলিরিয়ম, প্রায় অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় জন্য সর্ব্বদা চীৎকার করা, শূন্যে হাত নাড়া, হস্ত ও জিহ্বা কামড়ান, শয্যার বস্ত্র টানিতে থাকা প্রভৃতি সমুদয় মন্দ লক্ষণই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩ দিনের দিন হইতে ১৫ দশ দিন পর্য্যন্ত অতিশয় বৃদ্ধি অবস্থা ছিল। ১৫।১৬ দিনের পর হইতে জ্বর বসিয়া ১০১ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তখনও ডিলিরিয়মের অতিশয় বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইয়াছিল বলা বাহুল্য যে ইহা অতিশয় মন্দ লক্ষণ। বালকের আকৃতি এমন কালি মাখা হইয়াছিল যে তাহাকে চিনিতেই পারা যাইত না। বিশেষ হাতের অঙ্গুলিদ্বয় ও পায়ের পাতা, জিহ্বা এত অধিক কাল হইয়া গিয়াছিল যে তাহার জ্যেষ্ঠ" (১৯ বৎসরের বালক) হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল যে (ঐ বালক) হনুমান হইয়া গিয়াছে বক্ষে উভয় ফুসফুসেই—ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, কাশি শুষ্ক এবং উৎক্ষেপ বিহীন ছিল। নাসিকা খুঁটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিত। উদরের ফাঁপ প্রায়ই থাকিত—দাস্ত হওয়া সত্বেও—প্রস্রাব পরিমাণে স্বল্প হইত।

যাঁহারা এই রোগী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু হানিমানের কৃপায় আমরা অতি কষ্টে পূর্ব্বোক্তরূপ ভয়াবহ অবস্থা হইতেও ঐ বালকের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া হোমিওপ্যাথীর জয় জগতে ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই রোগীর চিকিৎসা ধারাবাহিক রূপে কি কি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বর্ণনায় এখানে স্থান নাই সেজন্য অগ্রে সে গুলির নাম বলিয়া যাইব। এই পীড়ার জন্য আমি হায়সায়ামস্ ষ্ট্রামোনিয়ম্, কেলিব্রোমেটস্ ডিলিরিয়ম জন্য, সিনা, এরম্ ট্রিফাইলম্ কৃমি ও অতিরিক্ত নাসিকা খোঁটার জন্য, ওপিয়ম ও নক্স মস্চাটা উদরের ফাঁপ জন্য এবং বক্ষাক্রান্তি জন্য ফস্ফরস্ ও কেলিব্রোমেটস সময়মত লক্ষণ-দৃষ্টে ব্যবহার করিয়াছিলাম। ২৩।২৪ দিনের পর হইতে সমুদয় লক্ষণের বেশ উপশম লক্ষিত হইয়াছিল এবং ২৯ কি ৩০ দিনে জ্বর একেবারে বিরাম প্রথম হইয়াছিল। ৩৫।৩৬ দিনের দিন পুনরায় রাত্রিতে হঠাৎ জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইজ্বর বৃদ্ধি ও সামান্য একবারে দুসদুসে জ্বর ক্যাল্কেরিয়া-কা, ক্যাল্কে আস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

এইজ্বরে প্রবল বক্ষাক্রান্তি থাকা সত্বেও আমরা ব্লিষ্টার না দিয়া কেবলমাত্র তুলা ও ফ্লানেল ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম এবং মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তের আধিক্য জন্য মাথায় আইস ব্যাগ দেওয়া হইত।

পরিশেষে গৃহস্থের ধৈর্য্য সম্বন্ধে ২।১টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদের হোমিওপ্যাথীর উপর অটল বিশ্বাস ও ঔষধের সফলতা দর্শন জনিত ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হওয়ার জন্যই যে আমরা ধৈর্য্য সহকারে ঐ বালকের

চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এবং অনেক বন্ধুবান্ধব চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু গৃহস্থের মন ধামাইতে পারেন নাই। রোগী যেরূপ দুর্ব্বল ও জীবনী শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছিল এই অবস্থায় তাহাকে উগ্র অ্যালোপ্যাথী নানারূপ তীব্র ঔষধ সেবন করাইলে ফল কি হইত বলিতে পারি না। এই রোগীকে হোমিওপ্যাথির সফলতা দৃষ্টে অনেকের এই চিকিৎসার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাইয়া গিয়াছে।

আর একটি রোগীর বিবরণ এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত মল্লিক বংশের নন্দ মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কঠিন পীড়ায় গত বৎসর আক্রান্ত হইয়া অ্যালোপ্যাথী দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছিল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য সাহেব ও বাঙ্গালী ডাক্তার প্লেগ বলিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন এবং ১৩ দিনের দিন একরূপ জবাব দিয়াই দিয়াছিলেন যে মারা যাইবে। যাহা হউক পরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয় আহুত হইয়া উহা টাইফয়েড ফিবার বলিয়া স্থির করেন। ঐ বালক তখন ঘোর অজ্ঞানাবস্থায় ছিল অথচ ঘোর ডিলিরিয়মযুক্ত; কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সদা চীৎকার ও অস্থির হইয়া শয্যায় এপাশ ওপাশ করিত। পেটে ফাঁপ, চক্ষে ক্ষত, কাণের পাশে রক্তার্ব্বুদ গাত্রে অজ স্তজ রক্তস্ফোট বাহ্যে প্রস্রাব এক প্রকার বন্ধ বলিলে চলে। সকলেই এই বালকের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিল। যাহা হউক ফলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং হোমিওপ্যাথীর অমোঘকতায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

এই রোগীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঔষধাদি ও পথ্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ডাক্তার—মৈত্র।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জনপ্রণালী।

স্বদেশী ও স্বজাতি আন্দোলনে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছে। অনেকেরই অন্তঃকরণে আত্মসম্মান স্বাবলম্বন নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চার হইয়াছে। দাসত্বকে হেয় জ্ঞান করিতে অনেকেই শিক্ষা করিয়াছে। শিক্ষারও দিকপরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এখন অনেকের নিকটেই আর যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিল্প বাণিজ্যের প্রতি সকলেরই এখন অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। কলেজের পাঠসমাপনান্তে চাকুরী ও ওকালতি ব্যতীত অপর কোন উপায় আছে কিনা তদ্বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে ছাত্র সম্প্রদায়ের অনেককেই এখন দেখা যায়। সাময়িক পত্রাদিতেও শিল্প বিজ্ঞান কৃষি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদিরও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধের পাঠক শ্রেণীর সংখ্যাও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে আমরা অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছি যে দাসত্ব ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের আরও অনেক পথ খোলা রহিয়াছে। কেবল মাত্র উপযুক্ত চেষ্টার অভাব। কিন্তু সময়ের অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। গত তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে তাঁতের সংখ্যা যেরূপ সহসা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার। গত দুই বৎসরের মধ্যে কেবল মোজার কলই বঙ্গদেশে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বিক্রীত হইয়াছে কলিকাতার প্রায় ঘরে ঘরে ঐ কল

চালিত হইতেছে ; দেখিতে দেখিতে আমাদের দেশে কতগুলি কাপড়ের ও সূতার, কল ষ্টিমার কোম্পানী, বীমা কোম্পানি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া গেল। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ও যদি কেহ আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে সন্দিহান হন তবে তাঁহার দুর্বুদ্ধি বলিতে হইবে।

চারিদিকে উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু তাহাই যথেষ্ট বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোন কারণ নাই। জাতীয় উন্নতি সাধনের আবেগের সঙ্গে কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল কিন্তু কার্য্য সাধনের জন্য কেবল আবেগই যথেষ্ট নয়।

কার্য্য উদ্ধারের জন্য ব্যবসায় পরিচালনোপযোগী বিশেষ বুদ্ধি থাকা অথবা তাহার বিকাশের বিশেষ আবশ্যক। ব্যবসায় বুদ্ধি একটি ভিন্ন জিনিস ; তাহা কলের থাকে না ইহাও একটা শিক্ষার বিষয় ; আয়াস করিয়া ইহা লাভ করিতে হয়।

বর্ত্তমান উত্তেজনার ফলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে সত্য কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক ও ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। আমরা আপাততঃ সূত্র ও বস্ত্রাদি রংকরণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়াদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই।

শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ৪০০,০০০ মন রঙ্গিন সূতা ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য প্রায় ২ কোটী টাকা। এই সূতার প্রায় ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার সূতা বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এবং অবশিষ্ট বোম্বাই আমেদনগর পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয় অতি সামান্য ভাগ বঙ্গদেশের শিল্পিদিগের শ্রমজাত।

টাকা নানাদিক দিয়া আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে আমরা অন্ধ ; আমরা তাহার কোনটীরই কোন সন্ধান রাখি না আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই সমস্ত দিক লক্ষ্য করা এবং তাহার যদি কোন প্রতিকারের উপায় থাকে তাহার বিধান করা।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমরা স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারে উদ্যোগী হইয়াছি কিন্তু খুঁজিতে গেলে আমরা স্বদেশী বলিয়া যাহা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই বিলাতি না বিদেশ জাত।

আমরা দেশী তাঁতের কাপড় ব্যবহার করি তাহার সূতা বিলাতি দেশী গেঞ্জি ও মোজা ব্যবহার করি—তাহারও প্রায় সমস্তই বিদেশী। সময় বুঝিয়া বিদেশী বণিকেরা ঐ সমস্ত সূতার দর চড়াইয়া দিয়াছে এবং সেই জন্যই আমাদের দেশের প্রস্তুত গেঞ্জি মোজা প্রভৃতি বিদেশীয় সহিত প্রতি যোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। রেঙ্গুন বাতি আমরা দেশী বলিয়া জানি, কিন্তু উহার মূলধন সমস্তই সাহেব কোম্পানির। প্যারাফিন মোম দ্বারা ঐ বাতি প্রস্তুত। সাহেব কোম্পানী ঐ বাতি ৵১০ ও ৶০ মূল্যে প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু ঐ প্যারাফিন যাহা রেঙ্গুণ বাতির একমাত্র উপাদান তাহা উহারা ।০ ।৫ মূল্যে প্রতি পাউণ্ড বিক্রয় করিতেছে পাছে ভারতবাসীরা ঐ মোম খরিদ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া উহাদের সহিত প্রতি যোগিতা করে। এইরূপ পদে পদে তাহাদের শক্রতায় আমরা—প্রতারিত প্রতিহত হইতেছি। ইহার উপায় আমাদেরই করিতে হইবে। আমরা একটী একটী করিয়া পর পর প্রধান প্রধান বিষয় গুলির আলোচনা করিব। আপাততঃ রং করা সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলা যাক্।

বিলাতি ১৬নং রঙ্গিন সূতার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৲

টাকা। ঐ স্থলে বিলাতি ১৬নং সাদা সুতা ৸৹ আনায় বিক্রীত হয় সুতরাং আমরা প্রতি পাউণ্ডে রং করার জন্য ।৹ আনা অতিরিক্ত দণ্ড দিয়া থাকি।

৪ লক্ষ মণ সুতা ৩ কোটি পাউণ্ডের উপর সুতরাং আমরা প্রতি বৎসর বিলাতকে কেবল রং-করিবার খরচা স্বরূপ ৭৫ লক্ষ টাকা অযথা দিয়া থাকি। ইহা কেবল বাঙ্গলা সম্বন্ধে। বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গলা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রঙ্গিন কাপড় ব্যবহৃত হয় সুতরাং সেই সমস্ত প্রদেশ হইতে আরও অধিক টাকা বিলাতের চরণে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। আমরা জাতীয় উন্নতির উপায় কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই খুঁজিয়া থাকি। অবশ্য সেদিক ও দেখিতে হইবে কিন্তু অপর দিক সম্বন্ধে একবারে উদাসীন থাকিলেও চলিবে না; সে দিকটাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

অনেক পত্রিকার সম্পাদক লেখকগণ কে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সহ শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারি না প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নূতন কোন শিল্প সম্বন্ধে পাঠক গণের কি করিয়া কার্যোপযোগী জ্ঞান জন্মিতে পারে। শিল্প প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শিখিবার পদার্থ নয়। "হাতে হাতিয়ারে" কাজ করিলে তবে কোন শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার জন্মিতে পারে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শিল্প শিক্ষার আশা বিড়ম্বনা মাত্র; তবে, ইহাতে উপায় মাত্র নির্দ্দেশিত হইতে পারে। ধরুন আমরা রং করিবার কতকগুলি উপাদানের নাম ধাম সহ কতকগুলি প্রক্রিয়া পরিষ্কার লিপিবদ্ধ করিলাম; তাহা পাঠ করিলেই একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সুতা উপযুক্ত মত রং করিতে পারিবে? রং করিতে গেলে হয়ত সুতার এক অংশে গাঢ় ও অপর অংশে ফিকে হইল; এ জিনিস বাজারের কাটিবে না; আবার রং করিবার পূর্ব্বে যে সুতা নরম ও উজ্জ্বল ছিল রং করিবার পরে হয়ত তাহা শক্ত, মলিন ও কর্কশ হইয়া পড়িল। ইহা স্বাভাবিক, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রত্যেক শিল্প সম্বন্ধেই এইরূপ। শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ শিল্পের উপর পাঠক গণের আগ্রহ আকর্ষণ করা ও আগ্রহ শীল পাঠককে পথ প্রদর্শন করা। যাহা হউক অনুরোধ মত শেষে দুই একটী আবশ্যকীয় ও অতি পরীক্ষিত রং করণ প্রক্রিয়া বিবৃত করিব। ইহার পূর্ব্বে আমার উহার কল সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ,

অদ্ভুত পরীক্ষা।

—(*)—

পুরাকালে জনশ্রুতি নামে এক নরপতি প্রাচীন ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। এই মহীপাল সাতিশয় সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে রাজ্যের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপিত ছিল। তিনি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য ধর্ম্মরাজ্যে আবার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং ভয় ও উৎপীড়ন দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মান-লাভ ও প্রীতি আকর্ষণ তাঁহার নিকট নিন্দনীয় ছিল। প্রজার সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি, দুঃখ নিরাকরণের উপায় বিধান, ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বসাধারণের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও

একদিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য পরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এই জন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়া নানাদিগ্‌দেশ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ও সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদা তদীয় রাজসভায় সমাগত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি স্থানে স্থানে কূপ খনন, পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর পথিকবৃন্দের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থগণ ঐ সকল পান্থশালায় অযাচিতভাবে সুখসেব্য ভোজ্য পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার যশগান করিতে করিতে ভগবান সমীপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিত। ফলতঃ তাঁহার শাসনগুণে ও ধর্ম্মপ্রভাবে মর্ত্ত্যরাজ্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট' এই প্রচলিত বাক্য তাঁহার শাসনকালে জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। রাজা জনশ্রুতিও তাঁহার সুশাসন এবং বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসাবাদ শ্রবণে আত্মপ্রসাদরূপ বিমল ও পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিবস রজনীযোগে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নবশে দেখিতে পাইলেন সম্মুখে ফুল্ল কুমুদদাম সুশোভিতবাপী বিরাজমান; রাজহংসগণ সলিল বক্ষে কেলি করিতে করিতে বিবিধ বিষয়ক প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। প্রায় সকলেই একবাক্যে রাজা জনশ্রুতির বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া স্তুতিবাদ করিতেছে। অতঃপর এক বৃদ্ধ রাজহংস সলিল বক্ষে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বন্ধুগণ! এই রাজ্যে রৈক্য নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ বাস করেন। তিনি জনশ্রুতি নরপতি অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসার্হ। এই বাক্যে অবমানিত হইলেন না বটে, কিন্তু রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজা এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে রৈক্যের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর একদা একজন দূত প্রত্যাগত হইয়া বলিল—মহারাজ! রৈক্যের অনুসন্ধান পাইয়াছি। এই বাক্য শ্রবণে রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বিবিধ ধনরত্নাদি লইয়া দূত সমভিব্যাহারে রৈক্যের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক পর্ণশালার অভ্যন্তরে এক কদাকার দেহ ব্যক্তি শুক্রধরের কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। দূত বলিল মহারাজ! ইঁহারই নাম রৈক্য। রৈক্য সহসা রাজসমাগমে বিস্মিত হইয়া শশব্যস্তে রাজাকে যথাবিহিত সম্মানে অভিবাদন করিলেন।

রাজা সেই ধর্ম্মাত্মা দেহ শ্রমনিরত শুক্রধরের সদানন্দ চিত্ত ও অপূর্ব্ব তেজ দৃষ্টে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ভদ্র! আমি আপনার জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। রৈক্য বিনয়পূর্ণ বচনে উত্তর করিলেন মহারাজ! আপনার রাজভোগ ও আপনার বিবিধ ধনরত্নাদির প্রয়োজন কিন্তু আমি যে অমূল্য রত্নের প্রত্যাশী তাঁহার নিকট এ সমুদয় অতীব অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। আমার ইহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। বস্তুতঃ তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। সংসার সুখসম্ভোগ অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। জনশ্রুতি নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিফল মনোরথ হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরিশেষে রৈক্যকে একজন পরম তত্ত্বজ্ঞানী বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপলাবণ্যবতী একমাত্র কন্যা-রত্ন সুকন্যাকে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন, এবং অবিলম্বে রাজা পুনরায় বিপুল ধনরত্নাদি ও স্বীয় দুহিতা গমভিব্যাহারে রৈক্যের নিকট গমন করিলেন এবং রাজকন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এ প্রস্তাব রৈক্য প্রত্যা-খ্যান করিলেন না। শুভ বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই মহাত্মা ধর্ম্ম ও পুণ্যের বলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কৃপায় দিব্যকান্তি রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইলেন; ইনিই মহর্ষি চ্যবন নামে খ্যাত রহিয়াছেন।

আমরা এইখানেই উপাখ্যানটীর শেষ করিলাম, এই উপাখ্যান হইতে কি শিক্ষালাভ করিলাম? শিখি-লাম—শক্তি থাকিতে ক্ষমা, সত্যের পুরস্কার ধর্ম্মের প্রতি সম্মান, যোগ্যপাত্রে দান; জনশ্রুতি সসাগরা ধরার অধিপতি; রৈক্য রাজ্যের একজন দীনহীন অধিবাসী। রাজার দানে বিপুলরত্নাদি, রৈক্যের নিকট সেদান তুচ্ছ, সুতরাং হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অপ্রিয় ব্যবহারে জনশ্রুতির অবমাননা বোধ নাই, দ্বেষ নাই, প্রতিহিংসাও নাই। শক্তি থাকিতে ক্ষমা কি অদ্ভুত পরীক্ষা। পরীক্ষায় পরিণাম সত্যের পুরস্কার। ধন্য পুণ্যভূমি আর্য্যভূমি! এরূপ নরপতি তোমাতেই শোভা পায়। ধর্ম্মেই তোমার উন্নতি। ধর্ম্মহীনতায় তোমার অবনতি। আর কতদিন ধর্ম্মহীন ভাব ভারতে থাকিবে? আর কতদিন পরে পুনরায় ধর্ম্মভাব পূর্ব্ববৎ প্রবুদ্ধ হইবে? যে তোমার দীন হীন সন্তান-গণ আত্মস্বার্থপর স্বার্থে বলি দিতে শিখিবে, সত্যকে সত্য বলিয়া চিনিবে; সত্য রক্ষার জন্য, কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। পুণ্যভূমি আর্য্যভূমি, পুণ্যভূমি এসিয়া খণ্ড! তোমরা জগতের গুরু; সমস্ত জগৎ আজ তোমাদিগের নিকট অবনত মস্তকে ধর্ম্মজ্ঞানলাভ করিতেছে। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আজ ধর্ম্মহীন, একবার পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মে অনুপ্রাণিতকর; পুনরায় সত্য যুগের আবির্ভাব হউক।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

পাটোয়ারি বুদ্ধি।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস, রাজসেবা কত অচমচ, গৃহস্থ আছয়ে যত, সক-লের এইমত, ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ।" একথা কে না জানে? তথাপি চাকুরীর কি যে মোহিনী শক্তি, কেহই ছাড়িতে পারে না। বিষ্ণুপুরের মদন ঘোষ ও ইহার একজন। কিন্তু তাঁহার কয়েক ঘর জ্ঞাতি বাণিজ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মদন-ঘোষের পৈতৃক ভিটার চতুর্দ্দিকে তাহাদের সক-লের দোতলা তেতলা অট্টালিকাগুলি যেন কলি-কাতার অপরিষ্কৃত পথ পার্শ্বস্থ বিপুল সৌধমালার ন্যায় শোভা পাইত।

তাঁহার জ্ঞাতিদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের ধুমে রাত্রে ঘুম হইত না। তাহার উপর আবার গৃহিণীর তাড়না, মধ্যে মধ্যে শুকনা ঝাগড়া। মদন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

মদনঘোষ একটী সামান্য চাকুরী করিতেন। আয় অতি যৎসামান্য এবং তদ্দ্বারা অতিকষ্টে কোনরূপে তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন হইত। তজ্জন্য মদনঘোষের বদনে কেহ কখন হাসির রেখাও দেখিতে পাইত না। মদন চির-দিন বিষণ্ণ বদনে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন

ও মনে মনে জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলের জন্য তাহাদের ভবযন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্য ধর্ম্মরাজের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু কলিতে অধর্ম্মের জয় বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়াছিল।

যখন সকল প্রার্থনা নিষ্ফল হইল, তখন মদন ভাবিলেন দৈববল ভিন্ন উপায় নাই। দেবতারাই মানুষকে রাতারাতি বড়মানুষ করিতে পারেন। নিজে তিনি বেশ চালাক] চতুর, ব্যবসা করিলে একজন বড়মানুষ হইতে পারেন, কিন্তু পুঁজি নাই। সুতরাং, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে দৈববল উপার্জ্জন করাই স্থির করিলেন।

একদিন দিনমণি তাঁহার দিনের কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করে বাটীযাবার যোগাড় কচ্চেন, এমন, সময়ে আকাশ থেকে সন্ধ্যাদেবী এসে পড়লেন। সন্ধ্যার এক কাল মেয়ে সঙ্গে, মেয়েটীরনাম নিশি, মিস্‌মিসে কালো, বিষণ্ণ বদন নিশি বাপের আদরের মেয়ে। পিতা দিনমণি তাঁহার আদুরে মেয়ের বিষণ্ণ বদন আড়ালথেকে দেখে মস্ত বড় সুতায় বড় বড় হীরের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলেন। নিশিঠাকুরাণী সাজসজ্জায় বিভূষিত হয়ে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাস আসিয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা, আসন বাঘছাল পরিধান বাঘছাল, মস্তকেজটাভার। দাড়ী বিলম্বিত, নেত্র ঢুলু ঢুলু। হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘাকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—যেন নিশিঠাকুরাণীর সদ্যজাত সন্তান।

গ্রামে অমনি রাষ্ট হইল একজন মহাকায় সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। দলে দলে লোক আসিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ নিজের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ঔষধাদি দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও যথাসাধ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা মদন অবশ্যই শুনিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই দৈব উপায়ে স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে এই সুযোগ বুঝিয়া বিরলে সন্ন্যাসী দর্শনে অভিলাষ করিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, লোকের ভিড় কমিলে, ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, নতুবা আজ আপনার পদপ্রান্তে এ ছার তনু বিসর্জ্জন করিব।"

সন্ন্যাসীর বোধ হয় কিছু ক্ষমতা ছিল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া মদনকে কহিলেন, "বেটা তোর ভাল হবে, তুই যা রোজ সাঁজ সময়ে শিবমন্দিরে যাস্, আর সেখানে গিয়ে ভক্তি করে প্রার্থনা করিস্।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মদন আপন কার্য্য করেন এবং অবকাশে একান্ত মনে আশুতোষের আরাধনা করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গ্রামের প্রান্তস্থিত শিবালয়ে গিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শিবের আরাধনা করেন।

কিসে কি হয়, তাহা ভাল বুঝা যায় না। কেন হয়, কেমন করিয়া হয়—তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঐ পূর্ণিমার চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ,—কিন্তু প্রতিপদ হইতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়। অন্তিমে অমাবস্যায় কিছুই নাই, কেবল ঘোর অন্ধকার। আবার শুক্লপক্ষারম্ভে সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অন্ধকারের ক্ষয়। শেষে পূর্ণিমায় কিছুই নাই—কেবল আলোক। কিন্তু কেন যে চিরকাল এইরূপ হইবে, কেন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না—কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

অথবা বুঝি আলোকের পর অন্ধকার ও অন্ধকারের পর আলোক প্রকৃতির একটী নিয়ম।

যাহা হউক, শিবের আরাধনা বা মদনের ভাগ্য-বলে তাঁহার শুভদিন উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে দয়া অধিক, সহজেই লোকের প্রতি দয়া হয়, সহজেই লোককে ভালবাসে। মদনের একান্ত ভক্তি দেখিয়া পার্ব্বতীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল; তিনি মহাদেবকে কহিলেন, "ঠাকুর, মদনের প্রতি কৃপা কর, এ বড় দুঃখী ইহার দুঃখ দূর করিতে হইবে, মদন বড় ভক্ত।"

মহাদেব কহিলেন, "দেখ, পার্ব্বতি, মদনের ভাল করব কি, ভাল করতে গেলে, উহার জ্ঞাতিদের দ্বিগুণ ভাল হইবে। "পার্ব্বতী বলিলেন, "তা হউক, সে গোয়ালা, সে তা বেশ বুঝিবে, সহ্যও করবে।"

এ দিকে মদন আপন কার্য্য সমাধা করিয়া শিবালয়ে গিয়া আরাধনায় বসিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল "মদন, তুমি বর প্রার্থনা কর; কিন্তু একটী কথা আছে, তুমি যাহা পাইবে, তোমার জ্ঞাতিদের তাহা দ্বিগুণ হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া বর গ্রহণ কর। চারিটী বর তুমি প্রার্থনা "কর।"

ইহা শুনিয়া মদন ঘোষের বদনে এই প্রথম হাসির বিকাশ হইল। তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। মদন বড় চতুর, বুদ্ধিমান। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার লক্ষ টাকার বিষয় হউক, দ্বিতীয় আমার একটী চক্ষু কাণা হউক, তৃতীয় আমার একটী সন্তান মরুক চতুর্থ আমার সমস্ত দ্বারের সম্মুখে একটী করিয়া বৃহৎ গর্ত্ত হউক।" মহাদেবের বরে মদনের তাহাই হইল; কিন্তু জ্ঞাতি-দিগের দুই লক্ষ টাকার বিষয়, দুইটী চক্ষু অন্ধ দুইটী সন্তান মৃত ও সমস্ত দ্বারের সম্মুখে দুইটী করিয়া বৃহৎ গর্ত্ত হইল। জ্ঞাতিরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সমস্ত বিষয় লইয়া মদন ঘোষ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাটোয়ারি বুদ্ধির কাছে দেবতারও হার হইল।

শ্রীসত্যচরণ দত্ত বি, এ।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন। তবে কি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের একটা সৎরূপ কারণ থাকা চাই? নতুবা কার্য্যও উপলব্ধি হয় না?

ভগবান। নিশ্চয়ই।—কোনপ্রকার চলন যেখানে আছে অন্তরালে একটা স্থির কিছু আছেই। যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই কার্য্য। কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কি? নাম ও রূপ অস্তি ভাতি প্রিয় না থাকিলে নাম দিবে কাহার?

অর্জ্জুন—আর একবার বল। সাক্ষাতে তোমার এই সুন্দর রূপ দেখিতেছি, এই সুন্দর হাসি দেখিতেছি এই দৃশ্য প্রপঞ্চ দেখিতেছি কিরূপে বলি এইত দৃশ্য প্রপঞ্চের সত্তা নাই। ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বপ্নকালে তুমি কত বস্তু দেখ কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে উহার ভ্রম বুঝিতে পার। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে তুমি জাগ্রত হইলে দেখিবে আত্মার দীর্ঘ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নে যে অসৎ জগৎ ভাসিয়াছিল স্বপ্ন ভঙ্গে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ স্থিতিতে এই স্বপ্নরূপ জগৎ প্রপঞ্চ কিছুই রহিল না। অজ্ঞান তাঁহারই কল্পনা। তিনিই ইচ্ছা করিয়া বহু হইব কল্পনা করেন। কল্পনা সত্য নহে। আকাশ নীল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিচার করিয়া দেখ ইহা কে বলিল? জগৎ দেখিতেছে লোকে কিন্তু বাস্তবিক ইহা নাই একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগৎ রূপ ইন্দ্রজাল তাহাতেই ভাসিতেছে। জ্ঞান-দৃষ্টিতে মায়িক জগৎ তুচ্ছ। যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয়

এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক।

অর্জ্জুন—"ন সতো বিদ্যতে ভাব" বুঝিলাম। "না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" এইরূপ বুঝিয়াছি আরও ভাল করিয়া বল।

ভগবান—সৎবস্তু পরিপূর্ণ চৈতন্যের অভাব কোন কালে কোন দেশে হইতে পারে না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র "আছে" ইহা বস্তু বা অবস্তু সকলেরই উপাদান। ইন্দ্রজালও আছে। আছে বা বিদ্যমানতা সকলেরই অন্তরালে রহিয়াছে তরঙ্গের ভিত্তি যেমন সমুদ্র সেই রূপ বিশ্ব মমতা সকলেরই ভিত্তি। বৃক্ষ আছে, ঘট আছে, বায়ু আছে, সকলেই বলিয়া থাকে, এই বিদ্যমানতা বাদ দিলে কি হয় কেহ কি বলিতে পারে? এজন্য সৎ বা বিদ্যমানতা রূপ সাধারণ ভিত্তির কোথাও অভাব হয় না, যাহা সৎ তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম ইহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কাল ত্রয়ে আদিঅন্ত মধ্য স্থানত্রয়ে বিদ্যমান। ইহা অবিকারী। আরও যে সৎ পদার্থ দ্বারা সমস্ত দৃশ্য জগৎ পরিব্যাপ্ত তাহা অবিনাশী। এই অব্যয় সৎ বস্তুর বিনাশ কে করিবে?

অর্জ্জুন—বিনাশ কাহাকে বলে?

ভগবান্। সাধারণতঃ নাশ অর্থে (১) অদর্শন, (২) পরিবর্ত্তন। দেহ অগ্নি যোগে ভস্ম হইল, লোকে বলিল দেহ নষ্ট হইল। আবার রোগাদি দ্বারা কৃশ হইল লোকে বলিল দেহটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আত্মার অদর্শন বা পরিবর্ত্তন নাই। প্রকৃত পক্ষে দেশকাল বা বস্তু দ্বারা যে পরিচ্ছেদ তাহারই নাম নাশ। সৎ স্বরূপ ব্রহ্মে কোন পরিচ্ছেদ নাই এজন্য নাশও নাই।

অর্জ্জুন—সর্ব্বব্যাপী কিরূপ? ভগবান্—ব্রহ্মই আছেন। তিনি পরিপূর্ণ, অন্য দৃশ্য জগৎ যাহা দেখিতেছি তাহা রজ্জুতে সর্প জ্ঞান মাত্র। এই মায়ার কার্য্য। মায়াই চৈতন্যের সহিত জড়িত হইয়া মিথ্যা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি রূপ পরিবর্তন দেখাইতেছে। যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই তাহার মূলে একটা অপরিবর্তনীয় কিছু থাকে। জাগ্রত কালে চৈতন্য প্রকৃত মায়া দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় স্বপ্নকালে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে সঙ্কুচিত হইয়া মনের সংস্কার মাত্র প্রকাশ করে। সুষুপ্তিতে বাসনা সমস্ত সুপ্ত হওয়ায় তিনি আপন স্বরূপে যাইতে থাকেন। তুরীয় অবস্থায় শুদ্ধ সৎ চিৎ আনন্দে ভাসিতে থাকে। তখন সৎ নাই। কাজেই অজ্ঞান নাশ অনন্ত পরিপূর্ণ এক পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। যাহারা তুরীয় অবস্থা অনুভব করেন তাঁহারা জানেন আত্মা সর্ব্বব্যাপী।

অর্জ্জুন—ব্রহ্মকে চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ ও ত বলিতেছ। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হয় নষ্ট ও হয়? তবে জ্ঞান নিত্য কিরূপে? ভগবান্—একটা দৃষ্টান্ত লও। আমি ঘট জানিতেছি। এখানে 'আমি' কোন্ বস্তু বিচার কর। দেখিবে পরিপূর্ণ কিছু থাকিলে আমি। অনুভব থাকে না। দ্বিতীয় কিছু থাকিলে তবে আমি অনুভব সীমায় আসিবে, আমি অনুভব সীমায় আসিলেই জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি ভাসিয়া উঠে।

এই ত্রিপুটীর কোনটির অভাবে আমি অনুভব হয় না। সেইজন্য বলা হয় যেমন গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি ভঙ্গে একেবারে দৃশ্য প্রপঞ্চ স্মরণ হয় সেইরূপ বস্তু অহং ভাব আসিলেই জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী ভাসিয়া উঠে। একটু অনুভব করিতে চেষ্টা কর দেখিবে মায়া রচনা কি অদ্ভুত। তাই বলিতে ছিলাম যখন অন্য কিছু থাকে এবং তাহা হইতে পৃথক আমি এই কথা ব্যবহৃত হয় তখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সৎবস্তুকে অহং বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করে। অহং ভাসিলেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার পরিচ্ছেদ ঘটে। এই অহং বৃত্তির সহিত জড়িত

যে চৈতন্য তাহাই অহং,বৃত্তির পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও নাশ হওয়াতে উৎপন্ন হইতেছে ও নাশ হইতেছে বলিয়া বোধ হয় সেই কারণে বলা হয় জ্ঞান জন্মিতেছে ও নষ্ট হইতেছে। ফলে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি ও নাই নাশও নাই। অহং বৃত্তিরই উৎপত্তি ও নাশও ঘটে। যেমন ঘট পটাদি উপাধি নাশে তদুপস্থিত আকাশের নাশ হয় না। সেইরূপ অহং উপাধি নাশে তদুপস্থিত চৈতন্যের বা জ্ঞানের নাশ হয় না। যেমন মুখের উপাধি দর্পণ আকাশের উপাধি ঘট। সেইরূপ চৈতন্যের উপাধি অহং। আকাশ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ থাকিলেও ঘটের মধ্যে পড়িয়া পরিচ্ছিন্ন হয় বোধ হয় সেইরূপ চৈতন্য অহং বৃত্তি জড়িত হইয়া পরিচ্ছিন্নবলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান বা চৈতন্যের পরিচ্ছেদ নাই। এজন্য উৎপত্তি নাশও নাই।

আবার দেখ ঘটাদি মৃণ্ময় বস্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং মৃত্তিকাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য ঘট মৃত্তিকা রূপেই প্রস্তুত হয়। কেবল মৃত্তিকা পিণ্ডাকার ত্যাগ করিয়া ঘটাকার ধারণ করে বলিয়া উহা বিনাশ শীল। পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্তই বিনাশ। 'সৎ' বস্তুর এরূপ অবস্থান্তর হয় না। অথচ সৎ স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দৃশ্য জাত সমস্তেরই উপাদান। সৎ বস্তু বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎ রূপে পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বেও বলিয়াছি মায়া সম্বন্ধে পরিণাম বাদ প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে নহে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ঘটে সেইরূপ 'সৎ' বস্তু অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইলে অসৎ জগৎ রূপে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি। ভ্রম মায়ার কার্য্য। মায়া বা ভ্রম নাশে যে সৎ সেই সৎই থাকে। এখন বুঝিয়াছ সৎ। অবিনাশী ও অব্যয় কিরূপে অর্জ্জুন আত্মাজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী কিরূপে? আম্রোপ একটী মাধবীলতা সহকারে জড়িত হইয়াছে কখন ইহাকে কেহ দেখিতেছে না তখনও ইহাকে কেহ জানে কিরূপে?

ভগবান্—স্থূল দৃষ্টিতে বলা যায় আকাশ সর্ব্বব্যাপী। যেখানে কোন লোক নাই সেখানেও আকাশ আছে। যেখানে বলা যায় শক্তি দ্বারা সর্ব্ব বস্তু গঠিত সেই শক্তির পশ্চাতে শক্তিমান্ আছেন যাহার শক্তি তিনি সর্ব্বদা আপন শক্তি জানিতেছেন, তখন আত্মা সর্ব্বব্যাপী ইহা বলিতেই হইবে, শক্তির কার্য্য না হইলে শক্তি শক্তিমানে লীন থাকে। যেখানে শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়া থাকেন তখনই ব্রহ্মভাব। আর যেখানে শক্তির কার্য্য হইতেছে বা হইয়াছে তাহাই শক্তিমান দেখিতেছেন। এজন্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অর্জ্জুন। বুঝিতেছি পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সত্ত্বের উৎপত্তি নাশ উপচয়, অপচয়, হ্রাস, বৃদ্ধি এই ছয় বিকার নাই। ব্যয় নাই বলিয়া অব্যয়। অব্যয় বলিয়া পরিপূর্ণ—পরিপূর্ণের নাশ হইবার স্থান নাই।

ভগবান্—তবেই দেখ ভীষ্মাদির নাশ হইবে বলিয়া যে শোক করিয়াছিলে তাহা উচিত নহে। ১১ শ্লোকে তোমার শোকের বিষয় তিনটী দেখাইয়াছিলাম, দেখাইলাম আত্মার জন্য শোক হইতে পারে না। আত্মার দেহান্তরের জন্যও শোক হইতে পারে না এমন কি দেহে যে দুঃখ অনুভূত হয় তাহাও মিথ্যা, বাকি রহিল দেহ। দেহ নাশে যে শোক হইলে পারে না ইহা তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ, তবু বলি শোন।

অন্তবন্ত ইমে দেহা—আত্মার এই সমস্ত দেহ বিনাশশীল। তবে বৃথা, শোকে অন্ধ হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না, কেন? শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ।

[ক্রমশঃ]

সমালোচনা।

টাঙ্গাইল সন্তোষ প্রমথ ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল ও বারাণসী ধামের বিখ্যাত "উৎসব" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত 'সাবিত্রী পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। মহাভারতের চিরনূতন সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যানটী প্রাঞ্জল ও সুকোমল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট। হিন্দুর কাছে সাবিত্রীর কথার মত অল্পই আছে। মহাভারত অনুসরণ পূর্ব্বক নীতি ও সদুপদেশ পূর্ণ সেই কথা লিখিয়া গ্রন্থকার বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। যদিও আজকাল এরূপ ভাবের গ্রন্থের অভাব নাই তথাপি এ দুর্গতির দিনে রমণী চরিত্র গঠনের জন্য যিনি এরূপ সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষেই ধন্যবাদের পাত্র। ইহার সাংসারিক, বৈষয়িক, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতএব আজকালকার নানারূপ গ্রন্থ না পড়াইয়া আমাদের দেশের বালিকাগণকে এরূপ পুস্তক যতই পড়ান যায় ততই ভাল। রচয়িতা যে অভিপ্রায়ে সাবিত্রী রচনা করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সে অভিপ্রায় সফল হইয়াছে। কারণ বালিকাবস্থায় ও বিবাহান্তর হিন্দু রমণীগণ কিরূপ আচরণ করিলে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সহজ কথায় পুস্তকে যে সকল কথা লেখা আছে, মেয়েদিগকে সেই সকল কার্য্য নিত্য করাইতে পারিলে সংসারে তাহাদের মতি হইতে পারে। রামদয়াল বাবুর সাবিত্রী পড়িলে হিন্দু নরনারী উভয়েই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে সাবিত্রী কথার অধ্যয়নে ও অনুশীলনে কত পুণ্য আছে।

আর্য্যভূমি পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। আর্য্যভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ১।০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র। ৵০ আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়।

২। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মূল্য শেষ হইবার একমাস পূর্ব্বে নূতন বর্ষের জন্য মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৩। ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ আর্য্যভূমিতে প্রকাশ হয়। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। লেখকগণ আপনাপন প্রবন্ধের নকল রাখিবেন। অপ্রকাশিত প্রবন্ধের ফেরতের জন্য আমরা দায়ী নহি। প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

৪। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি ছত্র ৵০ আনা মাসে প্রতি কলম ২৲ টাকা। চুক্তি করিয়া দীর্ঘকালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে।

৫। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের পত্র, প্রবন্ধ এবং সমালোচ্য গ্রন্থাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আর্য্যভূমি কার্য্যালয়।
৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।
সত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক।
মাদিয়া, সাতক্ষীরা।

Registered No C. 439

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [আশ্বিন ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্. এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্,এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্. এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী; পি দত্ত F. C. S, PH. B.; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৹ আনা)

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কলিকাতা ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ৬৯নং কলেজ ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল বৈষ্ণবের আবিষ্কৃত।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

বাতবিজয় তৈল।

"আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ।"

আমাদের এই "বাতবিজয় তৈল" মালিসে সর্ব্ব প্রকার বাতরোগ অর্থাৎ প্রমেহ ও উপদংশজনিত বাত, কোমরের, কমুয়ের, হাতের কব্জির, পায়ের গাঁঠের বাত, ঝিঝিবাত, আমবাত, পক্ষাঘাত, খঞ্জ, পঙ্গু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনা, ফুলা, কন-কনানি এবং আঘাতপ্রাপ্তি জন্য বেদনা, এত সত্বর আরোগ্য হয় যে, আমাদের শাস্ত্রোক্ত মহামাষ তৈলাদি দ্বারাও সুদীর্ঘকালে, সেইরূপ ফল পাওয়া যায় না। অথচ শাস্ত্রোক্ত তৈলাপেক্ষা, কম ব্যয়ে কম সময়ে এই তৈল মালিসে বাতব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন কারণে বেদনা হইলে, এই তৈল একটু হাতে লইয়া ৫।৭ মিনিটকাল সেই স্থানে মালিষ করিলে, মন্ত্রশক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎই ব্যাধি-যন্ত্রণার উপশম হইবে।

মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ ।০।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও অম্লশূল প্রভৃতি রোগের সদ্যফলপ্রদ মহৌষধ

অম্লশূলান্তক চূর্ণ।

আমাদের অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে, অম্লজনিত বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, অয়োদ্গার, আহারান্তে বমন বা দমকা ভেদ, উদর ভার বোধ, মাথা ধরা, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ, বদ্ধতা, পেটে বায়ু জমা, মুখ দিয়া জল উঠা, বমি বমি বোধ, পেটের ভিতর চাকা মত হওয়া, এবং কোঁ, কোঁ ডুটভাট ও কলকল শব্দ হওয়া, গা গোলা মত প্রস্রাব হওয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অম্লপিত্তের উপসর্গ হউক না কেন, অম্লশূলান্তক চূর্ণ সেবনে নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হয়। যে রোগী অসহ্য বেদনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া দিন, দেখিবেন শান্তভাবে ঘুম পড়ার ন্যায়, তখনই, ব্যাধিযন্ত্রণার উপশম বোধ হইবে। মূল্য ছোট শিশি ॥০ আনা, বড় শিশি ১৲ মাঃ ।০ আনা।

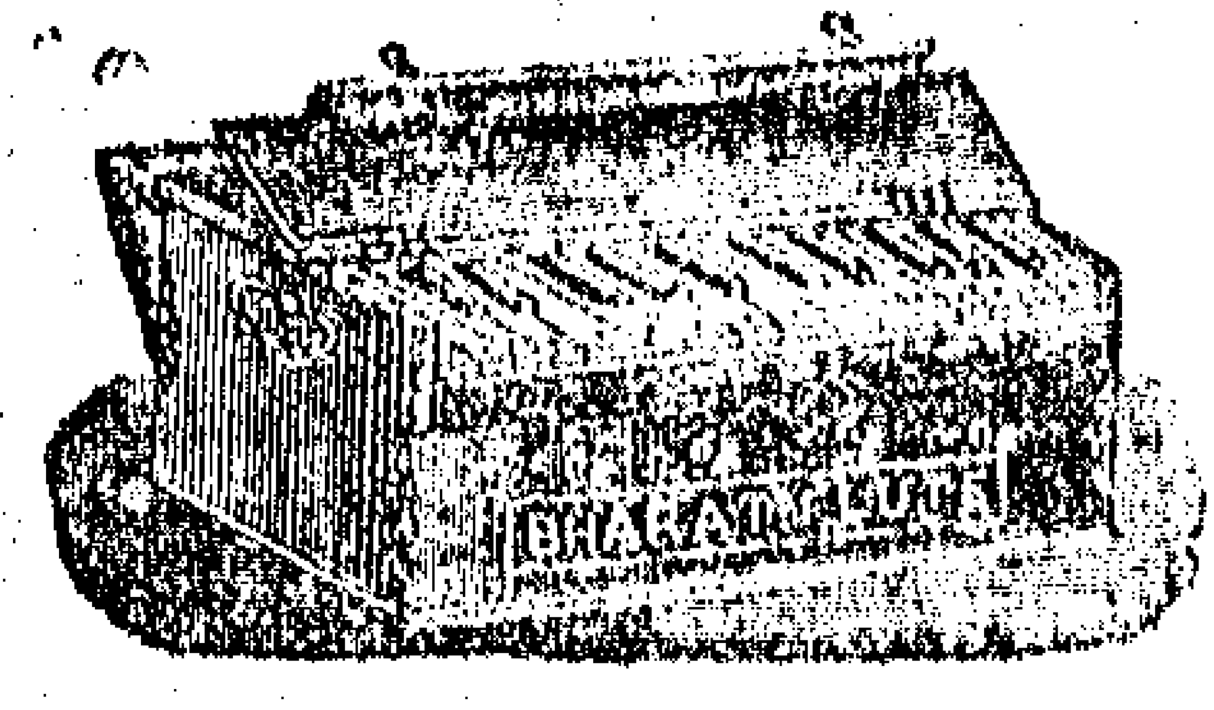
প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য স্বপ্নদোষ, গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ ধাতুভঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর প্রভৃতি রোগের মহৌষধ

স্বাস্থ্য সঞ্জীবন রসায়ণ।

(১মাস সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য। মূল্য ২৲ টাকা)

এই ঔষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া এবং তদুপসর্গ মূত্রনালীতে ক্ষত ও প্রদাহ, প্রস্রাবের সময় অসহ্য জ্বালা, যন্ত্রণা টন্-টনানি, সপূঁয ধাতু নির্গত হওয়া, কাপড়ে হলদে বা সাদা দাগ লাগা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হওয়া স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতু যাওয়া বা পড়া, কিম্বা পাড়গোলা মত প্রস্রাব হওয়া, বাহ্যে যাইবার বেগ দিলে, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া শুক্রনির্গত হওয়া স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্রে শুক্র স্খলন বুক ধড়ফড় করা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, মাথা ঘোরা সর্ব্বদা মনে দুশ্চিন্তা লাগিয়া থাকা, অল্প হজম, ক্ষুধা বোধ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই ঔষধ সেবন করিলে, অচিরে সমস্ত উপসর্গ দূর হইবে, শরীর সুস্থ এবং শিথিল ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে ইহার ন্যায় ধাতুপুষ্টিকারক ও বলবীর্য্যবর্দ্ধক মহৌ-

বন্দে মাতরম্।



৪ বৎসর গ্যারেণ্টি

ভারত ফ্লুট হারমোনিয়ম।

(স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত)

ঈশ্বর অনুগ্রহে ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের কালে আমাদের "ভারত ফ্লুট" হারমোনিয়ম উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়াছে কারণ মনমুগ্ধকর স্বর, সুন্দর গঠনপ্রণালী ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব-গুণে সকলেই ইহার সুখ্যাতি করেন। ইহা উৎকৃষ্ট উপাদানে ও সেগুণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একারণ সহজে জল বায়ুর দোষে নষ্ট হয় না। আমাদের এই হারমোনিয়ম যিনি একবার ক্রয় করিয়াছেন তিনিই ইহার গুণে মোহিত হইয়াছেন ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে ইহা ক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের সানুনয় প্রার্থনা—সঙ্গীত অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অন্যত্র হারমোনিয়ম ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের সুবিখ্যাত "ভারত ফ্লুট" হারমোনিয়ম একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

মূল্যাদি।

১ সেট	৩৭ রিড	৩ অক্টেভ	৩ ষ্টপ	মূল্য	২৫৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৩ ঐ	”	৩০৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৩ ঐ	”	৩৫৲
১ ঐ	৩৭ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	”	৪০৲
২ ঐ	৭৮ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	”	৪৫৲
২ ঐ	৭৪ ঐ	৩ ঐ	৪ ঐ	”	৫৫৲
২ ঐ	৮৪ ঐ	৩॥ ঐ	৫ ঐ	”	৬০৲
৩ ঐ	১২৬ ঐ	৩॥ ঐ	৭ ঐ	”	১২০

দাস ব্রাদার্স।—১৩ নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, মির্জাপুর ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

দাঁত থাকিতে দাঁতের যত্ন করুন্।

নিশান মার্কা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী দন্তমঞ্জন থাকিতে আপনি কেন অপকৃষ্ট জিনিষ ব্যবহার করেন? ইহার গুণ যেমন অধিক, মূল্যও তদ্রূপ অল্প। একদিন ব্যবহারেই প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন আর কখনও প্রস্তুত হয় নাই। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দন্তমঞ্জনের গুণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশংসাপত্র।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ মহোদয় বলেন যে "আমি বি দাসের টুথ-পাউডার ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। ইহা-দ্বারা মাড়ির ক্ষতশীঘ্রই আরোগ্য হয়।"

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল

সেকসনের কিউরেটার শ্রীযুক্ত ডি, হুপার মহোদয় বলেন যে "আমি বাবু বি, দাস কর্ত্তৃক প্রস্তুত টুথ পাউডার রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম যে ইহা দন্তরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নির্দ্দোষ উপাদান সমূহ দ্বারা প্রস্তুত এবং অত্যন্ত সুগন্ধ।"

মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা।

ঠিকানা—বি, দাস। ৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান টুথ প্রিজার্ভার।

যাবতীয় দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ॥০।

এজেণ্ট—এ, এম, জান।

প্রোপাইটার স্বদেশী সিগারেট কোম্পানী ১২নং কলুটোলা ষ্টিট।

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা।

স্ত্রী পুরুষের রজঃ সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষ তজ্জনিত মেহ প্রমেহ স্বপ্নদোষ ও ধাতু দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি ব্যাধিসমূহ নির্ম্মূলকরণক্ষম এবং শক্তিসঞ্চারক অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য ৩২ বটিকায় এক কৌটা এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা পুলিসকোর্টের মোকর্দ্দমা হইতে নির্ম্মুক্ত, উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত

কামশাস্ত্র।

বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় প্রস্তুত আছে। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে বিনামূল্যে ও ডাকমাশুলে পাইবে।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

১৬৬—৬৮ হ্যারিসন রোড কলিকাতা।



"গোলাপ-গন্ধ" সুবাসিনী তৈল।

ইহার মনোহর মিষ্টগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক ; ইহা তিল তৈলে প্রস্তুত বলিয়া মস্তিষ্ক শীতলকারী।

মূল্য ৩ আউন্স শিশি	||৶০	প্যাকিং ৵০ ডাঃ মাঃ	।০
৮ " "	১৶০	" ৶০ "	।৶০
" ২৪ " "	৩৲	" ।০ "	৷।০

স্বদেশী এসেন্স ও পারফিউমারি।

এসেন্‌স বোকে—বিলাতী এসেন্স "কাশ্মীর" বোকে হইতেও উৎকৃষ্ট ১।০

ভিক্‌টোরিয়া রোজ—উৎকৃষ্ট বসোরা গোলাপের গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১৲

নৈশ সুন্দরী—নানা জাতীয় পুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ বহুদিন স্থায়ী ১।০

কাশ্মীর কুসুম—নূতন ধরণের মনোহর গন্ধ ৸০

হোয়াইটরোজ—সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ ৸০

ডামাস্করোজ—ডাস্কস দেশীয় গোলাপের গন্ধ ৸০

এসেন্‌স রজনীগন্ধা—সদ্য প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধের স্থায়ী গন্ধ ৸০

বকুল—স্থায়ী প্রস্ফুটিত বকুলের গন্ধ বড় শিশি ||৶০ ছোট শিশি ।৶০।

খস্—গ্রীষ্মকালের বিশেষ উপযোগী বহুক্ষণ স্থায়ী ৸০



কামিনী-কুসুম—প্রস্ফুটিত কামিনী পুষ্পের গন্ধ ৸০

গন্ধরাজ—প্রস্ফুটিত গন্ধরাজ পুষ্পের স্থায়ী গন্ধ ৸০

চেরি—চেরিরসের ন্যায় স্থায়ী গন্ধ ৸০

জেস্‌মিন—প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের স্থায়ী গন্ধ ||০

কুমুদিনী—সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের স্থায়ী গন্ধ ৸০

টগর—স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৵০

সেফালিকা—বহুক্ষণ স্থায়ী মিষ্ট গন্ধ ।৶০

হেনা—স্থায়ী হেনার গন্ধ ৸০

চম্পক—প্রস্ফুটিত কনক চম্পকের স্থায়ীগন্ধ ৸০

চামেলী—সুমিষ্ট ও ঠাণ্ডা স্থায়ী গন্ধ ৸০

ভুল না আমায়— ১৲

বেলা—বেলফুলের গন্ধ ৸০

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—সর্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ||৶০

অডিকলোন— ||০

কারখানা—৩৮, ৩৮।১ মসজিদ্‌বাটী ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

—(*)—

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৪ সাল [৬ষ্ঠসংখ্যা।

মহামায়ার আগমন।

আবার প্রাবৃটের ঘনধারা অপসৃত হইল। ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন বিদ্যুৎচকিত সন্ত্রাসিত ধরণীর বিষাদ-মলিনবদনে আবার হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসিত হইল। শারদ-চন্দ্রিকা-বিধৌত প্রকৃতির প্রফুল্লমূর্ত্তি আবার ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইল।

মায়ের শুভাগমনের দিন সমাগত প্রায়। কোটী কোটী নরনারী প্রীতি-বিস্ফারিত লোচনে জননীর আগমন-পথ প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতেছেন। দিবাভাগের ধূলিখেলা সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে শিশু যেমন ব্যাকুল প্রাণে মায়ের সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহার সুখ দুঃখের কথা জননীকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়, বঙ্গের নরনারী সংবৎসর পরে সুদীর্ঘ বৎসরের জয় পরাজয়ের আনন্দ নিরানন্দের কাহিনী জগজ্জননীর শ্রীপদে নিবেদন করিবার জন্য তেমনই ব্যাকুল হইয়াছেন।

মা দুর্গা আসিয়াছেন। প্রতি পত্র মর্ম্মরে, প্রতি বাত হিল্লোলে, প্রতি পতত্রীর স্বরে—সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে,—মা আসিয়াছেন। ধরাতলে, নভঃস্থলে, অনিলে, সলিলে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখ —মা আসিয়াছেন।

অয়ি রিপুদলবারিণি, শক্তিময়ি জননি, ঐ দেখ ভগ্নমন্দিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তোমার লাঞ্ছিত পুত্রগণ "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এস মা শিব-সীমন্তিনি, সিদ্ধিদাত্রি জননি, তুমি তাহাদের প্রাণে অযুত মত্তমাতঙ্গের বল প্রদান কর, তাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া প্রসন্নবদনে সমস্ত সহ্য করুক। মা অন্নদে, ঐ দেখ অন্নাভাবে শীর্ণ সন্তানগণ "অন্ন দে" "অন্ন দে" বলিয়া কাঁদি-

তেছে। মা তোমার কর্ণে কি ঐ ক্রন্দনের গগন-বিদারী রোল প্রবেশ করে না? অন্নপূর্ণার পুত্র-কন্যাগণ কি "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে? মা, তোমার ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়া সন্তান প্রতিপালন কর। মা, বাঙ্গালী কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া তোমার অর্চনা করিতেছে, কত দিনে এই পতিত জাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে? কবে তুমি এই পরাধীন জাতির ভালে বিজয়তিলক পরাইয়া দিবে? মা, বাঙ্গালী তোমার নাম করিতে করিতে এবার যেন কি এক নূতন আশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। মা, তুমি কি বাঙ্গালীর হৃদয়ে এই নূতন আশা জাগাইয়া তোল নাই? বাঙ্গালী হৃত-সর্ব্বস্ব দীন ভিখারী হইয়াও এবার আশায় বুক বাঁধিয়া পৃথিবীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাই বলিতেছি—এবার আট কোটী কণ্ঠের কাতর চীৎকার তোমাকে অধীর করিয়া তুলিবে।

মা!—কি মধুর নাম! যাহার মা নাই, জগতে তাহার কেহ নাই,—সেই মা—স্নেহময়ী করুণাময়ী মা—সেই অমৃতময়ী মাধুরীময়ী মা—আমার একার নহে,—কোটী কোটী সন্তানের মা—আনন্দময়ী, মা, ত্রাহি ত্রাহি।

মায়ের করুণাশ্রুপ্লাবিত স্নেহময় উৎসঙ্গে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া শান্তিলাভে অভিলাষী—পীড়িত সন্তান মুমূর্ষু শয্যায় মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যগ্র। এস মা বিজয়ে সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শীতাতপ-বর্ষা-বিক্ষোভিত দৈত্য দানবের চরণ তাড়নায় সমস্ত বঙ্গের বক্ষে তোমার চরণারুণের শুভ চিহ্ন অঙ্কিত কর! সম্বৎসর ধরিয়া, মা আমরা সাশ্রুনয়নে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া আছি। এস মা, আজ তোমার আট কোটী সন্তানের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তাহা-দিগকে কৃতার্থ কর।

মা মধুকৈটভনাশিনি, মহিষাসুর-মর্দ্দিনি, শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিসূদনি মা! যে রূপে তুমি অসুর প্রপীড়িত দেবগণকে অভয় দান করিয়াছিলে, আজ তোমার এই অকৃতি অধম সন্তানগণকে একবার সেই রূপে দেখা দাও! সর্ব্ব বিপদবিনাশন মাতৃপদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইতে ইচ্ছুক; এ সময়ে মা তুমি না আসিলে মা নামে যে কলঙ্ক হইবে! এ দুর্দ্দিনে, এ সঙ্কটে, এ বিপদে আমা-দিগকে তোমার অভয় কোলে স্থান দাও। অভয়া! যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দুর্গমনামা মহাসুরকে বধ করিয়া দুর্গা নামে প্রখ্যাতা হইয়াছ, সেই শতাক্ষী শাকম্ভরী মূর্ত্তি আর একবার ধারণ কর মা! যে রূপে তুমি রাজ্যচ্যুত শত্রুপ্রপীড়িত দুঃখক্লিষ্ট সুরথ রাজাকে অভয় দিয়াছিলে, যে রূপে রাজ্যভ্রষ্ট হৃতদার রামচন্দ্রকে অভীষ্ট বরদানে চরিতার্থ করিয়াছিলে যে রূপে দাক্ষিণাত্যে এক সামান্য জমিদার-তনয়কে ছত্রপতি রূপে পরিচিত করিয়াছিলে, আর একবার সেই রূপে আমাদের দেখা দাও মা!

তাই বঙ্গবাসি! ভক্তের প্রাণ ফাটিয়া যে অমিয়-মাখা "মা" নাম নিঃসৃত হয়, তাহা সপ্তলোক ভেদ করিয়া অনন্ত লোকে অনন্তকাল গভীর নাদে নিনা-দিত হইতে থাকে। প্রাণের কর্ণে যে তাহা একবার শুনিয়াছে—সেই পাগল হইয়াছে। তাই বলি ভাই! সকল ছাড়িয়া, সকল ভুলিয়া "মা মা" করিয়া কেবল জগৎকে মাতাইয়া তোল। এস, এস ভাই! সুখী দুঃখী, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, এস ভাই! ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, দেব দানব, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, ভূত প্রেত, এস, এস! সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, নদ নদী, পর্ব্বত অরণ্য, সমুদ্র ভূমি, পুষ্প ফল, তৃণ পত্র, এস ভাই! শৈব শাক্ত, দণ্ডী বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য, এস ভাই! গৃহী, সন্ন্যাসী,

সাধু দস্যু, ভক্ত ভণ্ড, পিশাচ পাষণ্ড, আমার মায়ের ছেলে যে যেখানে আছে এই মহাশক্তির মানসী পূজা বা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ধন্য হও। স্বদেশপ্রাণ ও স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃবৃন্দ! বিশ্বজননীর কৃপালাভ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য ধন প্রাণ দেহ সম্পত্তি সমস্তই নিয়োজিত কর। মা বিশ্বেশ্বরী আমাদের ও স্বদেশের হিতসাধন করুন। আর একবার সকলে মিলিয়া সমপ্রাণে সমস্বরে হৃদয় ভরিয়া প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে একবার মনের সাধ মিটাইয়া "মা" "মা" বলিয়া ডাকি, এস ভাই! মান অভিমান, বিবাদ বৈষম্য, জাতি বর্ণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শ্রেণী সম্প্রদায় ক্ষণেকের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়া পরস্পরে প্রাণের সম্বন্ধে মিলিত হইয়া আজ বৎসরকার দিন একবার সকলের একমাত্র জননী মা ব্রহ্মময়ীর পূজা করিয়া পবিত্র প্রেমালিঙ্গনে পরস্পরের প্রতি প্রীতি করি, এস ভাই! অতীতের শোক সন্তাপ সমস্ত বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া মা নাম-সুধাসমুদ্রে ঝাঁপ দিই।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

—*—

"দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর দ্বারে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদি'পরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

১৭৫৪ শকাব্দার ১০ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার সমস্ত জগতবাসীর পক্ষে একটী মহা-শুভদিন হইয়াছিল। এই দিনে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরে জগতের মঙ্গলের জন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে হুগলীজেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুর গ্রামে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে—'দুখিনী ব্রাহ্মণীর' কোলে—এক মহাপুরুষের উদয় হইয়াছিল।

যে মুহূর্ত্তে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তখন পূর্ব্বাকাশে প্রধান পাঁচটী গ্রহের সহিত সায়ন মীনরাশির ২০ অংশ উদিত হইতেছিল। এইরূপ লক্ষণ যে মহাপুরুষের আবির্ভাবসূচক তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। উক্ত সময়ের সায়ন গ্রহস্ফুট নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রবিস্ফুট রাশ্যাদি ১১।১।১৪
চন্দ্রস্ফুট রাশ্যাদি ১১।৫।০
মঙ্গলস্ফুট রাশ্যাদি ২।৬।২০
বুধস্ফুট রাশ্যাদি ১০।২২।১০
বৃহস্পতিস্ফুট রাশ্যাদি ০।২।৬
শুক্রস্ফুট রাশ্যাদি ০।১৬.৫৪
শনিস্ফুট রাশ্যাদি ৫।২৬।২৯ বক্রী
রাহুস্ফুট রাশ্যাদি ৩।২২।২১
কেতুস্ফুট রাশ্যাদি ৯.২২।২১

উক্ত গ্রহসন্নিবেশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জন্মসময়ে রবি, চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতির বিশেষ প্রাবল্য আছে এবং রবি ও চন্দ্র মীন রাশিতে অবস্থানহেতু এবং উক্ত রাশিই লগ্ন হওয়ায় জাতকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। রবি ও চন্দ্রসহ মীন রাশির উদয় ধর্ম্মপ্রাণতা বোধক। এই জাতকের হৃদয় নবনীত ন্যায় কোমল, সদা ভাবরাজ্যে বাসপ্রিয়, এবং ইচ্ছাশক্তি অপরিমিত অতুল বলশালী। বাস্তব-জগতের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধর্ম্মানুচরণে—ঈশ্বরের মহিমানুসরণে উৎসর্গীকৃত। বুধ দ্বাদশস্থ হইয়া উচ্চরাশিস্থ—

সন্ন্যাস বিষয়, গুপ্ত বিষয় যাহা সাধারণ লোকের বিচারেই বোধগম্য হইবার নহে, সে সমস্ত বিষয় সহজে সরলভাবে অন্যকে বুঝাইবার শক্তিজ্ঞাপক। পূর্ব্বে বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনায় আর্য্যঋষি নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাস-যোগের লক্ষণ বলিয়াছি *। সেই লক্ষণ এস্থলেও বিদ্যমান আছে। কেন্দ্রে চারিটী বলবানগ্রহ এবং দশমাধিপতি নবমাধিপতির ক্ষেত্রে ও নবমাধিপতি কেন্দ্রে, এই সমস্ত লক্ষণ সন্ন্যাস-যোগ সূচক।

এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই তাঁহার জন্মশকাব্দার ভ্রম দৃষ্ট হয়। উক্ত জীবনী লেখকেরা ১৭৫৬ শকাব্দা নিরূপিত করেন। কিন্তু ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন বুধবার হয় না এবং শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিও হয় না। আমাদের নিরূপিত ১৭৫৪ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুনই বুধবার শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি হয়। ইংরাজী তারিখ ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুর গ্রামে একজন অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও তপঃ প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীও অতিশয় দয়ার্দ্রহৃদয়া ও সদ্গুণসম্পন্না ছিলেন। একদা গয়াধামে ক্ষুদিরাম স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মুর্ত্তিকে স্বীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিতে শুনিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ক্ষুদিরামের তিনটী পুত্রসন্তান তন্মধ্যে, সর্ব্বকনিষ্ঠই এই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ। ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস জন্মগ্রহণেই। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহার যে শক্তির জন্য প্রতিপত্তি বাল্য-জীবনে তাঁহার সেই শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি। ক্ষণজন্মা রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন; দিন দিন শশি কলাসম বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে পিতা ক্ষুদিরামেরও ভাগ্য-শ্রী সম্বর্দ্ধিত হইল। ক্ষুদিরামের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ করিল; সুতরাং ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে একটু লক্ষ্মীশ্রীও দেখা দিল। পাড়ায় রব উঠিল,—"চাটুয্যেদের বাড়ীতে পয়মন্ত ছেলে জন্মিয়াছে।" "পয়মন্তের" প্রতিপত্তি রামকৃষ্ণের বাল্যকাল হইতে। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিবাসীর প্রীতিপাত্র।

* আ। ভূমি ৮৮ পৃঃ।

রামকৃষ্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঠাকুর দেবতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকায় ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে ভক্তাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের গ্রামের লাহাবাবুদের একটী অতিথিশালা ছিল। সেখানে নানাবিধ অতিথি আসিত। বালক রামকৃষ্ণ, তাহাদিগের নিকট গিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন শুনিতেন। তাঁহার মেধাশক্তি এত প্রবলা ছিল যে তিনি যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর কখনও বিস্মৃত হইতেন না। সে সময় গ্রামে, গ্রামে ভারতাদি পুরাণ পাঠ, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কথকতা যাত্রা প্রভৃতি হইত, বালক রামকৃষ্ণের এ সকল, শুনিয়া শুনিয়া এত কণ্ঠস্থ হইয়াছিল যে তিনি, কথকের ন্যায় নিজেই অনর্গল বলিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এত মধুর গান করিবার ক্ষমতা ছিল যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সংগীত শ্রবণ, করিত সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সংসারের সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্কন্ধে পড়িল। তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালে প্রেরণ, করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিয়া কি করিব? তাহার ফল ত কেবল চাল কলা; এমন বিদ্যা আমি শিখিব, না।" ভ্রাতার বিদ্যাশিক্ষায় এরূপ অনাসক্তি দেখিয়া

নিজে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় নিজের চতুষ্পাঠীতে লইয়া আসিলেন।

রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলেন, তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহার বিবাহের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদের গ্রামের নিকটস্থ জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা সারদামণি দেবীর সহিত উদ্বাহক্রীয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহ হইল বটে, কিন্তু স্ত্রী যে কি বস্তু, বিবাহ কি, ইহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। আজীবন তিনি কখনও স্ত্রী স্পর্শ করেন নাই। ইহাও তাঁহার কোষ্ঠীতে গ্রহসন্নিবেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সপ্তমস্থান পত্নীবোধক। এই স্থানে কুগ্রহ শনি বক্রী হইয়া অবস্থিত। সপ্তমাধিপতি বুধ দ্বাদশস্থ, সুতরাং জীবনে কখনও দাম্পত্যভাব বা স্ত্রীসহবাস সূচিত হয় না—সংসার হইতে নির্লিপ্ত বুঝায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উত্তরভাগে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে জানবাজার নিবাসিনী বিখ্যাতনামা মাড়-কুল-গৌরবা রাণী রাসমণি একটী কালীমন্দির স্থাপনা করেন। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই দেবালয়ের দেবলরূপে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণও এই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁহাকেই তাঁহার ভ্রাতার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।

কালীপূজায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিভাবের উদয় হইল। তিনি সর্ব্বদাই কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সরোদনে বলিতেন, "মা তুই ত জগতের মা, আমি শাস্ত্র জানি না, পণ্ডিত নহি, অবোধ সন্তান, আমাকে দেখা দে।" ক্রমে তাঁহার মুখে "মা, দেখা দে" ব্যতীত আর কোন কথা কেহ শুনিতে পাইত না। পাগলের মত, সমস্ত দিবারাত্রি "মা দেখা দে" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যখন নদীতে বান আসে, নদীদ্বয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি যখন নদীর দুইটী পার্শ্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন অগাধ জলরাশি উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না, অপ্রতিহত-প্রভাবে আপনার বলে আপনি চলিয়া যায়। ভক্তিপ্রবণ হৃদয়েরও এই অবস্থা। হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, ভক্তি চারিদিকের বাধা বিঘ্ন, পাপ প্রলোভন না মানিয়া, আপনার মহালক্ষ্য পথে চলিয়া যায়। ভক্তিবলে রামকৃষ্ণ জগদম্বার অনুগৃহীত হইলেন। প্রায় ছয় মাস পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মবীর রামকৃষ্ণের অগ্রে ঈশ্বর-দর্শন, পরে সাধন-কার্য্য আরম্ভ হয়।

এইবার তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করিবার জন্য সাধনা করিলেন। ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু যে ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া জগতের সুখ দুঃখ, জীবনের নানাসংগ্রাম সকলই উপেক্ষিত হয়, কেবল অন্তরে তাঁহার আরাধ্য দেবতা অন্তর আলোকিত করিয়া জ্যোতিতে সদা প্রকাশিত থাকেন, যে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভক্ত আত্মহারা, —সে ভক্তি চির অপরাজিতা, নিত্য মহাবলশালিনী, সুতরাং তাহার বলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ সাধক রামকৃষ্ণের সুখসাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একটী যোগিনী ও একজন সন্ন্যাসীর আগমন হয়, তাঁহাদের নিকট হইতে রামকৃষ্ণ যোগাভ্যাস শিক্ষা করেন, এবং মনের একাগ্রতা বশতঃ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে অতি অল্প দিনে যোগের চরমা-

বস্থা নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার শরীর একটু হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল ও রূপ লাবণ্যে দিক্ আলোকিত করিত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য একখানি মোটা উত্তরীয় বসন দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিতেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এইবার পরমহংসদেব সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি ভগবানের আরাধনার জন্য কখনও রাধিকা ভাবে, কখনও শ্রীদাম সুবলাদির সখ্যভাবে কৃষ্ণের উপাসনা, মহম্মদীয় ভাবে উপাসনা, খ্রীষ্টিয়ভাবে উপাসনা, এমন কি ভারতবর্ষের প্রচলিত অনেক প্রকার সম্প্রদায়দিগের মতে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক উপাসনার ফল একই হইল। প্রত্যেক ভাবের উপাসনাতেই তাঁহার নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ হইত। প্রত্যেক বিভিন্ন ভাবের উপাসনায় যে ভগবানকে পাওয়া যায় তাহা তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব সর্ব্বধর্ম্ম সাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখন বিনা পরীক্ষায় কোন মত প্রকাশ করিতেন না। তিনি সমুদয় ধর্ম্মপ্রণালী সাধন দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব ও ভক্তি বা লীলাতত্ত্ব এই দুইভাগে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, "এক ঈশ্বর তাঁহার অনন্তশক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্রভাব এবং স্বতন্ত্ররূপ। মনুষ্যগণ এক জাতি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ কাহার সহিত সমান নহে। কিম্বা যেমন কোন পুষ্করিণীর চারিটী ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জলপান করিতেছে। এক জলাশয়ের চারিটী ঘাট, এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জলপান করিলেও কাহারও দোষ হইতেছে না কিম্বা কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অথবা গঙ্গায় কত বিভিন্ন জাতি স্নান করিতেছে, জলপান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছামত ঘাটও নির্ম্মাণ করিতেছে। হিন্দুর ঘাট, মুসলমানের ঘাট, সাহেবদের ঘাট প্রভৃতি কত ঘাট রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীয় গঙ্গার কি পরিবর্ত্তন হয়? সেই প্রকার, এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে কোন দোষ হয় না।"

রাসমণির জামাতা মথুরনাথ বিশ্বাস কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে রামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে রামকৃষ্ণের অসাধারণ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিতেন ও দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। এই সময়ে তিনি মথুর বাবুর সঙ্গে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইবার তাঁহার প্রধান কার্য্য আরম্ভ হইল। ভগবান রামকৃষ্ণ বোধ হয় জগতে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ লাগিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে লোকে আপনাকে শিক্ষিতম্মন্য ভাবিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে লোকে জড়বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির কেবল স্থূল-কার্য্য-কলাপ অবলোকনে

চমৎকৃত ও অন্তর্দৃষ্টিশূন্য হইয়া এক ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূচনা আনিয়াছিল। বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশে ঘোরতর সমাজবিপ্লব ও শিক্ষাসংস্কার চলিতেছিল। ইংরাজী শিক্ষায় আলোচনায় লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। বঙ্গমাতা তখন কয়েকটী দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন রত্ন লইয়া ক্রোড় উজ্জ্বল করিতেছিলেন। সে সময়েরাজা রাজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে "মেঘনাদ" রচনা করিয়া মধুসূদন লোকের নিকট উপহাসাস্পদ। কবিবর হেমচন্দ্র অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দান ও সাধারণের নিকট মাইকেলের গৌরববর্দ্ধন করিতেছিলেন। পরিহাসরসিক দীনবন্ধুর অমর নাটক "নীলদর্পণ" নীলকরদিগের দর্পনাশ করিতে উদ্যত। রাজ-অন্নে প্রতিপালিত পাদরী মহাশয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যীশুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, নিরক্ষর হিন্দুদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। তন্নিবারণে দয়ানন্দের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা ও আর্য্যসমাজ স্থাপন। আবার, রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার কল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রের ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। সে সময় ইংরাজি শিক্ষিত অনেক নব্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন। অন্য দিকে, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর হিন্দুবালবিধবার বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া, শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনে প্রবৃত্ত। দেশের এইরূপ অবস্থার সময় ভগবান রামকৃষ্ণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। আজ সেই আলোকের জ্যোতিতে সুদূর মার্কিন রাজ্যও উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর উপদেশ শ্রবণ, এবং ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞাত হইতে নিত্য শতসহস্র লোক দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইত। অনেক শিক্ষিত সংশয়বাদী লোক তাঁহাকে বহুপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া শেষে তাঁহার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া শান্তিলাভ করিত। বহু দিবসের অন্ধকার গৃহে যেমন একবার আলো জ্বালিলেই তাহার চিরসঞ্চিত অন্ধকার দূরীভূত হয় তদ্রূপ তাঁহার সংস্পর্শে কত অজ্ঞানান্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয় এক দিনেই জ্ঞানালোকে বিভাসিত হইয়াছিল। দয়ার অবতার পরমহংসদেব যে কত নরপিশাচকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মার মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও অনেক শিক্ষিত ও বিখ্যাতলোক পরমহংসদেবের উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। পরমহংস হইতে কেশবচন্দ্র সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা, এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হন। পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সরস করিয়া ফেলে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। এই কণ্ঠরোগই তাঁহার লীলা সম্বরণের কারণ হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার উপদেশের বিরাম ছিল না। এ উপদেশ কেবলমাত্র শব্দযোজনা নহে, প্রাণের কথা। যে একবার শুনিত সে আর ভুলিতে পারিত না, তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে চিত্ত সমুদ্ভাসিত হইত।

সন ১২৯৩ সাল ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ১ ঘণ্টা ৬

মিনিটের সময় পরমহংসদেব সহসা সমাধিস্থ হইলেন। সেই সমাধিই তাঁহার মহাসমাধি হইল। ধীরে, ধীরে, নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে, কুসুম-কুসুম বাস সঞ্চিত সুগন্ধি পবনে মহাপুরুষের আত্মা চিদ্ঘন সচ্চিদানন্দ পদপদ্মে লীন হইল।

আজ ভারতে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য সকলে ব্যস্ত। এই মহাপুরুষের উপদেশ যে, জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের উৎকর্ষ করিতে হইবে, ধর্ম্মবল না থাকিলে উন্নতি হইতে পারে না। মনুষ্যশক্তি সীমাবদ্ধ, এই ক্ষুদ্র শক্তিতে কতদূর উন্নতি হইতে পারে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, ভক্তের ভগবান, তিনিই ভক্তের রক্ষা করিবেন।

আমরা আশা করি মহাপুরুষের বাক্য অন্যথা হইবে না। এমন সময় আসিতেছে যে দিন তাঁহার প্রজ্বলিত ক্ষীণ আলোকরশ্মিরেখা সমস্ত দিক্দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী, F. C. S.

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিম্বিসার নরপতির রাজত্বকালে রাজগৃহে জৈনদিগের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। এইখানেই জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর প্রাদুর্ভূত হন এবং অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রতের অনুষ্ঠানই মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, বৌদ্ধধর্ম্মের এই সার মত প্রচার করেন। রাজগৃহ তীর্থঙ্কর মহাবীরের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই জৈনগণ পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বিপুল নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে জৈনদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব ও মুসলমানদিগের উৎপীড়ন বশতঃ এই স্থান হইতে জৈনগণ তিরোহিত হন এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন আধিপত্যের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় নাই। মুসলমানগণ হীনবীর্য্য হইলে পর জৈনগণ পুনরায় রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বৈভার, বরাহ, বৃষভ, ঋষি ও চৈত্যক নামক পঞ্চ পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বহুল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জৈনদিগের এই সকল মন্দির কাননাবৃত গিরিপৃষ্ঠে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত; মন্দিরগুলি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত। জৈনগণ প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষগুলি সবিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্মের আধিপত্য ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বিম্বিসার নরপতি এবং বৈভার পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী জনসাধারণ বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উক্ত পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গমন করিতেন। নূতন রাজগৃহে সহরের দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুইটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশোক পুরাতন রাজগৃহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। এবং সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু যখন অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তখন হইতে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের হ্রাস হইতে লাগিল। কয়েক শতাব্দীপর শুঙ্গ ও মিত্র বংশীয় নরপতিগণের উত্থানের সহিত পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে পর, রাজগৃহের ব্রাহ্মণগণ তথায় পৌরাণিকধর্ম্ম প্রচারের জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে

বৌদ্ধদিগের মন্দিরাদি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মগধের গুপ্ত নরপতিগণের সহায়তায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরায় এইরূপ যুগ স্তর উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণদিগের একটী দেবালয় পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত না। খৃষ্ট পর ৬০০ অব্দে কণৌজে যশোবর্ম্ম নরপতির উত্থানে এবং গৌড়ে আদিশূরের পরাক্রমে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করেন। মগধের বৌদ্ধ পালবংশীয় নরপতিগণের তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণদিগের উপর সহানুভূতি ছিল তৎকারণ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা বহুল পরিমাণে হইয়াছিল। এবং কালক্রমে জৈন ও বুদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল।

বখতিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বেহার বিজয়ের পর মুসলমান ফকীরগণ রাজগৃহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মধ্যে পীর মুকুন্দ সাহ বেহারে সুপ্রসিদ্ধ আছেন। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ডে বাস করিতেন এবং বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জনসাধারণের চিত্ত ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড বিপুল পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত এবং পীর মুকুন্দ সাহের নামানুসারে পরিশেষে মুকদাম কুণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছিল। মুকদাম কুণ্ড এক্ষণে মুসলমানগণের বিশেষতঃ মুসলমান ফকীরগণের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিসমূহের অনেক ধ্বংশাবশেষ এক্ষণে মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন সহরের উত্তরাংশে প্রায় ৩০০ হস্ত দূরে কালন্দাবিহার। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে এবং শ্রমণগণ এই স্থান পরিষ্কার রাখেন এবং জল সিঞ্চন করেন। সহরের উত্তর তোরণের বহির্ভাগে একটী স্তূপ আছে এইখানে দেবদত্ত ও অজাতশত্রু উভয়ে মিলিত হইয়া একটী মদমত্ত হস্তীকে বুদ্ধের বধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তেজ প্রভাবে মত্ত হস্তীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। এই স্থানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্তূপ আছে এইখানে শ্রীপুত্র অশ্বজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে উত্তর দিকে একটী গভীর খাত আছে। ইহার পার্শ্বে একটী স্তূপ আছে এখানে শ্রীগুপ্ত বুদ্ধের বিনাশসাধনার্থ একটী গর্ত্তের অভ্যন্তরে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অগ্নিময় গর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্তূপ আছে এখানে চিকিৎসক জীবক একটী সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উত্তর তোরণ হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে করন্দবিহারের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। করন্দবিহারের পূর্ব্বদিকে একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপ বৌদ্ধের সম্মানার্থ অজাতশত্রু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুইটি ক্ষুদ্র সন্তবরন আছে। রাজগৃহের দক্ষিণে এবং উদয়গিরির পার্শ্বে জরাসন্ধের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

ঊষা।

—(*)—

শ্যামল শাদ্বল পূর্ণ প্রশান্ত প্রান্তর,
নিহার নিচয় শোভে মুকুতা নিকর।
পুষ্পের সৌরভ ভার করিয়া হরণ
শান্তভাবে বহিতেছে স্নিগ্ধ সমীরণ।

মৃদু মন্দ সুখে কিবা মৃদুল পবনে,
তরুলতা নমিতেছে ঈশ্বর চরণে।
বালরবি ছবি কিবা শোভিত গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করি রক্তিম বরণে।
আঁধার নাশিয়া পিছে এসেছে আলোক,
তাই কলনাদে রত যত জীব লোক।
নিরখি মোহিনী মূর্ত্তি প্রশান্ত উষার,
কার না উপজে সুখ অন্তরে অপার ?
কেগো এই মনোরম প্রত্যুষ সময়,
মোহময় মানসেতে জ্ঞান বিতরয়।
বিমল বিজ্ঞান ভাতি দীপ্ত করে মন,
অজ্ঞান আঁধার যাহে করে পলায়ন।
ভক্তি ভরে প্রেমানন্দে পবিত্র উষায়,
চরাচর সনে সেথি নম তাঁর পায়।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী।

—*—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করিয়া সংক্ষেপে উহার প্রত্যেক অংশের বিষয় আলোচনা করা যাইবে ঃ— (১) বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী (২) ঐ কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং (৩) ঐ কার্য্যের উপযোগী কল প্রভৃতি।

দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি বিধান করিতে হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষ হইতে হইবে; নতুবা পতন অনিবার্য্য। কেবল হাতে কাজ করিয়া তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য কল কারখানা আবশ্যক। ১৮৭১ সালের বিলাতের ফ্যাক্টরি রিটার্ণে প্রকাশ, তখন তথায়—৭৩৮টী বস্ত্রাদি রঞ্জনের কারখানা ছিল এবং তাহাদের কর্ম্মী ও শিল্পীদের সংখ্যা প্রায় ৬৭০০০ ছিল। বর্ত্তমানে তথায় অন্যূন ২০০০ কারখানা চলিতেছে এবং তাহাদের শিল্পী সংখ্যাও ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য একটিও ঐরূপ কারখানা নাই। অন্যান্য প্রদেশেও কাপড়ের কলের সঙ্গে দুই একটি সামান্য বস্ত্র ও সূত্ররঞ্জনের কারখানা ব্যতীত একটীও বড় রকমের কারখানা নাই। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত এ দেশে কেহ এই অভাবটির গুরুত্ব অনুভব করেন নাই।

আমরা কার্পাস, পশম, রেশম ও অন্যান্য নানাবিধ সূত্র * ও তজ্জাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। এ সকলের প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জনপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বিভিন্নপ্রকার সূত্রের ও তজ্জাত বস্ত্রাদির রং করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কল আবশ্যক। যে কলে কার্পাসের রং করা যাইতে পারে—ঠিক ঐ কলে পাটের সূতা রং করা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। সুতরাং রং করিবার কল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কলের আলোচনা ও শিক্ষা আবশ্যক। আমাদের স্থান অতি অল্প; সুতরাং সংক্ষিপ্তসারেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

রং অতি সুন্দর ও স্থায়ী করিতে হইলে বস্ত্রাদি রং করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে ধুইয়া লইতে হয়। এজন্য পাশ্চাত্য দেশে রং করিবার কারখানার সঙ্গে সূত্র ও বস্ত্রাদি ধৌত করিবারও কারখানা থাকে। সূত্রাদি ধৌত করিবার কল রং করিবার কলের একরূপ অংশ বলিলেও হয়; এই রং করিবার কলের সঙ্গে ধৌত করিবার কলও স্থাপন আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকার সূত্রের জন্য যেরূপ বিভিন্ন প্রকার রঞ্জনপ্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার কলের আবশ্যক হয় ধৌত প্রণালী ও তদুপযোগী কল সম্বন্ধে সেইরূপ।

* এখানে সূত্র শব্দকে আমরা Yarn শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ ধরিয়াছি।

কার্পাস সুত্রকে যে প্রণালীতে ধৌত করিতে হয় রেশম সুত্রকে সেই প্রণালীতে ধৌত করিতে গেলে রেশম নষ্ট হইয়া যাইবে এবং হয় ত ধোয়াও হইবে না। আবার যে কল কার্পাস বস্ত্রাদি ধৌত পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা রেশম বা অন্য সুত্র ধৌত-করণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

রঞ্জন প্রণালীকে সাধারণতঃ দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে:—(১) কষে * ছোপান বা mordanting ও (২) রং করণ বা dyeing। রং সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, রং করিবার পূর্ব্বে সুতা বা কাপড়কে একবার একটি কষে ছোপাইয়া লইতে হয়। তাহার পরে উহাকে রংএর পাত্রে ছোপাইয়া রং করিতে হয়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির জন্য নানারূপ কল প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কলে সুতার ফেটি, কাহাতেও বা কাপড় কাহাতেও বা মূল্যবান পরি-চ্ছদাদি ধৌত ও রঞ্জিত হইয়া থাকে। রং করিবার পরে আবার সুতা ও কাপড় কাচিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য ভিন্ন কলের বন্দোবস্ত আছে। কাপড়ের মধ্য হইতে জল পিষিয়া বাহির করিবার জন্যও ভিন্ন কলের আবশ্যক হয়। হাতে নিংড়াইতে গেলে কাপড় ও সুতা নষ্ট হওয়ার সম্ভব এই জন্য উহাও কলে হইয়া থাকে। ইহার পরে বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। রৌদ্রে দিলে অনেক রং নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য আর্দ্র বস্ত্রগুলিকে একটি ভয়ানক উত্তপ্ত ঘরের মধ্য দিয়া টানিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা শুকাইয়া যায়। একখানি ১০ গজ ভিজা কাপড় শুষ্ক করিতে ৫ সেকেণ্ড সময়ও লাগে না। এক সঙ্গে পাশাপাশি করিয়া এইরূপ অনেকগুলি কাপড় উক্ত তপ্ত গৃহের মধ্য দিয়া পার করান হয়। এই জন্য কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি শুষ্ক হইলে উহাদের আরও কতকগুলি কাজ বাকি থাকে; যেমন, ইস্ত্রি করা, উজ্জ্বল করা, ভাঁজ করা, ইত্যাদি, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

* মাজুফল, হরিতকী, বাবলার ছাল, তেতুল ছাল প্রভৃতি জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উহাদের দ্রবণীয় অংশ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ মিশ্রিত জলকে সাধারণ ভাষায় ঐ ঐ দ্রব্যের কষ বলিয়া থাকে।

সিংহদ দুর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উদয়ভানুকে প্রত্যাখ্যানের পর কমলকুমারীর পিতা উদয়েরই কোন আত্মীয়ের সহিত কমলের বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোন সীমান্ত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কমল পতিসহ এক চিতায় নশ্বর দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মূর্ত্তিমতি জলামভূতা সাবিত্রীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিয়া উদয়ভানুর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার সমাবেশ হইল। এ চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে তিলমাত্র বিলম্ব করা যুক্তি সঙ্গত নহে স্থির করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে বিদ্যুৎগতিতে কমলের পার্শ্বচরগণের উপর পড়িয়া তাহা-দিগকে নিহত করতঃ কমলকুমারী ও তাঁহার সহচরী দেবল দেবীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে সম্রাট আরঙ্গজীব এই সমুদয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া উদয়কে তিরস্কার মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলেন এবং তিন মাসের মধ্যে রাজকুমারী কমলকুমারীকে যেন বিবাহ না করেন তাহাও আদেশ করিয়া দিলেন। উদয় বিস্ময়ান্বিত ঐ দুই

রমণী রত্নকে লইয়া কোন্দানা দুর্গে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিয়োজিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরবর্ত্তী ৯ই মাঘ সেই তিন মাস অতীত হইবে এবং সেই দিনই কমলকুমারীর সহ উদয়ের বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে। রাজপুতজাতী চিরকালই অতিশয় প্রতিহিংসা পরায়ণ বলিয়া জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। বিশেষ যদি মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে রাজপুত যেরূপেই হউক আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। দেবলের স্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি উদয়ভানুর ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উদয়ভানু মোগলের সেনা নায়ক হইয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি হইয়া আছেন এমতাবস্থায় তাঁহার উপর প্রতিহিংসা সাধন করা দেবলদেবীর স্বামীর পক্ষে একরূপ দুরূহ বলিয়াই প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজপুত তাহাতে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি সামান্য সৈনিকের কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উদয়ের নিকট ছদ্মবেশে যাইয়া চাকুরীর প্রার্থী হইলেন। উদয়ও কোন প্রকার সন্দেহযুক্ত না হইয়া তাঁহার সে আশা পূরণ করিলেন। যে রাজপুত সৈন্য আহত হইয়া তনাজী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই সেঠ জগতসিংহই দেবল দেবীর স্বামী। জগৎ সিংহ আনন্দ সহকারে তানাজীর সহ যোগদান করিলেন এবং তাঁহাকে এমন আশ্বাসও দিলেন যে দুর্গের রাজপুত সৈন্যগণ উদয়ের উপর সতীর অবমাননা জন্য বিষম উত্তেজিত হইয়া আছে এবং প্রাণের সহিত তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা সুযোগ অভাবে এতদিন উদয়ের কোনই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তানাজী দুর্গে আগমন করিলে তাহারা কেহই অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিবে না সুতরাং সহজেই মহারাষ্ট্রীয়দের বিজয় পতাকা কোন্দানা দুর্গের উপরে উড্ডীন হইবে।

এই সমুদয় শ্রবণমাত্র তানাজী দুর্গ আক্রমণের কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া একদল সেনানী আনিবার জন্য গুপ্তচর পাঠাইয়া দিলেন। এই সেনানী দলের মধ্য হইতে বাছা বাছা কয়টী যোদ্ধা লইয়া তিনি দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির সংকল্প করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল নিকটে কোথাও না থাকায় অনেক দূরদেশ হইতে তাহাদের এখানে আনিতে হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে তাহার যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব। এদিকে ৯ই মাঘ আসিয়া পড়িল। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে তানাজী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম গগণে অগ্নিমূর্ত্তী ধারণ করিয়া অস্তমিত হইলেন—বোধ হইল যেন উদয়ের কার্য্যে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাগ করিয়া নিজ দেহ লুক্কায়িত করিলেন। সন্ধ্যাও আগত প্রায়; এখনও তানাজীর সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। রজনী দ্বিপ্রহরের পরই উদয়ভানু সতী কমলকুমারীকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে এবং তানাজীও তাহা কখনই ঘটিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আদবেই উপস্থিত দেখিতে পাইতেছেন না। সমুদায় প্রতিকূল দেখিয়া তানাজী বড়ই বিপদ গণিলেন। এদিকে একজন কাজী আসিয়া কমলকুমারীকে বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু রমণীর পত্যন্তরগ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাতে আবার রাজপুত

রমণী মরণের ভয় না করিয়া হাসিতে হাসিতে পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িতে প্রস্তুত থাকে। উদয় ভাবিয়াছিল যে সময়ে কমলের শোক অপনোদন হইয়া যাইবে তখন তাহাকে বশীভূত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মমতে তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন।

কমলকুমারী এই তিন মাস যাবৎ দিবা রাত্রি আদ্যাশক্তি মহা সতীর নিকট কায় মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছে সে কেমন করিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া সংসারে ব্যভিচারিণী বলিয়া অভিহিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। সতীর নিকট ক্রন্দন বৃথা হয় নাই। দৈবী মায়া এবং দেবলীলা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায় —ঘোর অন্ধকার রজনী। সতীর অবমাননা পাছে দেখিতে হয় বলিয়াই যেন রজনী দেবী মসীময়ী মূর্ত্তী ধারণ করিয়াছেন—দ্বিপ্রহর রজনীর আর মাত্র ২॥০ দণ্ড অবশিষ্ট আছে—এই সময় পরেই সতী কমলকুমারী মুসলমানের সহ উদ্বাহবন্ধনে অনিচ্ছায় আবদ্ধ হইবেন। জগতে সতীমাহাত্ম্য লোপের আর বিলম্ব নাই, এমন সময় কোথা হইতে ৫০ জন সাহসী মহারাষ্ট্র সেনা—"হর হর মহাদেও" বলিতে বলিতে তানাজীর পার্শ্বে আসিয়া যোগদান করিল। তানাজী আশার ক্ষীণালোকে সমুদয় ভবিষ্যৎ নয়নের সমক্ষে উদ্ভাসিত দেখিলেন। তিনি সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই মোগল দুর্গ আক্রমণে কৃত সংকল্প হইলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালুদেশে উঠিয়া তানাজী সদলে দুর্গ প্রাচীরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে প্রাচীর লঙ্ঘনের প্রথম উদ্যমে তানাজী অকৃতকার্য্য হওয়ায় বিমর্ষ ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই প্রকার হতাশ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কারণ প্রথমেই ব্যর্থ মনোরথ হইলে অনেক সময়ে কার্য্যে আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না। কিন্তু যাহাই হউক তানাজী তাহাতে কিছুমাত্র উদ্যমহীন না হইয়া পুনরায় অকুতোভয়ে প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। পুরুষের সাহসই বল ভরসা এবং অনেক সময়ে কেবলমাত্র উদ্যমশীলতা ও সাহসের জন্যই পৃথিবীতে অনেকে মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন—দেহ সম্বন্ধে একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি এই দুরূহ বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে বোধ হয় তুমি বিরক্ত হইবে না?

ভগবান্—কি বলিবে বল?

অর্জ্জুন—সৎ এর উপাধি এই দেহ। কিন্তু দেহের স্বরূপ কি?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি দেহ 'অসৎ'। দেহের উৎপত্তি নাশ আছে।

অর্জ্জুন—দেহ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র।

ভগবান্—না, দেহের অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর। যেমন মরীচিকায় জলভ্রম কেবল ভ্রমমাত্র, সেইরূপ অসৎ দেহাদি সৎ আত্মার কল্পিত মাত্র। যেমন জল হইতে পানা জন্মিয়া জলই আবরণ করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া মায়াই ব্রহ্মের উপর এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে। মরীচিকা ও জলভ্রম পৃথক এইটি অনুভূত হইলে যেমন জল ভ্রমের অন্ত হয় সেইরূপ আত্মা হইতে দেহ পৃথক ইহা অনুভূত হইলে দেহাদি ভ্রমের অন্ত হয়।

অর্জ্জুন—সর্ব্বদা সৎ বস্তু লক্ষ্য থাকিলেই ত দেহাদি ভুল হইল, কিন্তু সর্ব্বদা কিরূপে 'সৎ' লইয়া ভাবা যায়?

ভগবান্—'সতের' স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা উপলব্ধি হয়। যখন অনুভূত হইতে থাকে যে আত্মা নিজে অবিনাশী অপ্রমেয়, তখনই তুমি জীবন্মুক্ত "অবিনাশিনোঽপ্রমেয়স্য নিত্যস্য"।

অর্জ্জুন—নিত্য ও অবিনাশী এক কথা, পুনরুক্তি কেন?

ভগবান্—অর্থগত পার্থক্য নাই। তথাপি অদর্শন ও পরিবর্ত্তন ভেদে নাশ দুই প্রকার। দ্বিবিধ নাশ রহিত এজন্য অবিনাশী। সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য।

অর্জ্জুন—আত্মা 'অপ্রমেয়' কিরূপে?

ভগবান্—'এই বস্তু এইরূপ' প্রকৃষ্টরূপে বস্তুর স্বরূপ পরিমাণকে প্রমা জ্ঞান বলে। যাহাদ্বারা প্রমা জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। পূর্ব্বে আত্মা তাহাকে যাহা কিছু জানাইয়া দেয় তাহাইত প্রমাণ হইবে। কিন্তু আত্মাকে জানাইয়া দিবে কে? জ্ঞান আছে তাই জানা। জ্ঞানকে জানাইবে কে? আত্মাই আত্মার জ্ঞাতা; কারণ আর কোন বস্তুই জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হয় না। এজন্য আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বা অপ্রমেয়, এইরূপ আত্মাকে যে হন্তা মনে করে বা যে হত মনে করে তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না কারণ ইনি হননও করেন না হতও হন না।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম, বিনাশও করেন না বিনষ্টও হন না, এজন্য শোক করিলাম না। কিন্তু তাঁহাদির জন্য ত শোক না করিলে পাপ হইতে পারে, শুধু আমার পাপ নহে তোমারও। যেহেতু তুমি এই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছ?

ভগবান্—আমি প্রবৃত্ত করিতেছি না, কাহাকেও তাহা করি না। আমি তোমার অজ্ঞান বিনাশ করিয়া দিতেছি মাত্র। আর আত্মার সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিলাম তাহা শুধু আমার মনে করিও না। কঠোপনিষদে ইহাই আছে, অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন,

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি
ন হন্যতে॥ কঠ ১।২।১৯

যখন বেদ এই উপদেশ দিতেছেন তখন সকল শঙ্কা দূর কর। কারণ এ কার্য্যে পাপ থাকিলে বেদ কখন পাপকার্য্যে লওয়াইতে পারেন না।

এ কার্য্যে তোমার কি আমার কাহারও পাপ নাই। আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতির আর একটী মাত্র বলি শুন। আত্মা ষড়্বিধ বিকার শূন্য।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্, এ।

ভারতে জাতীয় জীবনের উন্মেষ।

হৃদয়ের উদারতাই মানবের সভ্যতার প্রধান পরিচায়ক; বসন ভূষণ বা অস্ত্রশস্ত্রই আমাদের সভ্যতার যথার্থ পরিচায়ক নহে। সেইরূপ, যেখানে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা, সেইখানেই অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার আধিপত্য। মানুষ যতদিন এই অজ্ঞানে অন্ধ থাকে, অসভ্য থাকে, ততদিন তাহার চারিধারের এই বহুর মধ্যে সে সেই এককে দেখিতে পায় না; মানবসমাজের এই অসংখ্য খণ্ডতার মধ্যে চিরদিন যে এক মহতী একতা বিরাজ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি ও অনুভব করিতে সে অক্ষম হয়। তাই আপনার মোহবশে সে তাহার চারিধারের এই বৃহৎ জগৎকে, এই বিপুল মানব সমাজকে সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র

করিয়া তাহাকে তাহার আপন ধারণার ও হৃদয়ের উপযুক্ত করিয়া লয়। কিন্তু, ক্রমে তাহার জ্ঞান যত পরিস্ফুট হইয়া উঠে, প্রাণ যত প্রসারিত হইতে থাকে, তত সে তাহার সেই ক্ষুদ্র জগতের সীমার গণ্ডীকে বিস্তৃত ও বৃহৎ করিয়া তুলে। এই ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশই সংসারের নিয়ম। এই নিয়মের বশে, মনুষ্যহৃদয় তাহার আপন ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে তাহার পরিবারের, তাহার গ্রামের, তাহার প্রদেশের, তাহার দেশের ও অবশেষে তাহার জগতের সকলেরই মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চতুর্দ্দিকের এই অসংখ্য দেশকে সে একই পৃথিবী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং বহুবর্ণে, ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে ভিন্ন এই অগণ্য মানবসমাজকে তাহার আপন সমাজ বলিয়া সে স্বীকার করে। তখন এই পৃথিবীর সকল দেশই তাহার স্বদেশ, সকল জাতিই তাহার স্বজাতি। এই উদারতা, এই সভ্যতাই উন্নতির চরম আদর্শ। কিন্তু আজিও এ পৃথিবীর মানবসমাজ সে উদারতা, সে সভ্যতা লাভ করে নাই;—কোন্ ভবিষ্যতে সে এই উদার উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়া ধন্য হইবে, তাহা আমাদিগের ধারণার অতীত। কিন্তু, কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে মানবসমাজ যে প্রতিদিনই তাহার সেই চরম আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে পৃথিবীর অনেক স্থলে দেখিতে পাই, মানুষ তাহার পূর্ব্ব সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার দেশবাসী সকলকেই তাহার হৃদয়-মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে,—এবং এই ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে এক একটি মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাষার, ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের সহস্র পার্থক্যসত্ত্বেও তাহারা সকলেই এক মহা জাতীয় ভাবে সম্মিলিত ও একপ্রাণ। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা মনান্তর, মতান্তর ও সহস্র স্বার্থসংঘর্ষ সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মাতৃভূমির সেবায় ও কল্যাণসাধনে একাগ্রচিত্ত। স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেকের কর্ম্মের সফলতায় গৌরব ও আনন্দবোধ করে,—বিফলতায়, অপমান ও শোক অনুভব করে। ইহাই যথার্থ জাতীয়তার লক্ষণ।

ভারতবর্ষ এত বৃহৎ ও বিস্তৃত দেশ যে, ইহার নানাপ্রদেশে নানাভাষায়, রীতির ও নীতির অর্থাৎ নানা ক্ষুদ্র জাতীর উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এবং প্রাচীন ভারতে ক্ষুদ্র জাতিকে একত্র মিলিত করিয়া একটা মহা জাতিতে পরিণত করিবার বহুল অন্তরায় ছিল।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে জাতীয় জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে যখন ভারতে সহস্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, শ্মশানের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায়, পরস্পর সংগ্রামে ও সংহারে মত্ত, সর্ব্বব্যাপী হিংসা ও বিদ্বেষের বিষে দেশের সর্ব্ব দেহ জর্জ্জরিত এবং দেশবাসীর প্রাণ-বায়ু কণ্ঠাগত, হিমালয়ের পাদমূল হইতে সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত এ মহাভারত অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় মগ্ন;—আমাদের জাতীয় অধঃপতনের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, ইংরাজের বাণিজ্যতরী ভারতের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ক্রমে ছলে, বলে ও কৌশলে ইংরাজ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। ইংরাজ ভারতে আসিয়া সর্ব্বদেশব্যাপী সকলের প্রতি সমদর্শী এক সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিল। জন-সাধারণের সম্মুখে জগতের শত শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ও ইতিহাসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিল এবং আপামর সাধারণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিল; হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের ও জাতি বিচারের সঙ্কীর্ণ দৃঢ় বন্ধনকে অপেক্ষাকৃত শিথিল করিয়া তুলিল,

রেল, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাতায়াতের ও ও আলাপ পরিচয়ের সুবিধা করিল; এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সকল প্রদেশের শিক্ষিত অধিবাসী-গণের মধ্যে পরস্পর ভাব প্রকাশের উপায় প্রতিষ্ঠা করিল।

ইংরাজের এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে, আমরা জগতের ইতিহাস ও সাহিত্য অনুশীলন করিয়া ক্রমে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলাম। এক অপক্ষপাত রাজশক্তির অধীন হইয়া আমরা সকলেই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিলাম যে, আমরা সকল প্রদেশের সকল ভারতবাসীই একই নিয়মে ও স্বার্থে বদ্ধ; এবং রেল, টেলিগ্রাফ্, ডাক ও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমরা সর্ব্ব প্রথম সকল প্রদেশের অধি-বাসীগণের সহিত পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও ভাব বিনিময় করিতে সমর্থ হইলাম। এই উপায়ে আমাদিগের মধ্যে প্রথম জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হইল। ক্রমে বিধাতার ইচ্ছায় তাহা নানা বাধাবিঘ্ন ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া অঙ্কুরে পরিণত হইল। বহু শতাব্দীর অন্ধকারের পর আমা-দের মধ্যে এক নব জীবনের মঙ্গলালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বহু দিনের নির্জ্জীবতার পর আবার চতুর্দ্দিকে একটা চেষ্টা ও চাঞ্চল্যের সজীবতা আসিয়া দেখা দিল। বহুকাল পরে আমরা আত্মপরীক্ষায় ও আত্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে আমাদের রীতি-নীতি, ভাষা-ভাব, সকলই উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শের অনুকরণে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাই জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি।

ইংলণ্ডের সৌভাগ্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের উপর তাহার দায়িত্বও অল্প নহে। কারণ ইংরাজ জানে, যে ভারতবর্ষ তাহাদের বিজিত দেশ নহে,—যাঁহারা বলেন যে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র সৈনিকের সাহায্যে ভারত জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ সন্দেহ নাই;—তাই বলিতেছি যে, ইংরাজ জানে যে সে ভারতে জয়ীরূপে প্রবেশ করে নাই, ভারতবাসী তাহাকে তৎকালীন সেই বিশৃ-ঙ্খলা, অশান্তি ও অরাজকতার মধ্যে, শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের জন্য, তাহাদিগকে একমাত্র সহায় ও মুক্তি-দাতা জ্ঞানে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দানে সম্মত হইয়া-ছিল। এক্ষণে ইংরাজ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি সন্দেহ চক্ষে দর্শন না করিয়া যদি তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভারতবাসীকে উপনিবেশ সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের উপ-যুক্ত ক্ষমতা দান করেন তাহাতেই ইংরাজের মঙ্গল, তাহাতেই ইংরাজের কীর্ত্তি।

পৌত্তলিক রোম্ তাহার সমৃদ্ধির দিনে, সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে তুল্য অধিকার দান করিতেন। ইংরাজ যীশু খৃষ্টের শিষ্য হইয়াও কি পৌত্তলিক রোমের অপেক্ষা হীন আচরণে কুণ্ঠিত হইবেন না? রোমীয়গণ, কেবল অর্থ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া, সাম্রাজ্য বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা মহত্তর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া সন্তোষতৃপ্ত প্রজাবৃন্দের কৃতজ্ঞতা লাভে পুলকিত হইয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ড অতীত রোম অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আজ ইংলণ্ডবাসীর রোমবাসীর অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তরভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক। আমা-দিগের বিশ্বাস ইংলণ্ড আমাদিগকে এ আশায় হতাশ করিবেন না; কারণ, এখানে আমরা যেরূপ হৃদয়শূ-ন্য ইংরাজকে দেখিয়া থাকি, ইংরাজ জাতি বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখানকার ইংরাজগণ তাহাদিগের রাজ্য ও স্বদেশের

নিকট বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু ইংরাজজাতি কখনই চিরদিন ইহাদের কথায় ভুলিয়া থাকিবে না। তবে এ বিষয়ে আমাদিগের ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। সময়ে আমরা সকল অধিকারই লাভ করিতে সক্ষম হইব সন্দেহ নাই। দুর্ব্বলের সবলের নিকট হইতে অধিকার লাভ করিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত বহু দিনের চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। অধিকন্তু, ভারতে রাজা ও প্রজার মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত বা বর্ণগত কোন সম্বন্ধ ও সহানুভূতিই নাই; কিন্তু সেজন্য আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে যেরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে তাহাতে আমাদের দুর্দ্দশা দূর হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

রাম শর্ম্মার দুর্গাপূজা।

——(*)——

এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে রাম শর্ম্মা নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংসারে পত্নী ও এক বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম সরলা। ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ছায়া স্বরূপিনী। ধর্ম্মশীলতায় সদাচরণে ব্রাহ্মণী সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের অনুগামিনী। সামান্য ব্রহ্মোত্তর জমির উপস্বত্বে ব্রাহ্মণ আপনার ও ক্ষুদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের সেই দারিদ্র্যপূর্ণ কুটিরে কিন্তু চির শান্তি বিরাজিত ছিল।

রাম শর্ম্মা প্রতি বৎসর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দুর্গাপূজা করিতেন। তাঁহার আয় তেমন ছিল না। সুতরাং ভিক্ষা দ্বারা তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বলহীন সহায়হীন সম্পদহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র ভক্তির বলেই প্রতি বৎসর এই মহা পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিতেন। পূজার সময় প্রতি বৎসর দলে দলে লোক সকল তাঁহার কুটিরে সমুপস্থিত হইত। তখন অসংখ্য লোকের কোলাহলে, ভিক্ষুকের আনন্দ-ধ্বনীতে ও অতিথি-অভ্যাগতগণের কলনাদে সেই ক্ষুদ্র পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রতি বৎসর তিন দিন সেই ক্ষুদ্র পল্লী যেন অমরগণের লীলাভূমিতে পরিণত হইত। তারপর মহাদেবীর বিসর্জ্জন হইলে সেই নীরব পল্লী আবার নীরব-সাগরে ডুবিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ দম্পতি আবার অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপেই দিন যায়। একবার রাম শর্ম্মা মহাপূজার জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইলে কয়েকজন দস্যু পরামর্শ করিল, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ পথ হইতে লুণ্ঠন করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় রহিল। এদিকে ব্রাহ্মণ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া বাটি প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশাধিক পথ দূরে আসিলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ এক দীর্ঘকায় বটবৃক্ষতলে অর্থ ও বস্ত্রাদির মোট রাখিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া সেই দীর্ঘিকার ঘাটে বসিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিতে লাগিলেন।

সেই দীর্ঘিকার জল অতি মনোহর। ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্রী মধ্যে মধ্যে এই দীঘি হইতে নির্ম্মল জল পানার্থ বাটী লইয়া যাইতেন। রাম শর্ম্মা যখন সেই দীঘির কূলে বসিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সুনীল শরতাকাশে তারার মেলা বসিয়াছে; মাঝে মাঝে শুভ্র মেঘখণ্ড গগন মণ্ডলে বিরাজ করিতেছিল। সে নির্ম্মল দীঘির জলে চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়া

চতুর্দ্দিক বিস্তারিত হইতেছিল। এমন সময়ে কলসীকক্ষে রাম শর্ম্মার ভ্রাতষ্পুত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে সেই দীর্ঘিকাকূলে উপবিষ্ট দেখিয়া ভ্রাতষ্পুত্রী বলিলেন,—

দেখ দেখি, যা ভাবিয়াছি, তাই। তুমি যে আজ বাটী আগমন করিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। তাই তোমার জন্য খাবার জল লইতে আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। এত রাত্রে তোর একলা আসিবার দরকার কি ছিল?

ভ্রাতষ্পুত্রী। না আসিলে কি চলে? তুমি যখন ক্লান্ত হইয়া বাড়ি আসিয়া ভৃঙ্গার জল চাহিবে তখন কি দিব? চল, বাড়ী চল।

এই কথার পর উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বস্ত্রাদির মোটটি ভারি দেখিয়া ভ্রাতষ্পুত্রী উহা লইলেন ও ব্রাহ্মণকে কলসীটি লইতে বলিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। তখন বন পথ দিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহপানে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর যাইলে সেই দস্যুদল ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। সেই মহা কোলাহলে ভ্রাতষ্পুত্রী মোট লইয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না। দস্যুদল ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলাকীর্ণ আম বাগান; তাহার মধ্যে এক জীর্ণ কুটীর; সেই কুটীরের ভিতর ভয়ঙ্করী এক কালী মূর্ত্তি। একটি প্রদীপ একটি হাঁড়ির ভিতর মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল; আর সেই কুটিরের বহির্ভাগে ১৫।১৬ জন ডাকাত রাম শর্ম্মাকে ঘিরিয়া অবিরত নির্য্যাতন করিতেছিল। রাম শর্ম্মা অটল। কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার বলিল ঃ—

মেধো মাল দেখাৎ। বিটলেকে মায়ের কাছেই আগা।

মেধো মহা আহ্লাদে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া হাড়কাঠ পুঁতিল ও ব্রাহ্মণকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আর একজনকে বলিল, 'খুড়ো ঠাকুর, লেগে যাও।' খুড়ো ঠাকুর পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। রাম শর্ম্মা বুঝিলেন, তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবার আর বিলম্ব নাই। তখন ব্রাহ্মণ ডাকাইতগণকে বলিলেন,—

টাকাগুলি পাইলে কি তোমরা আমায় ছাড়িয়া দাও?

সর্দ্দার। এখনি।

ব্রাহ্মণ। তবে আমার সঙ্গে চল। সমস্ত টাকা এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছিয়াছে।

মেধো। কি রকম?

ব্রাহ্মণ। আমার ভ্রাতষ্পুত্রী সঙ্গে ছিল, সে লইয়া গিয়াছে।

তখন সর্দ্দার উরু চাপড়াইয়া বলিল,—ঠিকরে ঠিক। ঠিক বটে।

ব্রাহ্মণ। তবে আমার সঙ্গে চল; যাইলেই পাইবে।

মেধো। ওরে বেটা বিট্‌লে! গেপ্তারের মতলব আঁটছিস্!

এই বলিয়া মেধো রাম শর্ম্মার গালে সজোরে এক চড় মারিল। সর্দ্দার বলিল, 'নারে বামুনটা মিছে বলে না। মেধো তুই যা।'

মেধো। একলা? বল, মালের বক্রা নেই।

সর্দ্দার। বেশ।

মেধো আনন্দে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। রাম শর্ম্মার বন্ধন মোচন করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে অন্যান্য ডাকাইতগণ ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হওয়া মেধোকেই রাম শর্ম্মার সহিত

যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন সর্দ্দার বলিল,—

বটে! তবে লাগাও তাল; তালে যার ক'র্‌লেই মাল।

এই বলিয়া প্রত্যেককে তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মল্ল যুদ্ধের যে রীতি আছে, এই সময়ে একজন ডাকাইত তাহা ভঙ্গ করে, সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ তাহাকে তরবারির এক আঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এই ঘটনায় দস্যুগণ মহা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইল ও ভয়ঙ্কর দাঙ্গা করিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রদেব অস্ত যাইলে ঘোর অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া রাম শর্ম্মা পলায়ন করিলেন।

অতি ঘোর অন্ধকার। শ্রবণবিদারক ভয়ঙ্কর ঝিল্লিরবে প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি আরও বিভীষণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পেচক চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল। রাম শর্ম্মার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই; নির্ভয়ে সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রাহ্মণ বাটি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন যখন বাটি পৌঁছিলেন ব্রাহ্মণী। অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

কি আশ্চর্য্য! তুমি ঘুমুচ্ছ!

ব্রাহ্মণী। কি করিব। আজ তোমার পত্র পাইয়া পড়াইয়া বুঝিলাম, তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি আসিবে। তোমার আহারাদি প্রস্তুত করিয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলাম; তুমি আসিলে না দেখিয়া ভাবিলাম কাল সকালে আসিবে। তারপর শুইলাম। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?

রাম শর্ম্মা। কেন কিছু জান না কি? বুড়ো বয়সে আবার রসিকতা! যাক্; মোটটি আন্‌তে পেরেছে ত?

ব্রাহ্মণী। ওমা! এ সব কি কথা গো!

রাম শর্ম্মা। কেন, সরলা আজ সন্ধ্যার পর দীঘিতে জল আনিতে যায় নাই?

ব্রাহ্মণী। ওমা! সে কি গো!

রাম শর্ম্মা। মিথ্যা বলিও না।

ব্রাহ্মণী। আমি কখনও মিথ্যা বলিয়াছি? সরলা আজ আবার কখন দীঘিতে যাইল?

রাম শর্ম্মা। এঁ্যা, সে যায় নাই! সে সরলা নয়?

তখন ব্রাহ্মণ অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া মস্তকে করাঘাত করিয়া হায় কি হইল বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শোকে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অবিরত 'হায় মা! কি করিলে' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীও স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ 'মা! মা!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন বিবেচনায় ব্রাহ্মণীও রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই দীঘির নাম কৃষ্ণ দীঘি। নির্ম্মল সলিলে সেই রমনীয় দীর্ঘিকা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত বলিয়া লোকে তাহার এইরূপ নামকরণ দিয়াছিল। কৃষ্ণ দীঘির নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক ইতর জাতীয় লোক বাস করিত। কৃষিই তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন। উক্ত ঘটনার পর দিবস এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া মাঠে যাইবার সময় সেই দীর্ঘিকার নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে একটি বৃহৎ মোট দেখিয়া কৌতুহলচিত্তে তথায় গমন করিল। পরে উহা-

দিগের মধ্যে একজন যেমন সেই মোটটি লইতে যাইবে অমনি এক প্রকাণ্ড কালসর্প বৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া মুহুর্মুহুঃ ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তখন সেই কৃষকগণ চীৎকার করিতে থাকলে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে বিস্তর লোক তথায় সমবেত হইল। কিন্তু কেহই বৃক্ষতলে গমন করিতে সাহসী হইল না। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'মা! মা!' রবে কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই বৃক্ষতলে সেই মোটটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র সেই অজগর বিষধর ফণা সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই মোট মাথায় করিয়া মা! মা! রবে আনন্দে নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সমবেত লোক সকল অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে পৌঁছিলে অনতিকাল মধ্যেই এই বৃত্তান্ত চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন দলে দলে গ্রামের লোক ব্রাহ্মণের বাটিতে আসিতে লাগিল। অনন্তর মহা সমারোহে ব্রাহ্মণের বাটিতে মহাপূজার অনুষ্ঠান হইল। এই বৎসর জগজ্জননীর এমন বিশ্ববিমোহন রূপ হইয়াছিল, যে, এরূপ অপরূপ মূর্ত্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই। আন্তরিক ভক্তির আকর্ষণে মহাদেবী স্বয়ং ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া তাঁহার কুটিরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পর বৎসর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বহু অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণের কুটির সুন্দর অট্টালিকায় পরিণত করিয়া দিলেন। পূজার পরে বহু লোক সেই ডাকাইতগণকে ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহাদিগের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

শ্রীজানকীচরণ রায়।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

কৃষি বা চাষ বলিলে সাধারণতঃ আমাদের দেশে একমাত্র ভূমিকর্ষণই বুঝায়, কিন্তু চাষ সকল বস্তুরই সম্ভব। স্থলের চাষের ন্যায় জলের চাষ অর্থাৎ মৎস্যের চাষও অসম্ভব নহে। কিন্তু সম্ভব হইলেও কেহ কেহ হয়ত 'ইহা জেলেদের কার্য্য' এই কথা বলিয়া উপেক্ষিত করিবেন। আমরা স্বীকার করি মৎস্যের উন্নতি করা, মৎস্য ধরা জেলেদিগেরই কার্য্য বটে, কিন্তু দিন দিন যেরূপ মৎস্যের অভাব হইতেছে, তাহাতে জেলেদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলিবে না। দেশের যে দিন দিন কি দুর্গতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে বস্তুতই শরীর অবসন্ন হয়। এতদ্দেশীয় কৃষক শ্রেণী, মৎস্য ব্যবসায়ী জেলে, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ যাহারা সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ তাহাদিগের উন্নতির জন্য যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন সেরূপ হইতেছে না। আজ কাল স্বদেশী আন্দোলনে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, অনেক দিকে পড়িয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। ফলতঃ স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় না থাকিলে দেশের উন্নতি কিরূপে হইবে। মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসা ধনাগমের একটী সহজ উপায়। এবং অল্প মূলধন লইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ বিষয় সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করিব।

দুগ্ধ ও অন্নের পর বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্য।

উচ্চবংশীয়া হিন্দু বিধবাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, মাছ খান না এমন লোক বাঙ্গালা দেশে কমই দেখা যায়। বাস্তবিক মৎস্য বাঙ্গালীর বড়ই আদরের জিনিস, একটি প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়, মৎস্যে সাধারণতঃ শতকরা ১৪ ভাগ যবক্ষারজান, ৭ ভাগ অঙ্গার, একভাগ ধাতব দ্রব্য ও ৭৮ ভাগ জল ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ আছে। এই জন্যই অনেক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক মৎস্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন মৎস্য দ্বারা মস্তিষ্ক পুষ্ট ও মানসিক বৃত্তি সকল তীক্ষ্ণ হয়। নানা কারণ বশতঃ দিন দিন বাঙ্গালায় এই পুষ্টিকর খাদ্য মৎস্যের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে। এই অভাবেরও কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) আমাদের দেশে দিন দিনই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত আহার্য্য বস্তুরও যে অভাব হয় তাহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। (২) পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ জল ছিল এখনও সেই পরিমাণ জল আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুকুর, খাল, বিল এমন কি বড় বড় নদী পর্য্যন্ত প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। জলের পরিমাণের ন্যূনতার সঙ্গে মৎস্যেরও যে ন্যূনতা হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। (৩) আহারাভাবে মনুষ্য-দিগের যেরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে, নিরীহ মৎস্য-জাতিরও ঐরূপ ক্লেশ হয়। এতদ্দেশের জঙ্গল আবাদ হওয়াতে মৎস্যকুলের খাদ্যের পক্ষে অনেকটা ব্যাঘাত পড়িয়াছে, সুতরাং নদী, খাল, বিলে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তত মৎস্য দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষাদির পত্র, ফুল ও ফল মৎস্যের শরীরের পুষ্টিসাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পত্র, ফুল ও ফল নদীগর্ভে পতিত হইয়া পচিলে মৎস্যকুল ঐ সকল গলিত পত্র, ফুল ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। পত্র, ফুল, ফলাদিতে যে রস থাকে তাহা জলে মিশ্রিত হওয়াতে সেই জল মৎস্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়। (৪) এতদ্দেশে রেলের গাড়ী ও জাহাজের প্রচলন মৎস্য অভাবের আর একটী প্রধান কারণ। রেলের রাস্তা নির্ম্মাণের দরুণ অনেক খাল, নালা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদিও মাঝে মাঝে দুই একটী খাল দৃষ্ট হয়, তদুপরি পুল হওয়াতে খাল কিম্বা নদীর স্রোত এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে মৎস্যকুল আর স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারে না। জাহাজের বংশীধ্বনি ও ঝপাঝপ শব্দে মৎস্যকুল যে কোথায় পলাইয়াছে তাহা তাহা-রাই জানে। (৫) মাছের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া জেলেরা ছোট ছোট মৎস্য বা সবে মাত্র ডিম্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এমন ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিতেও ত্রুটি করে না। বিস্তর পরিমাণে ডিমওয়ালা মাছ ও মৎস্যের পোনা ধ্বংশ হইতেছে বলিয়াই এতদ্দেশে দিন দিন মৎস্যের এত অভাব হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।

বঙ্গভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের পরিভাষা।

ভাষার না উন্নতি হইলে জাতীয় উন্নতি হয় না, জাতীয় উন্নতি না হইলে ভাষার উন্নতি হয় না, উভয়টীই পরস্পর একই পাশে আবদ্ধ। ভাষার তেজেই মনের তেজ এবং মনের তেজেই শরীরের তেজ জন্মে, মন ও শরীরের তেজযুক্ত জাতিই প্রকৃতজাতির মধ্যে গণ্য। পার্সি এবং হিন্দি উভয়ই জোরের ভাষা। এতাদৃশ্য ভাষাচয় যাহারা

ব্যবহার করে; একবার তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হয়। ইংরাজিও বিশেষ জোরের ভাষা।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়, কলকারখানা, জাহাজ ইত্যাদির গঠনভুক্ত অনেক যন্ত্র (wheel বা চাকা), ফিমেল স্ক্রু (female screw), মেইল স্ক্রু (male screw) ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের অনেক ব্যবহারিক যন্ত্রাদির জন্য কতকগুলি স্ত্রীবাচক এবং কতকগুলি পুংবাচক শব্দ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বিষয়ের অনুবাদে স্ত্রী-পুংপার্থক্যযুক্ত সর্ব্বনাম দ্বারা উপকার হইবে আশা করি।

ইংরাজীতে, হিন্দিতে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতে আবশ্যক গুটিকতক স্ত্রী এবং পুংবাচক সর্ব্বনামের বিভিন্নতা রহিয়াছে, তবে আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন ?

অত্র আমরা অভাব ও অসুবিধা বোধ করিয়া "she" জন্য "সা", "her" জন্য "তস্যা" শব্দ মূল বা basis করিয়া অভাবাদি পূরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

এতাদৃশ কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে কয়েকটী উচ্চ বঙ্গসাহিত্যসেবক ও সংস্কৃত ও ইংরাজীতে দক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক মনে হওয়াতে যত্নতঃ তাহাও করিয়াছি। তাঁহারা সানন্দে এতাদৃশ সর্ব্বনামের বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা একটি আবশ্যক অভাব পূর্ণ হইবে বলিয়া এতাদৃশ ব্যবহারের বিশেষ অনুমোদন করিয়াছেন।

যে কাল আসিয়াছে ও আসিতেছে, তাহাতে বঙ্গবাসীকে ভাষাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন ব্যবসা শিক্ষা, কলকারখানা শিক্ষা, নানা শিল্প শিক্ষা হেতু পরিচালিত হইতে হইবে। সেইজন্য, এখন হইতেই আমাদের যতটুকু যে বিষয়ে সাধ্য সে বিষয়ের technical terms (পারিভাষিক শব্দচয়) ঠিক বজায় রাখিয়া হউক বা অনুবাদ করিয়া হউক, বা পারিভাষিক কথা কিংবা ব্যাখ্যা দ্বারা হউক বা নবগঠন (coining) করিয়া হউক, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় প্রচুর গ্রন্থচয় রচিত এবং মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মাতৃভূমির সন্তানগণ এইরূপে জগতের সর্ব্বজাতির সহিত কোন না কোন প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সমস্ত জাতির উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক গ্রন্থনিচয় আমাদের মাতৃভাষায় প্রস্ফুটিত হউক, এই প্রাণের ইচ্ছা; তাহাতে মাতৃভূমির সন্তানগণ জগতের যাবতীয় জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করুন, এই হৃদয়ের বাসনা।

সংস্কৃতভাষা জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা। "সা" যখন বঙ্গভাষার মাতৃস্থানীয়া তখন "তস্যার" সর্ব্বপ্রকার অভাব কালে পূর্ণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর কালী, L. M. S.

সমালোচনা।

মন্দার—শ্রীমতী পুষ্পময়ী দেবী প্রণীত।

মন্দার সুরতরু তাই প্রত্যেক পুষ্প স্বর্গীয় পরিমলে পরিপূর্ণ। মন্দারে দেখিলাম কি ?—দেখিলাম, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সমস্ত স্বর্গীয় ভাবগুলিই কবিতায় পরিস্ফুট রহিয়াছে;

আর দেখিলাম, প্রেমের ক্রম বিকাশ, প্রেম স্বপরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে বিশ্বসংসারে, পরিশেষে বিশ্বসংসারের অধিপতি সেই ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছে। "বিমল", "অমিয় কুমার" প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় কবির প্রেমের জন্ম, "কাঙ্গালিনী মা" প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় সেই প্রেমের ক্রমবিকাশ, "তুমিই আমার" শীর্ষক কবিতায় সেই প্রেমের পূর্ণতা। কবি লিখিয়াছেন,

"যতদিন দেহে প্রাণ
থাকে মোর এই ভবে,
ততদিন তুমি, নাথ,
একাই আমার রবে।
তারপরে শেষ দিনে
তোমারে লইয়া বুকে,
মরহদে অমরাত্মা
লভিব পরম সুখে।"

প্রেমের কি সুন্দর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

মন্দাবে সুন্দর ঈশ্বর নির্ভরের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।—কবি লিখিয়াছেন,—

'তব পানে চেয়ে চেয়ে
মাথা পেতে নিরন্তর,
সতত সহিতে পারি
সংসারের শত ঝড়।'

"বিভো!
কি ভেবে হয়েছি আমি এতই আকুল?
যে ভাবে রাখিবে তুমি,
সেই ভাবে রব আমি,
অমিত একটী তব খেলার পুতুল!"

আপনার উপর কবি কিছুমাত্র দায়িত্ব রাখেন নাই। ভগবানে সম্পূর্ণরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কি মধুর ভাব!

ভগবানের নিকট কবির সুন্দর তিনটী প্রার্থনা আছে। এরূপ প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধক কবির লেখনী ব্যতীত নিঃসৃত হয় না। সাধক কবি পুষ্পময়ী প্রার্থনা করিতেছেন,

(১) বিভো!
যে ক'দিন থাকি ভবে
তোমার করুণা বলে,
তোমারি আদেশে যেন
খাটি এই ধরাতলে।

(২) চাহিনা তোমার কাছে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
এ শকতি দিও যেন
মনে রাখি তব নাম।

(৩) জগদীশ!
এ দাসের আর প্রভো কিছুই দিও না,
'যা' দেছ ফিরিয়া লও,
এই শুধু ভিক্ষা দাও,
আঁখি জল টুকু মোর
কাড়িয়া নিও না।

যতদিন বাঁচি তোমার প্রিয় কার্য্য যেন সাধন করি; কিন্তু তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবারই বা শক্তি কোথায়? তুমিই সেই প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার শক্তি দাও। আমি অতি দীন হীন, তোমার প্রকৃত সাধন ভজন জানি না কিন্তু তোমার সুধাময় নাম যেন সতত উচ্চারণ করিতে পারি এ শক্তি দাও। আর তোমার জন্য যেন সতত প্রাণ কাঁদে, তোমার জন্য যেন প্রাণে এক নিত্য আকাঙ্ক্ষা থাকে। দেব! সতত দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ জীবনে আনিয়া দিও। সুখে সম্পদে তো তোমার নাম মনে পড়িবে না যদি দুঃখে, শোকে তোমার জন্য প্রাণে এক নিত্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। দুঃখ যে বিরেচক ঔষধ; যেমন বিরেচক ঔষধ শরীরের

মল নির্গত করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে সেইরূপ দুঃখ মনের মলিনতা দূর করিয়া ভগবদ্ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাই প্রার্থনা দেব ! চক্ষের জলটি যেন কাড়িয়া নিও না। মরি, কি দীন হীন ভক্ত সাধকের উক্তি ! ভক্ত মনে করেন ভক্তির দর বাড়ায় কে ? ভগবানের দয়া—তাই ভক্ত সকল কাজে ভগবানের দয়ার ভিখারী। আর যে সকল জিনিষ সেই দয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগায় তাহাই ভক্তের প্রার্থনীয়।

ভাষার অন্ত আছে কিন্তু আশার অন্ত নাই। আশার অন্ত এক ভগবানে, তাই কবি লিখিয়াছেন,

"তুমিই আমার এক
জীবনের সাধ আশা,
বেশী কি বলিব প্রভো,
আর তো জানে না ভাষা।"

বুদ্ধির উপর প্রকৃতি, প্রকৃতির উপরে পরমাত্মা। সাধকের সমাধিকালে বুদ্ধিতে পরমাত্মার ছায়া পড়ে তাই সমাধির পর সাধকের ভক্তিপ্লবণ হৃদয় হইতে ব্রহ্মানন্দের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। একজন সাধক বলিয়াছিলেন ;—'মরে গেলে ফিরে আসি যদি মনে রয়, তবে তো বলিতে পারি মরিলে কি হয়।' তাই মনে হয় সাধক কবি পুষ্পময়ী দেবী ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া লিখিয়াছেন,—

"তবে এক আশা সদা বুকে পুরে রাখি,
তাই পূর্ণ কর নাম,
এ আকাঙ্ক্ষা প্রিয়তম,
তুমি আমি ঘুচে দুই
এক হয়ে থাকি।"
"তোমাতেই মিশে যা'ক আমিত্ব আমার,
একটী বাসনা এই,
আর কোন সাধ নেই,
বারে বারে জন্ম মৃত্যু ঘুচুক এবার
তুমি আমি মিলে মিশে হই একাকার।"

প্রকৃত বৈরাগ্য কি ?—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা, তাহার প্রতি বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য। দেবী পুষ্পময়ী 'কতদিনে ত্যজিব', 'কেন এত ভাবি' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃত বৈরাগ্যের ছবি আঁকিয়াছেন।

কবি কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"নরদেহ ধরিয়া ধরায়,
বৃথা ত হেথায় আসি নাই,
যা' হয় এ ক্ষুদ্র ক্ষমতায়,
তব কাজ কিছু করে যাই।"

কর্ম্মের ফলটী ভগবানে অর্পণ করিয়া কবিতার শেষে কবি যদি আর চারিটী চরণ রচনা করিতেন, কর্ম্মযোগ সুসঙ্গত হইত বলিয়া মনে করি।

দেবী পুষ্পময়ীর কবিতা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক কবি। তাঁহার 'মন্দার' প্রকৃত পক্ষেই স্বর্গীয় সুষমায় ও পরিমলে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

গোলাপসার। শ্রীযুক্ত এস, সি সেন কৃত এক শিশি গোলাপসার আমরা সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি। প্রথমে শিশি খুলিতেই কি এক অপূর্ব্ব সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি গোলাপের গন্ধে ঘর আমোদিত হইল। বোধ হইল, যেন মহাশয় নন্দন-কানন হইতে কয়েকটি ফুল সংগ্রহ করিয়া এই এসেন্সটী প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী এসেন্স অপেক্ষা ইহার সুগন্ধের কোমলতার মধ্যে যেন কি এক মধুর মোহিনী শক্তি পরিলক্ষিত হইল। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য পরের জিনিস অপেক্ষা এই ঘরের জিনিস অধিকতর প্রীতিপ্রদ, উৎকৃষ্ট ও সুলভ বলিয়া বোধ হইবে।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা,] [কার্ত্তিক ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

সূচী।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০) প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)

কলিকাতা, ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট্ আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



विरहिणी—सैनिक पत्नी।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল [৭ম সংখ্যা।

বিজয়ার সম্ভাষণ।

—()—

শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজার বিজয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকারে আমরা আমাদের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সহযোগিগণকে যথোচিত অভিবাদন করিতেছি। মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা যেন প্রতি বর্ষেই এইরূপ হাস্যমুখে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণপূর্ব্বক ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া স্বদেশের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

আঁধার বঙ্গভূমি—তিন চারি দিনের জন্য দিব্য-প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল। মা আনন্দময়ী আসিয়াছিলেন; দিঙ্মণ্ডল আনন্দে পরিময় ছিল; সলিলে, অনিলে, আকাশে, ভূতলে—সর্ব্বত্রই আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল।

এখন আবার—আবার সেই গাঢ় অন্ধকার; বিজয়া-দশমীর বাদ্যোদ্যমের সহিত যখন আদ্যা-শক্তির স্বর্ণপ্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি; রজনীর প্রগাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের মধ্য দৃশ্য যখন পাষাণ প্রাণে অশ্রু-নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছে; তখনই বুঝিয়াছি মা চলিয়া গিয়াছেন—যে শ্মশান সেই শ্মশানেই আমরা পড়িয়া আছি। প্রকৃতি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কমল-নয়ন, হেমন্তের নৈশ-শিশির সম্পাতে, পুনরায় অশ্রুধারাভিষিক্ত হইতেছে।

কিন্তু আজ বিজয়োৎসব বলিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে আনন্দসাগরে মগ্ন হইবেন। সম্বৎসরের শত্রুতা [illegible] মনোমালিন্য ভুলিয়া, অবমানিত আক্রোশ ভুলিয়া মানব যে বাহুদ্বয়ে শত্রুর প্রাণ সংহার মানসে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল সেই বাহুদ্বয় প্রেমভরে প্রসারণপূর্ব্বক শত্রুকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিবে। আজ আনন্দের সীমা নাই, নরনারী সকলেরই প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এ আনন্দের দিনে পতিহীনা অনাথিনী বিধবার নীরব রোদন, মৃত পুত্র রত্নের জন্য মাতার আর্ত্তনাদ, দরিদ্রের অন্তস্তল সমুত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রবাহ যে বহিতেছে না তাহা নহে। তবে আনন্দ কোলাহলে তাহা ডুবিয়া যাইতেছে। এই মহৎ দিনে সসৈন্য মহিষাসুরের নিধন সাধন হইলে দেবগণ আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দধ্বনির অন্তরে নারীগণের হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ কাহার কর্ণগোচর হইতে দেয় নাই। এই বিজয়ার দিনে রাবণ বধ হইলে শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যগণ পরিবৃত হইয়া আনন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন। আনন্দরোলে রাক্ষসরমণীগণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি মহোৎসবে মত্ত বানরসৈন্যের কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিয়াছিল? আজ ভারতে সেই বিজয়ার সাম্বৎসরিক মহোৎসব। এই বিজয়া-উৎসব দিবসে পূর্ব্বে প্রধান হিন্দু রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিতেন। ভারতের রাজপুত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পুরাতন বীরজাতিরা মহাসমারোহে অস্ত্র-পূজার উৎসব করিয়া থাকেন। যে খড়্গ, শর, গদা প্রভৃতির সাহায্যে বীর রণে বিজয়ী হয়েন তিনি আজ মহাসমারোহে সেই অস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন। তবে কালের নিয়মে [illegible] সেই সকল প্রথাই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আর বীর [illegible] দান [illegible], শক্তি [illegible] অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহার পূজা করেন, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের কথা স্মরণ হয় যে বীরগণের বলবীর্য্যে ভারত পরিপূর্ণ ছিল, যাঁহাদের বাহুবলে ধরা কম্পিত হইত; তাঁহাদের কথা আজ মনে হয় এবং [illegible] মিলিত হইবা [illegible] আর সেই [illegible] পীড়িত হয়। [illegible] করিয়া হৃদয়ের শোক ক্ষণমধ্যে চাপিয়া দশজনের সঙ্গে মিলিয়া আজ বিজয়ার দিনে আনন্দোৎসব করেন।

জননীর প্রতি আমাদের সামান্যমাত্র ভক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়াও বোধ হয় না। একান্তিক আত্মবিস্মৃত একান্তিক ভক্তিহীন হইয়াও জননীর কৃপায় আমরা কখন বঞ্চিত নহি। মা যাইবার সময়ও আমাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কি কৃতঘ্ন আমরা যে, সব মুহূর্ত্তেই আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। শত্রু মিত্রে আত্মজ্ঞানে আলিঙ্গন অভিবাদন বিজয়ার এই সুমহান পবিত্র উপদেশ মা যে কর্ণে কর্ণে প্রদান করিয়া গিয়াছেন! সে কাজ মন! দিনান্তেই আমরা তাহা বিস্মৃত হইলাম! জগতে আত্মপর অভেদজ্ঞান একান্তিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর অধিক কি থাকিতে পারে? হিন্দুর "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই ধর্ম্মের কথা। এই মহা সার ধর্ম যদি প্রতি-পালন করিতে পারি, তবে আর আমাদের দুঃখ কি—ভাবনা কিসের? তাই বলিতেছিলাম ভাই! মায়ের শেষ উপদেশ যেন বিস্মৃত হইও না। এস

ভাই—শত্রু মিত্র, যে যেখানে আছ, সকলেই আমরা বিজয়ার পর হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন—অভিবাদন করি। জননীর শেষ আদেশ—শত্রু-মিত্রে আত্মজ্ঞান; ভাই এ উপদেশ, যেন জীবনে মরণে কখন বিস্মৃত না হই।

ঁউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

রাজগৃহের ইতিবৃত্ত।

- ৪০৪

এক্ষণে আমরা রাজগৃহের সুপ্রসিদ্ধ গিরিগুহা সমূহের প্রাচীন প্রাচীর মালার, পবিত্র হিন্দু তীর্থ-স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিব্রজ, বৈভার, বিপুল গিরি রত্নগিরি, উদয়গিরি ও সোণাগিরি এই পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপাণি গিরি-গহ্বর বৈভার পর্ব্বতে অবস্থিত। এই খানেই খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে প্রথম বৌদ্ধদিগের সভা আহুত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন বর্ত্তমান শোন-ভদ্র গিরিগহ্বর সপ্তপাণিগুহার নামান্তর মাত্র, এবং এই খানেই বুদ্ধদেব মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গভীর ধ্যানমগ্ন হইতেন। বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে ৩০০ হস্ত দূরে পিপোলো নামক আর একটা গিরি-গুহা আছে। এস্থানটীও বুদ্ধদেবের অতি প্রিয়স্থান ছিল; এবং এই স্থানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর ৫০০ আর্হৎ সমবেত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ ও মীমাংসা করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে বনভূমির মধ্যে, এক সুদীর্ঘ ভগ্ন প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন অজাতশত্রু এই সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৈভার গিরিমালায় আর একটি দুর্গম গিরিগহ্বর আছে। বিপুলপর্ব্বতে সুপ্রসিদ্ধ দেবদত্তগিরিগহ্বর বিদ্যমান আছে। কথিত আছে এখানে একজন ভিক্ষু ত্রিতাপ জ্বালায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। প্রাচীন রাজ-গৃহের বহির্ভাগ প্রকৃতি দেবী পর্ব্বত মালায় সুশো-ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু মধ্যভাগও রাজ-গৃহের সমৃদ্ধির দিনে কৃত্রিম প্রাচীর মালায় পরি-বেষ্টিত ছিল। যদিও সে সমুদয় স্থান এক্ষণে দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় স্থানে পরিণত হইয়াছে তথাপি ইহার ভগ্নাবশেষ আজও পর্য্যন্ত এই জঙ্গলময় প্রদেশে দৃষ্টি গোচর হয়। এবং এই প্রাচীরের পরিধি-পাঁচ মাইলের ন্যূন হইবেনা।

বৈভার এবং বিপুল পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সরস্বতী নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। এই নদীর জল হিন্দুরা অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই সরস্বতী নদীর পশ্চিমে বৈভার পর্ব্বতের পাদদেশে মার্কণ্ডেয় ক্ষেত্র নামে পরম পবিত্র তীর্থস্থান আছে। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নামে দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সরস্বতীর উত্তরে মাধবালয় তীর্থ। মাধব-আলয় তীর্থের কিয়দংশ উত্তরে একটি তীর্থস্থান আছে, এখানে বিভন্দক, গিরিমর্দ্দন, কপর্দ্দক, ব্রত-মোক্ষম এবং ধনেশ্বর নামক পঞ্চ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার দক্ষিণাংশে বনারিতারণ তীর্থ। বৈভার পর্ব্বতের পাদমূলেই ব্রহ্মকুণ্ড, ইহার কিয়দ্দূরে সপ্তর্ষি কুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমাংশে পঞ্চনদ তীর্থ। ইহা একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত এবং ইহার জল পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিপুল পর্ব্বতে সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড, রামকুণ্ড ও ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড নামে উষ্ণ প্রস্রবণ সমূহ বিদ্যমান আছে। এসমুদয় হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। শেষোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড মুসলমান ফকীরগণ মুকদাম কুণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

বৃষ্টি-তত্ত্ব।

—:০:—

"কুম্ভেন সহিতোভানুঃ সমুদ্রমপি শোষয়েৎ।"

"পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ"।

মেঘ হইতেই অন্নের সম্ভব। শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত পৃথিবীর কৃষককুল বৃষ্টিপাতের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জল না হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এবং জলই প্রাণীসমূহের জীবনধারণের প্রধান বস্তু বলিয়াই ইহার অন্যতম নাম জীবন। সাধারণলোকের বিশেষতঃ কৃষি-উপজীবী ব্যক্তিগণের কোন সময়ে কিরূপ পরিমাণে বৃষ্টি ও কোন সময়ে অনাবৃষ্টি হইবে তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। এবং পূর্ব্বে জানিতে পারিলে দৈব-প্রতিকূলতার কথঞ্চিৎ প্রতিকারও করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই বৃষ্টিপাতের উপর শস্যের উৎপত্তি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বৃষ্টিপাতের কারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্নভাবের মত প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন মতের মূল ও উপাদান একটী সামান্য ও সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত। অন্তরীক্ষে অনিল সমূহের (gases) মধ্যে উষ্ণতার হ্রাসই বৃষ্টিপাতের মূল কারণ। যখনই পৃথিবীর কোন স্থানে শুষ্ক বায়ু বর্ত্তমান থাকে, তখনই তদ্দ্বারা বাষ্পীভবন (evaporation) আরম্ভ হয় এবং সেই স্থানের আয়তন অনুযায়ী বাষ্পীভবন সম্পূর্ণ হইতে অধিক বা অল্প সময় লাগে। কিন্তু যে স্থানে বাষ্পীভবন হইতে থাকে সেই স্থানেই যে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কারণ, এমত হইতে পারে যে, বায়ুতে ভাসমান বাষ্পসমূহ মেঘাকারে ঘনীভূত হইয়া দৃশ্যভাবে অথবা অদৃশ্যভাবেই বাতাস কর্ত্তৃক বাষ্পীভবন স্থান হইতে বহুদূরে নীত হয় এবং উক্ত রূপে নীত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের বৃষ্টিরূপে পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বাতাস শুষ্ক ও শীতল থাকিলেই বাষ্পীভবন আরম্ভ হয়, কিন্তু সে সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অতি অল্প। ক্রমে উত্তাপের বৃদ্ধি এবং অকস্মাৎ বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তন ও আর্দ্রবাতাসের আবির্ভাবের সহিত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রায়ই দেখা যায়, উত্তাপের আধিক্য বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে কি কারণে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তনঘটে? কেন উত্তাপ বৃদ্ধির পর অকস্মাৎ বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস হয়? আমরা জানি শুষ্ক বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু অপেক্ষা অধিকতর ভারী, সুতরাং শুষ্কবায়ু অন্তরীক্ষের নিম্নভাগে থাকে এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণবায়ু উপরে উত্থিত হয়, ক্রমে বাষ্পীভবনদ্বারা শুষ্কবায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হয় এবং পরে সেই বাষ্প ঘনীভবন (condensation) দ্বারা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। এই ঘনীভবন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বায়ুর যে উষ্ণতার

পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেবল রবির সাময়িক গতি দ্বারাই সাধিত হয় না, কারণ, রবি প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্টদিনে একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, সুতরাং যদি কেবল তাহারই সাময়িক গতিদ্বারা উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে, আমরা প্রতি বৎসরেই এক এক নির্দ্দিষ্ট দিনে এক-স্থানে একপ্রকারই উষ্ণতার পরিচয় পাইতাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না, কোন বৎসর হয়ত গ্রীষ্ম অধিক হয় কোন বৎসর বা শীত অধিক হইয়া থাকে; এবং প্রতি বৎসরেই যে প্রতি ঋতু এক ভাবের হয়, তাহাও নহে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে উষ্ণতার এইরূপ পরিবর্ত্তন রবিরগতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংঘটিত হয়। অবশ্য, রবির সাময়িক গতিই সরিৎসাগরমণ্ডলা শস্যশ্যামলা ধরণীর ঋতু পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ, কিন্তু তাহা সাধারণ ভাবের। বায়ুর উষ্ণতার দৈনন্দিন, তার-তম্য গ্রহসকলের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান ভেদে সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, যখন রাশিচক্রে রবি এবং মঙ্গল অথবা বৃহস্পতি, কিম্বা মঙ্গল ও বৃহস্পতি পৃথিবীর সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করে, অর্থাৎ উক্তগ্রহদ্বয় রাশি চক্রে একত্রে বা ১৮০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত থাকে তখনই উষ্ণতারবৃদ্ধি এবং উক্তভাবে শনি বিদ্যমান থাকিলে উষ্ণতার হ্রাস হইয়া থাকে।

বৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার স্থান আমাদিগের নাই। আমরা সংক্ষেপে ও যাহাতে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে এরূপভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে রাশিচক্রে গ্রহদিগের যেরূপ ব্যবধানে অবস্থিতির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবধানেও উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি সমাহিত হইয়া থাকে। গ্রহদিগের পরস্পরের ব্যবধান জানিতে হইলে তাৎকালিক গ্রহস্ফুট স্থির করিতে হইবে। আজকাল বঙ্গদেশের প্রচলিত পঞ্জিকার মধ্যে অনেকগুলিতেই গ্রহস্ফুট প্রদত্ত থাকে। প্রতি দিনের পঞ্জিকার বাম পার্শ্বে গ্রহসমূহ সেই দিবস কোন রাশির কত অংশে অবস্থিত তাহা উল্লিখিত থাকে। গ্রহস্ফুটগুলিতে প্রথমস্থিত অঙ্কে মেষাদি হইতে ০, ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা রাশি নির্দ্দিষ্ট থাকে, পরবর্ত্তী অঙ্কে অংশ কলাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে। এক এক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, সুতরাং দ্বাদশ-রাশি সম্বলিত রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। এই রাশিচক্রে গ্রহগণের কয়েকটি বিশেষভাবের অবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইবে। যখন একটী গ্রহ অন্য গ্রহের সহিত এক অংশে অবস্থান করে অথবা অন্য গ্রহ হইতে ৬০, ৯০, ১২০ বা ১৮০ অংশ দূরব্যবধানে থাকে তখন তাহাদিগের শক্তির বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়।

মনে কর, ১৫ই বৈশাখের দিন পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল যে উক্তদিবস রবি মেষ রাশির ১৫ অংশে অবস্থিত উক্তদিবস শনি কর্কট রাশির ১৫ অংশে, মঙ্গল কুম্ভরাশির ১৫ অংশে, বৃহস্পতি মেষ রাশির ১৫ অংশে, শুক্র ধনুরাশির ১৫ অংশে এবং বুধ তুলারাশির ১৫ অংশে অবস্থিত। এস্থলে দেখা যাইতেছে রবি বৃহস্পতির সহিত একত্রে অবস্থিত এবং রবি ও বৃহস্পতি হইতে শনি ৯০ অংশ, বুধ ১৮০ অংশ মঙ্গল ৬০ অংশ এবং শুক্র ১২০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত; শনি হইতে বুধ ৯০ অংশ ব্যবধানে, বুধ হইতে শুক্র ৬০ অংশ ও মঙ্গল ১২০ অংশ ব্যবধানে, এবং শুক্র হইতে মঙ্গল ৬০

অংশ ব্যবধানে অবস্থিত। এইরূপে প্রথমে গ্রহদিগের মধ্যে পরস্পরের পূর্ব্বোক্ত ব্যবধান নিরূপণ করিতে হইবে।

গ্রহদিগের মধ্যে রবিকে গ্রহরাজ কহে; কারণ, রবিই সৌরজগতের কেন্দ্র ও আদি; মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল গ্রহই তৎসম্ভূত। একমাত্র রবি হইতে সমস্ত জগত আলোকিত ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা, নানাবিধ তরুলতা, নানাবর্ণ ফুল-ফল, পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি জীবপ্রবাহ, নদী, হ্রদ, সাগর ও বিষয়সমৃদ্ধি সকলের মধ্যেই সূর্য্যরশ্মি অন্তর্লিপ্ত। সুতরাং অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা রবির সহিত অপর গ্রহসকলের পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধান বিশেষ ফলপ্রদায়ক। কিন্তু অনেকস্থলে অন্যান্য গ্রহদিগের মধ্যেও উক্তরূপ ব্যবধান ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

আবার, সকলগ্রহের সমান গতি নহে; কোন গ্রহের গতি ক্ষিপ্র এবং কোন গ্রহের গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু। সুতরাং, গ্রহগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যবধানই একদিনে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় না। উক্ত ব্যবধান যত সম্পূর্ণ হইতে থাকে গ্রহদিগের ফলপ্রদায়িনী শক্তি ততই বৃদ্ধি পায় এবং আবার যতক্ষণ না উক্ত ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের শক্তি কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, গ্রহদিগের মধ্যে উক্তরূপ কোন ব্যবধান সম্পূর্ণ হইবার দুই তিন দিবস পূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে।

বহুবার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে দিবস শনি, শুক্র এবং বুধ, রবি এবং কখন কখন চন্দ্র * হইতে অথবা আপনাদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৬০, ৯০, ১২০, ১৮০ অংশ ব্যবধানে বা একত্রে অবস্থিত থাকে সেই দিবস বা তাহার পূর্ব্ব-পর দুই দিবসের মধ্যে বৃষ্টিপাত হয় অথবা বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস হয়। বুধগ্রহে বৃষ্টি অপেক্ষা ঝটিকারই প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, যে দিবস মঙ্গল বা বৃহস্পতি, রবির সহিত একত্রে অথবা পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধানে থাকে, সেই দিবস বা তাহার পূর্ব্ব-পর দিবসদ্বয়ের মধ্যে সাধারণতঃ উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ত্তমান ১৯০৭ সালের বিগত জুলাই মাসের ৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত চারি দিবসের কলিকাতা আলিপুরের মানমন্দিরে পরিলক্ষিত বৃষ্টিপাতের তালিকা ও উক্ত দিবসচতুষ্টয়ে গ্রহদিগের ব্যবধান উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বৃ
(
৭ই
হই
সা
উপ
হপ্
অং
মঙ্গ
অংশে

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

* চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়া, অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সমান ফলপ্রদ হয় না। তথাপি সময়ে সময়ে ইহার বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

প্রার্থনা।

—;*:—

দাও, দেখিতে দাওহে, ভুবন মোহন!
তোমারে পরাণ ভরিয়া।
লও, কৃপা করি লও হে, মনো হরণ!
আমার মানস হরিয়া॥
প্রভু, তোমার মোহন বাঁশরী শ্রবণে
শ্রুতিযুগ যাক্ গলিয়া।
যাক্ অহরহ যাক্, তব গুণগানে,
রসনা অবশ হইয়া॥
দাও, পরশমাণিক, চরণ পরশে,
মমতা বাঁধন খুলিয়া।
তব, তরূপ-মাধুরী দেখিহে হরষে
বিষয়-বাসনা ভুলিয়া॥

বিনীত—
শ্রীগৌর গোপাল সেন।
মালদহ।

বঙ্গভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের পরিভাষা।

—:•:—

যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজি হইতে অনুবাদাদি করিব সে পর্য্যন্ত একমাত্র তদ্ শব্দের রূপ আমাদের জানা থাকিলেই যথেষ্ট। ব্যবহারতঃ সুবিধার জন্য সম্প্রতি আমরা নিতান্ত কার্য্যানুরোধে নিম্নলিখিত ভাবে কেবল তদ্ শব্দেরই রূপচয় ব্যবহার করিয়াছি।

তদ্ স্ত্রীলিঙ্গে একবচনে।

কর্ত্তা	সা	She
কর্ম্ম	তস্যাকে	her
করণ	তস্যাকর্ত্তৃক, দ্বারা	by-her
সম্প্রদান	তস্যাকে	to her
অপাদান	তস্যা হইতে	from her
সম্বন্ধ	তস্যার	her or hers
অধিকরণ	তস্যাতে	in her

তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে যেমন "তাহা শব্দ মূল; এথায় অতি প্রাচীন ব্যবহৃত "তস্যা" শব্দকে মূল ধরিয়া তাহাতে চলিত বিভক্তিচয় যোগ করিয়া তাহাদের রূপচয় প্রদত্ত হইল।

"তস্যার" এই ষষ্ঠ্যন্ত স্ত্রী-সর্ব্বনামের ব্যবহার আমাদের নূতন নহে; অনেক প্রাচীন দলিলপত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। "ভবদাসীর স্বামীবিয়োগের দুই মাস পরে "তস্যার" তৃতীয় পুত্রের জন্ম। * * " প্রকাশ থাকে যে "তস্যার" গর্ভলাভের পূর্ব্বেই "তস্যার" পুত্রেরা মাতার জীবনে এই সম্পত্তি খরিদ করেন।" এতাদৃশ "তস্যার" ব্যবহার বাঙ্গালায় অনেক পূর্ব্বকাল হইতে আছে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। কোন কোন প্রাচীন দলিল পত্রাদিতে "তস্যাকে' শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়. "যদিচ রূপলতার পিতা "তস্যাকে' ভালবাসিত" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই কাল হইতে বোধ হয় "বিলাসমণি দাস্যার' সম্পত্তি; "কৃপাময়ী দাস্যাকে" তাহার মাতুল এই সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন; এইরূপ লেখা হইতেছে। উক্ত কাল হইতেই পুং আদি "তাহার" স্থানে "তস্

শব্দের অসংখ্য ব্যবহার দেখা যায়। ঘটকদিগের কুরসি নামাতে দেখিবে "তস্য পুত্র অমুক, তস্য পুত্র অমুক ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং স্ত্রী সর্ব্বনাম জন্য "তস্যা" শব্দকে মূল শব্দ ধরা বোধ হয় আমাদের নিতান্ত অন্যায় হয় নাই। এই সমস্ত ব্যবহার ঠিক সংস্কৃতের সূত্রানুযায়ী শুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারে চলিত, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্যসাধক। এবং স্ত্রী-সর্ব্বনাম যে, বঙ্গভাষার জন্য প্রয়োজন তাহারই প্রমাণ সন্দেহ নাই।

ইহাদের দ্বিবচন "দ্বয়" যোগে হইবে। যথা ঃ সাদ্বয়, তস্যাদ্বয়কে, তস্যাদ্বয় দ্বারা বা কর্তৃক, তস্যাদ্বয়কে, তস্যাদ্বয় হইতে, তস্যাদ্বয়ের, তস্যাদ্বয়েতে।

ইহাদের বহুবচন "গণ" এবং "দিগ" যোগে হইবে। যথা ঃ—তস্যাদিগকে, তস্যাদিগের কিংবা তস্যাদিগ-কর্তৃক, তস্যাদিগকে, তস্যাদিগের হইতে কিংবা তস্যাদিগ হইতে, তস্যাদিগের কিম্বা তস্যাদের, তস্যাদিগেতে।

সম্মানার্থ প্রয়োগ প্রচলিতমত চন্দ্রবিন্দু দ্বারা হইবে। যথা ঃ—সাঁ, তাঁস্যাকে তাঁস্যার ইত্যাদি।

যখন বঙ্গভাষার সৌভাগ্য সময় আসিবে এবং জাপান, চিন, জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি নানা ভাষা হইতে "নানাবিধ আবশ্যকীয় বিষয় অনুবাদ করিতে হইবে তখন স্ত্রী সর্ব্বনামের সাধারণ পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন হইবে তাহা যেন প্রাণের ভিতরে কেহ বলিয়া দিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রী চন্দ্রশেখর কালী, এল্, এম্, এস্।

সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয়।

—:০:—

গাঁয়ের একপাশে আমাদের কুঁড়ে ঘর। বাবা বিদেশে চাকুরী করেন। কাকা আমাদের ঘর সংসার দেখ্তেন। কাকা লোকটী খুব সাদাসিদা রকমের, প্রাণটা বড়ই খোলা। তিনি নামেই সংসার দেখ্তেন; বস্তুতঃ ঠাকুর মা যা করেন তাই হোতো, তবে ফায়টা ফরমাসটা মাঝে মাঝে কাকা শুন্তেন এই যা তাঁর সংসার দেখা। নতুবা সারাদিন কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন আর পরের ব্যাগার দিতেন। ঘরের ছাড়া অপর যাহারই কোন কাজ হোক্ না সব যেন তাঁর নিজের কাজ, কাঠ কাটিতে হইবে লোকে কাকাকে ডাকে; ঘর ছাইতে হবে কাকাকে ডাকে; কাহারও বাটী বিবাহে পরিবেশন করিতে হবে—কাকাকে ডাকে। অমুক লোককে অমুক জায়গায় রেখে আস্তে হবে —কাকা বলেন "চল যাচ্ছি।" কেহ বলে "ওহে আমার এই কাজটা করে দাওনা ভাই।" কাকা অমনি প্রস্তুত। সন্ধ্যার সময় কেহ যদি বলে, "ওহে, আমাদের পাতকুয়ায় ঘড়াটা পড়ে গেছে, তুলে দেবে?" অমনি কাকা এক খাব্লা তেল মাথায় দিয়া পাতকুয়ার ভিতরে নামিল। বিয়ের কি বারয়ারীতলার আসর তৈয়ার করিতে হইবে কাকার ডাক পড়িল—বাঁশের উপর কাকার কাটারি ঘন ঘন চলিতে লাগিল। গাঁয়ের লোকের যখন যা দরকার হয়—কাকাকেই ডাকে। কাকাও কোন কাজে "না" বলেন না। ঠাকুর মা এইজন্য কাকাকে তিরস্কার করিলে, কাকা বড় রাগ করিতেন ও সে

দিবস গাঁয়ের মুদীর যে বেশ দুপয়সা লাভ হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাকার শরীর খানি বেশ কালো কালো হৃষ্ট পুষ্ট; মুখখানিতে সরলতা মাখান। সবাই তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর কাজ পছন্দ করে। তবে কাকার মেজাজ্‌টা খাঁ করিয়া চটিয়া যায়, এইটুকু তাঁর দোষ।

আমাদের গাঁয়ে এক চোর ছিল। ছেলেবেলা থেকে চুরি করিতে করিতে তাহার বহুদর্শিতা জন্মিয়া গিয়াছিল। এখন বুড়ো হয়েছে ব'লে সব কাজ আর একলা পারিয়া উঠিত না। সুতরাং, রোজগারটা কম হওয়ায় ও একলা আর না পারায় একটা জোগাড় ধরিবার উদ্দেশে একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাটী আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর মা তখন ভাত চড়াইয়া উনানে ধীরে ধীরে জ্বাল দিতেছিল এবং মাঝে মাঝে উনান নিবিয়া ধোঁয়া হইতেছিল বলিয়া, ফুঁ পাড়িয়া, ধোঁয়া লাগা চোখ বুজিয়া, দাঁত মুখ সিটকাইয়া উনানের পিতৃপুরুষের উপর গালি বর্ষণ করিতেছিল।

এমনসময় চোর আসিয়া ধীরে ধীরে কাকার নাম ধরিয়া ডাকিল। ঠাকুরমা চোরকে চিনিতেন এবং এই সময় তাঁহার মেজাজ গরম ছিল, সুতরাং তাহাকে গালি দিয়া বাটী হইতে দূর করিলেন।

কাকা প্রায়ই ঝোঁকে থাকিতেন, এবং প্রায়ই যে কাজ করিতে বারণ করা হইত আগে তাহাই করিতেন পরে অনুতাপ ইত্যাদির কথা ভাবিতেন।

ঠাকুরমাকে চোরকে বকিতে দেখিয়া কাকার রাগ হইল। কাকা তাহাকে আস্তে আস্তে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হে, কি চাও?—মায়ের কথা শুন না, তোমার কি দরকার বল দেখি?' তখন চোর তাহার কাছে গিয়া বলিল, "ওহে, একটা কাজ কত্তে পার?"

কাকা। কি কাজ?

চোর। দেখ, আমি চুরি চামারী করি, তা'ত তুমি জানই। তা' আমি একা ত আর আজকাল পেরে উঠ্‌ছিনা। তুমি আমার সঙ্গে যোগাড় দিতে পার? আমি তোমাকে কিছু বকরা দিব।"

কাকা নেহাৎ সরল লোক, ভাল মন্দ বিশেষ একটা কিছু বুঝেন না। বিশেষ, তাঁর কখনও কোন কাজে "না" বলা অভ্যাস নাই। 'যোগাড় দিবার' কথা শুনিয়া তিনি অম্লান বদনে কহিলেন, "তা পারবোনা কেন? কি ক'ত্তে হবে?"

চোর কহিল, "বেশী কিছু না। সে সব পরে টের পাবে। মোট কথা এই, যে আমি যেমন যেমন বল্‌ব', তোমায় তেমনি তেমনি কত্তে হবে। বুঝেছ ত?"

কাকা কহিলেন, "তা পারবো।"

চোর। আজ রাত্রেই এক জায়গায় যেতে হবে। তবে, তুমি এখন খাওয়া দাওয়া কর। রাতে আমি এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। তুমি জেগে থেক'। আমি এখন যাই।

এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। ঠাকুরমা কাকাকে যারপর নাই বকিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। কাকা যখন একটা গোঁ ধরিয়াছেন তখন কিছুতেই ছাড়িবেন না। তিনি বলিলেন, "একবার সঙ্গে যাব, তাতে আর হয়েছে কি?"

ঠাকুরমা। যদি পুলিসে ধরে?

কাকা। দৌড়ে পালিয়ে আস্‌বো।

ঠাকুরমা বেগতিক দেখিয়া চুপ করিলেন। পরে আমরা সকলে খাওয়ার পর ঘুমুতে গেলাম।

রাত্রি দশটা হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে এখন ত গভীর রাত্রি। কোথায়ও সাড়া শব্দটী নাই, মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের চীৎকার আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। এমন সময়ে চোর আসিয়া আস্তে আস্তে কাকাকে ডাকিল। কাকা উঠিয়া চোরকে দরজা খুলিয়া দিলেন।

চোর কহিল, "চল, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। দেখ, তোমাকে আমি যেমন যেমন ক'র্‌তে বল্‌বো ঠিক সেই রকম ক'র্‌বে। বুঝেছ'ত ?"

কাকা, "আচ্ছা" বলিয়া একখানি গামছা কাঁধে লইলেন, এবং ঘর বন্ধ করিয়া চোরের সঙ্গে চলিলেন। পথে কি হইয়াছিল তাহা আমি নিজে দেখি নাই, পরে কাকার মুখে যাহা শুনেছিলাম তাহা বলিতেছি।

চোর ও কাকা দুজনে পথে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া, শেষে এক গৃহস্থের বাড়ী পঁহুছিলেন। চোর সেই বাড়ীর পিছনে পাঁদাড়ে কাকাকে বসাইয়া চুপি চুপি কহিল, "দেখ, তুমি এইখানে চুপ ক'রে বসে থাক। আমি আসছি।" কাকা বলিলেন "আচ্ছা!" কাকা পাঁদাড়ে লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। চোর দেওয়ালে সিঁদ কাটীয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কাকা পাঁদাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এ কি তাঁর পোষায় ? অনেক দেরী হইল, চোর আর ফিরিয়া আসে না। সেখানে মশা বোঁ বোঁ করিতেছে ও কাকার সর্ব্বাঙ্গে কামড়াইতেছে। বেচারা অনেকক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। "ভাল বিপদ! আরে দূর!" এই কথা বলেন আর চটাস্ পটাস্ চড় মারিয়া গায়ের মশা মারেন। তারপর যখন দেখিলেন, চোর তখনও ফিরিতেছে না, তখন চটিয়া গিয়া, পাঁদাড় হইতে বাহির হইয়া, সিঁদের ভিতর দিয়া একবারে বাটীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। ছুটা চারিটা মশা বোঁ বোঁ করিতে করিতে সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তাহাতে তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আরে গেলো যা! আবার এখানেও ?" এই বলিয়া মশা মারিবার জন্য নিজের পিঠে মাথায়, গালে, চটাপট্ চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে গৃহস্থেরা জাগিয়া উঠিল এবং "কেরে ? কেরে ?" করিতে করিতে বাহিরে আসিল। চোর বেগতিক দেখিয়া, আগেই চম্পট দিল। কাকাকে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তুই এখানে কেন ?"

কাকা মহা চটিয়া, অথচ সম্মানের সহিত উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, মশাইয়ের বাড়ীতে সিঁদ হয়েছে!

তখন তাহারা আলো জ্বালিয়া সিঁদ দেখিতে পাইল। ভাবিল, কাকা বুঝি চোর ধরিতে আসিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া পরদিবসের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিল।

পথে আসিয়া চোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চোর কহিল, "তুমি কি কল্লে বল দেখি ? সব মাটী কল্লে ?"

কাকা। তা ভাই, আমি কি কর্‌বো বল ? যে মশা কামড়াতে লাগলো ? আর তুমিও অত দেরী করে লাগ্‌লে। আমার রাগ হয়ে গেল।"

চোর। আচ্ছা, তবে চল, আর একজায়গায় যাই।

এই বলিয়া তাহারা অন্য এক বাটীতে উপস্থিত হইল। চোর সিঁদ কাটিয়া কাকাকে বলিল "এবার তুমি যাও। গিয়ে, জিনিষ পত্র নিয়ে এসে

আমাকে দাও। খুব চুপি চুপি যাও। দেখ যেন দোর খুলতে শব্দ না হয়।"

কাকা ঘাড় নাড়িয়া বাটীর ভিতর ঢুকিলেন। একটী দরজায় গিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিলেন। তাহাতে কেঁা করিয়া একটু শব্দ হইল। কাকা চমকিয়া, হাত গুটাইয়া চুপিচুপি কহিলেন, "এই বা বারণ করেছে তাই!" একটু থামিয়া আবার দরজাটা আর একটু ঠেলিলেন। পুনরায় শব্দ হইল। কাকা এইবার চটিলেন। মুখ ভ্যাং চাইয়া একটুচেঁচাইয়া কহিলেন, "আবার"? একটু পরে আবার আর একটু বেশী করিয়া দরজাটা ঠেলিলেন। এবার খুবজোরে শব্দ হইল "কোঁ—ওঁ ওঁ।" কাকার আর সহ্য হইল না। একেবারে রাগিয়া কহিলেন, "কেবলকোঁ—! আচ্ছা, কত কেঁা করবি কর্!" এই বলিয়া দরজার কপাট ধরিয়া একবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিলেন। দরজা কাতর হইয়া "কোঁ-কোঁ" শব্দ করিতে লাগিল।

এদিকে চোর দেখিল, মহা বিপদ! এখনই হয়ত গৃহস্থ জাগিয়া উঠিবে। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া অন্যধারে লইয়া গিয়া কহিল, এ ঘর নহে, ঐ ঘরের জিনিস পত্তর সরিয়ে এই খানে নিয়ে এস। আমি এই খানে দাঁড়িয়ে রহিলাম।"

কাকা ঘাড় নাড়িয়া অন্য ঘরে ঢুকিলেন অনেকক্ষণ পরে চোরের নিকট আসিয়া কহিলেন, "ও ভাই, কি আনবো"?

চোর কহিল, "দূর বোকা; এতক্ষন পরে শুধুহাতে এসে বলেঁ কিনা কি আনবো? যাও বেশ একটু ভারি জিনিস, যা বাজে এমন ধারা দেখে নিয়ে এস। বাজিয়ে নিয়ে আসবে বুঝেছ"?

কাকা আবার গেলেন। গিয়া দেখিলেন একখানা খোল দেয়ালে ঝোলান আছে। ভাবিলেন "এইত বাজে!" আর ইতস্ততঃ না করিয়া, খোলটাকে গলায় দিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন। বাজনার শব্দে গৃহস্থ জাগিয়া উঠিল। বলিল "কেরে? কেরে? খোলবাজায় কে?" কাকা দৌড়িয়া তখন সিঁদের কাছে আসিয়াছেন। গৃহস্থ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ওদিকে চোর তাহাকে বাহির করিবার জন্য সিদের ভিতর দিয়া টানিতে লাগিল। খোল গলায় থাকায় কাকা সিদে আটকাইয়া গেলেন। চোরও বেগতিক দেখিয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। গৃহস্থ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই খোল নিয়ে যাচ্ছিস কেন?"

কাকা। আমাকে বাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে যে।

গৃহস্থ। কে বাজিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে?

কাকা তখন আগাগোড়া সব কথা বলিলেন। গৃহস্থেরাও হাসিয়া খুন। তাহারা কাকার সাহয্যে চোরকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহার কয়েদ হইল। কাকাও আর কখনও ঠাকুরমার অবাধ্য হইতেন না।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দাসী।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

——:0:——

জলের মধ্যে যত প্রকার রূঢ় বা যৌগিক পদার্থ আছে তদ্ব্যতীত খোল, পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র, শস্য শরীরের ও বৃক্ষলতা পাতার পচানী, মনুষ্যের খাদ্য ভাত, ডাল প্রভৃতি এই সকলই মৎস্যের খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ও খোলে নাইটারজান ও প্রস্ফরস্ মিলিত অম্লের ভাগ অত্যন্ত বেশী। কার্পাস বীজের খোল অত্যুৎকৃষ্ট ইহাতে হাজার করা নাইটারজান্, ৬৬০ ভাগ প্রস্ফরস মিলিত অম্ল ৩১২ ভাগ থাকে। খোল মৃত্তিকা কি অন্য কোন মৎস্য খাদ্যোপযোগী দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পচাইয়া জলে ফেলা উচিত। (২) গোময় মৎস্যের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য; ইহা ভিন্ন অশ্ব, ছাগোল, শূকর, মেষ কুকুর প্রভৃতি পশু সকলের বিষ্ঠাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। (৩) জন্তুর চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি পচা কিম্বা পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইলে মৎস্যের উত্তম খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কেঁচো ছোট ছোট অব্যবহার্য্য মৎস্য পচাইয়া সময়ে সময়ে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের অব্যবহার্য্য এমন অনেক ছোট ছোট মৎস্য আছে যাহা পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের খাদ্য হইতে পারে। (৪) শম্বুক সচরাচর জলে থাকে, এবং মৎস্যের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। মৎস্যের পোনার পক্ষে শম্বুক ও গেঁড়ি ভাঙ্গা বিশেষ উপযোগী। (৫) যে পুকুরে মৎস্যের চাস করা যাইবে তাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগের আহারীয় পদার্থ অর্থাৎ পর্য্যুসিত ডাল, ভাত ইত্যাদিও ফেলা উচিত এবং থালা বাসন ধুইতে নিষেধ করা উচিত নয়। (৬) সমস্ত পুকুর ব্যাপিয়া দাম থাকিলে মাছের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না কিন্তু পুকুরে খানিকটা দাম রাখা উচিত এতদ্ভিন্ন পুকুরে পানিফলের চাস করিতে দেওয়া মন্দ নয়। পুকুরে পানিফলের চাস করিতে দিলে চারিধারে যেন চাস করা না হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড় খোলা রাখা নিতান্ত উচিত, কারণ কতক গুলি পুষ্পের ন্যায় মৎস্যেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে ইহারা সূর্য্যোদয় হইলে জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তে এবং অস্ত যাইবার সময় পূর্ব্বপ্রান্তে যাইয়া ক্রীড়া বা বিচরণ করিতে থাকে।

আলো হইতে বঞ্চিত থাকা কোন জীবেরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে। (৭) মৃত্তিকায় যবক্ষারজান্, পটাস্, ফসফরিক অম্ল প্রভৃতি যৌগিক ও রূঢ় পদার্থ আছে, সময়ে সময়ে গোময় ও মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া পুকুরে ফেলা যাইতে পারে। উপরে যত গুলি খাদ্য লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন কুঁড়ো মদের মেয়া, পনির, পাঁউরুটি, মুড়ি, আলু, পচা গলিতপত্র, শাঁক, গেঁড়ী, প্রভৃতি অনেক রকম পদার্থ আছে, যাহা মৎস্যের খাদ্যের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে। জলাশয়ের নিকটে গোশালা সংস্থাপিত হওয়া মন্দ নয় এবং গোশালা হইতে দুই একটী প্রণালী জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। নিকটে রজকের বাসস্থান থাকিলে ভাল হয়। রজকগণ যে সকল মলিন বস্ত্র পুকুরে ধৌত করিবে তাহাতে মৎস্যের উপকার ভিন্ন অপকারের আশঙ্কা নাই।

একণে কি উপায়ে মৎস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার উপায় সম্বন্ধে আমরা একণে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এতদ্দেশে অনেককাল হইতেই

মৎস্যের পোনা পুকুরে ছাড়িয়া মৎস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার একটী উপায় চলিয়া আসিতেছে। মৎস্য ব্যবসায়ী জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে মৎস্যের পোনা ধরিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আজকাল অনেক জেলে নদী হইতে মৎস্যের ডিম্ব ধরিয়া মৎস্য জন্মাইতেছে। এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে অল্প ব্যয়ে যে অনেক মৎস্য জন্মান যাইতে পারে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের বড় বড় নদী, খাল, বিল, পুকুরে মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী যত জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যে সকল মৎস্য সমুদ্র কিম্বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, কেবল বর্ষা ঋতুতে ডিম্ব প্রসব করিবার সময়ে অথবা আহারীয় দ্রব্যের জন্য সময়ে সময়ে অপ্রশস্ত নদী ও খালে যাতায়াত করে ঐ সকল মৎস্যকে স্থান পরিবর্ত্তনশীল এবং যে সমুদয় মৎস্য নদী, খাল, বিল ও পুষ্করিণীতে সদা সর্ব্বদা বাসকরে, ডিম্ব প্রসব বা আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিবার জন্য কখন স্থানান্তরে যায় না তাহাদিগকে স্থান অপরিবর্ত্তন-শীল মৎস্য কহে। ইলিস, ভোলা, খরশুন জাতীয় মৎস্য প্রথম শ্রেণী এবং রোহিত, মিরগাল কাতলা, কৈ, মাগুর, প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। রোহিত মিরগাল কাতলা জাতীয় মৎস্যগুলিকে আপাততঃ স্থানপরিবর্ত্তনশীল মৎস্য বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ইহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। উপরি উক্ত মৎস্য সমূহের ডিম্বাদি কি পোনা সাধারণতঃ আমরা নদী খাল ইত্যাদি স্রোত জল হইতে প্রাপ্ত হই।

ক্রমশঃ

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

হোমিওপ্যাথি ও অস্ত্রচিকিৎসা।

—(১)—

সাধারণের মধ্যে একটি বড়ই ভুল বিশ্বাস আছে যে হোমিওপ্যাথি মতে অস্ত্র চিকিৎসা নাই। এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস যে কতই ভ্রমসঙ্কুল তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অস্ত্রোপচার একটি চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ এবং উহার সহিত অ্যালোপ্যাথদিগের ও যেমন সম্বন্ধ হোমিওপ্যাথগণের সহ ও তেমনি সম্বন্ধ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আজিও স্থানে স্থানে নূতন মতের চিকিৎসা বলিয়া বিদিত রহিয়াছে। এখানে উহা এখনও উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে অস্ত্রোপচার প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ের সমুদয় উচ্চাঙ্গলাভ করিয়া perfect বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই। আমেরিকা ও ইয়ুরোপের নানা স্থানে এই মতের চিকিৎসা পুরাতন মতাপেক্ষা কোন অংশেই কোন বিষয়ে ন্যূন নহে। অ্যালোপ্যাথ হাঁসপাতালেও যেমন প্রভূত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেইরূপ হোমিওপ্যাথি হাঁসপাতালেতে সুন্দর অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবেঅ্যালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথদিগের মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসার বিশেষ মতদ্বৈধতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্তগণের মতে অস্ত্র-চিকিৎসার সুবিধা ও উপায় থাকিলেই উহা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে কিন্তু শেষোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন যে যাহা ঔষধেই সুসাধ্য হইবে তাহার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিয়া রোগীকে কষ্ট দেওয়া যায়

কেন? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ফলে উক্ত মতাবলম্বীগণেরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ রোগীর যন্ত্রণা উপশম করিয়া ব্যাধিমুক্ত করা।

আমরা অস্ত্র-চিকিৎসার বিরোধী নহি তবে যথা-সাধ্য চেষ্টাদ্বারা ঔষধ প্রয়োগেই ব্যাধিনির্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। যেখানে অস্ত্র প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া থাকি তথায় বাধ্য হইয়া তাহার সাহায্য লইতে হয়। অস্ত্র প্রয়োগের যেমন সুফল দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ অনেক স্থলে কেবল মাত্র যে উহারই জন্য বিষময় ফল ফলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে কিন্তু হোমিও-প্যাথি মতের চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগ জনিত কোন প্রকার মন্দফল ফলিয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। পীড়াবিশেষে ইহাতে দেখা গিয়াছে যে অস্ত্রপ্রয়োগে পীড়া এককালীন আরোগ্য না হইয়া উপশম হইয়াছে মাত্র কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে যাহা উপশম হইবে তাহা একেবারে radically আরোগ্য হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে অস্ত্র প্রয়োগ অপেক্ষা হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় আমরা দুইটি a vantage লইতেছি যথা, (১) পীড়ার মূল উৎপাটিত হইয়া এককালীন আরোগ্য হওয়া; (২) ঔষধ প্রয়োগ জনিত আশু মৃত্যুভয় সম্ভাবনা না থাকা। ভাবিয়া দেখিলে ইহা সামান্য সুবিধার কথা নহে। আমরা বহুসংখ্যক রোগীতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতে পারি কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্থানাভাব। সদ্য অস্ত্রোপচার না করিলে যে রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন এমত রোগীও আমাদিগের হস্তে আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। হোমিও-প্যাথির পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের পরিচয় নহে! নিম্নে একটি রোগীর বিবরণ দিয়া পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমান্ গনেশচন্দ্র দে হিন্দুবালক, বয়স ১০।১২ বৎসর পিতার নাম শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে নিবাস কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সিমলা পোঃ অঃ।

৩ মাস পূর্ব্বে একদিন প্রাতে আমার ডাক্তার খানায় আসিয়া উপস্থিত। পরীক্ষায় দেখিলাম তাহার গলদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটি কমলা লেবুর ন্যায় গণ্ড উত্থিত হইয়াছে, উহা অতিশয় নরম তুল্ তুল্ করিতেছে—দেখিলেই পুঁষ সংযুক্ত হইয়া পাকিয়াছে বলিয়া বোধ হয় কিন্তু কোন প্রকার লাল হয় নাই বা তাহাতে কোন বেদনা নাই। গলদেশে ইতঃস্ততঃ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই চারিটি কাটালের বিচির মত গণ্ড রহিয়াছে দেখা গেল। বালকটির আকৃতি গৌরবর্ণ স্ক্রফুলা ধাতুর constitution কিন্তু স্থূলকায় নহে। শুনিলাম যে প্রায় ৪ মাস হইবে পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে এবং ঐ গণ্ডদ্বয় ক্ষুদ্রাবস্থা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ একজন কলিকাতা মেডিকাল কলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষো-ত্তীর্ণ কৃতবিদ্য বিচক্ষণ অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক দেখিতেছিলেন। এ যাবৎ তাঁহাদের বিদিত সমুদয় প্রকার ঔষধ প্রয়োগে উহা বসাইতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বা ফাটাইতে পারেননাই। আজ কয়েকদিন হইতে বলিতেছেন যে অস্ত্র ব্যবহার ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। বালকের পিতা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে হোমি-

ওপ্যাথি দেখাইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রথমে এক জন সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথের দ্বারা ৮।১০ দিবস চিকিৎসান্তে আমার নিকট লইয়া আসেন। সমুদয় অবস্থা দৃষ্টে রোগমুক্ত হইতে বিলম্ব হইবে আমি বলিয়া দিলাম এবং ইহাও সাহস করিয়া বলিলাম যে বিনা অস্ত্র ব্যবহারে শুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগেই উহা আরোগ্য করিব। মহাত্মা হানিম্যানের আবিষ্কৃত ঔষধই যে আমাদের উক্ত সাহসের মূল তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শশী বাবুর একটি জামাতা লিভারের ফোটকে অস্ত্র-ব্যবহার মারা গিয়াছিল সুতরাং তিনি যে আমার আশ্বাসবাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে অস্ত্র প্রয়োগের লোভ সম্বরণ দুষ্কর। বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে অস্ত্র প্রয়োগ করি কিন্তু বালকের পিতার কথা শুনিয়া তাহাতে বিরত হইলাম অন্য অবস্থায় হইলে হয়ত আমিও প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগে উহা কর্ত্তন করিতাম।

যাহা হউক উভয় গণ্ডদ্বয়ের উপর গরম পোলটিস্ মসিনার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে সাল্ফ-আইড ব্যবস্থা করিলাম। ৩ দিবস পরেই দেখিলাম একটি গণ্ড আপনা হইতে ফাটিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে কোন প্রকার পূঁয বা রক্ত নির্গত না হইয়া কেবলমাত্র জল এবং সাদা লিম্ফ (lymph) বহির্গত হইতেছে। আমি টিপিয়া আরও বাহির করিয়া দিলাম। স্ক্রফুলার ক্ষত আরোগ্য হইতে অধিক বিলম্ব হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। অন্য গণ্ডটি দেখিলাম যে আরক্ত হইয়াছে এবং সামান্য বেদনা তাহাতে আছে। পুনরায় গরম মসিনার পোল্টিস্ ব্যবস্থা করিয়া হিপার (৬) ব্যবস্থা করিলাম। পুনরায় ৩দিন পরে দেখিলাম যে সেটিও ফাটিয়া গিয়াছে। এটি হইতে কেবল জল ও lymph বহির্গত হইল। এখন দুটির আকার অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে ক্যাল্কে আইয়ড কয়েক দিবস দিয়া সমুদয় ঔষধ বন্ধ রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা করিয়া ক্যাল্কে কা (৩০) দিতে লাগিলাম। উক্ত গণ্ডদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড ছিল তাহাও ক্রমে উহা ব্যবহারে মিলাইয়া আসিল। মধ্যে দুটি ক্ষুদ্র গণ্ড একটু আকারে বড় হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহাও মিলাইয়া গেল। ক্ষত সারিবার জন্য এখন কেবল সাইলিসিয়া (২০) ৪ দিবস অন্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। ফাটিয়া যাইবার পর হইতেই ক্যালেণ্ডুলা অইল-বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে দিয়াছিলাম।

এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং হোমিও-প্যাথির অমোঘতায় বালকটিকে দেখিলে একবার মনেও ধারণা হয় না যে উহার গলদেশে সেইরূপ গণ্ডছিল। কোন ফোড়া ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগে কাটিলে যেমন ক্ষত মিলাইয়া একটি চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ তাহার গলদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়. আমার বন্ধুবর্গের অনেকেই উহা শ্রবণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বালকটিকে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হোমিওপ্যাথি বিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে উহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "জল ঔষধ" সেবনে কেমন করিয়া এত বড় কার্য্য সাধিত হইল।

এইরূপ নানা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন টিউমার বিনা অস্ত্র সাহায্যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে আমরা দেখাইতে পারি। বিশেষতঃ রমণীগণের ডিম্বা-

শয়িক অথবা আরায়বিক নানা প্রকার পীড়িত, টিউমার অথবা কাঠিন্য, যাহা আলোপ্যাথ মতে অস্ত্র সাহায্য ব্যতীত আরোগ্য হইতে পারে না বলিয়া স্বীকৃত তাহা আমাদের ঔষধ ব্যবহারে একেবারে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

এক্ষণে আর একটি রোগীর কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাম কর্ণের ম্যাষ্টয়েড্ উচ্চতার (mastoid process) একটি ক্ষুদ্র আঁচিলের ন্যায় একটু দেখা দেয়। তিনি প্রথমে উহা আঁচিল বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে উহা হইতে সামান্য স্পর্শ মাত্রই প্রভূত রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইল। আমার নিকট আসিয়া বলাতে আমিও প্রথমে আঁচিল ভাবিয়া একমাত্রা থুজা ৩০ প্রয়োগ করিয়া ঐ অর্ব্বুদটি ঘোড়ার বালামচি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বলিলাম। ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল এবং রক্ত পড়া থামে না দেখিয়া অর্ব্বুদটি পাকাইয়া দিবার জন্য হিপারসল্‌ফর (৬) ব্যবস্থা করিলাম এবং পুনরায় উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া রাখিতে বলিলাম। এবার রক্ত পড়া কমিয়া ক্রমে উহা শুকাইয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে পুনরায় সেই স্থানেই আবার সেই অর্ব্বুদ দেখা দিল এবং সামান্য হাত লাগা অথবা কোন প্রকার স্পর্শ মাত্রেই প্রভূত লাল রক্তের স্রাব হইতে থাকিল। প্রত্যহ ঐ প্রকার রক্তপাত দেখিয়া তিনি একটু ভীত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হোমিওপ্যাথ মতে ইহার কোন ঔষধ আছে কিনা?

তাঁহার একজন বন্ধু ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জ্জন পরামর্শ দেন যে উহা বিনা অস্ত্র প্রয়োগে আরোগ্য হইবে না। এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইতেছে বলিয়া কতক উপহাস করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন যে বাস্তবিক আমি আরোগ্য করিতে পারিব এই বিশ্বাস চিকিৎসা করিতেছি কিনা? বলা বাহুল্য যে প্রফুল্ল বাবু আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু সুতরাং শুদ্ধ মাত্র পসার জন্য আমি তাঁহাকে বৃথা আশ্বাস দিতে ছিলাম না। যাহা হউক ক্রমশঃ উপকার না দেখিয়া তিনি এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আলোপ্যাথ বন্ধু বলিতেন যে "যদি মেডিকেল কলেজে অস্ত্র প্রয়োগ জন্য আইস তবে তোমার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিব নতুবা নহে"।

আমিও দেখিলাম যে অর্ব্বুদটি সহজে যাইতেছেনা এবং প্রত্যহই তাহা লাল right red রক্ত স্রাবিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া হামামেলিশ [illegible] মাদার টিঞ্চার বাহ্য প্রয়োগ করিতে দিলাম এবং মধ্যে মধ্যে থুজা (৩০) সেবন করিতে দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হামামেলিশ বাহ্য প্রয়োগের পর হইতেই রক্ত পড়া কমিতে থাকে এবং ১০।১২ দিনের মধ্যেই অর্ব্বুদটিও ক্রমে স্বল্পাকার হইয়া আসিতে থাকে। আরও ৭।৮ দিনে উহা একেবারে মিলাইয়া গেল এবং আজও সেইস্থানে আর অর্ব্বুদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রফুল্ল বাবুর অন্যান্য বন্ধুগণও অস্ত্র প্রয়োগেই মত দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হোমিওপ্যাথিতে থাকায় কেহ তাহাকে এই চিকিৎসা ত্যাগে সম্মত করিতে পারে নাই। তাহার বন্ধুগণও আলোপ্যাথ ডাক্তারটি যে এই বিষয়ে হোমিওপ্যাথির অমোঘতা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় লেখা নিষ্প্রয়োজন।

পেরিটি ফ্লাউটিস্, ইলিয়াক অ্যাবসেস্, ওভার-ইটস্, হিপ্ জয়েন্ট ডিজিজ প্রভৃতি গুরুতর পীড়াও এই হোমিওপ্যাথির "ফোঁটা ঢালা" ঔষধেই আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে উপযুক্ত ভাবে সুনির্ব্বাচিত হইলে হোমিপ্যাথি ঔষধে বস্তুতঃই বিস্ময়কর ফললাভ হইতে পারে। এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্য আমরা কেবলমাত্র যুক্তির দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি না। হাতে কলমে practically দেখাইতে প্রস্তুত আছি এবং statistics অনুসন্ধান করিলে দৃষ্টান্তের অপ্রতুল হইবে না।

ডাক্তার জে, কে, মৈত্র।
শিমলা পোঃ অঃ কলিকাতা

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী

—:০:—

কাপড়ের উপর বিভিন্ন বর্ণের চিত্রাদি অঙ্কিত করণ ও রঞ্জন প্রণালীর একাংশ। বিলাতে ইহাকে calico printing বলে। ইহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতেই বিদেশীয়গণ ইহা শিক্ষা করে। দুঃখের বিষয় আজ এ শিল্প এদেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং বলিতে লজ্জা হয় আমরাই আজ ইংরেজ জার্ম্মান প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিগণের নিকট তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইহা পুনঃশিক্ষা করিবার জন্য বিনীত ভাবে তাহাদের দ্বারে উপস্থিত।

calico printing এর জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাবিধ কল আবিষ্কৃত হইয়া চালিত হইতেছে। বিবিধ জটিল বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে বর্ত্তমান সময়ে এবিষয়ের যতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। স্থানাভাব জন্য তাহার আলোচনা এখানে অসম্ভব।

বস্ত্রাদি রঞ্জন ও ধৌতীকরণ সম্বন্ধে নিত্য নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের কার্য্য প্রণালী বিশেষ কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারাও অনায়াসে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক ও বালকের দ্বারাই ইহার অর্দ্ধেক কার্য্য চালিত হইয়া থাকে। এই উক্তি সমর্থন জন্য তথাকার কোন সালের ফ্যাক্টরী রিটার্ণ হইতে মজুর বা শিল্পগণের একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উক্ত সালে ইংলণ্ডের বস্ত্র রঞ্জন ও ধৌতকরণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত মোট কর্ম্মী সংখ্যা—৬৭৮০১।

তন্মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা ১৩শ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা—৩৯২১।

তন্মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা ১৮শ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা—৯০৫৫।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা—১৪১৭৬।

অষ্টাদশ হইতে অধিক বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা—৩৯৯১১।

ধৌত ও রঞ্জন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এক পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত কল কারখানার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, অপর দিকে সেইরূপ নানাবিধ রং ও জলের বিশুদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক

জল অপরিষ্কার থাকিলে তদ্দ্বারা ধৌতাদি ব্যাপার চলিতে পারে না। কর্দ্দমময় হইলেই যে কেবল জল অবিশুদ্ধ হয়, তাহা নহে। একেবারে কর্দ্দমশূন্য এবং দেখিতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইলেও জল অবিশুদ্ধ হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা কোন কার্য্য অসম্ভব। এক গ্লাস ফিল্‌টার করা জলে কিয়ৎপরিমাণে দোবারা চিনি অথবা পরিষ্কার লবণ দিয়া নাড়িয়া দিলে উহা জলে একেবারে মিশিয়া যাইবে কিন্তু জল পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও পরিষ্কার দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ অবস্থায় জল পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ নয়; কারণ চক্ষুর অগোচর হইয়া থাকিলেও চিনি বা লবণ তন্মধ্যে রহিয়াছে; এই জন্য ঐ জলের স্বাদ মিষ্ট অথবা লবণাক্ত। জল উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া ফেলিলে পুনরায় ঐ চিনি বা লবণ বাহির হইয়া পড়ে। চিনি ও লবণের ন্যায় অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে। রঞ্জনাদি কার্য্যে জলের অপর পদার্থের অস্তিত্ব সাধারণতঃ—অনিষ্টজনক। উহাদিগকে দূরীভূত না করিয়া জল ব্যবহার করিলে, হয়, রঞ্জনাদি একেবারেই হইবে না অথবা আশানুরূপ ভাবে বস্ত্রাদি রঞ্জিত বা ধৌত হইবে না। অনেকেই দেখিয়াছেন কূপের জল জ্বাল দিলে পাত্রের গায়ে শ্বেতবর্ণের কোন পদার্থ সঞ্চিত হয়। উহা প্রথমে জলের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল; গরম করায় উহা জলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পাত্রের গায়ে গিয়া জমিয়াছে। উহা ধৌতাদি কার্য্যে বিশেষ অপকারী। এই জন্যই জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা একবার পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং পরীক্ষার পরে ঐ জল অবিশুদ্ধ স্থির হইলে উহা পরিত্যাগ করিবে এবং যদি উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তি সুকঠিন বিবেচনা হয় তবে উহাকেই বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। জল পরীক্ষা ও তাহা বিশুদ্ধ করণ সম্বন্ধে নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয় বলিয়া উহা আর এখানে আলোচিত হইল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

সিংহগড় দুর্গ।

—:০:—

তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যজীর নেতৃত্বাধীনে চালিত হইয়া মহারাষ্ট্র সেনা সমুদয় জয়োল্লাসে দুর্গে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে দুর্গমধ্যে শত্রুর প্রবেশ কথা সকলেই জানিতে পারিল। সকলেই ভয় ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

এদিকে একজন ভয়বিহ্বল অনুচর যাইয়া বিবাহ স্থানে উদয়ভানুকে এই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা বিদিত করিল। উদয়ও তৎক্ষণাৎ ঢাল ও তরবারীর সাহায্য লইয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন। জারজ এবং দেশত্যাগী ও দেশবৈরী হইলেও উদয় একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি অকুতোভয়ে এবং অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয় পক্ষীয় সৈন্যের গগনভেদী চীৎকার, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। প্রজ্বলিত মশালাদির অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা, মাওলী সৈন্যগণের বিকট চীৎকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া তথায় নৈশ অন্ধকারের মধ্যে কেমন এক ভয়াবহ দৃশ্যের যে অবতারণা করিয়াছিল তাহা সামান্য

লেখনীতে বর্ণনা করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। উদয় কিছুমাত্র বিমূঢ়চিত্ত না হইয়া সত্বর সেনা সংযোজিত করিয়া দক্ষিণ দিকের কূপ—যাহা হইতে সমুদয় দুর্গে জল সরবরাহ হইয়া থাকে—রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইলেন। তানাজী উহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সতেজে অগ্রসর হইলেন, উভয়ের তরবারী উভয়কে সানন্দে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু এখানে মহারাষ্ট্র বীর রাজপুতের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না—উদয়ের ভীম অসির এক আঘাতেই তানাজীর ঢাল দুইখণ্ড হইয়া গেল, দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ কনুই ছিন্ন এবং তৃতীয় বা শেষ আঘাতে তানাজী হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। অক্ষির পলক পড়িতে না পড়িতে বীরবর তানাজী রণস্থলে প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু ইহাতেই কি মহারাষ্ট্রগণ আত্মহারা হইয়া পশ্চাৎপদ হইল? না কখনই নহে। যে জাতী স্বজাতীয়ের মধ্যে জগতে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করিবে তাহার—গঠনকারকেরা সেরূপ দুর্ব্বলচিত্ত হইতেই পারে না। যেমন তানাজী পতিত হইলেন অমনি জগৎসিংহ তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তানাজীর খুল্লতাত সালের মামা তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে উদয়ের সম্মুখীন হইলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও সালের মামার শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিল—কথিত আছে বয়সকালে ইঁহার ন্যায় কৌশলী অসিজীবী—তদানীন্তন দক্ষিনাবর্ত্তে আর কেহ ছিলনা। সম্মুখে পুনরায় একজন নূতন ব্যক্তির উপস্থিতি উদয়ের অনুভিতি হইবার বহু-পূর্ব্বেই সালের মামা বিদ্যুৎগতিতে উদয়ের উপর লাফাইয়া পতিত হইয়া মস্তকে এক আঘাতেই দুর্গকে অধীস্বামী হারা করিয়া দিলেন। দুর্গস্বামীর পতনে বিজয়লক্ষী মহারাষ্ট্রদিগকে আলিঙ্গন করিল এখন মহারাষ্ট্রীয়গণ অমিততেজে চতুর্দিক হইতে আসিয়া মোগলগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল; নেতৃবিহীন দুর্গস্থ সেনাগণ উপায়ন্তর না দেখিয়া বিজিতগণের নিকট অধীনতা স্বীকার করিল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিচালির গাদায় অগ্নি সমর্পণ করিয়া রায়গড় দুর্গে অবস্থিত শিবাজীকে জানাইয়া দিল যে কোন্দানা দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। এই সংবাদে মহারাজ শিবাজীর আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল. তিনি বলিলেন "এখন হইতে ঐ দুর্গের নাম কোন্দানা না হইয়া সিংহনাদ (সিংহের দুর্গ) কারণ কেবলমাত্র সিংহতুল্য অসমসাহসী তানাজীই উহা দখল করিয়াছেন নতুবা আর কেহ পারিত না।" এই কথা বলিয়াই যতসত্বর সম্ভব. তিনি নূতন অধিকৃত স্থান দেখিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যখন তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সালের মামার নিকট সমুদয় যুদ্ধের ঘটনা শ্রবণান্তে শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও জীবনের সহচর তানাজী আত্মবলী দিয়া দুর্গজয় করিয়াছেন তখন তাঁহার মনে যে কি প্রকার শোকের উদয় হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে-ছিল। শিবজী কিয়ৎকাল আত্মবিমূঢ় হইয়া থাকিয়াই অশ্রুজল মোচন করিয়া পূর্ব্ব উক্তি স্মরণ করতঃ বলিলেন "'সিংহের দুর্গ' অবশ্য, আমরা দুর্গ-জয়ে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু সিংহটিকে হারাইতে হইয়াছে।"

আমাদিগের গল্পের মূল আখ্যায়িকা এক্ষণে শেষ হইল বটে কিন্তু জগৎসিংহ দেবল দেবী ও সর্ব্বো-পরি সতী কমলকুমারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্ততঃ সংক্ষেপে না বলিয়া যাইলে পাঠকগণ আমায় ক্ষমা

করিবেন না নিশ্চয়ই—এবং আমার ও আত্ম তৃপ্তি হইবে না এ কারণ পরিশিষ্ট ঘটনাবলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। দুর্গ জয়ের পরই জগৎসিংহ উন্মাদ গতিতে ইতস্ততঃ দেবল-দেবীকে অন্বেষণ করিবার জন্য কমলকুমারী যে স্থানে আবদ্ধা ছিলেন সেই দিকে দ্রুত গমন করিলেন। কিন্তু হায় উদয়-ভানুর আদেশে অথবা অন্য যে যে কোন কারণেই হউক দেবল-দেবীর জন্য নিযুক্ত কাফ্রী চাকুরানীরা দেবলদেবীর লাবণ্যময়ী প্রতিমাটি ফাঁসীতে ঝুলাইয়া রখিয়াছে দেখিয়া জগৎসিংহ ক্ষোভে রোষে জ্ঞান হারা হইয়া গেলেন। হায় তাঁহার এতদিনের পরিশ্রম অদ্য সফল হইয়া কোথায় তাঁহার প্রাণারাম হৃদয় নলিনীকে বক্ষে ধারণ করিবেন না অসহায় অবস্থায় দুষ্টা চেড়ীর হস্তে মৃতা সতীর মৃতদেহ দেখিতে হইল। জগৎসিংহ ক্ষণকাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পত্নীর প্রতি শেষদেখা দেখিয়া লইলেন তাহার পরে উন্মাদের ন্যায় বেগে কোথায় যে চলিয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিলনা। জগতের কেহ তাঁহাকে সংসারে দেখিতে পায় নাই।

যাহা হউক কমলকুমারী অক্ষতা অবস্থায় ছিলেন, ভগবান তাঁহার পবিত্র সতীধর্মে আঘাত লাগিতে দেন নাই। কমল এখন সকলের অনুমতি লইয়া প্রলন্ত চিতায় আরোহন করত সতীমহীমা প্রচার করিয়া মৃত স্বামীর সহ মিলন আশায় আত্মত্যাগ করিলেন। ধন্য সতী মহিমা। স্বয়ং আদ্যাশক্তি অন্তরীক্ষিতে থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। কমলকুমারী জলন্তচিতায় অরোহন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু আজও ঐ দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোনে একখানি প্রস্তর খণ্ড উত্থিত থাকিয়া জগতে প্রচার করিতেছে যে "এইপুণ্য স্থানে একজন রাজপুত রমণী স্বামীর সহ পরলোক মিলিত হইবার আশায় জলন্ত চিতায় আরোহন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আত্ম ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন সন্দেহ নাই।

যে স্থানে তান্যজী রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেখানেও আজও একখানি প্রস্তর খণ্ডউত্তোলিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে তাহাতে তদানীং কালের যোদ্ধবেশী একজন মহারাষ্ট্রের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন।

সমালোচনা।

—;*;—

অমলেশ্বর গন্ধকের গ্লাস। জি, সরকার কোম্পানীর প্রস্তুত "অমলেশ্বর গন্ধকের গ্লাস সমালোচনার্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। চিকিৎসক মাত্রেই অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, মেহ, প্রভৃতি হইতে সামান্য খোস পাঁচড়া সমস্ত রোগেই গন্ধকের উপকারিতা অবগত আছেন। হোমিও-প্যাথিকদিগের গন্ধকই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। যে কোন প্রকারে গন্ধকের ব্যবহার যে রোগ নাশক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ গন্ধক হইতে পানপাত্রের আকারে গ্লাস প্রস্তুত সরকার কোম্পানীর কলা-বিদ্যার অভিনব পরিচায়ক অথচ নিয়মিতরূপে

ব্যবহার করিলে সর্ব্ব রোগের বিনাশ। মূল্য অধিক নহে, দুইটী টাকা। সরকার কোম্পানী এজন্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

—(৩)—

অর্জ্জুন। আত্মা দেহের ন্যায় নিত্যজাত বা নিত্যমৃত এ কাহাদের মত ?

ভগবান। দেহের জন্মের সহিত আত্মার জন্ম হয় দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় এজন্য ইহা দেহের ন্যায় নিত্যজাত ও নিত্যমৃত ইহা চার্ব্বাকাদি এবং অজ্ঞানী সাধারণ লোকও বলিয়া থাকে।

অর্জ্জুন। চার্ব্বকাদি "নিত্যজাত" অর্থে কি প্রতিপন্ন করে ?

ভগবান। নিত্যং নিয়মেন জাতং নিত্যজাতং ইতি চার্ব্বাক পক্ষঃ।

নিত্য সর্ব্বদা জাতং ইতি ক্ষণিক বিজ্ঞান পক্ষঃ নিতশ্চসৌ অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ জাতশ্চেতি তর্কাদি পক্ষাঃ।

অর্জ্জুনঃ। ইহাদের মতের অর্থ কি ?

ভগবানঃ। দেহাত্মবাদীগণ বলেন—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ একত্রে মিলিয়া চৈতন্যময় দেহ সংঘটিত করে সেই দেহই আত্মা। আর ঐ চারি ভূতের মিলন বশতঃ চৈতন্য জন্মে। যেমন পান চূণ খয়ের একত্রে করিলে সুন্দর লাল হয় সেইরূপ।

ক্ষণিকবাদীগণ বলেন;—আত্মা জ্ঞান স্বরূপ কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই ক্ষণিক। এইমাত্র জ্ঞান জন্মিল তৎক্ষণাৎ লয় হইল। একটী লয় হইতেই আর একটী জন্মিতেছে আবার লয় হইতেছে আবার জন্মিতেছে। এজন্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে নিত্যজাত বা সর্ব্বদা জাত ও সর্ব্বদা মৃত বলে। যদি এই রূপেও বল তথাপি ইহার জন্য শোক হইতে পারে না।

অর্জ্জুন। মৃত্যু কি ? জন্ম কি ? জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম কেন হয় ?

ভগবান। আত্মা নিত্য। আত্মাতে অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয় যোগের নাম জন্ম। আত্মা হইতে পূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়ের নাম মৃত্যু।

স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু হয়। আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় নিমিত্ত মৃত্যুর অবসানে জন্ম হয়। কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে প্রাণিনা ধ্রুবঃ। ভাঃ ১০।১।২৬।

অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ।

অর্জ্জুন। কিরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ?

ভগবান। তুমি মৃত্যুর কথা ভুলিয়া নিরন্তর ভোগ বিলাসে উন্মত্ত থাক তথাপি তোমাকে মরিতে হইবে। অথবা সংসার জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে নিরন্তর মৃত্যু কামনা কর তথাপি তোমাকে মরিতেই হইবে। দেহ জন্মিয়াছে মরিবেই ইহা নিশ্চিৎ। বস্ত্রখানি জোর করিয়া কেহ কাড়িয়া লইলেই দুঃখ কিন্তু ছিঁড়িয়া গেলে অথবা মলিন বোধ করিলে যখন তুমি আপন ইচ্ছায় ত্যাগ কর এবং নূতন বস্ত্র পরিধান কর তখন দুঃখ নাই। আপনি এই দেহ-

রূপ স্বপ্ন যাহাতে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতে পার তজ্জন্য তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষয় কর। উপাসনা দ্বারা আপন স্বরূপে চিত্ত একাগ্র কর এবং "তত্ত্বমস্যাদি" বিচার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মার একতা নিশ্চয় করিয়া সদানন্দাকারে আকারিত হইয়া যাও, এবং নিত্য আত্মাকে লইয়া থাক তবেই তোমার পরিত্রাণ তবেই তোমার মুক্তি। আরও দেখ এই দেহ যাহা আদিতে ছিল না অন্তেও থাকে না তাহা মধ্যেও নাই জানিও।

অর্জুন। দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করুন।

ভগবান। রজ্জু অজ্ঞানবশতঃ সর্পিত বোধ হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখ সর্প নাই। অজ্ঞান হইতে জাত সর্প অজ্ঞানেই লয় হইতেছে। রজ্জুতে নহে, অজ্ঞানেই সর্প দেখা যাইতেছিল। অজ্ঞানের পূর্ব্বে সর্প ছিল না, অজ্ঞানের নাশেও সর্প নাই। সেইরূপ আত্মাতে অজ্ঞান কল্পিত জগত শুদ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় দৃশ্য হয়। পূর্ব্বেও নাই পরেও নাই অজ্ঞানে যাহা দেখ তাহাও নাই। এরূপ দেহটী অজ্ঞানে দেখিতেছ। বাস্তবিক ইহার অস্তিত্ব নাই।

অর্জুন। রজ্জুতে যে সর্প দেখি পূর্ব্বে সর্প দেখিয়াছি বলিয়াত? একমাত্র আমিই ছিলাম দেহত ছিলনা তবে এ ভ্রম আসিল কোথা হইতে?

ভগবান। যাহা নাই তাহাই আছে দেখানই মায়া। "মা" নিষেধ বাচক "আ" অস্তিবাচক। এজন্যই মায়াকে "অঘটনঘটন পটীয়সী বলে। পুরাণ বলেন—

"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা।"

অদর্শন হইতে আসিয়াছে আবার অদর্শনে হইয়াছে। সে তোমার নয় তুমিও তার নয় বৃথা কেন ভাবনা?

অর্জুন। এ সমস্ত কি এক অদ্ভুত রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আচ্ছা সুষুপ্তিতে আত্মা স্বরূপে থাকেন তখন অজ্ঞান নাই বলিয়া কিছুই নাই। আবার সুষুপ্তি যখন স্বপ্নরূপে পরিণত হয় এবং জাগ্রত হয়, তখন কিরূপ ব্যাপার ঘটে? আত্মাই লয় স্থান কিরূপ?

ভগবান। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে স্বপ্ন ও প্রবোধ কালে জগতের লয় ও উদয় সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্ট হয়।

"স যদা স্বপিতি তদৈনং বাক সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রবুদ্ধ্যতে তদি তস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

সম্পাদক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। গ্রাহকগণের বিরক্তি নিবারণার্থে [illegible] মাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে [illegible] খণ্ড আর্য্যভূমি প্রকাশিত হইবে। আঃ ভূঃ সং।

প্রমেহ, ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, পারা বা উপদংশজনিত দূষিত রক্ত, স্ত্রীলোকের প্রদর, ঋতুবন্ধ বা অধিক রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগের এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কৃশতার একমাত্র মহৌষধ।

নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন।

এই মহৌষধ সেবনে আজ ভারতবাসী অনেকেই বলিতেছেন যে, সালসা কড্‌লিভার অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন। কেবল তাহা নহে, শাস্ত্রীয় মকরধ্বজ, বৃহৎ মকরধ্বজ, সোমনাথ রস বসন্তকুসুমাকর ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি বহুমূল্যবান ঔষধ সেবনে কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত রোগী এই ভারত বিখ্যাত নবাঙ্গ রসায়ন সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম সকলের মতে একমাত্র লৌহই সমস্ত রোগের মহৌষধ এবং সমস্ত ঔষধের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। বহু পুটের উৎকৃষ্ট লৌহ প্রায়ই পাওয়া যায় না, আমরা বহু চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ সংগ্রহ করিয়া এই নবাঙ্গ রসায়ন নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি, এই ঔষধে চারিটী মাত্র ধাতু দ্রব্য আছে; যথা লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ; তন্মধ্যে লৌহের ভাগ অধিক হওয়ায় নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন নাম হইয়াছে, এই ঔষধ বার্দ্ধক্যতারূপ ব্যাধি নষ্ট করে; এজন্য রসায়ন শব্দবাচ্য হইয়াছে।

এই ঔষধ সেবন করিলে শিথিল অঙ্গ দৃঢ় করে অর্থাৎ অঙ্গ সকল হাড়ে মাংসে জড়িত হয়। সালসার ক্রিয়া ক্ষণিক, লৌহের ক্রিয়া চিরস্থায়ী; সালসা যখন সেবন করা হয়, তখনই শরীর একটু ঠুসাঠুসা ও চাকচিক্য দেখা যায়, বন্ধ দিলে তাহা আর থাকে না আসল হইতেও একটু কমে। এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ভাল হইয়া অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু পূর্ণ ও পরিষ্কার হইয়া শরীরের লাবণ্য ও পুষ্টি হইয়া থাকে। টৈতল, ঘৃত অরিষ্ট, আসব এ সমস্ত অপেক্ষা লৌহের গুণ অধিক ও চিরস্থায়ী একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ১৫ দিবস সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহাশ্রিত জ্বর, হস্ত পদাদির জ্বালা ও উত্তাপ স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদর, ঋতুবন্ধ ও অধিক রক্তস্রাব, পুরাতন জ্বর, পেটগরম, মাথাঘোরা, মাথাগরম, শরীরের দুর্ব্বলতা, শুক্রের শিথিলতা ও তরলতা, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, অধিক প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ এই সমস্ত রোগ হইতে ১৫ দিবস সেবনে একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়। বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি সুতরাং এই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষ অবগত আছি। যদি শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সাম্যতা চাও, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্তধাতু সমান পূর্ণাবস্থা রাখিতে চাও, অল্প বয়সে অকাল বৃদ্ধ না হইতে চাও, তবে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন কর। শরীরের ধাতাদি ভাল করিতে লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ এই চারিটী ধাতুই উৎকৃষ্ট। এই ঔষধও এই চারিটি ধাতুদ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারা সপ্তাহকাল সেবন করিয়া দেখুন উক্ত ব্যাধি সমূহ হইতে অবশ্য আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা যৌবনের পূর্ব্বে বা যৌবনাবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা বারাঙ্গনা জনিত অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হেতু অকাল বার্দ্ধক্য শরীরে অনুভব করিতেছেন অর্থাৎ অল্প উত্তেজনায় শুক্রপতন বা স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়, মাথাঘোরা, অন্ধকার দর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা জোনাকি পোকার ন্যায় দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ হইলে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধ বলিতে হইবে। এই রকম বিস্তর রোগীতে প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি, আপনারা একবার সেবন করিয়া দেখুন পুনর্ব্বার যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ লইলে ১৲ টাকা। একেবারে ১৫ দিবসের ঔষধ লইলে ১৸৹ এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিতে লইলে ডাক মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা।


শ্রীচারুচন্দ্র মল্লিক
কবিরাজের
নিম্বাদি
সর্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায়।

পারদ ও রক্তদুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ডু, বাত, রক্তদুষ্টি, উপদংশ, দক্র সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারদবিকৃতি প্রভৃতি এবং যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা কৃশতা ও ধাতু-ক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট এবং চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় পারাদোষ-নাশক ও রক্তপরিষ্কারক ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত ধাতু নাই।

ইহা সকল সময়ে ও সকল ঋতুতেই বালক বৃদ্ধ ও বণিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি এগার আনা। তিন শিশির মূল্য তিন টাকা বার আনা। মাশুলাদি পনর আনা।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান ইংরেজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, ম্যাগিন M.D., L. M. C. L. S. B. E. M. মহোদয় বলেন—

সুরবল্লী কষায়ের রক্ত-শোধকতা গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহা সমস্ত সত্য।

বঙ্গের উজ্জ্বলতমরত্ন শ্রীযুক্ত কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, এ, এ, ম্, ডি, I. M. S. স্যানিটারি কমিশনার বেঙ্গল মহোদয় বলেন—

সুরবল্লীকষায় অতি তীক্ষ্ণবীর্য্যশালী, অথচ নির্দ্দোষ গুণসম্পন্ন ইহা পারদজনিত সর্ব্ববিধ দোষ নাশক ও পুষ্টিকর সালসা।

বঙ্গের সুসন্তান, দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেজর বি, কে, বসু, M. D. I. M. S. মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি ইহার শোণিত-শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষায় ও পুষ্টিকার্য্যে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার জে, চক্রবর্ত্তী, এল, এম, এস, বলেন—

সর্ব্বপ্রকার দূষিত রক্তের অতি উপাদেয় ঔষধ।

ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত এলেক্‌জাণ্ডার এ ফ্যারমি, এল, আর, সি, এণ্ড, এস (এডিনবর্গ) মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুরবল্লীকষায় ব্যবহারে আমি সন্তোষজনক ফললাভ করিয়াছি।

সুরবল্লীকষায় রক্ত পরিষ্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগির শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট ;—কলিকাতা।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ৮ম, ৯ম সংখ্যা]　　[অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্,এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী; পি দত্ত I.C S.PH.D., শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতা, ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেসে" শ্রীগোবর্দ্ধন পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০)　প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)



আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৪ সাল। { ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

জাতীয় মহাসমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যে অধম বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইত, তাহারাই আজ ভারতে ধর্ম্মের, সমাজের, শিক্ষার ও অন্যান্য যাবতীয় বিভাগের সংস্কার সাধনে ও স্বদেশের কল্যাণ কার্য্যে সকলেরই অগ্রণী ও আদর্শ। সুতরাং, ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের সম্মিলিত জাতীয় চেষ্টার সর্ব্বাগ্রে আমরা এই বাঙ্গালীকেই দেখিতে পাই। যে সকল মহাপুরুষ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা সম্মিলিত জাতীয় ভাব পুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ও আমাদের বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধনের সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ সেবা ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য এবং তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু, এই মহাব্রত-সাধক মহাপুরুষগণের মধ্যে অচল অধ্যবসায়, অদম্য উত্তম ও অক্লান্ত চেষ্টায় সকলের অগ্রে আমরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখিতে পাই।

শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আমরা রাজা ও প্রজার মধ্যে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত সম্বন্ধের বিষয় ক্রমে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলে পর, বঙ্গ ও অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত নেতৃগণ দেখিলেন যে, যে সকল উচ্চ ও পবিত্র নীতি অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে বলিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই স্পষ্টাক্ষরে

ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ ভারতে সে নীতির প্রবর্ত্তন হইল না,—সুতরাং, রাজার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র হইলেও, প্রজার নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে হইতেছে। রাজার সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র নীতির প্রবর্ত্তনের জন্য ও প্রজার স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতা লাভের জন্য, ভারতের সকল প্রজার সমবেত ইচ্ছা ও সংকল্প প্রকাশের সুবিধার জন্য, তাঁহারা একটা ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য নেতৃগণের যত্নে ও চেষ্টায় কলিকাতায় "ভারত সমিতি" স্থাপিত হইল। নানা কারণে, তাহা দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইল না বটে, কিন্তু দেশে একটা জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা যে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৮২ সালের ২৭এ মে তারিখের বেঙ্গলী সংবাদপত্রে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"ভারতে একটা জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সময় এক্ষণে যথার্থই উপস্থিত হইয়াছে। ইহার বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতার বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে, এবং ইহা বিভিন্ন প্রদেশের নানা বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সমিতির সম্মিলিত কার্য্যের সহায়তা করিবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে "ভারত সমিতি" আগামী বৎসর এই রূপ একটা জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন।" ১৮৮৩ সালে উক্ত সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের প্রকৃত প্রবর্ত্তক মিঃ অ্যালান্ হিউম। ইঁহারই পরামর্শে, নিঃস্বার্থ যত্নে ও চেষ্টায় এই সমিতি জন্মলাভ করে। এই মহাপুরুষের নাম আমাদের সকলেরই পূজ্য ও প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু ভারতের রাজপ্রতিনিধির সহানুভূতি ও পরামর্শ যে এই জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত নহেন। প্রাতঃস্মরণীয় হিউম সাহেবই এই অভিনব কল্পনার উদ্ভাবয়িতা বটে এবং তিনিই সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, যে আকারে জাতীয় মহাসমিতি জন্মলাভ করে, তাহার প্রকৃত পরামর্শদাতা স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফ্‌রিন্। হিউম সাহেব ও ভারতের নেতৃবৃন্দ কল্পনা করেন যে, শাসনবিভাগের নানা কার্য্যে ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের সুবিধার জন্য এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য, বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণকে লইয়া বৎসরে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমগ্র ভারতবাসীর এক জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন আবশ্যক। যে সমিতিতে স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার সমক্ষে দেশের নেতৃগণ ও শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। ১৮৮৪ সালে হিউম সাহেব বড়লাট ডাফ্‌রিনের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য সিমলা শৈলে গমন করেন। লর্ড ডাফ্‌রিন্ তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বলেন যে, এরূপ সমিতি দ্বারা রাজার ও প্রজার উভয়েরই কোন উপকার সাধিত হইবে না। এরূপ সমিতিতে কেহই নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে সাহস করিবেন না, অধিকাংশই কেবল রাজপুরুষের অনুমোদন করিবেন মাত্র। এরূপ সমিতির অপেক্ষা, যদি সম্পূর্ণরূপে প্রজাগণের দ্বারা

চালিত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত নেতৃগণকে ও প্রতিনিধিগণকে লইয়া জাতীয় মহাসমিতি স্থাপিত হয়, তাহা দ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে। রাজার সকল কার্য্যের একটা প্রবল সমালোচক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলে, রাজপক্ষের যথেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা এবং শাসনবিধির ভ্রম ও ত্রুটি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এবং ক্রমে, এরূপ সমালোচক দলের মধ্যেও দায়িত্ববোধ, একতা ও রাজনৈতিক শিক্ষা পুষ্টিলাভ করে। লর্ড ডাফ্‌রিণের এই উদরতা, বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার জন্য, তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার এই পরামর্শ অনুসারে হিউম সাহেব ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে পুনা নগরে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রচার করেন—"এই সমিতিতে বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইবেন। সময়ে ইহা জাতীয় পার্লামেন্টের ন্যায় প্রবল সমিতিতে পরিণত হইবে এবং ন্যায্যরূপে চালিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে যে ভারতবাসী সম্মিলিতভাবে কার্য্যসাধনে অনুপযুক্ত নহে।"

বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ২০ জন এবং উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাব হইতে ১০ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করা স্থির হয়। কিন্তু, সেই সময়ে পুনা নগরে বিসূচিকার প্রকোপ হওয়াতে বোম্বাই নগরেই সমিতির প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির প্রথম অধিবেশনে বোম্বাইর রাজ কর্ম্মচারীগণ প্রতিনিধিগণকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং সমিতির কার্য্যে তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে ১০০ জন প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। সমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল, হিউম সাহেব, মিঃ দাদাভাই নাওরোজী, মিঃ আনন্দ চার্লু ও অন্যান্য নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৫ সালের ২৮এ ডিসেম্বর সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের ভবিষ্যত ইতিহাসে এই দিন স্বর্ণাক্ষরে-লিখিত থাকিবে পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির পদে বৃত হয়েন। প্রথম সমিতি শাসন বিধি সংস্কারের জন্য সাতটি প্রস্তাব করেন ও সেগুলি কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় সমিতির অধিবেশন ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় হয়। এবারে ভারতের চতুর্দ্দিক হইতেই প্রতিনিধিগণ আসিয়া উপস্থিত হন, এবং জন সাধারণে তাঁহাদিগকে যে আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণাতীত। প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩১ জন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ১৩০ জন জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি। মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। এবার অধিবেশনে দাদাভাই নাওরোজী সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। বঙ্গের সুসন্তান মতিলাল ঘোষ, মনমোহন ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোধ্যায় ও অম্বিকাচরণ মজুমদার সমিতির কার্য্যে যোগদান করেন।

সমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ স্থির করেন যে, জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একটা জাতীয় শিল্পের প্রদর্শনী করিলে

দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ১৯০১ সালে কলিকাতায় প্রথম জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ১৯০৫ সাল হইতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর একটা জাতীয় শিল্পসমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই সমিতিতে এক একটী শিল্পের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভারতের সর্ব্বপ্রকার শিল্প সকলের উন্নতি-সাধনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। গত কয় বৎসর গবর্ণমেণ্ট এই শিল্প-প্রদর্শনী ও শিল্পসমিতির কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক যে গত বাইশ বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে আমরা কতটুকু উপকৃত হইয়াছি? ইহার কার্য্যের ও উপকারের হিসাব লইবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, সমিতির এই জাতীয় কার্য্যে আমরা সকলে কতটুকু সাহায্য ও যোগদান করিয়াছি? যদি তাহা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় কর্ম্ম ও কল্যাণের হিসাব দেখা বৃথা,—কারণ, সমগ্র জাতির আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন জাতীয় কর্ম্ম বা কল্যাণই সাধিত হয় নাই। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র হইলেও আন্তরিক চেষ্টা মাত্রেরই একটা সফলতা আছে, এবং যাহার জন্য জগতে একজনও জীবন দান করে, এ বিশ্ববিধানে তাহার একটা প্রতিদান আছেই! সুতরাং, জাতীয় মহাসমিতির এতদিনের চেষ্টা ও উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা নিশ্চয়। কিন্তু, মানুষ যাহা চায় বা পাইবার আশা করে, তাহা সে কতদূর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই দিক দিয়া যদি সকল বস্তুর ও কার্য্যের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ জগতের সকল কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সমাজ ও জীবনই ব্যর্থ;—কারণ, যাহা চাহিয়াছে,—যাহা পাইবার আশা করিয়াছে, তাহা এখানে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে কে?

জাতীয় মহাসমিতির এই ক্ষুদ্র জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম যে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে অধিকতর সম্মিলিত জাতীয়ভাবের পুষ্টির পথে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ক্ষুদ্র জীবনে ইহা আমাদিগকে রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজনৈতিক ন্যায্য সম্বন্ধের শিক্ষাদান করিয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম ও চেষ্টাকে সম্মিলিত করিয়া এক প্রবল শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। ইহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে, আজ ভারতের শত জাতি ও শত সম্প্রদায়ের সহস্র বিভাগের ব্যক্তিগণের মধ্যে সহোদরের ন্যায় এক স্নেহ ও সহানুভূতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে, আজ ইংলণ্ডের উদার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভারতের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগের বিষয়ে সহানুভূতির সহিত কর্ণপাত করিতেছেন এবং আমাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচনের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতিই আজ জগতের নিকট ভারতবাসীকে একটা শিক্ষিত ও সম্মিলিত জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছে এবং ভারতের শাসন-বিধির অব্যবস্থা ও অবিচারের বিষয় প্রচার করিয়াছে। ইহারই যত্নে ও চেষ্টায় আজ ভারতে সামরিক ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়াছে, প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসী সভ্যের সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য সাধন প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহারই নিঃস্বার্থ চেষ্টা যত্নের ফলে আজ ভারতের শিল্প জগতে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভারতবাসীর শুষ্ক শীর্ণ অস্থিকঙ্কালের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রভাত।

১

পোহাইল বিভাবরী, নীলনভোস্থলে
বিলীন নিশারকান্তি নক্ষত্র নিকর,
অস্তগত শশধর পশ্চিম অচলে,
পরিল ধরণীলোকে বসন ধূসর।

২

মুদিল কুমুদকুল সরসীর নীরে,
সরোজিনী উন্মাদিনী পতি দরশনে,
লজ্জাবগুণ্ঠন খুলি চাহে ধীরে ধীরে,
বিষাদ প্রমোদ কিবা শোভে একসনে।

৩

গাহিল প্রভাত গাথা সুমধুর স্বরে,
মঞ্জুল নিকুঞ্জচর বিহঙ্গম গণ,
ঢালিল অমিয়ধারা শ্রবণ বিবরে,
ভক্তিরসে পরিপ্লুত মানবের মন।

৪

প্রস্ফুটিত পুষ্পবাস করিয়া হরণ,
মৃদুমন্দ ভাবে বহে শান্ত সমীরণ,
ভূজনে লুণ্ঠিত ধন করি বিতরণ,
কথঞ্চিৎ করে তার পাপ বিমোচন।

৫

সপ্ত হয় সংযোজিত বিমান স্যন্দনে,
অরুণের দিব্যমূর্ত্তি হইল প্রকাশ,
রঞ্জিয়া রক্তিম রাগে উদীচ্য গগনে,
পড়িল ধরারমাঝে রূপের বিভাস।

৬

ঝিল্লীগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে রবে না এখন,
ডাকেনা পেচক আর সকরুণ স্বরে,
হেরিয়া ভাস্করে যত নিশাচরগণ,
লুকায় কন্দরে কিম্বা তরুর কোটরে।

৭

শ্রেণীবদ্ধ সারি সারি তটিনীর নীরে,
যতেক তরণী ছিল করিয়া নঙ্গর,
শয্যাত্যাজি মাল্লাগণ উঠি ধীরে ধীরে,
ভাসায় তরণী মুখে বদর বদর।

৮

বাষ্পযান ভয়ঙ্কর গম্ভীর হুঙ্কারে,
উন্মত্ত হইয়া করে ধূম উদ্‌গীরণ,
বাড়বা অনল ক্রীড়া তটিনীর নীরে,
অথবা আগ্নেয়োদগম হেন লয় মনে।

৯

মৃদুল পবনে কিবা মৃদুমন্দ দুলে,
নবলতাবলী আর মহীরুহ গণ,
ভক্তিভরে নত শিরে মন প্রাণ খুলে,
নমিছে তাঁহায় যিনি অনাদি কারণ।

১০

সত্যব্রত ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু দ্বিজগণ,
পূর্ব্বাকাশে ঊষা আসি দিলে দরশন,
অবগাহনের তরে করেন গমন,
স্নানান্তরে স্তবপাঠে রবে মগ্নমন।

১১

অধ্যয়নে যত্নশীল বালক সকল,
শয্যাত্যাজি প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন,
পরিধান করিবাস শুভ্র নিরমল,
অধ্যয়ন তরে সবে নিবেশিছে মন।

১২

গোপাল গোপাল লয়ে হরষিত মনে,
নবদুর্ব্বাদল ক্ষেত্রে করিছে গমন,
সেথানে চরায় সবে অতি সযতনে,
কিবা সতর্কিত ভাবে যতেক গোধন।

১৩

শয্যাত্যাজি প্রভাতেতে কৃষীবল গণ,
হল কর্ষণের তরে বলিবর্দ্দসহ,
ধাইছে প্রান্তর পানে অতি হৃষ্টমন,
প্রস্তুত সহিতে সবে ক্লেশ দুর্ব্বিসহ।

১৪

প্রভাতে নিদ্রার ভঙ্গে যত শিশুগণ,
মাতৃঅঙ্ক আরোহিয়া করিছে রোদন,
থামে না রোদন রোল সবে যতক্ষণ,
নাশিতে ক্ষুধার জ্বালা না পায় ওদন।

১৫

জননী করিয়া শান্ত সন্তান নিচয়ে,
সোহাগেতে তুষ্ট করি তাহাদের মন,
ক্ষিপ্রপদে হৃষ্টচিত্তে শশব্যস্ত হয়ে,
গৃহকর্ম্মে সবে কিবা নিবেশিছেমন।

১৬

নেহারি গগন ভালে অরুণ উদয়,
কোলাহল পরিপূর্ণ হল বিশ্বময়,
অগণন জন স্রোত প্রফুল্ল হৃদয়,
স্ব স্ব কর্ম্মে শান্ত ভাবে সবে রত হয়।

১৭

হে নাথ জগপতি, অজ্ঞান হৃদয়,
তর্কশাস্ত্র প্রসাদেতে স্বরূপ তোমার,
সমর্থ কিরূপে হবে করিতে নির্ণয়,
জগৎ আধার তুমি, বিশ্বমূলাধর।

১৮

এবিশ্ব আলেখ্যে যবে সুদীন নয়ন,
অন্বেষণ করে বিভো স্বরূপ, তোমার
তব অপরূপ রূপ, করি সন্দর্শন
বিমোহিত হয় নাথ হৃদয় আমার।

১৯

মধুর প্রভাতকালে নমি ভক্তি ভরে,
বার বার অনিবার হেনাথ তোমায়,
তোমার কৃপায় সুখী দেখি চরাচরে,
কৃপানাথ কৃপাকরি রেখতব পায়।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

—:০:—

পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য স্থান অপরিবর্ত্তনশীল শ্রেণীর অন্তর্গত। জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে উল্লিখিত মৎস্য সমূহের ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে। বর্ষা ঋতুতে যখন নূতন জলে নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায় সেই সময়ে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। আষাঢ় মাসের প্রথমে কিম্বা অম্বুবাচীর সময়ে যে সকল ডিম্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা

উৎকৃষ্ট দেখা গিয়াছে; জেলেগণ এই সময়ে কয়েক-দিন যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান্য সময়ের ডিম্বাণু হইতে এই সময়ের ডিম্বাণু ইহারা অত্যন্ত বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই সময়ের সংগৃহীত ডিম্ব বেশ সতেজ ও সজীব জলাশয়ে ছাড়িলে, ইহার প্রায় একটিও নষ্ট হয় না, সমস্তই ফুটিয়া থাকে এবং পোনাসমূহ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব সেই সময়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা উচিত। ডিম্বাণু সকল জলের ফেণার সহিত মিশ্রিত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে, কাপড় কিম্বা এই উদ্দেশ্যে যে এক রকম জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দ্বারা ধরিতে হয়। নূতন জল প্রাপ্ত হইয়া নানাজাতীয় মৎস্য এই সময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, অতএব মৎস্যবিশেষের ডিম্ব বাছিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নহে, সকলেই একত্রিত হইয়া জলো-পরি ভাসিতে থাকে। আমাদিগের বহু দর্শনের দ্বারা এবং এতদ্দেশীয় জেলেদিগের নিকট হইতে ডিম পরীক্ষা সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারি-য়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

যত জাতীয় ডিম্ব হউক না সমস্তই সংগ্রহ করিয়া একটি জলপাত্রে রাখিয়া দিতে হয়, তৎপর জলপাত্রের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া যদি ক্ষণকাল বদ্ধ করিয়া রাখা যায় তবে দেখা যায়, রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু হইলে ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই একস্থানে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিবে, যদি কোন প্রকার পোকা কি অন্যান্য মৎস্যের ডিম্ব হয়, তাহা হইলে তাহারা একত্রে কখনই জমাট বাঁধে না। এতদ্ভিন্ন রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা, প্রভৃতি মৎস্যের ডিম্বাণুর বর্ণ বিশুদ্ধ তাম্রের ন্যায়। আমাদিগের পরিচিত কোন ব্যক্তি জেলে-দিগের নিকট হইতে একভার ডিম্ব ক্রয় করিয়া স্বীয় পুকুরে ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ১৫ দিবস পরে দেখা গেল, ঘুসোচিংড়িতে পুকুরটী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক উল্লিখিত উপায়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করতঃ পরীক্ষা করিয়া ভাল ভাল সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

প্রায় সকল পুকুরেই ডিম্ব ফুটিয়া থাকে, তবে যে সকল পুকুরের জল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং মৎস্যের খাদ্যোপযোগী কোন পদার্থই থাকে না বিশেষতঃ শোল, শাল, বোল, চিতল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয় মৎস্য থাকে, তাহাতে ডিম্ব ফুটনের আশা করা যাইতে পারে না। নূতন পুকুরে ডিম্ব সহজে ফুটে কারণ পুকুর কাটিলে কিম্বা পঙ্কোদ্ধার করিলে মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারাম্ল, প্রস্ফুরস্ মিলিতাম্ল ইত্যাদি পার্থিব পদার্থ অনায়াসে চুয়াইয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে এবং হিংস্রক মৎস্যাদি একেবারেই থাকে না। মৎস্যের চাস করিতে হইলে জলাশয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। জলাশয়ের জল বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে খুব ভাল হয়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা কর্ত্তব্য। এবং যাহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জলে না থাকে কিম্বা কোন রকম বিষাক্ত গাছ গাছড়া পুকুরের তটে না থাকিতে বা জন্মাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। শাল, শোল, বোল প্রভৃতি কতকগুলি হিংস্র জাতীয় মৎস্য আছে, ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও মৎস্যের পোনার প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া থাকে, অতএব যে পুকুরে মৎস্যের চাস করিতে হইবে, তাহাতে উল্লিখিত

হিংস্র জাতীয় মৎস্য যাহাতে বাস না করিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, হিংস্রজাতীয় মৎস্য চাসের পুকুরে থাকা, আর মেষেরপালে ব্যাঘ্র থাকা একই কথা।

ডিম্ব ফুটাইয়া মৎস্যের পোনা জন্মাইবার আর একটি সহজ উপায় আছে। একটু বড় রকমের একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহার তলা এবং চতুর্দ্দিক ইষ্টকের দ্বারা বান্ধাইয়া, তৎপর এক ভাগ বিলাতী মৃত্তিকা ও নয় ভাগ বালু মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা পলাস্তার্ করিতে হইবে। চৌবাচ্চাটির তলাতে কি অন্য কোন দিকে কৌশল করিয়া এমন ভাবে দুটি ছিদ্র রাখা উচিত যে তাহা দ্বারা অনায়াসে চৌবাচ্চায় জল আনয়ন ও পুরাতন জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং এই জল পরিবর্ত্তন করিবার সময়ে মৎস্যেরপোনার উপর যেন কোন রকম অত্যাচার না হয়; এই জন্য চৌবাচ্চার এক পার্শ্বে একটি দরজা (Penstock) রাখা আবশ্যক, উক্ত দরজা উত্তোলন করিলে জলের সঙ্গে পোনা সমূহ অনায়াসে সন্নিকটস্থ অন্য আর একটি জলপাত্রে যাইতে পারে। উল্লিখিত উপায় অবম্বন করিলে ডিম্বাণু নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুব কম। চৌবাচ্চাতে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে, ডিম্বাণু সকল ফুটিলেও, পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কয়েক দিন চৌবাচ্চাতে রাখা আবশ্যক। এবং এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা চাউলের গুড়া কি নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা উচিত। ইহার পর অনায়াসে অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া সকলেই যে ডিম ফুটাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, অতএব অন্য আর একটি উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমতঃ, ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে, পুকুরে পাঁক থাকিলে তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল হয়। যদি একান্তই পঙ্কোদ্ধার করিতে পারা না যায়, তবে সেই সময়ে পুকুরে যে কোন জাতীয় মৎস্য থাকুক না, তাহা ধরা উচিত। ইহার পর সুবিধা ও সময়ানুসারে নানা জাতীয় সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু, কিংবা পোনা সংগ্রহ করিয়া পুকুরেছাড়িতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে ডিম্বাণু সমূহ একেবারে শুষ্ক হইয়া কি পুড়িয়া যায়, এবং কখন কখন অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে ডিম্বাণু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কিম্বা শীতে প্রস্ফুটিত হইবার অনেক ব্যাঘাত জন্মায়, অতএব পুকুরে মৎস্যের ডিম্ব ছাড়িয়া ইহাদিগকে শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুকুরের মধ্যপ্রদেশেই হউক, কি অন্যকোন প্রান্তে হউক চারিটি খুঁটি পুতিয়া একটি "মাচা" প্রস্তুত করিয়া দিলেই হইতে পারে। যাহা হউক, পুকুরে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে ডিম্বাণু সকল ফুটিলে পর, মৎস্যের পোনা একটু বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পুকুরে রাখিলেই ভাল হয় এবং এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য, ময়দা, চালের গুড়া ও নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা আবশ্যক। তৎপর অন্য কোন পুকুরে স্থানান্তরিত করা উচিত, এইরূপ স্থানান্তরিত করাকে এতদ্দেশে "মাছ চালা" বলে। মৎস্য চালিয়া অন্য পুকুরে ফেলিবার পূর্ব্বে, পুকুর পূর্ব্ব লিখিত অনুসারে সংস্কার করিয়া নানা জাতীয় হিংস্র মৎস্য দূর করিতে যেন ভুল না হয়। জলাশয়ের জলকর অনুসারে মৎস্যের পোনা ছাড়া এবং মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। খাদ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আহারের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন বা ব্যায়াম

শরীর বৃদ্ধির আর একটি প্রধান উপায়। শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণী কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া থাকে। করুণাময় পরমেশ্বর নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে, কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন, ইহারা তদনুসারে স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় ও সুস্থ থাকে। ইহাদিগকে আহার অন্বেষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যতটুকু পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই এক রকম ব্যায়ামের কার্য্য সাধিত হয়। যাহা হউক পুকুরে মৎস্য জন্মাইয়া শুধু আহার দিলে চলিবে না, মধ্যে মধ্যে পুকুরে জাল ফেলিয়া কি অন্য কোন প্রকারে ইহাদিগকে তাড়া দেওয়া উচিত। কারণ, ইহারা অনায়াসে আহার প্রাপ্ত হয় বলিয়া বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে না, কাজেই নিতান্ত অলস হয়, এবং তজ্জন্য ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় না। সময়ে সময়ে তাড়া দিলে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, রেলওয়ের নিকটস্থ পুকুরগুলির কিম্বা তালপুকুরের মৎস্য অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, রেলগাড়ীর যাতায়াতের ভয়ানক শব্দ শুনিয়া বা দিবানিশি তালবৃন্তের "খড়খড়" শব্দে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে, এই ধাবন বা অঙ্গ সঞ্চালনই ইহাদিগের শরীর বৃদ্ধি হইবার প্রকৃত কারণ। মৎস্য সমূহ জলচর জীব বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাদিগকে শীতে ক্লেশ পাইতে হয় না, স্থলচর কিম্বা জলচর যে জাতীয় জন্তুই বল না কেন, শীতের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না এবং শীতকালে সাধারণতঃ সকল জন্তুই একটু বেশী নিস্তেজ হয়, অতএব শীত ঋতুতে মৎস্যদিগকে বেশী তাড়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পুকুরের নিকট রজকের বাসস্থান থাকা ভাল, রজকের দ্বারা দুইটী কার্য্যই সাধিত হইতে পারে, রজকগণের কাপড় "কাচার" শব্দে মৎস্যকুল ভীত হইয়া সাধারণতই দৌড়াইয়া থাকে, এবং এই অঙ্গচালনায় ইহারা বেশ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মলিন বস্ত্রের ময়লা ক্ষার প্রভৃতি খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বড় বড় দির্ঘীকায় একখানি ছোট রকমের নৌকা রাখিয়া সময়ে সময়ে বেড়াইলে, জলক্রীড়া ও মৎস্যকে তাড়া দেওয়া উভয় কার্য্যই আনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, এ,

মৃত্যুর পর।

জগৎ—অর্থাৎ যাহা যায়। মানুষ জন্মে, আবার মরে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই জন্মে, আবার দুইদিন পরে, মরে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা সকলেই জন্মে; ও মরে। নির্ম্মল সলিলা প্রাণস্বরূপা স্রোতস্বিনী, নয়নানন্দকর গাম্ভীর্য্যময় সুনীল পর্ব্বতরাজি, অপূর্ব্ব বৈচিত্রময়ী ধরিত্রী, সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত, উদ্ভিজ্জ ও জীব জগতের প্রসবিতা সবিতৃদেব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সুবিচিত্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সকলেরই আদি ও পরিণাম ঐ, জন্ম ও মৃত্যু, প্রকাশ ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়। সকলেই আসে ও কিছুদিনের জন্য বিশ্বে নিজ নিজ লীলা প্রদর্শন করিয়া আবার বিলীন হয়।

সমস্তই যায়! তবে কি কিছুই থাকে না? কবি-হৃদয় স্মৃতির অতীত কাল হইতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। তাহার ব্যাকুল হৃদয় কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না, যে, তাহার এত প্রেম, এত ব্যাকুলতা, এত আশা, এত পিপাসা সমস্তই মিথ্যা—সমস্তই চিত্তের ভ্রম মাত্র। সে যেন বিশ্বজোড়া বিরাট শূন্যতার অন্ধকারের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আলো রেখার আভাস দেখিতে পায়, যেন অনুভব করে,—বিশ্ব নিধ্বংসী কালের করাল কবলও ঐ আলোকণার নিকট উপেক্ষিত, তাহার ধ্বংশ নাই,—উহা ধ্বংশের পর পারে অবস্থিত। কবির প্রেমিক প্রাণ সর্ব্বদাই জানিবার জন্য ব্যগ্র—যে, ঐ আলোটুকু কি প্রকৃতই সত্য; না উহা তাহার দৃষ্টিভ্রম?

ব্রহ্মাণ্ডে নশ্বর জগৎ ব্যতীত আরও কি কিছু আছে, যাহা নিত্য ও অবিনশ্বর? মানুষ মরে, কিন্তু মৃত্যুকেও উপহাস করে এমন কিছু কি তাহার মধ্যে আছে? কবির সরল প্রাণের এই গূঢ় ব্যাকুলতা টুকু লইয়া সংসারে বিশাল বাগ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; সাধুভাষায় ইহারই নাম দর্শন। পাগলের প্রলাপ বলিয়া কেহ কেহ উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে; কেহবা উহার ভিতর অনন্ত দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছে, নানা জনে ইহার নানা উত্তর দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মীমাংসা আজিও হইল না।

সেই প্রাচীন যুগের কবিতাময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে;—

"যেয়ম প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নাস্তীতি চান্যে"—মানুষ মরিয়া গেলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন, না, তখনও তাহার অস্তিত্ব থাকে, ইহার মধ্যে কোনটি সত্য? এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন ঘোর সন্দেহের অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় কি?

বিজ্ঞান কঠোর সত্যবাদী। বিজ্ঞানের সমর্থন ব্যতীত এখন কোন সত্যই সমাদৃত হয় না। সুতরাং আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব, বিজ্ঞান উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

বিজ্ঞান স্বীকার করে, শক্তি অনশ্বর ও নিত্য (Conservation of energy)। জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। কেহ তাহার উৎপাদন বা ধ্বংশ সাধন করিতে পারে না। জগতের বৈচিত্র্যময়ী ঘটনাবলী ইহারই বিভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্তি (transformation of energy) বশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ঐ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আকারে সমাহিত থাকে এবং পদার্থের বা এক আকারের শক্তি কিছু মাত্র ব্যয়িত হইবা মাত্র অন্য পদার্থে বা অন্য আকারে তাহা ঠিক সেই পরিমাণে তৎক্ষণাৎ আভির্ভূত হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পরিমাপক নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থে কি পরিমাণ শক্তি বর্ত্তমান আছে তাহা আমরা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারি এবং এক পদার্থ হইতে শক্তি অপর পদার্থে চালিত হইলে ঐ চালিত শক্তিরই বা পরিমাণ কত, তাহাও আমরা স্থির করিতে পারি। এই যন্ত্র গুলির সাহায্যেই শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ স্থাপিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।

সংসারের যাবতীয় বিচিত্র ঘটনাবলী ঐ এক শক্তির এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গমনের ফল মাত্র। বিজ্ঞান বলে, বিশাল শক্তির আধার ভূত সূর্য্য হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত তাপ ও

আলোরূপে শক্তি বিকীরিত হইতেছে। তাহার কিয়দংশ আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিতে ঐ আলো ও তাপ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাহার ফলেই পৃথিবীতে বায়ুর সঞ্চালন, স্রোতস্বিনীর প্রবাহ, তুষার ধবল হিমগিরির ও সুনীল সমুদ্র বক্ষের প্রাণোন্মাদক অসীম গম্ভীর সৌন্দর্য্য; উহারই ফলে ধরিত্রী বক্ষের শষ্যশ্যামল পরম রমণীয়ত্ব, নর নারীর —মাধুর্য্যময় প্রেমের অনন্ত উচ্ছাস এবং জীবকুলের নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা ব্যাপদেশে কঠোর জীবন সংগ্রাম, ঐ শক্তি, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিজ্জাদির সংগঠন সাধন করে এবং নবোদ্ভূত বৃক্ষ লতাদির অভ্যন্তরে তাহাদের জীবন স্বরূপ হইয়া তথায় নানাবিধ আকারে অবস্থান করে। উদ্ভিজ্জ সমূহ জীবকুলের খাদ্য বলিয়া, তন্নিহিত শক্তি আহার কালে আবার জীব শরীরে প্রবেশ লাভ করে ও তথায় নানারূপ জটিল রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তির উন্মেষ ঘটাইয়া শরীরীকে সঞ্জীবিত ও রক্ষা করিতে থাকে।

যে কোন ঘটনা হউক না কেন বৈজ্ঞানিক বলেন, তাহা ঐ একই শক্তির, অবস্থান্তর প্রাপ্তি জনিত, নানাবিধ লীলা; জড় জগতের এমন কোনও ঘটনা নাই যাহা উহার আয়ত্তের বহির্ভূত।

জড় বিজ্ঞান আরও বলে, যে (১) সূর্য্য নিঃসৃত শক্তির, বা যে শক্তির বলে পৃথিবী পূর্ণ সঞ্জীবিত, তাহার কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নাই; উহা অন্ধ এবং অন্ধ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য চালাইতেছে; (২) আর ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কোন শক্তির ও অস্তিত্ব জগতে নাই। মানসিক শক্তিগুলিও ঐ শক্তির কোন বিশেষ অবস্থা মাত্র।

পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনার ন্যায় মৃত্যুও একটী ঘটনা। যখন "ঘটনা" তখন বিজ্ঞানের মতে উহা অবশ্য ঐ অনশ্বর শক্তির অবস্থান্তর প্রাপ্তির একটা ফল মাত্র। বিজ্ঞান বলে,—শক্তি যে অবস্থায় থাকিলে প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে, মৃত্যুতে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; মৃত্যুর সময় দেহ মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণাদি নানাবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই শরীরের পতন বা মৃত্যু হয়। অম্লজান যবক্ষারজান জলজান প্রভৃতি মূল পদার্থ গুলি মৃত্যুর পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীব শরীরে অবস্থিত ছিল এবং সমষ্টি ভাবে উহারাই শরীর রূপী হইয়া ছিল। মৃত্যুর সময় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়; তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া পুরাতন শরীরের পতন সাধন করে এবং অন্যত্র নূতন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া নূতন শরীর গঠন করে।

এখন শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ সত্য বলিতে হইলে, বলিতে হইবে মৃত্যুর পূর্ব্বে জীব শরীরে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত ছিল মৃত্যুর পরেও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি তথায় বা অন্যত্র পরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে; তাহার বিনাশ সাধন হয় না।

শক্তি এক হইলে ও অবস্থাভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ হইয়াছে। সেগুলি আমরা সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছি :— (১) জড়শক্তি :—যথা আলো, তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি (২) অজড় বা মানসিক শক্তি, যথা— বুদ্ধি ইচ্ছা ইত্যাদি।

শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ অনুসারে, মৃত্যুর পূর্ব্বের জড় ও অজড় শক্তি সমষ্টি, মৃত্যুর পরে জড় ও

অজড় শক্তি সমষ্টির সমান হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে জড় শক্তির সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে পরিমাণ জড় শক্তি শরীরে অবস্থিত ছিল মৃত্যুর পরে ও তাহাই থাকে অবশ্য পরিবর্ত্তিত অবস্থায়। কিন্তু মৃত্যুর পরে সমপরিমাণ অজড় শক্তির অস্তিত্ব কোন যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করা যায় না কিম্বা উহার কিছু মাত্রেরও যে অস্তিত্ব থাকে তাহা ধরিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু উহার অস্তিত্ব না থাকিলে শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। শক্তির অনশ্বরত্ব বাদ বিজ্ঞানের একটী কঠোর সত্য সুতরাং বিজ্ঞানকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে,—মৃত্যুর পর পারেও মানসিক শক্তি গুলির অস্তিত্ব লোপ পায় না।

অতএব বিজ্ঞানের সাহায্যেই সিদ্ধ হইল চিন্তা প্রেম, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির উপর মৃত্যুর কোন হাত নাই, উহারা মৃত্যুর অতীত। ইহাদের ধ্বংশ নাই; কোন জড় শক্তির ন্যায় উহারা অবস্থান্তরে যাইতে পারে মাত্র।

মন, বুদ্ধি, চিন্তা, শক্তি অহংজ্ঞান, প্রেম, দয়া ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির মৃত্যুর পর পারে অস্তিত্ব থাকিলেও তাহারা কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে তাহা এখনও আমাদের বোধগম্য হইল না। তবে কি ভাবে ইহারা শূন্যে শূন্যে অনাধার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়? না, তাহা নয়। যখন আধার রহিত অবস্থায় কোন শক্তিরই অস্তিত্ব দেখা যায় না, তখন মানসিক শক্তিগুলিই বা কেন ঐ অবস্থায় থাকিবে? এই জন্য স্বীকার করিতে হয় মৃত্যুর পরেও উহাদের কোন আধার থাকে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহারা অবস্থান করিতে পারে।

হিন্দু শাস্ত্রে ঐ আধারের নাম লিঙ্গশরীর।

আরও একটী কথা, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির স্বাধীন ক্ষমতা নাই। রেলওয়ে এঞ্জিন ভীষণ শক্তির আধার তথাপি উহা পরাধীন; ড্রাইভারের পরিচালনা ব্যতীত উহা গম্য স্থানে গমন করিতে পারে না এবং তদ্ধার্য্য কোনও কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। সেইরূপ, চিন্তা প্রীতি ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতির কোনই কার্য্য কারিতা থাকে না, যদি তৎপশ্চাতে কোন একটি পরিচালক না থাকে।

আমরা জানি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক শক্তি গুলি হইতে কার্য্য প্রসূত হয়; তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উহারা কাহারও কর্ত্তৃক পরিচালিত ও প্রণোদিত হইতেছে। সেই পরিচালকের নামই আত্মা। মৃত্যুর পরে যদি ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে আত্মার ও অস্তিত্ব সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারেই সিদ্ধ হইল, মৃত্যুর পরেও মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সহ আত্মা বর্ত্তমান থাকে; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার ধ্বংশ সাধন হয় না; উহা নিত্য। অতএব আমরাও এখন নিঃসংশয়ে ভগবদ্বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া গাহিতে পারি—

"বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতিনরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥

শ্রী ঃ—

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জন প্রণালী।

শুভ্রীকরণ (Bleaching)*

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রঞ্জন কর্য্যের পূর্ব্বে সূত্র বা বস্ত্রকে শুভ্র করিয়া লইতে হয়। কার্পাস পশম ও রেশমের শুভ্রীকরণ প্রণালী ক্রমান্বয়ে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণীত হইল।

কার্পাস সূত্র বা বস্ত্র ঃ—তূলার মধ্যে স্বভাবতঃই কিয়ৎপরিমাণে ময়লা থাকে। এইজন্য তদ্দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিলে উহা দেখিতে ধূসরবর্ণ হয়। আবার টানা (১) করিবার সময় উহাতে আবও মলা (২) সঞ্চিত হয়; সময়ে সময়ে ঐ মলার পরিমাণ সূতার মোট ওজনের প্রায় তৃতীয়াংশের এক অংশ পর্য্যন্ত দাড়ায়। কাল অথবা অন্য কোন ঘন রং করিতে হইলে সূতাকে শুভ্র না করিলেও চলিতে পারে; কেবল গরম জলে ফুটাইয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। ফিকে রং করিতে হইলেও সূতাকে একেবারে সাদা ধপ্‌ধপে না করিলেও চলে; রঞ্জকগণ এক্ষেত্রে সাধারণতঃ সূতাকে গরম সোডা বা কোন ক্ষারের (ছাই) জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া লইয়া পরে ক্লোরাইড অব লাইম বা সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড এর জলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া কাচিয়া লয়; তৎপরে ইচ্ছামত রং করে। সূতাকে একেবারে সাদা করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় (৩) অবলম্বন করা আবশ্যক ঃ—

(ক) ধরা হউক, আমাদিগকে প্রায় ৪০ মণ সূতা শুভ্র করিতে হইবে। ৪৪০ গ্যালন জলের মধ্যে ১°১৬ আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ৩২° টোয়াডেল* ঘনত্ব বিশিষ্ট ৬৬ গ্যালন কষ্টিক সোডার জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত পরিমাণ সূতা ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাও; তৎপরে পরিষ্কার জলে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল ধরিয়া সূতা কাচিয়া নিংড়াইয়া লও।

(খ) পরে ঐ সূতাকে ১° টোয়াডেল ঘনত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) এর মধ্যে ছোপাও; পরে পুনরায় উহাকে কাচ।

যদি সূতাকে রং না করিয়া কেবল শুভ্র করিয়া রাখাই উদ্দেশ্য থাকে তবে উহাকে সামান্য নীল ও সাবান (Ultra marine blue &c and soap) এর জলে পুনরায় ছোপাইয়া, নিংড়াইয়া শুকাইয়া লও।

এই উপায় অবলম্বন করিলে সূতা ঠিক বরফের মত সাদা হইবে। নিম্নে অপর দুইটী

* শুভ্রীকরণ শব্দকে আমার এখন হইতে bleaching শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিব।

(১) Warp,

(২) মাটি, তেল চর্ব্বি প্রভৃতি।

(৩) Textile fabrics by Hummel ১২-১৩ পৃঃ।

* তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাণ যন্ত্র বিশেষ।

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারের দোকানে ইহা বিক্রয় হয়; মূল্য আনুমানিক ৬৲ টাকা। তরল পদার্থের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ইহা ভাসিতে থাকে ইহার গায়ে কতকগুলি দাগ কাটা আছে; ইহার যে দাগ ঠিক তরল পদার্থটির মাথা (Surface) স্পর্শ করিয়া থাকে, ঐ দাগ বা সংখ্যাই ঐ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব জ্ঞাপক।

(১) ইহাও ডাক্তারের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়; প্রতি পাউণ্ডের মূল্য আনুমানিক ।৶০ আনা মাত্র।

উপায় সংক্ষেপে বর্ণীত হইতেছে। অল্প পরিমাণ জিনিসের পক্ষে উহাদের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

(১) ২ পাউণ্ড কষ্টিক সোডা ও ৩ পাউণ্ড সাবান ১৪০ পাউণ্ড জলের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে ১০০ পাউণ্ড সুতা বা কাপড় ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইয়া লও তাহার পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া শুকাও।

(২) দেড় ডিগ্রী-টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট ব্লিচিং পাউডারের শীতল জলের মধ্যে সুতা বা কাপড় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখ; তৎপরে তাহাকে উঠাইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত টেবিলের উপর রাখিয়া দাও। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন ব্লিচিং পাউডারের গুড়া সুতার গায়ে লাগিয়া না থাকে; যে স্থানে ঐ গুড়া লাগিয়া থাকিবে তথায় ছিদ্র হইয়া যাইবে। তৎপরে ১ ডিগ্রী টোয়াডেল ঘনত্ব বিশিষ্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলে ঐ সুতা ১০ মিনিটকাল রাখিয়া পরিষ্কার জলে উহাকে ভাল করিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লও।

পশমঃ—স্বাভাবিক অবস্থায় পশমের উপর কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থের আবরণ থাকে। উহার পরিমাণও নিতান্ত কমনয়; একসের পশমে ঐ মলার পরিমাণ প্রায় ১।৷০ ছটাক। প্রথমে এগুলিকে না উঠাইয়া ফেলিলে পশমে রং ধরান যায় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশে জান্তব মূত্রের সাহায্যে ঐ কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে। ৫ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ জান্তব মূত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে পশম বেশকরিয়া কাচিয়া লইলে পশমের তৈলাক্ত অংশ প্রায় সমস্তই উঠিয়া যায়। দুর্গন্ধ ব্যতীত এপ্রণালীর আর অন্য কোন দোষ নাই। পাশ্চাত্য দেশে ইহার পরিবর্ত্তে, পেট্রোলিয়ম, ইথর, কার্ব্বনবাইসালফাইড, বেনজিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ঐ জন্য সাবানের জলের সহিত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। ময়লা উঠিয়াগেলে পরিষ্কার জলে পশম বেশ করিয়া কাচিয়া লইয়া তৎপরে উহাকে শুভ্র করিতে হয়। শুভ্রকরিবার অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে আমরা নিম্নে দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিলামঃ—

(১) ৩২° টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট সোডা সালফাইটের জলে পশমকে ১৪।১৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, তৎপরে উহা নিংড়াইয়া পুনরায় উহাকে ৬° টোয়াডেল আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে কিছুক্ষণ ছোপাইয়া পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লও।

(২) ৪৬ গ্যালন জলের মধ্যে দুই গ্যালন হাইড্রজেনপারঅকসাইড, ও কিছু লাইকার অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া ঐজলের মধ্যে ১০ পাউণ্ড পশম প্রায় ১০।১২ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখ ও মধ্যে মধ্যে নাড়িতে থাক; তাহার পরে ঐ জল ১২০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহাতে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া পশমকে গরম কর; পরে পরিষ্কার জলে পশম কাচিয়া লও।

(৩) বার্মিংহামের নিকটস্থ ওল্ড্‌বারি নামক নগরের আলুমিনিয়ম মেটাল কোং কর্ত্তৃক প্রস্তুত সোডিয়ম পার অকসাইড দ্বারাও পশম অতি সুন্দর রূপে শুভ্রকরা যাইতে পারে। সোডিয়ম পার অকসাইড দেখিতে ধূসর বর্ণ; জলে দিলে সোঁ। সোঁ। শব্দ করিতে করিতে উহা গলিয়া যায় এবং ঐজল ক্ষার গুণ যুক্ত হয়। ২০ গ্যালন জলের সহিত ৩ পাউণ্ড দানাযুক্ত ম্যাগ্নেসিয়ম সালফেট ও ১ পাউণ্ড সোডিয়ম পার অকসাইড ক্রমশঃ মিশাও পরে ঐ জলকে ১৮০° ফা ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত

করিয়া এবং তন্মধ্যে পশম ডুবাইয়া, প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাড়িতে থাক; পরে জলের তাপ বৃদ্ধি করিয়া ১ঘণ্টা কি ১॥০ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ফুটাইতে থাক, অবশেষে উহাকে নিংড়াইয়া অল্প ঘনত্ব বিশিষ্ট গন্ধক দ্রাবকের জলে কিছুক্ষণ ছোপাইয়া পরিষ্কার জলে কাচিয়া লও। ১ পাউণ্ড সোডিয়ম পার অকসাইডের সাহায্যে প্রায় ১২ পাউণ্ড পশম শুভ্র করা যায়।

রেশমঃ—পশমের ন্যায় রেশমের উপরেও একরূপ তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। উহাকে উঠাইবার উপায় ঠিক পশমের অনুরূপ। পশম শুভ্র করিবার যে যে প্রণালী উপরে বর্ণীত হইল ঐ প্রণালী অবলম্বনে রেশমকেও শুভ্র করা যাইতে পারে। শুভ্রীকরণ প্রণালী যতই উন্নত হউক না কেন তথাপি সুত্রাদি শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ ধূসর বর্ণ থাকিয়া যায়; এইজন্য শুভ্রীক্রিয়ার অন্যান্য সমস্ত প্রণালী অনুষ্ঠিত হইবার পরেও রেশমকেও কিছুক্ষণ অল্পপরিমাণ নীল মিথিল ভায়লেট বা মিথিলিন ব্লু মিশ্রিত জলের মধ্যে ছোপাইয়া লওয়া আবশ্যক। এতদ্দ্বারা ধূসর ভাবটুকুও দুরীভূত হয়।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ।

রূপমতী।

ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে মালবপ্রদেশ কিছুকালের জন্য রাজবাহাদুর নামক একজন অফ্‌গান শর্দ্দারের অধীন হয়। রাজদীল্লীশ্বরের বেতন ভোগী প্রতিনিধি ছিলেন না সুতরাং মালব তখন এক প্রকার স্বাধীন রাজ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রূপমতী ইহারই প্রধান মহিষী ছিলেন।

এই স্বনাম প্রসিদ্ধা অসামান্যা গুণবতী ও সৌন্দর্য্যশালিনী ললনার নাম হিন্দুস্থানের গৌরবময়ী ও চিরপূজ্য রমণীবৃন্দের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইলেও আধুনিক ইতিহাসে ইহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না ইহা আমাদের ইতিহাস পাঠের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তাহা বলিতে পারি না। রূপমতী যে কেবল মাত্র গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন, তাহাই নহে,—তিনি রমণীর সারধনে ধনবতী—সতীত্বের আদর্শরূপিনী ছিলেন। যাহার জন্য কুৎসিতা হইলেও অরূপ রূপলাবণ্যবতী এবং যাহার অভাবে রমণী সুরূপা হইলেও কুৎসিতা, যাহার জন্য রমণীর রমণীয় নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকে, যাহার জন্য অলোক সামান্যা রূপবতী পদ্মিনীর নাম অদ্যাপি স্মৃতি মন্দির পবিত্র করিতেছে তাহার জন্য রূপমতীর নাম এত প্রসিদ্ধ।

তাঁহার জীবনী কাব্যের মত সুকোমল ভাবাপন্ন নহে; তাঁহার সমগ্র জীবন কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং সেগুলি সুরতান লয়ে গান করিতেন। নৃত্য গীতবিদ্যায় তিনি সম্যক পারদর্শিনী ছিলেন।

উজ্জয়িনী হইতে চতুর্ব্বিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, কালিসিন্ধুনদীর পূর্ব্বতীরস্থিত সারঙ্গপুর নামক একটী প্রাচীন নগরে রূপমতী জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা মাতা ও শৈশব ইতিহাসের সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই অবগত নহি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ম্যালকম সাহেবেরমতে রূপমতী সারঙ্গপুরের নৃত্যব্যব-

সাগিনী বালিকা ছিলেন। নর্ত্তকী হইলে কি হয়, তাঁহার গুণগ্রামে ও অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে তাঁহার নাম ও খ্যাতি বহুদূরে বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে সে সংবাদ মালবাধিপতি রাজবাহাদুরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

এই আফগান সর্দ্দার তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন সৌন্দর্য্য লিপ্সা তাঁহার প্রাণে অহরহঃ বিদ্যমান ছিল। তিনি সঙ্গীত ও কবিত্বের অসাধারণ পক্ষপাতী ছিলেন। রূপমতীর গুণাবলী ও সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে এতদূর অভিভূত করিয়াছিল সে, তিনি অবিলম্বে রূপমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাজ বাহাদুর রূপমতীর গুণগ্রামে যেমন আত্মহারা, রূপমতীও রাজা বাহাদুরের গুণগ্রামে তেমনই আত্মহারা হইয়াছিলেন। প্রগাঢ় প্রণয়, অকপট অনুরাগ ও নির্ম্মল প্রেম প্রণয়ী যুগলের সরল প্রাণে অপরূপ ভাবের সৃজন করিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, মানব সুখের এই বুঝি চরমোৎকর্ষ, পবিত্র প্রণয়লীলার এই বুঝি পরিণতি! সপ্তবর্ষ ব্যাপিয়া রাজ বাহাদুরের সুখের জীবন এমনই ভাবে অতিবাহিত হইতেছিল।

আকবরের দুর্দ্দমনিয় রাজ্যলিপ্সা লোলিহান রসনা মালবের শান্তিময় প্রদেশের উপর পতিত হইল। তাহার ফল স্বরূপ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আদম খাঁর নেতৃত্বে একদল সেনা মালবাধিকারে প্রেরিত হইল। একরূপ বিনাযুদ্ধেই রাজবাহাদুর পরাভূত ও বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার অপরিমিত ধনরাশি অগণিত হয়, হস্তি, সুবিখ্যাত "বেগম মহাল" আদম খাঁর হস্তে পতিত হইল।

রূপমতীর জীবনের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত বিদ্যমান থাকিলেও তিনি আদম খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আত্মঘাতিনী হয়েন, এই বিষয়ে সকল গুলিরই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

একটী মত এই। আদম খাঁর সহিত যুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজবাহাদুর তাঁহার "বেগম মহাল" সারঙ্গপুরে স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে আদেশ দেন "আমার পরাজয় দেখিলে তোমরা "মহলে" প্রবেশ করিয়া বেগমগণকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিবে যুদ্ধের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা রাজবাহাদুরের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। এই সংবাদ আদম খাঁর নিকট পৌছিল, তিনি ইতিপূর্ব্বেই রূপমতীকে যেরূপেই হউক, হস্তগত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে যখন তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিয়া সংবাদের যথার্থতা প্রমাণ করিল, তখন তিনি স্বয়ং রূপমতীর আহত দেহ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, রূপমতী তখনও জীবিতাবস্থায় চাহিয়াছেন। আদম খাঁ তাহার ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন ও বন্ধন (Bandage) করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপমতী কিছুতেই বাঁধিতে দিলেন না। যখন তিনি শুনিলেন, রাজবাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবেন, তখন তিনি বাঁধিতে আদেশ দিলেন। রূপমতী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে আদম খাঁর কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে বিষপানে আত্মঘাতিনী হয়েন।

অপর একটী মত এই। তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েন। বিষপান করেন নাই।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী আমরা

মুসলমান ঐতিহাসিক দফি খাঁর ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হই। তিনি বলেন, রাজবাহাদুর পরাজিত ও নিরুদ্দেশ হইলে রূপমতী আদম খাঁর হস্তগত হয়েন। খাঁ সাহেব বারবার তাঁহাকে প্রণয়িনী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সতী রমণী বরাবরই তাহার প্রত্যাখান করেন।

ইহাতে আদমখাঁ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নাশ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন।

যখন অনুনয় বিনয়ে ও কিছুই হইলনা, তখন সতীসাধ্বী রূপমতী সেই মহা সঙ্কটময় অবস্থার উপযোগী—সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য শেষেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি আদম খাঁর, অভ্যর্থনার জন্যে একটী দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। সেদিন রূপমতী বহুমূল্য রত্নরচিত পরিচ্ছদ ভূষিতা হইয়া ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। এমন সময়ে আদমখাঁ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া সহচরী বৃন্দ অনতি বিলম্বে রূপমতীকে জাগরিত করিতে গেলেন, কিন্তু হায়! তিনি আর জাগিলেন না, সে আকর্ণ বিস্তৃত সুন্দর নয়ন আর উন্মীলিত হইল না।

তখন বুঝাগেল বিষপানে রূপমতী চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কোন স্বর্গীয় পদার্থের পবিত্রতা রক্ষণে তুচ্ছপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন! ধন্য রূপমতী! ইহার জন্যেই তোমার নাম মানবের আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে অদ্যাবধি উচ্চারিত হইতেছে।

রূপমতী অসাধারণ সতিত্বগুণে গুণবতী। তাঁহার রচিত গাথা গুলি "রাজভুপ কল্যাণ" নামে আখ্যাত। সেগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নাইবটে, কিন্তু ভারতবাসী মাত্রেই সগৌরবে সেগুলি গান করিয়া থাকে। আজপর্য্যন্ত মালবের সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণ "রাজভুপ কল্যাণ" গীতগানে জীবিকার্জ্জন করে।

পতি প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ রূপমতী রচিত দুইটী কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পাপি প্রাণ রহত ঘট
ভিতর কিয়ো চাহত সুখরাজ।
রূপমতী পিয়ে হাম্সি দুঃখিয়া॥
কাঁকঁগয়া পিয়া বাহাদুর রাজ!

ইহা বিরহ সঙ্গীত। রাজ বাহাদুরের অনুপস্থিত জনিত বিরহে রচিত।

তনুবিনুজিত্ত বারহত হট্
মাঁগত হাই সুখরাজ,
রূপমতী দুখিয়া তেই
বিনে বাহাদুর রাজ!

প্রবাদ এই রূপ, আদম খাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া যখন রূপমতী ছুরিকা ঘাতে আত্মঘাতিনী হয়েন, উক্তগীত সেসময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিসৃত হইয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে সকল গুলি দিতে পারিলাম না।

এই দুইটী কবিতাই রূপমতীর অসামান্য পতি প্রেম ও সতীত্বের পরিচায়ক নহে কি?

শ্রী—

—০:*:০—

আর্য্য শক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্য রথীগণের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসা জাতীয় জীবনের উন্নতি স্রোতে ভাষা ও ভাবের, বক্তব্য ও কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ও সমাহারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু

দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্য আয়াসসাধ্য হইলেও স্বকীয় কার্য্য কারিতা দ্বারা সমাধান প্রয়াস, শিক্ষা বৈষম্যে বঙ্গীয় মস্তিষ্কে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, ইহাই দুঃখ; তবে লাভ এই,—এখন এ বিংশ শতাব্দীর, অস্তিত্ব সংরক্ষণের পারস্য গোষিত নির্ম্মলযুগে, স্বার্থসংঘর্ষের ঘোর দুর্দ্দিনে এ দুঃখের প্রতিকারকল্পে সামর্থহীনতা সত্বেও আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে পানীয় অভাব কিন্তু পিপাসার উত্ত-রোত্তর বর্দ্ধন শীলতা এক দিন না এক দিন পূর্ব্ববৎ আত্মনির্ভরতা আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই।

আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। সেই আদর্শ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় হইলেই অধিকতর আদরণীয়ও কার্য্যকরী হয়। মনুষ্যের আদর্শ কাল্পনিক দেবতা না হইয়া মনুষ্য হওয়াই উচিত। স্বদেশীয় মহাপুরুষ অর্থাৎ আর্য্য ঋষিগণের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতি হাসের উপর নির্ভর করে। অতীত ইতিহাস প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দিগের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত কিছুই নহে। যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই সুতরাং উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য, অতীত যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবন-বৃত্তান্তের আলোচনা করা তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা অতীত যুগের স্বদেশীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অতীতই ভারতবর্ষের সম্বল। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক দেশেরই অতীত ইতিহাস এরূপ সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। বহুবিপ্লব, ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারত সন্তানগণ অনেক পরিমাণে সে সকল অতীত কাহিনী বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু আবার বিধির কৃপায় সুদিন উপস্থিত হইয়াছে; আমরা অতীতের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রাচীন আর্য্য পণ্ডিতদিগের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অল্প, সেই জন্যই আমরা তাঁহা-দিগকে বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহারা যাহা উপদেশ দিতেন তাহা কর্ণপাতও করিতাম না। আমাদিগের অধঃ পতনের ইহাই মূলকারণ। তাঁহারা বলিতেন,—সত্য কথা কহিও, পরস্ত্রী গমন করিও না নিষ্ঠুরতার সহিত কাহাকেও ব্যবহার করিও না, তাহা হইলেই তুমি রোগ শোক পাপমতি হইতে দূরে থাকিয়া পরমাসম্ভারে আপনাপনি জ্যোতিষ্মান্ হইতে থাকিবেক ও দীর্ঘায়ুলাভে সদানন্দে কালযাপন করিতে পারিবেক। শিক্ষাগুণে প্রাচীন আর্য্য সমাজ যেরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়শীল, জগতে অধ্যবসায়ের এরূপ নিদর্শন কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরাণোক্ত ঋষিগণের দিব্য জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টি দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জগতের সর্ব্বস্থানের বিষয় অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অলীক বলিয়া জানিতাম; কিন্তু যখন জানিলাম যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের একত্র সাহায্যে দ্রব্যের অস্তিত্ব ও মানবাত্মার অবিনশ্বরত্ব, ইউক্লিডের (জ্যামিতি) প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিতে পারা যায়। অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, এমন কি

সেই মহাত্মা ঋষিগণের সহিত অনেক দিন একত্র বাস করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ছেন। তখন তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছি যে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আদৌ স্পর্শ করিতে সক্ষম না হইয়া প্রায় একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন ও যে বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কারণ ও পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও অবস্থিতি বিষয়ক কারণের জ্ঞান জন্মে, তাহা কেবল তাঁহারাই বিদিত আছেন। তাঁহাদের যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সাধারণের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা বলেন যে, উহা কেবল সেই বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভাবে হইয়া থাকে,। সকল বিষয় সকল বস্তু ও সকল কার্য্যই স্বাভাবিক নিয়মান্তর্গত। স্বভাবের নিয়মের বহির্ভূত কোন কর্ম্মই কখন সম্পাদিত হইতে পারে না।

মানব বুদ্ধির যে কত শক্তি তাহা মানুষ নিজেই অবগত নহে। কিন্তু আর্য্য মনীষীগণ জ্ঞাত আছেন। কাষ্ঠে অগ্নি আছে বলিয়াই দুইখণ্ড একত্র ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষে অনেক শক্তি অব্যক্তভাবে আছে বলিয়াই ক্রমে অনেক অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের এত উন্নতি হইতেছে। বৃক্ষ উৎপাদন করা ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুফল ফলার শক্তি বীজেই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। ক্ষেত্রগুণে ও বাহিক চেষ্টাতেই যেমন বীজ নিজশক্তি প্রভাবে একটী সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ কাল ও স্থান বিশেষ ও নিজ যত্ন ও চেষ্টায় মনুষ্য আপনার সেই অব্যক্ত শক্তি প্রভাবে সমস্ত জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই আর্য্য ঋষিগণ ঐ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও সেই মহাপুরুষের সন্তান ব্রাহ্মণ, আবার উদ্যোগ করিলে আমরাও কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই।

কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে যে কতদূর কঠোরতা পালন করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রকারগণ পুনঃপুনঃ বলিয়াগিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যে অর্থাদি বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, তাহা আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিয়া গিয়াছেন।

"ন ধর্ম্মবর্জ্জিতং কামমর্থং বা মনসা স্মরেৎ।
সীদন্নপি স্বধর্ম্মেণ নত্ব ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
ভূতানাং প্রিয়কারী স্যান্ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ॥"

কূর্ম্ম পুরাণে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবিহীন কোন কামনা অথবা অর্থের বিষয় স্মরণও করিবেন না; আপনার ধর্ম্মে থাকিয়া যদি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হন, তথাপি বৈশ্যাদির ধর্ম্ম অথবা যাহা ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধক হইবেন, কখনই পরের অনিষ্টসাধন বিষয়ে বুদ্ধি নিবেশ করিবেন না। ইহা অপেক্ষা আর কি স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে পারে! ধর্ম্ম রহিত অর্থ অথবা কামনার প্রাপ্তি ত দূরের কথা; সে বিষয় চিন্তা করিতেও ব্রাহ্মণের নিষেধ। ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যদি ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহও না হয়, তথাপি কৃষিশিল্পাদি বৈশ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ কেবল পরের মঙ্গল সাধনেই রত থাকিবেন। এইরূপ ভাবে যাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে কি আর কাহাকেও উপদেশ দিতে হয়, ভক্তি শ্রদ্ধা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ ঋষিগণ যে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া পূর্ব্বকালে তাহাদিগকেই প্রথমে সত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রদান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি, কারণ যাহা ন্যায় তাহাই সত্য, যাহা পুণ্য তাহাই সত্য আর যাহা অন্যায় যাহা পাপ তাহাই মিথ্যা। শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন ঃ—

নাস্তি সত্য সমো ধর্ম্ম ন সত্যাং বিদ্যতে পরম।
নহি তীব্র তরং কিঞ্চিদনতাদিহ বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ "সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর পদার্থ জগতে লক্ষিত হয় না।" এই জন্য ব্রাহ্মণকে প্রথমে সত্য পরায়ণ হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের সুবুদ্ধি ছিল; মনুষ্যের দুই প্রকার বুদ্ধি সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। যে বুদ্ধি আমাদিগকে শুভকার্য্যে উত্তেজিত ও অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে তাহাই সুবুদ্ধি, আর যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা অন্যায় কার্য্য করি তাহাই কুবুদ্ধি। সুবুদ্ধির পরামর্শে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ কুবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধির অনুসরণ করিতেন। শাস্ত্রেও কথিত আছে ঃ—

"যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥"

অর্থাৎ "যিনি মোহবশতঃ হিতবাক্য গ্রহণ না করেন তিনি দীর্ঘ সূত্রী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হন।" ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ করিবেন এই কথা ঋষিগণ পুনঃপুনঃ আদেশ করিয়াছেন, কারণ সাধু সঙ্গে আমাদের সাধুতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য সাধু সঙ্গ যেমন প্রার্থনীয় মন্দ সঙ্গও তেমনি পরিত্যাজ্য। যথা ঃ—

"মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধু সমাগমঃ ॥"

অর্থাৎ "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধুসংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।" শাস্ত্রকারগণ আরও উপদেশ দিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের "কৃতজ্ঞতা" রূপ মহারত্ন হৃদয়ে সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া রাখিতে হয়।

কেহ উপকার করিলে সেই উপকার অনুভব করিয়া উপকারক ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের যে সদ্ভাব ও অনুরাগের উদ্রেক হয় তাহাই কৃতজ্ঞতা। উপকার পাইয়া যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ না হয় সে নিতান্ত নীচ প্রকৃতির লোক। আর্য্য শাস্ত্রে কৃতঘ্নতা সকল পাপের অপেক্ষা মহত্তর পাপ বলিয়া গণিত। এইজন্য আর্য্য ঋষিগণ বলেন ঃ—

ধন্যস্তু কস্যবিল্লোকে হৃদয়ং তদলঙ্কৃতম্।
বিরাজতে সদা যত্র মহারত্নং কৃতজ্ঞতা ॥

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তিনিই ধন্য, তাঁহার হৃদয়ই অলঙ্কৃত যাঁহার হৃদয়ে মহারত্ন কৃতজ্ঞতা সতত বিরাজিত।

ব্রাহ্মণের আর একটী গুণ থাকা বিশেষ প্রয়োজন, উহা ক্ষমা। সংসারের সকলেই ক্ষমার প্রত্যাশী। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক পরস্পর সকলেই সকলের নিকট কোন না কোন সময়ে অপরাধী হইয়াই থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তাহা হইলে সংসার কি অশান্তির আলয় হইয়া উঠে! বস্তুতঃ সংসারে ক্ষমা পাওয়া যায় বলিয়াই সংসারে শান্তি আছে।

অন্যকে ভাল বাসিতে পারিলে ক্ষমা করা

অতি সহজ। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ লোকদিগকে ভাল বাসিতেন। যাঁহারা মহৎ লোক তাঁহারা পরকেও আপনার মত ভাল বাসেন, সুতরাং শত্রুকেও ক্ষমা করেন—অপকারীর উপকার করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহাই যথার্থ প্রতিশোধ, কেন না এইরূপ প্রতিশোধে শত্রুও মিত্র হয়। শাস্ত্রেও বলে—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানে জয়েৎ সত্যেন চানৃতং॥

অর্থাৎ "ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপরাধীকে জয় করিবেক এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

পুরাকালে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ধনের দিকে এখনকার মত লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র ধর্ম্মের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। এই স্বধর্ম্মের বলেই তাঁহারা মহাসুখে কাল যাপন করিতেন। সংসারে ধন একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা ধনে আমাদের অনেক অভাব মোচন হয়, ধন ব্যবহার করিতে জানিলে ইহা দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়, সুতরাং সকলেরই ন্যায় পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া উচিত। তৎকালে ব্রাহ্মণ ধনবান হইলে সেই ধনের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন এবং তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দেশের কার্য্য সাধিত হইত।

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়াদীনেষু সর্ব্বদা
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া, কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত লোক ত্রয় জয় করিতে তিনিই সমর্থ।

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ অন্যের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিয়া নিঃস্বার্থতার কাছে স্বার্থ অঞ্জলি দিতেন, পরোপকারে রত হইতেন, জ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, ক্ষমা করুণা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি মনুষ্যের অন্তর নিহিত সদ্‌গুণ সকলের বিনাশ দ্বারা ও ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তি সকলের ন্যায় দমন করিতেন। এই সকল গুণের জন্যই ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ।

আর্য্য ঋষিগণ বলেন ;—

"যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি ত্বয়া। নো ইতরাণি নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি।"

"কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, আর অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।" এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ তৎকালে ঈশ্বরানুরাগী হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা অর্থাৎ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতেন। ইহাতেই তাঁহারা যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করিতে পাইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ
(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

ওলাউঠায়—স্কোটমের গ্যাংগ্রিন।

—ঃ০ঃ—

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সাল, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর ; হিরালাল মৈত্র নিবাস কুমারখালী বর্ত্তমানে কুমারটুলি গলিতে বাস ; আজ ৩

দিবসাবধি ওলাউঠায় আক্রান্ত। ভেদ কয়েকবার করিয়া শুষ্ক ও হরিদ্রাভ ক্লেদাবৃত। প্রাতঃকাল হইতে অণ্ডকোষদ্বয় কাল হইয়াগিয়াছে, গ্যাংগ্রিন হেতু যে উহা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়; আরও দেখা যায় যে অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত ও কঠিণাকার ধারণ করিয়াছে; প্রস্রাব বন্ধ; উদর ফাঁপা রহিয়াছে। নাসাগ্রে ও হস্তপদ শীতল নাড়ী ইনটারমিটেন্ট ল্যাকেসিস্ ৩০শ শক্তি একমাত্রা দেওয়া গেল।

রাত্রি ১টা। আর ও দুইবার ভেদ হইয়াছে; মল সেই একই প্রকার আছে। প্রস্রাব হয় নাই কিন্তু উহার বেগ আছে এবং রোগী বলিতেছে যে প্রস্রাব হইলে সুস্থ বোধ করিতে পারি; মলত্যাগেরসহ কোঁতপাড়াও বর্ত্তমান আছে; তৃষ্ণা কমে নাই। মার্কুর্কর ৩০শ শক্তি। একমাত্রা দিয়া আসিলাম।

২—২—০৭। ভেদ কমিয়াছে প্রস্রাব হয় নাই, তৃষ্ণা একই প্রকারের; অণ্ডকোষের কাল রং একটু ফেকাশে হইয়াছে কিন্তু বাম কোষটি উপরে পিউবিকের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে, অন্য কোষটি ফুলিয়া শক্ত হইয়া একটি বড় ডিমের মত হইয়াছে। এই জন্যই রোগী অতিশয় যাতনাবোধ করিতেছে; ঐ স্থানে হাত দিয়া টিপিলে বেদনা অধিক বোধ হয় সর্ব্বদা টনটন করিতেছে।

রডোডেণ্ড্রন ৩০শ শক্তি দিয়া আসিলাম।

বেলা ৬টা। ভেদ ২ বার হইয়াছে মাত্র; ২।৪ ফোঁটা প্রস্রাব ও হইয়াছে; সকল শরীরে বেদনা ও সন্ধিস্থান এবং মাংসপেশী সমুদয় কামড়াইতেছে; অণ্ডকোষের বেদনা একটু কম পড়িয়াছে কিন্তু তথাকার দপদপানি যায় নাই; বসটক্স ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়া গেল।

৩রা ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে প্রস্রাব হইয়াছে তৃষ্ণা সামান্য কমিয়াছে; শরীর বড়ই দুর্ব্বল গত কল্য হইতেই নাড়ীতে আর ইণ্টারমিটেণ্ট ভাব দেখা যায় নাই; মল সামান্য পরিমাণে একবার মাত্র হইয়াছে। অণ্ডকোষের কালবর্ণ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে; শরীরের কামড়ানি আর নাই। (ঔষধ ঐ)

বেলা ৬টা। শরীরের অন্যান্য লক্ষণ সমুদয় বেশ ভাল; প্রস্রাব বেশ হইতেছে কিন্তু বাম কোষটি এখনও উর্দ্ধে উত্থিত রহিয়াছে এবং সেজন্য তীব্র যাতনা অনুভব করিতেছে। শরীরে কিজন্য অধিক যন্ত্রণা তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলে যে বোধ হয় কোষটি নামিয়া যাইলে শরীর সুস্থ হইতে পারে; অণ্ডকোষ এখনও স্ফীত ও কঠিন রহিয়াছে তবে আকারে একটু কমিয়াছে মাত্র। ক্লিমেটিস্ ৩০শ শক্তি। একমাত্রা দিয়া আসিলাম।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি। অণ্ডকোষের ফুলা কম পড়িয়াছে লক্ষিত হইতেছে এবং নিম্নাংশ হইতে চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছে; বাম কোষটি এখনও নামে নাই; আজ পুরুষাঙ্গের উপরেও লালভাব দেখা যায়; এই যাতনা ব্যতীত সাধারণতঃ রোগী অনেক ভাল; পূর্ব্বে নিদ্রা হইত না আজকাল ঠিক নিদ্রা যাইয়া থাকে; নড়াচড়া করিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করে; জিহ্বার ক্লেদ কম পড়িয়াছে। ক্লিমিটিস্ ৩৯ শক্তি।

বেলা ৬৷টা। একই প্রকার আছে—; বেশী কথা কহিতে চাহেনা; পূর্ব্বে গাত্রে কাপড়াদি

মোটেই বাখিত না। এখন তাহা রাখে এবং তাহাতে কষ্টবোধ করে না।

(ঔষধ ঐ)

৫ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকাল নিশ্বাস সজোরে পড়িতেছে, অণ্ডকোষের কালরং একটুবৃদ্ধি বোধ হইল, যাতনাও অধিকার দাস্ত ২৪ ঘণ্টার ও উপর বন্ধ আছে; রাত্র হইতে আর প্রস্রাব হয় নাই; উদর স্ফীত; কথা জড়তাপূর্ণ, সামান্য ভুলবকাও আছে তৃষ্ণা অতিশয়। ল্যাকেসিস্ ৩০শ শক্তি।

পুনরায় একমাত্রা দেওয়া গেল।

বেলা ৫টা এই সময় ডাক্তার কালী যাইয়া দেখেন ডিলিরিয়ম্ মৃদু প্রকারে চলিতেছে। প্রশ্বাস ঘন ঘন নড়িতেছে, তৃষ্ণা অতিশয় জিহ্বার মধ্যস্থল অতিশয় লাল ও শুষ্ক; অস্থিরতা প্রস্রাব একবার হইয়াছে। গাত্রাবরণ ফেলিতে চাহেনা। আর্সেনিক ২০০ শত শক্তি

রাত্রে ১০টা ডিলিরিয়ম অনেকটা কম, অস্থিরতা কম পড়িয়াছে; রোগীর এখন কতক সুস্থ হইয়াছে।

(ঔষধ বন্ধ।)

৬ই ফেব্রুরারী প্রাতঃকাল অবস্থা অনেক ভাল; বাম অণ্ডকোষটী একটু তাপ দেওয়াতে পিউবিকের নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। এই জন্য ও রোগী অনেক সুস্থতা বোধ করিতেছে; পিপাসা কম, প্রস্রাব রীতিমত হইতেছে; অণ্ডকোষের চর্ম্ম ক্রমশ কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। কথার জড়তা এখনও আছে। ভুলবকা প্রায় গিয়াছে।

(ঔষধ বন্ধ।)

সন্ধ্যা ৬৷৷০টা সকল অংশই রোগী সুস্থ; দুর্ব্বলতা অতিশয় রহিয়াছে; অলসভাব ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতেছে। ভুলবকা আর নাই বলিলেই চলে। এখন কয়েকমাত্রা দেওয়া গেল।

(চায়না ৩ শক্তি।)

৭ই ফেব্রুয়ারি। বিশেষ কোন যাতনা নাই; দক্ষিণ চক্ষু লাল হইয়াছে। উহা হইতে জল ও পিচুঁটি পড়িতেছে—চক্ষুতে কর করানিও সামান্যও আছে এখন মার্ক—সল ৩০শ শক্তির এক মাত্রা দিয়া ঢালা ৩য় শক্তির কয়েক মাত্রা সেবন করাইতে বলিয়াই আসিলাম।

রাত্রি ৮টা। চক্ষের লাল কমিয়াছে। কথার জড়তা আর নাই। ক্রমেই দুর্ব্বলতা কমিয়া আসিতেছে। আজ তিন দিবস হইতে দুগ্ধ পথ্যচলিতেছে; আজ প্রাতে মাগুর মৎস্যের ঝোল দেওয়া গিয়াছিল। ক্ষুধা বেশ বোধ করিতেছে। গত পরশ্ব হইতে এসেন্স অব মস্থরী পথ্যের পর এক ড্রাম করিয়া দেওয়া হইতেছে।

চায়না ৩য় শক্তি

৮ই ফেব্রুয়ারী। অণ্ডকোষ কুঞ্চিত হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতেছে। উহার গাত্র হইতে কাল বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্ম সকল শুকাইয়া ছাল উঠিয়া যাওয়ারার মত হইয়াছে। উঠিয়া যাইতেছে। এখনও চায়না ৩য় শক্তি চলিতে লাগিল আজ পথ্য দুধ সুজি দেওয়া গেল।

৯ই ফেব্রুয়ারী। ক্ষুধা অতিশয় বোধ করাতে; সুজির রুটি ব্যবস্থা থাকিল। জিবের ক্লেদ প্রায় কমিয়াছে। রোগী ক্রমেই সবলতা বোধ করিতেছে। (ঔষধ ঐ)

মন্তব্য।

৯ই সহরের দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর উক্ত অবস্থা দেখিয়া অতিশয় শঙ্কান্বিত হইয়া একজন বলিয়াছিলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা না করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মরে যাইবে এবং অন্য একজন বলিয়াছিলেন যে জোলাপ দিয়া দাস্ত না করাইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী আশ্চর্য্যের বিষয় এখন উভয়ের কেহ লক্ষ্য করিলেন না। যে কথিত রোগীটা সদ্য ওলাউঠার কবল হইতে উঠিয়াছে, এবং তাহার উপর ঐ সব ব্যবস্থা করা। যুক্তি সঙ্গত কিনা।

যাহা হউক হানিমানের কৃপায় রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। পরে শুনা গিয়াছে যে উক্ত আলোপাথ ডাক্তারদ্বয় ও রোগীর আরোগ্য সংবাদ শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন ও মহাত্মা হানিমানের জয়গান করেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে কোন চিকিৎসকই এরূপ রোগী দেখেন নাই। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে প্রথমে আমরাই এরোগী পাইয়াছিলাম হানিমাণের কৃপায় আমাদের হস্তেই উহা সম্পুর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়া যায়।

ডাক্তার মৈত্রে।
১৮।১ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন।

বৃষ্টিতত্ত্ব।

(উপসংহার)

বিগত জুলাই মাসের প্রারম্ভ হইতে অল্প-বিস্তর বৃষ্টি হইতেছিল। ৬ই তারিখের বৃষ্টি, বৃষ্টিমান যন্ত্রে (rain-gange) আদৌ পরিমাণ যোগ্য হয় নাই। ৭ই তারিখে বৃষ্টিমান যন্ত্রে ১,৭০ইঞ্চি বৃষ্টি পরিমিত হইয়াছিল, এবং ৯ই ও ১০ই তারিখেও সামান্য সামান্য (০·১৬ ও ০·১১ইঞ্চি) বৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত দিবস চতুষ্টয়ের গ্রহস্ফুট পঞ্জিকাদৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, যে, ৬ই তারিখে রবিস্ফুট ২।২০।৪৬ অর্থাৎ রবি মিথুন রাশির ২০ অংশে অবস্থিত এবং মঙ্গলস্ফুট ৮।১৮।৩৩ অর্থাৎ মঙ্গল ধনুরাশির ১৮ অংশে অবস্থিত; ইহার দুইদিবস পূর্ব্বে রবি ১৮ অংশে ছিল; সুতরাং সেই দিবস রবি মঙ্গল হইতে ১৮০ অংশে ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্যই পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে ৬ই তারিখে বৃষ্টিপাত আদৌ পরিমাণ যোগ্য হয় নাই। ৭ই তারিখে শুক্রস্ফুট ২।৪।২৮ অর্থাৎ শুক্র মিথুনরাশির ৪ অংশে ছিল এবং শনিস্ফুট ২১।৩।৫৭ অর্থাৎ শনি মীনরাশির ৪ অংশে যাইতেছিল; সুতরাং শনি হইতে শুক্রের৯০ অংশ ব্যবধান সম্পুর্ণ হইতেছিল। শুক্র ও শনি উভয়েই বৃষ্টিকারক গ্রহ, তজ্জন্য ৭ই তারিখ হইতে ১০ই পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত স্পষ্ট সুচিত হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কেন গ্রহসমূহের উক্তরূপ ব্যবধান বৃষ্টিপাতের হ্রাস ও বৃদ্ধিসূচিত করে, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ গ্রহদিগের মধ্যে তাড়িতাকর্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্তরীক্ষে উষ্ণতার এইরূপ আকস্মিক হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

—:০:—

ভগবান্—স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত নামাদি তাহাতেই লয় হয়। চক্ষু সমস্ত রূপ লইয়া তাহাতেই প্রবেশ করে শ্রোত্র সমস্ত শব্দ সহ, মন সমস্ত ধ্যান সহ তাহা-

তেই লয় হয়। আবার যখন জাগ্রত হন তখন সেই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয় দেহে ছড়াইয়া পড়ে প্রাণ হইতে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জাগিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে জগৎ জাগিয়া উঠিল। আত্মাই সর্বভূতের উদয় স্থান। অর্জ্জুন—আত্মা হইতে উদয় এবং আত্মাতেই যদি সমস্ত লয় হয় তবে সমস্ত ভূতাদি আদি অন্তে অব্যক্ত কিরূপ?

ভগবান—বাস্তবিক আত্মা পরিপূর্ণ। অন্য বস্তু কিছুই নাই। কেবল অজ্ঞান আশ্রয়ে ব্রহ্ম জগত ভান হয় মাত্র। বস্তুতঃ জগত নাই।

অর্জ্জুন—এই জটিল আত্মতত্ত্ব আমি কিছুতেই ধারণ করিতে পারিতেছি না। সম্মুখে জগৎ দেখিতেছি সম্মুখে ভীষ্ম দ্রোণাদি দেখিতেছি আপনি বুঝাইয়া দিতেছেন যাহা আদিতে নাই অন্তে থাকিবে না মধ্যে যাহা আছে বলিয়া বোধ করিতেছ তাহা নাই। বুঝিতেছি কিন্তু দৃশ্য ভ্রম যাইতেছে না। মনে মনে জানিতে পারিতেছি, ধারণাতে পারিতেছি না—কি অদ্ভুত প্রহেলিকা।

ভগবান—আত্মা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। আত্মতত্ত্ব অতি অদ্ভুত। জ্ঞানী ব্যক্তি ও বহুজন্মান্তে আত্মতত্ত্ব ধারণা করিতে সক্ষম হয়েন না। তোমার শোক না যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি শুকদেব ব্যাসদেবকে মোহ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কেন বলিয়াছিলেন—

"বিষ্ণ্বংশ সম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্ন পোতো বণিক যথা
অহো মায়াবলঞ্চোগ্রং যথোঽয়ংতি পণ্ডিতং
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্বজ্ঞং বেদ সম্মিতং
পুরাণাঞ্চ বক্তাচ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপানীতঃ।
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাঽতীত দুষ্করা
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতী সুতং॥

দেবীভাঃ ১।১৫।২৪-২৭

কেন বলিয়াছিলেন তাং যামি যাবণং দেবীং যাঁর জগৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হরাদিঞ্চ কথাঽন্যেষাঞ্চ কাদৃশ"। আপনি সর্ব্বজ্ঞ আমি অল্পজ্ঞ। যাহাতে আত্মতত্ত্বের সর্ব্বময়ত্ব ধারণা করিতে পারি তাহাই করুণ।

ভগবান—অত্মাদর্শনের অধিকারী দুর্লভ। কিন্তু আত্মদর্শন নিতান্ত বিস্ময়কর।

অর্জ্জুন—দর্শন অধিকারী দুর্লভ কিরূপ?

ভগবান—নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার যাহার নাই তাহার জ্ঞানে অধিকার নাই। গুরু মুখে প্রথমে বেদাদি শাস্ত্রের স্থূল ২ বিষয় অবগত হওয়া চাহি। পরে নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিত্য গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রকাশিত ধ্যেয় বিষয়ের উপাসনা চাই। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া ঈশ্বরের চিত্তের অনুরাগ জন্মিবে। তখন বৈরাগ্য আরম্ভ হইল। ক্রমে মন ও বাহেন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহ জন্য সমদমাদি অভ্যাস চাই। এইরূপে যোগাবস্থা জন্মিবে। তখন গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন পরিপক্ক হইলে গুরু মুখে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শুনিয়া অভ্যাস করিতে করিতে আত্মদর্শন লাভ হয়।

অর্জ্জুন—কিন্তু আত্মদর্শন বিস্ময়জনক কিরূপে? ভগবানঃ—আত্মাকে দেখিতে দেয়না অবিদ্যা। যেমন অজ্ঞান রজ্জুকে প্রথমে আবরণ করে, আবরণ করিলে অন্যরূপ দেখায় সেইরূপ অবিদ্যা আত্মাকে আবরণ করে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় আত্মাতে জগতরূপ সর্পদেখায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখ অবিদ্যা নাশনা হইলে আত্মদর্শন হয় না। আবার অবিদ্যা নাশেও আত্মদর্শন হয় না।

কারণ অবিদ্যা নাশে দ্বৈতভাব থাকে না। সে কাহাকে দেখিবে ? অদ্বৈত ভাবে দর্শন কোথায় ? আত্মামাত্র দ্রষ্টাদৃশ্য সমস্তই জড়। আত্মা আপনাকে দেখিতেছেন ইহাও আত্মদর্শন নহে। ইহার অর্থই জড়ের সৃষ্টি। আপনার যে অংশ দেখিতেছেন তাহাই আত্মার স্বরূপ না থাকিয়া জড় হইয়া প্রকৃতিরূপে জগৎ সাজিতেছে। এমন কি "অহংভাব" জাগ্রত হইলেই দ্বিতীয় কিছু অনুভব হইয়াছে জানিতে হইবে। আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই। দ্বিতীয় যাহা ভাণ তাহাই মায়া। যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া দর্শন। দেখিতেছ দেহ আছে কিন্তু বাস্তবিক নাই। ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল কি আছে ?

অর্জ্জুন—কি আশ্চর্য্যজনক এই আত্মা !

ভগবান—আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলা যায় বা শোনা যায় তাহাও বিস্ময় জনক।

অর্জ্জুন :—নিশ্চয়ই। আত্মা আছে বলিলেও দোষ কেননা কে বলে ! যিনি আত্মজ্ঞ তিনি বলিতে পারেন না। যিনি আত্মজ্ঞ নহেন তিনি অজ্ঞান তিনি ও বলিতে পারেন না। আবার না বলিলেও দোষ আছেই।

ভগবান—যাহা দেখিতেছ (জগৎ) তাহা নাই যাহা দেখ নাই (আত্মা) তাহাই আছে। যখন বাহ্য দেখিতেছ তখন অন্ধকারে যখন দেখিতেছ না তখন আলোকে। যখন জাগিয়া থাক (বিষয়ে) তখন রাত্রি আবার যখন নিদ্রা যাও (বিষয়ে) তখন দিন। কতদিন কত রাত ক্লেশ করিয়া যাহা পাইলে তাহা পাইয়া কিছুই পাওয়া হইল না অজ্ঞানই দূর হইল কি ? সূচি ছিদ্রে হস্তিপ্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে (অতিসূক্ষ্ম আত্মায় জগৎ সৃষ্ট হইতেছে ও নাশ হইতেছে) শ্রুতি বলেন "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"—কঠউঃ ১২ সূঃ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।" মণ্ডুক উঃ। আত্মা সম্বন্ধে শত শত বিরুদ্ধ বাক্য কথিত হয়। তিনি সৎ হইয়াও অসৎ জগতে অবস্থিত, দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিত, অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চ রূপে নশ্বর তিনি নিজে অচল অথচ জগৎ চালাইতে ছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছু করেন নাই। ইত্যাবদি যাহাই আত্মা সম্বন্ধে বলা যায় তাহাই বিস্ময় জনক।

অর্জ্জুন—আত্মা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিরুদ্ধ বাক্য হয় কেন !

ভগবান—শ্রুতি বলেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" আত্মতত্ত্ব বাক্যে বলা যায় না তাহার ভাষা নাই মনে ও ধারণা করা যায় না অতএব সর্ব্ব শব্দের অবাচ্য আত্মার সম্বন্ধে যে বচন তাহাও আশ্চর্য্য হইবে।

অর্জ্জুন—আত্মা সম্বন্ধে শুনিয়াও আত্মা হইতে পারে না কেন ?

ভগবান—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য বিচার জনিত জ্ঞান দ্বারাই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। ইহাই শাস্ত্র বাক্য। কিন্তু না জানিলে জানা যায় না। গাঢ়নিদ্রা কালে কোন কথার অর্থবোধ হয় না। তথাপি ডাকা ডাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। জাগিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারে কিন্তু অজ্ঞান নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যের অর্থ বোধ করিবে কিরূপে ! অর্থ বোধ না হইলে জাগিবে না। আবার না জাগিলেও অর্থবোধ হইবে না। তবেই দেখ শুনিয়াও জাগে না কেন। শ্রুতি এইজন্য বলেনঃ—'শ্রবণয়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানু-

শিষ্টঃ। যাহার শ্রোতা অল্প, শুনিয়াও অধিকাংশ লোক জানিতে পারে না যাহার বক্তা আশ্চর্য্য অনেক শ্রোতার মধ্যে নিপুণব্যক্তিই নিপুণ আচার্য্যের নিকট জানিয়া ইহা জ্ঞাত হন।

অর্জ্জুন—আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি নাই, অথচ আত্মজ্ঞান এরূপ দুর্ল্ভ। তবে গতি কি?

ভগবান—বিশ্বাসই গতি। বিশ্বাস রাখিয়া যাহা করিতেছ তাহাই আমার পূজা করিতে২ এই বোধে কর্ম্ম করিয়া চল আমি তোমাকে এই মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। আমি তোমার সহায় এই বোধ রাখিয়া সকল প্রকার ভয়কে মন হইতে উৎপাটিত কর। 'তুমি আমার' তোমর ভয় কি? তুমি সর্ব্বদা বলিও 'আমি তোমার' আর যাহা কিছু সমস্তই আমি করিয়া দিব। ভয়দূর কর, আশা রাখ, বিশ্বাস কর তুমি যাহা চাও পাইবে।

অর্জ্জুন—কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য করাইতে হইলে এই প্রকৃষ্ট উপায় বটে।

ভগবান—দেখ না কর্ত্তব্য করিতে গেলেই তোমার মত সকলে অনিচ্ছা আলস্য প্রকাশ করে। ইহার মূল ভয় ও শোক। তুমি যেমন মনে করিতেছ ইহারা সব মরিয়া যাইবে। এই ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইতেছ। সাধারণ লোকেও বলে এ অবস্থায় কার্য্য করিতে গেলে শরীর খারাপ হইবে মরিয়া যাইব এই ভয়ে কর্ত্তব্য অবহেলা করে। কিন্তু যাহারা সদাসর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে দেহ বিনাশশীল—দেহ থাকিবেই না বিশেষ দেহই আমি নই দেহ গেলেও আমার কোন অনিষ্ট হয় না। আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র তবে দেহের ভৃত্য হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া কেন আলস্যে চুপ করিয়া থাকি? দেহ যায় যাক্ আপন করিয়া যাই মঙ্গল হইবে। প্রকৃত কথা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি মানুষ মরে। দেহ অগ্রাহ্য করিয়া আপন কর্ম্ম করিলে দেহাত্ম ভাবনা বা বাসনা মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। তুমি সর্ব্বপ্রকার অনার্য্যের মত ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর। আরও দেখ 'দেহই আত্মা' এই ভ্রমেই লোকের সকল প্রকার ভয় হয়। দেহ অসুস্থ হইয়া যাইবে, মরিয়া যাইব, মরিয়া যাইবে লোকের ইহাই ভয়। কিন্তু যিনি জানেন দেহ আত্মা নহে, দেহ জড়, দেহ যাক আর থাক্ উঁহার কোন ভয় নাই তোমার এই মোহ নিবারণ করিলাম। এখন তোমার স্বধর্ম্ম কি আলোচনা কর দেখিবে যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম কি?

ভগবান—শৌর্য্যং তেজো বৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপল্যায়নাম্। দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অর্জ্জুন—যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ নাই উহা কি নিষ্ঠুর বিধি নয়?

ভগবান - অজ্ঞানীর পক্ষে জীবিত থাকাও নিষ্ঠুরতা জলের সহিত কত প্রাণী সংহার হয়, গমনে কত জীব বিনাশ হয়, একবিন্দু জলে অনন্ত কোটী জীব রহিয়াছে একটী বৃক্ষপত্রে কত প্রাণী রহিয়াছে তোমার দেহও কত জীবের আশ্রয় তাহা তুমি ধারণা করিতে পার না। কিন্তু জীবের দেহগুলি জীব নহে এ ধারণা হইলে কে কাহাকে বধ করিবে?

যজ্ঞের জন্যই ছাগাদি পশু সৃষ্টি হইয়াছে। "যজ্ঞেষু পশবো ব্রাহ্মণ হন্যন্ত সততং দ্বিজৈঃ সংস্কৃতা কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গ মবাপ্নুবন" মন্ত্রপূত পশু

যজ্ঞে বিনষ্ট হইলে কল্যাণ দেহ লাভ করে এবং যুদ্ধে হত বীরগণ কল্যাণতর দেহ প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটিলে ভাগ্যবান বলা যায় কেন?

ভগবান—দেখ জয় পরাজয় উভয়েই লাভ। জয় লাভে বিপুল যশ ও রাজ্য প্রাপ্তি এবং পরাজয়ে ও অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপানুষ্ঠান, ও যুদ্ধে স্পৃহা এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতুবটে কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে উহাতে কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম নাই।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় কি?

ভগবান:—

ন কুটৈরায়ু ধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে নিপুন্
ন কর্ণিভির্ণাপি দিগ্ধৈর্ণাগ্নিজ্বলিত তেজনৈঃ
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্
ন মুক্তকেশং না সীনং ন তবাস্মীতি বাদিনাম্
ন সুপ্তং ন বিষন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ধম্
না যুদ্ধমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্
না যুধ ব্যসন প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরিক্ষতম্
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন॥ মনু

শুধু যে তোমার কীর্ত্তিনষ্ট এবং স্বধর্ম্মত্যাগ জনিত পাপ হইবে তাহা নহে কিন্তু তুমি যুদ্ধারম্ভে পলায়ন করিয়াছিলে বলিয়া চিরদিন লোকে অপযশ করিবে।

অর্জ্জুন—করুণাহেতু আমি যুদ্ধত্যাগ করিতেছি।

ভগবান—ইহা কেহই মনে করিবেন না। বলিবে কাপুরুষ ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। আর পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলে "ন চৈতদ্বিদ্ম" (২।৬) তাহার উত্তর এই যে উভয় পক্ষেই তোমার লাভ। যুদ্ধই তোমার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মই জীবের কর্ত্তব্য। সমস্ত ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি মর বা অন্যেই মরুক, তোমার লাভ হউক বা অলাভ হউক, সুখ দুঃখ জয় পরাজয় কিছুই গন্য না করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও পাপ হইবে না।

অর্জ্জুন—কিরূপে? বুঝিতে পারিলাম না।

ভগবান—প্রভু ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভৃত্য স্বচ্ছন্দে খুন পর্য্যন্ত করিল। ভৃত্য জানে ইহাতে আমার কোন অন্যায় হইল না। যদি এস্থানে প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করিয়া নিজের ইচ্ছায় মত কার্য্য করে তবে সে ভৃত্য নহে। যিনি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তিনিই প্রভু। যিনি চালাইতেছেন, তুমি চলিতেছ, তিনি যন্ত্রী তুমি যন্ত্র। এখানে তোমার স্বাধীনতা নাই। এজন্য পাপ পুণ্যও নাই। তুমি আমার উপদেশ মত সমস্ত কুরুকুল ধ্বংশ কর তথাপি তোমার পাপ নাই কারণ তোমার কোন কামনা নাই। তুমি মাত্র আমাকেই চাও। আমি নিজে সমস্ত করিতে পারি নিজে না করিয়া তোমাকে সম্মানিত করিব বলিয়া তোমার দেহ দিয়া আমিই সমস্ত লাভ করিলাম। তুমি জড় মাত্র আমি তোমার দেহে চৈতন্য, আমি তোমায় চালাইতেছি, ঘুরাইতেছি, যুদ্ধ করাইতেছি ইহাতে জড়স্বরূপ তোমার পাপ কি? হাত দিয়া পাপ করিলাম ইহাতে কি হাতের পাপ হয়? যে ভক্ত সে প্রিয় বস্তুর নিকট জড়। তুমি আমার ভক্ত হও। সর্ব্বস্ব আমাতে অর্পণ কর। আমি যাহা বলি তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। এখানেভাল মন্দ লাভালাভ কিছুই বিচার নাই। স্বধর্ম্ম মত ধর্ম্মই তাঁহার আদেশ মত কার্য্য। কোন, দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম করিয়া যাও নিষ্কাম হইল। নিষ্কাম কর্ম্মে পাপ নাই, কারণ কোন কামনা নহে।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

কর-বিজ্ঞান।

—০:*:০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থি সমূহ।

গ্রন্থি অর্থাৎ অঙ্গুলীর গাঁইট উপরদিক হইতে এক দুই, তিন এইরূপ নাম করণ হইয়া থাকে। প্রথম গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে প্রত্যেক বিষয়ের আদ্যোপান্ত দর্শনেচ্ছা, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও শিল্পাদি বিষয় অনুশীলন আনুরক্তির প্রকাশক। যাহার অঙ্গুলীতে এরূপ পরিপুষ্ট প্রথম গ্রন্থি দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির প্রমাণ ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস হয় না এমন কি প্রমাণ পাইলেও অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে চায় না। তাহারা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট সন্দিগ্ধ, কিছুই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; কেবল তাহাদের অভীপ্সিত আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায় কিন্তু সর্ব্বদাই প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থি ভাবরাজ্যের শৃঙ্খলা বিধায়ক। ইহা পরিপুষ্ট হওয়া শুভকর। হস্ততালু কোমলতার সহিত ইহা পুষ্ট হইলে, অপরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুনিয়মিত দেখিতে ইচ্ছা করে। কঠিন করতলের সহিত গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, স্বয়ং সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী থাকে।

উভয়গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, তর্ক বিষয়ে নিয়মের বাধ্যতা, প্রত্যেক বিষয়ই যতদূর সম্ভব নিয়মিত অনুষ্ঠান করা, অনুসন্ধানপর ও বিশ্লেষক।

তৃতীয় গ্রন্থি গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা বিধায়ক। যাহাদের ইহা পুষ্ট, তাহারা ও চিরায়গ্রস্ত এবং কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, গৃহস্থালির কোন না কোন কার্য্য তাহাদের করা চাই।

সাধারণতঃ গ্রন্থি সকলের পুষ্টতা আগ্রহ না উদ্দিপ্ততার হ্রাস করে। যাহাদের তর্জ্জনীর গ্রন্থি পুষ্ট, তাহারা কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয়বাদী। সব অঙ্গুলীতেই যদি কেবল প্রথম গ্রন্থিই পুষ্ট হয়, তবে সমালোচনা তৎপর হইলেও দোষ সংশোধনে অমনোযোগী। কেবল দ্বিতীয় গ্রন্থি সমূহ যদি পুষ্ট হয়, তাহারা শৃঙ্খলা সম্পন্ন দেখিতে ভালবাসে, পরন্তু সমালোচনা তৎপর হয় না।

সপ্তম অধ্যায়।

নখর।

নখর সকলের দ্বারা প্রকৃতি এবং ক্রোধবিপ্লব পরিমাণ ও ভাব অবগত হওয়া যায়। ক্রোধের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইতে হইলে "মঙ্গলস্থানের" সুসংগতি (যদ্দারা দমন শক্তি ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়) শিরোরেখার গভীরতা (বুদ্ধি শক্তির তীক্ষ্ণতা) এবং অঙ্গুষ্ঠের ক্ষমতা (বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তির তেজস্বীতা) হইতে অবগত হওয়া যায়; কারণ, ইহাদের উপর ক্রোধের দমন নির্ভর করে।

মানবের প্রকৃতি নখরের বর্ণদ্বারা জানা যায়—

'! নখর! রক্তবর্ণ—কোপন স্বভাব; গোলাপী ক্ষিপ্রক্রোধী; শ্বেতবর্ণ—শান্ত প্রকৃতি;

বহুবর্ণবিশিষ্ট (যেমন কতকটা লাল, কতকটা সাদা, ইত্যাদি) নখর, ক্রোধের অন্তঃ সলিল প্রবাহ বুঝায়; এবং উহার প্রকাশ স্বাস্থ্যহীনতা এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের উপর নির্ভর করে।

ক্ষুদ্র অপেক্ষা বড় নখরযুক্ত ব্যক্তির ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী। ক্ষুদ্র নখর পরিহাস ও সমালোচনা প্রিয়। ডিম্বাকৃতি নখর ঈষৎ রক্তাভ হইলে উদাসীন।

নখরের গঠন চ্যাপ্টা হইলে, পক্ষাঘাত ব্যাধির সূচনা করে। উচ্চভাবে গোলাকার হইলে,

স্নায়বোগ, এবং আকুঞ্চিত অর্থাৎ এড়োভাবে বেখা থাকিলে, পীড়াব লক্ষণ। নখবেব উপব শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, অজীর্ণতা জ্ঞাপন কবে।

নখবেব মূলদেশ চতুষ্কোণ হইলে, প্রতিহিংসা পবায়ণ; ঈষৎ গোলাকাব হইলে, সুন্দব স্বভাব, অল্পপবিসব—সোঁজাকৃতি—হইলে, সহজেই দোষগ্রহণ এবং অসন্তোষ প্রকাশ কবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গ্রহস্থান।

কবতলেব চতুর্দ্দিকস্থ উন্নত মাংসপেশীসমূহকে গ্রহস্থান কহে। ববাদি সপ্তগ্রহের নামানুসাবে কবতলে সাতটী গ্রহস্থান আছে। প্রথম চাবিটী অঙ্গুলীমূলস্থ করতলেব উপবিভাগে অবস্থিত তাহাদেব নাম যথাক্রমে তর্জ্জনীব মূল হইতে, বৃহস্পতি, শনি, ববি ও বুধ। অপব তিনটীব মধ্যে মঙ্গল দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগ কবতে শিবোবেখা ও হৃদয় বেখাব মধ্যস্থ; অপবভাগ বৃহস্পতিস্থান ও অঙ্গুষ্ঠমূলে মধ্যস্থিত মঙ্গলেব এই দুই ভাগের মধ্যস্থিত স্থানকে মঙ্গলেব ক্ষেত্র কহে। শুক্রস্থান অঙ্গুষ্ঠেব নিম্নস্থ আয়ুবেখা বেষ্টিত অংশ; এবং চন্দ্রস্থান কবতস্থ মঙ্গলেব নিম্নে অবস্থিত।

সুগঠিত, সুসংস্থিত, দৃঢস্পর্শ হইলে 'গ্রহস্থান' শুভফল প্রদায়ক বুঝিতে হইবে। তাহাতে ঐ সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট গুণাবলীব উৎকৃষ্ট সাধিত হইয়াছে বুঝায়। অতিপুষ্ট, অন্যগ্রহস্থানে প্রবিষ্ট, কোমল অথবা একবাবে অস্তিত্বভাব অর্থাৎ উক্ত স্থান নিম্ন হইলে, কুফল প্রদায়ক। তদ্বাবা উক্ত স্থানেব সূচিত গুণ, হয় অতিবিক্ত, অব্যবহৃত নতুবা তাবৎগুণের একবাবেই অসদ্ভাব বুঝিতে হইবে।

যদি কবতলেব নিম্নস্থ গ্রহস্থান সকল হইতে উপবস্থ গ্রহস্থান সকল উন্নত হয়, তবে পাশবিক প্রকৃতিব পবিবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। তদ্বিপবীত হইলে ইন্দ্রিয়েব দাসত্ব অর্থাৎ পাশবিক প্রবৃত্তিব প্রাধান্য বুঝায়।

সমূহ গ্রহস্থান সমতল হইলে কার্য্যে আগ্রহপূর্ণতাব পবিচয় দেয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচাব কবিতে হইলে হস্ত পার্শ্ব ধীবভাবে টিপিয়া দেখা আবশ্যক।

নিম্নে গ্রহস্থান সমূহেব ভালমন্দ অনুসাবে গুণাবলীব বিববণ দেওয়া যাইতেছে:—

সুফল প্রদায়ক।

(সুসংস্থিত)

বৃহস্পতি—অহঙ্কাব।
শনি—নির্জ্জন প্রিয়তা।
ববি—করুণা।
বুধ—প্রফুল্লতা।
বুধনিম্নস্থ মঙ্গল—সহিষ্ণুতা।
চন্দ্র—কল্পনাপ্রিয়তা (মৌলিকতা)
শুক্র—প্রীতি।

কুফল প্রদায়ক।

(অতিবিক্তে)

বৃহঃ—আত্মশ্লাঘা।
শনি—বিষাদখিন্নতা।
রবি—বিচাবশূন্য করুণা।
বুধ—অপবেব মর্ম্মবেদনাব উদাসীন।
বুধ নিম্নস্থ মঙ্গল—বিবাদ প্রিয়তা।
বৃহঃ নিম্নস্থ মঙ্গল—নির্ব্বুদ্ধিতা।
চন্দ্র—চঞ্চল মতিত্ব (খামখেয়ালি)।
শুক্র—কামুকতা।

(অভাবে)

বৃহঃ—আত্মমর্য্যাদাহীনতা।

শনি—অব্যবস্থিত চিত্ততা।

রবি—নিষ্ঠুরতা।

বুধ—অরসিকতা।

বুধ নিম্নস্থ মঙ্গল—ভীরুতা।

বৃহঃ নিম্নস্থ মঙ্গল—ধৈর্য্যহীনতা।

চন্দ্র—কল্পনাবিরতি।

শুক্র—ঔদাসিন্য।

বৃহস্পতি স্থানের পরিপুষ্টি অনুসারে সমাজ-প্রীতি নির্ভর করে। রবিস্থানের প্রধান বিশেষত্ব, পশুপ্রীতি। বৃহস্পতি নিম্নস্থ মঙ্গলস্থান গাম্ভীর্য্যের ও প্রকাশক।

গ্রহস্থানের উচ্চতা স্বস্থানে থাকিয়া অন্য কোন স্থানের অভিমুখী হইলে, তদ্দ্বারা নানা প্রকার লক্ষণ বুঝায়;

বৃহস্পতি

তর্জ্জনীর মূলাভিমুখী হইলে বৃথা গর্ব্ব, আত্ম-শ্লাঘা; শনির স্থানাভিমুখী—আত্মশক্তি জ্ঞান; হৃদয় রেখার অভিমুখী—স্নেহগর্ব্ব; শিরোরেখার অভিমুখী—আসবৃদ্ধি অহঙ্কারিতা; আয়ুরেখার অভিমুখী—কুলাভিমানিতা।

শনি

মধ্যমার মূলাভিমুখী—অতিশয় নির্জ্জন প্রিয়তা বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী—বিষাদপূর্ণ আত্মাভি মানিতা; রবির স্থানাভিমুখী—সামান্য বিষণ্ণতা; হৃদয় রেখার অভিমুখী প্রণয়ে সংশয়।

রবি

অনামিকার মূলাভিমুখী—ছলপূর্ব্বক কৃত্রিম-ভাব, শনির স্থানাভিমুখী—সহানুভূতি প্রণোদিত পশুপ্রীতি; ধ্রুবের স্থানাভিমুখী—শিল্প-বিজ্ঞান বেত্তৃত্ব, অক্ষুণ্ণ করুণা।

বুধ

কনিষ্ঠার মূলাভিমুখী হইলে—রসিকতা; রবির স্থানাভিমুখী ধীর ঔদাসীন, করভাভিমুখী—রূঢ় রসিকতা।

বুধনিম্নস্থ মঙ্গল

করভাভিমুখী—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; মঙ্গলের ক্ষেত্রাভিমুখী—সর্ব্বত্র প্রথম উদ্যোগ; চন্দ্রের স্থানাভিমুখী—সম্মোহিনী শক্তি।

বৃহস্পতিনিম্নস্থ মঙ্গল

বৃহস্পতি স্থানাভিমুখী—গৌরবরক্ষার্থ সহিষ্ণুতা; অঙ্গুষ্ঠাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা শাসিত সহিষ্ণুতা।

চন্দ্র

মঙ্গলস্থানাভিমুখী—কার্য্যকরী কল্পনা; মণি-বন্ধাভিমুখী আকাশকুসুম রচনা; শুক্রস্থানাভি-মুখী—উদ্বেগাধিক্য; মঙ্গলের ক্ষেত্রাভিমুখী—উদ্যমাধিক্য।

শুক্র

অঙ্গুষ্ঠের অভিমুখী—উদ্বেগরহিত বাসনা; মণিবন্ধ বা অঙ্গুষ্ঠ কোণাভিমুখী—ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা; চন্দ্রস্থানাভিমুখী কামুকতা।

মঙ্গলের ক্ষেত্র।

শুক্রস্থানের সহিত অঙ্গুষ্ঠের 'কোণ সকল পুষ্ট হইলে, স্বর মাধুর্য্য প্রীতি বুঝায়।

ইহা করতলের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং উদ্যোগীতার পরিচায়ক। যদ্যপি অত্যন্ত উচ্চ ও

কঠিন হয়; তবে বিবাদ প্রিয়তা বুঝায়। যদি গভীর হয়, তবে অবস্থা বা স্বাস্থ্যহেতু অধীনতা জ্ঞাপন করে। এই গভীরতা যদি আয়ুরেখার অভিমুখে হেলিয়া থাকে তবে পারিবারিক ক্লেশ বুঝায়; ভাগ্যরেখার নিকটে হেলিয়া থাকিলে, কার্য্যে নৈরাশ্য; রবিরেখার নিম্নে, শিল্পাদি আলোচনায় ও অর্থলাভে বিফল মনোরথ হয়। হৃদয়রেখার নিম্নে হেলিয়া থাকিলে, পারিবারিক স্নেহে নৈরাশ্য বুঝায়।

উচ্চতা বিচার করিতে হইলে সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। করতলে গ্রহদিগের স্থান।

মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে সামান্য উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ; অপেক্ষাকৃত ও অধিক পরিমাণে উচ্চ হইলে, তাহা অত্যুচ্চ; এবং খাদবৎ (গর্ত্তের মত) প্রতীয়মান হইলে তাহা অনুচ্চ বা নিম্ন বলিয়া অভিহিত হয়। করতলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহস্থান গুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, বা একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান হয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী, F. C. S.

রণচণ্ডী।

কেউটে সাপের মুখে হাত দিতে সাহস হয়—জলে কুমীরের সঙ্গে বাস করতে ভরসা হয়—সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের মুখে যাইতে পারা যায়—তিনিদিন অনাহার থাকাও যায়—কিন্তু যে পাড়ায় "পাড়াকুন্দুলী" আছে সে পাড়ায় থাকিতে সাহস হয় না—তাকে দেখ্‌লে ভয় করে, তার নাম শুন্‌লে গা শিউরে উঠে গায়ে কাটা দেয়।

যে ছোট ছোট ছেলের পক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয়, স্কুলের ও কলেজের ছেলেদের পক্ষে সংস্কৃত জিউমেট্রী, পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে ইউনিভারসিটি; যুবকদিগের পক্ষে শিক্ষিতাপত্নী, বৃদ্ধদিগের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিনী, গুলিখোরের পক্ষে শীতল বারি মক্কেলের পক্ষে উকীল।

আমরা এক পাড়াকুন্দুলীকে জানি, তার ভয়ে পাড়ার অনেক মাতাল, তামাকখোর, গাঁজাখোর গুলিখোর, আফিঙখোর অর্থাৎ আবগারী মহলে যতরকম খোর থাকা সম্ভব তারাও সায়েস্তব হয়ে গেছেন। কাহাকে কাহাকেও সুধা নেশা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই; এ ভবসংসার পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছে।

আমরা আরও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সে পাড়ায় একটী ছেলে তিনবার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হয়, কিন্তু এই পাড়াকুন্দুলীর কুন্দুলের চোটে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ হয়ে গেল। পাড়ার দুজন আদবুড়ী বাজা মাগী ছিল তারাও ভয়ে সন্তান প্রসব করে ফেল্লে। একজন মহামহোপাধ্যায় পেটুক বলেন—যদি বাগবাজারের রসগোল্লা বহুবাজারের ভীমনাগের সন্দেশ, বড়তলার পানতোয়া, জনায়ের মনোহরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, ধনেখালীর খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ইত্যাদি নানা স্থানের নানা খাদ্য পেট ভরিয়া খাইতে দেয়, তাহা হইলেও তার বাড়ী যাইয়া খাইতে সাহস হয় না।

এই পাড়াকুন্দুলী ঠাকুরাণী প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া ছুতায়নতায় কলে কৌশলে ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করেন ও কার্য্য সফল করিয়া একটা হুলস্থূল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। বাড়ী এলেও ঝগড়ার জন্য মন ফস্ ফস্ করে শেষে

হাঁড়ীর সঙ্গে, উনুনের সঙ্গে,—এমন কি পেটের সঙ্গে পর্য্যন্তও ঝগড়া করিয়া উপবাসী থাকেন। আবার বৈকালে বাহির হন ও স্বকার্য্য সাধন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং বাড়ীতে আসিয়া পাড়ার লোকের নাম করিয়া ঘরের দেয়ালে শতাধিক সম্মার্জ্জনী সজোরে সপাসপ্ প্রহার করেন; তাতেও যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ রাগের শান্তি হয় তা এমন বোধ হয় না।

সেই গ্রামে দুই ভাই থাকৃত। তার মধ্যে বড় ভাই খুব বড় মানুষ; তাঁর বড় বাগান, বড় তিনতালা বাড়ী, বড় বড় গাড়ী ঘোড়া; আর চাকর নফরের ত শেষ নাই। আর ছোট ভাই সাত গরিবের এক গরিব; সে গাঁয়ের এক পাশে একটু চালা বেঁধে, সেই খানে তার স্ত্রী, ছেলে-পিলে নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের অবস্থা ভাল হলে হবে কি, সে তার গরিব ছোট ভাইএর হিংসায় জলে পুড়ে মরত; এমন কি ছোট ভাই যদি কোন ভয়ানক বিপদে পড়ত, ত বড় ভাই কখন ভুলে এক গাছা খড় দিয়েও তার সাহায্য করত না। বরং ছোট ভাই কষ্ট পাচ্চে শুনলে তার আনন্দের আর শেষ থাকৃত না।

ছোটভাই একে গরীব, তার উপর এরূপ দুর্ভিক্ষ ও কাচ্চা বাচ্চা অনেকগুলি বলিয়া মাঝে মাঝে বড় ভাইএর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হ'ত। বড়ভাই উত্তর করিতেন "কোথা পাব।" পূজার সময় যদি কেহ বড় ভাইকে বলিত এ ছোট ভাইকে ও ভাদ্রবধূকে একখানা কাপড় দাও না।" তিনি উত্তর দিতেন, "এত খরচ, আব তাতে এত দুর্ব্বৎসর, দেই কি প্রকারে?" যদি তাহার উত্তর বলা যাইত "কেন, কি খরচ তোমার ছেলে পুলে নাই যখন তখন ওদের করাই উচিত।" তিনি উত্তর দিতেন, "দেখুন, কুটুম্ব দিগকে প্রায় ৫০।৬০ জোড়া কাপড় দিতে হয়, ভাইকে সুতরাং দিতে অসমর্থ।" অবশ্য ইহার উপর আর কথা চলে না।"

যাহা হউক, একদিন এই ছোট ভাই, মনের দুঃখে একটা বড় গাছের তলায় বসিয়া গালে হাত দিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতে-ছিল, কিকারণে তাহার অদৃষ্টে বিধাতা এইরূপ কষ্ট লিখিয়াছিল, কেনই বা সে জন্মগ্রহণ করিল, আর যদিই জন্মিল তবে শীঘ্র অবসান করিবার উপায় কি? এবং বার বার হাত জোড় করিয়া ইষ্টদেব স্মরণ করিতে লাগিল।

ছোট ভাই যখন বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ সেই পথে পাড়া কুঁদুলীর আগমন হইল। তাহাকে দেখিয়া কোন্দল করিবার জন্য পাড়াকুঁদুলীর একটু আহ্লাদ হইল —বোধ হয় মুখে একটু হাসির রেখাও দেখা দিল —পাড়াকুঁদুলীর মুখে হাসির রেখা যে মন্দ লক্ষণ তাহা সেখানকার সকলেই জানিত, সুতরাং ছোট ভাই তাহাকে দেখিয়া একটু জড়সড় হইল।

পাড়াকুঁদুলী একটু ধীরে কহিল, "কেরে ওখানে বসে?" কোন উত্তর পাইল না। ক্রমে স্বর বাড়াইয়া বলিল, আঃ মোলো যা কেরে তুই?" তবুও উত্তর নাই। তখন পাড়াকুঁদুলী আরম্ভ করিল, "আরে এ'ত আহাম্মুখ; বলি, ওরে হত-ভাগা, একি তোর বাবার জায়গা যে এখানে হাঁ করে বসে আছিস? এযে সরকারী রাস্তা খালি চল্‌বার জন্যে, বস্‌বার জন্যে নয়—এ তোর জায়গা নয়, ওঠ বলছি নইলে, ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেব। আমি মেয়ে মানুষ এখান দিয়ে যাচ্চি, তোর সরম হোলো না, তুই গালে হাত দিয়ে দেখছিস্; তোর চোখ খসে যাবে; ওঠ বলছি ভাল হবে না।"

ছোট ভাইএর তখন প্রায় ভয়ে নাভিশ্বাস উপস্থিত; সে বলিবে কি? তাহার নিশ্বাস বহিতেছিল কি না সন্দেহ!

পাড়াকুন্দুলীর আর সহ্য হইল না নিকট হইতে একটু ইট কুড়াইয়া তাহার দিকে ছুড়িল। এমন সময়ে সেই বৃক্ষের ডালে একটী চিল কি একজিনিস মুখে করিয়া লইয়া আসিল এবং গাছে বসিতে না বসিতে পাড়াকুন্দুলীর ইট তাহার গায়ে লাগিল। চিল তখন বিকট চিৎকার করিয়া মুখের জিনিস ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল। তাহার মুখের জিনিস ছোট ভাইএর গলায় পড়িল; সেও বুড়ীর ভয়ে ছুটীয়া পলাইল। বাটী গিয়া দেখে যে তাহার গলায় এক গাছা সোণার হার। আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই হার বিক্রয় করিয়া যাহা মূলধন হইল তাহাতে ব্যবসা আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। গ্রামে রাষ্ট হইল পাড়াকুন্দুলী তাহাকে টাকা দিয়া এরূপ বড় মানুষ করিয়াছে। এসংবাদে পাড়াকুন্দুলীর একটু আনন্দ হইল, সে তখন বলিত, "আমি ওকে টাকা দিয়ে থাকি, দিয়েছি; তোদের কি? ফের যদি ওকথা বলিস্ তবে খেংরেনিব ঝেড়ে দিব।" এইরূপে তাহার আরও কোন্দলের ভাগ বেশী হইল, পূর্ব্বে এক আধটুকু সময় যদিও স্থিরভাব থাকিত, কি ঘুমাইত, তাহা বন্ধ হ'ল এবং ঝগড়ার পথ আরও সুপ্রসস্ত হইল।

ছোট ভাইএর সমৃদ্ধি দেখিয়া বড়ভাই হিংসায় ফাটিতে লাগিল। শেষে ছোট ভাইএর তোষামোদে প্রবৃত্ত হইল। অর্থই ইহ জগতের সার বস্তু।

লোকের ব্যারামে, কি বজ্রাঘাতে, কি সর্পাঘাতে, কি আত্মহত্যায় এবম্বিধ ব্যাপারে মৃত্যু হয়, কিন্তু পাড়াকুন্দলী ঠাকুরাণীর মৃত্যু অন্য রকমে হইল। একদিন প্রাতে আপনা আপনি কোন্দল করিতে করিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়িল, অমনি মৃত্যুও হ'ল। কেহ পোড়াইতে যায় না, প্রায়শ্চিত্ত না হইলে পোড়াইব না, টোলে বিধান আনিতে গেল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদেশ করিল কোন সুবৈদ্যের নিকট থেকে কি ব্যারাম লিখিয়া আন। পাড়ার এক সোণারবেণে ভৈষজ্যালয় খুলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট যাইল। তিনি বৈদ্যশাস্ত্রের যত গ্রন্থ আছে তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন্দল রোগ পাইলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন্দল রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছু ব্যবস্থাও করিতে পারিল না। পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত। পাড়া সরগরমা মাগী মরিয়াও ছাড়ে না। পুলিশ বলিল মৃত্যু সন্দেহ জনক। মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে হইবে। সকলে মিনতি করে বলে একটু দেরি করে, কিন্তু পুলিশ দেরি করিল না, লাস্ গাড়িতে তুলিয়া হাঁসপাতালে আনা হইল। মৃতদেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল—সন্দেহ জনক মৃত্যু নহে—পেটের ভিতর ঝগড়ার একটা থলী ছিল তাহা শূন্য হইয়াছে, তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছে।

মৃতদেহ দাহ করা হইল; পাড়ার লোকও বাঁচিল।

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা দাসী।

সাকার উপাসনার উপকারিতা ও সার্থকতা।

সাকার উপাসনা বা ব্রহ্মের রূপ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার পুজা অর্চ্চনাদি হিন্দু ধর্ম্মের আর একটী বিশেষত্ব; সাকার উপাসনার নামেই জ্ঞানী ও যোগীপুরুষের হৃদয়ে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয় যে যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহার আবার রূপ কিসের, তিনি ত রূপবিহীন এবং নির্গুণ তবে সেই পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মকে কি রূপ দিয়া বা কি গুণ অর্পণ করিয়া উপাসনা করিব কেননা তিনি তো অব্যয় অজন্মা ও সর্ব্বেশ্বর। ইহার উত্তরে একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে এই 'সাকার উপাসনা' প্রণালী, সাধকের সাধনার সাহায্যার্থে ও অল্পমেধাবীগণের হৃদয়ে ঐশ্বরিকভাবের উদয়ার্থে শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মানব, যাহার জ্ঞানশক্তি ও ধারণাশক্তি তাদৃশ প্রবল নহে যে, সে অনায়াসে সেই নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা করিতে সমর্থ হয়, তিনি এই সাকার গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা পথের পথিক হইবেন।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোঽরূপ কল্পনা॥"

ব্রহ্মের রূপ ও গুণ না থাকিলেও তাঁহাকে সরূপ ও সগুণভাবে হৃদয়ে কল্পনা করিলে সাধারণ মানবের পক্ষে পরমাত্মার নৈকট্য সম্বন্ধ বড়ই সহজ ও বোধগম্য হইয়া আসে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই; মানসপটে যদি সেই ভগবানের একটী নির্দ্দিষ্টরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারি তবে তাঁহার গুণবর্ণনাদি দ্বারা আমরা অনায়াসেই সেই পরম পুরুষের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু নিরাকার ও নির্গুণ পরমাত্মার উপলব্ধি জনসাধারণের পক্ষে বড়ই কঠিন ও অবোধ্য। তবে জ্ঞানী ও যোগীর পক্ষে এই নিরাকার নির্গুণ পরমাত্মার ধারণা বিশেষ কঠিন নহে।

সাকার উপাসনা নিরাকার নির্গুণ বা পরম ব্রহ্ম জ্ঞান উপলব্ধি একটী সোপান মাত্র; ইহার প্রচলন কালভেদে বা মানবের অভিব্যক্তির ক্রমিক বিকাশ ভেদে শাস্ত্রকারেরা, নানাপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা অল্পমেধাবী মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাপ্তির একটী সহজ উপায় মাত্র। উপাসনা বা দেবদেবী অর্চ্চনা সেই পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের সহিত একটী ঘনিষ্টতা সম্বন্ধ রক্ষার একটী সহজ পন্থা। এই ঘনিষ্টতা যতই দৃঢ় হয় মানবের ব্রহ্ম উপলব্ধির ইচ্ছাও সেই প্রকারে বলবতী হয়। দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা রাম বুদ্ধ আমরা যাহাকেই উপাসনা করিনা কেন, প্রকারান্তরে সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিতেছি কেননা এই দেব দেবী বা অবতার তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(গীতা ৪ অঃ)

"যদি ও অজন্মা আমি, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বেশ্বর;
আপন মায়ায় জন্মি আপন প্রকৃতি পর।
যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।

সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।"

"Creation is the act by which god passes through the primordial causes or universal ideas, into the region of particular things (processio) inorder finally to return to himself (reversio)."

(John, Scotus Eriqena.)

আর যখন সেই পরমাত্মার অংশ সকল জীবে জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান ও সকল পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তাঁহার অংশানুভূতি হৃদয়ঙ্গম হয় তখন তাঁহাকে যে অবস্থায় বা যে ভাবে উপাসনা করি না কেন প্রকারান্তরে সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান বা যোগ করিতেছি। তাঁহার জ্ঞান বা বর্ত্তমানতার উপলব্ধি যদি একমাত্র মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে পন্থাভেদে সে উদ্দেশ্য লাভের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটেনা। তবে পথ ঋজু বা বক্র হইতে পারে তজ্জন্য সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না; আমি জ্ঞানী, যোগী হইতে পারি আমার উদ্দেশ্য জ্ঞান বা যোগের দ্বারা লাভ হইবে, আমি যখন ভগবানকে প্রেমময় প্রীতিদাতারূপে কল্পনা করিব আমার মুক্তি এই ভক্তিমার্গে হইবে। আমি যখন তাঁহাকে ঘোর কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিব আমার মুক্তি সেই ভগবান নিহিত কর্ম্মযোগেই হইবে।

"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি

(গীতা)

অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি; তবু আমি কর্ম্মন্বিত।"

যদি রূপ ভেদে বা গুণভেদে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট দেব দেবীরূপ উপাসনায় সেই অন্তর্নিহিত পরম পুরুষ পরমাত্মার জ্ঞান বা তৎপ্রতি প্রেমের তারতম্য ঘটে তবে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী ও ভিন্ন ভিন্ন রূপধারীর জ্ঞানে আমাদের সেই এক অন্তস্থিত মানুষকে বর্ত্তমানতার উপলব্ধির ভ্রম হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না রঙ্গমঞ্চে একটী মানব কখনও নৃপতি আবার কখনও ভৃত্য, কেবল পরিচ্ছদের ও ভাব ভঙ্গিমার প্রভেদ মাত্র; যিনি এই প্রভেদ দেখাইতেছেন তাঁহার নিজের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, পরিবর্ত্তন কেবল পরিচ্ছদের ও ভাবের; সেইরূপ এই দেব দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষ একভাবে ও অপরিবর্জ্জনীয়ভাবে স্থিত কেবল পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ও ভাবের পরিবর্ত্তন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী-গণ সেই পরিচ্ছদের পূজা করে না কিন্তু তাঁহারা সেই বহির্দৃষ্ট পরিচ্ছদ মধ্যস্থিত পরমাত্মার আবির্ভাব অনুভব করেন এবং তাঁহারই ধ্যানে বা যোগে মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন।

তবে সাকার উপাসনার নিস্ফলতা কোথায়? বরং উপকারিতা পদে পদে; কেননা, সাকার উপাসক, বৃক্ষে, মৃত্তিকা পুষ্পে, পত্রে জলে সর্ব্বস্থানেই, সেই পরমাত্মার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করেন; তিনি বৃক্ষকে উপাসনা করেন কারণ তিনি বুঝিয়াছেন এই বৃক্ষ পরমাত্মার রূপান্তর মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহংন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতিস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

(গীতা ৬ অঃ ৩০।৩১)

"যে আমাকে দেখে সর্ব্বে, সর্ব্বত্র আমাতে আর,
হয়না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার।
সর্ব্বময় জানিয়া যে অভিন্ন ভজে আমায়,
সর্ব্বরে থাকিয়াও সে আমাতেই স্থিতি পায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিরাকার নিগুর্ণ পরমব্রহ্মের যোগ বা জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞানী ও যোগীগণের সাধ্যায়ত্ত। ইহার ধারণা জনসাধারণ পক্ষে সহজ ও সরল নহে। সেই ধারণাশক্তিকে প্রবল ও পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই সাকার উপাসনা বা অর্চ্চনা প্রণালীর সৃষ্টি। ইহা মানবকে পরমাত্মাতত্ত্বে অধিকতর তত্ত্ববান ও জ্ঞানবান করিবার পথ প্রদর্শন করে। ইহার উপকারিতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে যখন মানব এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ভূতে সেই পরমাত্মার স্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। যখন মানুষ বুঝিবে।

"Brahma is conceived as the eternal self-existent being, which on its material side unfolds itself to the world by gradually condening itself to matetial objects throug the gradation of ether fine water earth and the elements."

যখন অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন সাকার সগুণ উপাসনা ও নিরাকার নিগুর্ণ উপা-এই উভয় পথের মধ্যে প্রধান প্রশস্ত পথ কোন্‌টী? ভগবান উত্তর করিলেন।

"ময্যা বেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
"আমাতে নিবেশিমন, যারা নিত্যযুক্ত করে উপাসনামম,
পরম শ্রদ্ধার সহ, ধনঞ্জয়! মম মতে তারা যুক্ততম্।

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ বি, এ, বি, এল।

বায়ু।

১

নিখিল পৃথিবীব্যাপী
সর্ব্বত্র সঞ্চর মান্,
হে অনিল বহ্নিসখে
তুমিতো জগত প্রাণ

২

কিরূপে বাঁচিত জীব,
বাচিতে গো তরুলতা,
যদিনা বহিতে তুমি
শান্ত ভাবে যথা তথা।

৩

নিদাঘে তাপিত তনু
প্রচণ্ড রবির করে,
জীবকুল অঙ্গে যেন
বহ্নি সমস্পর্শ করে।

৪

প্রাবৃটের অধিকার
যখন ভুবন ময়,
তখন তোমার মূর্ত্তি
অতীব ভীষণ হয়।

৫

দিবারাত্র ঝঞ্ঝাঘাত,
প্রকাশ বিক্রম কত,
তব কদাচারে ভুঞ্জে
নানা ক্লেশ জীব যত।

৬

শরতে মুরতি তব
মবিকি আনন্দ ময়,
হেরি জীব যত তব
কদাচার ভুলে যায়।

৭

নাতিশীত উষ্ণ ভাব
তুমিতো হেমন্তেধর,
শান্তভাবে সদাচারে
চরাচরে সুখী কর।

৮
শীতে শৈত্য বৃদ্ধিকর
জীবকুল ভয়পায়,
কৃশানু ভানুর তাপে
সুখে কাল কেটে যায়।

৯
বসন্তেতে স্নিগ্ধভাবে
মনে তুমি তৃপ্তি কর,
পবশি জীবের অঙ্গ
সর্ব্বশ্রান্তি ক্লান্তি হর।

১০
মরুভূমে বালুলয়ে
ক্রীড়ামত্ত হলে তুমি,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে
প্রাণীহীন মরুভূমি।

১১
অতীব প্রমত্ত দেখি
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মেঘসনে,
নাশিতে প্রতাপতার
যুঝ তুমি প্রাণপণে।

১২
মলয় অচল আর
বিকশিত পুষ্প যত,
সৌরভ পূরিত করে,
নানামতে অবিরত।

১৩
রজনী হইলে গত
উষা দেখাদিলে পরে,
বিশ্রাম দেখি না তব
নিমেষ কালের তরে।

১৪
কখন বা পদ্মগণে
কভুলয়ে লতাচয়,
কখন উঠিয়া উৰ্দ্ধে
ধরি নব কিশলয়;

১৫
শিখাও কিরূপে তারা
হইয়া বিশুদ্ধ মতি,
নমিবে তাঁহার পদে
যিনি এ বিশ্বের পতি।

১৬
হে অনিল বিরাজিত
আছ যাঁর প্রাণরূপে
বার বার শতবার
নমিসে নিখিল ভূপে।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

পোষ্টকার্ডের উপর ফটো :—ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পোষ্টকার্ডের উপর নিজ নিজ ফটো ছাপাইয়া প্রেরণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এজন্য তথায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ৫ আউন্স গরম জলের সহিত ৫ গ্রেণ জিলেটিন বা শিরীস গলাইয়া উহার মধ্যে ৫০ গ্রেণ পরিষ্কার নিশাদল মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থ সাদা ব্লটিং কাগজের মধ্য দিয়া ছাকিয়া লওয়া হয়। পোষ্টকার্ডের যে পৃষ্ঠায় ফটো তুলিতে হইবে ঐ নীচের পৃষ্ঠা উক্ত জলের উপর ৪।৫ মিনিট কাল ধরিয়া ভিজাইয়া, উহাকে উঠাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন উপরের পৃষ্ঠায় জল না লাগে। পরে ১ আউন্স বিশুদ্ধ জলের (distiled water) সহিত ৫০ গ্রেণ সিলভার নাইটেট মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে পুনবায় পূর্ব্বের মত পোষ্টকার্ডের নীচের পৃষ্ঠা ভিজাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। তাহার পরে যেমন সাধারণ ফটোকে প্রিণ্ট এবং টোন (tone) করিয়া ফিক্স (fix)

করা হয় উক্ত পোষ্টকার্ডকেও ঐরূপে প্রিণ্ট করিয়া নিম্নলিখিত সলিউসন বা মিশ্রণ দুইটির সাহায্যে যথাক্রমে টোন ও ফিক্স করিতে হয়ঃ—টোনিং সলিউশন (toning aolution) জল ৩ আউন্স, গোল্ড্ ক্লোরাইড ২ গ্রেণ ও সোডিয়ম অ্যাসিটেট ১০০ গ্রেণ। টোন করিয়া পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া কার্ড ধুইয়া ফেলিতে হয়।

ফিক্সিং সলিউশন (fixing solution) জল ৮ ভাগ সোডিয়াম হাইপো সালফাইট ১ ভাগ। ফিক্স্ করিয়া পুনরায় কার্ড পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়।

দুগ্ধ দ্বারা কেরোসিনের অগ্নি নির্ব্বাণঃ—দেখা গিয়াছে জলদ্বারা কেরোসিনের আগুন নির্ব্বাসিত করিতে গেলে উহা অধিকতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ঐ সময়ে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ঐ অগ্নি অতি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

কোন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ধনেশ্বর তর্ক চূড়ামণির বাস। পল্লীটির নাম না বলিবার কারণ—এই যে, আসে পাশের লোকেরা বলে, নাম করিলে আর সেদিন অন্ন জোটে না।

চূড়ামণি মহাশয়ের চূড়ামণি খেতাবটি, টোলের অধ্যাপক দেন নাই কিম্বা কোন সংস্কৃত পরীক্ষায় পাশ হইয়া পান নাই। এটী তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি। কারণ তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺ সিদ্ধেশ্বর তর্কচূড়ামণি। সিদ্ধেশ্বর তর্ক চূড়ামণি আর এ সংসারে নাই। কাল তাঁহাকে অনেক দিন হইল গ্রাস করিয়াছে। যদিও তাঁহার বুদ্ধি খুব বড় ছিল না কিম্বা বিদ্যায় তিনি খুব দড় ছিলেন না—কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রিয়া কাণ্ড গুলি তিনি খুব সড়গড় করিয়াছিলেন। সরস্বতীর সহিত যে তাঁহার আদৌ সম্পর্ক ছিল না একথা বলিতে পারি না। যাহা হউক অল্পস্বল্প সংস্রব থাকাতে তিনি সংস্কৃত দুই একটী শ্লোক আওড়াইতে পারিতেন আর তাঁহার একটী প্রধান গুণ এই ছিল, যাহা একবার শুনিতেন তাহা তখনই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন।

তর্ক চূড়ামণির বাসগ্রামে ভদ্রলোকের বসবাস বড়ই কম ছিল। পোনর আনা তিন পাই চাসা লোক। কিন্তু চাসা হইলেও নেহাৎ চাসা নহে। আর তাহাদের মধ্যে অনেকই যোত্রশালী। তাহারা সকলে দেখিল গাঁয়ের মধ্যে যদি কোন বিধান লওয়ার দরকার হয়; পূজা পার্ব্বণ—সারিবার দরকার হয়, দায় ভাগের মতে সম্পত্তি বাঁটওয়ারার দরকার হয়, কিম্বা কোন বিষয়ের ছলা পরামর্শ লইতে হয় এক সিদ্ধেশ্বর বামুনছাড়া আর গতি নাই, এই সব কারণে সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিত। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার বাড়ীতে একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত কথায় বার্ত্তায় একতর্ক উপস্থিত হয়, চূড়ামণি মহাশয় বেগতিক দেখিয়া পেটে যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক ছিল পর পর উচ্চৈস্বরে আওড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে উচ্চ হাস্য করিয়া করতালি দিতে আরম্ভ করিলেন। আগত পণ্ডিতটী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বাপুহে ক্ষান্ত হও। আমারই হার হইয়াছে। আমাকে যখন হারাইয়াছ তখন আর তোমায় কি উপাধি দিব তর্ক চূড়ামণি উপাধি দিলাম। এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। গাঁয়ে রাষ্ট্র হইল সিদ্ধেশ্বর বামুন এক প্রকাণ্ড পণ্ডিতকে হারাইয়া দিয়াছে, পণ্ডিত হারিয়া বামুনকে তর্ক চূড়ামণি

খেতাব দিয়াগিয়াছে, সেই হইতেই সিদ্ধেশ্বর তর্ক চূড়ামণি হইলেন।

সিদ্ধেশ্বরের একমাত্র পুত্র ধনেশ্বর। একমাত্র পুত্র বলিয়া ধনেশ্বরের আর আদরের সীমা পরিসীমা ছিল না। সিদ্ধেশ্বরের গৃহিণী পুত্রকে কেহ কিছু বলিলে চটিয়া একেবারে আগুন হইতেন। পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বিবাহ দিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের সমান বয়সের এক পাত্রীর সহিত বিবাহ দিলেন। সংসারে যেদিন যায় সেই দিনই সুখের। পরিণাম ভাবিয়া কয়জন এ সংসারে কাজ করে? কয়জন পরিণামে সুখের ভাবনা ভাবে? যাহা হউক বধূমাতা যথাসময় হইতে পর্য্যায়ক্রমে সন্তানাদি প্রসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সংসার ভারী হইয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর ভার বহনে অসমর্থ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সংসার হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইলেন। ধনেশ্বরের ঘাড়ে সংসারের সমস্ত ভার পড়িল, ধনেশ্বরের চমক ভাঙ্গিল। যেদিকে চান দেখেন সেই দিকেই আঁধার।

পিতামাতার একমাত্র পুত্র হইলেও এবং শৈশব হইতে আদরে প্রতিপালিত হইলেও ধনেশ্বর পরিশ্রমী ছিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, মা জগদম্বার উপর তাঁহার অটলা অচলা ভক্তিও নির্ভর ছিল। তিনি মনে ভাবিলেন মা জগদম্বা যখন সংসারের ভার ঘাড়ে ফেলিয়াছেন, তখন সংসার চালাইবার পথও তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া করিব কি?

পিতৃ বিয়োগের পর দুঃখ কষ্টে ছয়মাস কাটিয়া গেল; কিন্তু ক্রমেই সংসার অচল হইয়া উঠিল। একদিবস রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া নানা প্রকার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ঘুমের ঘোরে দেখিলেন, তিনি এক দিঘীসরোবরের তীরে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক বৃদ্ধা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধনেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপু হে। দেখিতে পাইতেছি তুমি সংসারের জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছ; যাও, অনতিদূরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক ভগ্ন কালীমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের বাহিরে দক্ষিণ কোণে খনন কর, সেই খানে অনেক ধন পোতা রহিয়াছে, তুমি তাহা হইতে অভিলাষ মত গ্রহণ কর।" বৃদ্ধার এই কথা শেষ হইলে পর ধনেশ্বরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, স্বপ্নের বিষয় মনে মনে অনেক আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এবং বাত্র প্রভাতে বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট দেবীমন্দিরের নিকট একাকী উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দক্ষিণ কোণ বহির্ভাগে খনন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠক্ করিয়া শব্দ হইল মনে আশার সঞ্চার হইল। উৎসাহের সহিত খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে একটি পিত্তলের কলসী বাহির হইয়া পড়িল। ধনেশ্বর দেখিলেন কলসীটি টাকায় পরিপূর্ণ। তিনি অতি সাবধানে কলসীটি তুলিলেন, এবং জঙ্গলের মধ্যে লুককাইয়া রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, রজনীর অন্ধকারে তিনি সেই কলসী ঘাড়ে করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ধনেশ্বরের মাতা ও পত্নী প্রাতে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন দেখিয়া সমস্ত দিন অনাহার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এক্ষণে ধনেশ্বরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও অর্থপূর্ণ কলসী দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীবাসে মা জগদম্বাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। এই অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা ধনেশ্বর সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

প্রমেহ, ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, পারা বা উপদংশজনিত দূষিত রক্ত, স্ত্রীলোকের প্রদর, ঋতুবন্ধ বা অধিক রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগের এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কৃশতার একমাত্র মহৌষধ।

নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন।

এই মহৌষধ সেবনে আজ ভারতবাসী অনেকেই বলিতেছেন যে, সালসা কড্‌লিভার অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন। কেবল তাহা নহে, শাস্ত্রীয় বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর ও বসন্ততিলক রস প্রভৃতি বহুমূল্যবান ঔষধ সেবনে কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত রোগী এই ভারত বিখ্যাত নবাঙ্গ রসায়ন সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম সকলের মতে একমাত্র লৌহই সমস্ত রোগের মহৌষধ এবং সমস্ত ঔষধের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। বহু পুটের উৎকৃষ্ট লৌহ প্রায়ই পাওয়া যায় না, আমরা বহু চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ সংগ্রহ করিয়া এই নবাঙ্গ রসায়ন নামক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি, এই ঔষধে চারিটী মাত্র ধাতু দ্রব্য আছে; যথা লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ; তন্মধ্যে লৌহের ভাগ অধিক হওয়ায় নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন নাম হইয়াছে, এই ঔষধ বার্দ্ধক্যতারূপ ব্যাধি নষ্ট করে; এজন্য রসায়ন শব্দবাচ্য হইয়াছে।

এই ঔষধ সেবন করিলে শিথিল অঙ্গ দৃঢ় করে অর্থাৎ অঙ্গ সকল হাড়ে, মাংসে জড়িত হয়। সালসার ক্রিয়া ক্ষণিক, লৌহের ক্রিয়া চিরস্থায়ী; সালসা যখন সেবন করা হয়, তখনই শরীর একটু ঠুসাঠুসা ও চাকচিক্য দেখা যায়, বন্ধ দিলে তাহা আর থাকে না আসল হইতেও একটু কমে। এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন করিলে বনিয়াদ ভাল হইয়া অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু পূর্ণ ও পরিষ্কার হইয়া শরীরের লাবণ্য ও পুষ্টি হইয়া থাকে। তৈল ঘৃত অরিষ্ট, আসব এ সমস্ত অপেক্ষা লৌহের গুণ অধিক ও চিরস্থায়ী একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ১৫ দিবস সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহাশ্রিত জ্বর, হস্ত পদাদির জ্বালা ও উত্তাপ স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদর, ঋতুবন্ধ ও অধিক রক্তস্রাব, পুরাতন জ্বর, পেটগরম, মাথাঘোরা, মাথাগরম, শরীরের দুর্ব্বলতা, শুক্রের শিথিলতা ও তরলতা, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, অধিক প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ এই সমস্ত রোগ হইতে ১৫ দিবস সেবনে একেবারে আরোগ্য হওয়া যায়। বহুসংখ্যক রোগীতে আমরা প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি সুতরাং এই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষ অবগত আছি। যদি শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সাম্যতা চাও, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্তধাতু সমান পূর্ণাবস্থা রাখিতে চাও, অল্প বয়সে অকাল বৃদ্ধ না হইতে চাও, তবে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন সেবন কর। শরীরের ধাত্বাদি ভাল করিতে লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও বঙ্গ এই চারিটী ধাতুই উৎকৃষ্ট। এই ঔষধও এই চারিটি ধাতুদ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনারা সপ্তাহকাল সেবন করিয়া দেখুন উক্ত ব্যাধি সমূহ হইতে অবশ্য আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা যৌবনের পূর্ব্বে বা যৌবনাবস্থায় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ বা বারাঙ্গনা জনিত অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হেতু অকাল বার্দ্ধক্য শরীরে অনুভব করিতেছেন অর্থাৎ অল্প উত্তেজনায় শুক্রপতন বা স্বপ্নদোষ, বুক ধড়ফড়, মাথাঘোরা, অন্ধকার দর্শন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা জোনাকি পোকার ন্যায় দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ হইলে এই নবাঙ্গ লৌহ রসায়ন তাঁহাদের পক্ষে মহৌষধ বলিতে হইবে। এই রকম বিস্তর রোগীতে প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি, আপনারা একবার সেবন করিয়া দেখুন পুনর্ব্বার যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ লইলে ১৲ টাকা। একেবারে ১৫ দিবসের ঔষধ লইলে ১৸০ এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিতে লইলে ডাক মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

সমস্ত রকম বাত রোগের একমাত্র সুদক্ষ ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব
কবিচিন্তামণির ভারত বিখ্যাত বাতরোগের মহৌষধ

মূল্য বড় শিশি ১৸০ মাশুলাদি ।৵০ **বাতের তৈল** । ছোট শিশি ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা

এই বাতের তৈল মালিষ করিয়া ভারতের নানা দেশস্থ বাত রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমাদিগকে সানন্দ পত্র প্রদান করিতেছেন, ভগবানের কৃপায় এই বাতের তৈল আজ নিজগুণে দিন দিন এত বিখ্যাত হইতেছে, যে এই তৈল সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক পরিচয় দিতে আবশ্যক করে না। কুব্জপ্রসার সৈন্ধবাদি তৈল প্রভৃতি মালিষ করিয়া কোন কিছু ফল না পাইয়া আজ শত শত বাত রোগী শেষ এই তৈলে অল্প সময়ে ও অল্প অর্থব্যয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন. গেঁটে বাত, সন্ধিগত বাত, কোমরের বাত, জানু ও জঙ্ঘাগত বাত, পারা বা উপদংশ জনিত বাত, কোন অঙ্গ চিবান বা খাল ধরা, ঝিঁ ঝিঁ বাত, অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা আমবাত, শিবামুণ্ডু, খঞ্জ, পঙ্গু, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত প্রভৃতি সমস্ত রকম বাতরোগের এরূপ মহৌষধ আর নাই। এই কলিকাতাবাসী যাঁহারা এই তৈল মালিষ করিয়া বাতরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বাতরোগীর নাম ও ঠিকানা দিয়া আরোগ্য সংবাদ প্রকাশ করা হইল যথা—পাথুরিয়াঘাটাস্থ মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের ম্যানেজার বাবু মধুসূদন বর্ম্মণ মহাশয় কোমরে বেদনায় অতীব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, কোন চিকিৎসায় কোন কিছু ফল না পাইয়া শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। উক্ত মহারাজার খাতাঞ্জি বাবু দয়াময় মিত্র মহাশয় হাঁটু ফুলিয়া গুরুতর বেদনা ভোগ করিতেছিলেন, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মুন্সেফ বর্ত্তমান সবজজ বাবু মতিলাল হালদার মহাশয় দক্ষিণপদ ফুলা ও বেদনায় চলিতে অক্ষম হইয়া তিনমাস ভুগিয়াছিলেন, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। শোভাবাজারস্থ মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরায় জ্বর ভোগ করিতেছিলেন; প্রসারণ করিতে অক্ষম হইয়া দুই পদ শুষ্ক হইতেছিল, শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিলেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক পক্ষাঘাত রোগে ৬ মাস শয্যাগত থাকিয়া নানাপ্রকার চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষ এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। বড়-বাজারস্থ বাবু বীরেশ্বর দত্ত গাড়ির চাকার আঘাতে বামপদ মচকাইয়া ৬ মাস শয্যাগত ছিলেন শেষে এই তৈলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন বর্ত্তমান পেন্‌সন ভোগী ডাক্তার বাবু রতিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের স্কন্ধে ফুলার সহিত অতি গুরুতর বেদনা হইয়াছিল, ডাক্তারিমতে যত কিছু প্রক্রিয়া প্রায় সমস্তই করিয়া কিছুমাত্র উপশম না পাইয়া, পরে এই তৈল মালিষে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন॥ তাহির পুরের রাজা শশীশেখর রায় বাহাদুর বলেন, আমার বিশ্বাস কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব কবি-চিন্তামণির বাতের তৈলের ন্যায় উপকারী ঔষধ বাতরোগে আর নাই। এই বাতের তৈল ব্যবহার করিয়া বিস্তর বাতরোগী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞাপনে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কিছুই নাই, আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

সাবধান। আমাদের এই বাতের তৈলের নবাঙ্গ লৌহ রসায়নের উপকার বশতঃ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া লুব্ধ লোকেরা আমাদের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে আমাদের বিজ্ঞাপনের কথাগুলি অনুকরণ করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছে, অতএব আপনারা একটু সতর্কতার সহিত আমাদের নিজ ঠিকানায় স্বয়ং বা লোক দ্বারা অথবা পত্রদ্বারা এই তৈল গ্রহণ করিবেন।

কবিরাজ শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেব কবিচিন্তামণির আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।
রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের শেষ পূর্ব্ব সীমায় ১৪ নং বাটী. প্রবেশের সদর দরজা, গেষ্ট্রীট, ট্রামরাস্তার উপর।

জগতে অতুলনীয়—ভারতবিখ্যাত, সর্ব্বজন প্রশংসিত সর্ব্ববিধ

জ্বরের মহৌষধ—

জ্বর-কালান্তক রস।

জ্বর-কালান্তক রসের" অদ্ভুত উপকারিতা দর্শনে সকলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ "জ্বর-কালান্তক রসের" প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। যাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাই শত শত ধন্যবাদ দিয়া অযাচিত ভাবে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র দিতেছেন "একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

"জ্বর-কালান্তক রস" কি কি জ্বরের মহৌষধ।

নবজ্বরে "জ্বর কালান্তক রস' ধন্বন্তরি।

পুরাতন জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অমোঘ।

প্লীহা জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" ব্রহ্মাস্ত্র।

কম্পজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" যম।

পালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অব্যর্থ।

ঘুসঘুসে জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" অদ্বিতীয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রসই" একমাত্র ভরসার স্থল।

কালাজ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" কাল।

মজ্জাগত জ্বরে "জ্বর-কালান্তক রস" মন্ত্রৌষধি।

জ্বর-কালান্তক রস"—

কুইনাইনের আটকান জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দোষযুক্ত ঘুসঘুসে জ্বরে ইন্দ্রিয় বজ্র। "জ্বর-কালান্তক রস"—

আসামের কালাজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

দিনাজপুরের ভূতজ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

ম্বৌকালীন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

যকৃৎসংযুক্ত জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস"—

পাণ্ডু কামল জ্বরের মহৌষধ। "জ্বর-কালান্তক রস" বাতজ্বরের মহৌষধ।

এই "জ্বর-কালান্তক রস" সেবনে নবজ্বর যথা—সামান্যজ্বর, স্বল্পবিরামজ্বর, সন্দিজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নবজ্বর ত্বরায় উপশম হইবে।

সর্ব্ববিধ পুরাতম জ্বর যথা ;—

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পাণ্ডু কামলা, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বর নিবারণ হইবে।

এতদ্ব্যতীত—আসাম চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য-দেশজাত কালাজ্বর, কুইনাইনের আট্‌কান জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, আরক্তজ্বর, নাসাজ্বর, স্ফোটক জ্বর, আভিঘাতিক জ্বর, (কোণা ঘা ফোড়া ও "স্থানিক আঘাত বশতঃ জ্বর) প্রভৃতি যাবতীয় জ্বরে যথেষ্ট ফল পাইবেন। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে এই "জ্বর-কালান্তক রসের" তুল্য জ্বর নিবারণের দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই।

ছোট ৪ আউন্স ১ শিশির মূল্য ॥৵০ আনা, মাশুলাদি ।০ আনা ৩ শিশি ১॥৵০ ডাঃ মাঃ ॥০ আনা, ৬ শিশি ৩৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸০ আনা। বড় ৮ আউন্স ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা ডাঃ মাঃ ৸০ আনা।

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৪নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

Registered No C. 439.

১ম বর্ষ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা]   [মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৪ সাল

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্,এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী; পি দত্ত F.C.S.PH.B.; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষার্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

"কলিকাতা, ৮০।২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, "গোবর্দ্ধন প্রেসে" শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১।০)   প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)

কেশরঞ্জন তৈল

কেশের জন্য

কেশরঞ্জন।

কেন না—কেশরঞ্জন কেশকে যেরূপ মসৃণ কোমল কুঞ্চিত, ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিতে পারে—এমন আর কিছুই নাই। কেশরঞ্জন নিত্য মাখিলে চুল উঠা বন্ধ হয়, টাক দূরে যায়, কেশমূল দৃঢ় হয় আর বার্দ্ধক্যে নবীন যৌবন সঞ্চার হয়।

বিলাস ভোগে

কেশরঞ্জন

যাঁহারা একবার কেশরঞ্জন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার গুণে স্পিরিটভরা গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা—ইহাতে শত সহস্র সুগন্ধি মিশ্র কুসুমের সুরাভ সম্ভার সমাহিত। পূজার তত্ত্বে, বিবাহ-ক্ষেত্রে ইহা উপাদেয় উপহার।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	৶৹ তিন আনা।

অর্শোহর বটিকা।

আমাদের 'অর্শোহরবটিকা' সেবন করিলে—বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ কষ্টকর অর্শ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে ভাবেন, অর্শ রোগ একবার হইলে আর আরাম হয় না। ইহা তাঁহাদের মহাভ্রম। প্রথম হইতে সাবধান হইয়া আমাদের 'অর্শোহর বটিকা' ব্যবহার করিলে রোগের উপশম ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে রোগ একেবারে নিরাময় হইতে পারে। আমরা দর্প করিয়া বলিতে পারি, যদি অর্শরোগের প্রকৃত ঔষধ কোথাও থাকে, ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। প্রত্যেক রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি কৌটার মূল্য	...	১।৹ পাঁচ সিকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	৶৹ তিন আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"সুরমা" শ্রেষ্ঠ কেশতৈল কেন? সুরমার সুগন্ধ দিবারাত্র চিত্তের প্রফুল্লতাসাধন করিয়া থাকে। সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা জন্মে। সুরমার ন্যায় সহজপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ কেশরাগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। চুল কাল কোমল ও কুঞ্চিত করে।

সুরমা মাখিয়া স্নান করিলে মাথায় আটা হয় না। চুল বেশ নরম থাকে, কালো চুল আরও কালো হয়। বেণীরচনার সময় চারিদিকে "সুরমার" সুগন্ধ বহিতে থাকে। আর গৃহমন্দিরে শত শত প্রস্ফুটিত বেলা মল্লিকা-চামেলির সুবাস ফুটিয়া উঠে।

মূল্যাদি।—বড় একশিশির মূল্য ৸৹ মাশুলাদি ।৶৹ তিন শিশি ২৲ মাশুলাদি ৸৶৹।

স্বদেশী এসেন্স্!



বকুল। আমাদের বকুলের সৌরভ টাট্‌কা বকুলফুলের মতই অটুট সুন্দর! এই বকুলে সিক্ত রুমালখানি বুকে থাকিলে মনে হয়—বুক ফুড়িয়া বুঝি বকুলফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে!

দিল্ অব্ রোজ্। একটী ফুলের ফুলসার নহে, কতকগুলি কুসুমের সুমিষ্ট পুষ্পসার একত্রে মিশ্রিত। ইহার সৌরভ বলিয়া বুঝাইবার নহে। সকলকে একবার আমাদের 'দিল্ অব্ রোজ' ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। প্রতি শিশি ৸৹ মাঃ ।৴৹

এস, পি, সেন এণ্ড কোং ১৯।২ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



লালা লাজপৎ রায়।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অনির্দ্দেশ্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। | মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল। | ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

বাণী।

ওগো সুন্দরি-শুভ্র সেফালি বরণা,
রক্ত কমলগঞ্জিত অয়ি স্বতঃ রঞ্জিত চরণা,
ওগো অশোক অধর হসনা,
ওগো বিশদ কুন্দ দশনা,
ওগো অতসী পীতবসনা,
ওগো সুধা সঙ্গীত রসনা—
এস—অন্তরে এস চির আনন্দ
অধম-দীন-শরণা;
বরিষ আশীষ-উৎপল নীল নয়নে
(তব) গোলাপ-গণ্ড-শয়নে,
বিকসিত কর চিত্ত কমল—
বিভাসিত কর চিত্ত কমল
(ঐ) চরণ নখর-কিরণে!
দেহ-সঙ্গীতে, বীণাসঙ্গীতে, হৃদি সঙ্গীতে গো—,
এ হৃদয় মরুভূ কর উর্ব্বর
অয়ি নিত্য নিখিল-শরণা,
তোমার—
অপরাজিতা-অসিত কেশে
আনগো শান্তি মোহন বেশে
বিস্তারি দেহ চক্ষে বক্ষে
ওগো সব অশান্তি হরণা।

শ্রীশ্রীধরস্বামী ॥

অহং বেত্তি শুকোবেত্তি
ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ ॥

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভারতের গৌরব-রবি শ্রীশ্রীধরস্বামী একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। অনেকের মতে গুর্জ্জরদেশে শ্রীধরস্বামীর জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের * ৫ খণ্ডের লিখিতানুসারে তিনি ভারতের পূর্ব্বদেশ বাসী ছিলেন।

স্বামীজী পূজ্যপাদ্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলোকন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার গীতার সুবোধিনী নাম্নী টীকার মঙ্গলাচরণের পরবর্ত্তী শ্লোকটীই প্রমাণ। অনেকে ইহাঁকে, বৈষ্ণবীয় রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-স্বামীর অল্পকাল পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। এরূপ অনুমানের কারণও আছে।

শ্রীস্বামীজী বাল্যকালে অতি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। পরে উপযুক্ত বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হন। তারপর একদা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধীয়

"সংসারসাগরদুস্তরমূর্ত্তীতির্ষোঃ
নান্যঃপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।"

ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেম-পিপাসু হইয়া উঠে; এবং ভগবৎ প্রেম পিপাসার সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা ক্রমশই সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে। এই সময়ে উক্ত স্বামীজীর সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নী বিয়োগকে পূর্ণ আনুকূল্য পাইয়া স্বামীর ভগবদ্দর্শনলালসা বলবতী হইয়া উঠে। পত্নী বিয়োগের পর; শ্রীস্বামীজী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে "এই সদ্যোজাত শিশুকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব।" শ্রীস্বামীজী এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া সদ্যোজাত শিশুর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহের উপরিভাগ হইতে একটী টীক্‌টীকির ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; এবং তাহার মধ্য হইতে একটী ছানা বাহির হইয়াই সমীপবর্ত্তী একটী মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিল। স্বামীজী এই আশ্চর্য্য জনক ঘটনা দর্শন করিলেন; এবং ভাবিলেন—যিনি জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই জীবের পালনকর্ত্তা; যে দয়াময় এই সদ্য-প্রসূত ছানাটীর আহার যোগাইয়া দিলেন সেই দয়াময় এই শিশুটীরও আহার যোগাইবেন। অতএব সেই করুণাময় শ্রীভগবানের আশ্রয়ে এই নিরাশ্রয় শিশুটীকে রাখিয়া একান্তে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই প্রতিবেশীগণ সেই শিশুটীকে লইয়াগিয়া বল্লভীপতি রাজা নরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য দিলেন। কালক্রমে এই মাতৃপিতৃহারা বালকটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। "রত্নমাল" রচয়িতা, ভট্টিকাব্যের

* উইলসন্ সাহেব ৫ম খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত স্বামীজীকে ভারতীয় পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়া স্বিরীকৃত করিয়াছেন।

২২ সর্গের ৩৫ শ্লোক "কাব্যমিদং বিহিতং ময়াবলভ্যাং শ্রীধর-সুনু নরেন্দ্রপালিতায়াং" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ইহাঁকেই "ভট্টিকাব্যের" কবি-বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক এদিকে শ্রীশ্রীধরস্বামী ভারতীয় বিবিধ তীর্থপর্য্যটন করিয়া যথা সময়ে শ্রীকাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই তিনি শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধুময়ী টীকা রচনা করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে গীতা ও ভাগবতের এই স্বামী কৃত টীকাই বিশেষ আদরণীয় ও সুখপাঠ্য। কাশীধামের পণ্ডিত-সমাজে স্বামীকৃত গীতার টীকা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। পরে পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীবিশ্বেশ্বর সমীপে ইহার মীমাংসা প্রার্থনা করিলে, শ্রীবিশ্বেশ্বর স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন ;—

"অহং বেত্তি শুকোবেত্তি ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥"

স্বামীজী গীতা ও ভাগবতের টীকা ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের টীকা, এবং অমানুষী প্রতিভা বলে "মহিমন্ স্তব" নামক শিবস্তোত্রের বিষ্ণুস্তোত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর রচিত "ব্রজবিহার" নামে একখানি অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ আছে। এই কাব্যের শ্লোকগুলি অতি মধুর। উক্ত গ্রন্থের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺হরিমোহন প্রামাণিক স্বামীজীকে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

ভগবানের শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তিই ইহাঁর উপাস্য দেবতা ছিল। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর নিকটে ইনি বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। "মহিম্ন-স্তবের" বিষ্ণু-স্তোত্র-রূপ ব্যাখ্যাই ইহার শেষ রচনা, এবং এই রচনার অল্পকাল পরেই ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি কতকাল মর্ত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার এখনও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

"ভক্তমাল" রচয়িতা, শ্রীশ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ; প্রয়োজনীয় বোধে তাহারও কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জয় শ্রীশ্রীধর স্বামী ভুবন পাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন॥
তাঁহার বৈরাগ্য কথা আগু বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী হৃদয়ে উদয়॥
মহা ভাগোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্যজন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥
হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে একজ্যেঠী ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়িগেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকরিয়া
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হৈলা।
ভট্টি নামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা॥

শ্রীগৌরগোপাল সেন।
মালদহ।

আর্য্যশক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৩

"উপপ্লবায় লোকানং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন। কোন্ সময়ে বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন, এ প্রবন্ধে উহাই আলোচ্য বিষয়। আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত * প্রদেশে থাকিয়া, রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন, তখন এই বঙ্গদেশ ভয়াবহ বন্য হিংস্রজন্তু সমাকুল নিবীড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। এমন কি, সে সময় মগধরাজ্যেও আর্য্যসভ্যতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃকণা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন অসভ্য অনার্য্য নিবাস বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কারণ আর্য্যগণ তখন মগধের যথেষ্ট নিন্দা করিতেন। † তৎকালে "অঙ্গও" অনার্য্যদিগের বাসভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ‡ বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের আবাস স্থলই "পৌণ্ড্র" নামে অবিহিত; সেই পুণ্ড্রগণও দস্যু স্বরূপ অনার্য্যে পরিগণিত ছিলেন। (১) প্রাচীন অনেক গ্রন্থে বঙ্গও সেই সময়ে অনার্য্য নিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। (২) সংহিতা রচনা কালের বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হয় নাই।

ভগবান মনু প্রণীত তখনও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি স্থানে ব্রাহ্মণ বাস নিষিদ্ধ ছিল; কেবল মাত্র তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেই ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত দেশাদিতে গমনাগমন করিতেন। (১) রামায়ণ রচনার সময়েই বঙ্গে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতিঃকণা ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ-বাসের সূত্রপাত হয়। (২) চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাক্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ কামিখ্যা দেবীর স্থান কামরূপ স্থাপন করেন। প্রাক্‌জ্যোতিষপুর যাইতে হইলে, বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়; যে হেতু আর্য্য-সভ্যতা ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতেই পূর্ব্ব ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ অমূর্ত্তরজা প্রাক্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করিলেন, অথচ মধ্যস্থানে বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ আদৌ স্থাপিত হইল না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক বঙ্গদেশ নিবীড় অরণ্যপূর্ণ হইলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কোন স্থানে আর্য্যনিবাস যৎ সামান্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহাভারতের সময়ে যে বঙ্গদেশ আর্য্যগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, উহার যথেষ্ট প্রমাণই আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন বঙ্গে মহারাজ সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেছিলেন; মহাবল ভীমসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সমস্ত আর্য্যভূমি জয় করেন। পরিশেষে দ্বিতীয় পাণ্ডব বঙ্গদেশে উপস্থিত

* সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানেই "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নামে অভিহিত হইত।

† ঋক্‌বেদ সংহিতা ৩৫৩।১৪ দ্রষ্টব্য।

‡ অথর্ব্ব সংহিতা ৫।২২।১৪ দ্রষ্টব্য।

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮ দ্রষ্টব্য।

(২) ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১ দ্রষ্টব্য।

(১) "অঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।" মনুসংহিতা।

(২) তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চক্রে প্রাক্‌জ্যোতিষং পুরম্। ধর্ম্মারণ্য সমীপস্থং—ইতি রামায়ণম্।

হইয়া বঙ্গরাজ সমুদ্র সেনকে পরাজয় করিয়াছিলেন। (১) কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেও বঙ্গের ক্ষত্রিয় বীরগণ যথেষ্ট শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২) আর তীর্থ যাত্রা কালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করতঃ কলিঙ্গদেশে বৈতরনী নদীর তীরে সমুপস্থিত হন। যে স্থান মনুসংহিতায় অনার্য্য-নিবাস বলিয়া অভিহিত হইয়া ছিল, পাণ্ডবগণ তথায় "যজ্ঞিয় গিরি শোভিত সতত দ্বিজসেবিত" আর্য্য নিবাস সন্দর্শন করিয়াছিলেন। (৩) ফল কথা, তৎকালে ঋষিগণের যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বহুতর অনার্য্য-নিবাসও পবিত্র পুণ্য—ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ বৈদিক আর্য্যগণের বসতি ছিল না,—যখন কেবল অসভ্য ম্লেচ্ছগণের ও বন্য শ্বাপদ ভৈরব-নিনাদে এই বিস্তৃত বনভূমি প্রকম্পিত হইত, তখন আর্য্যগণ এতদ্দেশে আগমনে মহা-বিপদের আশঙ্কা করিতেন; কারণ এই প্রদেশে আসিলে, আর্য্য-ধর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিবারই সমধিক সম্ভাবনা ছিল। এ জন্যই বোধ হয় ভগবন্ মনু এই প্রদেশ অনার্য্য নিবাস বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। কিন্তু মনুর সময়েও তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই প্রদেশে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল না।

মনুর বহুকাল পরে আর্য্যগণ প্রবল পরাক্রমে এতদ্দেশের অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করতঃ অরণ্যাদি কাটাইয়া, নূতন নূতন নগর ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আর্য্য হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণ শূন্য হইলে চলিত না। ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যগণ এই প্রদেশে আগমন করিয়া, জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া, ম্লেচ্ছাচার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, ইহা কখন ও সম্ভবপর নহে। পুরকালে ক্ষত্রিয়রাজ-গণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ক্রিয়াই সম্পাদিত হইত না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় না হইলে চলিত না। (১)

সুতরাং মহাভারতের সময় যে বঙ্গে ব্রাহ্মণা-গমন হইয়াছিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারি বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। অপর কোন রাস্তা দিয়া কলিঙ্গে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহারাজ রঘু বঙ্গ অতিক্রম করিয়াই কলিঙ্গে সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন। (২) পুরা-কালে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন বঙ্গে মহারাজ বাসুদেব রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহার রাজ্যে কলিঙ্গের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল বলিয়া প্রমান পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাইতেছে, বহু প্রাচীন পৌরাণিক যুগ হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। কুরু

(১) সমুদ্রসেন নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
মহাভারতম্।

(২) ক্ষত্রিয় কাণ্ডের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) "এতে কলিঙ্গাঃ যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রা যজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণ মেত্যবৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥
মহাভারতম্।

(১) মনুসংহিতা ৯।৩।২২ দ্রষ্টব্য।

(২) "স তীর্ত্বা, কপিশাং সৌ নৈার্বদ্ধরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥"
রঘুবংশম্।

পাণ্ডবগণের সময়ে এপ্রদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহা নিশ্চিত রূপে বলিবার জন্য আমরা যত্নবান হইব। বৈদিক যুগে সারস্বত ব্রাহ্মণ-গণেরই সবিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারাই প্রথম কোশল, তৎপর বিদেহ বা মিথিলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। দেব বৈশ্বানর সদানীরা নদীর পরপাড় দগ্ধ করেন নাই বলিয়া, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ উক্তনদীর পরপাড়ে যাইতেন না। অধুনা বহুতর ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠান করায় উহা ব্রাহ্মণ বাস যোগ্য হইয়াছে। (১)

হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে আর্য্যক্ষত্রিয়ের অপ্রতিহত বল বীর্য্যকে, আর্য্য বৈশ্যের অতুল বিষয় বিভবকে, আর্য্য শূদ্রের অক্লান্ত শ্রমকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে পরিণত করিয়া আর্য্য-সমাজের পুণ্যস্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলে; তোমার বিধানে যে আর্য্য-সমাজে যাগ, যজ্ঞ, দান ,ধ্যানের, নিত্যই উৎসব হইত, যে আর্য্য-সমাজের নিত্য ক্রিয়া কলাপ ও চেষ্টাসমূহ দেখিলে এমন্ কি নাস্তিক ও ঈশ্বরকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া, পিতৃ-লোক ও দেবলোক মনুষ্যের অতি সন্নিহিত বলিয়া পরকালের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া বোধ করিত, এক্ষণে সেই আর্য্যসমাজ আর পারমার্থিক সমাজ নাই; ধর্ম্ম সংস্থানে, ধর্ম্মজীবন উদ্দেশ্যে আর এ সমাজের লোক সকল সমবেত নয় পরন্তু বিষয় সংস্থানে বিষয় বিভব বিস্তৃত করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার বাসনায়, সমাজের উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই এক-ত্রিত হইয়াছে হে ব্রাহ্মণ! যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত নাই, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আচারের তারতম্যে যে সমাজে উচ্চ নীচ গণনা হয় না, যে সমাজে মনুষ্যত্বের, বীরত্বের, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের প্রতিযোগিতা নাই; পরন্তু বিষয় বিভব অনুসারে যে সমাজে উচ্চ নীচ গণনা, যে সমাজে কেবল মাত্র বিষয় কোলাহল, বিষয় প্রতিযোগিতা ও কামোপভোগই যে সমাজের সমগ্র পুরুষার্থ; সেই সমুদায় সমাজকে, সেই সমুদায় দেশকে, তুমি যে ম্লেচ্ছসংজ্ঞা প্রদান করিয়া গর্ব্ব করিতে, এক্ষণে তোমারই প্রতিষ্ঠিত সেই সনাতন সমাজ ঘোর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া উন্নতি কামনা করিতেছে। এক্ষণে আর্য্য সমাজ কাহারও স্বাভাবিক বৃত্তি স্থির নাই—জীবিকার স্থির নাই সুতরাং জীবিকার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়াতে জীবিকার উপরে এক্ষণে প্রতিযোগীতা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আর্য্য সন্তানকে ২৪ ঘণ্টাকাল এক জীবিকাদায়ে শৃগাল কুক্কুরের মতন সংগ্রাম ও শ্রম করিতে হইতেছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, সকলেরই চরম উদ্দেশ্য জীবিকা হওয়াতে আর্য্যক্ষেত্রে আর বিদ্যার জন্য বিদ্যার আলোচনা নাই—ধর্ম্মের জন্য আর বীরত্বের চর্চ্চা নাই, মনুষ্যত্বের উন্নতি করিবার জন্যও আর অকপট ধর্ম্মভাব নাই। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার অতএব বৃত্তি বিধান -বর্ণ-ভেদ প্রথা অতি গুরুতর পাপ, মুখে এই কপট ভ্রাতৃভাব দেখাইয়া আধুনিক আর্য্যগণ কার্য্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে অন্নপানে বঞ্চিত করিবার জন্য বিদ্যা, বুদ্ধি, কল কৌশল লাভে সর্ব্বতোভাবে অহোরাত্র যথেষ্ট শ্রম করিতেছে। জীবিকা লাভ হইলেই যথেষ্ট, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে পারিলেই যে ক্ষেত্রে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের চরমফলে উপ-নীত হওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে সুতরাং প্রকৃত বিদ্বান্ প্রকৃত বীর ও প্রকৃত ধার্ম্মিক কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিবে। হে ব্রাহ্মণ। যে তোমার পুণ্য-

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০—১৭ দ্রষ্টব্য।

বিধানে গৃহস্থ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞকে গৃহস্থাশ্রমের প্রধান কার্য্য বলিয়া কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এক্ষণে সেই গৃহস্থাশ্রমে ভূত সেবা ও মনুষ্য সেবা হওয়া দূরে থাকুক পিতৃসেবা ও মাতৃসেবা হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। বিষয় প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, মনুষ্যত্বের, ভ্রাতৃত্বের এমন কি আশ্রমসুখ, আশ্রম ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ! যে তুমি তপোবলে আচারকে ধর্ম্মের মূল, স্বাস্থ্যের মূল—দীর্ঘ জীবনের মূল জানিয়া সমাজ সংস্থাপন আবার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া রাখিলেন, এক্ষণে সমাজ সংস্থান বিপরীত হওয়াতে এ সমাজে সম্যক্ আচার প্রতিপালন করিবার সুযোগ নাই সুতরাং বিবিধ প্রকার উৎকট উৎকট রোগ সকল সংহার মূর্ত্তি দেখাইয়া আর্য্যের পরমায়ু দিন দিন ক্ষয় করিতেছে আর্য্য জীর্ণ দেহে, ভগ্ন মনে এই জীবন ভার বহন করিতেছে। যাহা কিছু দুষ্কর, যাহা কিছু দুস্তর যাহা কিছু দুরূপ সকলই তপস্যা সাধ্য বলিয়া তপস্যার শ্রেয়ঃ সাধন মানসে তোমার বিধানে আর্য্যক্ষেত্রে কি রাজা, কি প্রজা কি কৃষক, কি বণিক, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিল। এক্ষণে সমাজ সংস্থান বিপরীত হওয়াতে তপোবলের নিদর্শন দেখিতে না পাওয়াতে লোকে আর তপস্তত্ত্বের উপর বিশ্বাস করে না সুতরাং সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ তপস্যার পথ রুদ্ধ হওয়াতে, নব নব তত্ত্বের আবিষ্কারের পন্থার রোধ হওয়াতে আর্য্যক্ষেত্রের স্ফূর্ত্তি দিন দিন ক্ষয় হইতেছে।

হে ব্রাহ্মণ ! আর্য্যসমাজে এক্ষণে সকল বিষয়েই ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত। আহারে, ব্যবহারে, শয়নে, পরিচ্ছদে, দেব দেবী মন্ত্র তন্ত্র শৌচাশৌচ সংস্কারে, ঔষধ চিকিৎসা দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন উপস্থিত। যাহা কিছু প্রাচীন তাহা ভঙ্গকর জাতীয় সমুদায় সংস্কার, জাতীয় চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ কর এবং রাজশ্রীর অস্তিত্বে মিশাইয়া উন্নতি কামনা কর এই বীজ মন্ত্র। আর্য্যক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এ যাবৎকাল কত শত প্রগাঢ় মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের আবির্ভাব হইল, কত কোটী কোটী লোকের সমাগম হইল, কিন্তু হে ব্রাহ্মণ ! তোমার বিধান ও শাস্ত্র উপদেশের উপর কাহারও কখন বুদ্ধি ক্ষোভ বা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই—কিন্তু এক্ষণে কালের কি মায়া, বাল্যসংস্কারের কি প্রভাব। নবীন আর্য্যগণ মিল্ কোমট ইত্যাদি রাক্ষসী মায়া অবলম্বনে পজিটিভিষ্ট হইতে পারেন, অলৌকিক ক্ষমতা লাভ প্রত্যাশায় ইংরেজ গুরুর শিষ্য হইয়া থিওছফীষ্ট হইতে পারেন এই সকলেরই জন্য আধুনিক আর্য্য-জাতিত্ব, জাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের উপর বাল্যকালাবধি তাঁহার এমনই কুসংস্কার, যে ইহার জন্য তিনি এক কপর্দ্দিকও ব্যয় করিতে চাহেন না—ইহার জন্য এ কটুত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেই বিস্তর অপকার্য্য করিলেন, এই বোধে তাঁহার মনে গ্লানি উপস্থিত হয়।

হে ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কি এই সব পরিবর্ত্তন, এই সকল অনাচার, অবিচার অত্যাচারে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই, সত্য সত্যই কি ভারতের উপর তোমার এরূপ নির্ব্বন্ধ হইয়াছে যে তুমি ইহার সকল বিষয়েই নিদ্রিত ভাব ধারণ করিয়া থাকিবে, সত্য সত্যই কি হিন্দুগণ আর ধর্ম্মভাবে একতা লাভ করিবে না, যে সমাজে পুণ্য সঞ্চয় অনায়াসলব্ধ বলিয়া দেবতারা ও

স্বর্গলোক পরিত্যাগ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন সত্য সত্যই কি তাই সমাজের পরিণাম এইরূপ ঘটিল, ব্রাহ্মণ্যদেব! কোন পাপে আর্য্যের বুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল যে সে বিষয় লালসা প্রেরিত হইয়া জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য দেহ মন সুস্থ করিয়া আত্মোন্নতি ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের ও পরকালের বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইল, কোন্ পাপেই বা আর্য্যসমাজে আর তপস্যার চর্চ্চা নাই, স্বাধীন চিন্তা শীল গ্রন্থকার, প্রকৃত বীর পুরুষ, দানধর্ম্ম নিরত অতুল বিষয় বিভবশালী লোক সকলও আর জন্মগ্রহণ করে না, পরন্তু রুগ্ন দেহ ও ভগ্নমনা পুরুষের সংখ্যা অধিক হইল! ব্রাহ্মণ্যদেব! আমাদিগকে এইসব কথার নিগূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দেও যাহাতে আমরা তোমার উপদেশ সমূহকে তোমার বেদ বেদাঙ্গ, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সকলকে বুদ্ধির সন্নিহিত করিয়া তোমার অনুসরণ করিতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় আপ্ত বচনের প্রমাণে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে চলিবে না পরন্তু বিংশশতাব্দীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ইত্যাদি আর্য্যধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমূহের ধর্ম্ম কি বুঝাইয়া দাও। ব্রাহ্মণ্যদেব! তুমি আর্য্যের হিত-কামনায় আবার জাগ্রত হও আর্য্যসমাজ হইতে রোগ, শোক দুঃখ দারিদ্র্য অন্তর্হিত হউক; জ্ঞানানন্দে, বিষয়ানন্দে আবার আর্য্যমুখ উদ্ভাসিত হইতে থাকুক আবার জগৎ দেখুক, দেহ মন আত্মার সভ্যতা কাহাকে বলে, দানও ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা কি, তপো বলের অসাধ্যই বা কি আছে; প্রকৃত বীরত্ব এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব কাহাকে কহে। এই সব কামনায় আমরা বারম্বার তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার উদ্বোধন করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

(সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যদি মৎস্যের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্পদিনে যে খুব লাভবান হইতে পারিবেন, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। দেশে দিন দিন যেরূপ মৎস্যের অভাব হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, এই সময়ে মৎস্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওবার কোনই আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ যৎসামান্য মূলধন দ্বারাই আরম্ভ করা যাইতে পারে ও আমাদিগের প্রকৃতির উপযোগী সামান্য পরিশ্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে। কলিকাতা মহানগরীর কোন এক প্রসিদ্ধ ধনী একদিন বলিয়াছিলেন, "একটি টাকা মূলধন লইয়া অল্পসময়ের মধ্যে একলক্ষ টাকা করিতে হইলে মৎস্যের ব্যবসায়।

মৎস্যের কারবার অনেক রকমে করা যাইতে পারে। যাঁহাদিগের মূলধন নিতান্ত কম, অথচ বেশী লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রথমতঃ মৎস্যের চাষ করাই উচিত। আর যাঁহারা বেশী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহারা শুধু পুকুরে চাষ না করিয়া বড়বড় নদী হইতে মৎস্য ধরাইয়া বিক্রয় করিতে পারেন। মৎস্যের ব্যবসায় যত রকম করা যাইতে পারে তাহা আমরা ক্রমে নিম্নে লিখিলাম।

১। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ গৃহস্থবর্গেরই আপন আপন বাড়ীর সীমার মধ্যে দুই একটি পুকুর আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে স্ব স্ব পুকুরে রীতিমত মৎস্যের চাষ করিয়া, আপনাদিগের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় মৎস্যের পূরণ করিতে কিম্বা বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহাদিগের

সুবিধানুরূপ পুকুর নাই, অথবা যাঁহারা সহরবাসী, ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে কি সহরে দুই একটি পুকুর জমা লইয়া মৎস্যের চাষ করিতে পারেন। পল্লীগ্রামে পুকুর জমা লইতেও অধিক টাকার প্রয়োজন হয় না, দুই তিন বিঘা জলকর এমন এক একটি পুকুর বার্ষিক ১৫।১৬ টাকা খাজনায় পাওয়া যাইতে পারে, তবে স্থান বিশেষে অর্থাৎ সহরে কি সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের পুকুরগুলির খাজনা কিছু বেশী হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক যদি নিজের পুকুর থাকেত ভালই, নতুবা সুবিধা অনুসারে বৎসরের শেষে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে মৎস্যের ডিম্ব ফুটান যাইতে পারে, এমন পুকুর জমা লইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশস্থ পুকুর সমূহে সাধারণতই কিছু কিছু মৎস্য থাকিতে দেখা যায়, ঐ সকল মৎস্যের অধিকাংশই শাল, বোয়াল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয়, অতএব এই হিংস্র জাতীয় মৎস্যগুলি ধরিতে যেন ভুল না হয়। সময়ে এই সকল মৎস্য পুকুরে এত প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে তাহা বিক্রয় করিলে অনায়াসে পুকুর পরিষ্কার ও মৎস্য ধরাইবার ব্যয় উঠান যাইতে পারে, এমন কি যদি সুবিধা হয়, তবে ঐ ব্যয় উঠাইয়া ভাবী মৎস্যের চাষ করিবার জন্য কিছু মূলধনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাসের প্রথমে পুকুরে ডিম ছাড়িবার পূর্ব্বে, আর একবার পুকুর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, তৎপর রোহিত, মিরগেল কাতলা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব মূলধন অনুসারে ক্রয় করিয়া ছাড়িতে হইবে; উক্ত মৎস্য সমূহের এক এক ভার ডিম্ ছয় সাত টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে, পুকুরে ডিম্ ছাড়িবার এক সপ্তাহ পরে, ডিম্ ফুটিলে পর আর এক সপ্তাহ কাল রীতিমত খাদ্য প্রদান করিয়া একটু বৃদ্ধি করত অনায়াসে বিক্রয় করা যাইতে পারে। যাঁহারা কিছু বেশী মূলধন (অন্তত একশত টাকা) লইয়া মৎস্যের চাষ করিতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সময়ে বিক্রয় না করাই যুক্তিসঙ্গত। রীতিমত মৎস্যের চাষ করত ভোঁদড় (উদ্) ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া এক বৎসর অন্তে বিক্রয় করিলে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহাদিগের মূলধন নিতান্ত কম, কি একভার ডিমের অধিক ক্রয় করিবার সুবিধা হয় না, এবং নিজের দুই একটি পুকুর ব্যতীত আর পুকুর নাই, কিম্বা জমা করিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারাই উল্লিখিত রূপে বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত পুকুরে চারি পাঁচবার ডিম্ ফুটাইয়া অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারা যায়, এবং শেষের বারে যে সকল ডিম্ ফুটান যাইবে তাহার কিছু বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চাষের জন্য রাখা যাইতে পারে।

২। যাঁহাদিগের কোন রকম পুকুর নাই কিম্বা জমা করিয়া লইবার সুবিধা হয় না, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও মৎস্যের ব্যবসায় করিতে পারেন। যাঁহারা মৎস্যের চাষ করেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিম্বা মৎস্যের আড্ডা হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া লোক রাখিয়াই হউক কি অন্য কোন উপায়েই হউক বাজারে খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিতে পারা যায়। এইরূপে মৎস্যের ব্যবসায় করিতে হইলেও বেশী মূলধনের আবশ্যক করে না, দশ বার টাকা কি ইহার ন্যূন হইলে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৩। যাঁহারা মৎস্যের চাষ করিতে ইচ্ছা করে না, অথচ কিছু বেশী মূলধন লইয়া কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ, পাড়ুয়া, মুঙ্গের প্রভৃতি মৎস্যপ্রধান দেশ হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতা কি অন্যান্য প্রদেশে চালান দিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আজকাল এতদ্দেশে রেলওয়ের বিস্তার হওয়াতে 'চালানী' কারবার সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যে সকল স্থলে রেলওয়ের সুবিধা নাই, কিম্বা যদি কোন স্থলে জীয়ন্ত মৎস্যের চালান পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে নৌকা দ্বারা কি অন্য কোন উপায়ে অনায়াসে প্রেরণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এতদঞ্চলে কই, মাগুর, শোল ইত্যাদি যে সকল জীয়ন্ত মৎস্যের আমদানী হয়, তাহা সমস্তই নৌকায় আসিয়া থাকে। চালানী ব্যবসায়ীগণ শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলার বিলাঞ্চল হইতে এই সকল জীয়ন্ত মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং ইহাদিগকে সংগ্রহ করিতেও বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। বিলাঞ্চলবাসী জিয়ানী, নিকারী ও অন্যান্য মৎস্য ব্যবসায়ীগণ, বড় বড় বিল হইতে মৎস্য ধরিয়া স্থানীয় হাট বাজারে আমদানী করিয়া থাকে, ঐ সকল হাট বাজার হইতে চালানী ব্যবসায়ীগণ মৎস্য ক্রয় করিয়া নৌকা বোঝাই করত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করে। ২৫০।৩০০ মণ মাল ধরে এমন এক এক খানি নৌকা ৩।৪ দিনে অনায়াসে বোঝাই করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ যাহারা পূর্ব্বোক্ত জিয়ানী কি নিকারীদিগকে কিছু অগ্রিম বা "দাদন" দিয়া রাখে তাহাদের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। দাদনপ্রাপ্ত জিয়ানী কি নিকারীগণ, দাদন দাতার নিকট মৎস্য বিক্রয় না করিয়া অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারে না এবং বাজার দর অপেক্ষা ইহাদিগের কিছু সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকে।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এতদ্দেশে কই, মাগুর প্রভৃতি যে সকল জীয়ন্ত মৎস্যের আমদানী হয়, তাহা দেখিতে বড়ই বিশ্রী, দেহের অংশ শুকাইয়া যাইয়া কেবল মাথাটি অবশিষ্ট থাকে, এবং খাইতেও তত সুস্বাদু হয় না। এইরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নয়, মৎস্য ব্যবসায়ীগণ অজ্ঞতা বশতঃ মৎস্য ধরার পর হইতে নিরীহ মৎস্য সমূহকে কিছুই আহার দেয় না, এবং এক এক খানি নৌকায় এত অধিক মাছ বোঝাই করে, যে ইহারা যৎসামান্য রূপেই একটু নড়িতে চড়িতে পারে। এমন কি, আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, অনেকে প্রত্যহ নূতন জল না দিয়া ৩।৪ দিন অন্তর জল পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় এই সকল জীয়ন্ত মৎস্য সবল ও সুশ্রী অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার কোনই আশা করা যাইতে পারে না, ইহাদিগের জীবন নিতান্ত কঠোর করিয়া তবু এক রকম জীবিত থাকে।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্তরূপ চালানী কারবার সাধারণতঃ শীত কালেই বেশী হয়, কারণ ঐ সময়ে বড় বড় নদীতে বড় একটা তুফানের আশঙ্কা থাকে না। শীত ঋতুতে ঢাকা ও ফরিদ পুরের বিলাঞ্চল হইতে এক এক খানি বোঝাই নৌকা ৭।৮ দিনে অনায়াসে এতদঞ্চলে পৌঁছিতে পারে। অধিকাংশ চালানী ব্যবসায়ীদিগের বড় বড় আড্ডায় এক এক জন মোকামী থাকে, ঐ সকল মোকামীগণই প্রত্যহ খুচরা হিসাবে স্থানীয় জেলেদিগের নিকট মৎস্য বিক্রয় করে।

যাহাদিগের মোকামী নাই তাহারা কোন আড়তদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এইরূপে আড়াই শত মণী এক এক খানি নৌকার মৎস্য ১০। ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

রোহিত, মিরগেল, কাতলা প্রভৃতি পোনা মৎস্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ হইতেও সময়ে সময়ে বিস্তর আমদানী হয়। কিন্তু ইলিশ মৎস্য গোয়ালন্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী বেলগাচি, রাজবাড়ী ভিন্ন অন্য কোন স্থল হইতে বড় বেশী আমদানী হয় না। এবং ঐ সকল স্থান হইতে ইলিশ মৎস্যের চালান যাইয়া থাকে, এই জন্যই কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় ইলিশ মৎস্যের আমদানী অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। গোয়ালন্দের নীচে পদ্মানদে জেলেগণ ব্যবসার্থ মৎস্য ধরে, তাহাদিগের নিকট হইতে নিকারী বা চালানী ব্যবসায়ীগণ মৎস্য ক্রয় করিয়া বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালান দেয়। রেলওয়ে দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালান মৎস্য পাঠাইতে ইহাদিগকে বিশেষ কোন কষ্টও স্বীকার করিতে হয় না। মৎস্য ক্রয় করিয়া ঝুড়ি বোঝাই করত কলিকাতা কি অন্যান্য প্রদেশে আপন আপন এজেণ্টের নামে প্রেরণ করিয়া থাকে, এবং এই সকল এজেণ্টগণ স্থানীয় জেলেদিগের নিকট ঝুড়ি হিসাবে বিক্রয় করে। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা মৎস্য পাঠাইতে হইলে, আজ কাল মণকরা দেড় টাকা হিসাবে রেল ভাড়া দিতে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিক টাকার ইলিশ মৎস্যের ক্রয় বিক্রয় "হালি"। কিম্বা কুড়ি হিসাবে হইয়া থাকে। মৎস্য যখন অত্যন্ত ধরা পড়ে তখন এক পয়সায় এক হালি কি দেড় হালি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারা যায়, এমন কি অত্যন্ত সুলভ প্রযুক্ত সময়ে সময়ে খরিদদার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অপর্য্যাপ্ত মৎস্য যে প্রত্যেক বৎসরেই ধরা পড়ে তাহা নহে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে মাছ খুব বেশী ধরা পড়ে, এবং সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই সময়ে এক টাকায় আট নয় হালি ক্রয় করিতে পারা যায়, কিন্তু শীতকালে এক টাকায় ছয় সাত হালির বেশী কদাচিৎ বিক্রয় হইয়া থাকে, কারণ এই সময়ে মাছ খুব কম ধরা পড়ে।

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

ভূমিকম্প।

জ্যোতিষ শিক্ষার্থীগণের পক্ষে ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের লাহোরের ভূমিকম্প বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত কি না, তাহার প্রমাণ এরূপ সুন্দরভাবে পাওয়া সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। যদ্যপি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিনা পরীক্ষায় অগ্রাহ্য না করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুশীলন করেন তাহা হইলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং জগতের অনেক ঘটনাই যে গ্রহদিগের আকর্ষণশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

যে শাস্ত্র দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে কোন দিনে বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে পারে জানিতে পারি, সে শাস্ত্রের উপকারিতা যে

কত বহুমূল্য তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপার যে ঘটিবার বহুপূর্ব্বে জানা আধুনিক কালে অসম্ভব, তাহা নহে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সামান্য আলোচনায় ইহা স্পষ্ট জানা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ (অবশ্য সকলেই নহে) জ্যোতিষশাস্ত্র আর্য্যদিগের কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করেন।

কিন্তু যে অবিশ্বাস অনুসন্ধান না লইয়াই যে কোন বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা সর্ব্বাংশে বিপদজনক এবং যার পর নাই ঘৃণিত। যাহা অনুসন্ধান না লইয়াই ঘটনায় আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকে সে রূপ অন্ধ বিশ্বাসও বরং ভাল, কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারী অবিশ্বাস অজ্ঞানতারই একরূপ প্রকার ভেদমাত্র। আগন্তুক ঘটনা সমূহে অতি সামান্য কারণেই আদ্যোপান্ত মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করে, এরূপ অদূরদর্শী ছিদ্রান্বেষী বিরুদ্ধবাদীর কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু উক্ত বিষয় যতই কেন দুরূহ এবং মানব-শক্তির সাধ্যাতীত হউক না, যিনি ধীর, প্রশান্ত এবং ক্লেশসহিষ্ণু পরীক্ষক, যিনি প্রকৃতির প্রতীক্ষায় সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং অতি সন্তর্পণে প্রকৃতি দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনিই কেবল মাত্র কোন নূতন সত্য প্রচারে সমর্থ হন। যদি বিজ্ঞানোৎসুকগণ বুঝিতে পারিতেন যে তাহাদের যথেচ্ছবিচার-বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় অবিশ্বাস দ্বারা তাঁহারা যে এত ভালবাসেন সেই বিজ্ঞানকে কতদূর হীন প্রভ করিতেছেন তবে তৎপ্রতি নিশ্চয়ই অধিক উদারতা ও অমায়িকতা প্রদর্শন করিতেন। এই মন্তব্য হইতে স্বতঃই মনোমধ্যে অন্য একটী ভাবের উদয় হয় তাহারা কি যথার্থই বিজ্ঞানামোদী না বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাহাদিগের উপজীবিকা স্বরূপ? যদ্যপি তাহাদিগের বিজ্ঞান-প্রীতি অকৃত্রিম হইত তবে বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান বৃক্ষে যে সুফল প্রসূত হইত সন্দেহ নাই, এবং এই সংশয়ও সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইতেছে কারণ যথার্থ বিজ্ঞান উপাসক এবং অকৃত্রিম বিজ্ঞানামোদী ব্যক্তিগণ সকলেই সরল-প্রকৃতি বিশিষ্ট, কুসংস্কার-শূন্য এবং অনুসন্ধিৎসু;—প্রত্যেক নূতন অনুমানের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক নূতন বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উদ্ধত প্রকৃতি বা আত্মম্ভরী নহেন, কিন্তু বিনীত এবং বিবেকবুদ্ধিযুক্ত অনুসন্ধানকারী। তাহারা স্বকীয় অবিজ্ঞতা ও অযোগ্যতা বুঝিতে পারেন এবং জানেন যে তাহারা প্রকৃতির কার্য্য বুঝিতে এখনও নিতান্ত ক্ষীণ শক্তি এবং প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে কখনই তাহারা সাহসী হন না অথবা প্রকৃতির শক্তির কোন সীমা নির্দ্দেশও করেন না। তাহারা সন্তুষ্ট মনে স্বীকার করেন যে কোন তত্ত্ব নূতন বলিয়া সন্দেহ করিবার কিছু নাই, কারণ উহা সত্য হইতেও পারে। কেবল তাহাদিগের স্বকীয় ঘটনা সমষ্টির জ্ঞান নিতান্ত সামান্য বলিয়া এবং যে পথ অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাও অনিশ্চিত রহস্যের মধ্যে স্থাপিত বলিয়াই অসম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বদাই প্রমাদপূর্ণ। অতএব যে কোন প্রদেশেই প্রজ্জ্বলিত হউক না কেন, পৃথ্বীপ্রান্তোদ্ভাসিনী প্রতি আলোক রশ্মিকে অপরিচিত অভ্যাগত প্রায় আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে, প্রফুল্লমনে এবং সাদরে অভ্যর্থনা করা উচিত।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক জ্যোতিষ-শাস্ত্র দ্বারা গণনা পূর্ব্বক গ্রহগণের সঞ্চার নির্ণয় করিয়া ভূমিকম্প সংঘটন, পূর্ব্ব হইতে স্থির করা যায় কি না। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকম্পের সাধারণ কারণাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সাধারণতঃ সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের অল্প-কাল পরেই ভূমিকম্প সম্ভাবিত হইয়া থাকে।

২। ভূমিকম্প সময়ে গ্রহদিগের মধ্যে '৬০, ৯০, ১২০, বা ১৮০ অংশ ব্যবধান থাকে অথবা কয়েকটী গ্রহ একত্রেও অবস্থান করে; এবং পূর্ব্ববর্ত্তি গ্রহণ পরিবেশ কালে অথবা পূর্ণিমা বা অমবস্যায় গ্রহদিগের বিশেষতঃ রবি ও চন্দ্রের— অবস্থিতি স্থান হইতে উক্তরূপ ব্যবধান দৃষ্ট হয়।

৩। যৎকালে গ্রহগণ বিশেষতঃ ইন্দ্রগ্রহ (uranus) শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল, বৃষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তৎকালে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৪। বৃহস্পতি যৎকালে শুক্র বা বুধ হইতে ১৮০ অংশ ব্যবধানে, একত্রে অথবা সমান্তরল ভাবে—বিশেষতঃ বৃষ বা বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান কালে—থাকিলে, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৫। যৎকালে বহুগ্রহ রবিকাষ্ঠা প্রদেশে (Tropics) বা নিরক্ষবৃত্তে অবস্থান করে, তৎকালে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

৬। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায়, বৃহস্পতি বা শনি যে স্থানের শম্যোত্তর রেখা (Meridian) বা অধঃস্বস্তিকে (Nadir) অবস্থান করে সেই স্থানেই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসুগণ ঘটনা অতিবাহিত হইবার পর বিজ্ঞ হইয়া থাকেন। কিন্তু, উপরোক্ত নিয়মাবলীর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে যে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ গণনার ন্যায়, ভূমিকম্পও নির্ণয় করা যায়। এজন্য উক্ত নিয়মের সত্যতা অবগতির জন্য দেখান যাইতেছে যে বিগত ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লাহোরের ভীষণ ভূমিকম্পের সহিত জ্যোতিষ নির্ণীত গ্রহগণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

৪ঠা এপ্রিলের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয়। লাহোরে রাত্রি ১১টা ৪৯ মিনিটের সময় গ্রহণ আরম্ভ হয়। উক্ত সময়ে শায়ন বৃশ্চিকরাশির ১৭ অংশ ৫৩ কলা উদিত হইতেছিল, সুতরাং লগ্ন হইতে চতুর্থ গৃহের আরম্ভ স্থান অর্থাৎ অধঃস্বস্তিক কুম্ভরাশির ২৪ অংশ ৩ কলা, এবং শনিও উক্ত সময়ে কুম্ভ-রাশির ২৪ অংশ ১৯ কলায় অবস্থান করিতেছিল। উপরোক্ত ষষ্ঠ নিয়ম হইতে উক্তস্থানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক উক্ত সময়ে গ্রহগণ কিরূপে অবস্থান করিতেছিল নিম্নে গ্রহগণের রাশ্যাংশাদি প্রদত্ত হইল।

রবি রাশ্যাদি ১১।০।২৮
চন্দ্র রাশ্যাদি ৫।০।২৮
মঙ্গল রাশ্যাদি ৭।১৬।৯
বুধ রাশ্যাদি ১০।১৫।৩২
বৃহস্পতি রাশ্যাদি ০।২৬।৫১
শুক্র রাশ্যাদি ০।১৬।১৯
শনি রাশ্যাদি ১০।২৪।১৯
ইন্দ্র রাশ্যাদি ৯।৩।১৬

উক্ত সময়ে মঙ্গল বৃশ্চিক রাশিতে এবং বুধ তথা হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত। তৃতীয় নিয়মানুসারে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। এক্ষণে কবে উক্ত ঘটনা সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

প্রথম নিয়মে কথিত হইয়াছে যে গ্রহগণের অল্পকাল পরে ভূমিকম্প হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় নিয়মানুসারে উক্ত গ্রহ সংস্থান হইতে কবে গ্রহ

সকলের মধ্যে ৬০, ৯০ অংশ প্রভৃতি ব্যবধান হইবে দেখা যাউক।

উক্ত গ্রহণের পরবর্ত্তী ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মঙ্গল গ্রহ বৃশ্চিক রাশির ২৫ অংশে বক্রী হইবে এবং গ্রহণ কালের শনির অবস্থিতি স্থান হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে আগমন করিবে, সুতরাং তৃতীয় নিয়মানুসারে উক্ত দিবসই ভূমিকম্পের বিশেষ সম্ভাবনা।

বিগত ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে ৬টা ১০ মিনিটের সময় লাহোরে বাস্তবিকই ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছিল, ভারতে এ প্রকার ভীষণ ভূমিকম্প কখনও হয় নাই।

উক্ত সময়ে সায়ন মেষরাশির ২০ অংশ ৪৭ কলা উদিত হইতেছিল। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বৃষরাশিতে ও মঙ্গল শনি হইতে ৯০ অংশ ব্যবধানে বৃশ্চিক রাশিতে ও লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে (মারক স্থানে) অবস্থিতি করিতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মানুসারে ভূমিকম্পের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সংঘটন গুলির মধ্যে উপরোক্তরূপ সংঘটন আকস্মিক অভ্রান্ত লক্ষণ।

উপরোক্ত ঘটনার ন্যায় অন্য সমস্ত ভূমিকম্পও উক্ত নিয়মাবলীর সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

কি কারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে ডাক্তার প্রিষ্টলী ও ডাক্তার স্ক্রুয়ী বৈদ্যুতিক আকর্ষণে ভূমিকম্পহয় বলেন। তাঁহাদের মতই আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ, যদি গ্রহদিগের আকর্ষণে ভূমিকম্প সূচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণই ইহার প্রকৃত কারণ হইবে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এ বিষয় মীমাংসিত হইবে। যাহা হউক, গ্রহগণের যেরূপ সংঘটন বশতঃ এতাদৃশশোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা সকলের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে, তাহা সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত,—সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

"কত চতুরানন, মরি মরি,
যায়ত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমায়ত,
সাগর-লহরী-সমানা।"

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিশাস্ত্রী, F. C. S.

২১।১।১, নবাব্দী ও প্তাগরের লেন, কলিকাতা।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

অর্জ্জুন—তাই কেন বলনা "যাহা হয় হউক তুমি আমার কথামত যুদ্ধ কর ?"

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি যে পণ্ডিত সাজ তাই বলি। তুমি ভক্ত হইলে ও সময়ে সময়ে জ্ঞানী হইতে চাও। যখন ভক্ত থাক তখন তুমি আমার; কাজেই তোমার কিছুই নাই, আমি যাহা বলিব তাহাই তোমার কার্য্য। ভক্তের কোন বিচার থাকে না। প্রিয় বস্তুর অস্তিত্বেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব। সে যাহাই বলুক ভক্ত তাহাতে দ্বিরুক্তি করে না। দ্বিরুক্তি তাহার আসে না। ভক্তের অহং নাই। তাহার অহংকেই ভক্ত অহং করিয়া কার্য্য করে। তুমি এইরূপ থাকিলে এতক্ষণ আমার এ সমস্ত কথা বলিতে হইত না। কিন্তু তুমি একটু জ্ঞানী সাজিয়াছ এজন্য একটু অবিশ্বাস সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে আসিয়াছে আমি

তোমার সমস্ত কথা বুঝিতেছি না এইরূপ তুমি ধারণা করিতেছ তাই তুমি তোমার হৃদয়ের সংশয় গুলি বলিতেছ। সংশয়গুলি কিছুই নয় কেবল তুমি আমা হইতে পৃথক হইয়াছ, কাজেই তোমার ভাব আমি বুঝিতে পারি না এইমাত্র ভাবিতেছ। জ্ঞানী হইতে চাও আমি তোমায় জ্ঞানী করিতেছি। জ্ঞানে "তুমিই আমি।" আমরা অভেদ। কাজেই তোমার কথা স্বতন্ত্র আমার কথা স্বতন্ত্র এরূপ নহে তখন দুই নাই এক। এখানে দেহ আছে, কিন্তু দেহ জড় তুমি আমি এক চৈতন্য দুই দেহে এক সঙ্গে এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। যেমন দুই বটে, এক আকাশ অখণ্ড অথচ পূর্ণভাবে থাকে সেইরূপ। তবেই দেখ আমাকে কিছুই বলিতে হয় না আমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তৎক্ষণাৎ তোমার আমার উভয়ের শরীর দ্বারা তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত হয়। তবেই দেখ জ্ঞানী ও ভক্ত একই। জ্ঞানী সাজিলেই পাপ পুণ্য। আমার ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছা হইল না তখন তুমি আমি স্বতন্ত্র। তোমাকে যে উপদেশ দিতেছি তোমায় আমায় এক হইব বলিয়া। ভক্তের সম্মুখে তাহার আরাধ্য বস্তু থাকা চাই প্রিয় বস্তুর কথা কওয়া চাই সে জড়বৎ, যাহা বলা যায় তাহাই করিয়া চলে তাহাতেই তাহার আনন্দ আর জ্ঞানীর কোন আকারের আবশ্যক নাই; কোনরূপের আবশ্যকতা নাই জ্ঞান মার্গে পতনের ভয় বেশী। ভয়ঙ্কর তাহা নাই। সঙ্গে সর্ব্বদাই প্রিয়বস্তু রহিয়াছে সে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। তোমাকে জ্ঞান যোগ দিয়া ভক্ত করিয়া লইতেছি পরে যাহাই বলিব তুমি তাহাই করিবে, পাপ পুণ্য কিছুই বিচার আসিবে না। তুমি আমার বড়ই প্রিয় সকলেই প্রিয়। কখন আমি সম্মুখে থাকিয়া আজ্ঞা করি; দেখিতে পাও না পাও স্বধর্ম্ম পালন কর ইহাই তোমার কার্য্য ইহাতে পাপপুণ্য আমার। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহা বলি তাহাই তাহার কার্য্য। দেখ অর্জ্জুন শোক মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই লোকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে এরূপ ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে বলা বৃথা। এজন্য আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহার উপস্থিত শোক দূর করিতে হয়। যখন ধারণা হয় দেহ জড় ইহার জন্য শোক মোহ অনুভব নাই আর আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহাতেও শোক মোহ স্পর্শ করে না, তবে কে কাহার জন্য দুঃখ করে? যখন উপস্থিত শোকের লাঘব হয় নাই সময়ে স্বধর্ম্ম পালন না করিলে কিরূপে অনিষ্ট হয় ও পরমার্থ নষ্ট হয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হয়। এইরূপে চিত্তমল দূর করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মের উপদেশ হয়। আপনি কর্ম্ম করি ও করিতে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা জন্মিলে পুনর্ব্বার তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হয়। অর্জ্জুন! আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব বিচার ও লৌকিক স্বধর্ম্ম বিচার দ্বারা কর্ম্ম করিবার পথে আনিতেছি শোন। যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইবে ও পরে আত্মদর্শন লাভ করিতে পারিবে। তখন কর্ম্ম তোমার পক্ষে অনাবশ্যক হইলে ও কেবল জগতের হিতের জন্য আমি যে ভাবে কর্ম্ম করিতেছি তুমি ও সেই ভাবে কর্ম্ম করিবে অথচ কোন প্রকার কর্ম্ম বন্ধন বা সংসার হইবে না।

অর্জ্জুন—সাংখ্য কি?

ভগবান—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত আছে বলিয়া উপনিষদ্‌কে সাংখ্য বলে। ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের নাম সাংখ্য জ্ঞান। পরবর্ত্তী শ্লোকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছি।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

ভগবান—কামনা অর্থ পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগের ইচ্ছা। যেখানে ভোগেচ্ছা নাই অথচ কর্ম্ম করিতেছ, কেবল আমার আদেশ প্রতিপালনার্থ আমার প্রীতির জন্য সেখানে কর্ম্ম নিষ্কাম।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম যোগের বিঘ্ন ঘটিলেও নিষ্ফলতা নাই কেন ?

ভগবান—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে কৃষিকর্ম্মফলের বিঘ্ন ঘটে কিন্তু আমার আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিতেছ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই তুমি শুধু কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ আমি ফলদাতা এই নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কিরূপে ? যতটুকু হইবে ততটুকু আমি তোমার হইব। আমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করাই আমার আরাধনা। কর্ম্ম করিয়াছ তুমি আমার নিকট পুরস্কার চাহিতেছ না। আমার আদেশ মত কর্ম্ম করাতেই তোমার প্রীতি। ফল আমার হাতে এজন্য আমাকে অর্পিত কর্ম্মকে অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশ মত কর্ম্ম বা শাস্ত্র বিহিত আমার উপদিষ্ট কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এ কর্ম্মে কোন বিঘ্ন নাই।

অর্জ্জুন—সুচারুরূপে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে এ কর্ম্ম করিতে না পারিলেও পাপ হয় না কেন ? সংসার ভয়ই বা যায় কিরূপে ?

ভগবান—যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মে অঙ্গহীন হইলে ঠিক ফল লাভ ত হয় না বরং যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর অমঙ্গল সাধিত হয়। এই সমস্ত বিঘ্নের মূল কারণ ফলানুসন্ধান রাহিত্য। কিন্তু ফলানুসন্ধান রাহিত্যই নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব। তুমি যেরূপ ভাবেই এই কর্ম্ম কর না কেন আমি বুঝিতেছি আমার আদেশ মত এই কর্ম্ম করিতেছ। আমার আদেশ মত এই কর্ম্ম করিতেছ। আমার আরাধনার্থ আমার সন্তোষার্থ তোমার এই নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেছে। তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ এজন্য তোমার মনে আনন্দ থাকিবেই। আনন্দ আত্মার স্বরূপ তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই। আমাকে বিস্মৃত হইলেই দুঃখ। বিশেষ আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিতে যখন তোমার বিরক্তি বোধ হয় তখন আমার উপর তোমার প্রীতি নাই নিশ্চয়ই। আমার উপর অনুরাগ রহিয়াছে এজন্য আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিয়া তোমার পাপ হইবে না। যেরূপ করিয়া কর্ম্ম কর না কেন যতটুকু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে পারিয়াছ তাহাতেই তুমি প্রাণে প্রাণে ধারণা করিয়াছ 'তুমি আমারই'। এই 'আমি তোমারই' ইহাই ভক্তিযোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ একই। এই কর্ম্মে সর্ব্বদাই আমার স্মৃতি থাকে এজন্য ইহাতে সমস্ত পাপ দূর হয়, সংসারে ভয় থাকে না। যে সর্ব্বদা আমার স্মরণ করে তাহার কোন প্রকার ভয় থাকে না।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্মের অল্পমাত্রাও মহৎ সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান—জনম মরণই সংসার ভয়ের লক্ষণ। অমুক সুন্দর সংসার করিতেছে ইহার অর্থ এই যে তাহার অর্থের সংস্থান আছে ; অন্নকষ্ট নাই, পরিবার মধ্যে শান্তি আছে। কাহারও রোগ শোক নাই বেশ সংসার। সংস্থান করি কেন ? যদি অন্ন না থাকে খাইতে পাইব না। পুত্র কন্যাদি না খাইতে পারিয়া মরিবে। উহাদিগকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করা চাই। অর্থ সঞ্চয় সুখ আছে অর্থাৎ অর্থ দ্বারা রোগাদি নিবারণ হইবে, ভালরূপে আহার নিদ্রা চলিবে, মন কোন কিছুর অভাবে অসুস্থ হইবে না। অন্য লোককেও

সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব। যেদিকে দেখ মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষার জন্য সংসার। ভাল খাইতে পাইতেছি না মরিয়া যাইব। ভাল নিদ্রা হয় নাই অসুখ হইবে মরিয়া যাইব। পরিবার মধ্যে অশান্তি জীবন ক্ষয় হইতেছে, সর্ব্বত্রই এই ভয় হইতে রক্ষার চেষ্টা জীব করিয়া থাকে। কিন্তু লোক জীবন ধরিয়া সংসার করে মৃত্যু ভয় যায় কি? অর্থ স্ত্রী পুত্রাদির বস্ত্র, অলঙ্কার, পুরুষানুক্রমে সুখে থাকিবার জন্য সংস্থান করিতেছে, মৃত্যুভয় নিবারণ হয় কি? হইতে পারে না। সংসার বা মৃত্যুভয় নিবারণের একমাত্র উপায় আমাকে স্মরণ করা। সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ। যে আমার স্মরণ করে তাহার চিত্ত আমার আকারে আকারিত হইয়া যায় এবং আমার মত সেও আনন্দে থাকে। আমাতে দৃঢ় ভাবনা বা দৃঢ় স্মরণ থাকিলেই তাহার প্রাণে সর্ব্বদা আনন্দ থাকে। যেখানে দৃঢ় আনন্দ সেখানে ভয় কোথায়? সন্তান জননীর নিকট থাকিলে কোন সঙ্গীকে ভয় করে না। রক্ষাকর্ত্তার নিকট ভয় কিরূপে থাকিবে? ভক্ত ভগবানের কাছে থাকিলে মৃত্যুকে ডরায় না। সে সর্ব্বদাই দেখে আমার ভগবান আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। মৃত্যুকে সে এই রক্ত মাংসময় এই নিতান্ত মলিন দেহ দিয়া আতিবাহিক দেহে নিত্যপ্রিয় বস্তুর সঙ্গ করে। মৃত্যুতে তাহার কতই সুখ কারণ স্থূল দেহ থাকে বলিয়া সে নিত্যপ্রিয় সঙ্গ করিতে পায় না। জ্ঞানীও মৃত্যু দেখিয়া হাস্য করে। সেই এই একি রহস্য তোমার! এই রূপে দেখ আমার আদেশে কর্ম্মকর আমার স্মৃতি রহিত আনন্দে রহিয়া তুমি আমাতেই রহিয়া গেলে। গোশৃঙ্গে একটী সর্ষপ যতক্ষণ থাকে ততটুকু সময় থাক, মহৎ সংসার ভয় তোমার ঘুচিয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি সকাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটে কিন্তু তুমি যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিতেছ ইহাতে তোমাকে বান্ধা যায় অন্য সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া যায়।

ভগবান—আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটে কিন্তু তুমি কিছুতেই দায়ী হইলে না। ফলাফল জন্য তোমার আসক্তি রহিল না আমার প্রীতিই তোমার লক্ষ্য কাজেই অতিশয় উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইলে। আবার নিজে কর্ত্তা অভিমানে কার্য্য করিলে তোমার বন্ধন ঘটিল।

অর্জ্জুন—তোমার অবতার গ্রহণের সময় তোমার মুখে শুনিয়া কার্য্য করিলাম কিন্তু যখন তোমার অবতার না হয় তখন কাহার প্রীতির জন্য মনুষ্য কর্ম্ম করিবে? কিরূপেই বা উহাদের কর্ম্মে উৎসাহ থাকিবে?

ভগবান:—আমি মাত্র ব্যাপী আমার উপদেশই শাস্ত্র বাক্য, এবং আমিই গুরুরূপী। গুরুকে ভাল না বাসিলে কখন শাস্ত্র বাক্যমত কার্য্য করিয়াও চলিতে পারিবে না। এইজন্য গুরুকে ভাল বলিয়া গুরু, শাস্ত্র এবং মন্ত্র এক করিয়া কার্য্য কর। তোমার সংসারে ভয় দূর হইবে। যতক্ষণে গুরুতে অনুরাগ না জন্মে ততদিন সমস্ত শুষ্কবোধ হইবে। গুরুতে অনুরাগ জন্মিলে তাঁহার আদেশমত কার্য্যে অনুৎসাহ হইবে না। তখন নিজের অনুভব, গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য এক হইয়া তুমি সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করিবে। আমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি। আমাকে দৃঢ় ভাবনা কর। আমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি সর্ব্বদা তোমার বক্ষে নৃত্য করিবে সংসারে

সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়া সর্ব্বদা আমার সহিত খেলা করিতে করিতে তোমার জীবন উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। তোমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। সেইজন্য বলিতেছি সংসার পার হইতে হইলে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আবশ্যক।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

হত্যা রহস্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রহস্য।

মোহনলাল উপবেশন করিলে হেমচন্দ্র কহিলেন, "মহাশয় হত্যারাত্রে কি অমর আপনার সহিত ছিল?"

মো। এ কথা আপনাকে কে বলিল?

হে। অমর বলিয়াছে।

মো। হাঁ, অমর আমার সহিত জুয়া খেলিতে গিয়াছিল, পাছে বাবা জানিতে পারেন সেইজন্য আমি তাহাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু ধন্য তাহার বন্ধুত্ব, এত বিপদ সত্ত্বেও যখন সে প্রকাশ করে নাই, তখন সে দেবতা। যদি আবশ্যক হয় আমি এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ দিতে পারি।

হে। তাহাত হইল, কিন্তু খুন করিয়াছে কে? আর অমরের নিকট টাকা পাওয়া গেল কোথা হইতে?

মো। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কিন্তু আমার বোধ হয় তারা এ বিষয়ে সমস্তই জানে। চলুন দেখি তাহার কাছে যাই।

পরে হেমচন্দ্র ও মোহনলাল উভয়েই হাওড়ায় তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে তারা কহিল, "মহাশয়, বাটীর সরকার হামিদ যখন তাহাকে এখানে দেখিয়াছে তখন নিশ্চয়ই সে খুন করিয়াছে।"

তারার কথায় হেমচন্দ্রের হামিদের উপর বিলক্ষণ সন্দেহ হইল। তিনি হামিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুন্নার গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথি মধ্যে রহমনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রহমন হেমচন্দ্রকে চিনিত। সে কহিল "মহাশয়, হত্যা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিলে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে কি? হেমচন্দ্র কহিলেন, "অবশ্য পাওয়া যাইবে। ৫০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।"

র। এ হত্যা হামিদ কর্তৃক হইয়াছে।

হে। প্রমাণ কি?

র। এই কাগজ গুলি।

এই বলিয়া রহমন হেমচন্দ্রকে কতকগুলি কাগজ দিল। কাগজ গুলি রহমন মুন্নার নিকট হইতে চুরি করিয়াছিল। কাগজগুলি তারার কয়েকখানি পত্র। মুন্না ও তারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া কিরূপে বিষয় হস্তগত করিবে লেখা ছিল। অবশ্য হামিদ এ বিষয় কিছু জানিত না। তাহাকে তারা খুন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল এবং খুন করিলে তাহাকেই বিবাহ করিয়া সমস্ত বিষয় সুখে ভোগ করিবে। এসমস্ত পরামর্শের মূল মুন্না। এই কর্তৃত্ব হামিদ জানিত না। সে জানিত তারা তাহাকে ভাল বাসে, সুতরাং এ বিষয়ে তাহার স্বার্থ আছে দেখিয়া খুন করিয়াছিল। এসমস্ত কথা উক্ত পত্রগুলিতে লেখা ছিল।

কাগজগুলি পাইয়া হেমচন্দ্র বড়ই আনন্দিত হইলেন। এবং দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী লইয়া হামিদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মুন্নার গৃহে হামিদ ধৃত হইল। হত্যা সম্বন্ধে হামিদ কহিল, সে কিছুই জানে না। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বলদেখি, হত্যারাত্রে অমরকে এখানে দেখিয়াছিলে কি না, নতুবা তুমি যে খুন করিয়াছ তাহা প্রমাণ করিতে বড় বিলম্ব হইবে না। তারাই সাক্ষ্য দিবে তুমি খুন করিয়াছ।"

কথা শুনিয়া ভয়ে হামিদের মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভীত ও কম্পিত স্বরে কহিল, "মহাশয় তারা মানবী নহে পিশাচী ; সে পূর্ব্বে আমাকেই হত্যা করিতে অনুরোধ করিত, এবং আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সে সম্ভবতঃ নিজে হত্যা করিয়াছিল, এবং আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া স্বীকার করাতে আমি অমরকে হত্যারাত্রে দেখিয়াছি বলি এক্ষণে আবার বলে কি না আমি হত্যা করিয়াছি।

হেমচন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "তবে তুমি আমাদের সহিত আইস, এবং তারা হত্যাকারী এই কথা তাহাকে বলিবে চল, নতুবা তোমাকেই হত্যাকারী বলিয়া চালান দিব।"

হামিদ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। যাইবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র একজন পুলিশকর্ম্মচারীকে মুন্নাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মুন্নাও যথা সময়ে থানায় আনীত হইল।

হামিদকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্র হাওড়ায় তারার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে লাগিল ; কহিল, "আর আসিয়া কি করিবেন, আমার লীলা ফুরাইয়াছে। আপনাদের আসিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছি সব প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু এখন আর আপনি আমার কিছুই করিতে পারেন না।"

হেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে বলিয়া তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ হত্যা কে করিয়াছে ?"

তারা কহিল মহাশয়, বাল্যকালে আমি মুন্না কর্ত্তৃক লালিত হইয়া ছিলাম, এখনও সেই জন্য সে আমার উপর একটু কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। এরূপ পরামর্শ সেই দেয়, কিন্তু হত্যা কার্য্যে সম্মত না হওয়ায়, সেই নিজে হত্যা করিয়াছে। এ হত্যা করিবার স্বার্থ যে আমি তাহার পুত্র হামিদকে বিবাহ করিয়া সমস্ত বিষয়টা ভোগ করিব। অমর এ বিষয়ে নির্দ্দোষী। তাহার নিকট যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহা মুন্নাই লোক দ্বারা তাহার পকেটে রাখাইয়াছিল।

তারা আর কথা কহিতে পারিল না, ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এসময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঔষধাদি প্রয়োগ করাতে তারার সামান্য চৈতন্য হইল, সে কহিল, "মহাশয়" আমার আর বড় দেরী নাই, অমরকে বলিবেন যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন, আর মুন্নাকে বলিবেন, সে যদি হত্যা না করিত তাহা হইলে হয়ত জীবনে একটু সুখ পাইতাম। কিন্তু বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। তারা আর কথা কহিতে পারিল না, ক্রমে চক্ষু নিমিলিত করিল এবং প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। হেমচন্দ্র মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া হামিদকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

যথা সময়ে বিচার হইল। বিচারে অমর সম্মানের সহিত মুক্তি পাইল। হামিদ নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইল এবং মুন্না হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হইল। মুন্নার সমস্ত বিষয় রহমন ও হামিদ প্রাপ্ত হইল। অমরের সহিত অলকার মহাসমারোহের সহিত বিবাহ হইল। হেমচন্দ্রও অমর ও অলকার নিকট হইতে অনেক অর্থাদি উপহার পাইলেন।

শ্রীঃ—

———

দুঃখ ও নিবৃত্তি।

—ঃ০ঃ—

দুঃখ কাহাকে বলে? যাহা ভাল লাগে না, তাহারই নাম দুঃখ। দুঃখ বলিলে আকাশ পাতাল কিছু বুঝায় না, বুঝায় একরকম "লাগা" অর্থাৎ ভাল না লাগা। একপেট আহারের পর কাশী হইতে আনিত টাটকা মালাই একহাঁড়ি খাইতে পারিতেছ না বলিয়া ভাল লাগিতেছে না, তখন দুঃখ হয়। পূজার সময় আত্মীয় স্বজন তোমাকে ভাল কাপড় না দিলে ভাল লাগে না, তখন দুঃখ হয়। কোন ধনী-আত্মীয় মৃত্যুর সময় তোমাকে তাহার সমস্ত বিষয় উইল না করিলে, ভাল লাগে না, দুঃখ হয়। অফিসের বড় বাবুর তিরস্কার মিষ্ট বোধহইবে কিন্তু বন্ধুর হিতোপদেশ ভাল লাগিবে না, তখন দুঃখ হইবে। বুঝা গেল যে, ভাল না লাগাই দুঃখ। দর্শনকার বলিতেছেন যে, এমন যে ভাল না লাগা, তাহার নিবৃত্তিই মুক্তি। কথাটা কি ঠিক?

আচ্ছা, দেখা যাক্। বুঝিলাম, দুঃখ একটা কিম্ভুত-কিমাকার বস্তু নহে। এমন কি দুঃখ কোন বস্তুতে নাই। তবে দুঃখটা কোথায়? দুঃখ বাহিরে নাই, আছে কেবল নিজের চিত্তে। যদি দুঃখ কোন বস্তুতে থাকিত, তাহা হইলে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইলেই দুঃখ আসিত; কিন্তু তাহাত হয় না। যে বস্তু একজনের দুঃখপ্রদ সেই অন্যজনের সুখপ্রদ। ক্ষুধাতুরের পক্ষে একমুষ্টি অন্ন অতি সুখপ্রদ আর একপেট আহারের পর একটামাত্রও এম্প্রেসগজা ভাল লাগে না। কেহ হয়ত একটী কন্যারত্নের জন্য হাহাকার করিতেছে আবার কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভাবিতেছে তাহার একটীও সন্তান না হইলেই ভাল ছিল। বুঝা গেল যে, দুঃখ আর কিছুই নহে, ঐ যে ভাল না লাগা, ঐ টুকুই দুঃখ। আর দুঃখ দূর হইলেই দুঃখ হইতে মুক্তি বা সুখ।

দুঃখ কত রকমে হয়? প্রথমতঃ, শরীরে রোগ হইলে ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা শারীরিক দুঃখ। দ্বিতীয়, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মানসিক উদ্বেগ হইলেও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা মানসিক দুঃখ। তৃতীয়, শত্রু, অন্য মানুষ, পশু প্রভৃতি হইতে যে অনিষ্ট হয় তাহাও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ এইদুঃখ ভূতপদার্থের দ্বারা সংঘটিত হয়। চতুর্থ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, ঝড় প্রভৃতি দৈব বিপদও ভাল লাগে না, সুতরাং ইহা আধিদৈবিক দুঃখ। আর অন্য কোন রকম দুঃখআছে কি? আরকোন রকম আছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

এখন দেখা যাউক, এসব দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না। কারণ, দুঃখ

দূর হইলে সুখ এবং এই সুখই মুক্তি। শাস্ত্রকার কিন্তু বলেন, "বিবেকজ্ঞানই মুক্তির উপায়।" বিবেক জ্ঞানটা কি? যখন জানিব জগতে সমস্ত মিথ্যা, জগতে সুখ বলিয়া প্রকৃত কিছু নাই, যাহা আছে তাহাও দুঃখের প্রকার ভেদ। যতক্ষণ না মনে হইবে জগতে আমি বা আমার কিছু নাই—সমস্তই মিথ্যা, ততক্ষণ দুঃখ, আবার উহা মনে হইলেই বিবেক অর্থাৎ জগতের কার্য্য ও বুদ্ধি হইতে আত্মার পার্থক্য জ্ঞান হইবে এবং তাহাই মুক্তির উপায়। এইরূপ জ্ঞান বড় সহজে হয় না, অনেক জন্মে, অনেক যত্নে, বিবেকজ্ঞান হয়। ভগবান্ই বলিয়াছেন, "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

বিবেকজ্ঞান দ্বারা বাস্তবিক দুঃখ দূর হয় কিনা তাহা পরে দেখা যাইবে এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সকল সহজে দূর করা যায় কি না। প্রবাদ আছে, "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ, ইষ্ট সার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ।" অর্থাৎ যদি আকন্দবৃক্ষে মধু পাওয়া যায়, তবে পর্ব্বতে যাইবার প্রয়োজন কি? অভিলষিত প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকেন?

পূর্ব্বোক্ত দুঃখসমূহের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যত্ন করিলে শরীর দুঃখের, যাহাতে মনের সন্তুষ্টি লাভ হয় এরূপ কার্য্যাদির দ্বারা মানসদুঃখের, শত্রু ও পশ্বাদি প্রভৃতি হইতে নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক এবং সুদৃঢ়, ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরক্ষিত স্থানে বাস দ্বারা ঝড়, ভূমিকম্প বজ্রাঘাত প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। যদি এরূপ উপায়ে দুঃখ দূর হয় তবে কষ্ট স্বীকারের আবশ্যক কি?

কথাটা বড় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে বড় বেশী সময় লাগে না। দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নানা প্রকারে সাবধান হইয়াও দুঃখ দূর হয় নাই, কতক পরিমাণে হয়ত দুঃখ দূর হইয়া থাকিবে কিন্তু সেই দুঃখের পুনরায় আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহা যদি হইত তবে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর ইংলণ্ডেশ্বরের বা সমস্ত রুষিয়ার একমাত্র অধীশ্বর জারের কোন দুঃখ থাকিত না। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রকার বলেন যে, বিবেক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উৎপাটিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দুঃখের সমুচ্ছেদ সাধন হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কার মত আর দুঃখের পুনরায় আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে তাহা হইতে ফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দেখা যাউক, কথাটা সত্য কি না।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা ভাল। যদিও সংসারে বিচিত্র সুখভোগ করেন, এমন প্রাণীর অভাব নাই, তথাপি জরা ও মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ দুঃখ স্বরূপ ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কেন না, জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। কিন্তু সুখের জন্য বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। তথাপি সাংসারিক সুখও দুঃখযুক্ত, দুঃখ হীন নহে। মাথার উপর তীক্ষ্ণধার অসি অতি সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে—কখন ছিঁড়িয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; এই অসির নিম্নে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করার মত, এই সংসারের সুখ। সুতরাং সংসার

দুঃখপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া সংসারে কি আদৌ সুখ নাই? উক্ত উপমায় বেশ বুঝা যাইবে যে সংসারে সুখ আছে, কিন্তু দুঃখের তুলনায় তাহা নাই বলিলেও চলে। দুঃখরাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

সকলেই জানেন, কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যের সহিত কারণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। শাস্ত্রকার বলেন, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু যে বৃক্ষের বীজ তাহা হইতে সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হয়। কাঁঠালগাছে আম ফলে না, আম গাছেও কাঁঠাল হয় না। বীজ বিকৃত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়। অতএব কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে, ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সংসার সুখ, দুঃখ ও বিষাদে পূর্ণ। এবং সংসারের সমস্ত বস্তুই সুখ, দুঃখ ও বিষাদের হেতু হয় বলিয়া উহা সুখ-দুঃখ-বিষাদাত্মক রূপে নিশ্চিত হয়। জগৎ সুখ-দুঃখ ও বিষাদাত্মক বলিয়া উহার কারণও সুখ-দুঃখ-বিষাদাত্মক হইবে। কিন্তু এই সমস্তই পরাপেক্ষী অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে সুখ, দুঃখ ও বিষাদ, যে যেরূপ ভাবে অনুভব করে সেই বস্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ হয়। সুতরাং সেই পর ব্যক্তিই পুরুষ বা আত্মা। ইহা হইতে আরও স্থির হইল যে আত্মা নিজে সুখ, দুঃখ না বিষাদ নহে, কারণ আত্মা বা পুরুষ এই সুখ-দুঃখ-বিষাদের উপভোগ বা অনুভব করে।

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ব্ব শরীরে এক আত্মা নহে। সমস্ত শরীরে এক আত্মা হইলে, একের জন্মে সকলের জন্ম ও একের মরণে সকলের মরণ হইত, অথবা তোমার অর্থপ্রাপ্তি হইলে আমার অর্থপ্রাপ্তি বা তোমার শত্রুর আহ্লাদে তোমারও আহ্লাদ হইত। শাস্ত্রকার বলেন, এক এক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব্ব গৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মানুসারে শরীরের উৎপত্তি হইলেই সংসারে আসিতে হয় এবং তাহা হইলেই দুঃখের আর শেষ থাকে না।

কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় কিরূপে? শাস্ত্রকার বলেন, "আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব ও নাই, এইরূপ বিবেক বিষয়ে অভ্যাস করিলে, বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং বিবেক জ্ঞান-বাসনা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করে।" যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমতি প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকিলেও যাহার বিবেক খ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না। হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না, এবং তাহা হইলে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না।

কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম প্রভাবে অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর

কিছুকাল অবস্থিত থাকে। ভগবান্ই বলিয়াছেন, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের পরে জ্ঞানীর দেহ-পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজ-ভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধ-বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন অবশ্যম্ভাবী ও অবিনাশী দুঃখ নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রকার কথিত দুঃখ নিবৃত্তিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্ও বলিতেছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

শ্রীধরণীধর শাস্ত্রী।

কালা-জ্বর।

—:০:—

কয়েক বৎসরাবধি ইহা আসামে দৃষ্ট হইয়াছে মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই পীড়ায়—সবিরাম বা স্বল্পবিরাম ভাবের জরের ব্যবস্থায় পাল্টাইয়া পড়া, রক্তাল্পতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি, শরীরের দিন দিন জীর্ণতা, লোম শরীরের বর্ণের অপেক্ষাকৃত কাল হওয়া এবং শেষে জরের বৃদ্ধি উদরাময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বা ফুস্ফুস্থ পীড়া হইয়া মৃত্যু।

বাটীর কাহারও এ পীড়া হইলে ক্রমশঃ জর সকলের বার বার হইয়া থাকে; এইরূপে ইহা নিজবাটীতে পরে পল্লীতে পরে সমুদয় গ্রাম বিস্তৃত হয়।

সচরাচর পীড়া ৫।৭ মাস স্থায়ী এই কালের মধ্যে রোগীর প্রায়ই মৃত্যু হয়—শীতকাল অপেক্ষা ইহা গ্রীষ্মকালে অধিক প্রবল।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে আক্রান্ত হইয়া ১০ বৎসরের নিম্নে শতকরা ২৫টী আক্রান্ত ১০—২০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৪টী; ২০—৩০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৩৩ টী।

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে দরিদ্র লোকেদের মধ্যে এ পীড়া দৃষ্ট হয়—এমন কি ইয়ুরোপিয়ানদিগের এ পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। অহিফেন সেবীদিগের এ পীড়া ভোগ অল্প।

এ পীড়া কোন স্থানে উদ্ভূত হইলে ৬ বৎসরের অধিক তথায় থাকে না। কিয়ৎ পরিমাণে এ পীড়া সংক্রামক যে স্থানে ইহা বর্ত্তমান, তথায় সকল লোকেরই প্রায় আক্রমণ হয়; যে স্থানে পুনর্ব্বার বসতি হইলে, তাহাদিগেরও আক্রমন হয়; এসকল ব্যক্তিদিগের—সহিত কোন প্রকার সংস্রব না হইলে অন্যলোকের আক্রান্তি হয় না। অনাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রথম হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, পীড়িত হইবার সম্ভাবনা অল্প।

এই পীড়ার জরের কোন নিয়মিত গতি নাই। সবিরাম ও স্বল্পবিরাম—সকল প্রকার জরই ইহাতে দেখা যায়—শেষোক্ত প্রকারের জর প্রথম আক্রমণ হইলেই ১০৫ পর্য্যন্ত তাপ হইতে দেখা যায়—যে ভাবেই জর দৃষ্ট হউক না কেন, বারম্বার পালটাইয়া পড়ে এ পীড়ার একটী জ্ঞাপক লক্ষণ। প্রথমবারের ১।২ সপ্তাহ থাকিয়া সারিয়া যায়; ১-৪ সপ্তাহ পর আবার জর উদ্রিক্ত হয়। ১।২ বা পাল্টাইয়া পড়ার পর জর হইলে রোগী

তাহা বুঝিতে পারে না, এমন কি যথাকালে জ্বরগায় কার্য্য করিতেছে চিকিৎসক দেখিয়া ১০২'৩' জ্বর কহিয়াছেন।

প্রথম জ্বরোদ্রেক সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর অধিক দিন থাকে; সবিরাম জ্বরকেও এককালীন ২ মাস ধরিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

যকৃত প্লীহার শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। রক্তাল্পতা আসিয়া পড়ে; এক তৃতীয়াংশ রোগীতে চক্ষুর যোজকত্ব সাদা হয়—অবশিষ্ট পীতবর্ণের হয়। বিশেষতঃ যকৃতের অধিক বিবৃদ্ধি থাকিবে। রক্তাল্পতা জ্বরের পরিমাণ অনুসারে স্বল্পজ্বরে স্বল্প-রক্তাল্পতা।

মুখ গহ্বরে ও জিহ্বারস্থানে কালাচে বর্ণের হয় —চর্ম্মের বর্ণও অপেক্ষাকৃত কাল হয়।

শোথ দৃষ্ট হয়; গুল্ফ বেড়িয়া ও চরণের কিঞ্চিৎ স্ফীতি দৃষ্ট হয়। পীড়ায় শেষাবস্থায় সদান শোথ দৃষ্ট হয়। অর্দ্ধেক রোগীর কোন প্রকার শোথ দৃষ্ট হয় না।

হৃৎপিণ্ডেই দুর্ব্বল প্রতিঘাত, কিন্তু রক্তাল্পতা জনিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। হৃৎপিণ্ডের মেদাপকৃষ্টতা এবং তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল ক্রিয়া হেতু রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত এবং নিম্নাঙ্গের শোথ।

স্নায়ুমণ্ডলের বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, অনেক রোগী রাত্রিতে দেখিতে পায় না। জ্বর কালীন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শীতকালে অনেক রোগীর ফুস্ফুস্ প্রদাহ হইয়া মৃত্যু। দুই তৃতীয়াংশ রোগীতে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় অতি সাধারণ।

পুরুষদের শোণ ও স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের লোপ। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৬ হইতে ১০১২। অতি সামান্য পরিমাণ অণ্ডলাল ও ফস্ফেট প্রস্রাব বর্ত্তমান।

দূরে বিশেষতঃ বেদনা হয়—অনেক সময়ে এই লক্ষণ দৃষ্ট, রোগীর বাত ব্যাধি পীড়া বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

প্লীহা বা যকৃতের পীড়ায় শেষাবস্থায় যেমন মুখ রোগ না স্থানীয় পবণ দৃষ্ট হয়—ইহাতেও তাহা হয়।

এ পীড়ায় শতকরা ৯৬ টী মৃত্যু সংখ্যা।

আরোগ্যস্থলে, জ্বরের, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধির হ্রাস হইয়া শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্তের সঞ্চার হয়।

এ পীড়া নূতন রোগ নহে। স্থানও জলবায়ুর দোষে কঠিন প্রকারের ম্যালেরিয়া প্রসূতায় এই প্রকার ভাব ধারণ করে।

চিকিৎসা—সাধারণ জ্বর ও ম্যালেরিয়া যে চিকিৎসা, ইহা তাহাই। কাম্ফেরিয়া, সম্দশ, সিলিকা আর্সেনিক, নেট্রম মিয়ুরিয়টিকম্—এবং উহাদিগের সংযুক্ত ঔষধ অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হইবে। ইহা ব্যতীত এপিস্, বেলিডোনিয়ম্, ইউপেটোরিয়ম্, প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার হয়।

ডাক্তার জে, মৈত্রে।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

পোঃ সিমলা,

কলিকাতা।

রমানাথ।

—:০:—

রমানাথ, ওরফে বুড়ো বক্কেশ্বরের বাস এক পল্লীগ্রামে। রমানাথ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার মা ও স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না।

রমানাথের পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যজমান ক্রিয়ায় তাঁহার রোজগার মন্দ ছিল না। তিনি গুছাইয়া সংসার করিতে জানিতেন, সুতরাং মরিবার সময় স্ত্রীর হাতে বেশ দুই পয়সা রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের মধ্যে পুত্রের অপোগণ্ড অবস্থায়ই তাঁহাকে ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রমানাথের মা খুব বুদ্ধিমতীছিলেন না, তবে ভোলাথোলা গোছের ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু শোক সত্বর সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিগণ, আত্মীয় স্বজন তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকলে সমান ছিলেন না। কেহ কেহ বা প্রকৃতই দুঃখে দুঃখী ছিলেন। কেহ কেহ বা অবসর বুঝিয়া বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া টাকা কড়ি গুলি হাতাইবার চেষ্টায় ছিলেন। বাহিরে মায়ার কান্না কাঁদিয়া বড়ই আপনার বলিয়া জানাইতেন। বিধবাকে ফাঁকি দেওয়াই জগৎ সংসারের নিয়ম।

যাহা হউক শোক দুঃখ মানুষের চিরকাল থাকে না। ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। রমানাথই তাঁহার মায়ের সর্ব্বস্ব ধন। রমানাথের মা মনে মনে ভাবিলেন, কর্ত্তা যা টাকা কড়ি রাখিয়াগিয়াছেন, গুছাইয়া চলিতে পারিলে আমার রমানাথের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দুঃখ হইবে না। তবে একজন মাথার উপর লোক চাই। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি রমানাথের লেখাপড়া শিক্ষার দিকটা একেবারেই দেখিলেন না। কিন্তু গুরুদশার বৎসর অতীত হইলে পর রমানাথের বিবাহ দিলেন।

মানুষ ভাবে এক হয় আর; ইহাই সংসারে দেখিতে পাই। এ সংসারে কে কার অভিভাবক? রমানাথের পিতাও একদিন তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভিভাবক ছিলেন কিন্তু তিনি এখন কোথায়? এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। রমানাথের বিবাহের এক বৎসর পরে রমানাথের শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইল। রমানাথের শ্বশুর বাড়ী সমূলে নির্ম্মূল হইল। থাকিলেন কেবল শাশুড়ীঠাকুরাণী নিরুপায়া, নিরাশ্রয়া। তিনি এখন রমানাথের গলগ্রহ হইলেন। সংসারের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! আজ যেখানে হাসির ছটা, কাল সেখানে কান্নার ঘটা! হাসি, কান্না লইয়াই সংসার।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল রমানাথ এখন বেশ বড় হইয়াছেন। সুদীর্ঘ গুম্ফ মুখে শোভা পাইতেছে। তিনি এখন সংসারে মুরুব্বি। পাড়ার নব্য সম্প্রদায়ের বৈঠকে তিনি যোগ দেন। তর্ক বিতর্ক করেন। সে তর্কের মাথাও নাই মুণ্ডুও নাই, কেবলমাত্র অসার কথার সমষ্টি। যাহা হউক পাড়ার ছেলেরা তাঁহাকে লইয়া হাস্য পরিহাস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন তর্কের অবতারণা করিত। একদিন তর্ক উপস্থিত হইল গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি চারপাওয়ালা জানোয়ারেরা দুধ দেয় কিন্তু দুই পাওয়ালা পাখীর মধ্যে কোন না কোন পাখী নিশ্চয়ই দুধ দেয়। যখন পাড়ার ছেলেরা রমানাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পরস্পর ঘোরতর তর্ক বিতর্ক করিতেছিল তখন রমানাথ বলিয়া

উঠিলেন, "আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে লছমন্ সেখ নামে এক মুসলমান অনেকগুলি পায়রা পুষিয়াছিল তার মধ্যে একটী পায়রা রোজ আড়াইসের করিয়া দুধ দিত।" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলে পর রমানাথ বলিয়া উঠিলেন, "কিহে তোমরা হাস্‌ছ যে ও রকম দুই একটী পারাবত দুগ্ধবতী থাকে।" এইরূপভাবে দু পাঁচটী বৈঠকে রমানাথের বক্তৃতার পর পাড়ার ছেলেরা রমানাথকে "বকেশ্বর" উপাধি ভূষণে বিভূষিত করিল। ইহার কিছুদিন পরেই এই উপাধির পূর্ব্বে—বুড়ো এই নূতন উপাধিটা যোগ করিয়া দিল। ক্রমে রমানাথের মায়ের কাণে একথা পোঁছিল। তিনি একদিন পাড়ার ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা রমানাথকে বুড়ো বুড়ো কর কেন? সত্যি উহার মাথার চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু রমানাথ আমার সেদিনকার ছেলে, চুলগুলিতো বয়সে পাকেনি।" তৎপরে গ্রাম্য নাপিতের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই নাপিত বেটা যত বুড়োলোকের চুল ছাটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া আসিবে আর সেই কাচি দিয়া রমানাথের চুল ছাটিবে আর সেই ক্ষুর দিয়া রমানাথের দাড়ি কামাইবে। আমি হাজার বার বারণ করিয়াছি কিন্তু বেটা যে কেমন একগুঁয়ে কিছুতেই আমার কথা শুনে না, ইহাতে কি বাপু চুল দাড়ি না পাকিয়া থাকিতে পারে।" রমানাথের মায়ের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা শুনিবার পর হইতে আর পাড়ার ছেলেরা কেহ প্রকাশ্য ভাবে রমানাথকে 'বুড়ো বকেশ্বর' বলিত না।

এইরূপ আমোদ প্রমোদে ও স্বচ্ছন্দে আরও কিছুকাল রমানাথের সংসার কাটিয়াগেল, সংসারের যে দিন যায় সেই দিন ভাল। কাল কি হইবে কে বলিতে পারে? রমানাথের মা সঞ্চিত টাকার সুদে সংসার চালাইবেন মনে করিয়া অধিকাংশ টাকা সুদে খাটাইতেছিলেন। কিছুকাল লোকে রীতিমত সুদ দিয়াছিল এখন অনেকেই আর সুদ দেয় না। বেগতিক দেখিয়া আসল টাকা চান, তাহাও লোকে আজ কাল করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সংসার বড়ই কষ্টে চলিতে লাগিল। রমানাথের গৃহিনীর এতদিনের পর মুখ ফুটিবার অবসর উপস্থিত হইল। তিনি এক দিবস "রমানাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "বুড়ো মিনসে কেবল বসে বসে খাবে টাকা কড়ি রোজগারের ধান্দা নাই।" এই তিরস্কার শুনিয়া রমানাথের মনে বড়ই ধিকার উপস্থিত হইল, তিনি পরদিন প্রাতে কাপড় চোপড় লইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। কোথায় যাইবেন লক্ষ্য নাই। কিয়দ্দূর আসিয়া মনে করিলেন শুনিয়াছি কলিকাতা খুব বড় সহর, সেখানে দেশ বিদেশের লোক টাকা রোজগারের জন্য যায়; সুতরাং আমি কলিকাতাই যাইব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমানাথ কলিকাতায় আসিলেন বটে কিন্তু কলিকাতা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। কি করেন, কোথায় যান, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একজনের বাটীর বহির্ভাগে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামীর হিন্দুস্থানী চাকর প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে যাইতেছিল, বাহিরে আসিয়া আগন্তককে দেখিয়া তীক্ষ্ণ গম্ভীরস্বরে বলিল "তোম্ কোন হ্যায়"? রমানাথ কিছুই বুঝিলেন না, উত্তর করিলেন, "বাপু আমি বামুন, বাস কৃষ্ণগঞ্জে।" চাকরও আনকোরা হিন্দুস্থানী। রমানাথের উত্তর বুঝিতে পারিল না, চটিয়া একে

ঘারে আগুন। সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বলিল, "শালা চোট্টা হ্যায়, কোকেন খোর হ্যায়, চুরীকরনেকা মতলব হ্যায়, শালা নিকালো হিঁয়াসে!" রমানাথ বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিলেন, সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এখানে আর কোন গোলমাল নাই। ক্রমে রজনী ঘোর হইল; রাজপথে লোকজন চলা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। দুই দিনের মধ্যে দুই পয়সার মুড়ি ছাড়া রমানাথের আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সহর জায়গা, পল্লীগ্রাম নহে যে কাহারও বাড়ী গিয়া অতিথী হইবেন। সদর রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন; পরিশেষে পথপ্রান্তে এক ঘোড়ার আস্তাবল দেখিতে পাইয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে দিবস পূর্ণিমা-তিথি ছিল। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন ঘোড়ার আহার্য্যার্থ স্তূপীকৃত তৃণ রহিয়াছে। তিনি সেই তৃণগুলি ঠেস দিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করিল। আস্তাবলের সহিস, কোচায়ানেরা উচ্চে মঞ্চে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, সুতরাং কেহই আর এ ব্যাপার জানিতে পারিল না। ক্রমে রাত্র শেষ হইয়া আসিল। সহিস কোচয়ানের ঘুম ভাঙ্গিল। রমানাথ তখন গভীর নিদ্রা যাইতেছেন এবং নাসিকার ডাকের চোটে আস্তাবল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সহিসেরা তাঁহার নাকের ডাক শুনিয়া আলো জ্বালিয়া নীচে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন মাতাল মনে করিয়া রমানাথের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া রমানাথের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহার পর তাহারা যে ব্যবহার করিল তাহাতে রমানাথ ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন তারপর সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, পথে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত রমানাথের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রমানাথ নিজের দুঃখ জানাইলেন। বৃদ্ধা রমানাথের দুঃখে দুঃখী হইলেন। রমানাথকে চারিটী পয়সা দিলেন আর বলিলেন, "বাবা" এখানে তোমায় কে সাহায্য করিবে? যাও, এই রাস্তা ধরিয়া যাও, চৌরঙ্গীতে গিয়া পড়িবে সেখানে হামেসা সাহেব বিবিরা বেড়ায় তাদের মন ভাল, তাহাদের কাছে ভিক্ষা করিলে তোমার একটা উপায় হইয়া যাইতে পারে। রমানাথও বৃদ্ধার কথামত কার্য্য করিলেন। বাস্তবিক হ্যাটকোটধারী এক বাঙ্গালী সাহেবের নিকট হইতে সেদিন তিনি চারি আনা রোজগার করিলেন, সে দিন গুজরানের মত হইল। ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল মাথা গুঁজিবার স্থান নাই সম্মুখে গড়ের মাঠ, সেইখানেই রাত্রে আশ্রয় লইলেন। খানিক রাত্রে এক পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত, পাহারাওয়ালা রমানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল তাঁহার এখানে কোন আশ্রয় নাই ভিক্ষা করিয়া দিন কাটান। পাহারাওয়ালা রমানাথকে পাকড়াইয়া থানায় লইয়া গেল, তৎপর দিবস যথারীতি ও যথা সময়ে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে আনীত হইলেন। বিচারে রমানাথের তিন সপ্তাহ কারাদণ্ড হইল।

এই সহরের এক ধনী পুত্র ঝোঁকে পড়িয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন ঘটনাক্রমে তাঁহারও সেদিন বিচারের দিন ছিল। বিচারে তাঁহারও তিন সপ্তাহ কারাদণ্ড হইল। রাজদ্বারে ধনী নির্ধন নাই, সকলের উপর সমান

বিচার। এক ধনী ও এক নির্ধনের পুত্র তিন হপ্তার জন্য আজ জেলে চলিলেন। আজ উভয়েই এক ভাগ্যাধীন। এক ভাগ্যাধীন হইলে বন্ধুত্বও সহজ ঘটে। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দুই জনের একই কর্ম্মক্ষেত্র ধনীপুত্র রমানাথকে সোণার চক্ষে দেখিলেন এবং তিনি তাহার প্রতিপালনের ভার লইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন সপ্তাহ ফুরাইয়া গেল। দুজনের কারামুক্তি হইল। ধনী পুত্র বাড়ী আসিবার সময় রমানাথকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ধনীগৃহে রমানাথের সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যাহাতে রমানাথের বেশ দুপয়সা রোজগার হয় ধনীপুত্র এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন তিনি রমানাথকে বলিলেন "দেখ তোমার মা ও স্ত্রীকে কলিকাতায় আন, আর দেশে ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না।" ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইলে বুদ্ধিরও পরিবর্ত্তন হয়, লোকে বলে এ বোকা, সে বুদ্ধিমান্, কিন্তু কিছুই নহে সবই ভাগ্যাধীন।

রমানাথ ধনী পুত্রের কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন। ধনীগৃহে সকলের বসবাস চলিল। সংসার সময়ের দাস। সময়ের পরিবর্ত্তন হইলে ঘরের পরিবার হইতে বাহিরের লোক পর্য্যন্ত খাতির যত্ন করে। রমানাথের স্ত্রী স্বামীর আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে স্বামীকে দেবতার অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। একদিন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখ আমি না বুঝিয়া তোমায় একদিন তিরস্কার করিয়াছিলাম সে কথা আর এখন মনে স্থান দিও না।" রমানাথ উত্তর করিলেন, দেখ "তোমার সেই তিরস্কারই আমার উন্নতির মূল। তবে তিরস্কারের প্রণালী আছে। স্বামীকে যেভাবে স্ত্রীর বলিবার অধিকার আছে। তুমি সেভাবে বল নাই ইহাই তোমার দোষ। কিন্তু তোমায় সে দোষ দিই না। কালেরই দোষ দিই আর হতভাগ্য বঙ্গদেশের অদৃষ্টের দোষ।" এইরূপে ধনীগৃহে সকলের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ক্রমে রমানাথও বেশ দু পয়সা গুছাইয়া লইলেন।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

—:০:—

হেক্টোগ্রাফ।—একখানি লেখা হইতে অনেকগুলি নকল প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি সহজে ও সুন্দররূপে লিথোগ্রাফের মত ছাপা উঠে। প্রথমে ৫ ভাগ জলে ও ৩ ভাগ এমোনিয়া দ্রাবকে ৪ ভাগ উত্তম শ্বেত শিরীষ ভিজাইয়া নরম করিতে হইবে। পরে উহা উত্তাপ দ্বারা গালাইয়া ৩ ভাগ চিনি ও ৮ ভাগ গ্লিসিরিণ মিশাইয়া বেশ করিয়া ঘাঁটিয়া লইবে ও উত্তাপ দ্বারা ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইবে। গরম থাকিতে থাকিতে এই মিশ্রিত দ্রব্যগুলি একটী মোটা ব্রুস দ্বারা একখানি সাদা ব্লটিং কাগজে উত্তমরূপে মাখাইয়া লইবে এবং ২।৩ দিবস শুখাইয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। ইহাতে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উপায় কালী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং লেখা কাগজ হইতে ইহাতে লেখা আনিবার পূর্ব্বে ইহাকে ভিজা স্পঞ্জ দিয়া একবার ভিজাইয়া লইতে হইবে এবং ২।১ মিনিট জল ঝরিয়া পড়িবার জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে।

যে লেখা বা ছবি নকল করিতে হইবে, নিম্নলিখিত উপায়ে কালী প্রস্তুত করিয়া একটী নূতন ষ্টিলপেনে করিয়া তাহা লিখিতে হইবে। সেই লেখা শুকাইয়া গেলে লেখা দিক্‌টী উক্ত ব্লটীং কাগজের উপর রাখিয়া বেশ করিয়া চাপ দিতে হইবে, এবং সেইভাবে ২।৩ মিনিট রাখিয়া আসল কাগজ খানি তুলিয়া লইবে। পরে তাহার উপর এক এক খানি সাদা কাগজ রাখিয়া অল্প অল্প চাপ দিয়া যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি নকল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কায শেষ হইলে পুনরায় স্পঞ্জে করিয়া অল্প জলদ্বারা উক্ত ব্লটিং কাগজ ধৌত করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। কাগজে লিখিবার জন্য কালি প্রস্তুত করিতে হইলে, নিগ্রোসিন ব্লাক ১ ভাগ, জল ১৪ ভাগ, গ্লিসিরীণ ৪ ভাগ একত্রে মিশাইতে হইবে।

অদৃশ্যকালী।—আইওডাইড অব্ ষ্টার্চ জলে গুলিয়া কালীকরিয়া তদ্দারা লিখিলে ঠিক ৪ সপ্তাহ পরে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং সেই কাগজে যে কখনও কিছু লেখা ছিল তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।

প্রত্নওক।

—:০:—

আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান "প্রত্নওক" নামে বেদে উক্ত হইয়াছে। এই "প্রত্নওক" কোন্ দেশ তাহার মীমাংসা আবশ্যক। এ বিষয়ে অন্ততঃ দশবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ইহা বাক্‌ট্রীয়া (Bactria) প্রদেশ; কোন মতে ইহা আমুনদীর উপত্যকা কোন মতে আসিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূখণ্ড বিশেষ; কোন মতে ভারতবর্ষ। রেবরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থে স্থির করিয়াছেন যে প্রত্নওক ককেশস পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী। এই সিদ্ধান্ত দোষাত্মক প্রণালীর দ্বারা কষ্টকল্পিত বলিয়া হৃদ্য নহে, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক তাঁহার উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

হিমালয়ের উত্তরে যে আর্য্যদিগের উপনিবেশ ছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, বাহ্লীক, কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি বিবিধ আর্য্যজনপদের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয় "তস্মাৎ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচন পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি "বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে।" হিমালয়ের উত্তরে উত্তরকুরু এবং উত্তরমদ্র এই দুই জনপদ। উত্তরকুরু বর্ত্তমান কাসগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে যখন সুগ্রীব বানরগণকে সীতার অন্বেষণে উত্তরদিকে প্রেরণ করেন তখন বানর-রাজ হিমালয়ের কৈলাস ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পর্ব্বতের পর উত্তরকুরু জনপদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ও আদিপর্ব্বে উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন দিগ্বিজয়কালে মানসসরোবরের উত্তরস্থ গন্ধর্ব্ব নগরের উত্তরে স্থিত উত্তরকুরুতে প্রয়াণ করেন। আদিপর্ব্বের ১২০ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই পাণ্ডুনৃপতি কুন্তীকে বলিয়াছিলেন:—

"অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥

তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারং স্বভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূৎ বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণ দৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
অস্মিংস্তু লোকে ন চিরাৎ মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।"

পূর্ব্বকালে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ছিল, সকলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। স্ত্রীলোকেরা স্বামী প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনিবার্য্য হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়ার নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিত। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা অধর্ম্মে পতিত হইত না, যেহেতু তৎকালে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। মহর্ষিরা অদ্যাপি উত্তরকুরু প্রদেশে এই ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করেন। সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেই অনাবৃত অর্থাৎ স্বাধীন ও সর্ব্বদর্শনযোগ্য।

উত্তরকুরু প্রদেশ অতি রমণীয় বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্লীক প্রদেশ আধুনিক বাল্খদেশ; ইহা পূর্ব্বে আর্য্যদিগের নিবাস ছিল। কম্বোজদেশও বর্ত্তমান বোখারার নিকটবর্ত্তী। এই সকল আর্য্যদিগের উপনিবেশ ছিল।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর ইন্দরালয় নামে একটী স্থান আছে। অমরকোষে, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি ইহার উল্লেখ আছে। জনষ্টোনসাহেব কৃত আসিয়া মহাদেশের বৃহৎ মানচিত্রে "ইন্দরালয়" দৃষ্ট হয়। ইন্দরালয়ের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রালয়। ইহাই আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ৯ ঋকে লিখিত আছে যে ইন্দ্রদেব আর্য্যদিগের পুরাতন বাসস্থানের সর্ব্বরক্ষক প্রভু ও বহুজন পালক ছিলেন। ইহা শীত প্রধান দেশ ছিল তাহা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের প্রভাবে জানা গিয়াছে যে প্রাচীনকালে আর্য্যবংশের বর্ত্তমান সপ্তবিভাগ একত্র বাস করিত। সপ্ত বিভাগ যথা ১ ভারতীয় আর্য্যগণ; ২ পারস্যবাসীরা; ৩ ইংরাজ এবং জর্ম্মাণদিগের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি; ৪ রুসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী শ্লাভোনিয়ান (Slavonion) জাতি; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি; ৬ গ্রীশদেশবাসী পিলাসজি (Pelasi) এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি।

"ইন্দ্রালয়" নামই প্রতিপন্ন করিতেছে যে ইহাই ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত আর্য্যদিগের আদিভূমি। ইন্দ্রদেব আর্য্যগণের রক্ষক বলিয়া আর্য্যগণ তাঁহাদের আদি বাসভূমির ইন্দ্রালয় নাম রাখিয়াছিলেন। আধুনিক ইন্দ্রালয় প্রাচীন ইন্দ্রালয়ের প্রায় দুইশত ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া অনুমান হয়। ইন্দ্রালয় অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ ছিল। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে হিমপ্রধান প্রদেশে বাস করিতেন। আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার হিমপ্রধানদেশবাসীদিগের ন্যায় ছিল। তাঁহারা হিমঋতু লইয়া বৎসর গণনা করিতেন। তাঁহারা মাংসভক্ষণ, উষ্ণপরিচ্ছদ পরিধারণ প্রভৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। উত্তরকুরু, উত্তরমদ্র, কম্বোজ, বাহ্লীক প্রভৃতি আর্য্য উপনিবেশ সকল ইন্দ্রালয়ের সন্নিহিত। ইন্দ্রালয়ে তাঁহারা সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিলেন এবং কোন কারণে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতিকালে আর্য্যদিগের যে ভাষা ছিল তাহার নাম ব্রহ্মভাষা। ব্রহ্মভাষার ও ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ উপনিষদাদিতে

বহুত্র দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে উপনিবেশান্তর আর্য্যগণ এই ব্রহ্মভাষার সংস্কারপূর্ব্বক উহাকে সংস্কৃতে পরিণত করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

দেশলাই।

—:০:—

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী দেশলাই আমরা চক্ষে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল প্রতিবৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ টাকার দেশলাই বিলাত প্রভৃতি বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হইয়া থাকে।

ইহার পূর্ব্বে দেশলাইএর জন্য আমাদের কি খরচ হইত? কালীপূজার সময়ে ছেলেদের খেলিবার প্যাঁকাটি হইতে দু-এক আটি রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আধ-পয়সা বা সিকি-পয়সার গন্ধক কিনিয়া দেশলাই করিলেই, তখন সম্বৎসর কাটিয়া যাইত, কেবল সোলা চকমকিতেই সংসারীর সুখে কাল অতিবাহিত হইত। এখন পঁচিশ লক্ষ টাকার যে পরিমাণ বিলাতী দেশলাই পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ প্যাঁকাটীর দেশলাই করিতে ৬॥০ মণ গন্ধক লাগিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কার্য্য পঁচিশ বা ত্রিশ টাকায় হইত এখন তাহার জন্য পঁচিশ লক্ষের অধিক টাকা দিতে হয়।

আমরা সচরাচর যে "পয়সায় দুই বাক্স" দেশলাই ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই সুইডেন দেশীয়। দেশলাইয়ের কাঠী যত শীঘ্র করিতে পারা যায় এবং লোকের মজুরী যত কম হয়, দেশলাই তত সস্তায় বিক্রয় হয়।

প্রথমতঃ আবশ্যক মত পুরু কাঠের তক্তাকে কলের করাত দ্বারা ছোট ছোট সমান অংশে কাটা হয়। এই সকল কাঠের টুকরা লম্বে দেশলাই-কাঠীর সমান, প্রস্থ এবং পুরু ইচ্ছামত এক মাপের। যাহাতে সকল প্রকার কাষ্ঠ অত্যন্ত শীঘ্র ও সুবিধায় কাটা যায়, সে জন্য এখন আমেরিকায়, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে নানা কৌশলময় যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে। এদেশে দেশলাই করিতে হইলে, সেরূপ যন্ত্র আমরা যে নিজে *নির্ম্মাণ করিব এমনটা এখন অসম্ভব।* *বিদেশীয়* যন্ত্রের উপর নির্ভর করাই ভাল।

যন্ত্রের দ্বারা কাঠীগুলি কাটা হইলে, হস্তের দ্বারায় কিম্বা যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি লইয়া আঁটি বাঁধে। আটি বাঁধিয়া ভিজা থাকিলে শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইয়া তাহার মুখগুলি, লোহার চাদর গরম করিয়া লাল হইলে, তাহাতে ঘষিয়া লয়, এইরূপে কাঠীর মুখগুলি ঈষৎ পোড়া পোড়া হইলে, একটা পাত্রে অল্প কেরসিন বা টার্পিণের ন্যায় শীঘ্র দহনীয় তৈল রাখিয়া সেই মুখগুলি তাহাতে স্পর্শ করাইলেই অমনি একটু তৈল শুষিয়া লয়। ইহার পর অগ্নি-উৎপাদক একটী মিশ্র পদার্থে কাঠীর মুখগুলি ডুবাইয়া লইলেই দেশলাই প্রস্তুত করা শেষ হয়।

এই মিশ্র পদার্থের উদ্দেশ্য অগ্নি উৎপাদন করা। কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহা অল্প বা অধিক উত্তাপে বায়ু লাগিলেই জ্বলিয়া উঠে। এই পদার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে সাধারণত পাঁচ প্রকার বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

১। পোটাশিয়ম্ ক্লোরেট ২৬ আউন্স;
২। ম্যাঙ্গানীজ পেরক্সাইড ২৫ ঐ
৩। বাই ক্রোমেট অব্ পোটাশ ২০ ঐ
৪। লেড্ সিয়ানাইড ২৮ ঐ

৫। এণ্টিমণি অক্‌সিসলফাইড্ ২০ আউন্স

উক্ত দ্রব্য সমূহ প্রথমে পৃথকভাবে চূর্ণ করিতে হইবে পরে ধীরে ধীরে খানিকটা জলে ১২ আউন্স গঁদ ভিজাইয়া সমস্ত গুলি মিশ্রিত করিতে হইবে। এমন করিয়া জল দিতে হয় যে, এই মিশ্রণ আটার মত ঘন হয়। এইরূপ অনেকক্ষণ নাড়িয়া দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া মিশিলে পর, তাহার সহিত উত্তমরূপে গুঁড়ান কাচের টুকরা ৪ আউন্স মিশ্রিত করিলেই দেশলাইএর মসলা প্রস্তুত হইল। এইবার পূর্ব্বোক্ত কাঠীগুলি একটা অল্প গভীর লোহার পাত্রে যতটুকু ডুবিবে সেই মত পুরু মসলা ঢালিয়া তাহাতে এক মুখ ডুবাইয়া প্রায় ২০ মিনিট ঝুলাইয়া রাখা হয়;—বেশী মসলা থাকিলে, তাহা ঝরিয়া পড়ে, এবং কাঠীর মুখ নীচুভাবে থাকাতে বেশ গোল ফোঁটার মত হয়।

মসলা লাগান হইলে, কাঠীগুলি বাতাসে রাখিয়া শুকান হয়। তাহাতে অসুবিধা হইলে একটা ঘরের মধ্যে কলের সাহায্যে গরম বাতাস প্রবিষ্ট করাইয়া সেই ঘরে উহা শুকান হয়। শুকান হইলে তাহা বাক্‌সের মধ্যে রাখা হয়।

বাক্‌সের কাঠ কলে কাটা হয়; বাক্সের যে যে স্থানে ভাঁজ পড়ে, কলে সেই সেই স্থানে খাঁজ কাটা থাকে; সুতরাং একজনে চক্ষু বুজিয়া দিনে পাঁচ ছয় শত বাক্স মুড়িয়া এক এক খণ্ড কাগজ লাগাইয়া দেয়। আবার দেশলাই ঘসিবার কাগজও স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা হয় না। কাচের গুড়া ও শিরীষে একটা আটা করিয়া বাক্সের দুই পার্শ্বের কাগজে লাগাইয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণ দেশলাই করিবার প্রক্রিয়া। এই দেশলাই যদিও এখনও অনেক প্রচলিত আছে, তবু অনেকে ইহা ব্যবহার করেন না এবং অনেক দেশলাইকারক তাহা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন না। কেন না, এই দেশলাই যেথা সেথা একটু চাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। কারিকরেরা বাক্সবন্দী করিতে অনেক বিপদ ঘটাইয়াছে। এই সকল বিপদ নিবারণ জন্য সেফ্‌টিম্যাচ বা আপদ শূন্য দেশলাই আবিষ্কার হয়। ইহাতে এমর্ফস (Amorphos) ফস্‌ফরস্ ব্যবহৃত হয়। এই এমর্ফস ফস্ফরাস্ সাধারণ ফস্ফরসের মত দাহ্যগুণ বিশিষ্ট নহে। ইহার বর্ণ লাল; ইহাতে বায়ু লাগিলে জ্বলিয়া উঠেনা বা ধূম নির্গত হয় না; অধিক উত্তপ্ত না হইলে ইহা জ্বলে না। ইহা কেবল বাক্সের গায়ে শিরীষের সহিত ব্যবহৃত হয়। কাঠির মসলা ক্লোরেট অব্ পোটাশ, এই ফস্ফরাসের একটুমাত্র সংস্পর্শে আসিলে জ্বলিয়া উঠে।

এই দেশলাই প্রস্তুত করিতে হইলে ক্লোরেট অব্ পোটাশ ওজনে ৬ ভাগ, সলফাইড অব্ এণ্টিমনি (সুর্ম্মা) ২ বা ৩ ভাগ, শিরীষ ১ ভাগ লইয়া গরমজলে প্রথমে পোটাশ ও শিরীষ গুলিতে হইবে পরে তাহাতে এণ্টিমণি মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ন্যায় কাঠি প্রস্তুত করিতে হইবে। বাক্সের গায়ের জন্য এমর্ফস ফস্ফরাস ১০ ভাগ, ম্যাঙ্গনীজ অক্সাইড বা সলফাইস অব্ এণ্টিমনি ৮ ভাগ, শিরীষ ৩ হইতে ৬ ভাগ উত্তমরূপে জলে গুলিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া বাক্সের গায়ে লাগাইতে হয়।

দেশলাই তৈয়ারির সমগ্র যন্ত্রাদির মূল্য প্রায় সতের হাজার টাকা এবং তৎসহ বিজ্ঞাপনাদি ও লোকজনের মজুরি প্রভৃতির খরচ জন্য মাসে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে বৎসরে প্রায় ৭০ হাজার টাকার দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারিবে। আজ কাল স্বদেশী আন্দোলনে কলিকাতায় ছট একটী

দেশালাইয়ের কারখানা খোলা হইয়াছে এবং আশা করা যায় এরূপ লাভজনক ব্যবসায় এদেশীয় ধনীদিগের দৃষ্টি পতিত হইবে।

শ্রীসত্যচরণ দত্ত, বি, এ।

আন্দুল-ঝোড়হাট বঙ্গ-বান্ধব সমিতির উৎসব।

—:০:—

বিগত ২রা চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় উক্ত সমিতির মঠভবনে সমিতির দশম সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সনাতনধর্ম্ম প্রচারিণী সভার নেতা পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরাও আহূত হইয়া সভাপতি মহোদয়ের শ্রীচরণ দর্শন ও উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম।

স্থানটী দেখিলাম, শীতলবাহিনী সরস্বতী-তরঙ্গ-চুম্বিত। পাদদেশে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য নীলাকাশের গায় চিত্রলেখবৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। গৃহের নবীন সংস্করণ, অস্তোন্মুখ তপনের আরক্তিম বিভায় যেন শক্রধনুর বিভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় এই নব সংস্কৃত দ্বিতল গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহ-স্বামীর কল্যাণ বিধান করিলেন এবং তদীয় পাদস্পর্শে সুরম্য গৃহটীও পবিত্র হইল।

ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আন্দুলবাসী বালক যুবক ও বৃদ্ধলোকেরা ঐ স্থানে সমবেত হইলেন। যে গাড়ী মহর্ষির জন্য আনা হইয়াছিল সকলে তাহার অশ্ব বিযুক্ত করিয়া স্বয়ং টানিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহা-পুরুষ গাড়ীতে উঠিলে বহুসংখ্যক দর্শক গাড়ীর অগ্র পশ্চাৎ চলিল। মহর্ষির গাড়ী এই বিশাল জনসঙ্ঘের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ঐ পথের এক পার্শ্বে সেই শীতলবাহিনী সরস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা, অপর দিকে গৃহস্থ ভদ্রমহিলাগণ মহর্ষির দর্শনলালসায় স্বীয় প্রাঙ্গণে, গবাক্ষে, দ্বারদেশে ও ছাতেরউপরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে যেমন গাড়ীঅগ্রসর হইতে লাগিল দর্শকেরা অমনি "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি ও "গুরু-দেবের জয়" শব্দে ঠাকুরের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। গুরুদেবও গাড়ীর উপর হইতে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য জনাইয়ের জমীদার ও উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষির সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক ব্যজন করিতে-ছিলেন। এ দৃশ্য বর্ণনাতীত, যে সকল ভাগ্যবান সেই শোভা দর্শনার্থ উপস্থিতছিলেন তাঁহারাই সেই বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কুল রমণীগণ রাস্তার ধারের বাড়ী হইতে প্রাচীন প্রথানুসারে মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি সহযোগে প্রণাম দ্বারা অসাধারণ ভক্তি ও সম্বর্দ্ধনার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ক্রমে গুরুদেবের গাড়ী সভাস্থলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখেউচ্চ নহবৎমঞ্চে শ্বেত, লোহিত, নীল, পীত, হরিত পতাকা সকল পত পত শব্দে উড্ডীন হইয়া যেন ধর্ম্মপিপাসু জনমণ্ডলী পরিবেষ্টিত মহর্ষিকে সাগত সম্ভাষণ করিতেছিল; এবং বাদ্যকরগণ সুমধুর গভীর নিক্কণে বাদ্যধ্বনি দ্বারা শুভানুষ্ঠানের সূচনা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

সভাতোরণ পূর্ণকুম্ভ কদলীবৃক্ষ, নানাবিধ বর্ণের ধ্বজা, পতাকা, বৃক্ষশ্রেণী ও বিচিত্র

রংএর কাগজের মালায় সজ্জিত হইয়াছিল। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রাঙ্গণটী নানাবিধ পত্র পল্লব ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। যেথানে যেটী সাজে সেথানেই সেইটী রহিয়াছে—কিছুরই অভাব দেখি নাই। সভাস্থলের সাজ সজ্জা ও চিত্রণ দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধশক্তির (aethetic culture) পরিচয় পাইলাম।

যে মহাত্মা স্বদেশ ও স্বজাতির স্বধর্ম্ম উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যিনি চিরজীবন ধর্ম্ম ও নীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া অসামান্য অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, উদ্যম, পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আজ ধর্ম্ম জগতে আমাদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, যিনি আমাদিগের নেতা, উপদেষ্টা ও আমাদের ইষ্টগুরু সেই অলৌকিক প্রতিভাশালী, ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন, নিখিল জনহিতাকাঙ্ক্ষী প্রাতঃস্মরণীয় নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়কে আজ রাজগঞ্জে শুভাগমন করিতে দেখিয়া আম্দুলের অদূরবর্ত্তী চারি পাঁচখানি গ্রামসমূহ হইতে অন্যূন সহস্রাধিক ভদ্রসন্তানগণের সমবেত হইয়াছিল এবং কলিকাতা হইতেও বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গ এই ধর্ম্ম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বহুকাল এরূপ ধর্ম্মসভা হয় নাই, এমন ধর্ম্ম বক্তৃতাও বহুদিন শুনা যায় নাই এবং এত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির একত্র সমাবেশ অনেককাল দেখি নাই। গুরুদেবের বক্তৃতার অনেকগুলি নূতনত্ব দেখিলাম, তন্মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ববিধ নরনারীর প্রাণের উপযুক্ত ও মধুর হইয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা অনেকের নিকট শুনা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রাণ মাতান বক্তৃতা আমরা কখনও শুনি নাই। মহর্ষির বক্তৃতার আরও একটী মোহিনীশক্তি দেখিলাম যে, বক্তৃতার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ৩॥ ঘণ্টাকাল এতগুলি লোকের প্রাণ ধর্ম্মরসে বিগলিত করিয়া তাঁহাদিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে "হরিধ্বনি" ও ভক্তবৃন্দের উচ্ছ্বাসমাত্র শ্রুত হইয়াছিল।

যথা সময়ে সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহার পুরোভাগে মৃদঙ্গ, সেতার, করতালাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ভাদুড়ী প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত কর্ত্তৃক কয়েকটী ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইয়াছিল। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা গুরুভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ও জাতীয় উন্নতির উপায় প্রভৃতি অতি সরল, প্রাঞ্জল ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। অবশেষে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের উৎপাতে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতি, শস্যহানি ও দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যকল্পে উক্ত সমিতি যথাসাধ্য অর্থদান করিয়াছেন। যে সভার এই সকল সাধু উদ্দেশ্য আমরা কায়মনোবাক্যে তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সভাভঙ্গের পর ভক্তবৃন্দ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিকে পূর্ব্ববৎ শকটারোহন করাইয়া শকটখানি পূর্ব্বোক্ত হর্ম্ম্য পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎপরে উক্ত হর্ম্ম্যে কলিকাতাবাসীগণকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এই ভোজনব্যাপার দর্শনে স্বতঃই

মনে উদিত হইয়াছিল যেন ত্রেতায় রাজর্ষিজনক কর্ত্তৃক ধর্ম্ম মহাসম্মিলনীতে ভোজন হইতেছে। ইহাও মহর্ষির একটি নূতন কীর্ত্তি। পূর্ব্বকালে এইরূপেই হিন্দুধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইত। তাই মনে হয় দেশের হাওয়া ফিরিতেছে। ভগবান্ মুখ তুলিয়াছেন।

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী।

প্রতিভা।

—:০:—

মানবদেহ নশ্বর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু যতদিন জগত থাকিবে ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরস্থায়ী,—প্রতিভাই চির-আদরণীয় ও পূজনীয়।

প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃতির সূক্ষ্ম-শক্তির পরিচায়ক ও তাঁহারাই মানুষের আদর্শ। প্রতিভা দৈবশক্তি বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের শক্তি বিসর্পিত।

প্রায় দুইশত পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে এক ঘটিকার সময় ইংলণ্ডের লিঙ্কন প্রদেশস্থ উলষ্টারওয়ার্থগ্রামে একজন দরিদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র কুঠিরে এক অসীম প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়। যাঁহার প্রতিভার বিকাশে জগত বিস্মিত ও চিরকৃতজ্ঞ, যাঁহার প্রতিভা এই জগতকে জ্ঞানালোকে বিভাসিত করিয়াছে, সেই প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মহামতি সার আইজাক্ নিউটন্।

নিউটনের পিতামহের মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে, এবং তাঁহার মাতার বিবাহের কয়েক মাস পরেই নিউটনের পিতার মৃত্যু হয়। নিউটনের মাতা গর্ভাবস্থায় বিধবা হইলেন। অদৃষ্টক্রমে নিয়মিত প্রসবকালের পূর্ব্বে নিউটনের জন্ম হইল। এত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া নিউটন জন্মগ্রহণ করেন যে তাঁহার মাতা বলিতেন, যে তাঁহাকে সে সময়ে সম্ভবতঃ একটী ক্ষুদ্র কলসে রাখা যাইতে পারিত, এবং যাহারা তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী কোন চিকিৎসকের নিকট গিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে চিকিৎসক লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বালকটী মরিয়া যাইবে। কিন্তু, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়। যে ক্ষীণ দেহ দেখিয়া সকলে ভাবিয়াছিল বালক এখনই মরিবে, সেই দেহ ক্রমে সবল হইয়া সুস্থভাবে পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত জীবন ধারণে সমর্থ হইল।

সুতরাং বলিতে হইবে নিউটনের জন্ম শুভমুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইয়াছিল। মানুষ জগতে তাহার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া থাকে; যেরূপ কার্য্যে সে নিয়োজিত হয়, সেই রূপ মুহূর্ত্তেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে। নিউটনের জন্ম সময়ে তুলারাশির ২০ অংশ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছিল; রবি মকররাশির ১৪ অংশে, চন্দ্রকর্কট রাশির ২ অংশে, বুধ ধনুরাশির ২১ অংশে, শুক্র কুম্ভরাশির ২৭ অংশে, মঙ্গল বৃষরাশির ৭ অংশে বৃহস্পতি মীন রাশির ১৪ অংশে, ও শনি মীন রাশির ২০ অংশে, অবস্থিত ছিল।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে নিউটন বিদ্যাশিক্ষার্থ নিকটস্থ এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। একে শৈশবে—জন্মের পূর্ব্বেই—পিতার মৃত্যু, অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তদুপরি বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ বড় সহজ নহে, সুতরাং অতি কষ্টে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন

মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ও বিনা বাসা খরচে ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইলেন। এইস্থানে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি কৌতূহল বশতঃ এক-খানি ফলিত জ্যোতিষের পুস্তক ক্রয় করেন এবং তাহা পাঠকালে তাঁহার গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল।

ফলিত জ্যোতিষে নিউটনের বিশেষ আস্থা ছিল। প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি এই শাস্ত্র সম্যক্ রূপে আলোচনা করিতেন। দুঃখের বিষয় যে, ফলিত জ্যোতিষ মহামতি নিউটন, বেকন, কেপ্লার প্রভৃতি মনস্বীগণ সত্য বলিয়া বিশেষ আদর করিতেন আধুনিক কতিপয় শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তি সেই ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অগ্রে এই শাস্ত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া পরে অবিশ্বাস করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই এই শাস্ত্র অসত্য প্রমাণে সমর্থ হন নাই, বরং যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিউটন বড় কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় বড় স্নেহপূর্ণ ছিল, এমন কি কথিত আছে যে তাঁহার প্রিয় সারমেয় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমুদায় নষ্ট করিলেও, তিনি কেবল দুঃখপূর্ণ ও স্নেহময় স্বরে বলিয়াছিলেন, "তুমি জান না আজ কি ক্ষতি করিয়াছ।" তাঁহার ন্যায় ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট লোক ইহ সংসারে অতি বিরল।

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিউটন কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রয়েল সোসাইটীর একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি যে প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাহা তখন সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে বৃক্ষ হইতে একটী আপেলের ভূতলে পতন দৃষ্টে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটীর প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই।

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের বিশেষ মানসিক পরিশ্রমে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে নিউটনের শরীর ভগ্ন হইল। এই সময়ে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য ছিল না, সর্ব্বদাই বিষাদচিত্তে অবস্থান করিতেন।

অজীর্ণ ও যকৃতের পীড়ার একটী প্রধান আনুষঙ্গিক লক্ষণ, বিষাদচিত্ততা। বয়সকালে নিউটন বাতরোগেও আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং চিকিৎসকেরা তাঁহার মূত্রাশ্মরী রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় অজীর্ণাদি রোগে আক্রান্ত হন; তদুপরি উৎসাহ ভগ্নতার ও দারিদ্র দুঃখের জন্য সরল ও নম্র প্রকৃতি নিউটনের যে মানসিক বিকার উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। অবশ্য নিউটনের যে চিত্তবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হইয়া-ছিল তাহা নহে; তাঁহার জীবন তাঁহার নিকট নানা কারণে বিষাদপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত; জীবনে আদৌ সুখানুভব করিতে পারেন নাই। যদি একবারে তাঁহার মানসিক বৈলক্ষণ্য হইত তাহা হইলে তিনি তাঁহার সময় বিদ্যালোচনায় অতিবাহিত করিতে ও নূতন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইতে পারিতেন না। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে বুধগ্রহ শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার

মানসিক বিষাদপূর্ণতা সূচিত হয়, এবং চন্দ্র কর্কট রাশিতে (উদর বোধক,) মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় অজীর্ণাদি রোগ সূচিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত আছে, চন্দ্র ও রবি কর্কট বা মকর রাশিতে অবস্থান করিলে জাতকের রাজনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের স্পৃহা বুঝায়। নিউটন অধিকাংশ সময় ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু জীবনের এক সময় বিশেষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎ পূর্ব্ব হইতে উক্ত খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সদস্য ছিলেন।

নিউটনের প্রতিভা কেবল বৈজ্ঞানিক জগতে নহে, নানা বিষয়েই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা যতকাল জগতে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে ততদিন সকলের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এত প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন বিষাদপূর্ণ ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহার জীবনের মহাকষ্টের এক প্রধান কারণ। দারিদ্র দোষই গুণরাশি নাশ করিয়া থাকে। অর্থকষ্ট হেতু রয়েল সোসাইটীর বাৎসরিক সামান্য চাঁদাও দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে উক্ত সভার সদস্যতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমে এই অসীম ও অতুলনীয় প্রতিভাকে একটী বিদ্যালয়ের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং যদি জনৈক বন্ধুর সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে সেই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। নিউটনের প্রতিভা সম্বন্ধে কবি পোপ বলিয়াছেন,

"Nature and Natu's laws, lay hid in night,
God said, 'Let Newton be !' and all was light"

যদিও নিউটনের প্রতিভা যথা সময়েই বিকাশপ্রাপ্ত ও স্বীকৃত হইয়াছিল; তথাপি তাঁহার দুঃখ কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। এরূপ অসামান্য প্রতিভা দেশের লোক কর্ত্তৃক যথার্থ আদর প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহাকে জীবিকার নিমিত্ত জনৈক বন্ধুর উপর নির্ভর করিতে হইত। এরূপ দুর্দ্দশা তাঁহার কোষ্ঠী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ভাগ্যাধিপতি বুধ, শনি দৃষ্ট, এবং শুভগ্রহ বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে শনিযুক্ত, সুতরাং জীবনে শনির প্রাবল্যই অধিক। শনির প্রভাবেও তৃতীয়স্থানে বুধ থাকায় এবং অন্যান্য শুভগ্রহ দৃষ্ট হওয়াতে বিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য বুঝায় এবং রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রে থাকায় বহু সম্মান লাভ বুঝায়। দ্বিতীয়াধিপতি অর্থাৎ ধনাধিপতি মঙ্গল অষ্টমস্থ অর্থাৎ কুস্থানে স্থিত ও শনিদৃষ্ট সুতরাং জীবনে অর্থকষ্ট স্পষ্ট বোধগম্য হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনায় বেশ বুঝা যায়, কেন একজন নীচ, স্বার্থপর ও কুস্বভাব বিশিষ্ট লোক সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করে, এবং কেনই বা একজন সরল, উদার, প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ উপেক্ষিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুসারে এ জগতে সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। প্রতিভা ও জগতের সুখ সম্পদ তুল্য মূল্য নহে; একটী অমূল্য অন্যটী অকিঞ্চিৎকর; একটী চিরস্থায়ী অন্যটী নশ্বর।

সামান্য কৃষকের গৃহে প্রতিভার উদয় জগতে সর্ব্বোচ্চ চিরস্থায়ী সম্মানলাভ তাহার পরিণাম। জ্যোতিষশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত দারিদ্র-যোগ অভ্রান্তরূপে মিলিয়াছিল, আবার "দৃশ্যতে যুক্ততে বাপিচন্দ্রজেন বৃহস্পতিঃ। শিরসা শাসনং তস্য ধারয়ন্তি নৃপাস্তদা॥" এই বাক্যটীর সত্যতা সহজে উপলব্ধি হয়। তৃতীয় স্থান হইতে বুধ

বৃহস্পতির উপর দৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং বিদ্যা-সম্বন্ধে (তৃতীয় স্থান সূচক) অতুল সম্মান লাভ সূচিত হয়।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ নিউটন অত্যন্ত পীড়িত হন এবং চিকিৎসক মীড্ তাঁহার বৃহদশ্মরী রোগ নির্ণয় করেন। ২০শে মার্চ্চ সোমবার প্রাতে এক ঘটিকা ও দুই ঘটিকার মধ্যে ৮৫ বৎসর বয়সে নিউটন ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। বৃষরাশিতে অষ্টমস্থ মঙ্গল মারক, সুতরাং জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে বৃহদশ্মরী রোগে মৃত্যুসূচিত হইতেছে।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নিউটন বলিয়াছিলেন, "আমি জানি না, জগত আমাকে কিরূপ ভাবে ভাবিবে; কিন্তু আমি জানি যে সামান্য বালকের ন্যায়, অকূল সমুদ্রের বেলা ভূমিতে খেলা করিতে করিতে দুএকটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু সম্মুখে বহুমূল্য রত্নপূর্ণ অসীম জ্ঞান সাগর প্রচ্ছন্ন ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে।"

শ্রীফকিরচন্দ্র জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিকার।

—০:(*):০—

সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম হিতব্রত গ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের হিতকামনায়—বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার পিতৃদেবের মন্ত্রশিষ্য সুজাগঞ্জের ব্রজমোহন রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দেশের সমগ্রবিপদবিনাশী এক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সাতদিন সাতরাত্র ধরিয়া এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। এই যজ্ঞের নাম "সর্ব্বজিৎ যজ্ঞ" দেওয়া হইবে এবং যজ্ঞ-সমাপনান্তে যজ্ঞদর্শনেচ্ছু সমবেত জনসঙ্ঘকে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রকৃত অবনতি ও অধঃপতনের কারণ সমূহ যথাসম্ভব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। সাধু যাঁর উদ্দেশ্য ভগবান তাঁর সহায়। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কিছুরই অভাব হইল না। এই যজ্ঞানু-ষ্ঠানের সংবাদ প্রচারিত হইলে পর এমন কি বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জন সমূহ যজ্ঞদর্শন মানসে বিজয়পুরে সমবেত হইতে লাগিলেন। সাতদিন সাতরাত্র ধরিয়া মহাযজ্ঞের মহানুষ্ঠান চলিল। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপনান্তে সর্ব্বভৌম মহাশয় সমবেত জন সমূহের সমীপে দেশের প্রকৃত অধঃপতনের বিষয়গুলি—বিশদরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জন সঙ্ঘও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বাক্যগুলি অভ্রান্ত বলিয়া—শ্রবণ করিতে লাগিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় ধীর গম্ভীরস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—বাঙ্গলা নদ নদী বহুলদেশ, প্রতি নদ নদীর তীরভূমি মনুষ্য এবং স্থলচর প্রাণি-গণের বাসস্থল, পরন্ত নানা জাতীয় ফল পুষ্প প্রসূ তরু, গুল্ম, ক্ষুপ বল্লরীর প্রশস্তক্ষেত্র। বাঙ্গ-লার মাঠ, গো প্রভৃতি তৃণভোজি পশুগণের উৎকৃষ্ট চারণভূমি; সে দেশের নিম্নতর স্থান উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র। বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য ও ভীরু-তার অপবাদ নাই। সুতরাং এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ একটী নহে; বহুকারণ সমবেত হইয়া বাঙ্গলার অবস্থান্তর সংঘটন করিয়াছে এবং বাঙ্গালীকে অধঃপাতে

দিতে বসিয়াছে। সেই সমস্ত কারণের মধ্যে বাঙ্গালার পার্থিবী বিপরিণতি, বাঙ্গালার জঘন্য যুগের আবির্ভাব, বাঙ্গালীর অব্রহ্মচর্য্য, বীজদোষ, ক্ষেত্রাশুদ্ধি, অসত্ম্য আহার, অনুচিত বিহার, আচার ভ্রংশ, অনুচিত অনুকরণপ্রিয়তা, শিক্ষা-বিভ্রাট এবং বাঙ্গলার দেশও প্রকৃতি, মনুষ্য প্রকৃতির প্রতিকূল রাজবিধি ও চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা এই দ্বাদশটী কারণ সর্ব্বাগ্রণ্য। দীর্ঘকাল যাবত বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী উক্ত কারণ সমুচ্চয়ের বশবর্ত্তী রহিলে অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হইবে। দেশের উপচিকীর্ষু নেতৃগণ প্রতি-কারণের উচ্ছেদে যত্নপরায়ণ রহিলে দেশের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাদৃশ দুষ্করকার্য্যে জন-সাধারণের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণের সাহায্য না পাইলে দেশহিত ব্রত পরায়ণ নেতৃগণ সিদ্ধ মনো-রথ হইবেন না।

ভূস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে জায়মান বা উপচীয়মান অবস্থায় জল-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন ছিল, বর্দ্ধমান অবস্থায় অরণ্য এবং বনচর প্রাণীর আবাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে, দেশ সুস্থিত হইলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য আসিয়া তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করে।

বাঙ্গালাদেশের প্রবাহিত একটী নদ বা নদীর তটদেশ হইতে অপরের তীরভূমি বহুদূরে অবস্থিত নহে। উভয়ের মধ্যস্থিত স্থলভাগ নাদেয়ান্তরাল ক্ষেত্র নামে অভিহিত। নাদেয়ন্তরালের মধ্যবর্ত্তী-ভূমি নিম্নপ্রান্তর বা বিল। সেই নিম্নস্থান ক্রমশঃ নদতটাভিমুখে উৎসারিত হইতে হইতে উভয়ের তটভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতর ভূমির জল নিঃসরণের জন্য নাদেয়ান্তরালের মাঝে মাঝে খালও বিদ্যমান ছিল। বঙ্গদেশের সুস্থিতিকালে বঙ্গসাগরের তীরভূমি, অধুনাতনী ভূমির ন্যায় নিম্নতর ছিল না; লোক-বসতির উপযোগী উচ্চতর ক্ষেত্র ছিল। নদ-নদীর তটদেশে এবং সাগরের উপকূলে আদৌ লোকালয়ের পত্তন হয়। তার পর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, নদীতটের দূরবর্ত্তী উচ্চতর স্থানে, আর কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত, কৃষক এবং ধীবর প্রভৃতি জাতি, নিম্নতর খাল বিলের ধারে বাসভূমি রচনা করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল। এইরূপে কালক্রমে বাঙ্গালাদেশ নানা-জাতীয় নরনারীর অধ্যুষিত ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এক নূতন রাজ্য এবং রাষ্ট্রিকের সৃষ্টি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, রাজ্য, বাঙ্গালা নামে আর রাষ্ট্রিক বাঙ্গালী নামে অভিহিত।

বাঙ্গালা যখন সুস্থিত ছিল, তখন সমস্ত শাখা-প্রশাখা নদ-নদীর এবং খাল-বিলের মোহনা উন্মুক্ত ছিল। বিপুল পার্ব্বতীয় স্বাদু-সলিলরাশি আর বর্ষার প্রভূত জল অবাধে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়িত। উচ্ছ্বসিত সাগরের জল সেই নদীবেগে প্রতিহত হইত, তজ্জন্য ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অত্যুৎকট বিস্বাদু সাগরের জল ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে নদীপথে সংক্রমণ করিতে পারিত না। আর তখন সাগরের উপকূলভাগও এখনকার মত নিম্ন ছিল না। সুতরাং উচ্ছ্বসিত সাগর-জল দেশ ডুবাইতে ও শস্য হানি করিতে বাধা পাইত। এই সকল কারণে এবং বক্ষ্যমাণ অন্যান্য কারণে সুস্থিত বঙ্গভূমি "সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা" ছিল। বাঙ্গালার জলও মনুষ্য ও পশুগণের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল না। আর খাদ্যাভাবে লোকের শরীর জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইত না।

যে দেশের স্রোতস্বতী সকল অনিরুদ্ধগতি, প্রভূত বৃষ্টির জলে যে দেশের বাসস্থের ভূমি এবং নিম্ন স্থানে সঞ্চিত রিক্ত আবর্জ্জনা নিধৌত হইয়া অবাধে ও নিঃশেষে স্রোতজলে পড়িয়া বহুদূরে অপসারিত হয়, যেখানে বহুল ছায়া বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়া বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণশীল দুষ্টবাষ্প শোষণ করিয়া পবনকে পবিত্র করে, যে দেশের বনরাজির তুষ্টিপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য, পর্জ্জন্যদেব যথাকালে প্রচুর সলিল বর্ষণ করে, যথায় স্নান-পানাবগাহনের উপযোগী প্রশস্ত জলাশয় বিদ্যমান থাকে এবং যে দেশে জীবের আজীব ফল-শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত হয় না, সেই দেশকে সুস্থিত দেশ বলে। এক সময়ে এই বঙ্গদেশ সুস্থিত ছিল। সেই সুস্থিতি কাল কত দীর্ঘ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কালক্রমে প্রকৃতির প্রতিকূলতায় এবং মনুষ্যের কর্ম্মদোষে সেই সুস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিবর্ত্তনাধীন। বিবর্ত্তিত অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া কিছুই একভাবে ক্ষণমাত্রও স্থির রহে না। সকল ভাবই অনুক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশও এই নিয়মাধিন। যে উপাদানে বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছিল, যাহার সু-সংস্থানে বঙ্গদেশের সুস্থিতি ঘটিয়াছিল, সেই জল আর জলগত পার্থিব রেণু শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালার জল-স্থলের বিপরিণতি ঘটাইয়াছে। আজিও সে ঘটনার বিরাম নাই।

প্রকৃতির আনুকূল্যে দেশ সুস্থিত হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় দেশের বিপরিণতি ঘটে, কখন কখন দেশ নিমগ্ন হইয়া যায়। দেশ, প্রকৃতির লীলাভূমি, মনুষ্যের কর্মক্ষেত্র। লোকের কর্মগুণে দেশের সুস্থিতিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কর্মদোষে তাহার বিঘ্ন ঘটে। মনুষ্যের কর্ম্মদোষে বাঙ্গালার যে অবস্থান্তর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহাও অতি ভয়াবহ। প্রকৃতির ক্রীড়া এবং মানবের অবিমৃশ্যকারিতায় দেশের বিপরিণতি ঘটিয়াছে। সুতরাং পার্থিবী বিপরিণতি দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাকৃত, অপর লোককৃত। দেশ রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উভয় প্রকার বিপরিণতির প্রতিকার করিয়া দেশকে সুস্থিত করিতে হইবে।

আর ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠবল উপলব্ধি করিয়া এবং এ বিশ্ববিধানে আমাদের প্রাণপাতের একটা নিশ্চয়ই প্রতিদান আছে এই ধ্রুবসত্যের উপর আস্থাস্থাপন করিয়া দেশহিত ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে।

(সমাপ্ত)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
কবিরত্ন।

Registered No. C. 439.

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]   [চৈত্র ১৩১৪ সাল।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সম্পাদক—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ, শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, শ্রীকামিনীকুমার চন্দ্র এম্, এ, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীননাথ কবিরত্নশাস্ত্রী, শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী; পি দত্ত F.C.S.PH.B. শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-কুমার কবিরত্ন, শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষা-র্ণব, শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ডাক্তার মৈত্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ আর্য্যভূমি পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতা, ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ঘোষপ্রেসে মন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও ১৮।১ নং শিমলা ষ্ট্রীট, আর্য্যভূমি কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা।)

(প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা।)



চীনের বর্ত্তমান সম্রাট।

আর্য্যভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

১ম বর্ষ। } চৈত্র ১৩১৪ সাল। { ১২শ সংখ্যা

গূঢ়শক্তি।

—:০:—

এই বিশ্ববিধানে অসম্পূর্ণ কোন ব্যাপারই সৌভাগ্যবশতঃ মানবজাতিকে বিশ্রামভোগের জন্য স্বল্প অবসরও প্রদান করে না। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যখন কোন একটি জাতি জাতীয় জীবনের হীনতা ও দুর্ব্বলতা জানিতে পারে,—উপলব্ধি করিতে পারে, তখন পরস্পর যেরূপ এক রক্তের, জাতির, ভাষার ও দেশের বন্ধনে বদ্ধ, সেইরূপ উদ্দেশ্যে, আকাঙ্খায় ও একতায় পরস্পর অভিন্ন হইয়া পড়ে। যখন কোন জাতির মধ্যে এরূপ একটা গভীর ও বহু বিস্তৃত ভাবের প্রাধান্য ঘটে, তাহা নিতান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও উপেক্ষনীয় নহে ইহা ধ্রুব সত্য। জাতিটীর এই ঘোর বিবর্ত্তনশীল অবস্থার সময় জানিনা কি এক মহীয়সীশক্তি তাহাদের শত মতান্তর, শত মনান্তর, শত বিদ্বেষ বহ্নি প্রশমিত করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইবার পক্ষে অলক্ষ্যে সহায়তা করে। এই অভিনব বলে বলীয়ান্ হইয়া জাতিটি যেন জগৎ সংসারকে

লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, "জগৎ, কালস্রোতের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না, জাতীয় হীনতার যুক্তি-দ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিও না। আমাদের সম্মুখে এক্ষণে দুইটী পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইতেছি,—একপথ জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্বিত ও সন্তোষ তৃপ্ত হওয়া; অপর পথ চির-আক্ষেপ ভূমিতে, লজ্জায় ও ঘৃণায় নতশীর হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।" বস্তুতঃ জাতিটী যখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় তখন তাহার প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; আর তাহাদের সাধনাও যে ব্যর্থ হইবার নহে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ তাহাদিগের মধ্যে নীরবে যে মহাশক্তি দিন দিন তাহাদিগকে এক মহা জাতীয়-ভাবে সম্মিলিত করিয়া, মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষার্থ তাহাদিগকে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রাণের মধ্যে এক নবীন উদ্যম ও উৎসাহ জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে তাহার গতিরোধ করা মানবশক্তির ও মানব কৌশলের অতীত। এবং যাঁহারা এখনও বলিতে সাহস করেন যে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তার জন্মলাভ করে নাই তাঁহাদের প্রতিবাদ যে নিতান্ত অসার ও ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তৎপ্রতিপাদনার্থ অধিক দূর যাইতে হইবেনা। কারণ জাতীয় জীবনের এক একটী জ্বলন্ত প্রাণপাতের ব্যাপারই এইরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। জাতিটীর এই ঘোর পরিবর্ত্তনের দিনে তাহার হৃদয়ে কত আশা, কত পিপাসা, কত আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, জগত সংসার বলিতে পারেন, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা সমূহ নিতান্ত অসাময়িক; কিন্তু মানবের সকল আদর্শই কালাতীত হইয়া থাকে; এবং উন্নতির আশা না থাকিলে, মনুষ্যজীবন নিতান্তই অর্থহীন ও লক্ষ্য-হীন। আদর্শ না থাকিলে, কোন আশাই থাকে না; এবং আশা না থাকিলে ধর্ম্ম বল, আকাঙ্ক্ষা বল, উৎসাহ বল, সৎকর্ম্ম বল, কিছুই থাকে না। প্রকৃত আদর্শ, স্বপ্ন ও অসার কল্পনা নহে—ইহা মানবের অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং সকল হিতকর কার্য্যের গূঢ়শক্তি।

সিন্ধুপারে।

—:০:—

তুমি চলগো সিন্ধুপারে,
তুমি লওগো সাথে মোরে,
রবির কিরণে আমারি তুমি
আমারি ঝটিকা তুফানে।

ঋতুর পরে ঋতু যায়,
কিন্তু বাঁধা যে ভালবাসায়,
চিরদিন তার টান্ যে সমান—
যাক্‌না কেন যেথানে।

নিয়তি থাক্ চেয়ে কঠোর চখে,
সে কভু নহেগো অসহ;
জীবন—সে ত মিলিন তব সনে
মরণ—তোমারি বিরহ।
তবে, চলগো সিন্ধুপারে,
তুমি লওগো সাথে মোরে,
বহেনা যেথায় ঝটিকা তুমুল
চলগো যাই দু'জনে।
ঋতুর পরে ঋতু যায়,
কিন্তু বাঁধা যে ভালবাসায়,
চিরদিন তার টান্ যে সমান—
যাক্‌না কেন যেথানে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস।

—:০:—

গোবিন্দ দাস, বৈদ্যবংশজাত চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠপুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত দামোদরের দৌহিত্র সন্তান—শ্রীখণ্ডে ইঁহার মাতুলালয়। কুমার নগরে চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস। ইনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া সেথান হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দ দাসের মাতামহ একজন শক্তি-উপাসক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাহায্যে গোবিন্দ দাসও প্রথম বয়সে শাক্ত হন। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, গোবিন্দ দাসের জন্ম সময়ে তদীয় জননী যখন প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন সেই সময় তাঁহার মাতামহ ভগবতী পূজায় নিরত ছিলেন। দাসী এই সংবাদ তাঁহার গোচর করিলে তিনি কথা না কহিয়া হস্ত ভঙ্গিমার দ্বারা দুর্গাদেবীর যন্ত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে এই যন্ত্র প্রদর্শন করাইলেই নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হইবে। কিন্তু দাসী তাহা বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্র ধৌত করিয়া জলপান করাইলে গোবিন্দ দাস ভূমিষ্ঠ হন।

গোবিন্দদাস এক সময়ে গ্রহণী রোগাক্রান্ত হওয়ায় কাতরভাবে ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করেন। প্রবাদ আছে যে ভগবতী স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূজা ব্যতীত তোমার মুক্তি হইবে না।

এই প্রত্যাদেশ শ্রবণের পর প্রেমধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত বড় অস্থির হইয়া উঠে। তিনি অবিলম্বে মন্ত্রগ্রহণমানসে কুমার নগর হইতে জাজীগ্রামে আচার্য্য ঠাকুরের নিকট আগমন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছেন। এ সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে শ্রীখণ্ডে ও কাঞ্চন গরিয়ায় উৎসব সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র ও অন্যান্য শিষ্য সঙ্গে বুধরী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধে গোবিন্দদাসকে দীক্ষিত করেন। ১৫৭৭খৃঃ তাঁহার এই দীক্ষা সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া নীরোগ হইলেন। দীক্ষান্তে গোবিন্দদাস আচার্য্যের অনুরোধে "গীতামৃত" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

গুরুদেবের আদেশক্রমে তিনি নির্য্যাসতত্ত্ব মতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদরচনা করিতে আরম্ভ করেন। নির্য্যাসতত্ত্ব একখানি কুলার্ণব গ্রন্থ, ইহাতে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের বিধি আছে। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী ঈশ্বরীর সহিত তিনি খেতরী হইতে বৃন্দাবনধাম গমন করেন, সেখানে জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি ব্রজবাসী মোহান্তগণ তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার "গীতামৃত" পাঠে জনৈক ব্রজবাসী বলিয়াছিলেন—"কবীন্দ্র শ্রীগোবিন্দরূপ মলয়গিরি হইতে চঞ্চল বসন্তানিলানীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুধাময় কবিতাবলীর পরিমল, শ্রীজীবরূপ সুরতরুআশ্রিত অলিকুলকে আমোদিত করিয়া ব্রজবাসী সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে।" জাহ্নবী ঈশ্বরীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব মহান্তগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া বুধরীতে ফিরিয়া আসেন।

তৎপরে তিনি আচার্য্য ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে কখনও আজীগ্রাম, কখন শ্রীখণ্ড, কখনও বুধরী, কখনও খেতুরীতে সংকীর্ত্তনানন্দে ভাগবৎ ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মপ্রচারে দিনপাত করিতেন। গোবিন্দদাসের পদ সমূহ কাঁচা গড়ীয়ানিবাসী চৈতন্য সহচর দ্বিজ হরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদামদ্বারা বৈষ্ণব মণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত এবং গীতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভু ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন।

নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে তিনি "সঙ্গীতমাধব" নামক রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় এক নাটক রচনা করেন। ইহাছাড়া অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু পদও তাঁহার রচিত।

গোবিন্দের ২৫।২৬ বৎসর বয়সে তদীয় পত্নী মহামায়ার গর্ভে দিব্যসিংহের জন্ম হয়। তিনিও পিতার অনুরূপ ভক্ত ছিলেন। দিব্য সিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। ইনিই "কর্ণামৃত" নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা।

কবি বিদ্যাপতির উপর গোবিন্দ দাসের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় গোবিন্দদাস মিথিলার বিস্‌ফি গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া আসেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদও তিনি উদ্ধার করিয়া আনেন। অনেক স্থলে বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দদাসের নামের যুগ্মভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদগুলি সম্পূর্ণ করিয়া বিনীতভাবে বিদ্যাপতি নামের নীচে নিজ নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিতায় যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের এবং তদীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের এবং রাজমহলের ফৌজদার রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য সন্তোষ রায়ের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাস ১৬১৩ খ্রীঃ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দদাসই পদ কর্ত্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। কৈশোর, মধ্যাহ্নলীলা, নৌকা বিহার, দীনলীলা, রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার রূপ, নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, বাসকশয্যা, মান, বিরহ প্রভৃতি বিবিধচিত্রে গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তি যেন সহস্রমুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় যেন চরাচরের জন্য স্বর্গীয় সুধা ও সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিবার জন্য গোবিন্দদাসের কবিত্বের সৃষ্টি। গোবিন্দদাসের ভাষায় যদিও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মতভাবের গভীরতা কিম্বা বিদ্যাপতির ন্যায় বর্ণনা চাতুর্য্য নাই কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা মধুর করুণ উচ্ছ্বাস, প্রেমের সংযতভাব, সৌন্দর্য্য বর্ণনের অপূর্ব্বকৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দ যোজনার পারিপাট্যে, এবং ভাবের প্রগাঢ়তায়, গোবিন্দদাস তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সমস্ত কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শব্দ বৈভবের সীমা ছিল না। তিনি অনেকগুলি পদ একটি আদ্য অক্ষরের কথা দিয়া রচনা করিতে পারিতেন অথচ তাহাতে ভাব শব্দশৃঙ্খলাবদ্ধ হইত না।

এক্ষণে আমরা অমর কবির কবিতায় মন্দাকিনীধারা, প্রেমের উৎস যে বৈকুণ্ঠের দিকে

ছুটিয়াছে, কবির প্রাণের দেবতার মন্দির, সংসারের বহু ঊর্দ্ধে যে স্পর্শ করিয়াছে তাহারই কয়েকটী চিত্র তাঁহার পদাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

প্রেমের নীরব আকর্ষণের স্বর্গীয় চিত্র কবির অমর তুলিকায় কি সুন্দর ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে ;—

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে॥
যদি চলিতে না চাহ কানুর পাশে
চরণে থিরনা বান্দে।
গোবিন্দদাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥

কবি একস্থলে লিখিয়াছেন ;—

দরশনে ন হত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিদুরত মরমে মরম মাহা পৈঠত
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন দুঁহু ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

আহা মরি মরি প্রেমের কি প্রগাঢ়তা! হৃদয়ের কি ঐকান্তিকী আকুলতাই চিত্রিত হইয়াছে।

সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ-প্রেম—যে প্রেম সংযত, যে প্রেমে তন্ময়তা আছে, যে প্রেম ভক্তিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, যে প্রেমে অভিমান চিরদিনের তরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাধিকা বলিতেছেন ;—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

সখি, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার শ্রীচরণের দাসীই করুন অথবা মহা কষ্টেই রাখুন, কিম্বা দেখা না দিয়া আমার প্রাণ হরণই করুন, অথবা তিনি বহু বল্লভ হইয়া যথাতথা বিচরণই করুন, তিনিই আমার প্রাণবল্লভ।

স্থানান্তরে ;—মরিব মরিব সই নিশ্চয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউমে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুক্তি এই বর সার॥"

তন্ময় ছাড়া, মহাভাবে মিশিয়া যাওয়া ছাড়া রাধিকার প্রেমক্ষুধা আর কিসে মিটিবে?

রাধিকা বলিতেছেন ;—

"প্রেমক দহন প্রেম পরে শীতল
আন হোয়ত নাহি আন॥"

কবি বলিতেছেন ;—

যে তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যামজলরস আশে।
সো অবনীরে ঘন সিঞ্চহি
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥

যে প্রেমতরু শ্যামজলদ-জল আশায় রোপণ করিয়াছ, এই নয়ন কমলের অশ্রুধারা সিঞ্চন কর উহাতেই সে পরিণতি লাভ করিবে—প্রাণনাথের দর্শন পাইবে বৈকি?

গোবিন্দ, অমর কবি গোবিন্দদাস, সাধক কবি গোবিন্দদাস! তোমার এ আশ্বাসবাণি কি শুধু শ্যাম পাগলিনী শ্রীরাধিকার পক্ষে না সমস্ত নর-নারীর পক্ষে, না সমস্ত পাপী তাপীর পক্ষে, না

সমস্ত অতৃপ্ত প্রাণের পক্ষে; ইহা কি আশ্বাস-বাণি না জলন্ত সাক্ষ্য! না জলন্ত অনুভূতি! এ উক্তি তোমার ন্যায় সাধক কবির মুখেই শোভা পাইয়াছে।

প্রেমের শেষ পরিণাম তন্ময়তা, তাই রাধিকা বলিতেছেন :—

যাঁহা যাঁহা পঁহু অরুণ চরণ চলিয়াত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী, হও মঝু গাত॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখচাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তছু মাহ॥
যো সরবরে পঁহু নিতি নাহ্।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোহ বীজনে পঁহু বীজহত গত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ধাম॥

প্রভু তোমাতে আমাতে অভিন্ন। আমি কেমন করিয়া তোমায় ছাড়িয়া থাকিব?—তুমি কমল, আমি জল, তুমি নিশ্বাস, আমি বায়ু, তুমি তরু, আমি ছায়া, তুমি জলধর আমি গগন, তুমি সঙ্গীত আমি শব্দ, তুমি চিত্র আমি বর্ণ তোমাতে আমাতে অভিন্ন। কবি কি সুন্দর তন্ময়তার চিত্রই আঁকিয়াছেন!

পরিশেষে অমর কবি হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি মহাভাবের অনন্ত প্রবাহে ফেলিয়া দিয়াছেন; জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য চির আকাঙ্ক্ষিত দেবতার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন। কবি গাহিয়াছেন;—

"যাকর চরণ নখর রুচি হের ইতি
মুরছয়ে কত কোটীকাম।"

ধন্য সাধক কবি গোবিন্দ দাস! ধন্য তোমার কবিত্ব! ধন্য তোমার কবিত্বের শক্তি! ধন্য তোমার কবিত্বের সৌন্দর্য্য; ধন্য তোমার কবিত্বের ভাষা! যে দিক দিয়াই দেখি সবই বিচিত্র। যিনি সাধক তিনিই তোমার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। আমরা তোমার পদাবলী পড়িয়া ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি।

ঝটিকা।

—:*:—

"When the planets,
In evil mixture, to disorder wander,
What Plagues ! and what portents ! what mutiny !
What raging of the sea ! shaking of the earth !
Commotion in the winds !"—SHAKESPEARE.

আধিদৈবিক বিপদের মধ্যে ঝড় অন্যতম। যে পবন জগতের প্রাণ স্বরূপ, তিনিই আবার সৃষ্টিধ্বংসের প্রধান কারণ। যে পবনদেবের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে তাপিতের ও শ্রম-পীড়িতের প্রাণ শীতল করে, যাঁহার মধুর হিল্লোলে চন্দ্রমা-চুম্বিত কুমুদ-কহ্লারের প্রমুদিত অঙ্গ-শিহরণ ও মধুময়ী প্রকৃতি মধুরিমায় গরিমময়ী হইয়া উঠে, সেই পবনদেবেরই বিক্রম প্রকাশে প্রলয় উপস্থিত হয়, —প্রকৃতির রাক্ষসীতালে ভীষণ নৃত্য, পৈশাচিক ভাষায় গুরু গম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি সমুত্থিত হয়! পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যত ক্রোধ বৃক্ষদের উপর পতিত হয়, সুতরাং তাহাদের কাহাকেও কবন্ধ, কাহাকেও হস্তহীন, কাহাকেও বা পদহীন করেন। তাঁহারই উত্তেজনায় মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়। একা ঝড়ের বিক্রমই অসহ্য, তার উপর যখন

দুইভাই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করেন, তখন কে সহিতে পারে বল? বৃক্ষেরা তখন বার বার ভূতলে ন্যস্ত হইয়া যেন বলে, "প্রভো! আর না, নিরস্ত হউন, যথেষ্ট দুর্দ্দশা হইয়াছে।" কে শোনে সে কথা?

কি কারণে পবনদেব উত্তেজিত হইয়া উঠেন তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু বায়ুচাপবৈষম্য যে ঝটিকার একটী কারণ, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত! যে কারণেই হউক পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং যদি পূর্ব্বাহ্নে পবনের উত্তেজনার সম্ভাবনা জানা যায় ও সাবধান হওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী বিপদের প্রতীকারে বহুল পরিমাণে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্ট ঝটিকা প্রভৃতির সম্ভাবনা নির্দ্ধারনার্থে ভারতের নানা স্থানে আবহ মানমন্দির (Meteorological Observatory স্থাপন) করিয়াছেন, এবং যদিও তাহাতে কতক পরিমাণে উপকার সাধিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের ফল বিশেষ সন্তোষজনক নহে। অনেক সময়ে, বড় জোর ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভাবী ঝটিকার সম্ভাবনা অবগত হওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা কোন বিশেষ উপকার সাধিত হয় না। এত অল্প সময়ের পূর্ব্বে সাবধান হওয়া—বিশেষতঃ যে সমস্ত জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রবক্ষে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে—এক প্রকার অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে আবার ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাধান্য স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, যদি এরূপ দেখান যায় যে রাশিচক্রে গ্রহদিগের বিশেষভাবে অবস্থিতিদ্বারা ঝটিকা সূচিত হয়, তাহা হইলে সহজে গ্রহদিগের উক্তরূপ অবস্থিতি গণনা দ্বারা অবগত হইয়া অনেক পূর্ব্বে ভাবী ঝটিকাদি সম্বন্ধে স্থির করা যাইতে পারে।

যে বিষয় আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই তাহা ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য অনেক বিষয় সত্য হইতে পারে, অথচ তাহার প্রমাণ দেওয়া সহজ নহে। আবার কোন কোন বিষয় একজনের নিকট সত্য বলিয়া অনুমিত হয়, অন্যের নিকট মিথ্যা বোধ হইতে পারে। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এই প্রকার যুক্তি চলে না। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ফল ব্যতীত কোন অনুমান বা যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক মত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি গ্রহদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ভাবে অবস্থিতির সহিত বাতাবর্ত্ত, বৃষ্টিপাত, আবহের উষ্ণতা চাপ ও আনুসঙ্গিক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সুভিক্ষাদির সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে গ্রহদিগের স্থিতি অনুসারে পার্থিব ব্যাপারের পরিণাম গণনা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বৃষ্টিতত্ত্বের * আলোচনায় আমরা কিরূপে রাশিচক্রে গ্রহদিগের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। সাধারণতঃ প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে গ্রহস্ফুট ও তাহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান সহজে অবগত হওয়া যাইবে। কেবল ইন্দ্রগ্রহের (Uranus) স্ফুট এবং গ্রহসমূহের ক্রান্ত্যংশ (Declination) ও চন্দ্রের অয়নান্তবৃত্তে (Solistitial Colure) অবস্থিতি জানিতে হইলে নাবিক পঞ্জিকা (Nautical Almanac) হইতে স্থির করিতে হইবে। স্থূলভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে, এই কয়েকটী বিষয় বাদ দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

* আর্য্যভূমি ১৫২-১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যখন কোন গ্রহ নিরক্ষবৃত্তে (Equator) অবস্থান করে, তখন তাহার শূন্য ক্রান্ত্যংশ হইয়া থাকে। যখনই কোন ঝড় বা বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়, তখন শনি, ইন্দ্র বা বুধগ্রহ হয় নিরক্ষবৃত্তে, নতুবা রবির সহিত একত্রে, সমক্রান্ত্যংশে, বা রবি হইতে ৬০, ৯০, ১২০ কিম্বা ১৮০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত থাকে; অথবা প্রবর গ্রহসমূহের (Superior planets) * মধ্যে দুইটীগ্রহ উক্তরূপ একত্রে, সমক্রান্ত্যাংশে বা পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দূর ব্যবধানে অবস্থিত ও তন্মধ্যে একটীর সহিত বুধগ্রহ উক্তরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কোন প্রবরগ্রহের সহিত বুধগ্রহ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং তৎসহ চন্দ্রও উক্তপ্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ কিম্বা অয়নান্তবৃত্তে অবস্থিত থাকে,—বিশেষতঃ, সেই সময় পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিকট হইলে,—ভীষণ ঝটিকাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রের উক্তরূপ সম্বন্ধ গ্রহদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সমাপ্তির অনুসারে ঝটিকাদি দুই চারি দিবস শীঘ্র বা দেরীতে হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক উপরোল্লিখিত নিয়মগুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ কি না। চিরস্মরণীয় আশ্বিনের ঝড় হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান বাতাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে তৎসমুদায়েই উক্ত নিয়মগুলি পরীক্ষা করা যাউক।

ইংরাজী ১৮৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে চারিঘণ্টা কাল স্থায়ী প্রলয় সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ রসাতল গত করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

এই ভীষণ বাতাবর্ত্তে অতি অল্পলোকেরই গৃহাদি রক্ষা পাইয়াছিল; বৃক্ষবল্লী সমুদায় সমভূম হইয়াছিল—কত জনক-জননী পুত্রকন্যা বিয়োগে হাহাকার করিয়াছিলেন,—কত বালক বালিকা পিতৃমাতৃ-বিয়োগজনিত সকরুণ রোদন ধ্বনিতে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক করিয়াছিল; কত স্বামীশোকবিধুরা বরাঙ্গনার মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বনের পশু, বৃক্ষের বিহঙ্গও কাঁদিয়া ছিল। ধবিত্রীগাত্রে, এবং নদনদীবক্ষে গতাসু নরদেহ দর্শনে দুঃসাহসিকেরও আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল; কতলোক সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়া ছিল। এই বিষম বিপৎপাতে হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটী জেলার লক্ষাধিক লোকের জীবনহানি হইয়াছিল।

কত শারদীয়া পঞ্চমী আসিতেছে ও যাইতেছে কিন্তু সেই পঞ্চমীতেই উক্তরূপ ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানের কারণ কি? গ্রহদিগের বিশিষ্টভাবে অবস্থিতি ভিন্ন অন্য কারণে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়া ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। উক্তদিবসের পরদিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করিতেছিল এবং তৎপর দিবস বৃহস্পতি হইতে বুধের ৬০ অংশ দূর ব্যবধান সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বৃহস্পতি হইতে বুধের উক্তরূপ ব্যবধান বাতাবর্ত্ত সূচক। কিন্তু তৎপূর্ব্ব দিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করাতে উক্ত ব্যবধান সম্পূর্ণ হইবার দুইদিবস পূর্ব্বেই এই ভীষণ বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়।

ইহার তিন বৎসর পরে ইংরাজী ১৮৬৭ সালের ১লা নবেম্বরে বিখ্যাত কার্ত্তিকের ঝড় হয়।

* রবি চন্দ্র, বুধ, ও শুক্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহসকলকে প্রবর গ্রহ কহে।

এই ঝড়ে প্রায় ৩০ হাজার গৃহভগ্ন হইয়াছিল, অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি ডুবিয়া গিয়াছিল, এবং প্রায় ৯০ হাজার লোক মরিয়াছিল। নিম্ন বঙ্গের বিশেষ শস্যহানি হইয়াছিল। এই দিবসেও চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে অবস্থান করিতেছিল এবং ইহার পূর্ব্বদিবসে মঙ্গল ও শনি দুইটী প্রবরগ্রহ একত্রে অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং ইহাদ্বারা ভীষণ ঝটিকা স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে।

পুনরায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানে মেদিনীপুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই মাসে প্রায় প্রত্যেক দিনেই রবি ও বুধগ্রহের সহিত প্রবর গ্রহসমূহের পূর্ব্ব কথিত দূর ব্যবধান দৃষ্ট হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার উপকূলে ভীষণ ঝটিকায় প্রায় পঞ্চসহস্র লোকের জীবনহানি হইয়াছিল। উক্ত দিবসে মঙ্গল ও ইন্দ্র দুইটী প্রবরগ্রহ পরস্পর ৬০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং তৎপূর্ব্বদিবসে রবি ও ইন্দ্রগ্রহ সমক্রান্ত্যংশে অবস্থিত ছিল।

১৮৮৮ সালের ৭ই এপ্রেল ঢাকা প্রদেশে এক ভীষণ ভ্রমি (tornado) উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দিবসে বুধগ্রহ ইন্দ্রগ্রহের সহিত সমক্রান্ত্যংশে এবং তৎপূর্ব্ব দিবস রবি ও মঙ্গল উক্তভাবে অবস্থিত ছিল।

১৮৯৭ সালের ২৪শে অক্টোবর চট্টগ্রামের ভীষণ বাতাবর্ত্তের কথা এখনও সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। উক্তদিবসে শনি বৃহস্পতি হইতে ৬০ অংশ ব্যবধানে এবং শনি ও ইন্দ্রগ্রহ একত্রে অবস্থিত ছিল।

বিগত ১৯০২ সালের ১লা মে ঢাকা প্রদেশে এক ভয়ঙ্কর ভ্রমির আবির্ভাব হয়। উক্ত দিবসে বুধ, বৃহস্পতি হইতে ৯০ অংশ দূরব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

উপরে যে কয়েকটী প্রধান প্রধান ঝটিকার উল্লেখ হইল, তাহাদের সমস্তগুলিতেই পূর্ব্ব কথিত নিয়মগুলির সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। পাঠকগণও যে কোন ঝটিকার দিনে উক্ত নিয়মগুলি পরীক্ষা করিতে পারেন।

ঝটিকাতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, যাহাতে সহজে সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন এরূপ ভাবেই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং যদি পাঠকবর্গের কৌতূহল আকর্ষণ করে তাহা হইলে বারান্তরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী
F. C. S.

হরিনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

—:০:—

হরিনাথ ন্যায়পঞ্চাননের বাস নদীয়া জেলার অধীন এক গণ্ডগ্রামে। পূর্ব্বে অনেক ন্যায়পঞ্চানন, তর্কপঞ্চানন, কবিরত্ন, ন্যায়রত্ন বেদান্তবাগীশ, বেদান্তচঞ্চু, গ্রাম খানিতে বাস করিতেন। কিন্তু এখন আর তাঁহারা ইহ সংসারে নাই। গ্রামে অনেকগুলি টোল ছিল, সেগুলিও বন্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি টোল আছে সে টোলের অধ্যাপক হরিনাথ ন্যায়পঞ্চানন। হরিনাথের পিতা বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ মহাশয় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "পাত্রাধার তৈল

কি তৈলাধার পাত্র” গোছের ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল। তিনি পণ্ডিত হইলেও ঘোর সংসারী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গ্রামেতো পণ্ডিত কুল নির্ম্মূল হইল, আর যে ক দিন আমি আছি তার পরতো গ্রামের নাম লোপ হইবে। যাহা হউক ছেলেটার যে স্থূল বুদ্ধি তাহাতে'ত ইহার রীতিমত একজন পণ্ডিত হইবার কোন আশা নাই। তবে ব্যাকরণের দুইপাতা, কাব্যের দুইপাতা ও ন্যায়ের দুইপাতা পড়াইয়া ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রিয়াকাণ্ডগুলিও শিক্ষা দিই। বছর দুই বাদে ছেলেটা-দুই একটা শ্লোক আওড়াইতে শিখিলে একবার টোলের বার্ষিক পরীক্ষার সময় বিল্ব গ্রামের শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আনাইয়া পরীক্ষা করাইব এবং তাঁহার দ্বারা "ন্যায়পঞ্চানন" এই উপাধিটা দেওয়াইয়া দিব, আর অতবড় লোকে উপাধিটা দিলে লোকে নিতান্ত অমান্য করিতে পারিবেনা, লোকে বলিবে ন্যায়বাগীশের বেটা ন্যায়পঞ্চানন, তবুও আমার কতকটা নাম থাকিবে।

হরিনাথের 'ন্যায়পঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্তির পর দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ মহাশয় পরলোক গত হইলেন। ছয়মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার স্বাধবী সতী পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিলেন। সংসারে রহিলেন হরিনাথ, তাঁহার যুবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধা পিসি।

হরিনাথের বুদ্ধি স্থূল ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ঠিক বিপরীত ছিল। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিনী ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সংসারে অভিভাবকের মধ্যে বৃদ্ধাপিসি ছাড়া আর কেহই নাই, তিনি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন সংসারের যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার মত না লইয়া করিতেন না। হরিনাথ সময়ে সময়ে পিসির উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তিনি হরিনাথের স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। হরিনাথের স্ত্রীও এই বীরত্ব প্রকাশের জন্য মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। তিনি বিনীত ভাবে স্বামীকে দশ কথা বুঝাইয়া বলিতেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।'

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর পর হরিনাথের অনেক বন্ধু জুটিতে লাগিল। এই সকল নবাগত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটি বাস্তুঘুঘু ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও পরামর্শে ক্রমে ক্রমে হরিনাথের মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পর হরিনাথের বৈঠকখানায় তিনি ও হরিনাথ উপস্থিত আছেন, মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ বুঝিয়া সময়োপযোগী প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। হরিনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে ন্যায়পঞ্চানন, শাস্ত্রে শুনিতে পাই পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা সোমরস পান করিতেন, এই সোমরস জিনিষটা কি জান?" হরিনাথ গাঁ, গোঁ করিতে লাগিলেন, কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন ঘুঘুটি বলিতে লাগিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন, তুমি কেবল ন্যায়েরই পণ্ডিত, কাব্যের তো ধার ধার না; অমরকোষে সোমের পর্য্যায় কি আছে মনে পড়ে?—সোমঃ তামরসঃ ইত্যমরঃ।" হরিনাথ তখন টিকি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ মনে পড়িয়াছে বটে।" তারপর হরিনাথের বন্ধু বলিলেন, পণ্ডিত, মনে পড়ে ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে, "মযোর্লয়োর্ণভেদঃ।" সুতরাং তামরস' আর 'তালরস' একই কথা। এই তালরসের অপভ্রংশে, তাড়ি হইয়াছে, এখন বুঝিলে 'সোমরস' জিনিষটা কি? দেখ, ন্যায়পঞ্চানন, ধরিতে গেলে এখন তুমি আমাদের গাঁয়ের মাথা, তুমিই আমাদের গ্রামের মুখোজ্জ্বল

করিয়া আছ, এখন হইতে একটু একটু সোমরস পান করিতে আরম্ভ কর। মুনি ঋষিদের ন্যায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবে। ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে।" হরিনাথ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুর কথা শুনিতেছিলেন এক্ষণে উত্তর করিলেন, "তাহাতে আপত্তি কি!" ইহার পর হইতে সোমরস পানের ব্যাপার আরম্ভ হইল ক্রমে টোলের ছাত্রেরা এ ব্যাপার জানিতে পারিল, গ্রামের দশজনের কানে উঠিল, টোল বন্ধ হইবার উপক্রম। গ্রামের দশ জন দুঃখিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ন্যায়বাগীশ মহাশয় দেবতুল্য লোক ছিলেন, তাঁহার এত বড় নাম, কিন্তু দেখিতেছি ওঝার বেটা বন গুরুই হইল।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের অনেকগুলি ধর্ম্মকার্য্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এক একটি করিয়া সমস্তই বন্ধ হইল। কেবল রহিলেন বার্ষিক কালীপূজা। কারণ এটি বন্ধ করা হরিনাথের বন্ধু বান্ধবের অভিপ্রেত ছিলনা। সোমরসের ব্যাপার ক্রমে ক্রমে এতদূর অধিক মাত্রায় উঠিয়াছিল যে, একবৎসর পূজায় বলিদানের সময় হরিনাথের জনৈক বন্ধু কর্ম্মকারের উপর অধিক মাত্রায় বীরত্ব প্রকাশ করায় কর্ম্মকার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতো বন্ধ হইবে না, হরিনাথ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা বলিদানের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। হরিনাথ ধরিলেন পাঁঠা, একজন ধরিলেন খাঁড়া কিন্তু কে কাহাকে ধরে? খাঁড়া হাত হইতে ভূমে পড়িল, পাঁঠাও ছুটিয়া পালাইল। সামনে একটা কুকুর দাঁড়াইয়াছিল, পাঁঠা ভ্রমে হরিনাথ তাহাকেই ধরিয়া হাঁড়ি কাঠে পুরিলেন। কুকুর প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। হরিনাথ সোমরস পানে উন্মত্ত। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি, সকলের সময় ভ্যা ভ্যা আর আমার সময় 'খেউ খেউ,' এই বলিয়া কুকুরকে তুলিয়া এক আছাড়। কুকুরতো প্রাণ ভয়ে পলায়ন করুক। এইরূপে সে বৎসর বলিদান ব্যাপার সম্পন্ন হইল, কিন্তু এই ব্যাপারে পাড়া প্রতিবেশী মর্ম্মাহত হইলেন। হরিনাথের স্ত্রী গললগ্নীবাসে মহামায়ার নিকট ভূমিষ্ঠা হইয়া হত্যা দিলেন। স্বামীর এই ব্যাপারের জন্য মহামায়ার নিকট সজল নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, পাড়ার দুই একটি মাতব্বর লোক হরিনাথের বাড়ীতে আসিলেন। হরিনাথকে দুই কথা বুঝাইয়া বলিলেন, হরিনাথ অবনত মস্তকে সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন নাই। উত্তর করিলেন "আপনারা আমায় চিনিবেন না, যদি চেনেন তবে বড় দিব্বি।" ইহার পর হইতে আর কেহ হরিনাথের বাড়ী পদার্পণ করেন নাই।

মানুষের অধঃপতন হইতে অধিক দিন লাগেনা। পর্ব্বতে উঠাই কঠিন, কিন্তু একবার পদস্খলিত হইলে অধঃপতন মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্ঘটিত হয়। হরিনাথের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বলিদানের ব্যাপার ক্রমে লোক পরম্পরায় সর্ব্বত্র রাষ্ট হইয়া পড়িল। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে একথা প্রচার হইয়া পড়িল। প্রায় সকলেই হরিনাথের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। কেবল মাত্র দুই একটি বনিয়াদি শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। কারণ বনিয়াদি ঘরের নিয়ম যে পিতৃ পিতামহ হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে হঠাৎ তাঁহারা তাহার একটা পরিবর্ত্তন করিতে চান না।

হরিনাথ ক্রমে ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রাণের বন্ধু, অর্থের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। তাহারাই হরিনাথের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। হরিনাথের স্ত্রী অবসর পাইলেই অতি করুণভাবে হরিনাথকে নানা রূপ বুঝান, পা ধরিয়া কাঁদেন, আর বলেন, "আমি এত বড়লোকের পুত্রের বৌ, আমার শ্বশুরের এত নাম, আজ সে নাম একেবারে ডুবিয়া গেল" এই সমস্ত আক্ষেপে হরিনাথের কঠিন হৃদয় যে দ্রব হইত না, একথা বলিতে পারি না। কারণ, সাধ্বী সতী স্ত্রীর আকর্ষণে স্বামীর যদি ক্ষণমাত্র পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত জগতে সতীমাহাত্ম্য থাকিত না। স্ত্রীর আক্ষেপে ও উপদেশে হরিনাথের যে পশু-প্রকৃতি তাঁহার দেব প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহা অপসারিত হইত, কিন্তু কুসংসর্গের কি মহিয়সী শক্তি, যেই হরিনাথ বৈঠকখানায় আসিয়াছেন, আর জানিনা কি যাদুবলে তাঁহার সমস্ত দেবভাব কোথায় চলিয়া যাইত। তখন তিনি যে হরিনাথ সেই হরিনাথ। হরিনাথ যদি এক পা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন ত তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দশ পা পিছনের দিকে টানেন সুতরাং হরিনাথ পিছনের দিকেই অধিক হাঁটিতে লাগিলেন। হরিনাথ এখন অভাব সাগরে ভাসিতেছেন। হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, বিবেকের হিতবাণি আর সে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় না। এখন তিনি অর্থের জন্য যে কোন কার্য্য করিতে পারেন। তিনি এখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য।

যে বৎসর কালীপূজার সময় বলিদানের ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয় তাহার পরবৎসর দুর্গা পূজার সময় অর্থের জ্বালায় এক অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হরিনাথ মনে মনে মতলব আঁটিলেন, এবার পূজায় এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাড়ী যাইব। বেটাতো সহজে আমার অভাব মোচন করিবে না, এক ফন্দি করিয়া কিছু হাতাইতে হইবে। এই রূপ মনে করিয়া সেবার পূজার সময় জনৈক বনিয়াদি শিষ্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্যও তাঁহাকে উৎসবের সময় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং সমাদর করিলেন। ক্রমে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী কাটিয়া গেল, হরিনাথ যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন সফল হইল না। হরিনাথের ক্রমে ভাবনা বাড়িতে লাগিল। নবমীর দিন প্রাতে শিষ্যের একমাত্র শৈশব পুত্রের উপর হরিনাথের নজর পড়িল। হরিনাথ দেখিলেন ছেলেটীর গায়ে প্রায় সহস্রাধিক টাকার গহনা রহিয়াছে। সেইগুলির উপর হরিনাথের লোভ পড়িল, তিনি সমস্ত দিন অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বৈকাল বেলায় দেখিলেন একটী অল্পবয়স্কা বালিকা ছেলে-টীকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। হরিনাথ তাহার কোল হইতে ছেলেটীকে নিজের কোলে লইলেন এবং এদিক ওদিক করিতে করিতে এক নিভৃতস্থানে লইয়া গেলেন এবং যে সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলা সহজ সাধ্য সেইগুলি খুলিয়া লইয়া নিভৃতস্থানে রাখিলেন এবং ছেলেটীকে লইয়া গিয়া শিষ্যের জনৈক চাকরের কোলে দিলেন। চাকর গোলমালে অত বুঝিতে পারিল না। হরিনাথ ইত্যবসরে শশব্যস্তে শিষ্যের নিকট উপ-স্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন আমাদের গ্রামের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার এইমাত্র সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, গতকল্য রাত্রে আমার স্ত্রীর কলেরা হইয়াছে জীবন সঙ্কটাপন্ন।" শিষ্য পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন দশ টাকার

তিনখানি নোট রহিয়াছে তাহাই হরিনাথকে দিলেন। হরিনাথ নিভৃতস্থান হইতে গহনাগুলি লইয়া চম্পট দিলেন। ইহার একঘণ্টা পরেই গহনার খোঁজ পড়িল। সকলেই চাকরটীর উপর সন্দেহ করিল। এবং চাকরটীকে একটী ঘরে আটকাইয়া রাখা হইল। এদিকে হরিনাথ যখন শিষ্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বহির্গত হন তখন দিনমণি পাটে বসিয়াছেন। সম্মুখে এক দীর্ঘ প্রান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে। হরিনাথ ক্রমে প্রান্তরের উপান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতি দেবী যেন হরিনাথের এই পাপদৃশ্য স্থাবর জঙ্গম সকলকে দেখাইবার জন্য অসংখ্য দীপমালা জ্বালিয়া ফেলিলেন। হরিনাথ মনের আনন্দে চলিয়াছেন। মূর্খ হরিনাথ! ইহসংসারে ধর্ম্মপথে থাকিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জনের ধন লোকে ষোল আনা ভোগ করিতে পারে না আর তুমি এই চুরীর ধন ভোগ করিবে, কি তোমার দুরাশা! হরিনাথ ক্রমে মাঠের শেষ ভাগে আসিয়া পড়িলেন। সম্মুখে এক নদী পার হইতে হইবে। নদীতীরে বিস্তৃত শ্মশান। হরিনাথ সেই বৃক্ষমূলে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার দুইপার্শ্বে যমদূতাকৃতি দুই দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিয়াইতো হরিনাথের নাভিশ্বাস উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন অপর জনকে বলিল, "বেটার কাছে একটা পুঁটুলি দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে, কিছু মালপত্র আছে। কিন্তু বেটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। সাবাড় করে ফেলতে হবে। তুই বেটাকে সাম্‌লে রাখ, আমি শ্মশান থেকে একটা বাঁশ তুলে আনি।" এই বলিয়া দ্রুতগতিতে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইল। যেমন একটী বাঁশে হাত দেওয়া অমনি এক বিষধর সর্প বাঁশের ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া ডাকাইতের হাতের সহিত বাঁশের সহিত জোরে জড়াইয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া রহিল। ডাকাত মহাশয়ের তো নড়ন চড়ন রহিত। একদিকে হরিনাথ আসন্ন মৃত্যুবুঝিতে পারিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন কিন্তু কে কার কান্না শোনে। এইরূপে ক্রমে ৩।৫ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় ডাকাইত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে পরিশেষে হরিনাথকে সেই বৃক্ষমূলে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়া সঙ্গীর অনুসন্ধানে চলিল। শ্মশানে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতো একেবারে আক্কেল গুড়ুম। দিশিহারা হইয়া সর্পটীকে মারিয়া বন্ধুকে উদ্ধার মানসে যেমন আর একটী বাঁশে হাত অমনি ছিদ্র হইতে এক কৃষ্ণ সর্প বাহির হইয়া হাতে বাঁশে আচ্ছা করে বাঁধিয়া ফেলিল। দুই মহাপ্রভু তো নাগপাশ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ওদিকে হরিনাথ বৃক্ষমূলে আবদ্ধ। রজনীদেবী এই সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য যেন শীঘ্র শীঘ্র পোহাইয়া গেলেন প্রত্যূষে নদীবক্ষে একখানি নৌকা ঝপ্ ঝপ্ করিয়া বাহিয়া যাইতেছিল। মাঝিরা নদীকূলের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইল। নৌকা থামাইল একজন মাঝি শশব্যস্তে ডাকিতে লাগিল দারোগা বাবু শীঘ্র বাহিরে আসুন, দুটা লোক শ্মশানে অমন করে দাঁড়ায়ে আছে কেন?

দারোগা বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়াতো স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কৌতূহল বশতঃ দু চারিজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া তীরে নামিলেন, তিনি ডাকাইত দুজনের সমীপবর্ত্তী হইলে সর্প দুইটী দুইজনকে বন্ধনমুক্ত করিয়া চল্ চল্ করিয়া চলিয়া গেল। লোক

দুইটীর আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া দারোগা বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলেন। ডাকাইত মহাশয়দিগের নিকট ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় তাহারা প্রথমতঃ সমস্ত গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ধনঞ্জয় শর্ম্মার চোটে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া পড়িতে হইল। আগাগোড়া হুড়হুড় করিয়া বলিয়া ফেলিল। তখন দারোগা বাবু অনুচরবর্গ লইয়া হরিনাথের উদ্ধারসাধন করিলেন। এবং বমাল শুদ্ধ তিন মহাপ্রভুকে নৌকার উপর লইয়া গেলেন। হরিনাথকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে আঁা আঁা করিতেছিলেন। তারপর বেগতিক দেখিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিতে হইল। দারোগা বাবু হরিনাথের শিষ্যের বাসগ্রাম যে থানার এলাকাধীন সেই থানায় মালপত্রসহ হরিনাথকে চালান দিলেন। এই ঘটনায় একমাসপূর্ব্বে ইহারই সমীপবর্ত্তী একখানি গ্রামে এক ধনাঢ্যের বাড়ী ভয়ানক ডাকাতি হইয়াছিল। তাহার তদন্তের ভার দারোগা বাবুর উপর ছিল। তিনি এক্ষণে এই দুই জন ডাকাত মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন তাহারা উক্ত দলের সহিত ছিল এই দুই জনের সাহায্যে দারোগা বাবু সমস্ত ডাকাতের দল ধরিয়া ফেলিলেন। ওদিকে হরিনাথের ব্যাপার লইয়া থানায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে থানার দারোগা বাবু হরিনাথের শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অলঙ্কারগুলি তাঁহার পুত্রের বলিয়া শিষ্যটী স্বীকার করিলেন। দারোগা বাবুকে ব্যাপারটী চাপা দিবার জন্য শিষ্য অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইল। শিষ্য হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। হরিনাথ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। শিষ্য বলিলেন, "তোমার টাকার দরকার হইয়াছিল আমাকে জানালেই হইত। এরূপ কার্য্য করিয়া সকলেরই মুখ হাসাইলে। যাহা হউক ২০০৲ টাকা দিতেছি লইয়া রাত্র প্রভাতে ঘরে যাও। আর এরূপ প্রবৃত্তি যেন কখন না হয়।" হরিনাথ টাকা লইতে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া যে কোথায় গেলেন কেহ সন্ধান বলিতে পারিল না। ইহার পর আর কেহ তাঁহাকে কখনও দেখিতে পায় নাই।

সূত্র ও বস্ত্রাদি রঞ্জনপ্রণালী।

—:*:—

জলে নীল গুলিয়া ঐ জলে এক টুকরা রেশম ও এক টুকরা কার্পাসের সুতা ডুবাইলে রেশমে নীল ধরিবে; কিন্তু কার্পাস সুতা কিছুমাত্র রং ধরিবে না। এই রূপ অনেক রং আছে যাহার কতক গুলি কার্পাস, ও কতক গুলি রেশম ও পশম রং করিবার উপযোগী।

ম্যাজেণ্টা ও আলিজারিন উভয়ই লাল রং। উহাদিগকে দুইটি ভিন্ন পাত্রে জলের সহিত গুলিয়া লইয়া তন্মধ্যে এক টুকরা করিয়া পশম ছোপাইলে দেখা যাইবে ম্যাজেণ্টার পাত্রে যে পশম টুকু ছোপান হয় উহা রক্তবর্ণ হইয়াছে কিন্তু আলিজারিনেও পাত্রের পশম ধূসর বর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কতক গুলি রঙ্গের মধ্যে কাপড় বা সুতা দিলে উহা সঙ্গে সঙ্গে ঐ রংএ রঞ্জিত হয়; আবার এমন কতকগুলি রং আছে তাহাতে কাপড় ছোপাইলে উহা সেই রং না হইয়া অন্য রং হইয়া যায়।

আলিজারিনের নিজ রং কাপড়ে ধরাইতে হইলে, প্রথমে কাপড়কে টার্টার ক্রমেটিক

ও আলুমিনিয়ম সালফেটের জলে ছোপাইয়া, পরে উহাকে আলিজারিনের পাত্রে ছোপাইতে হয়,—তাহা হইলে কাপড় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ অনেক রং আছে, যাহারা অন্য কোন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত বস্ত্রাদিতে নিজ নিজ বর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না।

হরিতকীর রস বা হিরাকসের জল ইহারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাপড়ের উপর কোন রং দিতে পারে না। এস্থলে প্রথমে কাপড়কে হরিতকীর জলে ছোপাইয়া পরে উহাকে হিরা-কসের জলে ছোপাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

উপরোক্ত উদাহরণ কয়েকটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে (১) বিভিন্ন প্রকার সূত্রের জন্য বিভিন্ন রং আবশ্যক ; (২) কোন রং স্বাধীন ভাবে বস্ত্রাদিতে ধরে ; (৩) আবার কোন কোন রং অন্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত নিজবর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না ; (৪) এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে যাহারা নিজে কোন রং নয় কিন্তু অপর কোন পদার্থের সহযোগে বিশেষ বিশেষ রং উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এইরূপ নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রং ও রঞ্জন কার্য্যকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন :—

(১) স্বাধীন রং (direct dyes)—যাহারা অপর কোন রংএর সাহায্যের অপেক্ষা করে না যথা :—কঙ্গোরেড, কুসুম, হরিদ্রা প্রভৃতি।

(২) ক্ষার রং (Basic dyes) যে রং ধরাই-বার জন্য বিশেষ কোন ক্ষার মিশ্রিত জলের আবশ্যক হয় যথা :—ম্যাজেণ্টা, মিথিল, ব্লু, প্রভৃতি।

(৩ অম্ল রং (acid dyes)—যে রং ধরাই-বার জন্য বিশেষ কোন ক্ষার মিশ্রিত জলের আব-শ্যক হয়, ইয়োসিন এ্যাসিড ম্যাজেণ্টা ইণ্ডিগো একষ্ট্রাক্ট।

(৪) কষজ রং (mardant dyes) বর্ণহীন বা বিভিন্ন বর্ণের পদার্থের সংমিশ্রনের উৎপন্ন রং যথা :—লগউড্, লাক্ষা প্রভৃতি। এইগুলির প্রত্যেকটীর বিভিন্নরূপে আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু তাহা না করিলে রঞ্জন সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধাতু উদ্ভিদ পাথুরে কয়লা প্রভৃতি হইতে অসংখ্য রং উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রত্যেকটির ব্যবস্থার প্রণালী স্বতন্ত্র। রঞ্জন ক্রিয়া সম্বন্ধে ইংরাজি বহুতর গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এ বিষয়ে আগ্রহশীল লোকদিগের ঐ গ্রন্থগুলির আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সূত্রের সহিত স্বাধীন রং (direct dyes) গুলির একটী স্বাভাবিক (রাসায়নিক) সংহতি আছে। রং মিশ্রিত জল ফুটাইয়া,—তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া, উহাতে কাপড় ছোপাইয়া লইলেই উহা রঞ্জিত হয়। কিন্তু অন্য রং গুলির কাপড়ের সহিত কোন সংহতি নাই। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাকে লোকে সাধারণত কষ বলিয়া থাকে। কাপড়ের সহিত ইহাদের যেরূপ সংহতি বা আকর্ষণ, রংয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এইজন্য প্রথমে কাপড়কে কোন বিশেষ কষের মধ্যে ছোপাইয়া লইতে হয়। কাপড়ের উপর কষ লাগিয়া গেলে তাহার পরে, ঐ কষের সহিত যে রংয়ের আকর্ষন আছে, তাহার মধ্যে কাপড় পুনরায় ছোপাইলে উহা ইচ্ছামত রঞ্জিত হইবে। বস্ত্রাদি রং করিবার ইহাই সাধারণ নিয়ম।

অনেক সময় দেখা যায় কাপড় ঠিক এক

প্রকার সূত্রের দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই উহাতে হয়ত কতক রেশমই কতক পশম, বা কতক কার্পাস ও কতক রেশম অথবা কতক পশম এবং কতক কার্পাস। হয়ত টানা এক প্রকার সূত্রের, ভরণ অন্য প্রকার সূত্রের; অথবা উপরের অংশ ও নীচের অংশ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের দ্বারা বয়িত। এরূপ মিশ্রিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদি রং করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। এক্ষণে অতি সাবধানে রং বিশেষণ করা আবশ্যক। মনে কর রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত এক খানি বস্ত্র লাল রং করিতে হইবে। আমাদিগকে এরূপ একটী রং বাছিয়া লইতে হইবে যাহা রেশম ও কার্পাস উভয়কেই ঠিক একরূপে রঞ্জিত করিতে পারে। ডায়ামাইন স্কারলেট বি (Diamine scarlet B) নামক একটী রং আছে, তাহা এই উদ্দেশ্য সফল করে। আধ পোয়া সাবান, এক পোয়া সোডা সালফেট ও এক ছটাক উপরোক্ত রং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে কাপড়খানি দিয়া ফুটাইয়া লইলেই উহা লালবর্ণ হয়। যদি ঐরূপ একটী কোন বিশেষ রং (যাহা রেশম ও কার্পাস উভয়েরই উপযোগী) না পাওয়া যায় তবে কাপড় খানির রেশম ও কার্পাসকে দুইবারে দুই পৃথক প্রক্রিয়া দ্বারা রং করিতে হইবে। অ্যাসিড ম্যাজেণ্টা সোডা সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জল মধ্যে কাপড়খানি ছোপাইয়া ফুটাইলে কাপড়ের কেবল রেশম অংশ টুকু রঞ্জিত হইবে; অবশিষ্ট কার্পাস অংশ এই প্রক্রিয়ায় রঞ্জিত হয় না। রেশম অংশ রঙ্গিন হইলে পর কাপড়খানিকে ট্যানিক ও টার্টারিক অ্যাসিড এবং টার্টার এমেটিকের জলে ছোপাইতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস অংশও রেশমঅংশের মত রঞ্জিত হইবে। এইরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিশ্রিত সূত্রোৎপন্ন বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়।

নানাবিধ রঞ্জন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং বিষয়টীও অতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও ইহার অনেক অত্যাবশ্যক অংশ বাদ দিতে হয়। একে পত্রিকায় আমাদের স্থান অতি অল্প, তাহাতে আবার বর্ষ শেষ, কাজেই প্রবন্ধটির এইখানেই সমাপ্তি আনিতে হইল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রবন্ধ আমাদের প্রবন্ধের অবলম্বন। সেই সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত দ্রব্যাদির ব্যবহারের উল্লেখ আছে তাহাদের নাম আমাদের কানে বড় একটা শ্রুতি মধুর বলিয়া বোধ হয় না; পাঠকগণের অনেকে ইহার মধ্যেই হয়ত ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং উপরে অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র রঞ্জনকার্য্যের মূল প্রণালীমাত্র বর্ণনা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিলাম।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ।

ধনাগমের একটি সহজ উপায়।

"আমাদের দেশে বৎসর বৎসর কত মাছ যে নষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে যত কেন মাছ আমদানী হউক না, প্রায় কাটিয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষ মধ্যে কলিকাতার ন্যায় সহর কয়টি আছে। যে সকল স্থানে অধিক মাছ ধরা পড়ে, সে সকল স্থান হইতে মাছ সহরে আমদানী করা সকল সময়ে বা কখনই সুবিধা হয় না, কাজেই এক এক

সময়ে শত শত মণ মাছ খরিদ্দার অভাবে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। টাট্‌কা মাছ বিক্রয় না হইলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ইলিশ মাছ "লোণা" করিয়া রাখিবার প্রণালী এবং অপর দুই একটা মাছ শুট্‌কী করিয়া রাখিবার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দুইটি প্রণালীর কোনটিই অধিক প্রচারিত নহে, এবং শুটকী মাছ বা লোণা মাছ অনেকেই খান না এবং পছন্দ করেন না, এবং বিদেশে রপ্তানী হইবার উপযুক্তও নহে। বিলাত, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অনেক মাছ এইরূপ প্রকারে রাখা হইয়া থাকে যে, তাহা অনেক দিন থাকিলে পচিয়া বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হইতে পারে না। যে প্রণালী মতে তাহারা মাছ রাখে তাহা অতি সামান্য, অল্প আয়াসেই আমরা সেইরূপ প্রকারে মাছ রাখিতে পারি, অথবা অবস্থাভেদে সেই সকল প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও করা কঠিন নহে। বিলাতে স্যামন নামক এক প্রকার সুস্বাদু মাছ বাক্স বন্দী করিয়া রাখা হয়। স্যামন মাছ দেখিতে আমাদের দেশের বড় রুই মাছের মত। তাহারা প্রথমে মাছের মাথাটা কাটিয়া ফেলে, পরে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া আধসের আন্দাজ এক এক খণ্ড টিন পাত্রে পূর্ণ করে, তৎপরে পাত্রের খোলা মুখটি বন্ধ করিয়া "ঝালিয়া" দেওয়া হয়। তৎপরে ৫ ফুট প্রশস্ত ও ৪ ফুট উচ্চ পাত্রে রাখিয়া তাহাদিগকে "বয়লারের" মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া এক ঘণ্টাকাল উষ্ণ বাষ্পের সংযোগে রাখা হয়। পরে বাহির করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। পাত্রের ঢাকনির মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র রাখা হয়, যে ছিদ্র এপর্য্যন্ত ঝালিয়া বন্ধ করা থাকে। পাত্র গুলি ঠাণ্ডা হইলে লোহা গরম করিয়া, সেই ছিদ্রের ঢাকনিটি খুলিয়া দেওয়া হয়, পাত্রের মধ্যে যে বায়ু ও অন্যান্য বাষ্প থাকে তাহা এই ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। পাত্রগুলির ছিদ্র সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া লুণ গোলা ফুটন্ত জলে দুই ঘণ্টাকলে ফেলিয়া রাখা হইয়া থাকে। পরে সেই জল শুদ্ধ তাহাদিগকে ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ প্রকার প্রণালী মতে স্যামন মাছ রাখিলে তাহা আর সহজে নষ্ট হয় না। বিলাত, ইউরোপ, আমিরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ মাছের যথেষ্ট কাট্‌তি, এমন কি এদেশেও টিনেপোরা স্যামন আমদানি হইয়া থাকে, এবং ইংরেজ ব্যতীত আমাদের দেশে অনেক লোক তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ফরাসী দেশের দক্ষিণ উপকূলে সার্ডিন নামক এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়; ইহা দেখিতে আমাদের দেশের ছোট বাটা মাছের মত। সার্ডিন রাখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র। একটা তামার পাত্রে তেল ফুটিতে থাকে; সার্ডিন মাছ বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া একটা চালুনিতে রাখিয়া সেই ফুটন্ত তেলে এক মিনিট কি দুই মিনিট ডুবাইয়া ধরিতে হয়। তাহার পর তেল হইতে তুলিয়া ধরিলে বাড়তি তেলটা চালুনি দিয়া গলিয়া পড়ে। তৎপরে ছোট টিনের বাক্সের মধ্যে যতগুলি মাছ ধরে ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিয়া ঠাণ্ডা পরিষ্কার তেল দিয়া বাক্সপূর্ণ করিয়া ঢাকনিটা বাক্সের মুখে ঝালিয়া দেওয়া হয়। ফরাসীরা ইহার জন্য জলপাই তেল ব্যবহার করে। তামার পাত্রে যে তেল ফুটিতে থাকে, তাহাতে মাছের তেল মিশিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া পড়ে; সেই জন্য তাহা শীঘ্র শীঘ্র বদলাইয়া দেওয়া হয়। একা বিলাতেই বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ টিনে-পোরা সার্ডিন মাছ ফরাসী দেশ হইতে আমদানী হইয়া

থাকে, ভারতবর্ষেও এই মাছের আমদানী আছে। ছোট চিংড়ি মাছ রাখিবার প্রণালী আরও স্বতন্ত্র ও সহজ। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া চিঙ্গড়ি মাছ জলে ফুটিতে থাকে ও সেই জলে মাঝে মাঝে অল্পপরিমাণ লুণ যোগ করিতে হয়। জল হইতে চিঙ্গড়ী মাছ তুলিয়া মাটীর উপর বিছাইয়া শুকাইতে দিতে হয় এবং শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে উল্টাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তিন চারি দিন মধ্যে মাছ শুকাইয়া যায়। সেই সময়ে হাত অথবা পা দিয়া ঘসিলে খোলা পৃথক হইয়া পড়ে। খোলাগুলিকে উড়াইয়া দিয়া মাছ ব্যাগ বা থলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইলিশমাছ মধ্যে মধ্যে যেরূপ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা নষ্ট হইতে না দিয়া যদি স্যামন মাছের মত "রাখা" হয়, তাহা হইলে যে সময়ে মাছ দুর্ম্মূল্য হয়, তখন বেচিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত বিলাত প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিয়া দেখা উচিত, বিদেশে ইহার কাট্‌তি হয় কি না। ইলিশ মাছ যেরূপ সুস্বাদু, তাহাতে বিদেশে ইহার আদর হইবার খুব সম্ভব। বিদেশে ইহার আদর হইলে ইলিস মাছ "রাখার" ব্যবসা ক্রমে এক বৃহৎ ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভব।

আমরা বিবেচনা করি ইলিশ মৎস্যের ন্যায় তপস্বী মৎস্যও (Mangofish) উল্লিতরূপ "রক্ষা" করিয়া বিলাত ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিলে লাভ হইবার খুব সম্ভাবনা তপস্বী মৎস্য সাহেবদিগের বড়ই আদরের জিনিস। কলিকাতা নিবাসী জেলেগণ এই মাছ "ফেরি" করিয়া সাহেব মহলে প্রায় পনের আনা বিক্রয় করে, অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে তাহাও বাজারে বিক্রয় করে। তপস্বী মৎস্য বারমাস পাওয়া যায় না, জেলেগণ চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে ধরিয়া থাকে। এই কয়েক মাস তপস্বী মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা জেলেদিগের একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়, ইহার এক এক শত মাছ (ডিমওয়ালা) পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা দরে বিক্রয় হয়।

গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে জেলেগণ বারমাসই মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং এই মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় দ্বারা ইহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করে। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, গোয়ালন্দের নীচে পদ্মানদে বর্ষাকালে যে সকল ধীবরগণ মৎস্য ধরিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সময়ে এক এক দিনে পাঁচ ছয় শত টাকা লাভ করে। আমরা বিবেচনা করি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যদি এই মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অল্প দিনে খুব লাভবান হইতে পারিবেন। যাহাহউক, মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় নানাপ্রকার, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তারিতরূপে লেখা এক রকম অসম্ভব। যাঁহারা মৎস্য "ধরার" ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে জেলেদিগের সহিত যোগদান করিয়া অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

ভগবদ্গীতা পাঠ।

—:০:—

অর্জ্জুন—কিরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম করিব?

ভগবান—সকাম ব্যক্তিদিগের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড। যাহাদের ভোগেচ্ছা আছে তাহারা ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি রাখিতে পারে না এজন্য

বেদবিধি মত তাহারা স্বেচ্ছাচরী এবং আত্মম্ভ না হইয়া অশ্বমেধাদি কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হইতে পারে এইজন্য তাহাদের প্রতি সকাম কর্ম্মের বিধি। যে যেমন কামনা করে কর্ম্মকাণ্ডে কামনা সিদ্ধির জন্য সেইরূপ উপদেশ আছে। সকাম কর্ম্মেই সংসারে জড়িত হইতে হয় তুমি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। ভোগেচ্ছাশূন্য কর্ম্মই নিষ্কাম।

অর্জ্জুন—শীতোষ্ণ নিবারণের জন্য বস্ত্র গৃহাদি আবশ্যক এ সমস্ত ত ভোগ তবে ভোগেচ্ছা যাইবে কিরূপে?

ভগবান—শীত উষ্ণ মান অপমান সুখ দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর।

অর্জ্জুন—ঐ সমস্ত অসহ্য দুঃখ কিরূপে অভ্যাস হইবে?

ভগবান—সত্ত্বগুণে থাকিলে লোকে ধৈর্য্যশীল হয় রজ তমোগুণ পরাস্ত করিয়া সর্ব্বদা সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে। কোন যন্ত্রণাদারা অভিভূত হইবে না। রজ ও তমোগুণে চিত্ত বহির্ম্মুখ হয় কিন্তু সত্ত্বগুণে চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইয়া আনন্দে মগ্ন থাকে সুখ ও দুঃখ দেখিবার অবসর থাকে না।

অর্জ্জুন—ক্ষুধা তৃষ্ণা ত আছে? কিরূপে সত্ত্বগুণে থাকিব? ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য যাহা নাই তাহার লাভের চেষ্টা ত করিতে হইবে নতুবা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব? সে জন্যও ত উপার্জ্জন ও রক্ষা চাই?

ভগবান—তুমি উপার্জ্জন ও রক্ষা দুই ত্যাগ কর। আত্মবান হও।

অর্জ্জুন—আত্মবান কি?

ভগবান—আমার ঈশ্বর আছেন তিনিই আমার যোগ ক্ষেম বহন করিবেন এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া তাহার ভাবনা কর এবং তাঁহার সন্তোষার্থ তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—সকাম কর্ম্ম করিয়া ফললাভ করিতে আনন্দ আছে কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া কি আনন্দ পাওয়া যায়?

ভগবান—নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সমস্ত প্রকার আনন্দই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হও। একলাভে তোমার সমস্ত লাভ হইবে। কিন্তু তুমি এখনও তোমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই এজন্য কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন—যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে চলিবে?

ভগবান—না ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ফলে যাহাতে জন্মিতে পারে এরূপ তৃষ্ণাও ত্যাগ কর। যদি ফল না পাইলাম তবে দুঃখ করিয়া কর্ম্ম কেন করিব এ ভাবিয়া কর্ম্মত্যাগ করিও না।

অর্জ্জুন—ভবিষ্যতের ফলাকাঙ্ক্ষা ত দূরের কথা উপস্থিত সুখ না পাইলে কর্ম্ম ভাল লাগে না এবং অনিচ্ছা সত্বে কর্ম্ম করা অতিশয় ক্লেশকর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা যায় না তুমি বল ‘করিয়া চল’ যাহাতে পারি তাহাই বল।

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি আমায় ভালবাস। ভাল লাগুক বা না লাগুক সুখ পাও বা দুঃখ পাও কোন বিচার না করিয়া কেবল মনে রাখ আমি এই কার্য্য করিতে বলিতেছি ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া চল। পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ বলিয়াছি। এই সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান ভাব রাখিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। জ্ঞান-যোগের বিষয় আত্মবিচার তোমার চিত্ত অশুদ্ধ এখনও ইহা কোন আরাধ্য বস্তুতে একাগ্র হয় নাই। তোমার চিত্ত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ও মূঢ়াবস্থায়

নিতান্ত চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছে। এজন্য জ্ঞানে তোমার অধিকার নাই। তোমার কর্ম্মেই অধিকার। কিন্তু যদি লাভালাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম কর তবে তোমার চিত্ত কখন একাগ্র ও নিরোধ অবস্থায় পৌছিবে না। তোমার কর্ম্ম তখন তোমার বন্ধন মোচন না করিয়া সংসারে তোমায় আরও দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। এজন্য তোমার প্রিয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে এই ভাবিয়া কর্ম্ম কর। এরূপ অবস্থায় দেখ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে লক্ষ্য নাই বলিয়া চিত্ত চঞ্চল হইতেছেনা। যদি কোন লক্ষ্য রাখে তবে সে প্রিয়বস্তুর আজ্ঞা পালন করিতেছে ইহাই লক্ষ্য করিয়াছে। এই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যে সমান বুদ্ধি তাহাই যোগ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্, এ।

বৈজ্ঞানিক রহস্য।

—:০:—

ওয়াটার প্রুফ ক্যানভাস।—জিলেটিন ও ক্রোমঅ্যালাম সমান ভাগে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জলের সহিত মিশ্রিত কর। ক্রোম অ্যালাম শীতল জলের সহিত মিশ্রিত হয়, জিলেটিন হয় না। জিলেটিন জলের মধ্যে দিয়া জল গরম করিলে উহা গলিয়া যায়। মোটা কাপড় (ক্যানভাস) এর উপর জিলেটিনের এক পরদা সমানভাবে মাখাইয়া দাও। পরে ঐ ক্যানভাস ক্রোমঅ্যালামের জলে ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দাও। অবশেষে শুকাইয়া লইলেই উহা ওয়াটার প্রুফ হইল। অয়েল ক্লথ প্রস্তুত করিবার ইহাই সাধারণ নিয়ম।

মরিচা হইতে লৌহ রক্ষা।—১০ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া উহার মধ্যে লৌহকে কিছুক্ষণ রাখিয়া দেও, ইহাতে উহার উপরের তৈলাক্ত পদার্থ দূরীভূত হইবে। তাহার পরে পরিষ্কার জল ও সূক্ষ্ম কাঠের গুঁড়া দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তুঁতিয়ার জলে ঐ লৌহ কিছুক্ষণ রাখিয়া দেও।

অল্প সময়ের মধ্যে উহার বর্ণ তাম্রবর্ণ হইয়া আসিবে। তুঁতিয়া হইতে তুলিয়া উহাকে আবার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেল। পরে হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ও হাইপোসালফাইট অব সোডার মিশ্রণের মধ্যে লৌহখণ্ডকে কিছুক্ষণ রাখ। দেখিবে উহার উপরে শীঘ্র একটি গাঢ় নীল আবরণ আসিয়া পড়িতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে ঐ নীল আবরণ জমিলে লৌহকে ধৌত করিয়া রাখিয়া দেও। এখন আর উহাতে মরিচা ধরিবে না।

হিন্দু না আর্য্য?

—:*:—

"হিন্দু" এ শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্রই যেন আমরা আনন্দে আটখানা হইয়া যাই! "হিন্দু" শব্দটির মধ্যে বিশেষরূপে প্রবেশ না করিয়া, "হিন্দু" শব্দটির প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আজ আমরা আহ্লাদের সহিত আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকি! কিন্তু, বাস্তবিক "হিন্দু" শব্দটি আমাদের গৌরববাচক নহে। মুসলমান-গণ যে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারত-বাসীকে আয়ত্তীকৃত করেন; সেই সময়ে তাঁহারা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ছলে ভারতবর্ষের নাম "হিন্দু-

স্থান" এবং ভারতবাসীর নাম "হিন্দু" দিয়াছিলেন। এই "হিন্দু" শব্দটি পারস্য ভাষার। ইহার প্রকৃত অর্থ "কাফের" "কৃষ্ণবর্ণ" "বিধর্ম্মী" "পাতকী" ইত্যাদি। আমার মনে হয়,—মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাবকালে তাহাদের কঠোর শাসন ভয়ে ভীত হইয়াই তদানীন্তন ভারতবাসী লজ্জাজনক অপমানসূচক এই "হিন্দু" শব্দটিকে নিজেদের গৌরব-বাচক পদটী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই বাদর্থ "হিন্দু" শব্দটির অর্থবোধহীনতাপ্রযুক্ত আমরাও আজ তাহাকে সত্যসত্যই গৌরববাচক মনে করিয়া শত মুখে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকি। পরন্তু উক্ত "হিন্দু" শব্দটিকে গৌরব-বাচক মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় যদি কোন একজন পারস্যভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আমাদের অনভিজ্ঞতা দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন না। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, এক মেরুতন্ত্র ব্যতিরেকে আমাদের উপনিষদ পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে কোথাও "হিন্দু" শব্দের উল্লেখ নাই। কেবল ইংরেজী, পারস্য, হিন্দী ও অধুনাতন বাঙলা ভাষায় "হিন্দু" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুতন্ত্রে লিখিত আছে—"হীনং দূষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ"। বলাবাহুল্য এই মেরুতন্ত্র প্রাচীন শাস্ত্র নহে। ভারতবর্ষ যে সময়ে মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক "হিন্দু-স্থান" আখ্যা ধারণ করে; তাহার অনেক কাল পরে "মেরুতন্ত্র" রচিত হইয়াছে। "হীনং দূষয়তে" ইত্যাদি "হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্তিটি মেরুতন্ত্র রচয়িতারই প্রথম কল্পনা প্রসূত। এবং রাজা সার রাধাকান্ত দেব মহাশয়ও এই মেরু-তন্ত্রের দোহাই দিয়াই তাঁহার শব্দকল্পদ্রুম অভিধানস্থ সংস্কৃত শব্দাবলির পার্শ্বেই "হিন্দু" শব্দটির স্থান দিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহার স্থানে যাহার পরিবর্ত্তে "হিন্দু" শব্দের ব্যবহার করি; তাহার নাম "আর্য্য"। অনুসন্ধিৎসু পাঠক! বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ভারত-বর্ষকে "হিন্দুস্থান" না বলিয়া "আর্য্যস্থান" বা "আর্য্যভূমি" বলাই শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। "হিন্দুধর্ম্ম" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক; "আর্য্যধর্ম্ম" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই শাস্ত্র সঙ্গত।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

বঙ্গে পঞ্জিকা বিভ্রাট।

——(*)——

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতবর কোড়া-পদ্মপুত্র বঙ্গপ্রদেশে প্রচলিত পঞ্জিকার দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া দৃষ্ট গ্রহানুসারে "পটবর্দ্ধনী" নামে একখানি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা প্রদেশে পণ্ডিতবর চন্দ্রশেখর সিংহ, হরিচন্দন মহাপাত্র, মান্দ্রাজে রঘুনাথ আচার্য্য, বঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত ও সুন্দরেশ্বর শ্রৌতী এবং কাশীতে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়গণ নিজ নিজ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়াদেখেন যে, বর্ত্তমান পঞ্জিকায় ভয়ানক ভুল দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহারা সময়ানুযায়ী গ্রহগণের অবস্থা স্থির করিয়া কেহ কেহ করণগ্রন্থ কেহ কেহ বা নূতন পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

উপরোক্ত কয়েকজন পণ্ডিতেরই জ্যোতিষ-

শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ভিন্ন সকলেই ইংরাজী জ্যোতিষশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী। পণ্ডিত-বর চন্দ্রশেখর উড়িষ্যা প্রদেশের মন্তপড়ার করদ রাজা মাননীয় সাধুচরণ মহাসিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য। তাঁহার বিদ্যাভিমান, যশোলিপ্সা বা জিগীষা কিছুই ছিল না। তিনি একজন পরম ভাগবত। জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধান এবং ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না, কেবল শাস্ত্রালোচনা ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং দৃঢ় যত্নে স্বকৃত নলিকাদি যন্ত্রদ্বারা গ্রহদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদনুসারে "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" নামক একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

স্বর্গীয় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে পঞ্জিকা-সংশোধনের জন্য কলিকাতায় তিনবার সভা হয়, এবং সভার অনুমতিক্রমে ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" নাম দিয়া ১২৯৭ সালে হইতে ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে গণনা করিয়া এক খানি বিশুদ্ধ পঞ্জিকা বাহির করেন। উক্ত পঞ্জিকাখানি এখনও প্রচলিত আছে। পঞ্জিকা যদিও নির্ভুল বটে তত্রাচ এখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই; কিন্তু প্রচলিত সমস্ত পঞ্জিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বিগত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকামঠের অধীশ্বর জগদ্গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য মহাশয় দেশের কল্যানের জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের নানাদেশ হইতে ১৫১ জন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষবেত্তাও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বোম্বাই সহরে পঞ্জিকাশোধন জন্য একটী বৃহৎ সভা করেন। ঐ সভায় বঙ্গদেশের নয় জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রায় দশদিন ব্যাপী তুমুল আলোচনায় স্থির হইল যে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি ভ্রমপূর্ণ থাকার জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত পণ্ড হইতেছে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়াছে, অতএব সভার অনুমোদিত ও গৃহিত মতানুসারে সর্ব্বত্রের পঞ্জিকাকারগণ তাঁহাদের পঞ্জিকা সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া প্রকাশ করিবেন। দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত কেহই তাহা করেন নাই। আগেকার "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাই" সূক্ষ্মরূপে গণিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "সরল ফলিত পঞ্জিকা" নাম দিয়া ১৩১২ সাল হইতে একখানি সূক্ষ্মরূপে গণিত পঞ্জিকা বাহির করিতেছেন। সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ন্যায় সরল-ফলিত পঞ্জিকাও ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে গণিত সুতরাং অভ্রান্ত। পূর্ব্বকালের প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ সারণী হইতে গণনা অপেক্ষা ইংরাজী নাবিক পঞ্জিকা হইতে পঞ্জিকার গণনা সহজ ও অভ্রান্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের এখনও এবিষয়ে দৃষ্টিপাত হয় নাই। নাবিক পঞ্জিকা প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ভূকেন্দ্রিক গ্রহস্ফুট বাহির করা অতি সহজ এবং যখন তদ্দ্বারা গণনা অভ্রান্ত হইয়া থাকে তখন সকলেরই সেই মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পঞ্জিকাতে কয়েকটী নূতন বিষয় আছে; তন্মধ্যে আকাশতত্ত্ব অন্যতম। আর্য্যভূমিতে প্রকাশিত নিয়মানুসারে বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পাদির গণনা যদি এই আকাশতত্ত্বে দেওয়া হয় তাহা হইলে ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রত্যহ কলিকাতায়

প্রাতঃকাল ৫।৫৪ সময়ের গ্রহস্ফুট দেওয়া আছে। এবং তৎসহ রবির ক্রান্তি (Declination) এবং রবি ও চন্দ্রের উদয়াস্তের সময় দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রত্যেক দিনের "কাল সমীকরণ" (Equation of time) প্রদত্ত না হওয়ায় সাধারণের পক্ষে যথার্থ উদয়াস্ত নির্ণয় করা কঠিন হইবে। আশা করা যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগামী বৎসর এইরূপ কয়েকটী ক্রটীর সংশোধন করিবেন। বঙ্গদেশে এরূপ নির্ভুল পঞ্জিকার প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক, এবং শশীবাবু যে স্বদেশের এক মহদুপকার সাধনে উদ্যোগী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

সায়ন্ত-চিকিৎসা।

চতুর্থ অধ্যায়।

নানাপ্রকার আগন্তুশোথের চিকিৎসা।

—(*)—

নানা কারণে নর-নারী শরীরে বিবিধ প্রকার আগন্তুশোথ জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ কারণজাত শোথের চিকিৎসা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যে প্রকার শোথে যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায় তাহা কথিত হইতেছে।

শরীরের স্থান বিশেষে প্রবল আঘাত লাগিলে যে বেদনাযুক্ত শোথ জন্মে তাহাকে অভিঘাতজ শোথ বলে। নিম্নলিখিত প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অভিঘাতজ শোথ প্রশমিত হয়।

১

কাঠের কয়লার আগুনে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া লইবে। যে পরিমিত তাপে পোড়াইলে তেঁতুলের মধ্যের শাঁস বা মজ্জা তরল হয়, সেই পরিমাণের তাপে পোড়াইতে হইবে। তারপর বীজ ও খোসা বাদ দিয়া মজ্জা বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণের গুঁড়া মিশাইয়া একটু গরম করিয়া শোথের উপর প্রলেপ দিবে। পুনঃ পুনঃ এই প্রলেপ লাগাইলে অতি সত্বর ফুলা ও বেদনা ভাল হইয়া যায়।

২

টাট্‌কা লেওয়া চুণ ও কাঁচা হলুদের রস সমান পরিমাণে লইয়া একত্র মিশাইবে। তারপর উহা একখানি মেটে পাত্রে রাখিয়া গরম করিতে হইবে। অল্প অল্প গরম থাকিতে অভিঘাতজ শোথের উপর প্রলেপ দিলে ফুলা ও বেদনা শীঘ্রই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

যদি কাঁচা হলুদ না পাওয়া যায় তাহা হইলে শুক্‌না হলুদের গুঁড়া ও লেওয়া চুণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

৩

উত্তমরূপে রস্থনের খোসা ছাড়াইয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। অত্যন্ত বেদনাযুক্ত প্রবল অভিঘাতজ শোথের উপর উক্ত প্রলেপ লাগাইলে অচিরে উপকার লাভ করা যায়। এই প্রলেপ কদাচ কোমল অঙ্গে প্রয়োগ করিবে না।

৪

শজুনার ছাল, অল্প ভাজা কৃষ্ণজীরা এবং মেথী সমান পরিমাণে লইয়া জল দিয়া বাটিয়া লইবে। তারপর অল্প গরম করিয়া শোথের উপর পুনঃ পুনঃ লাগাইলে উপকার লাভ করা যায়।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

—:০:—

ক্ষতাস্তক মলম ও তৈল—কবিরাজ শ্রীযুক্ত তড়িৎকুমার সেন গুপ্ত কাব্যবিনোদ কৃত। কবিরাজ মহাশয় ক্ষত চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয় ইঁহার চিকিৎসায় দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগ মুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ছোট আদালতের ক্লার্ক অব দি কোর্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেন, "আয়ুর্ব্বেদ মতে ক্ষত চিকিৎসা হয় এ বিশ্বাস আমার পূর্ব্বে ছিল না। আমার পারিবারিক চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে যে সকল দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগ আরোগ্য হইয়াছে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয়।" কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা নিপুণতায় ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং, এল, এম, রক্ষিত এণ্ড কোং, গিরীশচন্দ্র বসাক এণ্ড কোং, মহানন্দ কেশবচন্দ্র দাস এণ্ড কোং প্রভৃতি কলিকাতাস্থ অনেক গণ্যমান্য মহোদয়গণের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ইঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পারিতোষিক বিতরণ।

গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দরজীপাড়াস্থিত গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বীণাপাণি হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে না এ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের মত উল্লেখ করিয়া মহারাজাধিরাজ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্কুলের জনৈক সভ্য ডাক্তার ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায় মহামান্য গভর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে স্কুলটীর প্রায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। অত্র বিদ্যালয়ের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া স্কুলগৃহ প্রস্তুত কল্পে মহারাজাধিরাজ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালিকাদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে চারিটী রৌপ্য পদকের ব্যবস্থা আছে দেখিয়া স্বনামখ্যাত ডাক্তার এম্, কে, মল্লিক এবং ডাক্তার ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দুইখানি রৌপ্য পদক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য।

—:০:—

আর্য্যভূমির ১মবর্ষ শেষ হইল। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গ আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।